প্রাণ সমর্পণ।

সিন্ধু।

(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভাল,
সহি পদে পদে অপমান।

আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী
ধরা করি সরাজ্ঞান।

অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে
ভায়ে ভায়ে করি রণ।
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে
তার বেলা প্রাণপণ।
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছ্বসি
রাখিবার নাহি স্থান।

(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ,
(করি) পরের পরে অভিমান।
(ছিছি) পরের কাছে অভিমান!

(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক পসরা
যেওনা পরের দ্বার,
পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু
কাঁদিলে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চুরী না বাহাদুরী?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের পর বাড়ী যাইতেছিলাম। দুই বৎসরের অধিক প্রবাসে অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলাম। দুই বৎসরের সঞ্চিত অর্থ সঙ্গে লইয়া দেশে যাইতেছিলাম। রেলের পথে দুই দিন লাগে। অবশিষ্ট পথ গাড়ীর ডাকে আসিয়াছিলাম। রেলে

---

* এই দুটি গান ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় কর্ত্তৃক আহূত কালেজের ছাত্র সম্মিলন উপলক্ষে গীত হয়।

উঠিয়া অতিশয় সাবধানে যাইতেছিলাম। সঙ্গে যে অর্থ ছিল তাহার অধিকাংশ নোট, সে গুলি বাক্সে অথবা ব্যাগে রাখিতে সাহস হয় নাই। কোমর হইতেও অনেক টাকা অনেক সময় চুরি যাইতে শুনিয়াছি। সেই জন্য নোট গুলি বাঁধিয়া একখানা বড় রেশমের রুমালে পৈতার মত করিয়া কাঁধে বাঁধিয়াছিলাম। নোটের তাড়া বুকের উপর রহিল। তাহার উপর কাপড় চোপড় পরিলাম। আমার অজ্ঞাতে টাকা চুরি যাইবার আর কোন ভয় রহিল না। দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া রেলে উঠিলাম। পথ খরচের যে কয়টা টাকা আবশ্যক তাহা একটা কুরিয়র ব্যাগে ছিল, রাত্রে সেটা মাচার তলায় রাখিলাম। সেটা গেলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না।

ঘোড়ার গাড়ীতে যতটা পথ আসিয়াছিলাম কোন ভয়ই ছিল না। সে অঞ্চলে লোকে আমাকে বিলক্ষণ চিনিত, কাজ কর্ম্মের উপলক্ষে সে পথে আমার প্রায়ই যাওয়া আসা ঘটিত। সঙ্গে কিছু টাকা আছে জানিয়া কয়েক জন চাপরাসী সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহারা আমাকে রেলে তুলিয়া ফিরিয়া গেল। রেলের পথ যে নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যাইবে তাহাতে আমি কোন সন্দেহ করি নাই।

যে শ্রেণীর গাড়ীতে আমি চড়িয়াছিলাম তাহাতে অধিক লোক জন উঠে না। আমি প্রায়ই একা ছিলাম, কখন কখন দুই এক জন ওঠে আবার দুই চার ষ্টেশন পরে নামিয়া যায়। দীর্ঘ কালের জন্য সঙ্গী না থাকাতে আমি বরং খুসী হইলাম। যতই একা থাকি ততই নিশ্চিন্ত থাকি। বিশেষ যে কোন ভয় হইতেছিল তাহা নহে তবে আর কেহ আমার গাড়ীতে আসিলেই মনটা একটু খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল, যে আসিতেছিল তাহাকেই যে চোর মনে হইতেছিল এমত নহে, হয়ত তাহাদের মধ্যে অনেকে আমার অপেক্ষাও ভদ্র লোক, হয়ত আমার পক্ষে চুরী করা যেমন সম্ভব তাহাদের পক্ষে চুরী করা তাহার অপেক্ষা কম সম্ভব। কিন্তু বিচার করিয়া মনকে বুঝান যায় না। যখন কেহ আমার গাড়ীতে আসে আমি তখনি মনে করি, কেন, এই বই কি আর অন্য গাড়ী নাই? মুখে ফুটে বলিতে পারি না। কি করিয়াই বা বলিব? এক-খানি টিকিট লইয়া একখানা গাড়ী সমুদয় দখল করিবার আমার অধিকার কি?

প্রথম দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। আর এক রাত্রি কাটিলেই বাড়ীতে পঁহুছি। কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। বাড়ীতে আত্মীয় বন্ধুদিগের পুনর্দর্শন লালসা যেন কত প্রবল হইয়া উঠিল। আর একটা দিন যেন কাটে না। এত দিনের পর সহধর্ম্মিণীকে কি করিয়া সম্ভাষণ করিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। শেষ বারের চিঠি পকেটে ছিল বাহির করিয়া আবার পড়িতে লাগিলাম। ছেলে দুটির মুখ মনে পড়িতে লাগিল। তাহারা এখন কত বড় হইয়াছে? আবার কি আমায় চিনিতে পারিবে? বড়টী বোধ হয় চিনিতে পারিবে। ক্রমে ক্রমে আর সব ভুলিয়া গেলাম। প্রিয়জনদিগের পরিচিত কণ্ঠরব অস্পষ্ট ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় শ্রবণে পশিতে লাগিল। প্রিয়-

তমার আলিঙ্গন স্পর্শ যেন হৃদয়ে অনুভূত করিতে লাগিলাম। সন্তানের মুখ চুম্বন শব্দ শুনিলাম, বন্ধুদিগের সাদর সম্ভাষণ শুনিলাম, সস্নেহ সাগ্রহ সহস্র প্রশ্ন শুনিতে পাইলাম। অনতিদূর ভবিষ্যতের গাঢ় কল্পনায় বর্ত্তমান বিস্মৃত হইলাম।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মাঠের ভিতর দিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পুষ্করিণীর সম্মুখ দিয়া, নদীর উপর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিল। আকাশে একে একে নক্ষত্র উঠিতে লাগিল।

অন্ধকার হইলে গাড়ী একটা ষ্টেশনে লাগিল। আমি এক কোণে বসিয়া নিজের ভাবনায় মগ্ন ছিলাম। এমন সময় ষ্টেশনের একজন লোক গাড়ীর দরজা খুলিল। আমি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আরও কোণ ঘেঁসিয়া বসিলাম। শেষ রাত্রিটা যে একেলা থাকিব তাহারও যো নাই। আবার একজন সঙ্গী জুটিল। কিছুক্ষণ আমার সঙ্গীর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। কেবল জিনিস পত্র গাড়ীতে বোঝাই হইতে লাগিল। একজন লোককে গাড়ীতে এত জিনিস পত্র লইয়া উঠিতে আমি কখন দেখি নাই। গাড়ীর মধ্যে একটুও স্থান রহিল না। পোঁটলা পুঁটলি পর্ব্বতের সমান হইয়া উঠিল। আমি বিস্মিত হইয়া একজন কুলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কয়জন উঠিবে ?"

"এক জনের এত আসবাব ? ব্রেকভ্যানে কিছু দেওয়া হয় নাই কেন ?"

কুলিরা অত শত জানে না। তাহাদের পয়সা লইয়া কাজ। ব্রেকভ্যানে তুলিলে তাহারা কিছু পায় না। তাহারা ব্যস্ত হইয়া আসবাবের স্তূপ সাজাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশন মাষ্টার আরোহীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। দরজা খুলিয়া ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন, "মহাশয়, এই গাড়ী।"

লোকটা বড় বিজ্ঞের মধ্যে হইবে। ষ্টেশন মাষ্টার স্বয়ং গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছে।

আমাকে গাড়ীতে দেখিয়াই সে ব্যক্তি যেন একটু অপ্রসন্ন হইল। ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল, "খালি গাড়ী নাই ? এ গাড়ীতে যে লোক দেখিতেছি।"

ষ্টেশন মাষ্টার কহিল, "আজ কিছু ভিড়। অন্য গাড়ীতে আরও লোক। আপনার এই গাড়ীতে সুবিধা হইবে। আমি দেখিয়া শুনিয়াই আপনাকে এ গাড়ীতে উঠিতে বলিতেছি।"

আর এক দিকে ষ্টেশন মাষ্টারের ডাক পড়িল। আমি মুখ বাড়াইয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিলাম। সে ফিরিল। আমি বলিলাম, "মহাশয়, গাড়ীতে যে রকম জিনিস বোঝাই হইয়াছে তাহাতে বসিবার স্থান পাওয়া ভার। কতক বোঝা ব্রেকভ্যানে পাঠাইলে ভাল হয়।"

ষ্টেশন মাষ্টার উঁকি মারিয়া গাড়ীর ভিতর দেখিল। বলিল, "তাইত।" তার পর দ্বিতীয় আরোহীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি কি বলেন?"

সে লোকটী শশব্যস্তে কহিল, "তাহা হইবে না। আমার সমুদয় জিনিস আমার সঙ্গে যাইবে।"

ষ্টেশন মাষ্টার আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। কহিল, "মহাশয়, আপনি ভদ্রলোক। এত মাল লইয়া গাড়ীতে উঠিবার নিয়ম নাই বটে, কিন্তু আপনার বোধ হয় অসুবিধা হইবে না। আর কেহ বোধ হয় এ গাড়ীতে উঠিবে না। আর সময়ও নাই। জিনিস বাহির করিতে, টিকিট মারিতে, ব্রেকভ্যানে তুলিতে বিলম্ব হইবে। আপনি এখন আর পীড়াপীড়ি করিবেন না।"

আমারও পীড়াপীড়ি করিবার বড় ইচ্ছা ছিল না। আর একটা রাত বই ত নয় যেমন তেমন করিয়া কাটিয়া যাইবেই। বিশেষ ষ্টেশন মাষ্টার যে রকম করিয়া আমাকে বুঝাইয়া বলিল তাহাতে আমি নিরুত্তর হইলাম।

ষ্টেশন মাষ্টার আরোহীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি গাড়ীতে উঠুন। গাড়ী ছাড়ে।" এই বলিয়া সেকহ্যাণ্ড করিয়া চলিয়া গেল। আরোহী গাড়ীতে উঠিল।

গাড়ীতে উঠিয়া সে ব্যক্তি তাহার বোঁচকা বুঁচকি গণিতে লাগিল। খানিক ক্ষণ কুলিদিগের সহিত বচসা করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি এক ধারে বসিয়া নবাগত লোকটীকে দেখিতেছিলাম। তাহাকে দেখিলে বড় ভয় হইবার কথা নহে। লোকটী কিছু বেঁটে, মোটাসোটা, ছোট রকম একটী ভুঁড় আছে। গায়ে আঁটা পোশাক, ভুঁড়ির উপর একগাছা মোটা চেন ঝুলিতেছে। লোকটীকে দেখিলে সঙ্গতিশালী বোধ হয়। অর্থ এবং পদের যে ক্ষুদ্র অভিমান তাহাও বোধ হয় যথেষ্ট পরিমাণ আছে। লোকটা দেখিতে বিজ্ঞ ডিপুটীর মত, কিন্তু বোধ হয় ডিপুটীর অপেক্ষা আত্মশ্লাঘী। গাড়ীতে উঠিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাহার অসংখ্য পুঁটুলি সাজাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু অলক্ষিতে আমার প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে কুলিরা জিনিস পত্র অসাবধানে রাখিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে গালি দিতে লাগিল।

ঘণ্টা বাজিল, বাঁশী ডাকিল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, কোথা যাইবেন?"

"কলিকাতা। আপনি কোথায় যাইবেন?"

আমি বলিলাম, "শ্রীরামপুর।" মনে করিয়াছিলাম এ লোক অল্প দূর গিয়া নামিয়া যাবে। দেখিলাম আমার সাধের সাথী।

আমি শ্রীরামপুরে যাইব শুনিয়া লোকটী তাহাঁর লটবহর ছাড়িয়া আর এক কোণে বসিয়া পড়িল। বসিয়া বলিল, "আঃ"।

শব্দটী সন্তোষ অথবা অসন্তোষসূচক ভাল বুঝিতে পারিলাম না। ঐ শব্দটী করিয়া লোকটী আমায় ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল।

আমাকে কতকটা বিদেশীর মত দেখাইতেছিল। বসন ভূষণের বড় পারিপাট্য ছিল না। বেশ ভূষার উপর অনুরাগ কোন কালেই আমার বড় নাই তাহাতে রেলের পথে অতি সামান্য বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলাম। ঘড়ী ও চেন বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার আকৃতি দীর্ঘ, শরীর বলিষ্ঠ। বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়াছিলাম।

খানিকক্ষণ আমাকে দেখিয়া বোধ হয় সে ব্যক্তি বড় আশ্বস্ত হইল না। জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের এ পথে যাতায়াত আছে?

আমি বলিলাম, "না।"

"আপনি রেলে বড় একটা উঠিয়া থাকেন?"

"বড় নয়।" লোকটার কথায় আমার একটু বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। কোথায় সহজ কথাবার্ত্তা কহিবে না আমায় পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল!

কিছু পরে আমার সঙ্গী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমি গাড়াতে এত জিনিস পত্র লইয়া কেন উঠিয়াছি, জানেন?"

"না।"

"সম্প্রতি ব্রেকভ্যান হইতে অনেক সামগ্রী চুরী গিয়াছে। গার্ড বলে সে কিছু জানে না। তাহার মেয়াদ হইয়াছে বটে কিন্তু সে যে চুরী করিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই।"

কথাটা শুনিয়া আমার ঔৎসুক্য জন্মিল। বুকের উপর হাত ছিল, হাত দিয়া নোটের তাড়া একবার টিপিয়া দেখিলাম। কিছু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কত দিনের কথা?"

"এক সপ্তাহ হইবে।"

আমি বলিলাম, "যদি ব্রেকভ্যান হইতে চুরী যায় ত গাড়ী হইতে চুরী যাওয়াই বা আশ্চর্য্য কি?"

"আশ্চর্য্য কি!" এই বলিয়া আমার সঙ্গী কাতর দৃষ্টে চারিদিকে চাহিতে লাগিল একবার তাহার জিনিস পত্রের দিকে তাকায়, একবার গাড়ীর চারিদিকে তাকায় একবার গাড়ীর বাহিরে অন্ধকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার দিকে তীব্র অথচ অলক্ষ্য কটাক্ষ করে। একটা ছোট বাক্স পায়ের কাছে ছিল থাকিয়া থাকিয়া সেইটাকে আরও কাছে টানিয়া আনে। অবশেষে বাক্সটা তুলি

পার্শে রাখিল। আমাকে চোর বলিয়া [illegible] অথবা অকারণ সংশয় করিতেছে ভাল বুঝিতে পারিলাম না। স্থির হ[illegible]সিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

এইরূপে কিছুক্ষণ যায়। [illegible] একটু অন্যমনস্ক হইলাম। এক একবার আমার সঙ্গীর দিকে চাহিয়া [illegible]। সে লোকটী নির্নিমেষ চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমার সঙ্গে চোকোচোকি হইলেই অন্য দিকে চক্ষু ফিরায়; আমি অন্য দিকে তাকাইলেই [illegible] হইয়া আমায় দেখে। আমার মনটা একটু খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। হঠাৎ আমার সঙ্গী আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় আপনি কি অস্ত্র লইয়া পথ চলেন?"

আমি একটু হাসিয়া কহিলাম, "ইংরাজের রাজ্যে কেহ সশস্ত্র হইয়া রেলে ওঠে না।"

আমার ক্ষুদ্রকায় সঙ্গী একটু রুক্ষস্বরে কহিল, "আমি অস্ত্র লইয়াই ভ্রমণ করি। এই যে আমার পাশে বাক্স দেখিতেছেন তাহাতে একজোড়া ভরা পিস্তল আছে।"

আমি হাস্যমুখে কহিলাম, "আপনি কি শীকারে যাইতেছেন?"

সে ব্যক্তি কিছু কঠোর হাস্য করিয়া বলিল, "আপাততঃ কোন শীকার নাই, তবে আমাদের গাড়ীতে যদি কোন চোর ওঠে ত তাহাকে শীকার করিব। তাহাকে প্রাণে না মারি তাহার পা ভাঙ্গিয়া রাখিব।" এই বলিয়া অত্যন্ত সাহসিক পুরুষের ন্যায় বুক ফুলাইয়া আমার প্রতি খর খর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

আমার বড় হাসি পাইল। লোকটা আমায় তস্কর বিবেচনা করিতেছে অথবা সেইরূপ সন্দেহ করিতেছে বেশ বুঝিতে পারিলাম। একটু রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "পিস্তল ছোঁড়া আপনার অভ্যাস আছে?"

তাহার মুখ একটু মলিন হইল, কহিল, "এক রকম অভ্যাস আছে। এ গাড়ীতে চোর আসিলে তাহাকে অবশ্য যায়েল করিতে পারি।"

আমি গম্ভীর ভাবে কহিলাম, "আপনার কাছে দুইটা পিস্তল আছে বলিতেছেন। আপনি একটা পিস্তল আমাকে দিন, আর এই দুআনিটী এই জানালার সম্মুখে ধরুন। আমি গাড়ীর অন্য ধার হইতে পিস্তল ছুঁড়িয়া দুআনি উড়াইয়া দিতেছি। আপনার হাতে কিছু লাগিবে না।"

আমার কথা শুনিয়া সে বেচারির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বাক্সটী আরও কাছে টানিয়া লইল। হাত একটু কাঁপিতেছিল আমি দেখিতে পাইলাম। বলিল, "আপনার বোধ হয় বন্দুক ও পিস্তল ছুঁড়িবার বিলক্ষণ অভ্যাস আছে। কিন্তু পরীক্ষা করিবার আবশ্যক নাই।"

আমার মনে প্রথমেই সন্দেহ হইয়া[illegible] বাক্সটী দেখিতে পিস্তলের বাক্সের হইলেও তাহাতে পিস্তল নাই। আমার সঙ্গী যে মিথ্যা বলিতেছে তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া ছিলাম।

এই সময় আমরা একটা ছোট ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমি ষ্টেশনের

অপর দিকে জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলাম। নিশীথের শীতল পবন মুখে লাগিতে লাগিল। আকাশে চতুর্দিকে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, বিস্তৃত মাঠ, দূরে লোকালয়। দূর হইতে প্রদীপের আলোক দেখা যাইতেছে। অন্ধকারে কখন বাদুড় উড়িয়া যাইতেছে কখন পেচক ডাকিতেছে, কখন কোন নিশাচর জন্তুর রব শোনা যাইতেছে। ষ্টেশনে গোলমাল, বারাণ্ডায় লোকজন দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কেহ জল চাহিতেছে কেহ কোন সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে, কেহ অনর্থক চীৎকার করিতেছে। আমি সে দিকে মুখ ফিরাইলাম না।

দুই মিনিটের পর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি ঘুরিয়া বসিলাম—দেখিলাম গাড়ীতে আর একজন লোক উঠিয়াছে। অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। দরজা খুলিবার শব্দ অথবা অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই। এত নিঃশব্দে যে কেহ গাড়ীতে উঠিতে পারে আমি না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। বিস্ময় কিছু অপনীত হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি এই ষ্টেশনে উঠিলেন ?"

আগন্তুক মৃদু হাসিয়া কহিল, "হাঁ। আপনি বুঝি আমায় উঠিতে দেখেন নাই।

আমি বলিলাম, "দেখা দূরে থাকুক, দরজা খোলার অথবা বন্ধ হইবারও কোন শব্দ শুনি নাই। গাড়ীতে যদি ছাদ না থাকিত ত বলিতাম আপনি আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।"

আগন্তুক হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "মহাশয়, হাল্কা বোঝা মাথায় করিলে মুটে কিছু ভার বোধ করে না। চার গাছা মল পায়ে না পরিলে যুবতীর পায়ে শব্দ হয় না। আমি যদি আপনার বন্ধুর মত রাজ্যের সামগ্রী লইয়া উঠিতাম তাহা হইলে অবশ্য শুনিতেও পাইতেন দেখিতেও পাইতেন।"

'আমার বন্ধু' এতক্ষণ হাঁ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনিও আগন্তুককে আসিতে দেখেন নাই কিন্তু আর একজন লোক দেখিয়া তাহার ধড়ে প্রাণ আসিল। আমার হাত হইতে রক্ষা পাইল। তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত কহিল "আসুন মহাশয়, যেমন করিয়াই আসুন আসিয়াছেন বেশ করিয়াছেন। আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন ত ?"

আগন্তুক আবার হাসিয়া কহিল, "তাহা হইলে কি এমন করিয়া যাইতাম। অন্তত আপনার আসবাবের দশভাগের একভাগ লইয়া আসিতাম। আর তাহা হইলে আমার অলক্ষ্য আগমনও সম্ভব হইত না, আপনারা বিস্মিত হইতেন না। আমি মোটে এক ষ্টেশন যাইব, তাহার পরে আপনারা [illegible] নিদ্রা যাইবেন।

কলিকাতার যাত্রী কিছু বিষণ্ণ হইল, [illegible] একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল আমি অন্ধকার কোনে ঠেসান দিয়া বসিয়া আগন্তুককে ভাল করিয়া দেখিতেছিলাম।

আগন্তুক যুবা পুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ হইবে না, বরং কম হইবে

আকৃতি মাঝারি রকম ঈষদ্দীর্ঘও বলা যাইতে পারে। শরীর ক্ষীণ কিন্তু অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক। মুখের শ্রী অত্যন্ত মনোহর, হাস্যও বড় মধুর। পরিধান পরিচ্ছন্ন বস্ত্র, হাতে একটী ক্ষুদ্র ব্যাগ। কিন্তু যুবকের চক্ষু দেখিতে পাইলাম না। রেলে লোকে যেমন নীল রংএর চসমা পরে চক্ষে সেই রকম চসমা রহিয়াছে। রাত্রিকালে চোক্ষে চসমা দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল। যুবক আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "রাত্রে আমার চক্ষে চসমা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। চক্ষে কিছু বেদনা হইয়াছে সেই জন্য চসমা পরিয়াছি।"

এ ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার মন একটু চঞ্চল হইল। বলিতে পারি না কেন, মনে একটু বিপদের আশঙ্কা হইল। বোধ হয় অন্য মনে দুই একবার বুকে হাত দিয়া নোটের তাড়া স্পর্শ করিয়া থাকিব। যুবক কি দেখিতেছিল কি না, তাহার চক্ষে চসমা থাকাতে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সে এদিকে ওদিকে না চাহিয়া আমার পূর্ব্ব পরিচিত সঙ্গীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। একবার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনার ও বাক্সের ভিতর কি? পিস্তল না কি?"

আমার সঙ্গী অত্যন্ত বিস্মিত ও কিছু শঙ্কিত হইয়া কহিল, "হাঁ। আপনি কি করিয়া জানিলেন?

যুবক কহিল পিস্তলের বাক্স দেখিয়া বলিলাম। আপনি কি চোরের ভয়ে পিস্তল লইয়াছেন?"

সে ব্যক্তি আরও বিস্মিত হইল, বলিল, "আপনি কি সব জানেন?"

যুবক আবার হাস্য করিল। তাহার দশন পংক্তি শুভ্র ও সুন্দর। কহিল, "আমি কিছুই জানি না। কিন্তু যদি চোর আসে ত কি আপনাকে বলিয়া চুরী করিবে?"

আমার সঙ্গী অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিল, "চোর ত বাহির হইতে আসিবে না। যদি চোর আসে ত এই গাড়ীতেই আসিবে।"

যুবক আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের দুই জনের মধ্যে কাহাকেও সন্দেহ হয়?"

"না, না, আপনাদের কথা হইতেছে না। যদি আর কেহ ওঠে।"

যুবক কহিল, "তা ও বটে।"

আমার সন্দেহ ও আশঙ্কা বাড়িতে লাগিল। আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না তথাপি অত্যন্ত শঙ্কা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অন্য ষ্টেশন আসিল। যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। আমাদের দুই জনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনারা এখন নিশ্চিন্তে নিদ্রার চেষ্টা করুন। চোরের ভয়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবেন না।" এই বলিয়া নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া যুবক নামিয়া গেল।

অকারণে এরূপ আশঙ্কা হওয়াতে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু যুবক নামিয়া গেলে স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিলাম। বিছানার উপর পা ছড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শুইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাকে শুইতে দেখিয়া আমার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি নিদ্রা যাই-বেন?

আমি বলিলাম, "সমস্ত রাত্রি কি বসিয়া থাকা যায়?"

আমার সঙ্গী কহিল, "আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিব।"

"আপনার যেমন অভিরুচি হয় করিবেন," বলিয়া আমি পাশ ফিরিলাম।

শুইলাম বটে কিন্তু চক্ষে নিদ্রা আসিল না। ঘণ্টা কয়েক পরেই বাড়ী পঁহুছিব—এমন সময়ে নিদ্রা হয়ও না। যে আরোহী এক ষ্টেশন আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল তাহার বিষয় ভাবিত লাগিলাম। রাত্রে চক্ষে চসমা কেন? তাহাকে দেখিয়া মনে মনে আশঙ্কাই বা কেন হইল? লোকটা দেখিতে মন্দ নয়, কথাবার্ত্তা শিক্ষিত ভদ্র লোকের মত। তথাপি সে নামিয়া গেলে নিশ্চিন্ত বোধ হইল কেন? ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

একবার আমার সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম সে বাক্সটা মাথার কাছে লইয়া প্রাণপণে জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই বসিয়া থাকিতে পারি-তেছে না। অবশেষে শয়নকরিবা মাত্র নিদ্রাভিভূত হইল। আমার তখনও নিদ্রাবেশ হয় নাই।

সেই গভীর নিশীথের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। সে শব্দে আর কোন শব্দ শোনা যায় না, গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হইলে আমার নিদ্রিত সঙ্গীর নাসিকারব শুনিতে পাওয়া যায়।

ক্রমে ক্রমে আমার শরীর শিথিল হইল, মনে হইল তন্দ্রাকর্ষণ হইতেছে। কিন্তু এরূপ নিদ্রাবেশ পূর্ব্বে কখন অনুভব করি নাই। বোধ হইল যেন সমস্ত শরীর গুরু ভারাক্রান্ত হইয়াছে, নেত্রদ্বয় যেন কে চাপিয়া ধরিয়াছে। একবার চক্ষু উন্মীলন করিবার চেষ্টা করিলাম—চক্ষু নিমীলিত রহিল। ক্রমে চৈতন্য লুপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু একেবারে অচৈতন্য হইলাম না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, আপনা আপনি চক্ষু উন্মীলিত হইয়া গেল। অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলাম না। যে দিকে আমার সঙ্গী নিদ্রিত ছিল সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। আর কিছু দেখিতে পাইলাম না, কেবল অঙ্গারের মত উজ্জ্বল চক্ষু দেখিতে পাইলাম। সমুদয় ইন্দ্রিয় বৃত্তি আমার চক্ষে কেন্দ্রীভূত হইল, স্তিমিত নয়নে ভীতিমুগ্ধ হইয়া সেই জ্বলন্ত চক্ষু যুগলের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে

সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমি অচৈতন্য হইলাম।

কতক্ষণ এরূপ রহিলাম বলিতে পারি না। যখন আবার চৈতন্যোদয় হইল তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, অন্ধকার তত গাঢ় নাই। মুক্ত গবাক্ষ দিয়া শীতল পবন আসিতেছে, আমার ললাটে লাগিতেছে। আমি একেবারে উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়া বসিতেই অভ্যাসবশতঃ বুকে হাত পড়িল। অমনি তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বুকে নোটের তাড়া নাই!

সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। চক্ষে কিছু দেখিতে না পাইয়া বসিয়া পড়িলাম। মনে করিলাম রুমাল খানা বুক হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ জামা খুলিয়া ফেলিলাম। রুমাল শুদ্ধ নোটের তাড়া অদৃশ্য হইয়াছে! বিছানার নীচে, বেঞ্চের নীচে চারিদিকে খুঁজিলাম, কোথাও কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।

গাড়ীতে কোথা হইতে চোর আসিল, এত সাবধানে রক্ষিত নোটগুলি কিরূপে অপহৃত হইল? গাড়ীতে কেবল সেই একজন সঙ্গী, তৃতীয় ব্যক্তি নাই। আমি দ্বিতীয় আরোহীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। গাড়ীর আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

আমি ক্ষিপ্তের মত হইয়া উঠিয়াছিলাম। অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইলে সকলে স্থির থাকিতে পারে না। আমার সঙ্গীকে ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিলাম। সে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বকিতে বকিতে উঠিয়া বসিল। আমার মূর্ত্তি দেখিয়া সে অত্যন্ত ভীত হইল—সম্পূর্ণ জাগরিত হইল। আমি বলিলাম, "এ কেমন তামাসা? আমার টাকা?"

তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, কহিল, "টাকা? আমার কাছে কিছু টাকা নাই।"

আমি তাহার হাত ধরিয়াছিলাম, তাহার কথা শুনিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিলাম; সে পড়িতে পড়িতে রহিল। আমি চীৎকার করিয়া কহিলাম, "আমার নোট কোথায় আছে বল!"

ভয়ে ও বিস্ময়ে আকুল হইয়া সে কহিল, "তোমার নোট আমার কাছে!" এই কথা বলিয়াই তাহার শিয়রের দিকে দৃষ্টি পড়িল। অত্যন্ত কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, "আমার বাক্স?"

আমি দেখিলাম তাহার বাক্সটী নাই। তখন তাহার হাত ছাড়িয়া দিলাম। সে শোকে ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। কিছু পরে অতি করুণ স্বরে আমায় কহিল, "আমার বাক্সটী কোথায় রাখিয়াছ?"

আমি বুকে হাত দিয়া কহিলাম, "আমার নোট?"

সে ব্যক্তি কহিল, "আমার বাক্স?"

আমি ভাবিতে লাগিলাম। আমাদের দুইজনের মধ্যে কেহ চোর নয় বেশ বুঝিতে পারিলাম। দুই জনেরই চুরী গিয়াছে। আমার সঙ্গীর বিশ্বাস আমিই তাহার বাক্স চুরী করিয়াছি, তাহাকে উল্টা চোর বানাইতেছি। নোটের কথাটা সে উপকথা মনে করিতেছিল। আমি কিছু স্থির হইয়া আমার সঙ্গীকে বলিলাম, "মহাশয়, আমিও চোর নই, আপনিও চোর নন। দুইজনেরই চুরী গিয়াছে। কে চুরী করিয়াছে সেইটে জানা কঠিন।"

সে ব্যক্তি বোধ হয় আমার একটা কথাও বিশ্বাস করিল না। আমার দিকে চাহিয়া কেবল বলিল, "আমার বাক্স।"

আমি কহিলাম, "আপনার কত গিয়াছে আমি জানি না। আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। আমার প্রতি আপনার যে সন্দেহ হইতেছে তাহা শীঘ্রই দূর হইবে, কিন্তু আর কিছু গেল কি না দেখি।"

বাক্স ব্যাগ যেমন তেমনি রহিয়াছে। আমার আর যে সামান্য টাকা কড়ি ছিল তাহাও তেমনি রহিয়াছে। আমার সঙ্গীর বাক্সটী ছাড়া আর কিছু যায় নাই। তাহার ঘড়িটিও যেমন তেমনি রহিয়াছে, তবে চেনে কিছু তফাৎ হইয়াছে। সোণার চেনের বদলে একগাছি লোহার চেন রহিয়াছে! নূতন রকমের চুরী বটে!

তাহার পরের ষ্টেশনে আমার সঙ্গীটি ভারি গোল বাধাইল। আমি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার আসিলে বলিলাম, "আমাদের দুইজনের চুরী গিয়াছে।"

ষ্টেশনের লোক দেখিয়া আমার সঙ্গীর সাহস বাড়িল। আমার কথায় বাধা দিয়া কহিল; "নোট ফোট কিছু নয়। এই ব্যক্তি চোর। আমার বাক্সে দুই হাজার টাকার গহনা ছিল।"

আমি ষ্টেশন মাষ্টারকে কহিলাম, "আমার কাছে দশ হাজার টাকার নোট ছিল। নোটের নম্বর আমার কাছে আছে। আমার পরিচয় আমার কর্ম্ম স্থানে টেলিগ্রাম পাঠাইলেই পাইবেন। নোট ট্রেজরি হইতে লইয়া আসিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে কাগজ পত্র দেখাইলাম। রাত্রে যে বিশেষ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল সেটা কেহ বিশ্বাস করিবে না বলিয়া আর বলিলাম না।

ষ্টেশন মাষ্টার কহিল, "আপনার কথায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছি। কিন্তু এখানে আপনাকে কেহ চেনে না। যতক্ষণ টেলিগ্রামের উত্তর না আসে ততক্ষণ আপনাকে এইখানে থাকিতে হইবে।"

আমি কহিলাম, "অবশ্য।"

আমার সঙ্গী ষ্টেশন মাষ্টারের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আমাকেও কি থাকিতে হইবে? আমাকে অনেকে এদিকে চেনে।"

ষ্টেশন মাষ্টার কহিল, "আজ্ঞা হাঁ। লোকনাথ বাবুকে অনেকে চেনে।"

আমি মৃদু মৃদু কহিলাম, "লোকনাথ বাবু? নিবাস?

"সোমড়া। মহাশয়ের নামটী কি বলিলেন?"

আমি বলিলাম, "অমরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়।"

লোকনাথ বাবু আমার কাছে সরিয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নিবাস শ্রীরামপুর বলিলেন না?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"ঠাকুরের নাম?"

"মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"কর্ম্মস্থান?" "ফরক্কাবাদ"

"এতক্ষণ বলিতে নাই? আমার নাম লোকনাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস সোমড়া। আমায় চিনিতে পার?"

আমি প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আপনাকে পূর্ব্বে দেখি নাই। আপনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনার কন্যা দান করিয়াছেন?"

লোকনাথ বাবু ব্যস্ত হইয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "ইহার উপর কোন সন্দেহ নাই। ইনি আমার আত্মীয় লোক। আমাদের দুই জনের চুরী গিয়াছে।"

ষ্টেশন মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিল, "ইহার উপর আপনার কোন সন্দেহ নাই?"

লোকনাথ বাবু সবেগে কহিলেন, "কিছু না।"

ষ্টেশন মাষ্টার আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "তবে টেমিগ্রামের উত্তরের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।"

আমরা দুই জনে আবার গাড়ীতে উঠিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গাড়ীতে উঠিয়া আমি একটু কুণ্ঠিত ভাবে কহিলাম, "আপনাকে চিনিতে না পারিয়া রাত্রে সদ্ব্যবহার—"

লোকনাথ বাবু কথাটা সমাপ্ত হইতে দিলেন না। কহিলেন, "বিলক্ষণ তোমার ত কোনই দোষ নাই। আমি যে তোমাকে দশ জনের সাক্ষাতে চোর বলিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "অমন অবস্থায় সকলেই বলে। আমিও ত প্রথমে আপনাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম।"

লোকনাথ বাবু কহিলেন, "সে কথা যাক্, চোর কেমন করিয়া ধরা যাইবে? এ ত সাধারণ চুরী নয়।"

লোকনাথ বাবু একজন প্রসিদ্ধ ধনী এবং অত্যন্ত কৃপণ। সেই জন্য তাঁহাকে অনেকে

চিনিত। আমার সর্ব্বস্ব গিয়া যত না বিপদ হইয়াছে, দুই হাজার টাকার গহনা গিয়া তাঁহার ততোধিক বিপদ। একমাত্র কন্যার জন্য এই গহনা গড়াইয়া ছিলেন।

রাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল অবিকল লোকনাথ বাবুকে বলিলাম। শুনিয়া তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমি বরাবর ঘুমাইয়া ছিলাম, কিছুই টের পাই নাই। একবার কেবল ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল তখন উঠিতে পারিলাম না। চোকে যেন পাথর চাপা ছিল। আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম।"

আমি বলিলাম, "আমাদের সঙ্গে একজন সেই যে চসমা পরা লোকটা উঠিয়াছিল তাহাকে মনে পড়ে?"

লোকনাথ বাবুর মুখ এবং চোক খুলিয়া গেল। বলিলেন, "অ্যাঁ! পড়ে বই কি! সেত বেশলোক বোধ হইল। আর সে এক ষ্টেশন বই ত আর আসে নাই।

আমি বলিলাম "তাহাকে দেখিয়া আমার কেমন ভয় হইয়াছিল বলিতে পারি না। তাহাকেই আমার সন্দেহ হইতেছে।"

লোকনাথ বাবু বলিলেন, 'তোমার বুক থেকে কেমন করিয়া রুমাল খুলিয়া লইল। আর তুমি যাহা বলিতেছ এ রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার আমি কখনও শুনি নাই।"

শ্রীরামপুরে আমি নামিয়া গেলাম। ষ্টেশনে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর দাঁড়াইয়া ছিলেন তাঁহাকে সব বলিলাম। তিনি লোকনাথ বাবুকে নামিয়া আহার করিয়া কলিকাতায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। লোকনাথ বাবু বলিলেন, "আর এক দিন আসিব। এখন এই চুরীর একটা উপায় করি।"

গাড়ী ছাড়িলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কহিলেন, "ব্যাঙ্কে টেলিগ্রাম পাঠাও। নোটের নম্বর তোমার কাছে আছে। ব্যাঙ্কে নোট গেলে ধরা পড়িবে। আহার করিয়া আমরা কলিকাতায় যাইব।"

তখন মনে হইতে লাগিল সঙ্গে টাকা আনিয়া কি মূর্খের কাজই করিয়াছি! যদি রেজিষ্টরি করিয়া টাকা পাঠাই ত এতগুলা টাকা—আমার যথাসর্ব্বস্ব—মারা যায় না। বিদেশে যাইবার সময় মাকে বলিয়া গিয়াছিলাম ফিরিয়া আসিয়া তোমার হাতে টাকা দিব। সেই জন্য নিজের সঙ্গে টাকা লইয়া আসিতেছিলাম। এখন গিয়া মাকে কি বলিব? বহু পরিশ্রম উপার্জ্জিত অর্থ বাড়ীর কাছে আসিয়া হারাইলাম। বাড়ী ফিরিবার এত আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল।

মা বড় বুদ্ধিমতী। সমস্ত টাকা চুরী গিয়াছে শুনিয়া মনে যাহাই হউক মুখে কোন দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন, "অমর বেঁচে থাক্, টাকার ভাবনা কি? পুরুষ মানুষ আবার কত টাকা রোজগার কোর্‌বে?

আহারাদি করিয়া দুপুরের গাড়ীতে আমরা দুই ভাই কলিকাতায় গেলাম। রেলওয়ে পুলিসে চারিদিকে সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু তাহারা যে তদন্ত করিতে পারিবে আমা-

দেশে সে ভরসা বড় ছিল না। আমরা একজন বিখ্যাত ডিটেক্টিভের কাছে গেলাম। তাহাকে সকল কথা আদ্যোপান্ত বলিলাম। সে একটু চুপ করিয়া রহিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "সে ব্যক্তির চক্ষু আপনি দেখিতে পান নি?"

আমি বলিলাম, "একবারও না।"

ডিটেক্টিভ বলিল, "তাহা হইলে তাহাকে চেনা দুষ্কর। মানুষের চোক না দেখিলে তাহাকে চেনা যায় না।"

রাত্রে যাহা দেখিয়াছিলাম, সেই উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় দেখিয়া যে অবস্থা হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে ডিটেক্টিভ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। পরিশেষে কহিল, "আমরা ইহাতে কিছু করিতে পারি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? যে চুরী আর কেহ ধরিতে পারে না সেই চুরী ধরাই ত তোমার ব্যবসা।"

ডিটেক্টিভের দুটি দাঁত বাহির হইল। কহিল, "চুরী হইলে ত। এ চুরী নয়।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি?"

"বাহাদুরী।"

"সে কি?"

ডিটেক্টিভ বাম হস্তে দক্ষিণ হস্তের দুই অঙ্গুলি রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল "আপনারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন। এ সহজ কৌশলের চুরী নয়। যখন চুরী কোন মতে সম্ভব নয় তখন চুরী হইল। আপনি জাগিয়া ছিলেন আপনাকে কোন কৌশলে ঘুম পাড়াইয়া রাখিল। আপনার সঙ্গীরও সেই দশা। যে নোটের তাড়ার জন্য আপনি বড় ভীত সেই নোটের তাড়া গেল। আপনার সঙ্গী যে বাক্সটীর জন্য ভয়ে সারা সেই বাক্সটী গেল। আপনার ঘড়ী, খুজরা টাকা, আপনার সঙ্গীর ঘড়ী কিছু গেল না। চেন ছড়া লইল সেটা যেন তামাসা করিবার জন্য। এমন সুবিধা পাইয়া কোন চোর দুটা দুটা ঘড়ী রাখিয়া যায়?"

আমি এ কথা গুলা আগে ভাবি নাই। এখন নিরুত্তর হইলাম। ডিটেক্টিভ বলিতে লাগিল, "যার চোকে চসমা ছিল আমারও তাহাকেই সন্দেহ হইতেছে, কিন্তু তাহাকে চিনিবার কোন উপায় নাই।

বোধ হয় চুরী করা তাহার কাজ নয়। আর যদি এ রকম চুরী করে ত তাহাকে কোন কালে কেহ ধরিতে পারিবে না। যদি ব্যাঙ্কে আপনার নোট ভাঙ্গাইতে যায় কিম্বা চসমা পরিয়া কেবল রেলে বেড়ায় তাহা হইলেই ধরা পড়িবে। কিন্তু তাহাকে এমন বোকা বোধ হয় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে তুমি চেষ্টা করিবে না?"

ডিটেক্টিভ বলিল, "চেষ্টা অবশ্য করিব, কিন্তু আপনাকে কোন আশা দিতে

পারি না। আমাকে নিযুক্ত করিয়া আপনাদের কোন লাভ হইবে না।”

আমরা হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংবাদ পত্রে এই ঘটনা নানা রূপ অলঙ্কার বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইল। আমি প্রকৃত ঘটনা একখানি পত্রে লিখিয়া পাঠাইলাম, কেবল যে টুকু সাধারণের বিশ্বাস যোগ্য নহে তাহাই গোপন করিলাম। নোটগুলা যে আর কখন পাইব সে আশা কিছু মাত্র ছিল না।

দুই মাসের বিদায় লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলাম। দুই মাস দেখিতে দেখিতে গেল। আমি কর্ম্মস্থানে ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম। দুই বৎসর পূর্ব্বে যেমন রিক্ত হস্তে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম এখনও সেইমত বাহির হইলাম। রাত্রি দশটার সময় গাড়ীতে সেই রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত মনে পড়িতে লাগিল। দুই মাস ভাবিয়া আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। কেবল সেই ডিটেক্টিভের কয়টী কথা মনে পড়িত—চুরী নয় বাহাদুরী।

দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় গাড়ী বদল হয়। আমি নূতন গাড়ীতে উঠিতে গেলাম। দেখিলাম গাড়ীতে বড় ভিড়, একখানি গাড়ীতে কেবল একজন লোক, আর কেহ নাই। আমি সেই গাড়ীতে উঠিলাম।

সে লোকটী মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। আমাকে উঠিতে দেখিয়া ফিরিয়া চাহিল। আমি আর এক বেঞ্চে গিয়া বসিলাম। অপর ব্যক্তি আবার অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। সে পর্য্যন্ত আমি তাহার মুখ দেখি নাই। তাহার অবয়ব দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি। কোথায় দেখিয়াছি মনে করিতে লাগিলাম।

সে আবার ফিরিয়া চাহিল। দেখিলাম যুবা পুরুষ। অকস্মাৎ স্মরণ হইল যে ব্যক্তি লোকনাথ বাবু ও আমার সঙ্গে এক ষ্টেশন আসিয়াছিল সেও এইরূপ যুবা পুরুষ। অলক্ষিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মনে মনে সন্দেহ হইবা মাত্রই শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

যুবক আমার দিকে ফিরিয়া বসিল। চক্ষে চসমা নাই। আমি তাহার চক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, গাড়ীর বাহিরে অন্ধকার হয় নাই, গাড়ীর ভিতরে আলোক জ্বলিতেছে।

যুবকের চক্ষু দীর্ঘ, দৃষ্টি শান্ত। চক্ষের পাতা কিছু ভারি। আর কিছু লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। আমি এক দৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া আছি এমন সময় সে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি কিছু অপ্রতিভ হইয়া চক্ষু নত করিলাম।

যুবক আমায় জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয় কোথায় যাইবেন?”

আমি আবার বিস্মিত হইলাম। এ স্বর কোথাও শুনিয়াছি না? বলিলাম, "ফরক্কাবাদ।"

যুবক একবার আমার প্রতি কটাক্ষ করিল। বলিল, "ফরক্কাবাদ? সম্প্রতি সেখানে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল না?"

আমি যুবকের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কটাক্ষ লক্ষ্য করিতেছিলাম। বলিলাম, "ফরক্কাবাদ নয়। ফরক্কাবাদের একজন লোকের রেলে চুরী গিয়াছিল।"

যুবক বলিল, "হাঁ, মনে পড়িয়াছে। আপনি অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনেন?"

"অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমারই নাম।"

যুবক আমার দিকে ভাল করিয়া চাহিল। আমার বোধ হইল তাহার চক্ষু পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়াছে।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "এ পর্য্যন্ত চুরীর কোন সন্ধান পাইয়াছেন?"

"কিছু মাত্র না।"

"পাইবার কোন আশা আছে?"

"কোন আশা নাই।"

"কেন?"

"এ রকম চোর ধরা যায় না।"

যে যুবক লোকনাথ বাবু ও আমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়াছিল সে রঙ্গপ্রিয়; চঞ্চল, এ ব্যক্তি গম্ভীর, মুখে হাসি নাই। তাহাকে দেখিয়া আমার মনে শঙ্কা হইয়াছিল, ইহাকে দেখিয়া কোন শঙ্কা হয় নাই। তথাপি আমার বোধ হইতেছিল এ দুইজন একই ব্যক্তি।

আমার কথা শুনিয়া যুবক যেন একটু হাসিল, কহিল, "পুলিসে কিছু করিতে পারিল না?"

আমি বলিলাম, "পুলিসের সে ক্ষমতা নাই।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ পত্রে যাহা প্রকাশিত হয় সেই মতই কি আনুপূর্ব্বিক ঘটিয়াছিল? না আপনি কিছু অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন?"

এ কথার উত্তর দিব কি না মনে করিয়া আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। যুবক বুঝিতে পারিয়া বলিল, "অপরিচিত ব্যক্তিকে সব কথা বলিতে পারা যায় না। যদি কোন কথা গোপনীয় থাকে ত প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই।"

আমি বলিলাম, "গোপনীয় কিছু নাই। যে কথা আমি গোপন রাখিয়াছি তাহা সকলে বিশ্বাস করে না, আমিও এ পর্য্যন্ত কিছু বুঝিতে পারি নাই।"

যুবক সে কথা ছাড়িয়া দিল। কহিল, "আপনার সঙ্গে গাড়ীতে আর কে ছিলেন?"

"আমার একজন আত্মীয়—লোকনাথ বাবু।"

"বড় ধনী ?"

"হাঁ।"

"কৃপণ ?"

"লোকে বলে বটে।"

"তাঁহার কি চুরী গিয়াছিল ?"

"দুই হাজার টাকার গহনা।"

"আপনার কত গিয়াছিল ?"

"দশ হাজার টাকা—আমার সর্ব্বস্ব।"

যুবক আমার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন ?"

আমি বলিলাম, "দুই বৎসরে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলাম তাহা সমুদয়ই গিয়াছে। আমার কিছুই নাই।"

যুবক সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "নোটের নম্বর আপনার কাছে আছে।

আমি কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "আছে।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "সে রাত্রে আপনাদের গাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল ?"

আমি কহিলাম, "একজন লোক এক ষ্টেশন আমাদের গাড়ীতে আসিয়াছিল। তাহার পর আর কেহ ছিল না।"

"লোকটী দেখিতে কি রকম ?"

"চোকে চসমা পরা, দেখিতে অনেকটা আপনার রকম।" এই বলিয়া আমি যুবকের মুখ দেখিতে লাগিলাম।

সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কহিল, "আপনার ভ্রম হইয়াছে। আপনি যাহাকে দেখিয়াছিলেন সে আমি নই। আমি তাহাকে চিনি।"

এবার আমি কুতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আগ্রহাতিশয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে ব্যক্তি কে ? তাহার নাম কি ?"

যুবক উত্তরে কেবল কহিল, "রাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল অবিকল বর্ণনা করুন।"

আমি সব কহিলাম, পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে লোকটী কে ?"

যুবক কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু আপনার টাকা চুরী যায় নাই। আপনি টাকা ফিরিয়া পাইবেন।"

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলাম, "আমার সে আশা নাই।"

তখনি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় এপর্য্যন্ত আপনার নাম শুনিতে পাইলাম না ?"

যুবক কহিল, "নাম শুনিলেও আমার পরিচয় পাইবেন না। আমাকে অপরিচিতই বিবেচনা করুন।"

এই কথা শুনিয়া আমার নানা সন্দেহ হইতে লাগিল। এব্যক্তি আপনার নাম গোপন করিতেছে কেন? এত কথা বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় কেন? আমি আমার টাকা ফিরিয়া পাইব এ কথাই বা কেমন করিয়া বলিতেছে?

কিছু পরে একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী লাগিল। আমি কোন প্রয়োজনে গাড়ী হইতে নামিলাম। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি সে যুবক আর গাড়ীতে নাই! ষ্টেশনে খুঁজিলাম, সব গাড়ীতে খুঁজিয়া দেখিলাম, কোথাও কোন সন্ধান পাইলাম না। ষ্টেশনে কত লোক যাইতেছে কত লোক আসিতেছে কে তাহার খবর রাখে?

গাড়ীতে আবার উঠিয়া নিজের সামান্য জিনিশপত্র ভাল করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম কিছু চুরী যায় নাই। অপরিচিত যুবক যাহাই হউক চোর নহে।

রাত্রে চক্ষে নিদ্রা আসিল না। রাত্রি অনেক হইল তথাপি নিদ্রার লেশমাত্র নাই। আমার সঙ্গী যাহা যাহা বলিয়াছিল সব কথা ভাবিতে লাগিলাম। সে যেরূপে অদৃশ্য হইল তাহাতে আরও অনেক ভাবনা বাড়িল।

অকস্মাৎ উঠিয়া বসিলাম। যে রাত্রে নোট গুলা চুরি যায় সেই রাত্রে যেমন শরীর অবসন্ন হইয়াছিল এখনও সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। মনে অত্যন্ত ভয় হইল, গাড়ীর ভিতরে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—কোথাও কিছু নাই। ক্রমে শরীর অবশ হইয়া পড়িল, আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। বোধ হইতে লাগিল যেন কেহ আমায় ধীরে ধীরে স্পর্শ করিতেছে। ললাটে যেন অঙ্গুলি স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলাম। মুখে যেন কাহার নিশ্বাস লাগিতে লাগিল। চক্ষু খুলিয়া যে দেখিব সে সাধ্য নাই। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে নিদ্রা আসিল, গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে, পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের আভা দেখা যাইতেছে। আমি চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলাম। বসিলে বোধ হইল যেন বুকে কি বাঁধা রহিয়াছে। বুকে হাত দিয়া দেখিলাম উঁচু মতন যেন কি ঠেকিল। নোট নহে ত?

নিমেষের মধ্যে অঙ্গবস্ত্র খুলিয়া ফেলিলাম—দেখিলাম আমার সেই রেশমের রুমালে যেমন করিয়া আমি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম সেই রকম নোটের তাড়া বাঁধা রহিয়াছে! খুলিয়া গণিয়া দেখিলাম, নোটের নম্বর মিলাইয়া দেখিলাম, সব ঠিক আছে। যেমন টাকা তেমনি ফিরিয়া পাইলাম।

ফরক্কাবাদে পঁহুছিয়া কাহাকেও কিছু বলিলাম না। যে কথা শুনিয়া সকলে হাসিবে সে কথা না বলাই ভাল। নোটগুলি রেজিষ্টরি করিয়া মার কাছে পাঠাইয়া দিলাম।

কয়েক দিন পরে লোকনাথ বাবুর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিতেছেন, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে! পরশু রাত্রের গাড়ীতে আমি বাড়ী যাইতেছি, পথে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি, যে গহনার বাক্স চুরী গিয়াছিল সেই

বাক্স আমার শিয়রে রহিয়াছে। তাহার কাছে নীল রংএর এক জোড়া চসমা। যে বাক্স ফিরাইয়া দিয়াছে তাহাকে আমি দশ টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু কেহই সে পুরস্কার লইতে আসে নাই। চসমা জোড়া কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। গহনা গুলা পাইলাম ভাল হইল। আমার কন্যার জন্য নূতন গহনা গড়াইতে হইবে না।”

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বাবা কেন এল না।

মা, বাবা কেন এল না!
আসি বলে গেল চলে,
‘এখনি’ কি এরে বলে!
কতক্ষণ বসে আছি
বাবা তবু এল না!

ফুল নিয়ে বসে আছি
গেঁথে দেবে মালা গাছি,
শুকাইয়ে গেল ফুল
বাবা কেন এল না!

পাখী কেন ডাকে না,
খেলাতে কেউ আসে না,
এমনতর কেন হল
বাবা কেন আসে না!

রোজ যে মা সন্ধে হলে
বাবা এসে করে কোলে,
আজ কেন মা আমারে
মা বলে আর ডাকে না!

আজ কি মা কাজ নাই
এখানে বসিয়ে তাই!
তাই কি মা আঁখিজল
আঁখিতে আর রহে না!

চোক ফেটে আসে জল,
কি হয়েছে মা বল্ বল্!
কেন, আজ তোরে কেউ
নাম ধোরে ডাকে না!

এই যে বলিলি মোরে,
‘বাবা এই এল ওরে!
না দেখে তোর মুখখানি
থাকিতে যে পারে না!’

এখনি আসিবে যবে
কেন কেঁদে সারা তবে!
চাহিলে আমার পানে
কেন হাসি ফোটে না!

ওমা, কেন আজ কাঁপে বুক
কেন রে শুকায় মুখ,
কেন আজ হয় মনে
বাবা আর আসিবে না!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

বিষয়ী লোকে বিষয় খুঁজিয়া মরে। লেখা দেখিলেই বলে বিষয়টা কি? কিন্তু লিখিতে হইলে যে বিষয় চাইই এমন কোন কথা নাই। বিষয় থাকে ত থাক্, না থাকে ত নাই থাক্ সাহিত্যের তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে। প্রকৃত সাহিত্যের মধ্য হইতে তাহার উদ্দেশ্যটুকু টানিয়া বাহির করা সহজ নহে। তাহার মর্ম্মটুকু সহজে ধরা দেয় না। মানুষের সর্ব্বাঙ্গে প্রাণের বিকাশ—সেই প্রাণটুকু নাশ করিবার জন্য নানা দেশে নানা অস্ত্র আছে কিন্তু দেহ হইতে সেই প্রাণটুকু স্বতন্ত্র বাহির করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য কোন অস্ত্র বাহির হয় নাই।

আমাদের বঙ্গ ভাষায় সাহিত্য সমালোচকেরা আজকাল লেখা পাইলেই তাহার উদ্দেশ্য বাহির করিতে চেষ্টা করেন। বোধ করি তাহার প্রধান কারণ এই, একটা উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিলে তাঁহাদের লিখিবার তেমন সুবিধা হয় না। যে শিক্ষকের ঝুঁটি ধরিয়া মারা অভ্যাস সহসা ছাত্রের মুণ্ডিত মস্তক তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত শোকের কারণ হয়।

মনে কর তুমি যদি অত্যন্ত বুদ্ধির প্রভাবে বলিয়া বস—এই তরঙ্গভঙ্গময়, এই চূর্ণ বিচূর্ণ সূর্য্যালোকে খচিত, অবিশ্রাম প্রবহমান জাহ্নবীর জলটুকু মারিয়া কেবল ইহার বিষয়টুকু বাহির করিব এবং এই উদ্দেশে প্রবল অধ্যবসায় সহকারে ঘড়া ঘড়া জল তুলিয়া চুলির উপরে উত্থাপন কর তবে পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ বিপুল বাষ্প ও প্রচুর পঙ্ক লাভ করিবে কিন্তু কোথায় তরঙ্গ, কোথায় সূর্য্যালোক, কোথায় কলধ্বনি, কোথায় জাহ্নবীর প্রবাহ!

উদ্দেশ্য হাতড়াইতে গিয়া কিছু না কিছু হাতে উঠেই। যেমন গঙ্গায় তলাইয়া অন্বেষণ করিলে তাহার পঙ্ক হইতে চিংড়িমাছ বাহির হইয়া পড়ে। ধীবরের পক্ষে সে কিছু কম লাভ নহে কিন্তু আমার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে চিংড়ি মাছ না থাকিলেও গঙ্গার মূলগত কোন প্রভেদ হয় না। কিন্তু গঙ্গার প্রবাহ নাই, গঙ্গার ছায়ালোক বিচিত্র তরঙ্গমালা নাই, গঙ্গার প্রশান্ত প্রবল উদারতা নাই, এমন যদি হয় তবে গঙ্গাই নাই। কিন্তু প্রবাহ আয়ত্ত করা যায় না, ছিপ ফেলিয়া ছায়ালোক ধরা যায় না, গঙ্গার প্রশান্তভাব কেবল অনুভব করা যায় কিন্তু কোন উপায়ে ডাঙ্গায় তোলা যায় না। উপরি উক্ত চিংড়ি মাছ গঙ্গার মধ্যে সহজে অনুভব করা যায় না কিন্তু সহজেই ধরা যায়। অতএব বিষয়ী সমালোচকের পক্ষে মৎস্য নামধারী উক্ত কীট বিশেষ সকল হিসাবেই সুবিধাজনক।

বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক। এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী। যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য নাম—কোন একটা বিশেষ

তত্ব নির্ণয়, বা কোন একটা বিশেষ ঘটনা বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষণ অনুসারে তাহাকে দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা আর কিছু বলিতে পার। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই।

ঐতিহাসিক রচনাকে কখন্ সাহিত্য বলিব, যখন জানিব যে তাহার ঐতিহাসিক অংশটুকু অসত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেলেও তাহা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অর্থাৎ যখন জানিব ইতিহাস উপলক্ষ মাত্র লক্ষ্য নহে। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অন্য বিভাগ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইঁটের পাঁজা কেন পোড়ে সুরকীর কল কেন চলে তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্ম্মী, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্ম্মাণধর্ম্মী। সৃষ্টির ন্যায় সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

যদি কোন উদ্দেশ্য নাই তবে সাহিত্যে লাভ কি! যাহারা সকলের চেয়ে হিসাব ভাল বুঝেন তাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। উত্তর দেওয়া সহজ নহে। গোটাকতক সন্দেশ খাইলে যে রসনার তৃপ্তি ও উদরের পূর্ত্তি সাধন হয় ইহা প্রমাণ করা সহজ, যদি অজ্ঞান বশত কেহ প্রতিবাদ করে তবে তাহার মুখে দুটো সন্দেশ পুরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ বন্ধ করা যায়। কিন্তু সমুদ্র তীরে থাকিলে যে এক বিশাল আনন্দ অলক্ষ্যে শরীর মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বাস্থ্যবিধান করে তাহা হাতে হাতে প্রমাণ করা যায় না।

সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রবাহ রক্ষা হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে, হৃদয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য সঞ্চার হয়। যুক্তিশৃঙ্খলের দ্বারা মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন হয়। কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিবার তেমন কৃত্রিম উপায় নাই। সাহিত্য স্বতঃ উৎসারিত হইয়া সেই যোগ সাধন করে। সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব—মানবের "সহিত" থাকিবার ভাব—মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা। সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীতাতপ সঞ্চরিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, ঋতুচক্র ফিরে, গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

বন্ধুতে বন্ধুতে মিলন হইলে আমরা কত বাজে কথাই বলিয়া থাকি। তাহাতে (করিয়া) হৃদয়ের কেমন বিকাশ হয়? কত হাস্য কত আলাপ কত আনন্দ। পরস্পরের নয়নের হর্ষজ্যোতির সহিত মিশিয়া সূর্য্যালোক কত মধুর বলিয়া মনে হয়! বিষয়ী লোকের পরামর্শমত কেবলি যদি কাজের কথা বলি, সকল কথার মধ্যেই যদি কীটের মত উদ্দেশ্য ও অর্থ লুকাইয়া থাকে, তবে কোথায় হাস্য কৌতুক, কোথায় প্রেম, কোথায়

আনন্দ! তবে চারিদিকে দেখিতে পাইব শুষ্ক দেহ, লম্ব মুখ, শীর্ণ গণ্ড, উচ্চ হনু, হাস্য-হীন শুষ্ক ওষ্ঠাধর, কোটর-প্রবিষ্ট-চক্ষু মানবের উপছায়া সকল পরস্পরের কথার উপরে পড়িয়া খুদিয়া খুদিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া অর্থই বাহির করিতেছে, অথবা পরস্পরের পলিত-কেশ-মুণ্ড লক্ষ্য করিয়া উদ্দেশ্য-কঠিন কথার লোষ্ট্র বর্ষণ করিতেছে।

অনেক সাহিত্য এইরূপ হৃদয়-মিলন উপলক্ষে বাজে কথা এবং মুখোমুখী, চাহা-চাহি, কোলাকুলি। সাহিত্য এইরূপ বিকাশ এবং স্ফূর্ত্তি মাত্র। আনন্দই তাহার আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য। না বলিলে নয় বলিয়াই বলা, ও না হইলে নয় বলিয়াই হওয়া!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজনীতি।

(প্রথম প্রবন্ধ।)

অনেকেরই একটা বিশ্বাস আছে যে রাজনীতি কথাটিতে নীতির ভাগ বড়ই কম বরং তাহাতে যাহা কিছু অসত্য এবং অসৎ তাহারই প্রাদুর্ভাব, রাজনীতি সবই ফাঁকি! এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া আমরা যতদিন রাজনীতি আলোচনা করিব তত দিন দেশের কোন উন্নতি সম্ভাবনা নাই। আমাদের এতটা অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে যে ফাঁকি দিয়া সব শিখিব ফাঁকি দিয়া সব করিব। যদিও নিজে বুঝিয়া সুঝিয়া মিথ্যা আচরণ মিথ্যা সংগ্রহ এবং মিথ্যা প্রচার করিতেছি তবুও অন্যের নিকট তাহা সম্পূর্ণ সৎ এবং সত্য ইহাই প্রমাণ করিব। অনেক দিনের পুরাতন কথা যে, শাসন বিজ্ঞান, কি যে কোনরূপ বিজ্ঞান হউক না কেন, প্রথমে তাহা কি জানিতে হইবে বুঝিতে হইবে, বুঝিয়া কি করিতে হইবে। যদি না জানি, না স্থির করিতে পারি তাহা হইলে বিজ্ঞান আলোচনা করিব কি করিয়া। অনেক দিন আগে আমরা এ কথাটা আয়ত্ত করিতে পারিতাম যদি চালাকি আর ফাঁকি ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়া যথার্থ যাহা তাহাই দেখিব তাহাই বুঝিব স্থির করিয়া রাজনীতি আ-লোচনা করিতাম।

দাসের পক্ষে রাজনীতি নাই। দাসবৃত্তি যাহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য এবং পরিণাম, যাহাদিগের স্বাধীন ভাব কিংবা স্বাধীন চেষ্টা নাই, তাহাদিগের সহিত রাজনীতিরও কোন সম্বন্ধ নাই। রাজাজ্ঞা নতশিরে পালন করা, যেরূপই আজ্ঞা হউক না কেন, ভাল কিংবা মন্দ বিচার না করিয়া অবনত মস্তকে তাহা পালন করা যাহা-

দিগের জীবনে প্রধান প্রয়াস তাহাদিগের আবার রাজনীতি কোথায়। পুরাতন মিশরের একজন রাজা আজ প্রায় চারি সহস্র বৎসর হইল যাহা বলিয়াছিলেন তাহা একটি চিরন্তন সত্য—স্বাধীন চেতা না হইলে কোনরূপ নীতিই সম্ভব নহে, অতএব রাজনীতি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে স্বাধীন ভাবে বিষয়টি দেখা আবশ্যক, স্বাধীন অন্তঃকরণে তাহার দোষ গুণ বিচার করা আবশ্যক। স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া, সম্প্রদায় বিশেষের লাভালাভ বিস্মৃত হইয়া, সমগ্র জাতির সুখ মাত্র কল্পনা করিয়া শাসন বিধান অনুষ্ঠান করা পরাধীন চেতা পারে না। উন্নত প্রাণে স্বাধীন ভাবে জগৎ এবং জগতের জীব যে দেখিতে অপারগ তাহার পক্ষে রাজনীতিও অসম্ভব। যে দেশের রাজা স্বেচ্ছাচারী, নিজের যাহা ইচ্ছা তাহাই নির্ব্বিবাদ নির্ব্বিরোধে কার্য্যে পরিনত করে, জনসমাজে এমন কেহই যখন থাকে না যে তাহা বাধা দেয়, তাহার ন্যায় অন্যায় সমালোচনা করিতে পারে তখন সেই পরাধীন রাজ্যে রাজনীতি অসম্ভব। স্বাধীনতাই রাজনীতির প্রাণ।

প্রথম কথা রাজনীতি কাহাকে বলে। সহসা দুইচারি কথায় বলা অসম্ভব না হউক, কঠিন। আমরা কেহই প্রায় একটা কোন স্থির সংজ্ঞা দিতে পারি না। অনেকেরই বিশ্বাস যে রাজনীতি আর কিছুই নহে শুদ্ধ শাসন কৌশল। কিন্তু শাসনকৌশল কথা দুইটির অর্থ যেমন বোধ হয় তত সহজ নহে। প্রথমতঃ শাসন কাহাকে বলে শাসনের অর্থ নির্দ্দেশ। যাহার যাহা উপযুক্ত স্থান তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া এবং যাহাতে তাহারা সেই স্থান অবলম্বন করে তাহাকেই শাসন বলে। যদি শাসনের নির্দ্দেশ অর্থ দেওয়া যায় তাহা হইলে ইংরাজী govern কথাটির সহিত তাহার প্রায়ই এক অর্থ হয়। নৌকার হাল যেমন নৌকার পথ ঠিক করিয়া লইয়া যায়—govern ও তাহাই, একটি জাতিকে সংসারের বিস্তৃত সমুদ্রের মধ্য দিয়া তাহার যে পথ, যে দূর যাত্রা এবং যাত্রার শেষে যে তীর্থ, সেইখানে লইয়া যাইবার অনুষ্ঠানই শাসন। আমরা যেমন রিপু দমন করিয়া, আত্ম শাসন করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য যাহা বুঝিয়াছি তাহাই সাধন করিতে চেষ্টা করি, তেমনই শাসন কর্ত্তা যে, সে সহস্র সহস্র নর নারীর জীবনের উদ্দেশ্য তাহাদিগের রিপু দমন করিয়া, তাহাদিগের স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া, সমগ্র জাতির সংসারে যে কার্য্য, জগতে যে উপযোগিতা তাহা স্থির করিয়া, সুখ-দুঃখ, কোটি প্রকার আশা আবেগ, ক্লেদ, কামনা, গতি গ্লানি দেখিয়া শুনিয়া সেই দূর তীর্থে লইয়া যাইবে, তাহাই প্রকৃত শাসন। এক জনকে আমরা, আপনাকে আপনি, সংসার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে কত শোক কত ক্লেশ, কত যাতনা, মর্ম্মবেদনা সহ্য করি, কতদিন ধরিয়া কোথায় যাইব তাহা স্থির করিতে পারিনা; স্থির করিয়াও যাইবার পথ নির্ণয় করিতে পারি না, নির্ণয় করিয়াও সে পথের যাত্রীদিগের

সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারি না, তখন বুঝিয়া দেখিলেই হয় যে এক সমগ্র জাতিকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া কত কঠিন, কত দুরূহ। অভুক্তকে খাওয়াইতে হইবে, অন্ধ দীনকে স্কন্ধে লইতে হইবে, শিশুকে হাত ধরিয়া, মার অঞ্চলের ছায়ায় তাহাকে রাখিয়া, দীন জরা জীর্ণকে ধনী বলবান দুর্দ্দান্তের সহযাত্রী করিয়া, যাহার যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া, সে সে পথ ধরিয়া চলিয়াছে কি না দেখিতে দেখিতে যাওয়া কি কম কৌশলের কাজ। এই শাসন কৌশলকে রাজনীতি বলিলে ব ;তে পার। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবে যে রাজনীতি শাসন কৌশল ভিন্ন আরও কিছু। শাসন কৌশল কথা দুইটিতে উদ্দেশ্য যাহা প্রকাশ পায় তাহা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ—সে উদ্দেশ্য শুদ্ধমাত্র যাহা বিধান আছে তাহাই কেমন করিয়া কার্য্যে পরিণত হইবে। সে বিধান ভাল কিংবা মন্দ তাহার আলোচনা শাসন প্রণালীতে নাই। সে বিধান সর্ব্বোৎকৃষ্ট কি না, সময়োপযোগী কিনা, সে বিধানে জগতের বিধি যদি কিছু থাকে তাহা রক্ষা হইতেছে কিনা তাহার আলোচনা নাই। বিধান, এই কার্য্যটি করিতে হইবে; প্রণালী, কেমন করিয়া করিতে হইতে হইবে—যেমন তেমন করিয়া করিলেই হইল। চাউল ঝাড়িতে হইবে, কুলা দিয়া ঝাড়িলেই হইল; অন্য কোন ভাল উপায় আছে কি.না তাহা নির্ণয় না করিয়া কুলা ব্যবহার করিলে প্রণালী ভাল হউক না হউক, ইহা একটি প্রণালী ত। শাসনের উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, মহান উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; বিধান জাগতিক নিয়তি অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে কিন্তু শুদ্ধ মাত্র প্রণালী কথাটিতে তাহা সুচারু কি অন্য প্রকার তাহা বুঝায় না। অতএব রাজনীতি যাহাতে প্রজার সুখ দুঃখের কথা আছে, জাতীয় উদ্দেশ্য আছে বিস্তৃত সংসারের এক পথে শত কোটি সহযাত্রী আছে, সেখানে তাহাকে শুদ্ধ শাসন প্রণালী বলিলে যথেষ্ট হয় না।

আবার অন্য এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন যাঁহারা রাজনীতিকে শাসন প্রণালী বলিতে চাহেন না কিন্তু তাহাকে শাসন নিয়তি বলিতে প্রস্তুত। যে ভয়ে, যে অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা রাজনীতিকে শাসন প্রণালী বলিতে ইচ্ছুক নহেন, নূতন কথা ব্যবহার করিয়া তাঁহারা সে অভাব মোচন করিতে পারেন না। প্রথমতঃ শাসন-নিয়তি কথার অর্থ একটু দুরূহ। জগৎ যেমন কোন এক অদৃশ্য শক্তির তেজে, একটি স্থির নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, যে শক্তির প্রভাবে বিশ্বের ভাঙা চোরা গড়া চলিতেছে, জীবন মরণ এবং মরণ হইতে আবার জীবন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যেমন আমরা প্রত্যেকে যেখানেই যাই না কেন, যাহাই করি না কেন এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সংসারের নিয়তি অবহেলা করিতে পারি না, সেইরূপ সকল জাতিই, তাহার যে নিয়তি, বিশ্বের নিয়তিকে অপেক্ষা করিয়া, অবলম্বন করিয়া চলে। এতদূর পর্য্যন্ত সহজে বুঝা গেল। কিন্তু নিয়তি কথাটির সহিত শাসন কথা যোগ করিবা মাত্র

নূতন এক কর্ত্তা আনিলাম, নূতন এক শক্তি যোগ করিয়া দিলাম। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে তাহার দরুণ নিয়তির নূতন নিয়ন্তা কেহ হইল না, কেবল মাত্র সেই নিয়তির নূতন একটি অবলম্বন মাত্র লাভ হইল। শাসন করিবার জন্য শাসন-কর্ত্তা চাই, এবং শাসন-প্রণালী চাই। যে শাসন কর্ত্তা সে সেই বিশ্বের নিয়তির অধীনে। তুমি আমি ইচ্ছা করিলাম আর শাসন কর্ত্তা হইলাম ইহা অসম্ভব। যে শাসন করিবে সে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে শাসন-কর্ত্তা। তুমি আমি ইচ্ছা করিলেও তাহাকে শাসন বিচ্যুত করিতে পারি না। যে নিয়তির অধীনে সে কর্ত্তা, সেই নিয়তির অধীনে সে স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী। সহস্র কারণ, যাহার উপর তোমার আমার কোন শাসন নাই, সহস্র অবস্থা যাহা তোমার আমার আয়ত্তাধীন নহে, তাহাদিগেরই ফল স্বরূপ সেই কর্ত্তা। আচ্ছা তাহাই যদি হইল তবে আবার শাসন কাহাকে বলিব। যদি সবই নিয়তির অধীন, অনন্ত, অচল, নিয়তির অধীন, তবে শাসন-নিয়তির অর্থ কি। তাঁহারা বলেন, যে সে কেবল নিয়তির রূপভেদ মাত্র। দিন দিন একটি জাতি একরকম ভাবে চলিয়াছে, অতএব সে জাতি কি ভাবে চলিবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি এবং যাহাতে সুচারু রূপে সেই ভাবে চলে তাহার অনুষ্ঠানই শাসন নিয়তি, তাহাই রাজনীতি।

এখন দেখা যাক যে "শাসন প্রণালীতে" যেরূপ অভাব সেইরূপ অভাব "শাসন নিয়তিতে" আছে কি না। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে প্রথমটিতে প্রণালী কথাটিতে উদ্দেশ্যের অর্থ বড়ই সঙ্কীর্ণ। কিন্তু শেষের মতে "শাসন" কথার ব্যবহার বড়ই সঙ্কীর্ণ, অর্থাৎ শাসনের উদ্দেশ্য বড়ই সীমাবদ্ধ। যদি একটি চিরন্তন নিয়মের অধীনে সবই হইতেছে এবং হইবে ইহাই স্থির করি, তাহা হইলে সে নিয়মটি কি, যদি দুদশ দিন দেখিয়া একটা কোন রকম বুঝিয়া লইয়া তাহাই অবলম্বন করিয়া শাসন করিলে শাসন উপলক্ষ মাত্র হইল। জগৎ হইতে মানুষের নিকট হইতে সুখ দুঃখের ভাবনা একেবারে চলিয়া গেল। আমাদের সহিত অচেতন পদার্থের সহিত কি বিশেষ ভেদ হইল? আমাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা কোথায় গেল? কিন্তু আমরা প্রত্যহই দেখিতেছি যে শেষে যাহা ঘটিতেছে তাহাকে যদিও আমরা নিয়তি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কি উদ্যম শূন্য, চেষ্টা শূন্য, আমরা কি একেবারে হাত তুলিয়া বসিয়া আছি? জগৎ চলিতেছে চলুক আমার স্বাধীনতা আছে ত। এই **স্বাধীন প্রবৃত্তির পথ নির্দ্দেশই প্রকৃত শাসন**। রাজনীতি এই স্বাধীন প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া একটি জাতিকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া কিংবা নির্দ্দিষ্ট পথে লইয়া যাইবার অনুষ্ঠান।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

শান্তা মারীয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রোসন লালের অবস্থা বড়ই খারাপ, কিন্তু সে লোক ভাল। হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয় সে কেমন এক রকম। কিন্তু তার খেয়ালগুলি যখন খানিকটা বোঝা যায় তখন তাকে প্রায় সকলেরই ভাল লাগে। রোসনের যা খেয়াল তাতে কিন্তু সামাজিক, জাগতিক, পারত্রিকের সঙ্গে কিছুই সম্বন্ধ নাই। সে নিতান্ত যুবক—নিজেরই খেয়াল নিয়ে ব্যস্ত। সে কবিতা লেখেনা, কবিতা লিখে অপরকে শোনায় না, অধিক বক্তৃতা-শীল নহে, আর অপরের বক্তৃতা শুনতেও বড় রাজী নহে। ঘরের এক কোণটীতে বোসে নিজের খেয়াল নিয়ে থাকে। আজকালের রাজনৈতিক ঝড় তার কোণটিতে পঁহুছে না। সে বেচারা পৃথিবীতে কি আছে, আর চন্দ্র মণ্ডলে কি নাই, আর কোথা কি নিলে দিলে বিশ্বে সামঞ্জস্য হয় তা নিয়ে মোটেই ব্যস্ত নহে। সংসার সম্বন্ধে তার মত নিতান্ত সরল। খেটে মরার চেয়ে, চুপ করে পোড়ে থেকে মরা ভাল তাহার স্থির বিশ্বাস। ভাল খাবার, আর দেখ্‌তে যা সুন্দর তা সে ভালবাসে। এ বিশ্বের এক অন্ত হতে আর এক অন্ত পর্য্যন্ত যে কোটী কোটী জীব আমাদের সঙ্গে কে জানে কিসের অনুরোধে, বাস করে, রোসেন সে গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করে; প্রথম, যাহারা খায়, দ্বিতীয় যাহাদিগকে খায়। এছাড়া সে বড় সংসারের জীব জন্তু নিয়ে নাড়া চাড়া করে না। বেচারা রোসেনের কিছু মাত্র আত্মাভিমান নেই। সে নিজের হাতের লাঠি খানিকে পৃথিবীর মানদণ্ড ভাবে না। আর সে এটাও বোঝে যে সে হস্তক্ষেপ করুক আর নাই করুক পৃথিবী ঘুরবেই। দুই একবার দূরবীণ দিয়ে আকাশের দুই একটি কোণ দেখার পর, আর নিজে মোটে সাড়ে তিন হাত লম্বা মেপে যুঁকে, সে অনন্ত কাল এবং অনন্ত আকাশের ভাবনা একেবারে পরিত্যাগ করেছে। এক দিন কোন একজন বিখ্যাত সমাজের নেতা রোসনকে পাকড়াও করে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতাতে জগতের মল, ক্লেদ প্রভৃতির কথা সমজাইয়া দেবার চেষ্টা পান। সব শোনার পর রোসেন তাঁকে বল্লে, "কি জানেন, পোকা মাকড়ের জন্মই ময়লা সাফ করার জন্য, আমরা ত মানুষ" একবার ভেবে দেখুন কথাটার কি কোন অর্থ আছে? কিন্তু এ সব সত্ত্বেও রোসন লোক ভাল।

যদি কোন স্নেহ মমতাপূর্ণ মহিলা ভাবেন রোসনের শরীরে দয়া মায়া নাই, তার ভালবাস্‌বার ক্ষমতা নাই, হৃদয়ের তেজ নেই, তাহলে বেচারা রোসনকে বড়ই অন্যায় করা হবে। সে বড়ই সৌন্দর্য্য-পক্ষপাতী কিন্তু এই কথা কটা পোড়ে পাছে কারও

হৃদয় উদ্বেলিত হয়, আগেই বলে দেওয়া ভাল যে রোসন "কাব্য-সুন্দরী" এবং "চিত্র সুন্দরীর" পক্ষপাতী। সে বড় আর কিছুই সুন্দর ভাবে না।

আমি যখনকার কথা বল্‌ছি রোসন্ তখন লণ্ডনে থাকৃতেন। বিলেতে গিয়ে তাঁহার সৌন্দর্য্যলিপ্সা জন্মে। রোসন এদেশে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ পড়ে নাই। তাহলে এদেশেই সে রোগের সৃষ্টি হত। "বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়" প্রভৃতি রসাত্মক বর্ণনা পড়িলেও রোসন সে বয়সে তার গভীর অর্থটুকু বুঝিতে পারে নাই। "সই ভাল করি পেখন না ভেল। কনকলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।" এই সুন্দর কথাগুলি, সুন্দরতর ভাব রোসনের নিতান্ত রক্ত মাংসের শরীরের যে হৃদয় তাতে ঠিক্ অনুভব কোরে উঠতে পারত না।

বিলাতে গিয়ে বড় বড় চিত্রকরের চিত্র, রাফেলের মাদোন্না, টিসিয়ানের স্ত্রী মূর্ত্তি সকল দেখে তার মন খানিকটা বিগ্‌ড়ে গেল। তার পর বাইরণের হাইডি, আর পারিসিনা, আঁদ্রে সেনিয়ের কামিয়া, ডোডের সাফো প্রভৃতি পোড়ে তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক অধিক আলোড়িত হয়ে উঠিল, আর দিন দিন সে শরীরী স্ত্রীলোককে অধিকতর কুৎসিৎ ভাবিতে লাগিল। যার চোখের সম্মুখে মিলোর ভিনাস সে কেমন কোরে যাকে তাকে সুন্দর ভাবে। তাইতেই বলেছি রোসনের অবস্থা বড়ই খারাপ।

রোসনের ঘরের জিনিষ পত্র এক রকমের। দেয়ালে বড় বড় ছবি। ঘরের চারিদিকে ছোট গালিচার উপর ফরাস। বেশ ছোট ছোট গোল গাল বালিশ—তাতে কাশমিরি কাজ। দোরে পরদা চিনে রেশমের, আর ছোট ছোট লাল কাল পাথরের টেবলের উপর, পিতলের টবে বনের ফুল ফুটে আছে। ঘরে সোফা প্রভৃতি এমন ভাবে সাজান যেন রোসন কোন কালে লোক জন আস্‌বে বস্‌বে তার ভাবনা ভাবেই নাই। নিজের সুবিধা মত, কোনটা শুয়ে পড়বার জন্য, কোনটা জানালার কাছে বসে রাস্তার লোক দেখ্‌বার জন্য সাজান। চৌকিগুলি প্রায়ই কোণে, দেয়ালের দিকে মুখ করা, তার সাম্‌নে ছোট টেবিলে দুই একখানি কবিতা বা চিত্র পুস্তক, আর টেবিলের সামনে দেয়ালে দামী ফ্রেমে কোন বিখ্যাত ছবির নকল। ঘরে গেলে মনে হয় লোকটি থাকে ভাল—তবে একলা থাকৃতে চায়। তার ঘরের একটা কোণে কি আছে হঠাৎ ঘরের ভিতর গেলে দেখা যায় না। সেই কোণটি রোসনের তীর্থ স্থান। যখন সে ঘরে একা থেকে আরও একা হতে চায় তখনই সে কোণটিতে লুকিয়ে যায়। তার একদিকে জাপানের সরকাটির পরদা ও তারই পাশে জাপানি চিত্র; লম্বা লম্বা বক একপা তুলে গম্ভীর ভাবে খানিকটা কাল জল দেখ্‌ছে; জলের পাশ থেকেই উলু ঘাস উঠেছে, তার মাথায় মেটে মেটে ফুল; আর দূরে একটা নাকশূন্য চোখের পাতা শূন্য ছেলে কোলে একটী গোলমুখী, সবুজ কাপড় পরা ছোট খাট স্ত্রীলোক; আরও দূরে একটা বড় গোলপাতার ছাতা মাথায় গম্ভীরশ্রেষ্ঠ স্বামী প্রবর। ঠিক্ দেয়ালের

কোণটিতে একটি ছোট প্রস্তর মূর্ত্তি, সেটি মিলোর ভিনাসের নকল। তার ঠিক্ বাঁদিকে একটা কাল মখমলের পরদা ঝুলছে। আর পায়ের নীচে একখানা ইরানী গালিচার বিছানা, বিছানার মাথার গোড়ায় একখানা বেহালা, আর একদিকে হাফেজের বই, পাট্‌কেলে রংএর চামড়া দিয়ে, সোনার জল দিয়ে অতি সুন্দর রকমে বাঁধান। মাথার উপর ভেনিসের অষ্টধাতুর একটি প্রদীপ। ঘরের চারিদিকে দামী না হোক, সুন্দর জিনিষ, দেশ বিদেশের সুন্দর জিনিষ। রোসনলাল হিন্দু হইয়াও জাতি বিচার শূন্য। সুন্দরী সম্বন্ধেও তাহার দেশকাল বিচার নাই। তাতেই বোলেছি যে রোসনলাল ভাল লোক। এ বিষয় মত ভেদ হলেও আমি তাহাকে ভাল লোক বলিব।

রোসনলাল হিন্দু, কিন্তু ইরাণী কবির মত সে একটি কাল তিলের জন্য সমস্ত বোখারা সমরখন্দ বিলাইয়া দিতে পারে, লাল পায়ের গোড়ায় কাল চুল লতাইয়া পড়িয়াছে দেখিলে তাহারই মত চিরদিনই অগ্নি উপাসনা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি ছিলনা—একান্ত উদার ভাবে যাহা কিছু সুন্দর তাহাই ভাল বসিত। যাহা সুন্দর নহে তাহা দেখিতে পারিত না। রূপ, গঠন, সৌন্দর্য্য, জীবনের প্রধান প্রয়োজন তাহার মনে হইত। যদি কেহ বলিত এটা প্রয়োজনীয়, না হয় দেখ্‌তে তত ভাল নহে কিন্তু কাজে দেখ্‌বে”—রোসনের তাহাতে উত্তর “যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা কুৎসিত কারণ তাহা মানব জীবনের অভাবের মূর্ত্তি স্বরূপ; হাঁড়ী প্রয়োজনীয় কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ তাহা কাছে রাখে?” বোকার মত কথা। রোসনের যদি আর একটু ন্যায়, বিজ্ঞান, ধননীতি পড়া থাকিত তাহা হইলে অতদূর মূর্খের মত জবাব দিতে পারিত না। বেচারা নিতান্তই যাহা নিজে বোঝে তাহাই বলে—যাহা নিজে ভাবিয়া ঠিক্ করে তাহাই তাহার ধর্ম্ম। মূর্খ কি না!

এই বেগোছের যুবকটিকে আমি এক দিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে চলিয়াছি। খানিকটা আগেই খুব বরফ পড়ে গ্যাছে। রাস্তার উপর তুলারাশির মত পোড়ে আছে। পা দিতে দিতেই বসে যাচ্ছে। তার উপর ভয়ানক কুয়াসা হয়েছে। গ্যাসের আলো মিটি মিটি জ্বলছে। কিন্তু যেমন লোকের ভীড় তেমনই আছে। অনবরত চারিদিক হতে লোক আস্‌ছে যাচ্ছে। সকলেই যেন জীবন কিসে কাটে কেমন কোরে একদিন আহার যোটে এই চিন্তায় পূর্ণ। কেহ কাহারও মুখে একবার চোখ তুলে চাচ্ছেনা। সকলেই নিজের স্বার্থের ভরে অধনত। ভয়ানক শীত। যেথানে দেবতা এতঃ নির্দ্দয় সেখানে মানুষের হৃদয়ে মায়া মমতা খানিকটা শুকাইয়া যায়, হৃদয় খানিকটা জড় হইয়া যায়—আহারই প্রাণের কাতর চেষ্টা। দুদিন বাঁচিয়া থাকিবে বটে কিন্তু সে দুদিন কাটে কেমন কোরে। সেই বরফ স্তূপের ভিতরদিয়া শীতের রাত্রি আমি রোসনলালকে দেখিতে চলিয়াছি—কারণ সেখানে তাহার ঘরে এই দুরন্ত খেদ পরি-

পূর্ণ, শোকতাপ বেদনা ভরা বর্হির্জগতের ছায়া নাই। আমি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি যে রোসনলাল বোধ হয় জানেনা যে এত বরফ পোড়েছে। খানিকটা পরে তাহার বাড়ীতে পঁহুছিলাম। অতি আস্তে দ্বারে আঘাত করিলাম যেন রোসন লাল না জানিতে পায় কেহ আসিয়াছে। দাসী দ্বার খুলিয়া দিল। আমি তাহাকে সংবাদ দিতে বারণ করিয়া নিজেই উপরে গেলাম। আস্তে আস্তে দুয়ার খুলিয়া দেখি ঘরে খুব আগুন জল্‌ছে—তাতেই যে আলো তাহা ভিন্ন অন্য আলো নাই। হঠাৎ ঘরে প্রবেশ কোরে আঁধার বোধ হল। কয়লার লাল আলোতে দেয়ালের ছবিগুলি কেমন এক রকম অপার্থিব দেখাচ্ছিল। ঘরের চারিদিকে যেন কত ছায়া উপছায়া। এক কোণে একটী পাত্রে ধূপ ধূনা জলছে তাতে আরও খানিকটা আঁধার হোয়েছে। আমি ঘরে প্রবেশ করে রোসনকে খানিকটা দেখ্‌তে পেলেম না। ক্রমে যখন চোখে সেই আঁধার সহ্য হোয়ে এল তখন দেখি সে গম্ভীর ভাবে একখানি কি কাগজ পোড়ছে। আমি একটু আশ্চর্য্য হলেম যে রোসনের হাতে সংবাদ পত্র। দেখেই ভাবলেম দুর হোক্‌গে যাক্‌ বাড়ী ফিরে যাই, যদি রোসনের হাতেই কাগজ তবে এতদূর শীতে বরফের ভিতর দিয়ে এসে লাভ। সকলেই যদি সভ্য হল তবে বেঁচে সুখ। আর যদি সকলেই একটা পয়সা দিয়ে দেশ বিদেশের খবর জেনে নিলে তাহলে এ ক্ষুদ্র সংসারে অধিকদিন থেকে কষ্ট পাবার প্রয়োজন।" তার হাতে কাগজ দেখেই কেমন আমার উগ্র মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল। একটু তীব্র ভাবে তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেম "তুমি আবার কাগজ নিয়ে পোড়ছো কেন? তোমারও অধঃপতন হোচ্ছে দেখ্‌ছি।" রোসন বল্লে "কাগজ কই, কাগজ কোথা? আমার হাতেত কাগজ নেই।"

"ওখানা কি?"

"হাঁ তাইত, কিন্তু আমি দেখ্‌ছিলাম শান্তা মারীয়ার ছবি। তুমি দেখেছ কি? অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। সমগ্র জগত যেমন গম্ভীর শান্তি পরিপূর্ণ আবার তাতেই যেমন পৃথিবীর ছায়া, তেমনই "শান্তা মারীয়ার" প্রশান্ত ললাটের উপর কেমন একটি বিষাদ রেখা আছে, তার সুনীল আকাশ মাখা চোখের কোণে কেমন একটু শোকের ছায়া আছে—শান্তা মারীয়া দেবী।"

"দেখি।"

রোসন কাগজ খানি আমার হাতে দিয়া কি ভাবিতে লাগিল। আমি কাগজের এপিঠ্‌ ওপিঠ্‌ খুঁজলেও কোনখানে কাহারও ছবি দেখ্‌তে পেলেম না। একস্থানে হঠাৎ দেখি "শান্তা মারীয়া" বড় বড় অক্ষরে লেখা তার নাচে দার্ঘ সমালোচনা। তখন বুঝিলাম রোসনের ভ্রান্তির কারণ। হঠাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "ঘরের ভিতর আর বস্‌তে পাচ্ছি না, চল বেরিয়ে আসি"।

"বেড়াতে যাবে কোথা। রাত অনেক হোয়েছে, বাইরে খুব শীত আর খুব বরফ হয়ে গ্যাছে এখানেই বসাযাক্। তুমি "শান্তা মারীয়ার" কথা বল শুনি।"

রোসন বিরক্তির সহিত বলিল "তুমি থাক্‌বে থাক আমি এই inferno (নরকে) থাক্‌তে চাই না দেবী "শান্তা মারীয়া"কে নীল আকাশের নীচে ভিন্ন ঘরের ভিতর দেখা যায় না।" কি করি অগত্যা তারই সঙ্গে গায়ের কাপড়ে খুঁব বোতাম সোতাম দিয়ে আবার রাস্তায় বেরুলেম। অনেকটা দুজনেই গম্ভীর ভাবে চোলেছি। কোন কথা নেই। রোসন কি লক্ষ্য কোরে কোথা চলেছে জানিনা। আমি তবু তার সঙ্গে চোলেছি। জন স্রোত কিছু কমেছে, কিন্তু রাস্তার মোড়ে মদের দোকানে ভিড় জমেছে। অন্ধকার রাস্তার ধারে একশ বাতি জ্বালা পান-গৃহ। ছোট ছেলে, মেয়ে কোলে, জীর্ণ কাপড় পরা অর্দ্ধ অনাবৃত কত স্ত্রীলোক, কত পুরুষ, ক্ষুধার জালা, অনাহারের ভয়, পাপের চিন্তা ভুলিবার জন্য পৈশাচিক উৎসবে যোগ দিয়াছে। কতবার এ ভয়ানক দৃশ্য দেখিলাম। পথের ধারে মাতাল বাপকে গৃহে লইবার জন্য ক্ষুধার্ত্ত ক্ষীণ শিশু হাত ধরিয়া টানিতেছে। কোন স্থানে স্ত্রীলোক পুরুষে মিলিয়া চীৎকার করিয়া হাসি তামাসা করিতেছে সেই হাসির নীচে কত যাতনা কত মর্ম্মান্তিক বেদনা—তাহা ঢাকিবার জন্যই যেন চীৎকার করিয়া হাসিতেছে। কোন স্থানে বা স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করিতেছে—স্ত্রী স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতেছে স্বামী মাতাল স্ত্রীর হাত ধরিয়া বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কোথায় বা স্বামী স্ত্রী দুই জনেই মাতাল দূরে ছেলে মেয়েগুলি একত্রে দাঁড়াইয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। কখন বা দ্রুতগামী গাড়ীর ভিতর ধনী পুরুষ স্ত্রী জগৎকে অবহেলা করিয়া নিজের সুখের, নিজের বিলাসের কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছে—কেজানে তাহাদের চিন্তা পূর্ণভাবে পবিত্র কি না? সেই পুরুষ স্ত্রীলোক পাপের সঙ্গী কিনা?

শীতের সময় হাঁটিতে আরাম আছে, শীত মোটেই অনুভব করা যায় না। আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম। সম্মুখে টেম্‌স নদী। একদিকে পার্লিয়ামেণ্ট গৃহের শতচূড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাহারই পার্শ্বে সুবিখ্যাত ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি—মহতের সমাধি মন্দির—কাল আকাশের গায় ছবির মত দেখাইতেছে। আমরা রাজপ্রসাদ, দেবভূমি উত্তীর্ণ হইয়া নদীর ধারে আসিলাম। জগতের ধন যেখানে তাহারই হাত দশদূরে কত অনাথ সারা দিন অনাহারের পর, গৃহাভাবে নদীর উপর যে সব সেতু আছে তাহাতেই যে বসিবার স্থান তাহারই উপর দুর্দ্দান্ত শীতের সময়ও শুইয়া রাত কাটায়—আর কোথায় যায়! এই সব দেখিয়া আমি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, এ জগতে সৌন্দর্য্য আর কোথা, 'শান্তা মারীয়াই' বা কই? হঠাৎ কি দেখিলাম। রোসনও তাহাই দেখিতেছে। একখানি বেঞ্চের নীচে বরফের স্তূপের উপর ও কে পড়িয়া আছে? সোনার রংএর ও গুলি কি চুল—আর ওখানি কি এক বালিকার

হাত? বালিকা কে? সে কি এখন ও বাঁচিয়া আছে? এই কথা গুলি ভাবিতে না ভাবিতে আমরা দুই জনে তাহার নিকট পৌঁছিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। রোসন লাল চীৎকার করিয়া বলিল এই ত আমার শান্তা মারীয়া। সে মুখখানির ম্লান সৌন্দর্য্য কখন ভুলিব না। বালিকার বুক তখন ও একটু একটু কাঁপিতেছে। বালিকার বয়স ১৫, ১৬। তাহার মুখ দেখিলে যথার্থই মনে হয় সে "শান্তা মারীয়া" তবে অধিকতর কোমল—তাহাকে পূজা না করিয়া ভালবাসা যায়। আমি রোসনকে বলিলাম "মারীয়া এখনও বাঁচিয়া আছে—কিন্তু আর অধিকক্ষণ এখানে থাক্‌লে জীবনের আশা থাক্‌বে না"। রোসনের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। বালিকার নিস্পন্দ শরীর নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল "আমি আর বাড়ী ফিরিব না।"

আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে একখানি গাড়ী নিয়ে এলেম। কোনরূপে রোসন ও বালিকাকে তাহার ভিতর তুলিয়া দিয়া রোসনের বাড়ীর দিকে চলিলাম। সে যেন জ্ঞান শূন্য। তাহার বাড়ী পঁহুছিলাম। গৃহের ভিতর লইয়া গিয়া, আগুনের কাছে বালিকাকে শুয়াইয়া, দাসীকে একজন ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া দিলাম।

সাহিত্য ও সভ্যতা।

বোধ করি সকলেই দেখিয়াছেন বিলাতী কাগজে আজকাল সাহিত্যরসের বিশেষ অভাব দেখা যায়। আগাগোড়া কেবল রাজনীতি ও সমাজনীতি। মুক্ত বাণিজ্য, জামার দোকান, সুদানের যুদ্ধ, রবিবারে জাদুঘর খোলা থাকা উচিত, ঘুষ দেওয়া সম্বন্ধে নূতন আইন, ডাব্লিন দুর্গ ইত্যাদি। ভাল কবিতা, বা সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটা ভাল প্রবন্ধ শুনিতে পাই বিস্তর টাকা দিয়া কিনিতে হয়। তাহাতে সাহিত্যের আদর প্রমাণ হয়, না সাহিত্যের দুর্ম্মূল্যতা প্রমাণ হয় কে জানে! স্পেক্টেটর র‍্যাম্বলার প্রভৃতি কাগজের সহিত এখনকার কাগজের তুলনা করিয়া দেখ—তখন কি প্রবল সাহিত্যের নেশাই ছিল! জেফ্রি, ডিকুইন্সি, হ্যাজ্‌লিট্, সাদি, লে হাণ্ট্, ল্যাম্বের আমলেও পত্র ও পত্রিকায় সাহিত্যের নির্ঝরিণী কি অবাধে প্রবাহিত হইত! কিন্তু আধুনিক ইংরাজপত্রে সাহিত্য প্রবাহ রুদ্ধ দেখিতেছি কেন! মনে হইতেছে আগেকার চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বাড়িতেছে কিন্তু চাষ কমিতেছে। ইহার কারণ কি!

আমার বোধ হয়, ইংলণ্ডে কাজের ভিড় কিছু বেশী বাড়িয়াছে। রাজ্যও সমাজ তন্ত্র উত্তরোত্তর জটিল হইয়া পড়িতেছে। এত বর্ত্তমান অভাব নিরাকরণ, এত উপস্থিত সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে, প্রতিদিনের কথা প্রতিদিন এত

জমা হইতেছে যে, যাহা নিত্য, যাহা মানবের চিরদিনের কথা, যে সকল অনন্ত প্রশ্নের মীমাংসার ভার এক যুগ অন্য যুগের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায়, মানবাত্মার যে সকল গভীর বেদনা এবং গভীর আশার কাহিনী, সে আর উত্থাপিত হইবার অবসর পায় না। চিরনবীন চিরপ্রবীন প্রকৃতি তাহার নিবিড় রহস্যময় অসীম সৌন্দর্য্য লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় তেমনি ভাবেই চাহিয়া আছে, চারিদিকে সেই শ্যামল তরু পল্লব, কালের চুপি চুপি রহস্য কথার মত অরণ্যের সেই মর্ম্মর ধ্বনি, নদীর সেই চিরপ্রবাহময় অথচ চির অবসরপূর্ণ কলগীতি; প্রকৃতির অবিরাম নিশ্বসিত বিচিত্র বাণী এখনও নিঃশেষিত হয় নাই—কিন্তু যাহার আপিষের তাড়া পড়িয়াছে, কেরাণীগিরির সহস্র খুচ্রা দায় যাহার শামলার মধ্যে বাসা বাঁধিয়া কিচি কিচি করিয়া মরিতেছে—সে বলে দূর কর তোমার প্রকৃতির মহত্ত্ব, তোমার সমুদ্র ও আকাশ, তোমার মানব হৃদয়, তোমার মানব হৃদয়ের সহস্রবাহী সুখ দুঃখ ঘৃণা ও প্রীতি, তোমার মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ ও গভীর রহস্য পিপাসা—এখন হিসাব ছাড়া আর কোন কথা হইতে পারে না? আমার বোধ হয় কলকারখানার কোলাহলে ইংরেজেরা বিশ্বের অনন্ত সঙ্গীতধ্বনির প্রতি মনোযোগ দিতে পারিতেছে না; উপস্থিত মুহূর্ত্তগুলো পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া অনন্ত কালকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

আমরা আরেকটি প্রবন্ধে লিখিয়াছি সৃষ্টির সহিত সাহিত্যের তুলনা হয়। * এই অসীম সৃষ্টিকার্য্য অসীম অবসরের মধ্যে নিমগ্ন। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র অপার অবসর সমুদ্রের মধ্যে সহস্র কুমুদ কহ্লার পদ্মের মত ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কার্য্যের শেষও নাই অথচ তাড়াও নাই। বসন্তের একটি শুভ প্রভাতের জন্য শুভ্র চামেলি সৃষ্টির কোন অন্তঃপুরে অপেক্ষা করিয়া আছে, বর্ষার মেঘস্নিগ্ধ আর্দ্র সন্ধ্যার জন্য একটি শুভ্র জুঁই সমস্ত বৎসর তাহার পূর্ব্বজন্ম যাপন করিতেছে। সাহিত্যও সেইরূপ অবসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। ইহার জন্য অনেক খানি আকাশ, অনেক খানি সূর্য্যালোক, অনেক খানি শ্যামল ভূমির আবশ্যক। কার্য্যালয়ের শান-বাঁধান মেজে ফুঁড়িয়া যেমন মাধবীলতা উঠে না তেমনি সাহিত্যও উঠে না।

উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান বিস্তৃত রাজ্যভার, জটিল কর্ত্তব্য শৃঙ্খল, অবিশ্রাম দলাদলি ও রাজনৈতিক কূটতর্ক, বাণিজ্যের জুয়াখেলা, জীবিকা সংগ্রাম, রাশিকৃত সম্পদ ও অগাধ দারিদ্র্যের একত্র অবস্থানে সামাজিক সমস্যা—এই সকল লইয়া ইংরাজ মানবহৃদয় ভারাক্রান্ত। তাহার মধ্যে স্থানও নাই সময়ও নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে যদি কোন কথা থাকে ত সংক্ষেপে সার'—আরো সংক্ষেপ কর। প্রাচীন সাহিত্য ও বিদেশী সাহিত্যের সার সঙ্কলন করিয়া "পিলের" মত গুলি পাকাইয়া গলার মধ্যে চালান

* সাহিত্যের উদ্দেশ্য নামক প্রবন্ধ দেখ।

করিয়া দাও। কিন্তু সাহিত্যের সার সঙ্কলন করা যায় না। ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের সার সঙ্কলন করা যাইতে পারে। মালতী লতাকে হামান্‌দিস্তায় ঘুঁটিয়া তাল পাকাইলে সেই তালটাকে মালতীলতার সার সঙ্কলন বলা যাইতে পারে না। মালতীলতার হিল্লোল, তাহার বাহুর বন্ধন, তাহার প্রত্যেক শাখা প্রশাখার ভঙ্গিমা, তাহার পূর্ণ যৌবনভার, হামান্‌দিস্তার মধ্যে ঘুঁটিয়া তোলা ইংরাজেরও অসাধ্য।

ইহা প্রায় দেখা যায়, অতিরিক্ত কার্য্যভার যাহার স্কন্ধে সে কিছু নেশার বশ হয়। যো সো করিয়া একটু অবসর পাইলে উৎকট আমোদ নহিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। যেমন উৎকট কাজ তেম্‌নি উৎকট অবসর। কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে নেশার তীব্রতা নাই। ভাল সন্দেশে যেমন চিনির আতিশয্য থাকে না, তেমনি উন্নত সাহিত্যে প্রচণ্ড বেগ এবং প্রশান্ত মাধুরী থাকে বটে কিন্তু উগ্র মাদকতা থাকে না। এই জন্য নিরতিশয় ব্যস্ত লোকের কাছে সাহিত্যের আদর নাই। নেশা চাই। ইংলণ্ডে দেখ খবরের নেশা। সে নেশা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। খবরের জন্য কাড়াকাড়ি তাড়াতাড়ি, যে খবর দুই ঘণ্টা পরে পাইলে কাহারো কোন ক্ষতি হয় না সেই খবর দুই ঘণ্টা আগে যোগাইবার জন্য ইংলণ্ড ধন প্রাণ অকাতরে বিসর্জ্জন দিতেছে। সমস্ত পৃথিবী ঝাঁটাইয়া প্রতিদিনের খবরের টুক্‌রা ইংলণ্ড দ্বারের নিকট স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছি। সেই টুক্‌রা গুলো চা দিয়া ভিজাইয়া বিস্কুটের সঙ্গে মিলাইয়া ইংলণ্ডের আবাল বৃদ্ধবণিতা প্রতি দিন প্রভাতে এবং প্রদোষে পরমানন্দে পার করিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে কোন খবর পাওয়া যায় না। কারণ যে সকল খবর সকলেই জানে অধিকাংশ সাহিত্য তাহাই লইয়া।

উপস্থিত বিষয় উপস্থিত ঘটনার মধ্যে যেমন নেশা, স্থায়ী বিষয়ের মধ্যে তেমন নেশা নাই। গোলদিঘির ধারে মারামারি বা চক্রবর্ত্তী পরিবারের গৃহবিচ্ছেদ যত তুমুল বলিয়া বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও এমন মনে হয় না। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মহাশয় যখন কালো আলপাকার চাপকান পরিয়া ছাতা হাতে ক্যাপ্ মাথায় চাঁদার খাতা লইয়া ব্যস্ত হইয়া বেড়ান তখন লোকে মনে করে পৃথিবীর আর সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া আছে। যখন কোন আর্য্য আর কোন আর্য্যকে অনার্য্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য গলা জাহির করেন ও দল পাকাইয়া তোলেন, তখন নস্যরেণু তাম্রকূট-ধূম্র এবং আর্য্য-অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি এবং তাঁহার দলবল ভুলিয়া যান যে তাঁহাদের চণ্ডিমণ্ডপের বাহিরেও বৃহৎ বিশ্বসংসার ছিল এবং এখনও আছে। ইংলণ্ডে না জানি আরও কি কাণ্ড! সেখানে বিশ্বব্যাপী কারখানা এবং দেশব্যাপী দলাদলি লইয়া না জানি কি মত্ততা! সেখানে যদি বর্ত্তমানই দানবাকার ধারণ করিয়া নিত্যকে গ্রাস করে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

বর্ত্তমানের সহিত অনুরাগভরে সংলগ্ন হইয়া থাকা যে মানুষের স্বভাব এবং কর্ত্তব্য

তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তাই বলিয়া বর্ত্তমানের আতিশয্যে মানবের সমস্তটা চাপা পড়িয়া যাওয়া কিছু নয়। গাছের কিয়দংশ মাটির নীচে থাকা আবশ্যক বলিয়া যে সমস্ত গাছটাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তাহার পক্ষে অনেকখানি ফাঁকা অনেকখানি আকাশ আবশ্যক। যে মাটির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সেই মাটি ফুঁড়িয়াও মানবকে অনেক উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, তবেই তাহার মনুষ্যত্ব সাধন হইবে—কিন্তু ক্রমাগতই যদি সে ধূলিচাপা পড়ে, আকাশে উঠিবার যদি সে অবসর না পায় তবে তাহার কি দশা!

যেমন বদ্ধ গৃহে থাকিলে মুক্তবায়ুর আবশ্যক অধিক তেমনি সভ্যতার সহস্র বন্ধনের অবস্থাতেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবশ্যকতা অধিক হয়। সভ্যতার শাসন নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম শৃঙ্খল যতই আঁট হয়—হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতির অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কিছু কালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি ততই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। সাহিত্যই সেই মিলনের স্থান সেই খেলার গৃহ, সেই শান্তি নিকেতন। সাহিত্যই মানব হৃদয়ে সেই ধ্রুব অসীমের বিকাশ। অনেক পণ্ডিত ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন যে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিনাশ হইবে। তা যদি হয় তবে সভ্যতারও বিনাশ হইবে। কেবল পাকা রাস্তাই যে মানুষের পক্ষে আবশ্যক তাহা নয়, শ্যামল ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা অধিক আবশ্যক। প্রকৃতির বুকের উপরে পাথর ভাঙ্গিয়া আগাগোড়া সমস্তটাই যদি পাকা রাস্তা করা যায়, কাঁচা কিছুই না থাকে তবে সভ্যতার অতিশয় বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই কিন্তু সেই অতিবৃদ্ধিতেই তাহার বিনাশ। লণ্ডন সহর অত্যন্ত সভ্য ইহা কে না বলিবে, কিন্তু এই লণ্ডনরূপী সভ্যতা যদি দৈত্যশিশুর মত বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত দ্বীপটাকে তাহার ইষ্টক কঙ্কালের দ্বারা চাপিয়া বসে, তবে সেখানে মানব কেমন করিয়া টিঁকে! মানব ত কোন পণ্ডিত বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত কল বিশেষ নহে!

দূর হইতে ইংলণ্ডের সাহিত্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা হয় ত আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। এ বিষয়ে অভ্রান্ত বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং সেরূপ যোগ্যতাও আমার নাই। আমাদের এই রৌদ্রতাপিত নিদ্রাতুর নিস্তব্ধ গৃহের একপ্রান্তে বসিয়া কেমন করিয়া ধারণা করিব সেই সুরাসুরের রণরঙ্গভূমি য়ুরোপীয় সমাজের প্রচণ্ড আবেগ, উত্তেজনা, উদ্যম, সহস্রমুখী বাসনার উদ্দাম উচ্ছ্বাস, অবিশ্রাম মন্থ্যমান ক্ষুব্ধ জীবন মহাসমুদ্রের আঘাত ও প্রতিঘাত, তরঙ্গ ও প্রতিতরঙ্গ ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, উৎক্ষিপ্ত সহস্র হস্তে পৃথিবী বেষ্টন করিবার বিপুল আকাঙ্খা! দুই একটা লক্ষণ মাত্র দেখিয়া, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে লিপ্ত না থাকিয়া বাহিরের লোকের মনে সহসা যে কথা উদয় হয় আমি সেই কথা লিখিয়া প্রকাশ করিলাম এবং এই সুযোগে সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মত কথঞ্চিৎ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ।

১৮ই আশ্বিন, শরতের হেমাভ রৌদ্র ক্ষীণতেজ হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে হাবড়ার ষ্টেসনে গাড়ি ছাড়িবার বাঁশি বাজিয়া উঠিল। আমরাও তল্পিতল্পা লইয়া দ্রুতগতিতে গাড়িতে উঠিলাম। নিয়মিত সময়ে গাড়ি ছাড়িয়া দিল—জন্মভূমির নিকট কিছু দিনের জন্য বিদায় লইয়া চলিলাম। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গাড়ি ছাড়িয়াছিল—সুতরাং শ্রীরামপুর পার না হইতে হইতেই আঁধার আসিয়া প্রকৃতিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। যদিও ষষ্ঠির ক্ষীণ জ্যোৎস্নায়, আঁধারের তীব্রতেজ অনেকটা দূরীভূত হইল—তথাপি প্রকৃতির পরিস্ফুট চিত্র তাহার উপর প্রতিফলিত হইল না। দুই দিকের শস্য শ্যামলা ক্ষেত্রগুলির মধ্য দিয়া, গাড়িগুলা আপনার মনে বিদ্যুৎ বেগে ছুটিতে লাগিল ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গাছ পালা শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র ও টেলিগ্রাফের খুঁটি গুলিও দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। বরাবরই ইচ্ছা ছিল, যে সমস্তরাত্রি না ঘুমাইয়া কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া যতদূর রাত্রের মধ্যে যাইতে পারি, সেই সমস্ত স্থলগুলির প্রকৃতির চিত্র, অন্ধকার ও জ্যোৎস্নালোকের মধ্য দিয়া কিরূপ দেখায়, তাহা দেখিতে দেখিতে যাইব কিন্তু সে আশা পরিপূর্ণ হওয়ার সম্বন্ধে চারিদিকে ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। সেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নাকে তিমির সাগরে ডুবাইয়া দিয়া চন্দ্রমাকে লুক্কায়িত করিয়া ঝড় বৃষ্টি ভাই বোনে সজোরে প্রকৃতির সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল। চুপ করিয়া বসিয়া তাহাদের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। সেই ভীষণ ঝঞ্ঝা ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলাম, রাণীগঞ্জের কয়লার খনির চিমনীর উপর দিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে ও অদূরে দুই চারিটী আলোক জ্বলিতেছে। চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ক্লান্তি বোধ হওয়াতে শুইবার জন্য উপরের বিছানায় (Hanging bed) উঠিলাম—নিদ্রা যে যথেষ্ট হইল তাহা আর বলিতে হইবে না। ত্রিযামা রজনীর তৃতীয় ভাগের শেষে, বন্ধু আসিয়া বড় ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিলেন। আমি চোখ রগড়াইতে রাগড়াইতে উঠিয়া বসিলাম। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বাঙ্গ waterproof জামা আবৃত লণ্ঠন হস্তে বিস্তৃতগুম্ফ এক সাহেব আসিয়া উপস্থিত। তিনি দ্বারস্থ হইয়াই মধুর কণ্ঠে ডাকিলেন Baboo! Baboo! আমরা ত্রাস্তে টিকিট বাহির করিয়া দেখাইলাম—ও সেই প্রসারিত-গুম্ফ দীর্ঘবপুধারী পুরুষ, তড়িৎ বেগে আমাদিগকে রেহাই দিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। আমরা তখন—সেই মধুপুর ষ্টেসনের প্লাট ফরমে নামিয়া পদচারণা করিতে করিতে শীতল বায়ু সেবন করিতে লাগিলাম। তখন বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছিল ও আকাশও পরিষ্কার হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়িতে উঠিবা মাত্র গাড়ি ছাড়িয়া দিল—আমরাও প্রভাত বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে উষাকালে বৈদ্যনাথ উপস্থিত হইলাম।

যে সময়ে বৈদ্যনাথে পৌঁছান গেল. তখন দিঙ্মণ্ডল সম্যকরূপে অন্ধকার বর্জ্জিত হয় নাই। প্রশস্ত ময়দান হইতে সুশীতল প্রভাত বায়ু আসিয়া আমাদের গাত্র সুশীতল করিতে লাগিল। নওয়াধি ষ্টেসনে, আসিয়া সম্যক রূপে প্রভাত হইয়া পড়িল। নিসর্গ সুন্দরী, চির প্রীতিকর, রমণীয় বেশে আমাদের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। নবোদিত সূর্য্যের রক্ত লোহিত কিরণছটায়—সর্ব্বাগ্রে মেঘের কোল, পরে পাহাড়ের উচ্চতর শিখর ও তদুপরিস্থ তরুরাজি, আলোকিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সেই মধুর চিত্র দেখিয়া মনে যে শান্তিময় ভাবের উদয় হইল তাহা লেখনীতে অব্যক্ত। শান্তি ও প্রীতির উচ্ছ্বাসে মন ভরিয়া উঠিল। গত রজনীতে নিরাশ হওয়াতে যত না দুঃখ হইয়াছিল, অদ্য নিসর্গ সুন্দরীর এই মনোহর শোভা দেখিয়া তাহার শতগুণ ক্ষতিপুরণ করিয়া লইলাম। বস্তুতঃ সেদিন নওয়াধীতে ও তাহার চারিদিন পরে গোমতী তীরে প্রভাতে প্রকৃতির যে মনোমুগ্ধকর লীলাময়ী ছবি দেখিয়াছি তাহা এ জীবনেও ভুলিব না।

রাণীগঞ্জ হইতে প্রকৃত পক্ষে পাহাড়ের সুরু হইয়াছে বটে—কিন্তু বৈদ্যনাথ, নওয়াধি, শিমুলতলা ও গিধোড়ের আশে পাশে, পাহাড়ের দৃশ্য গুলি অতীব মনোহর। কতকগুলি পাহাড় কোন স্থলে বা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, প্রকৃতির অভেদ্য প্রাচীর রূপে, বৃক্ষাদির শ্যামল আবরণে শরীর ঢাকিয়া, মাঠের একদিক হইতে ধনুকাকারে ক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থল বেষ্টন করিয়া অপরদিকে গিয়া লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা দেখিলে বোধ হয় —কে যেন প্রকৃতিকে মানবের শিক্ষাস্থল করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যখানে, এক বৃহৎ অভেদ্য অনুল্লঙ্ঘনীয়, প্রস্তরময় আবরণ স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থলে কতকগুলি পাহাড়ের গাত্র লোহিত প্রস্তর বা লাল-মৃত্তিকার দ্বারা আবৃত দেখিলাম। সেই সকল বালুকাময়, লোহিত প্রস্তরের উপর, হেমাভ সূর্য্য কিরণ পড়াতে, তাহা যেন শত শত দীপ্ত মণির ন্যায় আভা বিকাশ করিতেছে। আবার কোথায় বা সর্ব্বাঙ্গ বৃক্ষাবৃত, শ্যামল পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখর দেশে, সূর্য্যরশ্মি পড়াতে তাহা ঈষৎ বায়ুভরে কম্পিত হইয়া অশেষ শোভার বিকাশ করিয়াছে। এই প্রকার পাহাড়ের উপর পাহাড় বনের গায়ে বন দেখিয়া আমাদের Hemans এর নিম্ন লিখিত কবিতাটী মনে আসিল।

Woods crowding upon woods hills over hills,
A surging seen, and only limited—
By the blue distance—

প্রকৃতির অবিনশ্বর পটে এই সমস্ত চিরমধুর মনোজ্ঞ চিত্র দেখিয়া আমার সেই সর্ব্বশক্তিমান চিত্রকরকে মনে মনে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম।

হাবড়া হইতে বেনারসে, (কর্ডলাইন দিয়া) যাইতে হইলে, দুইটী বৃহৎ পুল অতিক্রম

করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে একটী লক্ষ্মী সরাইয়ের ও অপরটী সোন নদীর। * লক্ষ্মী-সরাইয়ে যে স্থলে লুপ ও কর্ড লাইন আসিয়া একত্রে মিলিয়াছে তাহারই অনতিদূরে একটী বৃহৎ খাদের উপর লক্ষ্মীসরাইয়ের পুল অবস্থিত। তুলনায় লক্ষ্মীসরাইয়ের পুল অপেক্ষা সোনের পুল অতিপয় বৃহৎ। আমরা ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে সোনের পুলের উপর উপস্থিত হইলাম। আমাদের পার্শ্বের কামরায় একজন মান্দ্রাজী প্লীডার বসিয়াছিলেন তিনি গাড়িতে প্রবেশ করিয়া অবধি, ইংরাজিতে, আমাদের সহিত নানাবিধ আলাপ করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিলাম, যে তিনি মান্দ্রাজের জেলাকোর্টে প্রাক্‌টিস্ করেন কোন কার্য্য উপলক্ষে আসেন্‌সোলে আসিয়াছিলেন—এক্ষণে জোয়ানপুর যাইতেছেন। সোনভদ্রাকে দেখিয়া তিনি করদ্বয় মস্তকে স্পর্শ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন সুবর্ণভদ্রার আর সে প্রাচীন কালের তেজ নাই—তরঙ্গায়িত বক্ষে দুকূল ভাঙ্গিবার সামর্থ্য আর এক্ষণে তিলমাত্র নাই! একটানা স্রোতে গা ঢালিয়া সুবর্ণভদ্রা আপন মনে চলিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানি এই সোণের পুল বাধিতে অনেক খরচ করিয়াছেন। চারিদিক হইতে সোণের উভয় পার্শ্বে ছোট বড় খাল কাটিয়া তাহা মাঠের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়া স্রোতবেগ কমান হইয়াছে। তিনি বলিলেন—এ প্রকার না করিলে সোণের উপর পুলবাধা রেলকোম্পানীর বড় দুরূহ হইয়া উঠিত। আমরা দেখিলাম বাস্তবিক সোণ অতি মৃদুবেগে একটানা স্রোতে গা ঢালিয়া চলিতেছে। দক্ষিণে ও বামদিকে মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড বালুকা স্তূপ বা বহু বিস্তৃত বালির চড়া পড়িয়াছে। এই চড়ার গাত্রে, সেই ক্ষীণ তেজ, বিরল তরঙ্গ রাজি প্রতিহত হইয়া বহুদূর বিস্তৃত ফেণরাজি উৎপাদন করিয়াছে—ও সেই ফেন রাজি আবার স্রোতমুখে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সোনের উপরে পুল—সর্ব্বোপরি নীলিমাময়ংনভোমণ্ডল ও নদ বক্ষে অসংখ্য সুধা ধবল ফেনরাজি দেখিয়া আমাদের মনে সহসা—

"বৈদেহিপশ্যামলয়াৎ বিভক্তং।
মৎসেতু না ফেণিলাম্বু রাশিম্॥
ছায়াপথেনেব শরৎ প্রসন্নম্!
আকাশ মাবিষ্কৃত চারুতারম্॥

শ্লোকটীর আবৃত্তি হইয়া উঠিল। কল কল শব্দে দ্রুতবেগে ফেণমালা গলায় পরিয়া

* পুণ্য সলিলা নর্ম্মদা ও সোন এক স্থল হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। গণ্ডোয়ানা এই উভয় নদীর উৎপত্তি স্থল। প্রাচীন আর্য্যেরা সোননদকে "হিরণ্য বাহ" বলিতেন। সোনের জলস্রোতের সহিত ধৌত বালুকারাশির মধ্যে সোনারগুঁড়া পাওয়া যাইত বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে। Grand Trunk Road দিয়া পশ্চিম যাইতে হইলে পূর্ব্বে অনেক কষ্টে এই সোননদী পার হইতে হইত।

নাচিতে নাচিতে সোনপ্রবাহ উল্লাসে উন্মত্তের ন্যায় বালুকাস্তূপ ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। দৃশ্য কি সুন্দর! কিন্তু আর্য্যদিগের সাধের হিরণ্যবাহের পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য কিছুই নাই বলিয়া সম্পূর্ণ রূপ দর্শনসুখ মিটিল না। সোণের উপর দিয়া যে কোন প্রকার বাণিজ্য নৌকা যাতায়তে করে—ইহাত বোধ হইল না। দূরে কেবল ২। ১ খানি ধীবরের নৌকা ভিন্ন আমরা আর কোন প্রকার জলযান সোন বক্ষে দেখিতে পাইলাম না।

কানু জংসন হইতে মোগল সরাই পর্য্যন্ত কডলাইনে যে সমস্ত ষ্টেসন আছে—তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ পাটনা, বাঁকিপুর, দানাপুর, আরা, ডুমরাওন ও বক্সার প্রভৃতি কয়েকটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের দৌলতে যে ইহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহা নহে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই সকল স্থান, নানাকারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছে। বৈদ্যনাথ একটী অতি প্রাচীন হিন্দুতীর্থ। ইহার সন্নিহিত দেওঘরের জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর, আগে দেওঘরে রেলওয়ে না থাকাতে তীর্থ যাত্রীর অনেক ব্যয় পড়িত কিন্তু আজ কাল বর্ণ কোম্পানি সেই অভাবের দূরীকরণ করিয়াছেন বলিয়া বৈদ্যনাথের তীর্থ যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ অধিক হইতেছে আজ কাল অনেক বাঙ্গালী, এই সকল স্থানে বাস করিতেছেন। এই দেওঘরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর আবাস স্থান।

হিন্দু তীর্থের মধ্যে বৈদ্যনাথ একটী প্রধান তীর্থ। কথিত আছে—লঙ্কাধীপ রাবণ, এই লিঙ্গমূর্ত্তি কৈলাস হইতে স্বর্ণ লঙ্কায় লইয়া যাইতেছিলেন। এই জাগ্রত লিঙ্গ মূর্ত্তি রাবণের হস্তগত হইলে প্রমাদ ঘটিবে ভাবিয়া দেবতাগণ অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া রাবণ যাহাতে এই দেবমূর্ত্তি লঙ্কায় না লইয়া যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। মহাদেবের সহিত রাবণের এই করার ছিল—"যদ্যপি পথিমধ্যে কোন স্থলে তুমি আমায় নামাইয়া রাখ তাহা হইলে আমি তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব।" দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বরুণকে রাবণের উদরে প্রবেশ করিতে বলিলেন, বরুণের ছলনায়, রাবণের অসম্বরণীয় পীড়া উপস্থিত হইল—মস্তকে ইষ্টদেবতা, অথচ এদিকে ঘোর যাতনা, রাবণ অন্য উপায় না দেখিয়া সেইস্থলে এক ভগ্ন প্রস্তর খণ্ডের উপর লিঙ্গমূর্ত্তি রাখিয়া অদূরে গমন করিলেন। ইহা হইতে কর্ম্মনাশা নদীর উৎপত্তি হইল। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় ইষ্টদেবকে মস্তকে তুলিবার উপক্রম করিলেন—কিন্তু কিছুতেই তাহা তিলমাত্র সরাইতে পারিলেন না। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন অপরাধে লিঙ্গমূর্ত্তি লঙ্কেশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন। রাবণ এইরূপে বিফল প্রযত্ন হইয়া "এই স্থানেই থাক" এই কথা বলিয়া লিঙ্গের মস্তকে সজোরে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া রোষভরে চলিয়া গেলেন। পাণ্ডারা এই কাহিনী শাখা প্রশাখার সহিত বর্ণনা করিয়া আজও যাত্রীদিগকে এই তিনটী অঙ্গুলি চিহ্ন যত্ন করিয়া দেখাইয়া থাকে এবং বৈদ্যনাথ আজও রাবণেশ্বর" বলিয়া কথিত হন। বৈদ্যনাথের মন্দিরের সমস্তাংশই প্রস্তর নির্ম্মিত, সুদৃশ্য

না হইলেও তাহাতে কারু কার্য্য ও হিন্দু নৃপতির শিল্প কৌশলের বিশেষ পরিচয় আছে। বৈদ্যনাথ মন্দিরের সহিত, কটকের ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আজ কালকার মোটা মাহিনাভোগী ইংরাজী বিশ্বকর্ম্মারা, এ প্রকার মন্দির গঠনে কৃতকার্য্য হন কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। বৈদ্যনাথের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটী প্রকাণ্ড পাহাড়। ইহার মধ্যে "নন্দন পাহাড়"ই দেখিবার জিনিস।

বৈদ্যনাথের পর উল্লেখ করিবার জিনিস পাটনা। ভারতের যখন সুখের দিন ছিল তখন পাটনা যথেষ্ট শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল। যবনাধিকারের পরও বড় একটা কম নহে। কিন্তু ইংরাজাধিকারে পাটনার পূর্ব্ব গৌরব অনেক কমিয়াছে। পাটনার কথা স্মৃতিপথে উঠিলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর, পাটলী পুত্র, গ্রীক্‌দের "পালিবথ্রা" (Palibothra) ও চৈনিকদের "পোটেলিস্" (Potolitse) মনে আসিয়া পড়ে। পাটলী পুত্র, খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অজাত শত্রু কর্তৃক স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে প্রাচীন-কালে "রাজগৃহ" মগধের রাজধানী ছিল। অজাতশত্রুর পর হইতে ইহা যথাক্রমে নন্দবংশের চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের রাজধানী হয়। এই স্থান হইতেই রাজচক্রবর্ত্তী অশোক, ভারতের কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে অনুজ্ঞালিপি (Edicts) প্রচার করেন ও সাগর পারে, সিংহল, ইজিপ্ট, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেক প্রচারক পাঠাইয়া দেন। এই সকল ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই কূটবুদ্ধি তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী মন্ত্রীপ্রবর চাণক্য, ও অন্য পক্ষে ধীর স্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন্ত্রীরাজ রাক্ষসের কথা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রারাক্ষস ব্যাপার মনে আসিয়া উদিত হয়। অশোকের সময়ে পাটনার সৌন্দর্য্য অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—তিনি নগরীর চারিদিকে পথের দুই ধারে বৃক্ষরোপণ, কূপ ও জলাশয় খণন, সাধারণ উদ্যান ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া প্রজার সুখ বর্দ্ধনের যথেষ্ট চেষ্টা করেন। নগরের সৌন্দর্য্য তাঁহার সময়ে এতদুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে তিনি আদর করিয়া সেই সময়ে স্বীয় রাজধানীকে "কুসুমপুর" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। প্রাচীন পাটনা হইতে, বর্ত্তমান পাটনার অনেক বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রাচীন পাটনার যাহা ছিল আধুনিক পাটনার তাহার কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা কিছু ভাল ছিল তাহাই গিয়াছে—যাহা কিছু মন্দ তাহাই কেবল বর্ত্তমান। "পাটলীপুত্র" ও "পাটনা" সম্যকরূপে একস্থল অধিকার না করিলেও যে ইহারা পরস্পরের সন্নিহিত ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মিগাস্থিনাসের মতে দীর্ঘে আট মাইল প্রস্থে সার্দ্ধেক মাইল "পাটলীপুত্র" চারিদিকে সুগভীর খাত, ও উচ্চ প্রাচীর দ্বারা সুবেষ্টিত ছিল। নগরের চারিপার্শ্বে ঘুরিলে চৌষট্টিটি রাজতোরণ ও প্রায় ছয় শত, গৃহচূড়া লক্ষিত হইত।" কিন্তু আজকালকার সহরটী বোধ হয় এক ক্রোশেরও অধিক বিস্তৃত হইবে না। সেই সকল বৃক্ষশোভিত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, আনন্দময় শোভনোদ্যান, নয়নরঞ্জন "মহাবিল্লী" ও "সুগাঙ্গ্য" রাজপ্রসাদ এক্ষণে কালের কবলস্থ

হইয়াছে। থাকিবার মধ্যে ঠিক তাহার বিপরীতই বর্ত্তমান। বর্ত্তমান পাটনায় চারিদিকে দ্বিতল ও একতল কাঠের ও ক্ষুদ্র বৃহৎ খোলার ঘর ও মধ্যে মধ্যে অট্টালিকা রাজি, অপ্রশস্ত রাজপথ, ময়লা ও দুর্গন্ধময় অপ্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী ও বিশৃঙ্খল ভবনগুলি দেখিলে, পূর্ব্ব গৌরব যে অপনীত হইয়াছে ইহা বেশ উপলব্ধি হয়। অতি প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে কেবল রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে একটী অত্যুচ্চ ভূখণ্ড ও রাজা রামনারায়ণের ভগ্নপ্রায় কেল্লার অবশিষ্টাংশই আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অত্যুচ্চ ভূমি খণ্ডের উপর আজকাল একটী মুসলমানের দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে—প্রত্নতত্ত্ববিৎদিগের মতে এই উচ্চ ভূমি খণ্ডই অশোকের "স্তূপ" (Stupes) বলিয়া কথিত হয়। বাঙ্গালী গবর্ণর রাজা রামনারায়ণের ভগ্ন দুর্গ বাঙ্গালীর পক্ষে দেখিবার জিনিস। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, বাঙ্গালী যে বীরত্ব দেখাইতে পারিত, তাহা রামনারায়ণ ও মোহনলাল প্রভৃতির কার্য্য হইতেই প্রমাণ হয়।

পাটনার প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তির আর কিছুই বর্ত্তমান নাই। পুরাতন বৌদ্ধ মন্দির সকলের পরিবর্ত্তে মুসলমানের মস্‌জিদ্‌ ও হিন্দুদের দেবালয় সকলই আজকাল অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পাটনা, অন্যান্য বিষয়ে এ প্রকার অবনতি প্রাপ্ত হইলেও ইহার বাণিজ্য প্রাধান্যতা সম্যকরূপে লোপ হয় নাই। * পাটনায় অনেক হিন্দু ও মুসলমান সওদাগর কারবার করিয়া থাকেন। হিন্দু অধিবাসীর অপেক্ষা মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌএর মুসলমানের অনেকটা হীন প্রতাপ হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু পাটনার মুসলমানেরা চিরকালই সমানভাবে কাটাইয়া আসিয়াছে।

"পাটনার হত্যাকাণ্ড" ইংরাজী ইতিহাসে, বঙ্গেশ্বর মীরকাশিমের একটী জলন্ত কীর্ত্তি। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে ইহাই প্রধান কলঙ্ক। একশত পঞ্চাশ জন ইংরাজ এইস্থলে তাঁহার আজ্ঞানুসারে সমরুর তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নিহত ব্যক্তিদের স্মরণার্থে ইংরাজেরা ইহার উপর একটী কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

পাটনার পরে সিবিল ষ্টেশন বাঁকিপুর, বাঁকিপুরে কাছারি, পুলিস আদালত প্রভৃতি কিঞ্চিৎ জাজ্বল্য রূপে বর্ত্তমান। এই স্থানে আফিমের প্রধান গুদাম আছে। অনেক সাহেব, এইস্থানে বাস করেন বলিয়া ইহা পাটনার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে একটি সুপ্রশস্ত সুদীর্ঘ "সরাই" আছে। এ প্রকার সুবৃহৎ সরাই ভারতের আর কোন খানে আছে বলিয়া বোধ হয় না। সায়েস্তাখাঁর ধানের গোলা আমরা চক্ষে দেখি নাই—সুতরাং তাহার সহিত ইহার তুলনায় অক্ষম।

* মারুগঞ্জ পাটনার প্রধান বাণিজ্য স্থান।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই গোলা নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে স্থপতি বিদ্যার কোন কৌশল না থাকিলেও ইহা একটী ছোটখাট দেখিবার জিনিস। একেবারে অনেক শস্য কিনিয়া গোলাজাত করিয়া দুর্ভিক্ষের সময় সাধারণকে স্বল্প মুল্যে তাহা বিক্রয়ের জন্য গোলা সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমে যতদূর বাঁধাবাধি করিয়া ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল—কিন্তু শেষে ততদূর হইয়া উঠে নাই।

পাটনার মিলিটারি ষ্টেশন দানাপুর, পাটনা হইতে ইহার দূরত্ব চৌদ্দমাইল। দানাপুরে অনেক বারাক্ ও ইংরাজদিগের বাসোপযুক্ত বাঙ্গালা আছে। দানাপুরের চৌদ্দ মাইল উত্তরে ভাগিরথী ও সোনের সম্মিলন হইয়াছে। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের ন্যায় এই সঙ্গম মনোরম দর্শনীয় না হইলেও ইহা দেখিবার জিনিস বটে।

বক্সার, দানাপুর হইতে প্রায় ত্রিশ ক্রোশের উপর হইবে। জন শ্রুতি এই, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সহোদর লক্ষ্মণের সহিত এই প্রদেশে আসিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন। 'এই স্থানে উত্তমরূপে জ্যারোপণ করিতে শিখিয়াই তিনি মিথিলায় শিবধনুভঙ্গ করিতে সমর্থ হন। বক্সার দুর্গের উত্তরে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর একটী ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে লোক প্রবাদ মতে শ্রীরামচন্দ্র এই ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর সাতদিন অবস্থান করেন। বক্সারের চারি পার্শ্বস্থ প্রদেশ সমূহ এখানকার লোকে ভোজ রাজার রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। ইংরাজ রাজত্বে বক্সার একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান। এই বক্সারের দ্বিতীয় যুদ্ধেই নবাব সুজাউদ্দৌলা, ইংরাজের সহিত পরাভূত হইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। পলাশীতে ব্যাঙ্গযুদ্ধ করিয়া ইংরাজ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, বক্সারের যুদ্ধে সুজাকে পরাজিত করিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রথম প্রবেশ করিলেন। এই স্থানের জল হাওয়া ভাল বলিয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালীরা বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য এখানে আসিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

মহাকবি রাজশেখর।

"শার্দ্দূল ক্রীড়িতৈরেব প্রখ্যাতো রাজশেখরঃ।"

(সুবৃত্ত তিলকম্।)

ক্ষেমেন্দ্রকৃত সুবৃত্তি তিলক গ্রন্থে রাজশেখর কবির প্রশংসা দেখা যায়। ক্ষেমেন্দ্র কবি বলিয়াছেন, রাজশেখর শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃই তিনি শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে* কবিতা লিখিতে ভাল বাসিতেন

* শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দঃ ১৯ অক্ষরে গ্রথিত হয়। ইহার লক্ষণ ও প্রস্তার এই—

এবং তাঁহার শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের কবিতা গুলিই বিশেষ মনোহর। রাজশেখরের কৃত যত কবিতা দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ের মধ্যে তাঁহার বৃহৎ ছন্দের (শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের) কবিতাগুলি বস্তুতঃই ভাল, সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়।

রাজশেখর মহাকবি কেন? তাঁহার কি কি কবিতাগ্রন্থ আছে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার কৃত ছয়খানি কাব্যগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে বাল রামায়ণ (১) † বাল ভারত (২) কর্পূর মঞ্জরী (৩) ও বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা (৪)—এই চারি খানি গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় এবং তাহা আমরা প্রত্যক্ষও করিয়াছি। আর দুইখানি গ্রন্থের নাম জানি না; কিন্তু তাহা ছিল, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। রাজশেখর স্বকৃত বালরামায়ণ গ্রন্থের প্রস্তাবনা উপলক্ষে বলিয়াছেন, "বিদ্ধি নঃ ষট্ প্রবন্ধান্।" অর্থাৎ আমার ছয় খানি গ্রন্থ আছে, ইহা অবগত হও। অপিচ, ঔচিত্য বিচারচর্য্যা, সুভাষিতাবলী, শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, সূক্তি মুক্তাবলী, সুভাষিত হারাবলী প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থে রাজ শেখরের নামে এমন অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—যাহা রাজ শেখরের প্রোক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে নাই। অতএব, প্রাচীন ও মান্য-প্রমাণ পুরুষগণের নির্দ্দেশ অনুসারে এবং রাজশেখরের "বিদ্ধি নঃ ষট প্রবন্ধান্" এই বাক্য অনুসারে তাঁহার অন্য দুই খানি গ্রন্থ থাকা সপ্রমাণ হইতেছে।

রাজশেখর জাতিতে ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ বলেন ক্ষত্রিয়। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় তাহা নির্ণীত হয় না। রাজশেখর স্বকৃত বালরামায়ণাদি গ্রন্থে আপনাকে "উপাধ্যায়ঃ" "গুরু" ইত্যাদি বিধ ব্রাহ্মণ বোধক উপাখ্যায় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে। কেন না, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অধ্যাপনালব্ধ উপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতি-লব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার তিনি কর্পূর মঞ্জরী গ্রন্থের প্রস্তাবনায় আপনার ভার্য্যাকে চৌহান বংশীয়া বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ‡ চৌহান বংশ পৃথিবীতে বিখ্যাত ক্ষত্র বংশ। এই বংশে হাম্বীর ও পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি মহারাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজশেখর যদি ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে কি প্রকারে তিনি ক্ষত্রিয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন, অতএব, এতদনুসারে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়াই নির্ণীত হইতে পারেন। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই দ্বিবিধ বর্ণনা দেখিয়া রাজশেখর কবির

"সূর্য্যাশ্বৈর্মস জস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্।" ছন্দোমঞ্জরীর এই কবিতার দ্বারা শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের লক্ষণ ও আকার একই শ্লোকে দেখাইয়াছেন।

† বালভারত নাটকের অন্য নাম প্রচণ্ডপাণ্ডব। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না।

‡ "চাহমানকুল মৌলি মালিকা রাজশেখর কবীন্দ্র গেহিনী।" চাহমান—চৌহান ইতি প্রসিদ্ধং লোকে।

জাতি নির্ণয় করিতে অক্ষম আছেন। * রাজশেখর এই নাম, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় পক্ষেই সংগত হয় † সুতরাং নামের দ্বারা তাঁহার জাতি নিশ্চয় করা দুর্যুক্ত ভিন্ন সুযুক্ত নহে।

রাজশেখর কোন সময়ের লোক ? এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার বলিতেছেন ও বলিয়াছেন। ভাণ্ডারকার পণ্ডিত বলিয়াছেন, রাজশেখর দশম শতাব্দীর লোক। বেবর্ এই মতে মত দিয়াছেন। বিহ্লন পণ্ডিত বলেন, রাজশেখর একাদশ শতক সমাপ্তি ও দ্বাদশ শতক প্রারম্ভ এই দুয়ের অন্যতর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। আবার ভট্ট মোক্ষমূলর বলিতেছেন, বালরামায়ণ কর্ত্তা রাজশেখর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। এই সকল প্রত্নতত্ত্ববীৎ পণ্ডিত কি কি প্রমাণ উপজীবন করিয়া এই সকল নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং আমাদের এ সম্বন্ধে পৃথক্ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইতেছে।

আমরা শঙ্কর বিজয় নামক গ্রন্থে এক রাজশেখরের উল্লেখ বা বর্ণনা দেখিতে পাই। এই রাজশেখর কেবল দেশের অধিপতি ক্ষত্রিয় রাজা এবং ইনিও তদ্‌গ্রন্থে কবিতা-কুশল বা কবি বলিয়া বিখ্যাত। এ রাজশেখর ও বালরামায়ণ প্রণেতা রাজশেখর এক ব্যক্তি হইলে ইহাই নির্ণীত হইবে যে, রাজশেখর-কবি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম-কালিক। তাহার হেতু এই যে, ইনিই শঙ্করাচার্য্যের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা আমরা শঙ্করবিজয় গ্রন্থে দেখিতে পাই ‡ ফলতঃ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান

* আমাদের বিবেচনায় রাজশেখর ক্ষত্রিয় ছিলেন। উপাধ্যায় ও গুরু এই দুই বিশেষণ ক্ষত্রিয়ত্বের নিবর্ত্তক হইতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের অধ্যাপনা ছিল না বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষত্রিয়ের ছিল, ইহা পুরাতনতম উপনিষদাদি শাস্ত্রে দেখা যায়। অধুনা কালেও কেরলরাজ রাজশেখর অধ্যাপক ছিলেন, ইহা আমরা শঙ্কর বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণ হইয়া এ কলিকালে ক্ষত্রিয় কন্যার পাণিগ্রহণ করা যতদূর অসম্ভব, অধ্যাপনালব্ধ উপাধ্যায় আখ্যালাভ করা ততদূর অসম্ভব নহে। সুতরাং উপাধ্যায় শব্দ মাত্র দেখিয়া রাজশেখরকে ব্রাহ্মণ বলা অপেক্ষা, চৌহানকুল জাতা কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ অংশ দেখিয়া তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা সুসঙ্গত।

† রাজ্ঞাং শেখরঃ রাজশেখরঃ। ব্রাহ্মণ পক্ষে রাজা চন্দ্রঃ শেখরো যস্য। কর্পূর মঞ্জরীর প্রস্তাবনায় এই দ্বিতীয় পক্ষের পোষকতা দেখা যায়; যথা—"রজনী বল্লভ শিখণ্ডঃ।" কর্পূর মঞ্জরীর প্রস্তাবনায় রাজশেখর নামের পর্য্যায় শব্দ এইরূপে লিখিত থাকা দৃষ্ট হয়। এখন বিবেচনা করুন নামার্থ উভয় পক্ষে সঙ্গত হয় কি না।

‡ শঙ্কর বিজয় গ্রন্থের ২য় সর্গে "তত্রোদিতঃ কশ্চন রাজশেখর।" এইরূপ বর্ণনা আছে। পঞ্চম সর্গে "এবমেন মতিমর্ত্ত্য চরিত্রং সেবমান জন দৈন্য লবিত্রম্। কেরল ক্ষিতিপতির্হিদিদৃক্ষুঃ প্রাহিণোৎ সচিব মাদৃতভিক্ষুঃ।" "তেন পৃষ্ঠকুশলঃ ক্ষিতিপালঃ স্বেন সৃষ্ট মথ শাএবকালঃ। হাটকাযুত সমর্পণ পূর্ব্বং নাটকত্রয়মবোচদ পূর্ব্বম্॥" এতদ্ভিন্ন ১৪সর্গে—"কবিতাকুশলোঽয় কোলক্ষ্মা কমলঃ কশ্চন রাজশেখরাখ্যঃ! মুনিবর্য্য মমুংমুদা বিতেনে নিজ কোটীর নিঘৃষ্টপন্ন থাগ্রম্॥ প্রমতের্কিমুনীষ্যত্রয়ী সেত্যমুনা সংয-মিনা ততো নিযুক্তঃ॥" ইত্যাদি অনেক কথা আছে।

দ্বারা জানা যায়; শঙ্করাচার্য্যের সমকালিক নাটকত্রয় কর্ত্তা কেরলপতি রাজশেখর পৃথক ব্যক্তি।

এই ভারতবর্ষে পরপর রাজশেখর নামে তিন্ জন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নাটকত্রয় কর্ত্তা কেরল পতি রাজশেখর ১, বালরামায়ণ গ্রন্থকার রাজশেখর ২, প্রবন্ধকোষ নির্ম্মাতা রাজশেখর ৩। প্রথমোক্ত রাজশেখর শঙ্করাচার্য্যের সমকালিক এবং শেষোক্ত রাজশেখর জৈন ও সূরি উপাধ্যায় বিভূষিত। সূরি বিশেষণে বিশেষিত রাজশেখর অর্থাৎ রাজশেখর সূরি ১৩৪৭ সম্বৎ অব্দে প্রবন্ধকোষ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। অতএব প্রথমোক্ত রাজশেখর ও শেষোক্ত রাজশেখর জ্ঞাত কালত্ব বিধায় আমাদের অনুসন্ধিৎসা বিষয় নহেন, কেবল বালরামায়ণ কর্ত্তা রাজশেখর আমাদের অনুসন্ধিৎসিত, তাঁহার জন্যই আমাদের এই প্রস্তাব অবতরিত।

সূক্তি-মুক্তাবলী ও সুভাষিত-হারাবলী এই দুইগ্রন্থে রাজশেখর কবিকৃত কতিপয় স্তুতি শ্লোক সঙ্কলিত আছে। * সেই সকল শ্লোক আনন্দবর্দ্ধন ও রত্নাকর নামক বিশিষ্ট কবিদ্বয়ের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আনন্দবর্দ্ধন ও রত্নাকর কাশ্মীরাধিপতি অবন্তিবর্ম্মার সমকালিক। রাজা অবন্তি বর্ম্মা ৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সুতরাং বিবেচনা হয়, রাজশেখর কবি ৮৮৪ খৃষ্টাব্দের পর অনধিক ৫০ বৎসরের মধ্যে জীবিত ছিলেন। অপিচ, জৈন সোমদেব ৮৮১ শকে অথবা ৯৫৯ খৃষ্টাব্দে যশস্তিলক চম্পূগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাহার তৃতীয় আশ্বাসে মাঘাদি কবিগণের নামের সঙ্গে রাজশেখর কবির নামও গণিত হইয়াছে। সুতরাং সপ্রমাণ হইতেছে যে, রাজশেখর কবি জৈন সোম দেবের পূর্ব্বকালিক এবং ৮৮১ শকের কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

রাজশেখর স্বকৃত বালরামায়ণ গ্রন্থে রাজা মহেন্দ্র পালের বর্ণনা করিয়াছেন এবং বালভারত গ্রন্থে মহোদয় নামক নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, রাজশেখর কবি মহোদয়েশ্বর মহেন্দ্র পালের সমকালিক এবং তাঁহারই সভাসদ ছিলেন। ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকুইরি নামক মাসিক পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগে ১১২ পৃষ্ঠায় মহোদয় নগর বাস্তব্য মহারাজ মহেন্দ্র পালের এক দান পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। অনুমান হয়, রাজশেখর কবি স্বকৃত বালরামায়ণ গ্রন্থে এই মহেন্দ্র পালেরই বর্ণনা করিয়াছেন। এই অনুমান সত্য হইলে, রাজশেখর ও মহেন্দ্র পাল পরস্পর তুল্যকালিক ও বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। মুদ্রিত দান পত্রের প্রতিলিপি এই

"ওঁ স্বস্তি স্ত্রী মহোদয় সমাবাসিত্য নেক গোহস্ত্য শ্ব
রথপত্তি সম্পন্ন স্কন্ধাবারাৎ—পরম ভগবতী

---

* এই রাজশেখরই বালরামায়ণাদি কর্ত্তা রাজশেখর। তাহার কারণ এই যে, বালরামায়ণ বর্ণিত জলদ প্রভৃতি কবি রাজশেখর কবির পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষ, ইহা প্রোক্ত গ্রন্থের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

ভক্তো মহারাজ শ্রী ভোজদেব স্তস্য পুত্রস্তৎ পাদানু
ধ্যাতঃ শ্রীচন্দ্র ভট্টারিকা দেব্যা মুৎপন্নঃ পরম
ভগবতী ভক্তো মহারাজ শ্রীমহেন্দ্র পাল দেবঃ শ্রাবন্তী
ভুক্তৌশ্রাবন্তী মণ্ডলান্তঃ পাতি বালয়িকা বিষয় সম্বন্ধ
পানীয়ক গ্রাম সমুপগতান্ সর্ব্বানেচ যথা স্থান
নিযুক্তান্ প্রতিবাসিনশ্চ সমাজ্ঞা পয়তি—
সংবৎ ১০০ ৫০ ৫ মাঘ সুদি ১০—
নিবদ্ধম্।"

দান পত্রস্থ বৎসর সংখ্যা পৃথক লিখিত আছে বলিয়া অনুমিত হয়। পৃথক লিখিত প্রোক্ত সংখ্যা একত্র সঙ্কলন করিলে ১৫৫ মাত্র লব্ধ হয়, সুতরাং তদ্ দ্বারা মহেন্দ্র পালের যথার্থ সময় বোধগম্য করিতে পারি না। ১৫৫, ইহা যে কাহার প্রচলিত অব্দ অনুসারে লিখিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে আমরা বোধগম্য করিতে পারি না। কেহ কেহ অনুমান করেন, উহা হর্ষবর্দ্ধনের অব্দ অনুসারে লিখিত। যাহাই হউক, মহেন্দ্র দেব ও রাজশেখর যে এক সময়ের লোক, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

উক্ত দান পত্রে যে মহোদয় শব্দ আছে, তাহা কনোজের নামান্তর। রাজশেখর স্বকৃত বাল ভারতের প্রস্তাবনায় কান্যকুব্জের প্রসঙ্গে "কথমেতে মহোদয় মহানগর লীলাবতংসা বিদ্বাংসঃ সামাজিকাঃ।" ইত্যাদি প্রকার কথা বলিয়াছেন। আচার্য্য হেমচন্দ্রও স্বকৃত নামমালা গ্রন্থে "কান্যকুব্জং গাধিপুরং কৌশং কুশস্থলঞ্চতৎ।" এবং ক্রমে কনোজের নাম গণনা করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকাশ ও মেদিনী এই দুই অভিধানেও "মহোদয়ঃ কান্যকুব্জে" লিখিত আছে। বালরামায়ণের দশম অঙ্কে লক্ষণ বলিতেছেন—

"ইদং পুনস্ততোপি মন্দাকিনী পরিক্ষিপ্তং মহোদয়ং নাম নগরং দৃশ্যতে।"

রামও মহোদয় নগরকে গাধিপুর নামে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

শশ্বৎ সুধাম বসুধামহিতং দ্বিবদ্ভি
র্নৌগাহিতং ভবতি গাধিপুরং পুরস্তাৎ।
বৈদেহি দেহি শফরী সদৃশং দৃশং তৎ
অস্মিন্নিতম্বিনী নিতম্ব বহ দ্যুসিন্ধৌ॥" ইত্যাদি।

এই সকল প্রমাণ অনুসারে, দান পত্রের লিখিত মহোদয় নগর * কান্যকুব্জের নামা-

* কান্যকুব্জের মহোদয় নাম অন্বর্থ নাম। কেন না, কণোজ দেশ এক সময়ে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন ও যশোবর্ম্ম প্রভৃতি মহারাজগণ কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন এবং বাণভট্ট, ভবভূতি, বাক্পতি রাজ ও শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার আশ্রিত ছিলেন।

ন্তর, রাজা মহেন্দ্র পাল তাহার ঈশ্বর, এবং রাজশেখর কবি তাঁহার সভাসদ, ইহা সহজেই নির্ণীত হইতে পারে।

রাজশেখর কোন দেশ অলঙ্কৃত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ নির্ণয় হয় না। যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তদনুসারে তাঁহাকে মহারাষ্ট্রোৎপন্ন বলিলেও বলা যায়, চেদি দেশোদ্ভব বলিলেও বলা যায়। তিনি বাল রামায়ণের প্রস্তাবনায় আপনার প্রপিতামহ অকাল জলদ কবিকে মহারাষ্ট্র চূড়ামণি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, আবার সূক্তি মুক্তাবলী প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থস্থ শ্লোকে আপনার পূর্ব্ব পুরুষ সুরানন্দকে চেদি মণ্ডল মণ্ডন (ভূষণ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতদনুসারে তাঁহার জন্মস্থান আমাদের নিকট সন্দিগ্ধ বটে; কিন্তু তৎকৃত বিদ্ধ শাল ভঞ্জিকা ও কর্পূর মঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে চেদী দেশীয় করচুলী রাজগণের প্রচুর বর্ণনা থাকায়, অনুমান হয়, রাজ শেখর চেদি দেশীয় লোক, কোনরূপ কার্য্য বশাৎ তিনি কান্যকুব্জ মহিপালের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। যেমন বিহ্লন কবি স্বদেশ (কাশ্মীর) পরিত্যাগ করিয়া কর্ণাট রাজের আশ্রয়ে বসতি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজশেখরও স্বদেশ (চেদিদেশ) পরিত্যাগ করিয়া কান্যকুব্জে মহীপাল মহেন্দ্র দেবের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। †

রাজশেখরের কবিতা ও নাম দশরূপ, সরস্বতা কণ্ঠাভরণ, ক্ষীরস্বামী কৃত ‡ অমরটীকা, মুকুটকৃত অমরটীকা, কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পন, শাঙ্গর্ধর পদ্ধতি, সূক্তি মুক্তাবলি, সুভাষিতাবলি, সুভাষিত হারাবলী প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে এবং শ্রীকণ্ঠচরিত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বিদ্যমান আছে। উল্লিখিত গ্রন্থ নিচয় আমাদের অনুসন্ধিৎসিত রাজশেখর কবির অনেক পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং ইহা বহু পুরাতন ও বহুমাননীয়।

এতৎকৃত বাল রামায়ণে ভর্ত্তৃমেণ্ট, ভবভূতি, শঙ্কর বর্ম্মা, অকাল জলদ, তরল, সুরানন্দ ও কবিরাজ কবির নাম আছে। কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থেও মৃগাঙ্ক লেখা, কথাকার, অপরাজিত, হাল, হরিচন্দ্র, নন্দিচন্দ্র ও কোটিস কবির নাম দেখা যায়। তন্মধ্যে শঙ্কর বর্ম্মা ও অপরাজিত রাজশেখরের সমকালিক। অকাল জলদ, তরল, সুরানন্দ ও কবিরাজ কবি (যিনি রাঘব পাণ্ডবীয় কাব্যের রচয়িতা) ইহাঁরা রাজ শেখরের পূর্ব্বপুরুষ।

রাজশেখরের বিদ্ধশাল ও ভক্তিকা প্রস্তাবনায় আপনাকে "অকাল জলদস্য প্রণপ্তুঃ"

† চেদিদেশ—জব্বলপুরের নিকটস্থ "তেবুর" প্রভৃতি দেশ। করচুলি—কল্চুরী উপাখ্যাযুক্ত রাজবংশ। ইহারা প্রাচীন হৈহয় বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়।

‡ রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড় রাজার অধ্যাপক অন্য এক ক্ষীর পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। সে ক্ষীর ও অমর টীকাকার ক্ষীর স্বামী এক ব্যক্তি নহে। অমর টীকাকার ক্ষীর ভোজদেবের নাম গ্রহণ করায় জয়াপীড়ের অধ্যাপকতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন।

বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তদনুসারে অকাল জলদ কবি তাঁহার প্রপিতামহ। বালরামায়ণ প্রস্তাবনায় দেখা যায়, সুরানন্দ, তরল ও কবিরাজ রাজশেখরের বংশ পুরুষ, তাঁহার জননীর নাম শীলবতী এবং তাঁহার বংশের নাম যাবাবর। অর্থাৎ তিনি যাবাবর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * রাজশেখরের বালরামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে রঘুবংশোদ্ভব মহেন্দ্র পাল দেবকে আপনার শিষ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তাঁহার অধ্যাপনা উপলক্ষেই কান্যকুব্জ বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঔচিত্য বিচারচর্য্যা নামক গ্রন্থে একটী শ্লোক আছে, তদ্দৃষ্টে অনুমান হয়, রাজ শেখর শেষ দশায় কাশীবাস করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম চর্য্যায় সন্নিবিষ্ট থাকিয়া জীবনের শেষ ভাগ ক্ষপিত করিয়াছিলেন। যথা—

"কর্ণাটীদশনাঙ্কিতঃ শিতমহারাষ্ট্রীকটাক্ষাহতঃ
প্রৌঢ়াস্ত্রীস্তনপীড়িতঃ প্রণয়ণীভ্রূভঙ্গবিত্রাসিতঃ।
সাটী বাহু বিচেষ্টিতশ্চ মলয়স্ত্রীতর্জনীতর্জ্জিতঃ
সোঽয়ং সম্প্রতি রাজশেখরঃ কবিরহোবারাণসীং বাঞ্ছতি॥"

উপসংহার।

আমরা এই প্রস্তাব লেখার পর সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ কারল কাপেলার দ্বারা প্রকাশিত রাজশেখরকৃত প্রচণ্ড পাণ্ডব নাটক প্রাপ্ত হইলাম। ইহার দুই অঙ্ক মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার প্রস্তাবনা যথা—

নমিত মুরলমৌলিঃ পাকলো মেকলানাং
রণকলিত কলিঙ্গঃ কেলি ক্লকেরলেন্দ্রেঃ।
অজনি জিত কুলূতঃ কুন্তলানাং কঠোরো
হঠবিহত মঠশ্রীঃ শ্রীমহীপাল দেবঃ॥

তেন চ রঘুবংশ মুক্তামনিনার্য্যাবর্ত্ত মহারাজাধিরাজেন শ্রী নির্ভয় নরেন্দ্রনন্দনে নারা ধিতা সভাসদঃ। সর্ব্বানেষ বোগুণাকরঃ সমাহুয় সপ্রশ্রয়ং বিদ্যাপয়তি৭ বিদিত মেতক্র ভবতাং যদুত নাট্যাচার্য্যেণ রঙ্গবিদ্যাধরেণ প্রতিক্ষাতম্।

ইহাতে কবি আপনাকে রঘুবংশীয় মহিপাল বা মহেন্দ্রপালের সভাসদ্ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই নৃপতি নির্ভয় নরেন্দ্রর পুত্র ও আর্য্যবর্ত্তের সম্রাট। মহেন্দ্র পালের রাজধানী মহোদয় বা কান্যকুব্জ।

* অকাল জলদ কবির কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল ২। ১ টী খণ্ড কবিতা সূক্তি মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়। কবিরাজ কবির রাঘব পাণ্ডবীয় গ্রন্থ অদ্যাপি পঠিত হইতেছে।

রাজশেখর প্রচণ্ডপাণ্ডবের প্রস্তাবনায় সগর্ব্বে আপনাকে দ্বিতীয় ভবভূতি বলিয়াছেন। যথা—

"ততঃ স্থিতো যো ভবভূতিরেখয়া
স বর্ত্ততে সংপ্রতি রাজশেখরঃ॥"

শ্রীযুক্ত বামণশিররাম আপ্তি লিখিয়াছেন, মহেন্দ্র পাল ৭৬১ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং রাজশেখরও তাঁহার সমসাময়িক। ইহাঁর ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভবভূতি বর্ত্তমান ছিলেন

শ্রী রামদাস সেন।

হেঁয়ালি নাট্য।*

দৌলতচন্দ্র। কানাই।

দৌ। হৃদয় যখন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন বক্তৃতা করা কি সহজ? একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা সম্বন্ধে আমি যতই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম আমার উৎসাহ ততই প্রবল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, সভায় দাঁড়িয়ে ততই আমি অনর্গল বল্‌তে লাগ্‌লুম, সভাপতি ঘুমিয়ে পড়াতে আমাকে নিষেধ করবার কেউ রইল না। অবশেষে দেখ্‌লুম শোন্‌বার লোকও বড় একটা কেউ নেই, সেজের বাতিগুলো শুভ্র অশ্রুধারায় বিগলিত কলেবর হয়ে ক্রমেই অন্তিমের নিকটবর্ত্তী হতে লাগ্‌ল। কিন্তু আমার বাগ্মিতা-শিখা সমান ভাবেই জ্বল্‌তে লাগল্; শেষ কালে দুজন ছোক্‌রা এসে জোর করে আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বাড়িতে ফিরে এসে আমার কালাচাঁদ খানসামাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জোর করে বসিয়ে বাকি বক্তৃতাটুকু তাকে শুনিয়ে তবে রাত্তিরে একটু ঘুম হয়। সে দিন আমার এত উৎসাহ হয়েছিল।

কানাই। বটে, তা হবারই কথা। তা আপনি কি বলেছিলেন?

দৌ। আমি বলেছিলেম যে দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার নেই সে দেশের লোকেরা সকাল সকাল মারা পড়ে, কারণ ব্যামো হলে তাদের সেবা করবার কেউ থাকে না। অকাল মৃত্যু যে কি শোচনীয় ঘটনা তা আমি সকলকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেম। আমি বল্লেম "দেখ ভাই, তোমার যে শিশু সন্তানটি সবেমাত্র বাবা বল্‌তে, হামাগুড়ি দিতে এবং দাড়ি ধ'রে টান্‌তে শিখেছে আজ হঠাৎ যদি ফিরে গিয়ে দেখ সে হাত পা খিঁচিয়ে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরে প'ড়ে রয়েচে তা হলে তোমার মনে কি রকম ভাবের উদয় হয়।"

---

* গত বারের হেঁয়ালি-নাট্যের উত্তর বাসনা। শ্রীযুক্ত অনন্ত লাল ঘোষ ও জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

যুবক শ্রোতাদের ডেকে বল্লুম "হে যুবক, এখনি যদি তোমার বাড়ি থেকে একটি দূত উর্দ্ধশ্বাসে এসে তোমাকে খবর দেয় যে তোমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর মুখকমল দিয়ে অনবরত রক্ত উঠ্‌চে, তার কমলায়ত লোচন দুটি একেবারে উল্টে গিয়েছে, এবং তার কোকিল বিনিন্দিত কণ্ঠ থেকে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শ্রুতিগোচর হচ্চে না, তা হলে তুমি কি কর!" এই যেমন বলা অমনি পাঁচ সাতটা লোক এসে আমার গলা চেপে ধর্‌লে। আমার উন্মত্তকারী বক্তৃতা শুনে তাদের যে কতদূর পর্য্যন্ত আবেগ উপস্থিত হয়েছিল তাদের দৃঢ় মুষ্টির প্রভাবে আমি অত্যন্ত স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারলুম। সেখেনে আর অধিক কিছু না বলে বাড়ি ফিরে এসে কালাচাঁদকে ঘুম থেকে জাগিয়েই আমি বল্লুম "হে সভাপতি এবং হে কালাচাঁদ, হঠাৎ যদি এখনি তোমার বাড়িথেকে চিঠি আসে যে, তোমার যুবক জামাইটি কাল ভোরের বেলায় ওলাউঠো হয়ে হিম হয়ে মরে গেছে এবং তোমার ১২ বৎসরের মেয়েটি বিধবা হয়েচে তা হলে তুমি কি কর!" কালাচাঁদ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে—আমিও খানিকক্ষণ আর কথা কইতে পারলুম না। আমার নিজের বক্তৃতা-শক্তির প্রভাবে আমার নিজের কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, আমি অনেকক্ষণ মুখনত করে চুপ করে কেবলিই অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগ্‌লুম। কালাচাঁদ তার পর দিনই আমার কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গিয়েচে। একান্নবর্ত্তী পরিবার না থাকা এতই শোকাবহ, এতই মর্ম্ম বিদারণকারী, এতে হৃদয় এতই ভীত, স্তম্ভিত, চকিত এবং বিস্ফারিত এবং বিদ্রাবিত হয়। কানাই কি বল?

কা। আজ্ঞে তা হয় বটে। আমার এখনিই হচ্চে।

দৌলত। কেবল তাই নয় কানাই। আমি বলেছিলেম স্বার্থত্যাগ শিক্ষার একমাত্র উপায় একান্নবর্ত্তী পরিবার। এরূপ পরিবারে পরের অর্থেই অধিকাংশ লোকের জীবন নির্ব্বাহ হয় স্বার্থের কোন সম্ভাবনা বা আবশ্যক থাকে না। চতুর্দ্দিকের খবরের কাগজে আমার বক্তৃতা অত্যন্ত রাষ্ট্র হয়ে গেছে—তারা সকলেই বলেচে দুঃখের বিষয় দৌলত বাবুর পরিবার কেউ নেই তিনি একলা! (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ)

কা। আহা, এমন মহৎ ব্যক্তিরও এমন দশা হয়!

জয়নারায়ণের প্রবেশ।

জয়। জয় হোক্‌ বাবা। আমি তোমার পিসে।

দৌ। সে কি মশায়, আমার ত পিসি নেই।

জয়। না, তাঁর কাল হয়েচে বটে।

দৌ। পিসি কোন কালেই যে ছিলেন না।

জয়। (ঈষৎ হাসিয়া) সে কি ক'রে হয় বাবা! তা হলে আমি তোমার পিসে হলুম কি করে! (কানাইয়ের প্রতি) কি বলেন মশায়!

কানাই। তা ত বটেই!

দৌ। যে আজ্ঞে। তা আপনার কি অভিপ্রায়ে আগমন!

জয়। অভিপ্রায় তেমন বিশেষ কিছুই নেই। শুনলুম আমরা পৃথক হয়ে আছি বলে চারিদিকের খবরের কাগজে ভারি নিন্দে করচে, তাই তোমার সঙ্গে একত্রে বাস করতে এসেচি।

দৌ। আপনার সম্পত্তি কি আছে?

জয়। সে জন্যে বেশী ভেবো না বাবা, আমার কিছুই নেই কোন বালাই নেই, কোন উৎপাৎ নেই। কেবল এক খুড়তুতো ভাই আছে। তা সেও এল বলে।

দৌ। বটে! তা তাঁর কিছু আছে।

জয়। কিছু না, কোন ঝঞ্ঝট না। কেবল দুই স্ত্রী ও চারটি শিশু সন্তান। তারাও এল বলে। এতক্ষণে এসে পড়ত; যাত্রা করবার সময় তার দুই স্ত্রীতে চুলোচুলি বেধে গেছে তাই কিছু দেরী হবার সম্ভাবনা।

দৌ। কানাই কি করা যায় হে! (অত্যন্ত কাতর)

জয়। তোমাকে কিছুই করতে হবে না বাবা, তারা আপনারাই আস্‌বে ভাবনা কি দৌলৎ! অত অল্পে কাতর হোয়ো না। তারা আজ সন্ধ্যের মধ্যেই এসে পৌছবে।

রামচরণের প্রবেশ ও ভূমিষ্ঠ হইয়া দৌলৎকে প্রণাম।

রাম। মামা, তোমার বক্তৃতা কাগজে পড়ে অত্যন্ত উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছি।

দৌ। কে হে বাপু তুমি কে?

রাম। আজ্ঞে আমি আপনারই ভাগ্নে রামচরণ। ইষ্টেষনে একটি লোক পাঠিয়ে দিন, সেখেনে একটি পুঁটুলি আর আমার বুড়ি মাকে রেখে এসেচি। শীঘ্র নিয়ে আসুক।

দৌ। এখেনে তোমরা কি কর্ত্তে এসেচ?

রাম। বাস কর্ত্তে এসেচি।

দৌ। তোমাদের বাসস্থান কি নেই?

রাম। অম্‌নি একরকম আছে বটে। কিন্তু সেখেনে থেকে স্বার্থত্যাগ শিক্ষা হয় না মামা। তোমার হৃদয়ভেদী বক্তৃতা প'ড়ে আমরা সকলে মিলে এই স্থির করেচি যে আজ থেকে তোমার স্বার্থকেই আমাদের নিজের স্বার্থজ্ঞান করব। মামা, তোমার দিব্য, তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি—তুমি নিশ্চয় জেনো, তোমাকে আমরা আর কখনই ছেড়ে যাব না।

দৌ। (অত্যন্ত ভীত ভাবে) কানাই!

কা। আজ্ঞে এমন ভাগ্নে ত সচরাচর দেখা যায় না। উনি যে কথা বল্‌চেন সে

মস্ত কথা! উনি বল্‌চেন আজ থেকে আপনার স্বার্থেই ওঁর স্বার্থ। একান্নবর্ত্তী পরিবারের এই ত মহৎ শিক্ষা। এ সকল কথা আপনিত বলেই রেখেছেন। আমি আর অধিক কি বল্‌ব!

দৌ। (সনিশ্বাসে) আমি বলেছি বটে।

নিতাইয়ের প্রবেশ।

নি। দাদা চাক্‌রি ছিল, চাক্‌রি ছেড়ে এলুম। ভাবলুম এমন উপদেশ যে দিয়েছে সেই দৌলৎ দাদাকে আর ছাড়া হবে না। চাক্‌রি কিসের জন্যে? ওত কেবল স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ থেকে দাদার আশ্রয়ে থাক্‌ব দাদা যা খেতে পরতে দেবেন তাতেই সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন করব। বিশেষ, দাদা বর্ত্তমান থাক্‌তে সামান্য চাকরী করলে দাদার নিন্দে হয়, সে সহ্য কর্ত্তে পারব না! ওরে কে আছিস্ রে! ঝট্ করে দুটো ডাব পেড়ে নিয়ে আয় দেখি; বড় পিপাসা লেগেচে!

নদেরচাঁদ।

ন। এই লও খুড়ো, আমার সমস্ত স্বার্থ এই তোমার পদতলে বিসর্জ্জন দিলেম। এই আমার একটা ভাঙ্গা বোক্‌নো, একটা থেলো হুঁকো আর এক্‌টা বেড়াল ছানা। এর মধ্যে এই দুটো পৈতৃক সম্পত্তি আর এই বেড়াল ছানাটি আমার নিজের উপার্জ্জন। তুমি যে দুঃখ করবে আমার ভাইপো নদের চাঁদ কেবল নিজের স্বার্থ নিয়েই আছে দৌলৎখুড়োর কাছে একবারো আসে না, সে কথা আর বল্‌বার যো নেই। তোমার এইখেনেই আমি লেগে রইলুম।

দরজির প্রবেশ।

দৌলৎ। তুমি আমার কে হও?

দরজি। আজ্ঞে আমি দরজি, আপনার গায়ের মাপ নিতে এসেচি।

দৌলৎ। তুমি যাও। এখন আমার হাতে টাকা নেই আমি কাপড় করাতে পারব না।

নদেরচাঁদ। খলিফে জি, তুমি যাও কোথাও! আমার গায়ের মাপটা নেও। দেখ, খুড়োর গায়ে যেমন ফুলকাটা ছিটের জামা দেখ্‌চি, ঠিক অম্‌নি দু যোড়া জামা আমার চাই। যদি বেশ ভাল রকম তৈরি করে দিতে পারত খুড়ো তোমাকে খুসি করে দেবেন। বুঝেছ খলিফে জি।

দরজি। যে আজ্ঞে। (গায়ের মাপ লওন)

বালক সমেত পরেশনাথের প্রবেশ।

প। (দৌলৎকে প্রণাম করিয়া বালকের প্রতি) তোর জ্যেঠা মশায়কে প্রণাম কর। (দৌলতের প্রতি) দাদা এই লও তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

দৌলত। (সবিস্ময়ে) আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

প। তা নয় ত কি। যাকে চলিত বাঙ্গলায় বলে ভাইপো। ভাইয়ের ছেলে হল ভ্রাতুষ্পুত্র। এর ত আর কোন ভুল নেই। (কানাইয়ের প্রতি) কি বলেন মশায়।

কানাই। তা ত বটেই!

প। দাদা যে একেবারে অবাক্ হয়ে গেলে। পিতৃ শব্দের ষষ্ঠিতে হয় পিতুঃ, মাতৃ-শব্দের ষষ্টিতে হয় মাতুঃ—কেমন কি না?

কানাই। তা ত বটেই।

প। তেমনি ভ্রাতৃশব্দের ষষ্ঠিতে হয় ভ্রাতুঃ এতে অত আশ্চর্য্য হলে চল্‌বে কেন দাদা! ভ্রাতুঃ শব্দের উপর পুত্র শব্দের যোগ হলেই সন্ধির নিয়মানুসারে ভ্রাতুষ্পুত্র হবেই! আমি ত অন্যায় কিছু বলি নি! কি বলেন মশায়!

কানাই! ঠিক কথা!

পরেশ। অতএব অন্য প্রমাণের আর আবশ্যক নেই এই নিন আপনার ভাইপো।

কানাই। আপনার ছেলেটি কি করেন?

পরেশ। ওকে আমি নিজে পড়াচ্ছিলুম। হ্রস্ব ই পর্য্যন্ত পড়া এগিয়েছিল দীর্ঘ ঈতে এম্‌নি আটকে পড়ল যে কিছুতেই আর সেটা উত্তীর্ণ হতে পারলে না! আমি ভাব-লুম দৌলদ্দার মত যার এমন জেঠা আছে সে ছেলের লেখা পড়া শিখে দরকার কি! তা ছাড়া যে বেটার হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নেই তার পক্ষে বাবা জ্যেঠা দুই সমান। কেমন কি না?

কানাই। আজ্ঞে হাঁ, সমান বই কি।

পরেশ। দাদা ওঁর বক্তৃতাতে বলেছেন যে নিজের ক্ষুধা হেয় জ্ঞান করে পরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করার যে সুখ সে কেবল একান্নবর্ত্তী পরিবারেই সম্ভব। কাগজে এই কথাটা পড়েই আমি ঠাওরালুম নিশ্চয়ই দাদা এ সুখ অনেক দিন পাননি, যদি কখন পেয়ে থাকেন ত সম্ভবতঃ সেটা বিস্মৃত হয়েচেন। নিতান্ত মমতা পরবশ হয়ে এই ছেলেটিকে দাদার কাছে নিয়ে এলুম; রাবণের চুলো যদি কোথাও জ্বলে ত সে এই ছেলেটির পেটের মধ্যে।

নটবরের প্রবেশ।

নট। (দৌলতের কান মলিয়া) কিরে শালা। এত দিন পরে বুঝি তোর শালাকে মনে পড়েছে। শুন্‌লুম না কি সভায় দাঁড়িয়ে শালার শোকে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েচিস্।

দৌ। (সরোষে) কেহে তুমি বেল্লিক! ভদ্রলোকের কানে হাত দাও!

নট। ভগ্নীপতির কান মলব না ত কি কান ভাড়া করে এনে মল্‌ব! কি বলেন মশায়!

কানাই। কথাটা ঠিক বটে!

দৌ। কি বলহে কানাই! আমার স্ত্রীই নেই ত আমার শালা কিসের?

নট। তোমারি যেন স্ত্রী নেই তাই বলে আর কারো স্ত্রী নেই! একটু ভেবে দেখনা।

দৌ। স্ত্রী ত অনেকেরই আছে, তা আর ভাব্‌তে হবে কি!

নট। (হাসিয়া) তবে।

দৌ। (সরোষে) তবে কি! তুমি আমার শালা কোন্ সম্পর্কে?

নট। তোমার দাদার সম্পর্কে। তোমার দাদা ত আছেন, এবং তাঁর স্ত্রীও আছেন, এর ত আর কোন সাক্ষী সাবুদের আবশ্যক নেই! আচ্ছা আমার গা ছুঁয়ে বল দেখি তোমার দাদা এবং তোমার বৌঠাকরুণ আছেন কি না।

দৌ। আমি ত জান্‌তেম নেই, কিন্তু আজকের যে রকম দেখ্‌চি তাতে—

নট। থাক্, তা হলেই ত চুকে গেল। বেশি বকাবকিতে কাজ কি। ভদ্রলোকরা বসে আছেন এঁদের সাক্ষাতে কে শালা কে শালা নয় এ নিয়ে তর্ক করা ভাল দেখায় না। দৌলতের পশ্চাৎ হইতে তাকিয়া টানিয়া লইয়া) একটু জিরোনো যাক্। এক ছিলিম তামাক ডাক।

ফলমূল মিষ্টান্ন লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। (দৌলৎকে) আপনার জল খাবার।

দৌ। (সরোষে) বেটা তোকে এখেনে কে খাবার নিয়ে আস্‌তে বলেচে! বাড়ি ভিতর নিয়ে যা!

পরেশ। তাতে দোষ হয়েছে কি! (ভৃত্যের প্রতি) ওরে তুই দিয়ে যা এদিকে দিয়ে যা। (থালা লইয়া আহার আরম্ভ) দৌলতের বিস্মিত বিশুষ্ক বিমর্ষ গম্ভীর ভাব)।

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

১মা। বাবা দৌলৎ, তুই এমন কথা কাগজে নিক্‌লি কি করে?

২য়া। আমরা তোর আপনার লোক থাক্‌তে তোর ভাবনা কিসের বাবা!

৩য়া। আমরা মাসী থাকতে ব্যামোর সময় তোর সেবা হয় না এ কি কথা দৌলৎ।

৪র্থী। তোর শত্রু যে সেই মরুক! তোর বলাই নিয়ে আমরা তোর পিসিরা মরি। বালাই তুই মরবি কেন।

৫মা। এমন কথা কাগজে নেকে! (সকলে মিলিয়া উর্দ্ধস্বরে ক্রন্দন।)

ষষ্ঠা। আহা বাছা আমার রোগা হয়ে গেছে বটে। তা এবার আর আমরা তোকে ছাড়ব না। (সকলে মিলিয়া কেহ দৌলতের পিঠে হাত বুলায় কেহ মাথায় হাত বুলায়, দাড়ি ধরিয়া মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখে ইত্যাদি।)

দৌলৎ। (করযোড়ে) মা ঠাকরুণগণ, আমার শরীর বিশেষ ভাল আছে, কোন রোগ নেই কিছু ভেবো না, তোমরা বাড়ি যাও। আমি দিব্যি করে বল্‌চি কাগজে আর কোন কথা লিখ্‌ব না।

সকলে। আহা বাছার কি মিষ্টি কথা! তা আমরা এই খেনেই রইলুম—তোর আর কোন ভাবনা নেই।

(চুলের মুষ্টি ধরিয়া বিধুভূষণকে লইয়া দুই স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

১মা স্ত্রী। পোড়ার মুখো তোমার মরণ হয় না!

২য়া স্ত্রী। (সবলে চপেটা ঘাত করিয়া) কেমন লাগ্‌ল?

দৌলৎ। (ব্যস্ত হইয়া) এরা কে!

জয়নারায়ণ। বাবা ব্যস্ত হোয়োনা, আমার সেই খুড়তুতো ভাই এসে পৌঁছেচেন।

১ম। ও আবাগের বেটা ভূত!

২য়া। মার ঝ্যাঁটা মার ঝ্যাঁটা।

দৌলৎ। (সকাতরে) ভাই কানাই!

কা। একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাক্‌লে সহিষ্ণুতা শিক্ষা হয়।

১মা। মিন্সে বুড়ো বয়সে তুমি আক্কেল খুইয়ে বসেচ—

২য়া। ওগো এত লোকের এত সোয়ামি মারা পড়চে কেবল যমরা কি তোমাকেই ভুলে বসে আছে!

দৌলৎ। বাছারা একটু ঠাণ্ডা হও।

উভয়ে। ঠাণ্ডা হব কি রে মিন্সে! তুই ঠাণ্ডা হ তোর সাত পুরুষ ঠাণ্ডা হয়ে মরুক!

দৌলৎ। কানাই!

কানাই। আজ আপনার চারদিকে এই বিপুল পরিবার দেখে আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এতদিন আপনার কাছে আমি ছিলাম আজ আর আমাকে আপনার আবশ্যক নেই। আমি এই বেলা পালাই।

(প্রস্থান।)

দৌলৎ। (উদ্ধস্বরে) কানাই তুমি আমাকে কোথায় রেখে যাও। (গমনোদ্যম)

(সকলে মিলিয়া দৌলৎকে চাপিয়া ধরিয়া) যাও কোথায়!

১। মামা।

২। খুড়ো।

৩। দাদা তোমাকে ছাড়ব না।

৪। শালা তুই পালাবি কোথায়।

৫। বাবা তুমি কাহিল হয়ে গেছ, উঠে দাঁড়িয়োনা।

৬। আন্‌রে একটা পাখা আন্‌ বাবাকে একটু বাতাস করি।

৭। বাবা একটু জল খাবে কি? মুখ শুকিয়ে গেছে।

৮। ওরে ঐ জান্‌লাটা বন্ধ করে দে, বাতাস আসবে বাবার সর্দ্দি হবে

৯। বাবা তোমার মাথা ধরেছে কি! মাথা টীপে দেব?

১০। বাবা, তুমি অমন গোঁ গোঁ করচ কেন?

১১। বুঝি দানোয় পেয়েচে?

দৌলৎ। (ক্ষীণ কণ্ঠে) একটা না অনেক গুলো।

পত্র।

(বাসস্থান পরিবর্ত্তন উপলক্ষে)

বন্ধুবর,

দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়,
ঢুকেছে লোকের ভীড়,
বকুণীর বিড়্‌বিড়্‌
গেছে থেমে থুমে।
আপনারে কর্যে জড়
কোণে বস্যে আছি দড়,
আর সাধ নেই বড়
আকাশ কুসুমে!
সুখ নেই, আছে শান্তি,
ঘুচেছে মনের ভ্রান্তি,
"বিমুখা বান্ধবা যান্তি"
বুঝিয়াছি সার,—
কাছে থেকে কাটে সুখে
গল্প ও গুড়ুক ফুঁকে,
গেলে দক্ষিণের মুখে
দেখা নেই আর!
কাজ কি এ মিছে নাট,
তুলেছি দোকান-হাট,
গোলমাল চণ্ডিপাঠ,
আছি ভাই ভুলি!

তবু কেন খিটিমিটি,
থেকে থেকে কড়া চিঠি,
থেকে থেকে দু-চারিটি
চোখা চোখা বুলি!
"পেটে খেলে পিঠে সয়"
এইত প্রবাদে কয়,
ভুলে যদি দেখা হয়
তবু সয়্যে থাকি!—
হাত করে নিশ্‌পিশ্‌
মাঝে রেখে পোষ্টাপিষ্‌
ছাড় শুধু গোটা ত্রিশ
শব্দভেদী ফাঁকি!
বিষম উৎপাৎ এ কি!
হা রে নারদের ঢেঁকি!
শেষকালে এ যে দেখি
ঝগড়ার মত!
মেলা কথা হল জমা,
এইখেনে দিই Comma,
আমার স্বভাব ক্ষমা,
নির্ব্বিবাদ ব্রত!
কেদারার পরে চাপি
ভাবি শুধু ফিলজাফি,

নিতান্তই চুপিচাপি
মাটির মানুষ !
লেখা ত লিখেছি ঢের,
এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের
রঙ্গিন্ ফানুষ !
আঁধারের কূলে কূলে
ক্ষীণ শিখা মরে দুলে,
পথিকেরা মুখ তুলে
চেয়ে দেখে তাই !—
নকল-নক্ষত্র হায়
ধ্রুব তারা পানে ধায়,
ফিরে আসে এ ধরায়
একরত্তি ছাই !
সবারে সাজে না ভাল ;
হৃদয়ে স্বর্গের আলো
আছে যার সেই জ্বালো
আকাশের ভালে,
মাটির প্রদীপ যার
নিভে-নিভে বার বার,
সে দীপ জলুক্, তার
গৃহের আড়ালে !
যারা আছে কাছাকাছি,
তাহাদের নিয়্যে আছি,
শুধু ভালবেসে বাঁচি
বাঁচি যত কাল।
আশ কভু নাহি মেটে
ভূতের বেগার খেট্যে,
কাগজে আঁচড় কেট্যে,
সকাল বিকাল !
কিছু নাহি করি দাওয়া,
ছাতে বসে খাই হাওয়া
যতটুকু পড়্যে-পাওয়া
ততটুকু ভাল—
যারা মোরে ভালবাসে
ঘুরে ফির্যে কাছে আসে,
হাসি খুসি আশে পাশে
নয়নের আলো !
বাহবা যে জন চায়
বস্যে থাক্ চৌমাথায়,
নাচুক্ তৃণের প্রায়
পথিকের স্রোতে !
পরের মুখের বুলি
ভরুক্ ভিক্ষার ঝুলি,
নাই চাল্ নাই চুলি
ধূলির পর্ব্বতে !
বেড়ে যায় দীর্ঘ ছন্দ,
লেখনী না হয় বন্ধ,
বক্তৃতার নাম গন্ধ,
পেল্যে রক্ষে নেই !
ফেনা ঢোকে নাকে চোখে,
প্রবল মিলের ঝোঁকে
ভেসে যাই এক রোখে,
বুঝি দক্ষিণেই !
বাহিরেতে চেয়্যে দেখি,
দেবতা-দুর্য্যোগ এ কি !
বস্যে বস্যে লিখিতে কি
আর সরে মন !
আর্দ্র বায়ু বহে বেগে,
গাছপাল ওঠে জেগ্যে,
ঘন ঘোর স্নিগ্ধ মেঘে
আঁধার গগণ !
বেলা যায়, বৃষ্টি বাড়ে,
বসি শালিশার আড়ে

ভিজে কাক ডাক ছাড়ে
মনের অসুখে !
রাজ পথ জনহীন,
শুধু পান্থ দুই তিন
ছাতার ভিতরে লীন
ধায় গৃহ মুখে !
বৃষ্টি-ঘেরা চারিধার,
ঘন শ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ, আর
ঝর ঝর পাতা,
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে
গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে
আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার
বৃন্দাবন-অভিসার,
একাকিনী রাধিকার
চকিত চরণ।
শ্যামল তমাল তল,
নীল যমুনার জল,
আর, দুটি ছল ছল
নলিন নয়ন !
এ ভরা বাদর দিনে
কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিন্যে
মন যেতে চায় !
বিজন যমুনা-কূলে
বিকশিত নীপ মূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে
বিরহ ব্যথায় !
দোহাই কল্পনা তোর,
ছিন্ন কর্ মায়া ডোর,
কবিতায় আর মোর
নাই কোন দাবী ;
বিরহ, বকুল, আর
বৃন্দাবন স্তূপাকার,
সে গুলো চাপাই, কার
স্কন্ধে, তাই ভাবি !
এখন ঘরের ছেলে
বাঁচি ঘরে ফিরে গেল্যে,
দুদণ্ড সময় পেল্যে
নাবার খাবার।
কলম হাঁকিয়ে ফেরা
সকল রোগের সেরা,
তাই কবি-মানুষেরা
অস্থি চর্ম্ম সার !
কলমের গোলামীটা
আর নাহি লাগে মিঠা,
তার চেয়ে দুধ ঘিটা
বহুগুণে শ্রেয় !
সাঙ্গ করি এইখানে ;
শেষে বলি কানে কানে,
পুরোণো বন্ধুর পানে
মুখ তুল্যে চেয়্যো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পদার্থ কয় জাতি।

গুণভেদে জাতিভেদ স্বীকার করা হইয়া থাকে। গন্ধকের গুণ লৌহের গুণ হইতে ভিন্ন—গন্ধক ভঙ্গশীল, লৌহ কঠিন ; গন্ধক সহজেই ধুগলিয়ামাকার ধারণ করে, লৌহ

ধূমাকার করা দূরে থাকুক শুদ্ধ গলাইতে এত উত্তাপের প্রয়োজন হয় যে তাহা সহজে কল্পনা করা যায় না; গন্ধক হইতে অনেকগুলি অম্ল, দ্রাবক প্রস্তুত করা যায়, লৌহ হইতে সেরূপ প্রকৃতির কেবল একটীমাত্র পদার্থ (ফেরিক আসিড্) উৎপন্ন হয়। এইরূপ গুণের প্রভেদ আছে বলিয়া গন্ধককে একজাতীয় বস্তু আর লৌহকে আর একজাতীয় বস্তু বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সকল প্রকার গুণভেদে প্রকৃত জাতিভেদ প্রতিপাদিত করে না; এক গন্ধকই দেখ তিন প্রকার হইতে পারে—প্রথমতঃ সাধারণ গন্ধক, ইহা ভঙ্গশীল ও ইহার দানাগুলি অষ্ট কোণ বিশিষ্ট; দ্বিতীয়তঃ স্ঁচের ন্যায় লম্বা লম্বা দানা বিশিষ্ট গন্ধক ইহাও ভঙ্গশীল; আর তৃতীয়তঃ স্থিতিস্থাপক গন্ধক ইহা রবরের ন্যায় টানিলে বৃদ্ধিপায়, পরে আবার পূর্ব্বায়তন ধারণ করে। গন্ধক দেখা যাইতেছে তিনপ্রকারের অথচ এই তিন প্রকারের গন্ধককেই আমরা একজাতীয় পদার্থ বলিয়া থাকি। তবে কিপ্রকার গুণ ভেদে প্রকৃত জাতিভেদ প্রতিপন্ন হয়? প্রশ্নটী বড় সহজ নহে। একটী ত্রিভুজ আর একটী চতুর্ভুজ এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ অনেক, কত প্রভেদ তাহা জ্যামিতি দেখিলেই বুঝা যায়। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে যতই কেন প্রভেদ থাকুক না কেন, সমুদয় এক কথাতে বলা যাইতে পারে—ত্রিভুজের তিন বাহু; চতুর্ভুজের চারি বাহু। অর্থাৎ ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের মধ্যে যত রকম প্রভেদ বাহির কর না কেন, তাহা ঐ এক কথাতে যে প্রভেদ দেখান গিয়াছে উহা হইতে উৎপন্ন—উহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কোন নূতন প্রভেদ বাহির হইবে না। এক্ষণে দেখ গন্ধক ও লৌহ ইহাদিগের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা এক কথায় বলিবার যো নাই; ইহাদিগের মধ্যে কত রকম বিভিন্ন বিভিন্ন প্রভেদ বাহির হইয়াছে এবং আরও কত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ত্রিভুজে চতুর্ভুজে যে রূপ প্রভেদ লৌহে গন্ধকে সেরূপ প্রভেদ নাই। পূর্ব্বটী আমাদিগের রচিত প্রভেদ অর্থাৎ ত্রিভুজ চতুর্ভুজ আমরা গড়াই আর দ্বিতীয়টী প্রাকৃতিক প্রভেদ অর্থাৎ লৌহ গন্ধক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। প্রাকৃতিক জাতিগুলির প্রভেদ অতি গভীর, তাহার ইয়ত্তা হয় না—পুরুষানুক্রমে প্রাকৃতিক জাতিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহাদিগের মধ্যে কতই নূতন নূতন প্রভেদ দেখিতে পাইবে।

প্রকৃতির মধ্যে আমরা নানা রূপ জাতি দেখিতে পাই; কিন্তু আমাদিগের বুদ্ধি এতই ক্ষুদ্র যে যাহা আমরা প্রথমতঃ জাতিগত প্রভেদ বলিয়া মনে করি, কালক্রমে তাহা রূপগত প্রভেদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই বিষয়ের উদাহরণ দিতে আমাদিগের অধিক দূর যাইতে হইবে না—এক সময়ে রাসায়নিক পণ্ডিতগণের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে জন্তু কিম্বা উদ্ভিদ কোন জীবের দেহ হইতে উৎপন্ন পদার্থ একপ্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ; অর্থাৎ চিনি গঁদ কুইনিন প্রভৃতি বস্তুর প্রকৃতি জল প্রস্তর চূর্ণ প্রভৃতির প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বুয়োলর নামে একজন জার্ম্মন পণ্ডিত একটী

বিষয় আবিষ্কার করেন, তাহাতে উক্ত মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইউরিয়া বলিয়া একটী বস্তু পূর্ব্বে কেবল জীবদেহ হইতেই পাওয়া যাইত, উক্ত পণ্ডিত এক্ষণে তাহা খনিজ (যাহা জীবদেহ হইতে প্রাপ্ত নহে) দ্রব্য * হইতে প্রস্তুত করিলেন। প্রথম এই আবিষ্কারের পর অন্যান্য পণ্ডিত উক্ত প্রকার আরও অনেক বিষয় আবিষ্কার করিলেন—অতএব এক্ষণে আর রাসায়নিক পণ্ডিতেরা দেহজ ও খনিজ এই দুই প্রকার বস্তুর মধ্যে জাতিগত প্রভেদ স্বীকার করেন না—তাঁহারা বলেন উভয় প্রকার বস্তুর মধ্যে একই মৌলিক পদার্থ ও একই আকর্ষণ বিদ্যমান; অর্থাৎ খনিজ পদার্থের মধ্যে যে সকল মৌলিক পদার্থ আছে, দেহজ পদার্থে তাহাদিগের হইতে নূতন কোন মৌলিক পদার্থ নাই আর খনিজ পদার্থ-গুলিও যে আকর্ষণ শক্তি দ্বারা গঠিত দেহজ পদার্থ-গুলিও সেই আকর্ষণ শক্তি দ্বারা গঠিত। (রসায়ন বিজ্ঞান মতে জগতে কতকগুলি মৌলিক পদার্থ আছে আর সেই গুলি আকর্ষণশক্তি গুণে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তু উৎপন্ন করে।) তাহার পর আবার দেখ—খনিজ পদার্থ-গুলি অর্থাৎ যে সকল পদার্থ জীবদেহ হইতে সংগ্রহ করিতে হয় না, পৃথিবীর উপরে কিম্বা মধ্যে এমনিই পাওয়া যায় সে সকল পদার্থগুলি সাধারণতঃ ধাতু বা অ-ধাতু এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে—স্বর্ণ রৌপ্যাদিকে ধাতু আর অম্লজান যবক্ষারজানাদিকে অ-ধাতু বলা হইয়া থাকে। ধাতুগুলি সাধারণতঃ গুরু, চাক্‌চিক্যশালী এবং তড়িৎ ও উত্তাপের সঞ্চালক; যে পদার্থগুলি ধাতু নহে তাহাদিগের সাধারণতঃ এই সকল গুণ দেখা যায় না। কিন্তু এই গুণগুলি দ্বারা ধাতু ও অধাতুদিগের মধ্যে সকল পক্ষেই বিভেদ জানা কঠিন, কারণ কতকগুলি ধাতু আছে যাহা জল অপেক্ষা লঘু আবার কতকগুলি অধাতু আছে যাহা গুরুত্বশালী; আবার কয়েকটা অধাতু আছে যাহা যথেষ্ট চাক্‌চিক্যশালী; এবং উদকজান গ্যাস সাধারণতঃ অধাতুর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে অথচ ইহা দ্বারা তড়িৎ ও উত্তাপের সঞ্চালন হইতে পারে। আরও একটী কথা এই যে কতকগুলি মৌলিক পদার্থ পরস্পরের এত সদৃশ যে তাহারা বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহাদিগকে একত্র শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়া থাকে, যেমন ফস্‌ফরস্, আর্সেনিক, আণ্টিমনি ও বিস্‌মথ—এই চারিটীর মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়ের সহিত অনেক বিষয়ে সদৃশ, আর দ্বিতীয় তৃতীয়ের এবং তৃতীয় চতুর্থের

---

* ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড দেহজ বস্তু হইতে কতকগুলি ধাতুঘটিতযৌগিক প্রস্তুত করেন তাহাতে দেহজ ও খনিজ এই দুয়ের প্রভেদ আরও বিনষ্ট হয়। তিনি আলকোহল-স্থিত একটী মূল পদার্থের সহিত দস্তার যৌগিক প্রস্তুত করেন; দস্তা খনিজ বস্তু, আলকোহল দেহজ বস্তু সুতরাং ইহা সপ্রমাণিত হইল যে দেহজ বস্তুদিগের গঠন প্রণালীর নিয়মাবলী খনিজ বস্তুদিগের ন্যায়, কারণ পৃথক হইলে উক্ত যৌগিক উৎপন্ন হইত না।

সদৃশ; এবং চারিটীর মধ্যেই কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে (যথা—চারিটীর প্রত্যেকেরই দুইটী করিয়া (দুই রকম) অম্লজান বিশিষ্ট যৌগিক বস্তু আছে এবং ইহাদিগের গঠন একই প্রকারের।) অথচ এই চারিটীর মধ্যে প্রথমটী অধাতু আর তৃতীয় ও চতুর্থটী ধাতু বলিয়া ধরা হইয়া থাকে—দ্বিতীয়টী কেহ বা ধাতু কেহ বা অধাতু বলিয়া থাকেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ধাতু ও অধাতুর মধ্যে আমরা যে প্রভেদ করিয়া থাকি, ইহা প্রকৃত জাতিগত প্রভেদ নহে; উহা উপরের রূপগত প্রভেদ মাত্র। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে দেহজ ও খনিজ আর ধাতু ও অধাতু এই দুই প্রভেদ বাস্তবিক নহে, উহা আমাদিগের ধারণার প্রভেদ মাত্র।

আপাততঃ আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পড়িলাম—জগতে কয়েক প্রকার মূল পদার্থ আছে; তাহাদিগের পরস্পরের সংযোগে কি খনিজ কি দেহজ আর কি ধাতব কি অধাতব সমুদয় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এখন এই স্থির করিতে হইবে যে মূল পদার্থ দিগের মধ্যে জাতিগত প্রভেদ স্বীকার করা কতদূর ন্যায় সঙ্গত। অগ্রেই বলা হইয়াছে যে পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়া মৌলিক পদার্থগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়া থাকে—এক্ষণে এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাউক। ক্লোরিন, ব্রোমিন, ও আইয়োডিন এই তিনটী মৌলিক পদার্থ পরস্পরের সহিত নানা বিষয়ে সদৃশ—যেমন, ইহাদিগের প্রত্যেকেই উদজানের সহিত মিলিত হইয়া একটী অম্লপদার্থ প্রস্তুত করে, ইহাদিগের প্রত্যেকেই রৌপ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া এমন একটী পদার্থ উৎপন্ন করে যাহা জলে কিম্বা নাইট্রিক আসিড দ্রাবকে গলিয়া যায় না। ইহাদিগের প্রত্যেকেই সোডিয়মের সহিত যুক্ত হইয়া এক প্রকার লবণ উৎপন্ন করে এবং ইহার দানা সমচতুষ্কোণ ছয়টী পার্শ্ববিশিষ্ট—এইপ্রকার অনেক বিষয়ে উক্ত তিনটী পদার্থের সাদৃশ্য আছে। শুদ্ধ ইহা নহে, প্রভেদ যাহা যাহা আছে সেগুলির মধ্যেও সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়—তিনটীর মধ্যে ক্লোরিন সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, আইয়োডিন্ সর্ব্বাপেক্ষা গুরু এবং ইহার অনুযায়ী আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে ক্লোরিন্ গ্যাস, ব্রোমিন তরল, আর আইয়োডিন কঠিন; আর রৌপ্যের সহিত ক্লোরিনের যে যৌগিক জন্মে তাহা আমোনিয়া মিশ্রিত জলে সহজেই গলিয়া যায়, ব্রোমিনের যৌগিক তত সহজে গলে না, আইয়োডিনের যৌগিক একেবারেই গলে না। এস্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে উক্ত তিনটী পদার্থের গুরুত্বের তারতম্যের সহিত অন্যান্য কতকগুলি গুণের তারতম্যের ঐক্য আছে। তাহা হইলে এমন কিছু বলা যাইতে পারে কি না? ক্লোরিন, ব্রোমিন, আইয়োডিন ইহারা একই প্রকার পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এবং ইহাদিগের মধ্যে প্রভেদ যাহা আছে তাহা মাত্রা গত, জাতিগত নহে। * এ বিষয়ে এখনও কিছু স্থির বলিবার যো নাই, কারণ

* জাতিগত আর মাত্রাগত প্রভেদ এই দুইটী কথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। দুই

এ পর্য্যন্ত কেহ উক্ত তিনটী পদার্থের একটী হইতে অন্য একটী প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়েন নাই অথচ এরূপ করিতে পারা যে অসম্ভব তাহাও কেহ প্রমাণ করিতে পারেন না। ক্লোরিন ব্রোমিন আইয়োডিন যেমন একটী শ্রেণী, ফসফরস আর্সেনিক আণ্টিমনি বিসমথ যেমন একটী শ্রেণী, সেইরূপ অনেকগুলি শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ লঘুতম মৌলিক হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুতম পর্য্যন্ত যাইলে একশ্রেণীর পর আর এক শ্রেণী এইরূপ ক্রমে কতকগুলি শ্রেণী পাওয়া যায়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নিউলাণ্ডস্ এই বিষয়ে একটী নিয়ম আবিষ্কার করেন; তিনি বলেন যে মৌলিক বস্তুদিগের পরমাণুর গুরুত্ব অনুসারে চলিয়া গেলে প্রত্যেক সাতটী মৌলিকের পর আবার প্রথমটীর ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট একটী মৌলিক দেখিতে পাইবে। যেমন লিথিয়ম হইতে আরম্ভ করিয়া সাতটী মৌলিক পার হইয়া যাও, অষ্টমে যখন গেলে তখন উহার ন্যায় আর একটী মৌলিক দেখিবে ইহার নাম সোডিয়ম্, আবার অষ্টমে আসিলে আর একটী উক্ত প্রকৃতির মৌলিক পাইবে ইহার নাম পোটাসিয়ম; ইত্যাদি ক্রমে মৌলিকদিগকে পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে এমন কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে যে যে কোন মৌলিক ধরিয়া অষ্টম মৌলিকে পৌঁছাইলে প্রথমটীর সদৃশ একটী মৌলিক পাওয়া যাইবে। এই নিয়মকে নিউলাণ্ডস্ 'অষ্টমের নিয়ম' এই নাম দেন। ১৮৬৯ অব্দে মেণ্ডেলেফ এই বিষয়ে যে প্রণালী প্রকাশ করেন তাহা নিউলাণ্ডসের প্রণালী হইতে উৎকৃষ্টতর হইলেও আসলে একই। তবে মেণ্ডেলেফ দেখান যে কতকগুলি মৌলিক আছে তাহাদিগকে ঐ অষ্টমের নিয়মের মধ্যে আনিতে পারা যায় না। যাহা হউক, এবিষয়ে আর অধিক না বলিয়া আমরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে মৌলিক পদার্থগুলি আপাততঃ বিভিন্ন জাতির বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহাদিগের মধ্যে কোন গভীর জাতিগত সাদৃশ্য আছে। এমনও হইতে পারে যে মৌলিক পদার্থগুলি একই পদার্থের রূপ ভেদ মাত্র, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে মাত্রাগত ভিন্ন জাতিগত প্রভেদ নাই। কিছু দিন হইল সার উইলিয়ম টমসনও এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন মৌলিকের পরমাণুগুলি একই পদার্থের (ঈথর নামক আনুমানিক এক সূক্ষ্ম তরল পদার্থের) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ঘূর্ণায়মান অঙ্গুরীয়ক বিশেষ।

নিউলাণ্ডস-মেণ্ডেলেফের যে নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সমর্থনে এস্থলে একটী কথা বলা যাইতে পারে—উক্ত নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া অজানিত কয়েকটী মৌলিক পদার্থ আছে ইহা এবং তাহাদিগের কি কি গুণ ইহাও পূর্ব্বে থাকিতে বলা হয়; পরে ঐ কয়েকটী আবিষ্কৃত হয় এবং তাহাদিগের গুণ যেরূপ অনুমান করা

জন মানুষের মধ্যে কোন জাতিগত প্রভেদ নাই, কিন্তু তাহারা একজন লম্বা একজন বামন হইতে পারে আর তাহা হইলে উচ্চতা (শারীরিক) বিষয়ে তাহাদিগের মধ্যে মাত্রাগত প্রভেদ। জাতিগত প্রভেদের উদাহরণ মানুষ, অশ্ব, গর্দ্দভ ইত্যাদি।

হয় সেইরূপ দেখা যায়। ক্লোরিন ব্রোমিন আইয়োডিন এই শ্রেণীর সম্বন্ধে উপরে বলা হইয়াছে যে ইহাদিগের একটী হইতে অন্য একটী এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই—তাহা হইলেই স্পষ্ট প্রমাণ হইত যে উহারা একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। কিন্তু যদিচ এ পর্য্যন্ত এক মৌলিক হইতে অন্য মৌলিক প্রস্তুত করা হয় নাই, তথাপি ইহা দেখা যায় যে ক্লোরিন ব্রোমিন আইয়োডিনের ন্যায় নিউলাণ্ডস-মেণ্ডেলেফের প্রণালীতে যতগুলি শ্রেণী আছে তাহাদিগের প্রত্যেকের এই গুণ দেখা যায় যে তাহাদিগের অন্তর্গত একটী মৌলিক অন্য একটী মৌলিকের স্থান অধিকার করিতে পারে এবং তাহাতে পদার্থগণের গুরুত্ব ভিন্ন অন্যান্য গুণ প্রায় পূর্ব্ববৎই থাকে—যেমন পোটাসিয়ম ও ব্রোমিনের একটী যৌগিক আছে, ইহা অনেকটা সাধারণ লবণের মত; যদি এই যৌগিক জলে মিশ্রিত করিয়া উহাতে অল্পে অল্পে ক্লোরিন মিশ্রিত জল ঢালা যায়, তবে ব্রোমিন বাহির হইয়া আইসে এবং ক্লোরিন উহার স্থান অধিকার করে আর তাহাতে যে যৌগিক উৎপন্ন হয় তাহা অনেক বিষয়ে প্রথমোক্ত যৌগিকের ন্যায়। এইরূপে ক্লোরিন ব্রোমিন আইয়োডিন ইহারা পরস্পরের স্থান অধিকার করিতে পারে অথচ তাহাতে পদার্থের গুণ অনেকটা পূর্ব্ববৎ থাকে—সেইরূপ আবার অক্‌সিজেন, সলফর, সিলেনিয়ম্, টিলিউরিয়ম; পোটাসিয়ম, সোডিয়ম, লিথিয়ম, আমোনিয়ম; কালসিয়ম, ষ্ট্রন্‌শিয়ম, বেরিয়ম;—এই সকল যতগুলি শ্রেণী আছে ইহাদিগের প্রত্যেকের পক্ষে ক্লোরিন ব্রোমিন আইয়োডিনের শ্রেণীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে।

আমরা উপরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে যে সকল মৌলিকদিগকে আমরা এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনে করি তাহারা প্রকৃত পক্ষে একই বস্তুর অবস্থা ভেদ মাত্র হইতে পারে। একই প্রকার সামগ্রী হইতে যে ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা রসায়ন শাস্ত্রের একটী সুবিদিত বিষয়। একই দুই কি ততোঽধিক মৌলিক ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিলিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন গুণের বস্তু উৎপন্ন হয়—যেমন একই অঙ্গার ও উদক জান ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে যুক্ত হইলে মার্শ গ্যাস ও অলিফায়াণ্ট গ্যাস এই দুই বস্তু উৎপন্ন হয়—প্রথমটী জ্বালাইলে মিট্‌মিটে আলোক হয়, দ্বিতীয়টী জ্বালাইলে উজ্জ্বল আলোক হয়। অতএব এমন হইতে পারে যে যে গুলিকে আমরা এক্ষণে মৌলিক বলি তাহারা প্রকৃত পক্ষে যৌগিক, কিন্তু বিজ্ঞানের অনুসন্ধান প্রণালী এখনও তত সূক্ষ্ম হয় নাই বলিয়া আমরা উহা দেখিতে পাই না। এমন ধারা কতকগুলি বস্তু জানা আছে যাহাদিগকে প্রথমতঃ একরকম মৌলিক বলিয়া ধরা হইত, এক্ষণে তাহাদিগের যৌগিকত্ব প্রমাণ হইয়াছে—সুতরাং বর্ত্তমান মৌলিক গুলিরও যৌগিকত্ব পরে সপ্রমাণ হইতে পারে। রসায়ন শাস্ত্রে কতকগুলি যৌগিক জানা আছে যাহারা ঠিক মৌলিকের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ মৌলিকগণ যেমন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবেশ করে, তাহারাও সেইরূপ করিতে পারে। উদকজান ও যবক্ষার

জানের একটী যৌগিক আছে ; ইহা ঠিক পোটাসিয়ম সোডিয়ম প্রভৃতি মৌলিকের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। মৌলিকগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে যুক্ত হইলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হয় ইহা অগ্রেই বলা হইয়াছে—কিন্তু শুদ্ধ তাহা নহে পরিমাণের কোন বিভেদ না হইয়া, কেবল মাত্র সংযোগ প্রণালীর বিভেদ হইলেও তিন কিম্বা ততোঽধিক মৌলিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বাল্যজীবন। প্রথম ভাগ। পুস্তকখানিতে লেখকের নাম নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, যুধিষ্ঠির, বুদ্ধদেব, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, মার্টিন লুথার, নানক, চৈতন্য, রামমোহন রায়, থিওডোর পার্কার ও কেশবচন্দ্র সেন এই কয়েক জন ধর্ম্মাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে সন্নিবিষ্ট। বইখানি বড় ভাল হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানি বঙ্গের বালক বালিকা গণকে উপহার দিয়াছেন কিন্তু কেবল বালক বালিকাগণ নহে বৃদ্ধেরাও ইহা পড়িয়া প্রীতি লাভ করিবেন।

মনোমোহন গীতাবলী। (অর্থাৎ বাবু মনোমোহন বাবু কৃত হাফ আখড়াই, কবি, নাটক, গীতাভিনয়, পাঁচালি প্রভৃতি বিবিধ গান।) বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

এ পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা যে শুধু কাব্য পাঠ জনিত প্রীতি-লাভ করি এমন নহে—কিছুদিন পূর্ব্বে সমাজে কিরূপ আমোদ প্রমোদ প্রচলিত ছিল, এসব সম্বন্ধে সমাজের তখন কিরূপ রুচি ছিল—ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থের প্রথমেই মনোমোহন বাবুর লিখিত আফ আখড়াইএর একটি ইতিহাস আছে। ইতিহাসটিও বিশেষ প্রীতিপ্রদ।

মনোমোহন বাবুর কবিত্বের পরিচয় স্বরূপ তাঁহার ঈশ্বর বিষয়ের সঙ্গীত হইতে নীচে একটি ক্ষুদ্র সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সুখেতে, দুখেতে, তুমি সখা ;
ডাকিতে না জানি তোরে, আপনি এসে (নিজগুণে)
আপনি এসে দে যা দেখা!
কিসে ভাল কিসে মন্দ, সন্দ ক্রমে লাগে ধন্দ,
মনে প্রাণে সদাই দ্বন্দ, খুলে দে যা (দয়া করে)
ভেঙেদে মোর হৃদের ধোকা।
দর্শন শাস্ত্রে কি ছাই লেখে, প্রচারক সব মিছে বকে
তর্কের কাজ লয় ধ’র্ত্তে তোকে, হৃদয় নইলে (ও সরল)
হৃদয় নইলে কেবল ঠকা।

পঞ্জাব ভ্রমণ।

মুলতান।

ছন্নুষ্টেশন ছাড়াইলে তাতীপুর। তাতীপুর ছাড়াইলে মুলতান। মুলতান অতি প্রাচীন নগরী। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন মূলতানই প্রাচীন কাশ্যপপুর। টোলেমি কাস্পিরীয়া নামে নগরীকে কাশ্মীর হইতে মথুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক রাজ্যের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই কাস্পিরীয়াই পঞ্জাবের রাজধানী ছিল অনুমান হয়। ইহার পাঁচ শ বৎসর আগে সেকেন্দর সাহের আক্রমণ সময়ে মূলতান মহাপ্রতাপশালী মালী জাতির প্রধান নগরী ছিল। সেকেন্দর শাহা তাহাদিগকে অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর পরাজিত করেন। তিনি ফিলিপকে মূলতানের শাসন কর্ত্তা করিয়া যান; কিন্তু হেলেনীয় রাজত্ব এ অতিদূরদেশে বহুদিন থাকে নাই, কিছু কাল পরেই আমরা দেখিতে পাই মূলতান মগধের মহাপ্রতাপশালী গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের অধিকারে আসিয়াছে। ইহার পরে আর একবার বোধ হয় গ্রিসীয় শক্তি মূলতান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল সে ব্যাক্‌ট্রিয়াস্‌ রাজাদিগের সময়ে;—তাঁহাদিগের মুদ্রা মূলতানে কখন কখন পাওয়া যায়। প্রাচীন আরবীয় ভূগোল বেত্তারা মূলতানকে সিন্ধুরাজ্যের অন্তর্গত বিখ্যাত চূচ রাজার অধিকার ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসঙ্গ মূলতানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে তিনি সূর্য্যের এক স্বর্ণমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। মূলতান নামে পণ্ডিতেরা মালী-স্থান স্থির করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন মূলতান মানে মালো বা সূর্য্যের স্থান। মহম্মদ কাশীম সিন্ধুদেশ ও মূলতান মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার আগে সপ্তম শতাব্দির মধ্যভাগে হারান নামে একজন মুসলমান সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। এ রকম আক্রমণ আরো কয়েকবার হয়। তাহারা নিষ্ফল হয়। অবশেষে সিংহলাধিপতি খলিফা ওয়াসিদকে নানা দ্রব্য পূর্ণ করিয়া যে এক জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন, কথিত আছে, দেবল নামে একজন সিন্ধুদেশীয় রাজা সে জাহাজ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। খলিফা দেবলের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়া তাহাকে পরাজিত করেন। এই সেনা লইয়াই মহম্মদ কাশীম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। শক্কর নগরের সম্মুখে সিন্ধুতীরে পরপারে প্রাচীন নগরী আলোরের ভগ্নাবশেষ,—এই আলোরের রাজা ডাহিরকে মহম্মদ কাশীম পরাজিত করেন। আলোর হইতে মুলতানে যান—সেখানে বজ্রতাকী নামে এক বীরপুরুষ দু মাস পর্য্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ দেন, অবশেষে পরাজিত হন। মূলতান অধিকার ৭১৪ খৃষ্টাব্দে হয়। এ সময়ে মূলতানে সূর্য্য-

দেবের এক মন্দির ছিল। সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি তাহাতে স্থাপিত ছিল। মূর্ত্তির চক্ষু বহু মূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল, আর শিরে সুবর্ণ মুকুট ছিল। মুসলমানেরা এই দেবমূর্ত্তির নীচে বহু অর্থ পাইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক সূর্য্যদেবের পূজা করিতে আসিত—রাজা ইহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতেন। কর লোভে মুসলমানেরা দেব ও দেবালয় বিনষ্ট করিলেন না। কিন্তু অপহৃত অর্থ দ্বারা একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিলেন। দশম শতাব্দির শেষ ভাগে মুসলমানেরা সূর্যদেব ও তাহার মন্দির ধ্বংস করে। হিন্দুরা দুশ বৎসর পরে মন্দির পুনর্নির্ম্মিত ও সূর্য্যদেবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে। ঔরঙ্গজীব উভয়েরই বিনাশ করেন। শিখরা যখন ১৮১৮ সালে মূলতান লুণ্ঠন করে তখন আর এ মন্দিরের কোন চিহ্ন ছিল না। কোথায় এ মন্দির ছিল এখন কেহ জানে না। দী-দরওয়াজা ও দী-জল প্রণালীর মধ্য স্থানে সেখানে জুম্মা মসজিদ ছিল অনেকে অনুমান করেন সূর্য্য মন্দির সেখানে ছিল। শিখরা উক্ত জুম্মা মসজিদকে বারুদখানায় পরিণত করিয়াছিলেন। মহম্মদ কাশীম মূলতান অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু খলিফারা যেমন হীনবল হইতে লাগিলেন তেমনি এ অতিদূর-দেশে তাঁহাদিগের ক্ষমতা লুপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে নবম শতাব্দির শেষ ভাগে সিন্ধু দেশে দুটি স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপিত হয়—মূলতান এক রাজ্যের রাজধানী, মনসুরা অপর রাজ্যের। হায়দরাবাদের ৪৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ধ্বংশ প্রাপ্ত ব্রাহ্মণাবাদ নগরীর নিকটে এই মনসুরা নগরী ছিল। দশম শতাব্দির প্রারম্ভে আবুল দলহাত্—অল্—মনাভা মূলতানের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্য কানোজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—এক দিকে খোরাসান অন্য দিকে আলোর পর্য্যন্ত। মূলতানের স্বাধীনতা ১০০৫ খৃষ্টাব্দে যায়। সুলতান মামুদ মূলতান অবরোধ করেন, মূলতান অধিকার করিয়া সমস্ত সিন্ধুদেশ হস্তগত করেন। পঞ্চদশ শতাব্দির মধ্য ভাগে মূলতান কিছুদিনের জন্য স্বাধীন হইয়াছিল। শেখ মুসুক নামক এক বীর পুরুষকে মূলতানীরা নায়ক করিয়া মূলতানের স্বাধীনতার উদ্ধার করে। মোগল সম্রাটেরা যখন সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতবর্ষ একছত্র করেন তখন মূলতান তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। মোগল সাম্রাজ্য যত দিন অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন মূলতান একটি মোগল সুবার প্রধান নগর ছিল। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শা ১৭৩৯ সালে সাদোজাই আফগান বংশীয় জাহিদখাঁ নামক এক ব্যক্তিকে মূলতানের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। শিখ হস্তে মূলতানের স্বাধীনতা নাশ সময় পর্য্যন্ত মূলতান এই বংশের হস্তে স্বাধীন রাজ্য রূপে ছিল। বহু কাল শিখে আর মুসলমানে মূলতান লইয়া দ্বন্দ। অবশেষে ১৮১৮ শালে শিখ মূলতান অধিকার করে। মূলতান শিখদিগকে দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। মহাবীর মুজফ্ফর খাঁ ২ রা জুন তারিখে মূলতান রক্ষার সপঞ্চপুত্র যুদ্ধে প্রাণ হারান। মুজফ্ফর খাঁ ও তাঁহার পুত্রগণের সহিত তাঁহার প্রিয়তমা কুমারী কন্যাও যুদ্ধ করিতেছিলেন। পিতার মৃত

দেহ ও আপন সতীত্ব রক্ষার্থে তিনি যে অদ্ভুত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া নাকি নৃশংস শিখ শত্রুরাও মুগ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি পিতা ও ভ্রাতাগণের দেহের উপর প্রাণ ত্যাগ করিলেন। লাহোরে ঝমঝমা নামে যে প্রসিদ্ধ অতিপ্রকাণ্ড বাঙ্গী তোপ আছে, এ যুদ্ধে শিখরা তাহার ব্যবহার করিয়াছিল। এখানে মূলতানের আফগান নবাবদিগের রাজত্ব শেষ হইল। শিখদিগের সময় মূলতানে তাহাদিগের একজন সুবাদার থাকিত। শিখদিগের সর্ব্বোত্তম সুবাদার সাওয়ান মল। ১৮২১ শালে তিনি সুবাদারি পান—মূলতান প্রদেশে তিনি কৃষি প্রভৃতির উন্নতি করিয়াছিলেন। ৩০০ মাইল দীর্ঘ একটা কানাল বা জলপ্রণালী খনন করিয়াছিলেন। সাওয়ান মলকে এক জন সৈন্য প্রাণে বধ করে। তাঁহার মৃত্যু ১৮৪৪ শালে সেপ্টেম্বর মাসে হয়। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত মূলরাজ সুবাদার হন।

রণজিৎ সিংহ নাই, ১৮৩৯ শালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইংরেজেরা জলন্দর দোয়াব আপন রাজ্য ভুক্ত করিয়াছে। শিশু দলীপসিংহ রণজিৎসিংহের সিংহাসনে বসিয়াছেন। লাহোরে কাউনসিল অভ্ রিজেন্সি স্থাপিত হইয়াছে। হেনরি লরেন্স লাহোরে ইংরেজের রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। শিশু রাজার রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য এক ইংরেজ-সেনা পঞ্জাবে আসিয়াছে। কাউন্সিল অভ রিজেন্সির সভ্যেরা সকলেই স্বার্থপর, অর্থলোলুপ ও দেশহিতৈষণাশূন্য। রাজমাতা উপপতিকে প্রধান মন্ত্রী করিয়াছেন, ইহারই কিছুকাল পূর্ব্বে মূলরাজ মূলতানের সুবাদার হইলেন। ইংরেজ-অফিশিয়েলদিগের সহিত বনিল না—তিনি মূলতানের সুবাদারি পরিত্যাগ করিলেন। সর্দ্দার খাঁ সিঙ্গমান মূলতানের শাসনকর্ত্তা ও মিষ্টার ভান্স এগ্নিস্ পোলিটিকেল এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন। মূলতানে ইহারা ও লেফটেনণ্ট এণ্ডারসন পৌঁছিবার দুদিন পরে (১৯ শে এপ্রিল, ১৮৪৮) মূলরাজের সঙ্গে দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় হত হন। ইংরেজ তখন একপ্রকার নিরুপায়। সিন্ধুদেশের গ্রীষ্ম সময়ে, লাহোর হইতে ইংরেজ সৈন্য পাঠাইতে ভরসা পাইতেছেন না - সৈন্যও বেশী নাই। বাহাদুর লেফটেনেন্ট হারবর্ট এডোয়ার্ডস্ তখন বন্নুতে ছিলেন। তিনি লাহোর হইতে হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মূলতানে চলিলেন। পথে আরো সৈন্য মিলিল। মূলরাজকে ১৮ই জুন যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। মূলরাজ মূলতানের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। কিছুদিনের মধ্যে জেনেরেল হুরিশ ৭০০০ সৈন্য লইয়া মূলতান অবরোধ করিলেন। শিখ সর্দ্দার শের সিংহ পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া জেনেরেল হুরিশের সহিত মিলিত হইলেন। শেরসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মূলরাজের সহিত মিলিলেন। জেনেরেল হুরিশের দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিতে হইল। সমস্ত পঞ্জাবে যুদ্ধ রব উঠিল—নষ্ট স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য শিখের প্রাণে আগুণ জ্বলিল। শের সিংহ আর মূলরাজ একমত হইয়া চলিতে পারিলেন না— শের

সিংহ মূলতান ছাড়িয়া সসৈন্যে লাহোর যাত্রা করিলেন। ইংরেজ সৈন্য সেপ্টেম্বর মাসে মূলতান আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হইয়া তাঁহাদের সরিয়া পড়িতে হয়। ডিসেম্বরে নূতন সৈন্য লাহোর হইতে আসিয়া পঁহুছিলে ইংরেজ সেনা পুনর্ব্বার মূলতান আক্রমণ করে। মূলরাজ মহাবীর অসীম সাহস ও বীরত্বের সহিত বহু দিন মূলতান রক্ষা করেন। অবশেষে ১৮৪৯ শালে ২রা জানুয়ারি তারিখে মূলতান ইংরেজের হস্তগত হয়। ইংরেজের হাতে শহর গেলে মূলরাজ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২২ শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন ইংরেজের তোপে দুর্গ-প্রাচীর উড়িয়া যাইতে লাগিল তখন মূলরাজ আত্ম সমর্পণ করিলেন। ইংরেজ একটা বিচারের অভিনয় করিলেন, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। বিচারকদের অনুরোধক্রমে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর—লর্ড ডালহৌসি—তাঁহাকে নির্ব্বাসন করিলেন। পর বৎসর কলিকাতায় তাঁহার জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়। মূলরাজ মহাবীর ছিলেন—তাঁহার শত্রু ইংরেজও তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছে। মূলরাজের পতনের সময় হইতে মূলতান ইংরেজ রাজ্যভুক্ত। দুর্গে ভান্স, এগনিস্ ও লেফ্‌টেনেণ্ট এণ্ডারসনের একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। ১৮৫৭ সালে দেশীয় সৈন্যেরা বিদ্রোহী হয়—বিদ্রোহী হইতেই তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হয়। তাহারা নিরস্ত্র হইয়া লাঠি, চারপায়ের পা প্রভৃতি দ্বারা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করে। পরাভূত হইয়া পলায়ন করে। গ্রাম্য লোকেরা ইংরেজ পক্ষে ছিল। বিদ্রোহীরা তাহাদিগের হস্তে নিধন পায়। স্কিনার্স্ হর্স্ (Skinner's Horse) নামক সৈন্য দল, যাহার সৈন্য সকলই দিল্লীর মুসলমান ছিল, ইংরেজদিগকে রক্ষা করে।

মূলতান চিনাব বা চন্দ্রভাগার পূর্ব্বতীরে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে রাভী বা ইরাবতী মূলতানের পাদদেশ চুম্বন করিয়া বহিত। তৈমূরের আক্রমণ সময়েও ইরাবতী মূলতান হইয়া বহিয়া পাঁচ ক্রোশ নীচে যাইয়া চন্দ্রভাগার গায়ে আপনার গা ঢালিয়া দিত। এখন ইরাবতী বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে—মূলতানের ১৫ ক্রোশ উপরে বা উত্তরে ইরাবতী এখন চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত।

মূলতান তিনদিকে প্রাচীরে বেষ্টিত, দক্ষিণে অরক্ষিত—এদিক দিয়া ইরাবতী এককালে বহিয়া যাইত—তাহার শুষ্ক প্রণালী এখন পড়িয়া রহিয়াছে। দুর্গকে দন্তহীন করা হইয়াছে, নগরবেষ্টনী প্রাচীরে এক সময়ে ৪৬ টা বাষ্টিয়োন্ ছিল। এ প্রাচীর শাজিহানের কনিষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তিনি কয়েক বৎসর মূলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হিন্দু রাজত্বের চিহ্ন বিশেষ কিছুই নাই—কেবল কতকগুলি অতি প্রকাণ্ড আঙ্গুরিক মঙ্ক নামক প্রস্তরাঙ্গুরীয়, আর গোটা কতক প্রস্তর মূর্ত্তির ভগ্নাংশ। এই মূর্ত্তি গুলি হারাম দরওয়াজার নিকটে একটা মন্দিরে। হিন্দু চিহ্নের মধ্যে আর একটি প্রসিদ্ধ—প্রহ্লাদপুরীর ছাত শূন্য মন্দির, আর সূর্য্যকুণ্ড। প্রহ্লাদপুরীর মন্দির অতি প্রাচীন।

নরসিংহদেবের এখানে অবতার হয়, এই লোকের বিশ্বাস। হিরণ্যকশিপু মূলতানের রাজা ছিলেন। প্রহ্লাদ চরিত্র কারখানাটা এখানে হয়, এই মূলতানীদের অভিপ্রায়। প্রহ্লাদপুরীর সম্মানের সীমা নাই—হিন্দুদের মহা পুণ্য স্থান। সূর্য্যদেবের মন্দির দুর্গের মধ্যস্থলে ছিল। তাহার ইতিহাস আমি উপরে দিয়াছি। প্রহ্লাদপুরীর সঙ্গে প্রায় সংলগ্ন করিয়া মুসলমানেরা একাদশ শতাব্দির প্রারম্ভে সেখ বাহাউদ্দীন নামক একজন মহাপীরের সমাধি ক্ষেত্রের উপর একটা উচ্চ গুম্বেজাবশিষ্ট স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করে। এই পীরের পৌত্র রুকনুদ্দানও একজন মস্ত পীর হইয়া দাঁড়ান। তাঁহার স্মৃতিমন্দিরের নাম রুকন-ই-আলম, আর তাঁহার পিতামহের স্মৃতিমন্দিরের নাম বাহাওয়াল হক্। রুকন-ই-আলম সুন্দর মন্দির। বাড়ীটা প্রকাণ্ড—দেয়াল গুলি ৪০ ফিট উচু। গুম্বজের ব্যাস ৫৮ ফিট আর উচ্চতা ১০০ ফিট। গ্লেজ করা টালী দিয়া গুম্বেজ তৈয়েরি। চারি দিকে ১০। ১৫ মাইল দূর হইতে এই মন্দির দেখা যায়। বাহাওয়াল হক্ আর প্রহ্লাদ-পুরী। অতি সান্নিধ্যের জন্যে হিন্দু মুসলমানে প্রায় কলহ হয়। ১৮৮১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মূলতানে যে হিন্দু মুসলমানে লড়াই হয় এই ঝগড়া তাহার এক প্রধান কারণ। মূলতানের হিন্দুরা অন্যান্য স্থানের হিন্দুদের ন্যায় মাইল্ড্ বা মেষপ্রকৃতি নয়—অসংখ্যবার তাহারা মুসলমানদের সহিত লড়িয়াছে। ঔরঙ্গজীব ইহাদিগকে হতোৎসাহ করিবার জন্য মূলতানে একবার দশ হাজার হিন্দু হত্যা করেন। ইংরেজদিগের মূলতানাধিকারের পূর্ব্বে দুর্গের মধ্য স্থলে একটা মসজিদ ছিল, সূর্য্যদেবের মন্দির ধ্বংস-করিয়া তাহার স্থানে এই মসজিদ নির্ম্মিত হয়। মূলরাজ যুদ্ধকালে এই মসজিদ মুসল-মানদের উল্লিখিত স্মৃতি-মন্দির এবং প্রহ্লাদপুরীকে বারুদাগার করেন। একটা গোলা এই মসজিদে প্রবেশ করে—মসজিদ চূর্ণ হইয়া যায়—মন্দিরাদিও বিকলাঙ্গ বা ভগ্নাঙ্গ হইয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমানেরা তারপর যথাসাধ্য আপন আপন মন্দিরাদি পুনর্নির্ম্মিত করিয়াছে। মূলতানে অনেকগুলি লম্বা লম্বা ইষ্টক নির্ম্মিত কবর আছে—সে গুলিকে 'নওগজা' বলে। নওগজার উল্লেখ হাতপুরেও হইয়াছে। গাজী ও সাহিদ (warriors and martyrs) গণের গোর। ইহারা এক এক জন নয় গজ লম্বা ছিলেন, এইরূপ লোকের বিশ্বাস।

মূলতান মরুভূর মধ্যে বলিলেই হয়। অত্যন্ত গরম স্থান। শীতে আবার তেমনি ঠাণ্ডা। লোককথা এই যে এখানে অনেক পীর সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহারা যোগ প্রভাবে সূর্য্যদেবকে মূলতানের নিকটস্থ করিয়া লইয়াছেন। বৃষ্টি সমস্ত বৎসরে ৬।৭ ইঞ্চ হয়। উত্তাপ ও ধূলিতে লোকের বড় কষ্ট হয়। একটি ফারসি কবিতায় বলে—

চার জিনিষে নাই কেহ মূলতান সমান
উত্তাপ, ভিক্ষুক, ধূলো আর গোরস্থান।

মূলতান মস্ত বাণিজ্য স্থান। রাভী, ঝিলম ও চিনাভ দিয়া মধ্য পঞ্জাবের সমস্ত বাণিজ্য

দ্রব্য মুলতানে আসে। সমস্ত পঞ্জাবের করাচির সহিত যে বাণিজ্য তাহা মূলতানে আসিয়া জড়িত হয়। মূলতানে রেশমী কাপড় ও সতরঞ্জী তৈয়ার হয়। গ্লেজ করা মৃৎবাসন আর ইনামেল্ কার্য্য মূলতানের প্রসিদ্ধ।

মূলতান্ হইতে ৬৩ মাইল দক্ষিণে শতদ্রুতীরে বাহাওয়ালপুর নগর। এ প্রদেশে বাহাওয়ালপুর সর্ব্বপ্রধান মুসলমান রাজ্য। শিকারপুরের এক জোলার ছেলে বাহাওয়াল খাঁ এই নগর স্থাপন করেন। কাবুল হইতে শাসুজা তাড়িত হইলে যখন দুরাণী সাম্রাজ্য অঙ্গহীন ও ছিন্ন ভিন্ন হয় তখন বাহাওয়ালপুরের নবাবরা স্বাধীন হন। রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ের সময় নবাব বাহাওয়াল খাঁ আত্মরক্ষার্থ ইংরেজের নিকট অভয় প্রার্থনা করেন। ইংরেজ তখন তাঁহাকে অভয় দেন না। ১৮৩৩ সালে বাণিজ্যাদির অবস্থার জন্যে নবাবের সঙ্গে সন্ধি হয়।

১৮৩৮ সালে যে সন্ধি হয় এখন সেই সন্ধি পত্রানুসারে কার্য্য চলিতেছে। সে সন্ধি পত্রের মর্ম্ম এই যে, ইংরেজ নবাবের রাজ্য শত্রু হইতে রক্ষা করিবেন, নবাব ইংরেজের চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিবেন; ইংরেজের অজ্ঞাতে অন্য কোন রাজার সহিত কোন সন্ধি বা মন্ত্রণা করিবেন না, কাহাকেও আক্রমণ করিবেন না; ঝগড়া বিবাদ হইলে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহার বিচার করিবেন। ইংরেজ কোন রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় ও দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের সময় নবাব ইংরেজের সহায়তা করিয়াছিলেন। পুরস্কাররূপে নবাব সবজলকোট ও ভোঙ্গ জেলা আর আমরণ এক লক্ষমুদ্রা পেনসন পান। বাহাওয়ালপুর রাজ্য সুবিস্তৃত—১৫০০০ বর্গ মাইল, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রায় দশ হাজার মাইল মরুভূমি। পশ্চিমে সিন্ধুদেশ, মরুভূমি নয়—পূর্ব্বে উত্তর পূর্ব্বে দক্ষিণ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মহামরুভূ বিকানীরের মরুভূমি। বর্ত্তমান রাজা যে চমৎকার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার উপরে দাঁড়াইলে অনন্ত বিস্তৃত তরু লতা শূন্য বারিবিহীন বিকানীরের মরুভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। বাহাওয়ালপুর রাজ্যের লোক সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ—নগরীর ১৪ হাজার। নবাবের আয় ১৬ লক্ষ টাকা। নবাব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে কর দেন না। বাহাওয়ালপুরে একটি রেশমের কারখানা আছে। নগর মৃত্তিকাপ্রাচীরে বেষ্টিত। লুঙ্গী (পাগড়ী বাঁধিবার কাপড়) মুক্তা, রেশমী কাপড়, নীল, তুলা প্রভৃতি বাহাওয়ালপুরে জন্মায়। বাহাওয়ালপুরের উপরে শতদ্রু-বক্ষে বিখ্যাত এম্প্রেস ব্রিজ।

আগামীবারের "ভারতী" বাহির হইবার আগেই আমরা লাহোরে ফিরিয়া যাইব। সেখান হইতে দিল্লী যাত্রা করিয়া পথে অনেক জায়গা দেখিব। "পঞ্জাবভ্রমণ" এখনো শেষ হইল না বলিয়া পাঠক দুঃখ করিবেন না।

শ্রী শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

কবিতা গুচ্ছ।

বাসন্তী নিদ্রা।

বিজনে বসন্ত দেবী সন্তোষে ঘুমায়।
ফল-ফুল সুশোভিত তরুর ছায়ায়।
চরণ-তলে, অদূরে নীল
সরসী করে তর তর,
সুদূর বন-হৃদয় লুঠি
মলয়ভাষে সর সর,
বনজ ফুল ঝর ঝর ঝরিয়ে পড়ে যায়।
ধরণী নব সংগঠনে
শ্রান্তি ভারে অবনতা—
ললাটে স্বেদ বিন্দু ঝরে,
কর চরণে অলসতা,
বিজনে বসন্তলতা কুন্তল দোলায়।
ধবল চারু চন্দ্র-কর
ধরণী-বুকে পড়ে ঢলি,
শ্যামল বন পুলকে ভাসে,
উচ্ছাসে হাসে ফুল-কলি,
কুহরে পিক, শিহরে অলি, পাপিয়া গীত গায়।
শ্যামল ছায়ে খুঁজি খুঁজি
জোছনা আসি পড়ে মুখে,
মুদিত প্রাণ নিচল দেখি
স্বপন খেলা করে বুকে,
নিদ্রিত ষড় ঋতু সুখে প্রণতি করে পায়।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

কে?

জানি না কে তুমি, বসন্তের সনে
হাত ধরাধরি করে,
হাতে লয়ে বীণা, মুখে গুণ গুণ
আইলে আঁধার ঘরে,
মুছে দিতে আঁখি, ফুটাইতে প্রাণ,
কত না যতন তব,
চিনি না তোমারে, কে তুমি আমার,
নিতি দেখি নব নব।
ও তোমার মুখে, কি আছে না জানি,
হেরিলে পলায় দুখ।
প্রাণে নব বল, যেন ভরে আসে,
উছলে কি সুখে বুক।
হায়! চিনি না তোমারে কে তুমি আমার
নিশীথ-পরাণে আসি,
মাঝে মাঝে মৃদু, মধুর ললিতে
বাজাও ভোরের বাঁশী।

শ্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

অবসান।

নীমিলিত অধরের দু'টী ম্লান হাসি
দোঁহা পানে রহিল চাহিয়া।
মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ের দুইখানি মেঘ
গায় গায় পড়িল ঢলিয়া।
প্রেমপূর্ণ দুই ফোঁটা শেষ অশ্রু জল
পরস্পরে চাহিল বিদায়—
সন্ধ্যাময় জগতের নিঝুম আঁধারে
ঝ'রে গেল বনের ছায়ায়।

শ্রীবলেন্দ্রনাথনাথ ঠাকুর

সন্দেহ।

(সখী সমীপে)

কাল্, সখি, আঁখিভোরে দেখিবারে তায়,
বকুলতলায়
লুকাইয়ে সাঁঝে এসে বসেছিনু একা ;
সুধু চোখে দেখা !
ভাল কোরে তাও মোর হোলোনা স্বজনি,
আসিল রজনী !
গোপবেশে, হেসে হেসে, লোয়ে সব ধেনু,
আসিতে দেখিনু।
কেবা কি কহিবে পাছে, তাইলো ললিতে,
উঠিনু ত্বরিতে।
চোলে যেতে যেতে সুধু,ফিরে ফিরে দেখা !
ওলো চিত্রলেখা,
আজি মোরা সবে মিলে যাব কুঞ্জবনে,
দেখিতে সে ধনে।
শুনিয়াছি নিধুবনে, বিধু মুখে হরি,
বাজায় বাশরী।
বড়ই আকুল সই হতেছে পরাণ
শুনিতে সে গান।
লুকায়ে, জানিতে সাধ, কেন বা সে গায়
একা শ্যাম রায়।
বসন্তে, নিকুঞ্জবনে, পুষ্পময়শাখে,
পাখী যথা ডাকে ?
নিদাঘে, জলদ যথা, আকাশের গায়
উড়িয়া বেড়ায় ?
যমুনা যৌবন ছেয়ে, যথা বরষায়
তরঙ্গ, খেলায় ?
শরতে, আকাশে যথা, চন্দ্রমার হাসি,
ফুটে পড়ে ভাসি ?
সুধু কি তেমনিতর উছলিত প্রাণ,
স্ফূর্ত্তিময় গান
অলক্ষ্যে, বিজনে গায় ? অথবা স্বজনি,
শ্যামগুণমণি,
পেয়েছে কি প্রেমময়ী কোন ব্রজাঙ্গনা ?
জানিতে বাসনা !
যদি শুনি, কোন ধনী, প্রেমময়ী তার ?
কি হবে রাধার ?
অকূল যমুনা জলে, গেয়ে শ্যাম নাম,
ত্যজিব পরাণ।
না পাইলে শ্যামধনে, জীবন সংসার
তুচ্ছ রাধিকার।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

তুমি আমি।

তুমি আমি যেন সখি, এক গাছে দুটি ফুল,
দু'জনার সুরভিতে দুজনে হয়েছি ভুল ;
দু'জনার মধু হাসি, দুজনায় গেছে মিশি,
আলাদা থাকিনা তবু প্রাণে মেশে দিবা নিশি;
তুমি আমি যেন সখি, আকাশের দুটি তারা,
দুটির কিরণ মাখে দুটিতে হ'য়েছি হারা ;
তুমি আমি যেন সখি, আগু পিছু দুটি ঢেউ,
অন্তরে গিয়েছে মিশে,বাহিরে মেশে না কেউ;
তুমি আমি যেন সখি, দুইটি গাছের ছায়া,
ছায়ায় ছায়ায় মেশে বাহিরে মেশে না কায়া;
তুমি আমি যেন সখি, দুইটি পাখির গান,
দুইটি সুরেতে মিশে হ'য়ে গেছে একতান ;
তুমি আমি যেন সখি, রামধনু নীলাকাশে,
ভিতরেতে হাসি খুসি,বহিরেতে তাই ভাসে;
তুমি আমি যেন সখি, সৌন্দর্য্য ও ভালবাসা,
চিরকাল আছে মিশে, তবুও মিশিতে আশা।

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সেই অর্দ্ধ উন্মুক্ত যবনিকার মধ্য দিয়া অনেক জিনিষ নয়নগোচর হইতে লাগিল। জীবনের সম্পূর্ণ অভিনয় হইল না ভাবিয়া যাহাদের বিবর্ণ মুখমণ্ডল উৎফুল্ল ভাব ধারণ করিয়াছিল তাহাদের অনেকেরই হৃদয় বিষাদে ম্লান হইয়া গেল—অনেকেরই মহতী আশা নিরাশায় পরিণত হইল। ঐ শুন কাহারা কানাকানি করিতেছে "সে বুঝি মরিবে না।" ক্ষুদ্র প্রাণ নিভিয়া যাইলেই সব গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু সংসারে ক্ষুদ্রেরাই মিট-মিট্ জ্বলিতে থাকে। সূর্য্য অস্ত যায় চাঁদ ডুবিয়া যায় তারকারা নিভিয়া যায় কিন্তু ক্ষুদ্র প্রদীপ সহজে নিভে না—যতক্ষণ পারে প্রাণপণে জ্বলিবার চেষ্টা করে। সূর্য্য চন্দ্রের মত সে লক্ষ বৎসর টিকে না—সেই জন্য বার ঘণ্টার স্থানে চৌদ্দ ঘণ্টা জ্বলিলেই সে আপনাকে কত কি মনে করিয়া লয়। মহৎ লোকেরা অমর। ক্ষুদ্রেরা হয়ত শত বৎসর মরণের দাসত্ব করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহাদের মত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না। ক্ষুদ্র প্রাণ হয় ত কত বৎসর সংসারের দাসত্ব করিবে। তাহার মরণই শ্রেয়। ক্ষুদ্রেরা সংসারের ঝটিকা সহিবার উপযুক্ত নয়—তাহারা শুধু সংসারের অভিমান কুড়াইতে আসে।

ক্ষুদ্র প্রাণ যত দিন টিঁকিয়া আছে—যতদিন সংসারের দাসত্ব করিতে নিযুক্ত আছে তত দিন তোমরা তাহাকে অভিশাপ দাও—তোমাদের অভিশাপ মাথায় লইয়া সে যেন মরিতে পারে। ভাঙ্গা কুঁলার মত তাহার মস্তকে তোমাদের ঘরের যত ছাই ঢালিয়া দাও—সে ধূলিসাৎ হইয়া গেলে যেন "বাকি আছে" বলিয়া আক্ষেপ না করিতে হয়। তোমরা তাহাকে যে অভিসম্পাত কর ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য। সে যে বিনা কারণে (হয় ত বা কোনও কারণ আছে) তোমাদের অভিশাপগুলি কুড়াইয়া লইবার যোগ্য বিবেচনা করিয়াছ ইহাতেই সে কৃতার্থ হইয়াছে। তোমরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কর সে তোমাদের দান বিস্মৃত হইবে না—তোমাদের নিকট হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিবে।

সেই ক্ষুদ্র প্রাণের চারিদিকে ছোট ছোট অনেকগুলি নূতন প্রাণ গজাইয়াছে—জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা নিরাশা লইয়া পৃথিবীর রণক্ষেত্রে বীরের মত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। প্রভাত সূর্য্যের প্রতিরশ্মিতে তাহাদের কত নূতন আশা সঞ্চিত হইতেছে। এই সকল নূতন আশা—নব উদ্যমের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র প্রাণের পুরাতন কাহিনী গুলি যেন আধ আধ দেখা দিতেছে। কত কাহিনী মিলাইয়া গিয়াছে—কত নিশীথ বাঁশীর গান সেখানে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অতীতের এই ঘুমন্ত ভাবের

ছায়ায় ভবিষ্যতের একটি ক্ষুদ্র আশা বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহার একটি ক্ষুদ্র পত্রে কে যেন সোণার অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে—

অন্তিমে একটি শুধু উদাসী পরাণ
ছিন্ন আশা ছিন্ন সুখ হারা শেষ তান।

ভবিষ্যতের এই উদাস ভাব প্রাণে কেমন বসিয়া যায়। ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীর ধূলিরাশি ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে কেমন পবিত্র হয়। বিষয় বাসনার তুচ্ছ কোলাহল সে সময়ে একেবারে যেন থামিয়া যায়—অনন্তের মহান্ সঙ্গীতে হৃদয় উথলিয়া উঠে।

ক্ষুদ্র প্রাণ নিজের পদশব্দে নিজেই চমকাইয়া উঠে। সে মনে করে যে তাহার তুচ্ছ প্রতিধ্বনি সংসারের শান্তি নাশ করে। কিন্তু সংসারে শান্তি কোথায়? সংসারের বাহিরেই শান্তি। সংসারের অতীত হইতে পারিলেই শান্তিলাভ করা যায়।

সংসারে কিছুই নাই। হেথা শুধু আকাঙ্খা—লালসার সুতীব্র দংশন। যে সন্তান-হীন সে মনে করিতেছে আমার কি দুরদৃষ্ট আমার বংশ লোপ হইল; যাহার সন্তান আছে সে তাহাদের রোগের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া মনে করিতেছে 'ভগবান আমায় কেন নিঃসন্তান করিলে না'; যাহার অর্থ আছে সে দেখিতেছে অর্থই সর্ব্বনাশের মূল', যে নিধর্ন সে ভাবিতেছে ধনই সকল সুখের মূল'। মনুষ্য কিছুতেই পরিতৃপ্ত নহে। সংসারে শুধু কোলাহল—শুধু হট্টগোল। হেথায় শান্তি কোথা? হেথা শুধু কানাকানি—চোখটেপাটিপি।

তোমরা সংসারের পক্ষ সমর্থন করিবে—বলিবে যে কতকগুলা যুক্তিহীন কথা সাজাইয়া সংসারকে গালি দেওয়া কিছু নয়। যথার্থই সংসার যে কাহাকে বলে তাহা ভগবান জানেন। সংসার যেন একটা মহা সমস্যা—ক্ষুদ্র বুদ্ধির তাহাকে বুঝিবার শক্তি নাই। চারিদিকে শুধু অন্ধকার—চক্ষুর সে অন্ধকার ভেদ করিবার সামর্থ্য নাই। ভগবান তুমিই জান।

এই মহা সমস্যার এক প্রান্তে পথহারা সেই ক্ষুদ্র প্রাণটী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—জীবনের রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া সংসারের ছায়ায় মিলাইয়া যাইতেছে। তাহার চারিদিকে নূতন পুরাতনের কোলাহল—পরিবর্ত্তনশীল জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহা বিপ্লবের রেখা—জগতের স্রোত ভাঙ্গা উচ্ছাসের সফেন তরঙ্গ। তাহার তুচ্ছ কাহিনী এই কোলাহলে ডুবিয়া গিয়াছে। নিতান্ত চীৎকার না করিলে কেহ তাহা শুনিতে পায় না। তাহার ভাঙ্গা গলার এত জোর নাই, যে জগতের কোলাহল ছাড়াইয়া উঠিতে পারে। ক্ষীণ প্রাণের ক্ষীণ কণ্ঠ ধীরে ধীরে থামিয়া আসিল। একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহার সাড়া দিল।

পরিবর্ত্তন। ইহ জীবনের কি যেন একটা প্রধান দৃশ্য সেই ক্ষুদ্র প্রাণের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইল। সে এত দিন যে পরিচতের মধ্যে বাস করিতেছিল আজ তাহার খানি-

কটা বই সমস্তটাই কেমন অপরিচিত। একটা অজানাভাব-চাপা পড়িয়া সে মৃতপ্রায়।

আর সেই প্রাচীন কুটীর। তাহার শ্যামল শেওলাগুলি মনুষ্যের কঠোর হস্তে লুপ্তপ্রায়। মনুষ্যের কঠোর অনুগ্রহে সেই প্রাচীন দেবদারুর অন্ত্যেষ্টি সৎকার সম্পন্ন হইয়াছে—তাহার ইহ জীবনের হর্ষ শোক চিরদিনের জন্য নিভিয়া গিয়াছে। এখন বর্ষাকালে আর সে কদম্ব ফুটে না—বর্ষার অশ্রুর মত ফুলগুলি চির বিদায় লইয়াছে।

সে সব গিয়াছে। সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া পুরাতনের কাহিনী চলিয়া গিয়াছে। নূতনের কিছুই নাই। পুরাতনের কাহিনীগুলিকে জাগাইয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার ছায়ায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। পুষ্করিণীর অধর চুমিয়া সন্ধ্যার সময় ঝির্ ঝির্ করিয়া যে মধুর বাতাসটুকু বহিয়া যাইত তাহাই শুধু পড়িয়া আছে। পুষ্করিণীর প্রাণের উচ্ছাস থামিয়া গিয়াছে—তাহার সেই উচ্ছাসের ক্ষীণ হাসিটুকু সাঁঝের প্রথম অশ্রুবিন্দুতে মিশাইয়া গেছে। সবই গিয়াছে। ক্ষুদ্র প্রাণও কোন্ না যাইবে? সে প্রতিমুহূর্ত্তে সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিরাত্মার আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছে—দু দিন পরেই চলিয়া যাইবে।

তাহার তুচ্ছ অভিমান অহঙ্কারের উপরে শ্মশানের শান্তিময় ছায়া পড়িয়াছে—তাহার ক্ষুদ্র মরমের বক্ষে মরণের সুমধুর গাম্ভীর্য্য প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু সে কি যাইবে? সে যাইলে কত মূর্ত্তিমান্ বিষাদ হরষে কাঁদিয়া উঠে। ধরণী আশীর্ব্বাদ কর যেন তাহাই হয়। তোমার আশীর্ব্বাদে সংসারের একটী বিষাদও যদি হরষিত হয় তাহা হইলে মা তুমি পুণ্যবতী। তাহা কি হইবে? তুমি বুঝি তোমার স্নেহ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহ না। কিন্তু তাহার জন্য তুমি কেন অভিশাপ কুড়াইবে? তোমার নিষ্কলঙ্ক প্রাণ তাঁহার জন্য কেন অভিশাপে ছাইয়া ফেলিবে? তুমি আনন্দের প্রতিমা—ভগবানের ইচ্ছায় তুমি দেবী। তোমার চরণে সে তাহার ভক্তিপূর্ণ প্রেম উৎসর্গ করিতেছে। ভগবানের অনুগ্রহে তুমি চিরদিন তোমার নিঃস্বার্থ প্রেম বিতরণ করিয়া সুখী হও। সে দীনকে শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর যে সে যেন কাহারও আড়াল না হয় কাহারও তীব্র কটাক্ষ পূর্ণ হাসির সম্মুখে না পড়ে।

স্বার্থময় সংসারের জটিল গোলকধাঁধায় ক্ষুদ্র প্রাণ পথহারা। শত সহস্র কুটিলতা তাহার পানে তীব্রদৃষ্টিতে তাকাইতেছে। গর্ব্বিত পরশ্রীকাতরতা আপনার দেমাকে ল্যাজ ফুলাইয়া বেড়াইতেছে। ক্ষুদ্র প্রাণ একটুকু পথ পাইলেই সরিয়া যায় কিন্তু হতভাগ্য পথ দেখিতে পাইতেছে না। হিংসার কুটিল কটাক্ষে সে জড়সড়। খাঁটি স্বার্থকে সে তেমন ভয় করে না কিন্তু নিঃস্বার্থ-স্বার্থকে দেখিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

সেই শরৎকালের পূর্ণিমায় সে যখন ভাগীরথীর প্রাণের উচ্ছাসে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সংসারের বাহিরে ঘুরিয়া আসিত তখন তাহার ক্ষীণ মরমে কত আনন্দই না জানি ছিল। এখন কি তাহা আছে? কে জানে।

এখন ত কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দুই দিন পূর্ব্বের উপহাস এখন উপহাসাস্পদ—দুই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের ঘৃণা এখন ঘৃণার্হ—গত কল্যের তাচ্ছল্য এখন সুমধুর মৃদু সম্ভাষণ। আর সেই সে দিনকার দিদিহারা আজ গম্ভীর দাদা।

সেই প্রাচীন কুটীর। সংসারের সমস্ত কষ্টের মধ্যেও সেখানে কেমন আরাম। সেখানে শত সহস্র অশান্তি থাকিলেও সে শান্তিময়। ক্ষুদ্র প্রাণ তাহার ছায়ায় জন্মিয়াছে তাহার ছায়ায় মরিলেই সে সুখী হইবে। সে (সেই কুটীরটী) নিজেই একটী ক্ষুদ্র জগৎ—তাহার মধ্যে যেন জগতের সমস্ত সুখ দুঃখ লীন হইয়া আছে। ক্ষুদ্র প্রাণের নিকট সে "স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

ঐ শুন সেই কুটীরে আজ কি মহা-কোলাহল। সেখানে আজ কত লোক জমিয়াছে—কত হাঁসির উচ্ছাস উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ যে তাহার দুয়ারে কাঙ্গালিনী অাঁচল পাতিয়া তৃষিত হিয়ায় বসিয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশু সন্তান স্তন্য পান করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—মাতা আজ তিন দিবস উপবাসের পর রুদ্ধকণ্ঠে ভিক্ষা মাগিতেছে। সে যদি জানিত যে তাহার দুঃখে দুঃখী হেথায় কেহ নাই—হেথায় শুধু মনুষ্যের কঠোর কণ্ঠোচ্চারিত "চলা যাও" ভিন্ন মায়া মমতা নাই তাহা হইলে সে কি এত আশা করিয়া বসিয়া থাকিত? দয়া তাহার জন্য হয় নাই—মনুষ্যত্ব তাহার উপকারের জন্য নহে। তাহার জন্য আচক্ষু-কুঞ্চিত নাসিকা—সমদর্শী ঘৃণা—উদাস তাচ্ছল্য। তাহার জন্য যদি মনুষ্যের মমতা থাকিত তাহা হইলে তাহাকে তোমরা এতদিন গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে—সে সংসারের যম-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইত।

সে মরুক্। মৃত্যুই তাহার ইহ জন্মের পুরস্কার। কিন্তু শিশুটীর তাহা হইলে কি হইবে? মাতৃহারা শিশু অনাহারে মরিবে। আর চারিদিকের দয়ালু ভাইগুলি অন্ধ সাজিয়া বসিয়া থাকিবে। জগতের কি ইহাই নিয়ম? হয় হৌক্।

আবার সেই কাহিনী। পুকুরধারে একটী যে শিশু-কনকচাঁপা আপনার আশাগুলি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে দু দিন পূর্ব্বে সে বুঝি ছিল না কিন্তু আজ সে ক্ষুদ্র প্রাণের প্রেমে বিগলিত। ক্ষুদ্র প্রাণ কাহার নিকট হইতে যেন বিদায় লইতে যাইতেছিল তাহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া যাইতে পারিল না। এক দিন সন্ধ্যার ছায়ায় সে কনকচাঁপাকে মনে মনে বলিয়াছিল "আজ তোর নিকট হইতে বিদায় লইলাম। যদি বাঁচিয়া থাকি আবার দেখা হইবে।" আজ বুঝি সেই দেখা হইল।

কিন্তু এ কি? এ কি সেই কনক? দু দিন পূর্ব্বে সে একাকিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কাঁদিত আজ তাহাকে জড়াইয়া কত লতা বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহাকে ত জড়াইয়া তাহারা উঠিতেছে, আর এখানে?—এখানে ছিন্ন লতিকা জননী সৌন্দর্য্যের ম্রিয়মান ছবি দেখিয়া আকুল প্রাণ শীতল করিতেছেন। প্রকৃতির এ মর্ম্মখেলা কে বুঝে?

সেই ক্ষুদ্র প্রাণ ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিতেছে। তাহার দলিত হৃদয়ের মুমূর্ষু

আশালতা চিরদিনের মত শুকাইয়া গেছে। জটিল স্বার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কানাকানির ঢেউ গুলি তাহার ক্ষুদ্র বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। নিভ নিভ হইয়াও সে নিভিতে চাহে না। তোমাদের আশীর্ব্বাদে সে যেন শীঘ্রই ধূলিতে মিশায়।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তা মারীয়া।

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।)

দীর্ঘ শীতের রাতও শেষে পোহায়, আঁধার ভাঙিয়া আলোকের রেখা ফুটিয়া উঠে, মেঘের কাল বিষাদ ভরা মুখেও অন্য জগতের জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্কা পূর্ণ হৃদয়ে যেমন আশার আভাস, মেঘের বুকের ভিতর যেমন দুই একটি নিভ নিভ তারা, তেমনই আশা, তেমনই আলোক রোসনের চক্ষুতে। রাত পোহাইতেছে কিন্তু আকাশ তেমনই মেঘ ভরা। উষা যেন শীত-কাতর, অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইতেছে। শান্তার জ্ঞান এখনও হয় নাই। সে তখন নিদ্রা কাতর কিম্বা জ্ঞান শূন্য তাহা বোঝা যায় না। আমি বোধ হয় মধ্যে খানিকটা ঘুমাইয়াছিলাম কারণ হঠাৎ একবার মনে হইয়াছিল সামনে ও কে, আমি কোথা হইতে এখানে আসিলাম, পর মুহূর্ত্তেই আবার সব কথা মনে পড়িল। শান্তাকে দেখিয়া আমার একটি চিত্র মনে পড়িল। কতদিন হইল সেটি দেখিয়াছিলাম কতদিন বিস্মৃতির পর হঠাৎ আবার তাহা যেন দেখিতে পাইলাম। সে ছবি খানি এমন কিছুই নহে। দেখিবা মাত্র তাহা প্রায় কাহারও ভাল লাগে না কিন্তু একবার যে তাহার অর্থ বুঝিয়াছে সে শতবার দেখিয়াও তৃপ্ত হয় না। কত যোজন ধরিয়া যেন বড় বড় গাছ চলিয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘ, দূর প্রান্তে আলোকের একটি রেখা মাত্র। গাছের পাতা অস্পষ্ট। সম্মুখের ভূমিখণ্ড তাম্র-পাটল। সফেন তরঙ্গায়িত নীল সমুদ্রের খণ্ড আকাশ, যেন তুফান শেষ হইয়া গিয়াছে আর ভয় নাই দূরে আলোক রেখা দেখা গিয়াছে। গাছগুলি স্থির, যেন নিতান্ত ক্লান্ত। আর আঁধার যায় যায় যাইতেছে না। আকাশ ভরা আঁধারের মধ্যে উষার প্রথম শুভ্র হাসি। জন মানব নাই। শুধু আকাশ, অরণ্য এবং প্রান্তর এবং সেই আকাশ অরণ্য এবং প্রান্তর অতিক্রম করিয়া কোথা হইতে কিসের যেন আলোক আসিতেছে। কিন্তু সে আলোকও তমসাচ্ছন্ন শান্তার মুখের ভাতির মত। হঠাৎ কত-দিনকার ছবিখানির কথা মনে পড়িল। শান্তার মুখে সেই আঁধার, সেই আলোক,

সেই জগৎ ছাড়া-ভাতি আর সেই জগতের বিষাদ, মৃত্যুর ছায়া কেমন যেন একত্র মিশিয়াছিল। হৃদয় এমন বিষন্ন হইয়া গেল, সারা রাতের আশা যেন একেবারে চলিয়া গেল। শান্তা বাঁচিবে না কেমন হঠাৎ মনে হইল। আঁধার শীতের রাতেও আশা ছিল কিন্তু ক্ষীণ উষার আলোকে সে আশা খুজিয়া গেল। আমার মনে হইল শান্তা বাঁচিবে না।

রোসনের মুখ দেখিয়া সেই ছবি আবার মনে পড়িল। তুফান থামিয়া গিয়াছে, তবু সমুদ্রের হৃদয় অস্থির, কিন্তু সে অস্থৈর্য্য সীমাবদ্ধ নহে বলিয়াই ভয়ানক। সেই ভয়ানক ভাবের মধ্যেও ঔদার্য্যের সৌন্দর্য্য আছে। যাহা হইবে তাহার উপর তোমার আমার হাত নাই, নিতান্ত ক্ষুদ্র মানব হৃদয়ের অস্থৈর্য্য কেন। যাহা হাত বাড়াইয়া পাইব না, যাহা কখন মানুষে পাইবে না তাহা হারাইব ক্ষুদ্র হৃদয়ের কাতরতা দিয়া তাহা পরিমেয় নহে। অসীমের সম্মুখে মানবের সীমাবদ্ধ আকাঙ্ক্ষা কি স্থান পায়। রোসনের হৃদয়েও সেই ভাব। তাহাতে আশা নাই, নিরাশা নাই, উদ্বেগ নাই তাহা পর্ব্বতের মত মূলবদ্ধ কঠোর এবং ভয়ানক। কিন্তু পর্ব্বতেরও হৃদয় ফাটিয়া অশ্রু পড়ে, পর্ব্বতের গায়ে পল্লবিনী লতা জড়াইয়া থাকে, পর্ব্বতের ললাটে সূর্য্যের ভাতি চন্দ্রের কিরণ দেখিতে পাওয়া যায়; আবার সেই পর্ব্বত অকাতরে বরফের স্তূপ মাথায় বহে, বুকের শত সহস্র উৎসব লুকাইয়া রাখে।

আমি এইরূপ ভাবিতেছিলাম, রোসন কি ভাবিতেছিল জানি না। সে শান্তার চুল সযত্নে তাহার মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিতেছিল এবং তাহাকেই দেখিতেছিল। জগতে যেন আর কেহ নাই আর কিছুই নাই—শুধু শান্তা—না, শুধু শান্তার মুখখানি। আমি বলিতে গিয়াছিলাম যে রোসনের নিকট শান্তার জীবন ও মৃত্যু প্রায়ই এক। কিন্তু তাহা যদি বলিতাম, তুমি তাহাকে নিতান্ত নির্ম্মম, হৃদয়শূন্য ভাবিতে তাই বলিবার ইচ্ছা সত্বেও বলিলাম না। রোসনের পক্ষে শান্তা শরীরী নহে। শুদ্ধ আত্মা মাত্র। তাহার মুখ সেই আত্মার মূর্ত্তি, আর কিছুই নহে। ইহা যদি নির্ম্মম ভাব তাহা হইলে আমাদের উদার ভাব আর কি আছে। হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ভাবের ভাব যাহা, যাহা দ্বারা তুমি আমি সংসার এক সূত্রে বাঁধা আছি সেই আত্মা যাহার মুখে দেখিতে পাই সেই হৃদয়ের দেবতা, হৃদয়ের সব ভালবাসা, কামনা, ধর্ম্ম তাহারই জন্য। রোসনের নিকট শান্তা দেবী, দূর জগতের কল্যাণময়ী মূর্ত্তি, আমাদিগের ক্ষুদ্র পৃথিবীর নেত্রী। লোকে তাহাকে প্রণয় বলে, ভালবাসা বলে, অনেক নাম দেয়।

ক্রমে প্রভাত হইল। আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল। ঘরের ভিতর আলোক আসিল। আমি উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়াইলাম। পরদা সরাইয়া বাহিরে দেখি যে রাস্তায় বরফ গলিয়া কর্দ্দমময় হইয়াছে শত কোটি গৃহের উপর

কয়লার ধূম উড়িতেছে আকাশের আলোক তাহা ভেদ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটের গাড়ী বহিয়া বড় বড় ঘোড়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। তাহাদিগের সাজ সজ্জা অনেক রকম। কাহারও গলায় ঘণ্টা, কাহার ও কানে পিতলের ফুল, কপালের উপর ঝুঁটি বাঁধা, ঘাড়ের চুল বিনাইয়া দেওয়া এবং সকলকারই লেজ থোপা কোরে বাঁধা। অত সাজ গোজের পরও খাট্‌তে হয় এই দুঃখ! কোন গাড়ীর উপর প্রশান্ত ভাবে পাইপ টানিতে টানিতে, আনমেষ চক্ষে নিজের ফুৎকারিত ধূম শিখা দেখিতে দেখিতে জগৎকে উপেক্ষা করিয়া, দুরন্ত শাত অবহেলা করিয়া, শ্বেতাঙ্গ গাড়োয়ান চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে 'হোল্ড' বলিতেছে এবং সারি সারি গাড়ী একেবারে দাঁড়াইতেছে এবং যেখানকার যে মোট তাহা নামাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার "ইয়ই" বলিবা মাত্র আবার সবগুলি একত্রে চলিয়াছে। দূরে দুধওয়ালার অদ্ভুত চীৎকার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। রাস্তায় আর কোন গোল নাই। পথের উপর বেলে পাথরের ধাপগুলির উপর উপুড় হইয়া সাদা টুপি পরা দাসীরা ধাপ ঘঁসিয়া পরিষ্কার করিতেছে কেহ বা কাঁচের দোর সাফ করিতেছে। এখনও লণ্ডন জাগে নাই। এখনও দেখিলে মনে হয় জগতে শান্তি আছে, আঁধার থাকুক আর নাই থাকুক শান্তি আছে, সুখ আছে, মানুষের মাথার উপর গৃহ আছে, শিশুটির মায়ের কোল আছে। আর দুই এক ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনের আর এক ভাব হইবে। চঞ্চল জাবন অস্থিরভাবে এখানে ওখানে দ্রুতপদে ঘুরিতেছে, নিশ্বাস লইবার যেন সময় নাই, এবং সে নিশ্বাসেও বিষ। এ সব সত্ত্বেও লোক বাঁচিয়া আছে—আমাদিগের সুন্দর দেশের লোকের মত বাঁচিয়া আছে।

লণ্ডনের সুপ্ত মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে এবং খানিকটা পরেই তাহার জাগ্রত অবস্থা আবার যে দেখিয়াছে তাহার পক্ষে জীবনের অর্থ একেবারে অন্য রকমের, এদেশে আমরা তাহা বুঝি না। ঈশ্বর করুন কখনও যেন তাহা বুঝিতে না হয়। মারামারি করিয়া বাঁচিবার কি প্রয়োজন। যতদিন প্রাণ থাকে কোন রূপে দিনাতিপাত করা মারামারি করিয়া দুই মুষ্টি অধিক আহার করার চেয়ে ভাল। এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। এ বিষয় অনেক বক্তৃতা হইতে পারে, কিন্তু মনে থাকে যে আমি রোসনের বন্ধু। তাঁহার সঙ্গদোষে আমার খানিকটা অবনতি হইয়াছে।

জানালায় দাঁড়াইয়া এই সব ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল শান্তার বাড়ী খোঁজ করা আমাদের উচিত। কিন্তু এই বিপুল লণ্ডনে কোথায় খোঁজ করা যায়। খানিকটা ভাবিলাম। পরে যেখানে শান্তাকে প্রথমে দেখিতে পাই সেইখানে যাওয়া স্থির করিলাম। শান্তা যেখানে শুইয়াছিল সেখানে রোসনকে দেখিতে পাইলাম না। রোসন কোথায়? দেখি তাহার ঘরের সেই কোণটিতে হাফেজ মাথায় দিয়া রোসন নিদ্রিত। দেখিয়াই বোধ হইল তাহার নিদ্রা যাইবার যেন ইচ্ছা ছিল না হাতের উপর শান্তার

তুষার শ্বেত সুন্দর হাত খানি শাখাছিন্ন লতার মত পড়িয়া আছে। শান্তার ক্লিষ্ট মুখ খানির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতেই যেন রোসন ঘুমাইয়া গিয়াছে।

দাসীকে বলিয়া গেলাম যে আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিব। শান্তার বাড়ীর কোন উদ্দেশ পাই কি না জানিতে বাহির হইলাম। রাস্তার মোড়ে একখানি গাড়ী লইয়া টেমস্ নদীর ধারে চলিলাম। গাড়োয়ান একটু আশ্চর্য্য হইয়া মুখের দিকে তাকাইল। এত সকালে এই দুরন্ত শীতে নদীর ধারে হাওয়া খাইতে যাওয়া তাহার নিকট খুবই নূতন বোধ হইল। অল্প সময়েই সেইখানে পঁহুছিলাম। প্রথমে যেখানে শান্তাকে আমরা দেখিতে পাই সেখানে কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। বরফ গলিয়া কাদা হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে কাদার মত বরফ, আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তবু এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলাম। কোন বেঞ্চের উপর অর্দ্ধাবৃত স্ত্রীলোক, শিশু কোলে, মুখে ময়লা রুমাল দিয়া ঘুমাইতেছে। কোন স্থানে সাঁকোর খিলানের নীচে ছোট বালক বালিকা গলা ধরিয়া নিদ্রিত আর তাহারই অনতিদুরে জঘন্য অপবিত্র চিত্র। পাপ পুণ্য ক্ষুধার যন্ত্রণায় একই স্থানে পবিত্র অপবিত্রের কোন্ ভেদ নাই। সকলেরই এক দশা। চলিয়াছি, অনেকক্ষণ চলিয়াছি, গাড়ী সঙ্গে আসিতেছে। কোথা যাই কি করি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। হঠাৎ মনে হইল পুলিষে গেলে কোন সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে, অন্ততঃ শান্তার বিষয় বলিয়া রাখা যাইতে পারে। শান্তার যেরূপ অবস্থা কখন কি হয় কে জানে। শেষে যদি তাহার মৃত্যুই হয় তখন পুলিষের নিকট জবাবদিহী করার চেয়ে আগে হোতে খবর দেওয়া ভাল। থানায় উপস্থিত হইলাম। আমাদের দেশের মত কনেষ্টবল মহাশয় চড়া মেজাজে "তুমারা কেয়া দরকার" জিজ্ঞাসা করিলেন না। এখানকার মত প্রাণ হাতে কোরে সেখানে যেতে হয় না। সেখানে পেয়াদা থেকে দারগা মহাশয় কাহারও বিশ্বাস নয় যে তিনি লাট সাহেব। দাসের দেশে পুলিষ রাজা। দাসের দেশে পুলিষ পিশাচ। আমি যাইবা মাত্র একজন কনেষ্টবল দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহাকেই আমার আসিবার কারণ বলিতে যাইতেছিলাম। সে তাহাতে বলিল "আমাকে কিছু বলিবেন না, আমার কিছু শুনিবার অধিকার নাই আসুন দারগা মহাশয়ের নিকট সব বলিবেন।" দারগা যেখানে বসেন তাহার সামনেই রেলোয়ের টিকিট দেবার জানালার মত একটা জানালা আছে। কনেষ্টবলটি একটিবার তাহাতে আস্তে আঘাত করিল। ভিতর হইতে দারগা জানালা খুলিয়া দিলেন অমনি যে কনেষ্টবলটি সঙ্গে আসিয়াছিল সে চলিয়া গেল। দারগাটি আমাকে অভিবাদন করিয়া একখানি খাতা বাহির করিলেন। "আপনার যাহা বলিবার আছে বলুন আমি লিখিয়া লইতেছি।"

আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলাম। লেখা হইয়া গেলে তিনি আমার নাম ধাম স্বাক্ষর লইলেন। পরে বলিলেন "আপনি যদি একটু অপেক্ষা করিতে পারেন আমি আপ-

নার সহিতই বাহির হইতেছি আমার ওদিকে একটা কাজ আছে।” কথাটি বলিতে বলিতে আমার কেন হঠাৎ বোধ হইল যে তাঁহার গলার স্বর পরিবর্ত্তন হইল। আমি বলিলাম আনন্দ সহকারে অপেক্ষা করিব। পরে দুইজনেই বাহিরে আসিলাম। অন্য একজনকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়াই বলিলেন—

“কাল রাত্রে একটি ছোট বালিকার মৃতদেহ লণ্ডন ব্রীজের নিকট পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার শরীরে এমন কোন চিহ্ন নাই যাহার সাহায্যে সে কে সন্ধান করা যাইতে পারে। আমার বোধ হয় কোন অনাথা তাহাকে আহার দিতে অশক্ত হইয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিল।” পরে একটু দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিলেন “মধ্যে মধ্যেই আমরা ওরূপ ছোট ছেলে মেয়ে কুড়াইয়া পাই। চলুন হাঁসপাতালে আর একবার মেয়েটিকে দেখে আপনার সঙ্গে যাই। আপনার ত কোন আপত্তি নাই”?

“না চলুন। আপনাদিগের কাজ মধ্যে মধ্যে খুবই কষ্টজনক নহে কি? আমার বোধ হয় যে প্রত্যহ সহস্র পাপ দেখিয়া আপনাদিগের দয়া মায়া একটু কম হইয়া যায়। অন্ততঃ আমার বোধ হয় কমিয়া যাইত।”

মিষ্টার বার্ণার্ড (দারোগা) বলিলেন “না সব সময়ে সকলকার সম্বন্ধে ও কথা সত্য নহে। পাপ দেখিয়া পাপের উপর ঘৃণা হইতে পারে কিন্তু পাপীর জন্য মমতা জন্মে। আপনারা নিয়তি কথার অর্থ বোঝেন না।”

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে আমরা হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলাম। যদি লণ্ডনে কোন-স্থান দেখিয়া মনে হয়, ইংরাজ বড় জাতি সেণ্টপলের নিকট শিশুদিগের যে হাঁসপাতাল তাহা দেখিলে মনে হয় ইংরাজ দেবতা। বাড়ীটির বাহিরে জাঁক জমক কিছুই নাই। শুদ্ধ সিঁড়ির নিকটে মুমূর্ষ শিশুকোলে একটি স্ত্রী মূর্ত্তি। আমরা ক্রমে উপরে উঠিলাম। কত শত ছোট ছোট বিছানার উপর পীড়াকাতর ছেলে মেয়ে শুইয়া আছে। অধিকাংশই নিদ্রিত। দুই একজন যাহারা জাগিয়া, তাহাদিগের নিকট কাল কাপড়ের উপর সাদা এপ্রন্ (একরূপ মলমলের আচ্ছাদন) পড়া মাথায় সাদা টুপি পরা জনকত ভদ্র মহিলা যাঁহারা পীড়িতের শুশ্রূষাই জীবনের মহান উদ্দেশ্য করিয়াছেন. তাঁহারা সেবায় নিযুক্ত। জীবনে মায়ের ভালবাসা যাহারা পায় না সেই পরিত্যক্ত শিশুদিগের মাতার স্বরূপ এই দেবী পরিসেবিকারা কল্যাণ-নিরতা। সকল বিছানা গুলিরই সামনে ফুলের তোড়া, ঘরের দেয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি এবং মধ্যে মধ্যে বাইবেলের দুই এক ছত্রের বড় বড় অক্ষরের ছাঁপা ঝোলান। মৃত্যু যাহাদিগের উপস্থিত তাহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। দ্রুত পদে সেই ঘরের পাস দিয়া যাইতেই যাহা দেখিলাম তাহাতে মন কেমন খারাপ হইয়া গেল। বার্ণাডেরও মুখে বিষদের ছায়া দেখিতে পাইলাম, দুই এক মুহূর্ত্ত পরেই মৃতদেহ যে ঘরে রাখে সেই খানে উপস্থিত হইলাম। একটি সাদা কাঠের টেবিলের উপর নিতান্ত ছোট একটি শব

রহিয়াছে। আমরা তাহারই কাছে গেলাম। বার্ণার্ড তাহার মুখের আবরণ উঠাইল। বালিকা দুই তিন মাস মাত্র এ জগতে আসিয়াছে। দুই তিন মাসের জীবনের লীলা শেষ করিয়া আবার কোন জগতে চলিয়া গিয়াছে কে জানে? বোধ হয় গতজীবনের পাপ ঘুচাইবার জন্য এত কম সময় কোন পুণ্যবতী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বালিকাটির গায়ের আবরণও ক্রমে উন্মুক্ত করা হইল। যদি তুষার শয্যায় স্নো-ড্রপ ফুল Snow drop দেখিয়া থাক তাহার ঈষৎ নীল শুভ্র কান্তি কখনও তোমার চোখে পড়িয়া থাকে তাহা হইলে বালিকাটির সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব বুঝিতে পারিবে। * যদি কখনও প্রস্ফুটিত চামেলী ফুল ধূলামাখা দেখিয়া থাক তাহা হইলেও খানিকটা বুঝিতে পারিবে যে বালিকার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে জগতের ছায়া কতটুকু পড়িয়াছিল। আকাশের মেঘ, যাহা আমরা দেখিতে পাই, তাহা যদিও অসীম, অস্পর্শ বিস্তৃতির উপর ভাসিতে দেখি, কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপরে দাঁড়াইয়া দেখি বলিয়া, সে মেঘ গুলি পূর্ণভাবে অমল দেখি না। বালিকার শরীরে, বালিকার মুখে খানিকটা কেমন কালিমা ছিল—যেন কাতর প্রাণের কাতর কাহিনী তাহার সুন্দর চক্ষুপুটে লেখা। আমি কি জানি কি ভাবিতেছিলাম হঠাৎ বার্ণার্ড বালিকার বাম হস্তের নীচে একটা উলকি দেখাইল, বলিল।

"কাল রাত্রে আমরা উলকিটি দেখিতে পাই নাই একটা কি লেখা আছে বোধ হচ্ছে। আপনি পড়ুন দেখি।"

অনেক কষ্টে আমি পড়িলাম "Misericorde. 18— ।""পাপীর প্রভু দয়া কর—১৮।" চোখে জল আসিল। একটি জীবনের সমস্ত ইতিহাস যেন ঐ কয়েকটি কথাতে লেখা আছে মনে হইল। কোন পাপী, কিসের পাপ—কিসের জন্য পাপ কত কথা মনে হইল। আমি বালিকার মৃত দেহের কথাই একেবারে ভুলিয়া গেলাম। হঠাৎ আবার বালিকার মুখের উপর চোখ পড়িল, হঠাৎ শান্তার মুখের ভাব মনে পড়িল। চকিত চক্ষে আর একবার সে মুখ দেখিলাম। বালিকার চোখ শান্তার চোখের মত।

পর মুহূর্ত্তেই ভাবিলাম শান্তার পীড়াকাতর মুখ দেখিয়া আসিতেছি বলিয়াই ঐরূপ মনে হইতেছে। কিন্তু মন কেমন হইয়া গেল।

এই সময় বার্নার্ড বলিলেন "আমি আরও একটু অনুসন্ধান করিয়া যাইব এই পীড়া-রেজেষ্টরি আফিসে জন্ম মৃত্যুর খাতা একবার দেখিতে যাইব। আপনি আর আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন না। আমি যত শীঘ্র পারি আপনাদিগের ওখানে যাইতেছি।"

আমি শান্তার ও বালিকার মরা মুখখানির কথা ভাবিতে ভাবিতে ফিরিলাম।

বিফল মিলন।

মিলন হল যদি
নিরবধি
কাঁদিয়া,
রাখিতে পারি না যে
হৃদি মাঝে
বাঁধিয়া!
প্রেমের ফুল-পাশে
মরে ত্রাসে
যে জনা,
কেমনে রাখি তারে
বারে বারে
সাধিয়া!
ফুটো না ফুল রাশি,
আর বাঁশি
বেজো না,
হেথা যে অমানিশি
দশ দিশি
আঁধিয়া!

যে জন চলিয়াছে
তারি পাছে
সবে ধায়!
নিখিলে যত প্রাণ
যত গান
ঘিরে তায়।
ধরার রূপ ভার
লুটে তার
চরণে,
ধায় গো উদাসিয়া
যত হিয়া
পায় পায়।

যে জন পড়ে থাকে
একা ডাকে
মরণে!
সুদূর হতে হাসি
আর বাঁশি
শোনা যায়!

ছিলাম নিশি দিন
আশাহীন
প্রবাসী,
বিরহ মায়াবনে
আনমনে
উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে
দিশে দিশে
খেলিত;
অটবী বায়ুবশে
উঠিত সে
উছাসি।
কখনো ফুল দুটি
আঁখিপুট
মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে
পড়িত রে
নিশাসি'।

তবু সে ছিনু ভালো
আধা-আলো-
আঁধারে,
গহন শত-ফের
বিষাদের
মাঝারে!

নয়নে কত ছায়া
কত মায়া
ভাসিত,
উদাস বায়ু সে ত
ডেকে যেত
আমারে !
ভাবনা কত সাজে
হৃদিমাঝে
আসিত,
খেলাত অবিরত
কতশত
আকারে !

বিরহ-পরিপূত
ছায়া-যুত
শয়নে,
ঘুমের সাথে স্মৃতি
আসে নিতি
নয়নে।
কপোত দুটি ডাকে,
বসি শাখে,
মধুরে,
দিবস চ'লে যায়
গ'লে যায়
গগনে !
কোকিল কুহু তানে
ডেকে আনে
বধুরে,
নিবিড় শীতলতা
তরুলতা-
গহনে !

আকাশে চাহিতাম,
গাহিতাম
একাকী,
বুকের যত কথা,
ছিল সেথা
লেখা কি ?
দিবা রজনী ধ'রে
ধ্যান ক'রে
তাহারে,
নীলিমা-পরপার
পাব তার
দেখা কি ?
তটিনী অনুক্ষণ
ছোটে কোন্
পাথারে !
আমি যে গান গাই,
তারি ঠাঁই
শেখা কি ?

বিরহে তারি নাম
শুনিতাম
পবনে,
তাহারি সাথে থাকা
মেঘে ঢাকা
ভবনে।
পাতার মরমর,
কলেবর
হরষে ;
তাহারি পদধ্বনি
যেন গণি
কাননে।

মুকুল সুকুমার
যেন তার
পরশে ;
চাঁদের চোখে ক্ষুধা
তারি সুধা-
স্বপনে !

করুণা অনুক্ষণ
প্রাণমন
ভরিত,
ঝরিলে ফুলদল
চোখে জল
ঝরিত !
পবন হুহু ক'রে
করিতরে
হাহাকার,
ধরার তরে যেন
মোর প্রাণ
ঝুরিত !
হেরিলে দুখে শোকে
কারো চোখে
আঁখিধার
তোমারি আঁখি কেন
মনে যেন
পড়িত !

শিশুরে কোলে নিয়ে
জুড়াইয়ে
যেত বুক,
আকাশে বিকাশিত'
তোরি মত
স্নেহমুখ !

দেখিলে আঁখি-রাঙা
পাখা-ভাঙ্গা
পাখীটি,
"আহাহা" ধ্বনি তোর
প্রাণে মোর
দিত দুখ !
মুছালে দুখনীর
দুখিনীর
আঁখিটি,
জাগিত মনে ত্বরা
দয়া-ভরা
তোর সুখ !

সারাটা দিনমান
রচি গান
কত না !
তোমারি পাশে রহি
যেন কহি
বেদনা।
কানন মরমরে
কত স্বরে
কহিত,
ধ্বনিত' যেন দিশে
তোমারি সে
রচনা।
সতত দূরে কাছে
আগে পাছে
বহিত
তোমারি যত কথা
পাতা লতা
ঝরণা।

তোমারে আঁকিতাম,
রাখিতাম
ধরিয়া।
বিরহ ছায়াতল
সুশীতল
করিয়া।
কখন দেখি যেন
ম্লান-হেন
মুখানি,
কখন আঁখি-পুটে
হাসি উঠে
ভরিয়া।
কখন সারারাত
ধরি হাত
দুখানি,
রহি গো বেশবাসে
কেশপাশে
মরিয়া!

বিরহ সুমধুর
হল দূর
কেন রে!
মিলন-দাবানলে
গেল জ্বলে
যেন রে!
কই সে দেবী কই
হের ওই
একাকার,
শ্মশান-বিলাসিনী
বিবাসিনী
বিহরে!
নাই গো দয়ামায়া,
স্নেহছায়া
নাহি আর,
সকলি করে ধূধু
প্রাণ শুধু
শিহরে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাসায়নিক কার্য্যের উত্তাপ।

কাষ্ঠ দগ্ধ হইলে উত্তাপের আবির্ভাব হয়; ইহার কারণ কি? যখন কাষ্ঠ জ্বলে তখন উহাতে স্থিত অঙ্গার ও উদকজানের পরমাণুগুলি বায়ুস্থিত অম্লজানের পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়; আর এই সংযোগ হইবার সময় উত্তাপ আবির্ভূত হয়। এই প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়টী সূক্ষ্মরূপে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি। সদ্যঃপ্রস্তুত শুষ্ক চূর্ণ যখন জলের সহিত মিশ্রিত করা যায়, তখন উত্তাপ উৎপন্ন হয় ইহা প্রায় সকলেই জানেন; সেইরূপ আবার কষ্টিক পটাশ নামক ক্ষার, সল্‌ফিউরিক আসিড নামক গন্ধক দ্রাবক, আলকোহল নামক সুরাসার ইত্যাদি অনেক বস্তু জলের সহিত মিশ্রিত করিলে উত্তাপ বাহির হয়। ইহার কারণ এই যে ঐ সকল বস্তুর অণুগুলি জলের অণুর সহিত সংযুক্ত হয়। আবার যখন গন্ধক, কয়লা ও সোরা এই তিন বস্তু মিশ্রিত করিয়া বারুদ প্রস্তুত করা হয় আর তাহাতে এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি আনা হয়, তখন কিরূপ

উত্তাপ হয় তাহা সকলেই জানেন; এস্থলেও উত্তাপের কারণ রাসায়নিক সংযোগ, গন্ধক ও কয়লা (অঙ্গার) সোরাস্থিত অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হয়। এক্ষণে দেখা যাউক রাসায়নিক সংযোগজাত উত্তাপ কোন নিয়মের বশীভূত কি না। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা অনেকগুলি ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন; সংক্ষেপে আমরা তাহার দুই একটী এখানে বলিতেছি। একসের ওজনের উদকজান যদি যথেষ্ট 'পরিমাণ অম্লজানের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে তাড়িত যন্ত্র দ্বারা এক স্ফূলিঙ্গ তড়িৎ প্রবেশ করান যায়, তবে ঐ তড়িতের উত্তাপে উদকজান অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইলে এত উত্তাপ জন্মে যে তাহাতে ৩৪৪৬২ সের জল শতাংশিক তাপমানের ০ হইতে ১ ডিগ্রি পর্য্যন্ত) এক ডিগ্রি উত্তপ্ত করা যাইতে পারে। সেইরূপ আবার একসের অঙ্গার অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্ব্বনিক আসিড গ্যাস হইলে এত উত্তাপ হয় যে তাহাতে ৮০৮০ সের জল এক ডিগ্রি শতাংশিক উত্তপ্ত করা যাইতে পারে। আবার একসের উদকজান ক্লোরিন নামক গ্যাসের সহিত সংযুক্ত হইলে যত উত্তাপ হয় তাহাতে ২২০০০সের জল উক্ত মাত্রায় উত্তপ্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ অনেকগুলি বস্তুর পক্ষে পণ্ডিতেরা তাহাদিগের রাসায়নিক সংযোগ জাত উত্তাপের পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাসায়নিক সংযোগে যেমন উত্তাপ আবির্ভূত হয়, রাসায়নিক বিয়োগে আবার সেইরূপ উত্তাপ অন্তর্হিত হয়—শুদ্ধ তাহা নহে; পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সংযোগে যত পরিমাণে উত্তাপ আবির্ভূত হয়, বিয়োগে আবার ঠিক তত পরিমাণে উত্তাপ অন্তর্হিত হয়। ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একসের জল এক ডিগ্রি শতাংশিক উত্তপ্ত করিতে যে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, তাহাকে যদি একডিগ্রি উত্তাপ বলা যায়—তবে উদকজান ও অম্লজানে যুক্ত হইয়া যখন জল উৎপন্ন হয়, তখন উক্ত রাসায়নিক সংযোগ জাত উত্তাপের পরিমাণ প্রত্যেক একসের ওজন উদকজানের পক্ষে ৩৪৪৬২ ডিগ্রি। সেইরূপ আবার উদকজান ও অম্লজান যুক্ত হইয়া যখন হাইড্রক্সিল হয় তখন ঐ উত্তাপের পরিমাণ প্রত্যেক একসের উদকজানের পক্ষে ২৩৫০০ ডিগ্রি।* সুতরাং যখন জলের অণু

* জল ও হাইড্রক্সিল এই দুইটী উদকজান ও অম্লজান হইতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে গঠিত; জলে এক ভাগ ওজন উদকজান আর আটভাগ ওজন অম্লজান আছে—হাইড্রক্সিলে উদকজান একভাগ আর অম্লজান ষোলভাগ।

এই কথাটী আরও এক রকমে বলা হইয়া থাকে—জলে দুই পরমাণু উদকজান এক পরমাণু অম্লজানের সহিত, আর হাইড্রকসিলে দুই পরমাণু উদকজান দুই পরমাণু অম্লজানের সহিত সংযুক্ত থাকে। এক পরমাণু অম্লজান এক পরমাণু উদকজান অপেক্ষা ষোলগুণ ভারী। জলকে উদকজানের মনক্সাইড অর্থাৎ এক-অম্লজান-যৌগিক, আর হাইড্রক্সিলকে ডাইঅক্সাইড অর্থাৎ দ্বি-অম্লজান-যৌগিক বলে।

ভাঙ্গিয়া অম্লজানের সহিত যুক্ত হইয়া হাইড্রক্‌সিল প্রস্তুত হয়, তখন (৩৪৪৬২—২৩৫০০) প্রায় ১১০০ ডিগ্রি উত্তাপ অন্তর্হিত হওয়ার কথা; আর কার্য্যতঃ ইহাদেখা যায় যে কোন উপায়ে এই ১১০০ ডিগ্রি উত্তাপ (যাহা অন্তর্হিত হবে) সরবরাহ করিতে না পারিলে উক্ত বস্তু প্রস্তুত হয় না। এক্ষণে দেখা যাউক সংযোগেই বা কেন উত্তাপের আবির্ভাব হয় আর বিয়োগেই বা কেন উহার তিরোভাব হয়। আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহারা বাহিরে গতিহীন হইলেও ভিতরে তাহা নহে। তাহাদিগের সব অণুগুলি দোলকের ন্যায় এক এক নিৰ্দ্দিষ্ট বিন্দুর এদিক ওদিক দুলিতেছে—যেস্থানের মধ্যে দুলিতেছে তাহা শূন্য নহে কিন্তু তথায় ঈথর নামে এক অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। বস্তুর মধ্যাস্থিত অণুগুলি যেমন এক এক নির্দ্দিষ্ট স্থলে দুলিতেছে, অণুর মধ্যস্থিত পরমাণুগুলিও আবার সেইরূপ দুলিতেছে। এইরূপ সকল বস্তুই গতিশীল, অর্থাৎ তাহাদিগের অণুগুলি অবিরত দুলিতেছে। যে তেজ প্রভাবে এই গতি নির্ব্বাহ হয় তাহার নাম উত্তাপ; কি কঠিণ, কি জলবৎ কি বায়বীয় সকল বস্তুরই এই উত্তাপ জনিত আণবিক গতি আছে। অণুগুলি যেমন উত্তাপ প্রভাবে নড়িতেছে, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা করিতেছে—তাহারা আবার পরস্পরকে আকর্ষণও করিতেছে। এই আকর্ষণের নাম যোগাকর্ষণ; কঠিণ বস্তুতে উত্তাপের তেজ অপেক্ষা যোগাকর্ষণের তেজ অধিক (এই নিমিত্ত তাহার অণুগুলি অত অবিচ্ছিদ্য ভাবে পরস্পরের নিকট অবস্থিত,) জলবৎ বস্তুতে সমান (এই নিমিত্ত জলের ও জলবৎ তরল বস্তুর অণুগুলি অবাধে একস্থান হইতে অন্যস্থানে নড়িতে পারে,) আর গ্যাসে কম অর্থাৎ যোগাকর্ষণের অপেক্ষা উত্তাপের তেজ অধিক (এই নিমিত্ত গ্যাসের অণুগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করে আর তাহাতে উহার অত বিস্তার শক্তি।) এইরূপ গতিশীল অণুগুলি যখন রাসায়নিক আকর্ষণ প্রভাবে দূর হইতে পরস্পরের নিকট আনীত হয়, তখন তাহারা সবেগে পরস্পরকে আঘাত করে, ইহাতে তাহাদিগের পূর্ব্বের দোলন গতি বৃদ্ধি পায় আর তখন অধিক উত্তাপ প্রতীত হয়—কারণ অধিক উত্তাপ অধিক দোলন গতি ভিন্ন আর কিছু নহে। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি রাসায়নিক সংযোগে কেন উত্তাপ দেখা যায়। হঠাৎ দুই বস্তুতে আঘাত লাগিয়া গতিরোধ হইলে উত্তাপ জন্মে ইহা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই—রেলগাড়ি যদি কোন বস্তুতে লাগিয়া হঠাৎ থামিয়া যায়, তবে রেলের সহিত রেলগাড়ির চাকার সংঘর্ষণ হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পর্য্যন্তও বাহির হইতে পারে। রাসায়নিক বিয়োগে উত্তাপের তিরোভাব হয় কেন—তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। পরমাণুগণ যখন পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকে তখন তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে শক্তির প্রয়োজন হয়। উত্তাপ এক প্রকার শক্তি বিশেষ, উত্তাপে পরমাণুগণের দোলন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়—ক্রমে ক্রমে এই দোলন এত বাড়িয়া উঠে যে তখন আর রাসায়নিক আকর্ষণ উহা রোধ করিতে

পারে না—এরূপ অবস্থায় পরমাণুগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে রাসায়নিক বিয়োগে কেন উত্তাপের তিরোভাব হয়—এই উত্তাপের তেজ পরমাণুগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে ব্যয় হইয়া যায়। কোন বস্তু উচ্চ স্থল হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ প্রভাবে নিম্নে পতিত হইলে সবেগে আসিয়া ভূপৃষ্ঠ আঘাত করে আর তাহাতে উত্তাপ আবির্ভূত হয়—এই বস্তুকে আবার ঐ উচ্চ স্থলে উঠাইতে হইলে শক্তির প্রয়োজন হয়। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই শক্তি উক্ত উত্তাপের শক্তির সমান। রাসায়নিক সংযোগ ও বিয়োগ ও সেইরূপ—সংযোগে রাসায়নিক শক্তি-প্রভাবে পরমাণুগণ পরস্পরের নিকট আনীত হয় আর তখন তাহারা সবেগে সংযুক্ত হইয়া উত্তাপ আবির্ভূত হয়—পরে আবার যখন তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে হয় তখন আবার ততখানি উত্তাপ প্রয়োজন হয় অর্থাৎ এই উত্তাপ বিচ্ছেদ কার্য্যে ব্যয় হইয়া তিরোভূত হয়।

রাসায়নিক উত্তাপ বিষয়ে বের্থেলো নামক এক পণ্ডিত তিনটী প্রধান নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

(১) কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে উত্তাপ আবির্ভূত হয়, তাহা উহাতে যে সকল রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটে সেই পরিবর্ত্তন কার্য্য সমষ্টির পরিমাপক।

(২) যখন কতকগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ বস্তুর প্রাকৃতিক কিম্বা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় আর তাহাতে তাহারা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় কিন্তু বাহিরের কোন বস্তুর স্থিতি বা গতি বিষয়ক কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না তখন কত উত্তাপ আবির্ভূত বা তিরোভূত হইবে তাহা কেবল ঐ বস্তু গুলির প্রথম ও শেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে।

(৩) বাহিরের কোন শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে যখন কোন রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন যে পরিবর্ত্তনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপ জন্মে সেই পরিবর্ত্তন ঘটিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাবনা।

এক্ষণে আমরা এই নিয়ম তিনটী সহজ ভাষায় বুঝাইয়া বলিতেছি। যখন অম্লজান গ্যাসে বিশুদ্ধ অঙ্গার পোড়ান হয়, তখন প্রত্যেক এক সের অঙ্গারে ৮০৮০ ডিগ্রি উত্তাপ আবির্ভূত হয় ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অঙ্গার দগ্ধ হইবার সময় উহা কঠিন অবস্থা হইতে গ্যাসের অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহা একটী প্রাকৃতিক কার্য্য; আর ইহা ছাড়া অঙ্গারের পরমাণুগুলি অম্লজানের পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্ব্বনিক আসিড গ্যাস হয়—ইহা একটী রাসায়নিক কার্য্য। দ্বিতীয় কার্য্যে উত্তাপের আবির্ভাব হয় আর প্রথম কার্য্যে এই উত্তাপের কিয়দংশ তিরোহিত হয় (কারণ অঙ্গারের যখন কঠিনের পরিবর্ত্তে বায়বীয় অবস্থা হয় তখন উহার অণুগুলির যোগাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া উহাদিগকে পরস্পর হইতে দূরীকরণের আবশ্যক আর উত্তাপের শক্তি দ্বারা তাহা

সাধিত হয়।) আবার অঙ্গারের পরমাণুগুলি অম্লজানের পরমাণুর সহিত যুক্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ অঙ্গারের ও অম্লজানের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হওয়ার আবশ্যক—ইহা রাসায়নিক বিয়োগ, অতএব ইহাতেও কিছু উত্তাপের ব্যয় হইবে (কারণ, অঙ্গারের অণুতে পরমাণুগুলি রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ছিল, এই আকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিবার নিমিত্ত কতক উত্তাপ শক্তি ব্যয় হওয়ার আবশ্যক; অম্লজানের অণুগুলির পক্ষেও ঐরূপ ঘটিবে।) এখন দেখ অঙ্গার ও অম্লজানের সংযোগে কার্ব্বনিক আসিড গ্যাস হইবার সময় তিনটী কার্য্য ঘটে: (১) অঙ্গারের বায়বীয় অবস্থা-প্রাপ্তি, (২) অঙ্গারের অণুগুলির এবং অম্লজানের অণুগুলির মধ্যস্থিত পরমাণুগুলির বিয়োগ, আর (৩) অঙ্গারের পরমাণুর অম্লজানের পরমাণুর সহিত সংযোগ। তৃতীয় কার্য্যে যে উত্তাপ জন্মিবে তাহা হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় কার্য্যের নিমিত্ত কতক উত্তাপ ব্যয় হইয়া যাইবে—অবশিষ্ট যে উত্তাপ থাকে তাহা প্রত্যেক এক সের অঙ্গারের পক্ষে ৮০৮০ ডিগ্রি। আমরা এস্থলে প্রধান তিনটী কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি অঙ্গার দগ্ধ হইবার সময় অন্যান্য কার্য্যও ঘটিতে পারে। যাহা হউক যতগুলি কার্য্য ঘটিবে ততগুলির নিমিত্ত উত্তাপের আয় কিম্বা ব্যয় হইবে—সমুদয়ে অবশেষে যত উত্তাপ আবির্ভূত বা তিরোভূত হইবে, তাহা ঐ সকল কার্য্যের সমষ্টির পরিমাপক হইবে। এক্ষণে আর উল্লিখিত প্রথম নিয়মটী বুঝিতে কষ্ট হইবে না। ইহার পর, দ্বিতীয় নিয়মটীর অর্থ কি দেখা যাউক। মনে কর অঙ্গারকে একেবারে কার্ব্বনিক আসিড * না করিয়া প্রথমতঃ কার্ব্বনিক অক্সাইড করিয়া পরে আবার এই অক্সাইডকে কার্ব্বনিক আসিডে পরিণত করা হউক। এখানে দেখা যাইতেছে যে অঙ্গার ও অম্লজান দুই রকমে কার্ব্বনিক আসিডে পরিণত করা যাইতে পারে—(১) একেবার, (২) মধ্যে কার্ব্বনিক অক্সাইড করিয়া। কিন্তু দুই রকমেই সর্ব্বসমেত প্রত্যেক এক সের অঙ্গারের পক্ষে ৮০৮০ ডিগ্রি উত্তাপ আবির্ভূত হইবে। এস্থলে বুঝা যাইতেছে যে এই উত্তাপের পরিমাণ কেবল প্রথম ও শেষ অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে, মধ্যবর্ত্তী অবস্থার প্রতি নহে। কিন্তু আমরা এই অনুমান করিয়া লইয়াছি যে যে উত্তাপ আবির্ভূত হইয়াছে হইয়াছে তাহার কোন অংশ বাহিরের কোন বস্তুর প্রতি কার্য্য করে নাই; যদি তাহা না হইয়া কতক অংশ এইরূপ কার্য্যে ব্যয় হয়,

---

* কার্ব্বনিক আসিডে এক পরমাণু অঙ্গার দুই পরমাণু অম্লজানের আর কার্ব্বনিক অক্সাইডে এক পরমাণু অম্লজানের সহিত সংযুক্ত থাকে। অঙ্গারের পরমাণুর গুরুত্ব ১২ ধরিলে অম্লজানের পরমাণুর গুরুত্ব ১৬। কার্ব্বনিক অকসাইডকে কার্ব্বন অর্থাৎ অঙ্গারের মনক্সাইড অর্থাৎ প্রথম-অম্লজান-যৌগিক, আর কার্ব্বনিক আসিডকে ডাই অক্সাইড অর্থাৎ দ্বি-অম্লজান-যৌগিক বলে।

তাহা হইলে উক্ত নিয়ম খাটিবে না। মনে কর দ্বিতীয় প্রকারে কার্ব্বনিক আসিড প্রস্তুত করিবার সময় কতক উত্তাপ বাহিরের বায়ুর মধ্যে চলিয়া গেল—এরূপ হইলে এক সের অঙ্গার হইতে ৮০৮০ ডিগ্রি উত্তাপ হইতে দেখা যাইবে না। তৃতীয় নিয়মটীর একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উদকজান ও অম্লজান হইতে জল ও হাইড্রক্সিল এই দুই বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু প্রথম বস্তু প্রস্তুত হইবার সময় অধিক উত্তাপ জন্মে—এই নিমিত্ত দেখা যায় যে উদকজান ও অম্লজান এই দুই বস্তু যখন আপনা হইতে যুক্ত হয় (অন্য কোন বস্তুর সাহায্য পায় না) তখন জল উৎপন্ন হয়, হাইড্রক্সিল উৎপন্ন হয় না। হাইড্রক্সিল প্রস্তুত করিতে হইলে উদকজান ও অম্লজান ব্যতীত অন্য বস্তুরও সাহায্য লইতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জল ও হাইড্রক্সিলের গঠনে এই বিভেদ যে জলে যত অম্লজান আছে, হাইড্রক্সিলে ঠিক তাহার দ্বিগুণ—এখানে অধিক অম্লজান বিশিষ্ট যৌগিক উৎপন্ন হওয়ার সময় কম উত্তাপ আবির্ভূত হয়, কারণ দুই পরমাণু উদকজান এক পরমাণু অম্লজান পাইলেই যথেষ্ট; অধিকের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখন আমরা যবক্ষারজান ও অম্লজান পরীক্ষা করিয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই যে দুই পরমাণু যবক্ষারজান চারি পরমাণু অম্লজান পর্য্যন্ত আগ্রহের সহিত আকর্ষণ করে আর তদনুসারে ইহাও দেখা যায় যবক্ষারজানের বেলা চারি পরমাণু-অম্লজান-বিশিষ্ট যৌগিক উৎপন্ন হওয়ার সময় যত উত্তাপ জন্মে তিন পরমাণু-অম্লজান-বিশিষ্ট যৌগিক উৎপন্ন হওয়ার সময় তাহার অপেক্ষা কম উত্তাপ জন্মে। ইহা হইতে আমরা এমন মনে করিতে পারি যে প্রচুর পরিমাণে অম্লজান থাকিলে যবক্ষারজান হইতে তিন পরমাণু-অম্লজান-বিশিষ্ট যৌগিক না হইয়া চারিপরমাণু বিশিষ্ট যৌগিক হইবে আর কার্য্যতঃ তাহাই দেখা যায়। এই দুইটী ও অন্যান্য উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে রাসায়নিক সংযোগের পক্ষে বের্থেলোর তৃতীয় নিয়ম প্রয়োগ হইতে পারে—যেরূপ সংযোগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপ জন্মিবে, সেইরূপ সংযোগই ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা। রাসায়নিক বিয়োগে উত্তাপের তিরোভাব ঘটে, সুতরাং বের্থেলোর উক্ত নিয়ম মতে ইহা আপনা হইতে ঘটিতে পারে না আর বস্তুতঃ দেখা যায় যে, কোন বস্তুর রাসায়নিক বিয়োগ ঘটাইবার নিমিত্ত বাহির হইতে কোনপ্রকার শক্তির (যেমন উত্তাপ, আলোক, অপর কোন বস্তুর রাসায়নিক কার্য্য, ও দ্রবীকরিণী শক্তি) আবশ্যক। যেমন পারদ ও অম্লজানের একলাল বর্ণ যৌগিক আছে, উহা উত্তাপ দ্বারা বিযুক্ত করা যাইতে পারে আর তাহা করিলে অম্লজান বায়বীয় আকার ধারণ করে আর পারদ তরলাকার ধারণ করে; সেইরূপ আবার রৌপ্য ও ক্লোরিনের যৌগিক সূর্য্যালোকে বিযুক্ত হয়, উহা সদ্যঃ অবস্থায় শুভ্রবর্ণ কিন্তু সূর্য্যালোকে বিযুক্ত হইয়া বেগুণে রঙ প্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ বস্তু অন্য কোন বস্তুর রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা যাইতে

পারে, যেমন লবণ মিশ্রিত জলে কোন রৌপ্য মিশ্রণ ঢালিলে লবণ বিযুক্ত হয় অর্থাৎ লবণের মধ্যে ক্লোরিনের সহিত সোডিয়ম যুক্ত থাকে—রৌপ্য মিশ্রণের সংস্পর্শে আসিলে সোডিয়মের স্থলে রৌপ্য স্থিত হয়। কোন কোন বস্তু (যেমন পোটাসিয়ম ফেরেট) কেবল মাত্র জলে দ্রব করিলেই বিযুক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ এই সকল বস্তুর অণুর অংশগুলির মধ্যে যে রাসায়নিক আকর্ষণ আছে তাহা দ্রবীভবনের শক্তি অপেক্ষা কম; সুতরাং এই সকল অংশ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলের সহিত সংযুক্ত হয়। এই সকল উদাহরণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে রাসায়নিক বিয়োগ আপনা হইতে ঘটেনা, বাহিরের কোন শক্তির প্রভাবে ঘটে। কিন্তু যেরূপ বিয়োগে উত্তাপ উদ্ভূত হয়, সেরূপ বিয়োগ আপনা হইতেই ঘটিতে পারে। হাইড্রক্সিল, নাইট্রস্ ক্লোরাইড, নাইট্রিক আন্‌হাইড্রাইড্ ইত্যাদি অনেক বস্তু আপনা হইতেই বিযুক্ত হইতে পারে, আর এই বিয়োগ হওয়ার সময় উত্তাপ উদ্ভূত হয়। ইহার কারণ এই যে ইহারা যে যে অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে, সেই সেই অংশ হইতে ইহাদিগকে গঠিত করিবার সময় উত্তাপের ব্যয় হয়। ইহাদিগের গঠনের সময় উত্তাপের ব্যয় হয়, সুতরাং এই গঠন ভাঙ্গিয়া যাইবার সময় পুনরায় ঐ উত্তাপ নির্গত হয়। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বিয়োগ ক্রিয়ার সহিত বের্থেলোর তৃতীয় নিয়মের সামঞ্জস্য আছে। এইরূপ আবার কোন যৌগিকে এক পদার্থের পরিবর্ত্তে অন্য পদার্থ সংস্থাপনে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাও ঐ নিয়মের অনুযায়ী। ব্রোমিনকে উঠাইয়া ক্লোরিন উহার স্থান অধিকার করিতে পারে, তদনুযায়ী ইহাও দেখা যায় যে ঐরূপ স্থলে ব্রোমিনের যৌগিক গঠিত হইবার সময় যে উত্তাপ জন্মে, ক্লোরিনের যৌগিক গঠিত হইবার সময় তাহার অপেক্ষা অধিক উত্তাপ জন্মে। এইরূপ আবার কোন দুই যৌগিক পরস্পরের উপর কার্য্য করিয়া যখন অন্য দুই যৌগিক উৎপন্ন করে, তখন দেখা যায় যে শেষোক্ত দুই যৌগিক উৎপন্ন হওয়ার সময় অধিক উত্তাপ জন্মে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে সকল প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধেই বের্থেলোর তৃতীয় নিয়ম প্রয়োগ হইতে পারে; কিন্তু একটী বিষয় এই নিয়মের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। যখন কোন অম্ল বস্তু ও কোন ক্ষার বস্তু জলে মিশাইয়া পরস্পরের সংস্পর্শে আনীত হয়, তখন তাহারা সংযুক্ত হইয়া লবণের ন্যায় বস্তু উৎপন্ন করে আর এই সংযোগে উত্তাপ আবির্ভূত হয়—এক্ষণে যদি একস্থলে দুইটী অম্ল বস্তুর মিশ্রণ থাকে আর তাহাতে এমন পরিমাণে ক্ষারমিশ্রণ ঢালা যায় যে তাহা দুইটীর সমুদয়ের সহিত সংযুক্ত হইবার পক্ষে প্রচুর নহে, তাহা হইলে যেরূপ লবণ প্রস্তুত হইলে অধিকতর উত্তাপ জন্মিবে সেই লবণই যে উৎপন্ন হইবে এমত নহে, অনেক পক্ষে ইহার বিপরীত দেখা গিয়াছে। সেইরূপ আবার দুইটী ক্ষার মিশ্রণ একস্থলে লইয়া তাহাতে অপ্রচুর পরিমাণে একটী অম্ল মিশ্রণ ঢালিলে অনেক সময় ঐরূপ বিপরীত নিয়ম দেখা যায়। এখানে বোধ হয় যেন উল্লিখিত

তৃতীয় নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; কিন্তু ইহা বাস্তবিক কোন ব্যতিক্রম না হইতে পারে। উক্ত প্রকারে লবণ প্রস্তুত হইবার সময় যে উত্তাপ জন্মে তাহা রাসায়নিক কার্য্যের পরিমাপক না হইতে পারে; না হওয়ারই সম্ভাবনা, কারণ উক্ত প্রকার মিশ্রণাবস্থায় রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিবার সময় আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। আয়নের হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটিবার সময় উত্তাপের বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটিয়া থাকে—সুতরাং উক্ত প্রকারে লবণ উৎপন্ন হওয়ার সময় যে উত্তাপের আবির্ভাব তিরোভাব হইবে তাহা শুদ্ধ কেবল রাসায়নিক কার্য্যেব উপর নির্ভর করিবে না, অতএব তাহার পরিমাপকও হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা অন্য এক স্থল হইতে একটী উদাহরণ দিতেছি—এক পরমাণু অঙ্গার প্রথমতঃ এক পরমাণু অম্লজানের সহিত যুক্ত হইতে পারে—প্রথম পরমাণুর সহিত সংযোগের সময় যত উত্তাপ নির্গত হয়, দ্বিতীয় পরমাণুর সহিত যুক্ত হইবার সময় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক (দ্বিগুণেরও অধিক) উত্তাপ নির্গত হয়। এক পরমাণু তাম্রও ঐরূপ প্রথমতঃ এক পরমাণু, পরে আবার এক পরমাণু অম্লজানের সহিত যুক্ত হইতে পারে—এখানে দেখা যায় প্রথম পরমাণুর সহিত সংযোগ কালে যত উত্তাপ হয় দ্বিতীয় পরমাণুর বেলাতেও তত উত্তাপ হয়, অতএব তাম্র প্রথম পরমাণুকে যত শক্তির সহিত আকর্ষণ করে দ্বিতীয়কেও সেইরূপ করে। অঙ্গারের পক্ষেও এইরূপ দুই পরমাণুর সম্বন্ধে সমান আকর্ষণ হওয়ার কথা, অথচ উত্তাপের পরিমাণ বিভিন্ন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে তাম্র ঐরূপ যুক্ত হওয়ার সময় কঠিন অবস্থা হইতে তরল কিম্বা বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় না; অঙ্গারের পক্ষে তাহা নহে, অম্লজানের সহিত সংযোগ কালে অঙ্গার কঠিণ হইতে বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়—সুতরাং অম্লজানের প্রথম পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইবার সময় যে উত্তাপ নির্গত হয় তাহার অধিকাংশ এই অবস্থান্তর ঘটাইতে ব্যয়িত হয়। সুতরাং * রাসায়নিক কার্য্য সমান হইলেও অঙ্গারের দুই অক্সাইডের (সংযোগ জনিত) উত্তাপ দুই মাত্রায় হওয়া আশ্চর্য্য নহে—এস্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে রাসায়নিক ক্রিয়ায় আমরা যে উত্তাপ জন্মিতে দেখিতে পাই শুদ্ধ কেবল তাহা হইতেই উক্ত ক্রিয়ার

---

* রাসায়নিক কার্য্য ও প্রাকৃতিক কার্য্য এই দুয়ের প্রভেদ এখানে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। রাসায়নিক আকর্ষণে যে বস্তুগণের সংযোগ বা বিয়োগ ঘটে তাহাকে রাসায়নিক কার্য্য বলে; রাসায়নিক কার্য্যে বস্তুদিগের গুরুত্ব ভিন্ন পূর্ব্বেকার অন্যান্য সমুদয় গুণই পরিবর্ত্তন হইতে পারে—যেমন লৌহের চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হইবার গুণ চলিয়া যাইতে পারে। প্রাকৃতিক কার্য্যে অতদূর পরিবর্ত্তন হয় না—উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ, যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদির কার্য্যের নাম প্রাকৃতিক কার্য্য। যেমন উত্তাপে লৌহ গলিতে পারে কিন্তু লৌহের অন্যান্য গুণ পূর্ব্ববৎ থাকে; উত্তাপ দ্বারা লৌহের দ্রবীভবনকে প্রাকৃতিক কার্য্য বলে।

পরিমাণ স্থির হইতে পারে না। রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্যে রাসায়নিক কার্য্যের সহিত যত অধিক প্রাকৃতিক কার্য্য থাকিবে, উক্ত ক্রিয়ার উত্তাপ দেখিয়া রাসায়নিক কার্য্যের পরিমাণ স্থির করা তত কঠিন হইবে,—কারণ ঐ উত্তাপ উক্ত উভয় প্রকার কার্য্যের উপর নির্ভর করিবে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বকুলের গল্প।

এতটুকু বেলা হইতে এই কাননে বাস করিতেছি। আজ আমার সর্ব্বোচ্চশির আশে পাশের বৃক্ষ ছাড়াইয়া বিমান ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। কালের হস্তলিপি যদি পড়িতে পারিতে তাহা হইলে দেখিতে আজ আমার পাতায় পাতায় কতদিনকার কত কাহিনী, কত মাতার স্নেহ, ভাই ভগিনীর মমতা, প্রণয়ীর প্রেমের কাহিনী চিরশ্যামল অক্ষরে লেখা রহিয়াছে।

কি জানি কেন, আজ যেন সে সকলই ভুলিয়া গিয়াছি, একটী মধুর ম্লান মুখ শুধু আমার সম্মুখে জাগিতেছে, একটী মধুর কণ্ঠধ্বনি মাত্র আমার কর্ণে বাজিতেছে।

সে আজ অনেকদিনের কথা।—এই কাননের কোল দিয়া একটী ক্ষুদ্র তটিনী বহিয়া যাইত। আশে পাশের বৃক্ষগুলির চরণসিক্ত করিয়া, আমার বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পল্লবগুলিকে বুকে লইয়া দ্রুতগামী তটিনী সমস্ত দিন রাত্রই হাস্য করিত। উষার শুভ্র কপোলে সূর্য্যের কনক চুম্বন পড়িতে না পড়িতে কাননের এক প্রান্তে একটী কুটীর হইতে দুইটি বালক বালিকা হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়া তটিনীর বক্ষে পাশাপাশি সাঁতার দিয়া বেড়াইত। স্নানান্তে উভয়ে আমার তলে আসিয়া দুইটি অঞ্চল ভরিয়া ফুল কুড়াইত। কোন দিন তাহারা একটী শিব গড়িয়া তাহাকেই সকল ফুলগুলি উপহার দিয়া যাইত, কোন দিন বা সুরেশ বকুলের অলঙ্কার রচিয়া মালতীকে সাজাইয়া দিত আর মালতী বকুলের মুকুট গড়িয়া সুরেশের মস্তকে পরাইয়া দিত, বকুলের সিংহাসন রচিয়া তাহাকে তাহার উপর বসাইয়া আনন্দে ছোট ছোট রাঙা হাত দুখানিতে করতালি দিয়া উঠিত। তাহাদের একখানি ক্ষুদ্র তরণী ছিল। জ্যোৎস্না রাত্রে সুদূরে রাখালের বাঁশীর ধ্বনি উঠিতে না উঠিতে, চন্দ্রমা নীলাকাশে ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে, দুটীতে আসিয়া তাহাদের সেই ক্ষুদ্রতরীখানি বাহিত। বালকটী একহাতে তরী বাহিয়া আর এক

হাতে বালিকার গলা ধরিয়া কতই সোহাগ করিত। প্রশান্ত রজনীতে দুটীতে তাহাদের সুললিত কণ্ঠে গাহিত—

"ভাসিয়ে দে তরী—
তবে নীল সাগর পরি
বহিছে মৃদুল বায়
নাচিছে মৃদু লহরী—"

বাতাস চুপি চুপি আসিয়া মালতীর আলুথালু কেশগুলি লইয়া খেলা করিত, মধুর জ্যোৎস্না চুপি চুপি তাহাদের চুম্বন করিয়া যাইত, নীল আকাশের শুভ্র মেঘগুলি তাহাদের প্রতি সস্নেহ নয়নে তাকাইতে তাকাইতে ভাসিয়া যাইত।

একদিন জ্যোৎস্না রাতে তাহারা তরী বাহিতে বাহিতে গান গাহিতেছে,

ডুবেছে রবির কায়া
আধো আলো আধো ছায়া
আমরা দুটীতে মিলি
যাই চল ধীরি ধীরি।

একজন পথিক সেইখান দিয়া যাইতেছিল, সহসা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার সম্মুখে একি সুন্দর দৃশ্য! বুঝি কোন দেব পুত্র ও দেববালা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কি সুললিত গীত! কাননের বৃক্ষে বৃক্ষে পাতায় পাতায় পল্লবে পল্লবে সেই গীতের ঝঙ্কার বাজিতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী নীরব রজনী যেন প্রাণ ভরিয়া সেই সুধামাখা গান পান করিতেছে। পথিকের হৃদয় এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া গেল। সেই পর্য্যন্ত সে প্রতিদিন এই কাননে আসিয়া সেই দুটী বালক বালিকার কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত অমৃতের ধারা বিহ্বল হৃদয়ে পান করিত।

একদিন কাননে আর তাহাদের ছোট ছোট পায়ের ধ্বনি উঠিল না একদিন তাহাদের কচি কচি হাতের কোমল স্পর্শ আর অনুভব করিলাম না। আমার ফুলগুলি অশ্রুজলের ন্যায় নীরবে টুপটাপ করিয়া ঝরিয়া আপনি শুকাইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় একবার পথিক আসিল। সকলই তেমনি রহিয়াছে সেই জ্যোৎস্না, সেই সব, কেবল সেই দুটী মধুর ছবি আর নাই। পথিক খানিকক্ষণ বসিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, কি জানি সুখের কি দুঃখের কি একটী ভাবের ছায়া যেন তাহার মুখে পড়িয়াছিল। সে দিনের পর পথিকও আর আসিল না। এখন সব শূন্য—শূন্য।

এখন আর গ্রামের বালিকারা ঘাটে জল লইতে আসিয়া সেই দুইটি বালকবালিকাকে দেখিতে পায় না। এখন আর রজনীতে জ্যোৎস্নার সঙ্গে ফুলের গন্ধের সঙ্গে তাহাদের সুললিত তান জড়িত হয় না! এখন সব শূন্য—শূন্য—শূন্য।

এমন কতদিন গেল বলিতে পারিনা আবার একদিন প্রাতে পরিচিত পায়ের

শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু সে পায়ের সে লঘুতা, সে ছন্দে ছন্দে পতন আর নাই, যেন তাহাতে কত কিসের অভাব। দেখিলাম সুরেশ একাকী আসিতেছে। মালতী কোথায়? গ্রামের বালিকাদের দুএকটী কথা সহসা কানে বাজিয়া উঠিল— "তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহার পিতা সেই ধনবান পথিকের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন, সে তাহার সহিত শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। তাহার চিরকালের সখা সুরেশকে চিরদিনের জন্য একেলা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে!—

সুরেশ ধীরে ধীরে আসিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া ধীরে ধীরে আমার তলে আসিয়া আমার ফুলগুলি লইয়া কতকগুলি অলঙ্কার রচিল। সব গাঁথা হইয়া গেলে গাছের তলায় সেগুলি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

তাহার মধু অধরের মধুর হাসিটী যেন চির দিনের মত শুকাইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সে আবার আসিল। তাহার প্রভাতের গাঁথা ফুলগুলি গাছতলাতেই পড়িয়া রহিয়াছে। সে সেদিকে না গিয়া ঘাটে গেল। তরীখানি ঘাটেই বাঁধা রহিয়াছে, সে তরীতে উঠিল না, নীরবে ঘাটের উপরে বসিয়া রাইল। অনেকক্ষণ পরে যেমন ধীরে ধীরে আসিয়াছিল, তেমনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে এখন প্রতিদিনই এইরূপ করে।

একদিন পূর্ণিমার রাতে ঘাটে বসিয়া আছে। বড়ই মধুর যামিনী। সমস্ত জগৎ যেন জ্যোৎস্নার কোমল হস্তের স্পর্শে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শীতল সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছে। সুরেশ ধীরে ধীরে উঠিল, ধীরে ধীরে তরীর বাঁধন খুলিয়া তরীর উপর উঠিল। তরীখানি ধীরে ধীরে বাহিতে লাগিল। ঘাট হইতে এখন সে অনেক দূরে গিয়াছে, তাহার হৃদয় বুঝি আজ পুরাণ স্মৃতিতে পূরিয়া গিয়াছে, তাই সে আর একটীবার "ভাসিয়ে দে তরী" গাহিতে চেষ্টা করিল। গাহিল কি না গাহিল শুনা গেল না। কিন্তু তরা ভাসিয়া গেল। পূর্ণিমা রাত্রি অবসান হইল। পূর্ণ চন্দ্র নীলাকাশের কোন অজ্ঞাত তারে গিয়া পৌঁছিল বুঝি। কিন্তু তরী ঘাটে ফিরিল না।

আমার ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, কেহ আর কুড়াইয়া লইয়া মালা গাঁথে না, মালতী লতা লুটাইয়া পড়িতেছে কেহ তুলিয়া অশোকশাখে বাঁধিয়া দেয় না। আমি এখনো দাঁড়াইয়া সেই ঘাটের দিকে চাহিয়া অছি, যদি আরেক পূর্ণিমা রাতে সেই তরী ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে। যদি কোন রহস্যরাজ্য হইতে কোন মায়াদ্বীপ হইতে মালতী তাহার শৈশব সখাটিকে ফিরাইয়া লইয়া আসে। কিন্তু যদি আসে তবে আর সে মালা গাঁথা, গান গাওয়া হইবে না। তাহাদের দুইখানি ছায়া বিজন পূর্ণিমা রাত্রে বকুল কুঞ্জের ছায়ার সহিত মিলাইয়া যাইবে, তাহাদের দুইখানি কিশোর হৃদয়ের প্রেম আমার সুগন্ধের সহিত মিশিয়া থাকিবে।

শ্রীসরলা দেবী।

রাজনীতি।

(২য় প্রবন্ধ)

হিন্দুর মুখে রাজা কথাটি অতি সুন্দর। আমাদিগের ভাষাতে যদি অন্য আর একটি কথা না থাকিত ঐ এক "রাজা" কথা হইতে পুরাতন আর্য্য সমাজ কত উন্নত হইয়াছিল তাহা সহজেই নির্ণয় করা যাইত। যে কথাটিতে প্রজার সুখ, সাধারণের আনন্দ, রাজা প্রজার সম্বন্ধ, পিতা পুত্রের সম্বন্ধ মনে করাইয়া দেয়, যাহাতে রামের শাসন ও সমস্ত রামায়ণ, যুধিষ্ঠির ও মহাভারত মনে করাইয়া দেয় হিন্দুর মুখে সে কথাটি কত মধুর। যে দেশে শাসন কর্ত্তা প্রজার সুখ ভাবিতেন বলিয়া রাজা, সে দেশের উন্নতির ইতিহাস লিখিতে অন্য কথা না থাকিলেও চলে।

হিন্দুর রাজা ইংরাজের king কথা দুটির অর্থ কত প্রভেদ। king পুরাতন ইংরাজীতে Cyning, কথার অর্থ যে, এক জাতির। ইংরাজী kin কথাটির একই উৎপত্তি। তাহার অর্থ সম্পর্কীয় লোক। king কথা স্বাধীন জাতির কথা, তাহাতেই স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক জাতির লোকের মধ্যে এক জন রাজা—এক জন king কেহ কেহ বলেন যাহাকে একটি জাতির সকলেই পুত্রের মত দেখেন সেই king, সকলের আদর ভালবাসা পান বলিয়াই রাজা। ইংরাজী child (শিশু) কথাটি আগে ধনী লোকের সন্তানদিগের নাম ছিল কিন্তু তখন তাহা childe (childe harold) লিখিত হইত। কেহ কেহ আবার বলেন যে জাতির পিতা স্বরূপ সেই king। সংস্কৃত 'জনক' কথা একই। বস্তুতঃ আমার ও বোধ হয় ইংরাজী kingএর অর্থ জাতির পিতা। কিন্তু ভাবিয়া দেখ আমাদিগের রাজা কথাটি kingএর অপেক্ষা ভাল নহে কি! যেমন রাজা কথার অর্থ যে রঞ্জন করে, এবং king যে জাতির পিতা, তেমনই লাটিন Rex শাসন কর্ত্তা। যেমন রাজা কথায় হিন্দুর ইতিহাস বুঝিতে পারা যায়, kingএ যেমন ইংরাজের বল ও স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই লাটিন Rexএ রোমান শাসন মনে পড়ে। দেশ, কাল এবং লোক ভেদে রাজা কথার অর্থও স্বতন্ত্র। কিন্তু এখানে আমার রাজা কথার ইতিহাস লেখা উদ্দেশ্য নহে। রাজা কথার অর্থ কি হওয়া উচিত তাহাই ভাবিয়া দেখা যাউক।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে রাজনীতি কি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে শাসনের উদ্দেশ্য জগদ্ব্যাপী। কোন একটি ক্ষুদ্র জাতি কিংবা ক্ষুদ্র দেশের শাসন জগতের চিরন্তন নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলে, অথচ শাসন একটি পদ্ধতি, তাহার জন্য শাসন কর্ত্তা আবশ্যক, শাসনের নিয়ম আবশ্যক। শাসন একজন লোকের দ্বারা কখনই সম্ভব নহে। অন্য সহস্র লোকে যদি শাসন কর্ত্তাকে শাসন করিতে না দেয়

তাহা হইলে শাসন অসম্ভব। অন্যের মন রাখিয়া শাসন আবশ্যক। কিন্তু যদি আমরা সহস্র লোকে একজন লোককে বলি "আপনি রাজা হউন আমাদের কোন আপত্তি নাই," এবং আর যদি কিছু না করি শুধু চুপ চাপ করিয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে তিনি কি শাসন করিতে পারেন? তিনি কি দিয়া, কাহার সাহায্যে রাজত্ব করিবেন। অতএব রাজার সহস্র সহযোগী চাই। শুদ্ধ আপত্তি নাই বলিলে চলে না, আমরা সাহায্য করিব বলা আবশ্যক। শাসনতন্ত্র যেরূপ হউক না কেন আপত্তির অভাব এবং সাহায্য দানের ইচ্ছা এবং সাহায্য বস্তুতঃ দেওয়া এই তিনটি নিতান্ত আবশ্যক। কোন দেশে কখন কোন রাজা স্বাধীন ভাবে, নির্ব্বিবাদে, অপরের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ইতিহাস পড়িয়া দেখ—রাজার সহিত রাজকীয় কর্ম্মচারী আছে, রাজার দল বল আছে। রাজার কিরূপ দল বল হওয়া উচিত এবং কে রাজা এবং কিরূপে তিনি রাজা, এ সব কথা পরে বলিব। এখন শুধু ইহাই মনে রাখিলে চলিবে যে রাজা যে কেহই হউন না কেন, রাজত্ব করার জন্য প্রজার ইচ্ছা, এবং সাহায্য আবশ্যক। সাহায্য কথাটির অর্থে একটু গোল আছে। সাহায্য দ্বিবিধ।

আমি ইচ্ছা করিয়া একটা কার্য্যের দ্বারা অপরকে সাহায্য করিতে পারি। একজন মাথায় মোট তুলিতেছে, আমি তাহার মাথায় নিজে হাত দিয়া যদি মোট তুলিয়া দিই তবে তাহাকে সাহায্য করিলাম। আবার ধর একজন লোক রাজপথ দিয়া যাইতেছে আমিও যাইতেছি। যাহাতে সে তাহার পথে যাইতে পারে অর্থাৎ, তাহার সামনে দাঁড়াইয়া তাহাকে বাধা না দিয়া যদি তাহাকে যাইতে দেই ইহাতেও আমি তাহাকে সাহায্য করিলাম। অতএব সাহায্য কিছু করিয়া হইতে পারে এবং কিছু না করিয়াও হইতে পারে। এখন দেখিতে পাইতেছ যে প্রজা যখন রাজাকে সাহায্য করে তখন প্রথমতঃ কার্য্য করিয়া, দ্বিতীয়তঃ কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া রাজাকে সাহায্য করে। অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যায় কেন শাসন তন্ত্রে দুইটি বিরোধী-বল এককালে বর্ত্তমান;— অনুরাগ এবং বিরাগ, কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য, স্বার্থ এবং পরার্থ,—যে নাম ইচ্ছা হয় তাহা দিতে পার, অর্থ সকলেরই প্রায় এক। শাসনের মূলে উদ্যম এবং আত্ম-শাসন।

এই দুইয়ের একটির অভাবে শাসন অসম্ভব। আমাদিগের আয়ত্তাধীন অনেক থাকিতে পারে, ইচ্ছা করিলে আমরা অনেক কার্য্য করিতে পারি কিন্তু উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্মশাসন না থাকে তাহা হইলে জীবনে ঘোর ব্যভিচার ঘটে, সমাজ বন্ধন শূন্য হয়, পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে, গৃহে-গৃহে বিবাদ উপস্থিত হয়। দেশে রাজা থাকিলেও দেশ অরাজক হইয়া উঠে। হিন্দু স্বাধীন কথাটি ইংরাজী independence কথাটির অপেক্ষা অনেক ভাল। আমি নিজের শাসনের অধীন কজন লোক বলিতে পারে। আমি কাহারও অধীন নহি অনেকে বলিলেও বলিতে পারে, আমি কিছু না কিছুর অধীন

ইহা উন্মাদেও বলিলে তুমি ভুল ধরিতে পার না, কিন্তু শিক্ষিত, ধর্ম্মপরায়ণ, পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন লোক ভিন্ন আমি স্বাধীন কেহই বলিতে পারে না। এই স্বাধীনতাই শাসনের ভিত্তি স্বরূপ।

যাহা বলিলাম ইতিহাস দিয়া সহজেই তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায়। ফরাসী দেশের স্বাধীনতার জন্য কতবার ঘোর বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। 'আমরা অপরকে আমাদিগের উপর শাসন করিতে দিব না। আমরা আপনা আপনি শাসন করিব। জগতে ধনী থাকিবে না, কারণ ধনীর হাতে ধনবল এবং দরিদ্র নিতান্ত পথের কাঙালী, তাহার উপর দৌরাত্ম্য হইবে। রাজা প্রজা থাকিবে না। এইরূপ অনেক কথার দরুণ অনেকবার ফরাসী দেশের মাটী কোটি লোকের রক্তে সিক্ত হইয়াছে, কত কোটি পরিবার একেবারে জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি সেই সঙ্গে স্বাধীনতার সত্য-অর্থ লোকে বুঝিতে পারিত তাহা হইলে অত রক্তপাত, অত দ্বন্দ, অত বিদ্রোহ ঘটিত না! অনেক সময় এইরূপ শুদ্ধ মাত্র কথার জন্য যত বিপদ ঘটে। যদি রাজা প্রজা উভয়েই বুঝিতে পারিত যে রাজত্ব প্রজার ইচ্ছা এবং সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না এবং শাসনের মূলে প্রজার উদ্যম এবং আত্মদমন, তাহা হইলে শাসন সম্বন্ধে আর কিছু অধিক কথা বলা আবশ্যক করিত না, রাজা প্রজার সম্বন্ধ সুখের হইত। কারণ ভাবিয়া দেখ ঐ কয়েকটি কথাতেই শাসনের সমস্ত নীতি পদ্ধতি সবই আছে। যদি শাসন প্রজার উপযোগী না হয় তাহা হইলে প্রজার ইচ্ছা এবং উদ্যম সেই ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। যদি প্রজার সুখের জন্য শাসন না করা হয় প্রজা রাজাকে কেন সাহায্য করিবে? আবার সাহায্য কথাটির ভিতর যখন কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের ভাব আছে, করা, না করা দুই আছে তখন রাজা, প্রজার নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহা খানিকটা স্থির করিতে পারা যায়।

সমাজে থাকার দরুন আমাদের নিজের নিজের মধ্যে ক্রমে কি করা উচিত, কি করা অন্যায় অনেকটা স্থির হইয়া যায়। পিতা পুত্রের সম্বন্ধ, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ প্রভৃতি পারিবারিক সম্বন্ধ সমাজের প্রায় প্রথম অবস্থা হইতেই খানিকটা স্থির হইয়া গিয়াছে! ক্রমে সমাজ যেমন বিপুল, বিস্তৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহারই সহিত পারিবারিক সম্বন্ধ, প্রতিবাসীত্বে খানিকটা পরিণত হইয়াছে। এইরূপে আজকালকার সভ্য সমাজ শুধু নিজের নিজের পরিবারের সম্বন্ধ এবং প্রতিবাসীত্বের অনুরোধ ভিন্ন আবার জাতীয়ত্বের সম্বন্ধ দ্বারা চালিত। পূর্ব্বে আর্য্য সমাজে শুদ্ধ গৃহের 'কর্ত্তা', স্বামী ভিন্ন, পুরুষ ভিন্ন আর কাহারও কোন সত্ব ছিল না। তেমনি রোমে পিতা গৃহের কর্ত্তা, তাহার সত্ব ভিন্ন আর কাহারও কোন সত্ব ছিল না। ক্রমে দেখ আর্য্যসমাজে স্ত্রী-ধনের নিয়ম, স্বোপার্জ্জিত ধনের অধিকার সম্বন্ধে কত নূতন নিয়ম প্রবেশ করিয়াছে। রোমেও সেইরূপ ক্রমে পুত্রের অবস্থা দিন দিন উন্নত হইয়াছিল। পিতা

পুত্রের প্রভু দাসের সম্বন্ধ অনেক উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমাজ যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, আমাদিগের নিজের নিজের মধ্যে সম্বন্ধ তেমনি বাড়িতেছে। এমন কি এক ভাবে দেখিলে এখন একজন লোক সমস্ত জগতের সহিত এক সূত্রে আবদ্ধ। দুই একটি উদাহরণ দিলেও সহজে বুঝিতে পারা যাইবে জগতের সহিত সম্বন্ধের অর্থ কি। এখন এমন কোন দেশই নাই যাহা সম্পূর্ণতঃ নিজের, যাহার উৎপন্ন তাহার পক্ষে যথেষ্ট। বাঙ্গলায় ধান হয়, পশ্চিমে গোম হয়, বিলাতে লৌহ আছে, এইরূপ পৃথিবীর এক অন্ত হইতে অপর অন্ত পর্য্যন্ত আমরা বিনিময়ের উপর নির্ভর করি। এই বিনিময় এত বিস্তৃত, যে তাহার দরুন দেশে দেশে প্রতিবাসীর মধ্যে যেমন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে সেইরূপ কতকগুলি নিয়মও অনুবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমাদের যখন অপরের মুখ অপেক্ষা করিয়া চলিতে হয় তখন সহজেই বুঝিতে পারি যে এক দেশের শাসনের নিয়ম অন্যদেশের নিয়মকে উপেক্ষা করিতে পারে না। এইরূপে আমরা পরিবার হইতে জাতিতে জাতি হইতে বিপুল জগতে পরিণত হইয়াছি।

শাসন এই বিপুল জগতের সুখ চেষ্টা আর কিছুই নহে।

সুখ চেষ্টার অর্থ কি এবং রাজা কাহাকে বলে পরে বলিব।

শ্রী আশুতোষ চৌধুরী।

আক্ষেপ।

হায়! কবির ঘটিল ঘোর দায়,
কৈফিয়ৎ কেমনে যোগায়!
আপনারে বোঝে না যে
বোঝাবে কাহায়?
জ্ঞানীর রাজত্ব ধরা,
কবির উচিত সরা,
পাগল বলিয়া শেষে,
বেড়ী বা পরায়!
আয়, তরু, লতা, ফুল,
আয় রে বিহঙ্গকুল,
সমীরণ, স্রোতস্বিনী,
আয় সবে আয়,
ছাড়িছে সংসার কবি,
ব্যাঙ্গের জ্বালায়।
না, না, কবির উদার প্রাণ,
খেয়ে খোঁচা বিষবাণ,
যেতে, যেতে, গাহে গান,
আহ্বানি সবায়,
শোন রে প্রকৃতি শোন,
জ্বলন্ত-ভাষায়,

* গত চৈত্র মাসের "কাব্য। স্পষ্ট অস্পষ্ট নামক" প্রবন্ধটি দেখ।"

বরষা বর্ণনে কবি,
সন্তাপ নিভায়।
"জলদের গড় গড়ি,
শিলা ছোটে খই মুড়ি,
ব্যাঙেদের কড় কড়ি,
সফুলো গলায়।
থপ্ থপ্ ছপ্ ছপ্,
কর্দ্দমে লাফায়,
ছিটাইয়া লাগে কাদা,
পথে চলা দায়"।
নগর ছাড়িল কবি,
ব্যাঙের জ্বালায়।
নদী ছাড়, কুল, কুল,
ধরিবে তোমার ভুল,
গেও না, তুমি যে ফুল,
সুরভি ভাষায়!
ভাঙ্গিবে তোমারে ফেলে,
ভাজনা খোলায়।
বসন্তের সমীরণ,
ভাল চাহ, যদি শোন,
ফুর্ ফুর্ করে হেন,
বয়োনা, হেথায়,
অজ্ঞতার পরিচয়ে
অস্পষ্ট ভাষায়।
স্পষ্ট ভাষে বহ, ঝড়,
ধূলা তুলে কর জড়,
হান, বজ্র কড় মড়,
বিদারি অম্বর,
চাও যদি, সিংহাসন
একের নম্বর।"

শ্রীমতী——

রাণা-বংশে ইরাণীত্ব আরোপ।

কে না জানেন উদয়পুরের রাণাগণ সূর্য্যবংশ বলিয়া বিখ্যাত। ক্ষত্রিয় রাজাদিগের পাণ্ডু লেখ্য ইতিহাসাবলী, * তাঁহাদের ভাট গ্রন্থ, তাঁহাদের মন্দিরস্থ খোদিত লিপি প্রভৃতি

---

* খোমানরস, রাজরত্নাকর, রাজবল্লভ, জয়বল্লভ প্রভৃতি। উল্লিখিত ইতিহাসাদি হইতে টড রাণা বংশের মিবারে আসিবার এইরূপ ইতিহাস দিয়াছেন।

রাজপুত্র নবের বংশ জাত একজন রাজ পুরুষ নবকোট (আধুনিক লাহোর। নব কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া নব-কোট।) হইতে সৌরাষ্ট্রে আগমন করিয়া ১৪৪ খৃষ্টাব্দে তথাকার, প্রমর বংশীয় একজন রাজার রাজ্য অধিকার করিয়া সেই রাজ্যে বীরনগর রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার প্রপৌত্র-পুত্র বিজয় সেনের রাজ্য কালে কনক সেনের স্থাপিত রাজ্য আরো বিস্তৃতি লাভ করে, তিনি সৌরাষ্ট্রে বিজয়পুর বল্লভীপুর প্রভৃতি কয়েকটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। বল্লভীপুরই তন্মধ্যে প্রধান হইয়া উঠে। ৫২৪ খৃষ্টাব্দে যবন কর্ত্তৃক বল্লভীপুর অধিকৃত হয়, তাহাদের সহিত যুদ্ধে সৌরাষ্ট্রের শেষ রাজা শিলাদিত্য নিহত হন। এই আক্রমণের সময় শিলাদিত্যের অন্তঃস্বত্ত্বা মহিষী পুষ্পবতী

হিন্দুদিগের যে সকল লেখা হইতে টড মিবার-রাণাগণের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছেন সে সকলেই রাণাগণ সূর্য্যবংশ বলিয়া উক্ত। মাঝখান হইতে কোন কোন যাবনিক গ্রন্থ কি রূপ যুক্তিহীন কথায় রাণাদিগের এই সূর্য্য কুলে ইরাণীত্ব আরোপ করিয়া পুরা-তত্ত্ববিদদিগের একটা খোরাক জুটাইয়া গিয়াছে পাঠকদিগকে আমরা তাহা দেখাইব।

"মাসার অল ওমরা" নামক গ্রন্থের উক্তি হইতেই প্রধানতঃ উক্তরূপ অনুমানের জন্ম।

শিবজির ইতিহাস লেখক 'লক্ষ্মীনারায়ণ স্থফিক আরঙ্গাবাদি' (আরঙ্গাবাদের কাব্য-লেখক) রাণা বংশ বলিয়া শিবজির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তাঁহার পুস্তকে উল্লিখিত গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। † টড আবার এই উদ্ধৃতাংশ অনুবাদ করিয়া রাজস্থানে যাহা সন্নিবেশ করিয়াছেন—আমরা এইখানে সংক্ষেপে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশিত করিতেছি। পাঠকগণ এখন দেখুন উক্তরূপ অনুমানের ভিত্তি কতদূর দৃঢ়।

"হিন্দু রাজকুল প্রধান উদয়পুর রাণাগণ 'নসিরান ই আদিলের' (ন্যায়বান) (যিনি হিন্দুস্থানের অনেক প্রদেশ জয় করেন) বংশ বলিয়া পরিচিত। বৈজন্তিয়মের (আধু-নিক কনষ্ট্যানটিনোপল) সম্রাট মরিসের কন্যা মেরিয়ানা পারস্যরাজ নসিরাণের এক মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভের সন্তান নসিজাদ পিতার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মাতার খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন. এবং সসৈন্যে হিন্দুস্থানে আসিয়া সেখান হইতে পিতার বিরুদ্ধে ইরাণ

পিত্রালয় চন্দ্রবতীতে ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় অম্বা ভবানীকে পূজা দিতে গমন করিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় পথে উক্ত সংবাদ পাইয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পাহাড়-গুহায় তাঁহার সন্তানের জন্ম হওয়াতে তাহার গুহা নাম হইল। গুহা ব্রাহ্মণ কন্যা কমলাবতী কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া মিবারের সন্নিহিত ভালরাজ মন্দালিকের ইদর রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েন। তাঁহার নাম হইতেই তাহার বংশধরগণ গুহ-লুট আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাহার বংশধর গুহলুট বাপ্পাই চিতোরের প্রথম রাজা। ৭২০ খৃষ্টাব্দে তিনি চিতোরের যে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন কালের সহস্র বিপ্লবের মধ্যে সেই সিংহাসন আজও তাঁহার বংশধরগণ অধিকার করিয়া আছেন।

† The work which has furnished all the knowledge which exists on the Persian ancestry of the Mewar princes is the Masser al Omra, or that (in the authors possession) founded on it intitled Bisat al Ganaem, or display of the Foe,' written in A. H. 1204. The writer of this work styles himsalf Latchmi Narrain shufeek .Arungabadi, or the 'rhymer of Arungbad ; He professes to give an account of Sevaji the founder of— the Mahratta Empire; for which purpose he goes deep into the lineage of the Ranas of Mewar from whom sivaji was descended, quoting at length the Massers al Omra from which the following is a literal trans-lation.

Tod's Rajasthan, Vol 1. P 235.

যাত্রা করেন, সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়—কিন্তু তাঁহার যে পুত্রকে তিনি হিন্দুস্থানে রাখিয়া যান তাহা হইতেই রাণা বংশের উৎপত্তি।”

এই এক কথা—আর এক—

“পিতৃ বিদ্রোহী নসিজাদ ইরাণে গিয়া যুদ্ধে নিহত হওয়ায় তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। এই ভ্রাতার বংশধর শেষ অগ্নিউপাসক রাজা এজিদ ১৭ হিজরা অব্দে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাভূত ও হৃত রাজ্য হয়েন। এজিদের তিন কন্যা ছিল। যুদ্ধের পর দ্বিতীয় কন্যা সাহার বানু ইমাম হোসেনের পত্নী হইলেন, তৃতীয় কন্যা বানু একজন আরব কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক চিকিক অরণ্যে নীত হইয়া সেইখানে ঈশ্বর শরণ করতঃ অদৃশ্য হইলেন। (এই জন্য পারসীদের ইহা একটি পুণ্য তীর্থ।) কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যা মহাবানুর যে কি হইল ইরাণী পুস্তকে তাহার কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু মহাবানু যে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন হিন্দু পুস্তক হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, মহাবানু হইতেই শশোদিয়া ‡ বংশের (রাণা বংশ) উৎপত্তি। 'এইরূপে যেদিক দিয়াই ধর মিবাররাজগণ হয় নুসিরাণ-পুত্র নসিজাদের সন্তান, না হয় এজিদ কন্যা মহাবানুর সন্তান।”

এই ত 'মাসার অল ওমরার' উক্তি, কিন্তু ইহার মধ্যে মুখের জোর কথা ছাড়া রাণাদের ইরাণীত্ব প্রতিপাদন করে এমন ঐতিহাসিক যুক্তি কই ?

ইতিহাস বরঞ্চ ইহার বিপরীতেই যুক্তি প্রদান করে।

টড বলেন—পারস্য ইতিহাসে নসিজাদের সৌরাষ্ট্র আক্রমণ ও তাহার সিংহাসন আরোহণের সময় (৫৩১ খৃঃ) যা পাওয়া যায়, তাহার সহিত হিন্দু ইতিহাসের বল্লভীপুর লুণ্ঠন কালের (৫২৪ খৃঃ) ঐক্য দেখা যায়। ১

আরো বলেন—

বল্লভীপুরের কাছে বৈজন্তিয়ম নামে একটি নগর ছিল। বৈজন্তিয়ম-সম্রাট-কন্যার গর্ভজাত পারস্য-রাজপুত্র নসিজাদ যে এইখানে যুদ্ধ করেন এই নামটিই তাহার প্রমাণ। যুদ্ধ জয়ের পর মাতার দেশের নামে এই নগরের নামকরণ করিয়াছেন। ২

---

‡ গুহা হইতে প্রথমে রাণাগণ গুহলুট আখ্যা পাইয়াছিলেন, পরে স্থানের নাম হইতে আহারিয়া ও শশোদিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন।

১ The period of the invasion of Saurashtra by Noshizad who mounted the thrown A. D. 531, corresponds well with the sack of Balabhi A. D. 524.

২ We have a singular support to these historic relics in a geographical fact, that places on the site of the ancient Balabhi a city called Byzantium

টডের এই দ্বিতীয় কথাটির সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে।

টড যে নগরকে বৈজন্তিয়ম নাম দিতেছেন, যতদূর সম্ভব তাহার প্রকৃত নাম বৈজয়ন্তী। বৈজয়ন্তী একটি সংস্কৃত কথা সুতরাং এই নাম হইতেই নগরটি নসিজাদের স্থাপিত এমন প্রমাণ হয় না। বিজয় সেন যখন বল্লভীপুর বিজয়পুর প্রভৃতি স্থাপন করেন তখন বৈজয়ন্তী নামে আর একটি নগর তাঁহা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল ইহাই অধিক সম্ভবপর।

টড যে সংস্কৃত ভাষা জানেন না—রাজস্থানের নানা স্থানে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—ইহাও আর একটি প্রমাণ মাত্র।

কিন্তু যদি উক্ত নগর নসিজাদের স্থাপিত বৈজন্তিয়ম বলিয়াই মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে টডের উল্লিখিত দুইটি কথা হইতে ইহাই প্রমাণ হয়—যে তাতারগণ নহে, পারস্য-রাজপুত্র নসিজাদই বল্লভীপুর আক্রমণ করিয়া শিলাদিত্যের রাজ্য অধিকার করেন। রাণাগণ যে নসিজাদের বংশ উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে তাহার প্রমাণ হয় না, বরঞ্চ পারস্যরাজপুত্রের সৌরাষ্ট্র আক্রমণ কাল ও শিলাদিত্যের পরাভব কালের ঐক্য হওয়ায় শিলাদিত্য যে পারস্যরাজের সন্তান নহেন তাহাই প্রমাণ হইতেছে।

এইখানে একটি কথা, সূর্য্য উপাসক ইরাণীদিগের সহিত রাণাদিগের পূজা পদ্ধতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই সূর্য্য পূজা করেন—উভয়ের পতাকায় সূর্য্যের মূর্ত্তি। রাণার নগরের প্রধান দ্বার সূর্য্যদ্বার নামে খ্যাত, ইত্যাদি। ইহা হইতে কি রাণাগণ পারস্য রাজবংশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না? না। ইরাণীগণ যে পুরাতন আর্য্যজাতির একটি শাখা—ইহা একটি সিদ্ধান্ত কথা, সুতরাং রাণাদিগের সহিত তাঁহাদের পূজা পদ্ধতির এই যে সাদৃশ্য তাহাতে কেবল সেই সিদ্ধান্তই অব্যর্থ রহিতেছে, রাণাগণ যে নসিজাদের সন্তান এ সাদৃশ্যে তাহার প্রমাণ হয় না।

এখন দেখা যাক 'মাসার অল ওমরার' দ্বিতীয় উক্তি অর্থাৎ রাণাগণ মহাবানুর সন্তান এই অনুমানটি কিরূপ যুক্তিসঙ্গত।

'মাসার অল ওমরা'-লেখক বলিতেছেন বটে এজিদের জ্যেষ্ঠ কন্যা হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন—হিন্দু পুস্তকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু কোন পুস্তক এ সম্বন্ধে কি বলিতেছে তাহা কিছুই বলেন নাই, সুতরাং তাহা না জানিলে এ কথার মূল্য আপাততঃ

which almost affords conclusive proof that it must have been the son of Noshirwan who captured Balabhi and Gajni and destroyed the family of Silladitya; for it would be a legitimate occasion to name such conquest after the city where his Christian mother had birth. Tod's Rajast'han Vol 1. P 238.

অতি সামান্য। তবে টডের মতে 'মাদার অল ওমরার' প্রথম অনুমানটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টিতে কিছু সত্য থাকিতে পারে। মগধি ভাষায় 'উপদেশ প্রধান' নামক গ্রন্থে শিলাদিত্যের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে—,

* গুজরাটের একটি নগরে দেবাদিত্য নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন সুভগা নামে তাঁহার একমাত্র বালিকা বিধবা কন্যা ছিল। কন্যা পিতার নিকট সূর্য্য মন্ত্র শুনিয়া অসাবধানে তাহা উচ্চারণ করায় সূর্য্যদেব তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

বিধবা কন্যাকে অন্তঃস্বত্তা দেখিয়া ব্রাহ্মণের ক্ষোভের সীমা রহিল না—কিন্তু যখন শুনিলেন সূর্য্যদেব তাহার জামাতা—তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা শান্ত হইলেন—কিন্তু অন্যে কন্যাকে কলঙ্কিত বিবেচনা করিবে এই ভয়ে গর্ব্বিনী দুহিতাকে বল্লভীপুর প্রেরণ করিলেন। সেখানে তাহার যমজ সন্তান হইল—একটি পুত্র একটি কন্যা।

পুত্র বড় হইয়া পাঠশালায় যায়, সমপাঠীগণ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে—সে বলিতে পারে না—সকলে তাহাকে উপহাস করে—এই উপহাসে এক দিন সে ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাকে হত্যা-ভয় দেখাইয়া তাহার পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

এই সময় সূর্য্যদেব সন্তানের নিকট প্রকাশিত হইয়া আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে একটি শিলাখণ্ড প্রদান করিলেন, এই শিলা স্পর্শ করাইবা মাত্র তাহার উপহাসকারী সমপাঠির মৃত্যু হওয়ায় বালক রাজসমীপে আনীত হইল। রাজা তাহাকে দণ্ডভয় দেখাইলে বালক ক্রুদ্ধ হইয়া শিলাখণ্ড দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিল। শিলা হইতে তাঁহার নাম শিলাদিত্য।

টড এই প্রবাদটির সহিত মহাবানুকে এক করিতে চাহেন। তিনি বলেন মহাবানুর পিতা এজিদ রাজ্য হারাইবার পর সম্ভবতঃ মহাবানু হিন্দুস্থানে তাহার আত্মীয়গণের নিকট (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নসিজাদের পুত্র হিন্দুস্থানে বসতিস্থাপন করেন) আশ্রয় লইতে আসেন। মহাবানুই সুভগা নামে খ্যাত হইয়া থাকিবেন। †

পারস্য রাজ দুহিতা-মহাবানুকে সৌরাষ্ট্র রাজ কেহ যে বিবাহ করিতে না পারেন

---

* See Tod's Rajasthan Vol 1. Annals of Mewer, Chapter III.

† But though I deem it morally impossible that the Ranas should have their lineage from any male branch of the Persian house, I would not equally assert that Maha Banoo the fugitive daughter of Yezdegird may not have found a husband, as, well as sunctuary with the prince of saurashtra, and she may be the soobhogna (mother of silladitya) whose mysterious amour with the 'sun' compelled her to abandon her native city of Kaira. The son of Marian had been in saurashtra and it is therefore not unlikely that her grand child should there seek protection in the reverses of her family. P 239.

তাহা নয়, তবে কি এ ঘটনাটি সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে গেলে ইতিহাস বেঠিক হইয়া পড়ে। এই মাত্র আমরা দেখিলাম নসিজাদ যখন সৌরাষ্ট্রে আসেন সেই সময়ে বল্লভীপুরের শেষ সূর্য্যবংশী রাজা শিলাদিত্য নিহত হন। নসিজাদের আক্রমণের অনেক পরে এজিদ মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন সুতরাং মহাবানু তখন সৌরাষ্ট্রে আসিয়া কিছু আর শিলাদিত্যের মাতা হইতে পারেন না।

তার পর, রাণাদিগের বংশের ইতিহাসে এ প্রবাদের কোনই উল্লেখ নাই, তাহাতে কনকসেনের বংশ পরম্পরায় ধারাবাহীক্রমে—শিলাদিত্য সোমাদিত্যের সন্তান বলিয়া উক্ত। (কোন কোন ইতিহাসে শিলাদিত্যের পিতার নাম স্বরষ রাও)।

টড এ সম্বন্ধে আবুল ফজেলের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহাও ঐরূপ মুখের কথা। "রাণা পরিবার আপনাদিগকে নসিরাণের বংশ মনে করেন"—(Rana's Family consider themselves descendents of Noshirwan.) এই এক লাইনে তাঁহার উক্তি শেষ হইয়াছে।

সুতরাং কেবল এইরূপ কথা হইতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সন্তানকুলোদ্ভব বিখ্যাত সূর্য্য বংশ রাণাগণকে ইরাণী পিতা মাতার সন্তান বলিয়া অনুমান করা নিতান্তই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শিশু যখন প্রশংসা পূর্ণ নেত্রে উজ্জ্বল কিরণশালী চন্দ্রের দিকে চাহিয়া আছে তখন যদি তাহাকে বল—ঐ যে চন্দ্র দেখিতেছ উহার কিরণ, জ্যোতি সকলি মিথ্যা,—প্রকৃত প্রস্তাবে উহা একটা মৃৎপিণ্ড মাত্র—তখন সে কথা শিশুর ত নিতান্তই অদ্ভুত মনে হইতে পারে, তাই বলিয়া উহার মধ্যে সত্যের কি কিছু সম্ভাবনা নাই? কে অস্বীকার করিবে?

তবে সম্ভাবনা যাহা তাহা পণ্ডিতদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই পৌঁছে, শিশু তাহার সহজ জ্ঞান ও সহজ বুদ্ধি দিয়া তাঁহা দেখিতে পায় না। যদি পণ্ডিতগণ, পণ্ডিত প্রবর টডের ন্যায় উপরোক্ত প্রমাণে আমাদের খৃষ্টান মহারাণীর সহিত সূর্য্য বংশ রাণাদিগের রক্ত সম্পর্কের সম্ভাবনা দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—কিন্তু অজ্ঞ আমাদের টডের এ আহ্লাদ দেখিয়া পিকুইকের পুরাতত্ব আবিষ্কারটিই মনে আসিয়া পড়ে।

---

* Whichever of the propositions we adopt at the command of the author of 'the Annals of princes' namely ' that the Sesodia race is of the seed of Noshizad Son of Noshirwan or that of of Mahabanoo daughter of Yezdegird" we arrive at a singular and startling conclusion, viz. that the 'Hindua Sooraj descendant of a hundred kings' the undisputed possessor of the honours of Rama, the patriarch of the solar race, is the issue of a Christian princess: that the chief prince among the nations of Hind can claim affinity with the emperors of 'the mistress of the world' though at a time when her glory had waned and her crown had been transferred from the Tiber to the Bosphorus.

Tod's Rajasthan P. 239.

হেঁয়ালিনাট্য।*

রমানাথ বাবুর বাটী।

(হরকান্ত বাবু আসীন, রমানাথ বাবুর প্রবেশ)

র। (হরকান্ত বাবুর প্রতি) এই যে আপনি কতক্ষণ ?

হ। সকালেই এসেছি। আপনি বাড়ী নেই দেখে বসে আছি।

র। এতক্ষণ অমনি বসে আছেন, এক ছিলিম তামাক বুঝি দেয় নি। আ, চাকরগুল যেন কি। ও হরি এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা।

(তামাক লইয়া হরির প্রবেশ।)

হ। (তামাক টানিতে টানিতে) সে দিন না আপনার আমাদের ওখানে বক্তৃতা শুনতে যাবার কথা ছিল তা কই আপনাকে দেখলুম না ত ? আপনি বুঝি বক্তৃতা শেষ হবার আগে চলে এসেছিলেন ?

র। না ভাই শেষে আর আমার যাওয়া ঘটে ওঠে নি, যেতে খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু হাতে একটা বিশেষ কাজ পড়ল।

হ। গেলে ভাল কর্ত্তেন, বেশ বক্তৃতাটী হয়েছিল।

র। বক্তৃতা কে দিলেন ?

হ। সুরেশ বাবু।

র। বিষয়টী কি ?

হ। হিন্দুজাতির অবনতি।

র। সুরেশ বাবু সে সম্বন্ধে কি বল্লেন কি ?

হ। এই আজকাল আর কেউ হিঁদুয়ানি রাখে না, নানা প্রকার অখাদ্য খায় তাই নিয়ে প্রথমটা খানিক দুঃখ প্রকাশ করলেন।

র। বটে, তা, বেশ, আর কি কথা হ'ল।

হ। বল্লেন যে ঐ রকম করা ভারি অন্যায়, ওরূপ গর্হিত লজ্জাকর ঘৃণাকর কার্য্য করিয়া পবিত্র হিন্দুধর্ম্মকে অবনত করা উচিত নহে। যাহারা পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের অবনতি করে তাহারা হিন্দু নামেরই যোগ্য নহে।

র। সুরেশ বাবুত দেখছি বেশ বক্তৃতা কর্ত্তে পারেন।

হ। তিনি আরও অনেক কথা বল্লেন, উপস্থিত সকলেই সুরেশ বাবুর খুব প্রশংসা করতে লাগল।

---

* গতবারের হেয়ালিনাট্যের উত্তর 'জামাই'।

র। যেতে পারলে বেশ হোত বটে। যে রকম শুনছি মনে হচ্ছে বেশ শোনবার উপযুক্ত বক্তৃতা।

হ। তাতে আর সন্দেহ কি? সুরেশ বাবুর মত বক্তার মুখে সব কথাই ভাল শোনায়। বিশেষ যেখানে প্রাণে আঘাত লাগে হৃদয় আপনা হ'তে বলে সেখানে ত ভাল হবারই কথা। হিন্দু সন্তান ম্লেচ্ছের মত ব্যবহার করে একি কম কথা! হিন্দু মাত্রেরই ইহাতে প্রাণে আঘাত লাগে!

র। ঠিক বলেছেন। হায়! আমাদের দেশের কি শোচনীয় অবস্থাই হচ্ছে।

হ। আসছে শনিবারে এ বিষয়ে আমার একটা বক্তৃতা আছে। আসছেন বোধ হয়?

র। অবশ্যই যাব তা আবার বলতে। আপনি কি বলবেন?

হ। আমিও ওই কথাই বলব। যে রকম হয়েছে তাতে ক্রমাগত না বললে ফল দাঁড়াবে না। আর্য্য সন্তানেরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অখাদ্য ভোজন করিয়া পিতৃ পিতামহের নাম কলঙ্কিত করিতেছেন—পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের নাম ডুবাইতেছেন ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি?

(রমানাথ বাবুর পুত্র মণির প্রবেশ।)

মণি। (রমানাথ বাবুকে) বাবা কাল তুমি যে লোকটাকে আসতে বলেছিলে সেই লোকটা এসেছে।

র। (হর কান্তর প্রতি) আপনি একটু বসুন আমি সেই লোকটার সঙ্গে কথা কয়ে এখনি আসছি।

হ। না ভাই—আর বসব না, বড় বেলা হয়ে গেল এখন যাই।

র। আ এত তাড়াতাড়ি কিসের, একটু বোসে জলটল খান তবে যাবেন।

হ। না আমি কিছু খাব না।

র। ঘরের তৈরি বেশ ভাল সন্দেশ আছে একটু খান আনতে বলি, ও মণি এদিকে শুনে যা।

(একটা কাগজের থলে হস্তে মণির প্রবেশ)

মণি। কি বাবা ডাকছ কেন?

র। হরবাবু জল খাবেন তোর মার কাছ থেকে কিছু ভাল সন্দেশ নিয়ে আয় দেখি।

হ। না আমি খাব না, কেন মিথ্যে বিব্রত হচ্ছেন আমি সন্দেশ ভাল বাসিনে।

র। তা সন্দেশ না খান, বাগবাজারের ভাল রসগোল্লা আছে তাই আসুক।

হ। না আমি কোন রকম খাবারই ভাল বাসিনে, আমি কিছু এখন খাব না।

র। (মণির প্রতি) তবে যা আর তোর মার কাছে যেতে হবে না! (হস্তস্থিত কাগজ দেখিয়া) তোর হাতের ওটা কি?

মণি। কেক। একজন স্কুলের ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছে।

হ। (রমানাথের প্রতি) কেক আছে, তা বরং খেতে পারি। ও সব আমার খুব ভাল লাগে।

কাফ্রিগণৎকার।

কাফ্রি জাতির মধ্যে গণৎকারদিগের যেরূপ আধিপত্য আর কোন জাতির মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না। রাজা ভিন্ন সকলেই তাহাদের ভয়ে সশঙ্কিত। তাহাদের হস্তে প্রজাদের জীবন মৃত্যু নির্ভর করে। কাফ্রিদের ধর্ম্ম বিশ্বাসই গণৎকারদের এই ক্ষমতার মূল। সুতরাং কাফ্রিগণৎকারের কথা বলিবার পূর্ব্বে কাফ্রিদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক।

কাফ্রিদিগের প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান বড় বিশেষ নাই, কতকগুলি প্রচলিত সংস্কার দ্বারাই তাহারা চালিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, একজন সৃষ্টি কর্ত্তা এই পৃথিবী মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া বহুরূপী ও টিকটিকি এই দুই প্রকার জীবকে লোকালয়ে জীবন ও মৃত্যুর সংবাদ দান করিতে প্রেরণ করেন। টিকটিকিকে বলিতে বলিলেন মনুষ্যের মৃত্যু হইবে। বহুরূপীকে বলিলেন মনুষ্যের মৃত্যু হইবে না। বহুরূপী পথে আলস্য করিয়া বিলম্ব করিল। ইতি মধ্যে মৃত্যু-দূত টিকটিকি আসিয়া অগ্রে মৃত্যুবার্ত্তা প্রদান করিল। পরে বহুরূপী আসিয়া জীবনের কথা বলিল কিন্তু তাহাতে আর ফল হইল না। এই বিশ্বাস অনুসারে তাহারা এই দুই প্রকার জীবকে দেখিলেই হত্যা করে কিন্তু তাহা ভিন্ন তাহাদের জীবনের কার্য্যে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি বিশ্বাসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব-পুরুষের উপছায়াই তাহাদের প্রকৃত পূজনীয় দেবতা। যাদুকার গণক তাহাদের পুরোহিত। যাদুর ক্ষমতায় কাফ্রিদের সুদৃঢ় বিশ্বাস বলিয়াই তাহাদের উপর গণৎকারের এত প্রভুত আধিপত্য। কাফ্রিদের বিশ্বাস মৃতব্যক্তিরা মাটীর অভ্যন্তরস্থ গুপ্তপুরীতে বাস করে ও নিজের নিজের পরিবারের ভাল মন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখে। সেই জন্য তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে কাফ্রিরা সর্ব্বদাই যত্নশীল। আমাদের দেশে ভূত প্রায়

* আফ্রিকা-পর্য্যটক রেবরেণ্ড জে, জি, উড-লিখিত পুস্তক হইতে গৃহীত।

তাহার পূর্ব্ব মূর্ত্তিতেই দেখা দেয় কিন্তু কাফ্রিদের তাহা নহে। তবে প্রয়োজন মতে কখনো কখনো তাহাও হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে একটী মজার ঘটনা পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি।

টেকা নামক একজন কাফ্রি-রাজার দেশ-অধিকার লালসা বড় প্রবল ছিল। তাঁহার সৈন্যেরা যুদ্ধ করিয়া করিয়া এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে আর তাহারা যুদ্ধ করিতে চাহিল না, তখন একদিন টেকা বলিলেন যে, "আম্বিয়া নামক প্রধান যোদ্ধার ভূত তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বিনাযুদ্ধে আলস্যে কাল কাটাইতেছেন বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। রাজা এই বলিয়া আবার মহা সমারোহে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং আম্বিয়ার বংশধরগণকে উপাধি ভূষিত করিলেন। কাফ্রিজাতির মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই সময় একজন বৃদ্ধ তাহার গৃহ হইতে অদৃশ্য হইল, তাহার স্ত্রী বলিল তাহাকে সিংহে লইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে উক্ত বৃদ্ধ নিতান্ত বন্যবেশে রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া বলিল "সিংহ আমাকে লইয়া গহ্বরে প্রবেশ করিয়া, লাল-মৃত্তিকাময় এক স্থানে রাখিয়া দিল, সে মাটী সরিতে সরিতে আমি ক্রমাগত নীচে হইতে নীচে পড়িতে লাগিলাম। অবশেষে কঠিন মাটি পাইয়া দেখিলাম যে একটী সুন্দর দেশে আসিয়াছি। সে দেশ প্রেত ভূমি। সেখানে সকল ভূতেরা স্ত্রী পরিবার গরু বাছুর লইয়া বেশ সুখে আছে, তবে তাহাদের বংশধরগণ আলস্যে কাল কাটাইতেছে এই তাহাদের যা দুঃখ, এবং এই কথা বলিবার জন্যই ভূতেরা সিংহ দ্বারা আমাকে লইয়া গিয়া ছিলেন। রাজা তাহার কথায় যদিও বিশ্বাস করিলেন তবুও সে ব্যক্তি সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে গণৎকারগণকে তাহা আবিষ্কার করিতে বলিলেন। গণৎকারেরা খানিকটা দেখিয়া বলিল "হাঁ সত্য বলিতেছে"। তখন আর সৈন্যদের উৎসাহ দেখে কে? পূর্ব্ব পুরুষদের অসন্তুষ্ট করিলে মহা অমঙ্গল সুতরাং তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাজার অভিলাষ সিদ্ধ হইল। বলা বাহুল্য আগা গোড়া এ সমস্তই রাজার ষড় যন্ত্র।

তবে সাধারণতঃ পূর্ব্ব পুরুষেরা অতটা অনুগ্রহ করেন না—কোন প্রকার আরণ্য জন্তু বা সর্প বেশে গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার বংশধরগণকে দেখা দিয়া থাকেন। এইরূপে পূর্ব্বপুরুষের দর্শন পাইলে কাফ্রিরা তাহার নামে বলি উৎসর্গ করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করে। যদি বলি না দেওয়া হয় তবে পূর্ব্ব- পুরুষের কোপে শীঘ্রই তাহা-দের অনিষ্ট হইবে ইহা তাহাদের স্থির বিশ্বাস। সন্ধি বিগ্রহ বিপদ সম্পদ রোগশোক উৎসব প্রভৃতি সকল কর্ম্মেই প্রেতাত্মার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করা হয়। আমাদের দেশে যেরূপ ভাবে দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়া হয় কাফ্রীদের ঠিক তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাফ্রি ভূতেরা গৃহস্থ লোক। তাহাদের নিজের নিজের গরু বাছুর আছে।

যে প্রেতাত্মার উদ্দেশে যে গরুকে বলি দেওয়া হয় সে গরুর ভূত তাহার হয়, সুতরাং এইরূপে তাহাদের গরু বাছুর লাভ হয়। গরু বাছুরই তাহাদের ধন, এইরূপে অর্থ দানে কাফ্রিরা ভূতকে সন্তুষ্ট করে। সুতরাং সকল কর্ম্মেই গণৎকারের পৌরহিত্য আবশ্যক। কাফ্রিরা প্রেতাত্মাদিগকে এত মান্য করে বটে কিন্তু তাহার মধ্যে একটী এই বিশেষত্ব দেখা যায় যে, প্রত্যেকেই নিজবংশীয় প্রেতাত্মার কোপ ভয়ে সশঙ্কিত অন্য পরিবারের প্রেতাত্মাকে শ্রদ্ধা করে না। তাহাদের সু বা কু দৃষ্টি ফলদায়ক মনে করে না।

সকল প্রকার রোগ অসুস্থতাকে ইহারা ভূতে পাওয়া বিবেচনা করে ও গণৎকার দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করে। যদি একজন সামান্য লোকের অসুখ করে তবে গণৎকার প্রায় ১টা জীব বলির ব্যবস্থা করেন মাত্র কিন্তু যদি রাজার বা কোন বড় লোকের অসুখ করে তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। প্রথম কথা, তাহাদের অসুখ হওয়া যে কাহারও যাদু বিদ্যার ফল সে বিষয়ে কাফ্রিদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। যদি কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে তবে রাজদ্রোহীতা অপরাধে তাহার প্রাণ দণ্ড হয়। দ্বিতীয় কথা অপরাধী কে? সমুদায় রাজধানীর সমবেত প্রজা মণ্ডলীর মধ্য হইতে গণৎকারকে অপরাধীকে বাহির করিতে বলা হয়। গণৎকার প্রথমতঃ আস্তে আস্তে লোকদের চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে। ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতগতিতে ছুটাছুটি আরম্ভ করে। লোকেরা তাহা হইতে বুঝিয়া লয় এবার গণৎকারের দেহে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। এইরূপে প্রেতাত্মা আবির্ভাব হইলে গণৎকার তখন কুকুরের মত চারি দিক আঘ্রাণ করিয়া বেড়ায়। এই আঘ্রাণ করিবার সময় এইরূপ ভাব দেখায় যেন কোন অন্য অনায়ত্ত শক্তির প্রভাবে কাহারও নিকট হইতে আকৃষ্ট কাহারও নিকট হইতে তাড়িত হইতেছে। অনেকক্ষণ আঘ্রাণ করিয়া অবশেষে কটি হইতে গণৎকারের মর্য্যাদাসূচক দণ্ড উন্মোচন করিয়া একজনকে স্পর্শ করে। স্পর্শিত ব্যক্তিই অপরাধী। তাহার পর গণৎকার অপরাধী ব্যক্তি কর্ত্তৃক লুক্কায়িত যাদু আবিষ্কার করে। এবারও পূর্ব্বের ন্যায় নানা স্থান ঘুরিয়া খুঁড়িবার জন্য একটি স্থান দেখাইয়া দেয়। লোকেরা খুঁড়িয়া কোন প্রকার মূলই বাহির করে। গণৎকারেরা এ জুয়াচুরিটুকু কি করিয়া সম্পন্ন করে তাহা পরে বলিব। এইবার অপরাধী ব্যক্তিকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। দগ্ধ হইবার পূর্ব্বে অপরাধীর অপরাধ স্বীকার করিতে হয়। অস্বীকার করায় কোন ফল নাই আরও কেবল অতিরিক্ত যন্ত্রণা দ্বারা তাহাকে স্বীকার করান হয়। এসম্বন্ধে কাফ্রিদিগের বিন্দুমাত্র মায়া নাই। কেহ যাদু করিয়াছে একবার এই বিশ্বাস হইলে তাহারা যে কিরূপ নির্ম্মম হইয়া পড়ে তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বোঝা যাইবে।

একজনকে অপরাধী সন্দেহ করিয়া অনেকে দল বাঁধিয়া তাহার বাড়ী উপস্থিত

হইল। হতভাগার বাড়ীতে তখন উৎসব, সে মনে করিল তাই ইহারা আসিয়াছে। লোকদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার দিল। আহারে তারা বড় মজবুত, আহার সম্পন্ন করিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া বদ্ধ করিল। সে কেবল বলিল "কি দুর্ভাগ্য আমার অস্ত্র নাই।"

তাহার পর লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল সে অপরাধী কি না। সে বলিল "আমি অপরাধী নই তবে রাজা যদি আমার মৃত্যু ইচ্ছা করেন তবে শীঘ্র বধকর।"

কাফ্রিরা সে কথা শুনিবে কেন, তাহারা বলিল

যাদু দ্রব্য সে শীঘ্র বাহির করুক নহিলে যন্ত্রণা দিবে।

অপরাধী বলিল "আমি কাহারও অমঙ্গল ইচ্ছায় কোন জিনিস কোথায় রাখি নাই। যাহা নাই তাহা কিরূপে বাহির করিব। বধ করিতে হয় আমাকে শীঘ্র বধ কর"।

কাফ্রিরা তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া তীক্ষ্ণাগ্র বর্ষা দ্বারা ক্রমাগত বিদ্ধ করিতে লাগিল। ৩।৪টি বর্ষা বাঁকিয়া গেল, বিদ্ধকারীর হাত ব্যথা হইয়া গেল, তবুও সে অপরাধ স্বীকার করিল না। এই সময়ের মধ্যে লোকেরা একটী অগ্নিকুণ্ড করিয়াছিল ও বড় বড় পাথর খুব গরম করিয়াছিল তাহা দেখাইয়া বলিল 'এখনও স্বীকার না করিলে তাহাকে দগ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দিবে। অপরাধী বলিল "একেবারে মারিয়া ফেলিলে সে খুসী হইত কিন্তু যদি একবারে মারিয়া না ফেলিয়া যন্ত্রণা দ্বারাই তাহারা মারে, তবে তাহাই সহ্য করিবে, যাহা করে নাই তাহা কি রূপে করিয়াছে বলিবে"।

লোকেরা তাহার স্ত্রীকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার সম্মুখে নানা রূপ কষ্ট দিতে লাগিল। অবশেষে অপরাধীকে মাটীতে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া উপর নীচে সেই গরম পাথর দিয়া, সে পাথর না সরিয়া পড়িতে পারে তাহার এমন করিয়া চারিদিকে কাঠ দিল, তার উপর অগ্নি জ্বালিল। আশ্চর্য্য এই এখনও হতভাগার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। খানিক পরে কাফ্রিরা জিজ্ঞাসা করিল মুক্ত করিব? সে বলিল 'কর'। লোকেরা ভাবিল এবার নিশ্চয়ই অপরাধ স্বীকার করিবে কিন্তু যখন দগ্ধকায় জীবন্ত-শব বিকটমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'এখন কি করিতে হইবে' তখন তাহারা ক্ষণকালের জন্য অবাক হইল। কিন্তু তখনও সে অপরাধ স্বীকার না করায় আরও নানারূপ ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়া সকলে তাহাকে বধ করিল।

সভ্য দেশে এরূপ সত্যানুরাগী সাহসী, বীর হৃদয়লোক দেবতা বলিয়া অনুস্মরণীয় হইতেন।

কাফ্রি গণৎকারেরা এত ক্ষমতা লাভ করে বটে কিন্তু যে সে ইচ্ছা করিলেই যে গণৎকার হইতে পারে তাহা নহে। প্রথমতঃ গণৎকার বংশীয় নহিলে গণৎকার হইবার অধিকার নাই। দ্বিতীয়তঃ প্রধান গণৎকার মণ্ডলী সবিশেষ পরীক্ষার পর যদি

তাহাকে গণৎকার হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন তবেই সে গণৎকার-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। যখন গণৎকার হইবার প্রথম লক্ষণ শরীরে ভূতাবেশ হয় তখন সে ব্যক্তির নিয়মিত গৃহ কর্ম্মে আর মন থাকে না। বিষণ্ণভাবে নির্জ্জনে কাল কাটায়, মূর্চ্ছা হয়, ক্ষুধা প্রায় থাকে না। অদ্ভুত অদ্ভুত নানা রকম স্বপ্ন দেখে। এইরূপে কিছু দিন প্রথম দশা যায় তাহার পর দ্বিতীয় দশা উপস্থিত হয়। এই সময় সে চীৎকার ছুটাছুটি লম্ফ ঝম্প করিয়া বেড়ায়, নানা রূপ বিপদজনক কার্য্য করে। কখন জঙ্গলে যাইয়া বিষাক্ত সর্প ধরিয়া গলায় জড়ায় কখন সর্প-কুম্ভীরপূর্ণ ভয়াবহ জলাশয়ে ডুব দেয় ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় দশায় পরিবারের লোকেরা তাহার মঙ্গল উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিয়া তাহার শরীরস্থ প্রেতাত্মাকে সন্তুষ্ট করে। স্টার নামক একজন ইংরাজ-ভ্রমণকারীর একজন চাকর গণৎকার হয়। তিনি তাহার এই রূপ বর্ণনা দিয়াছেন। প্রথম প্রথম সে বাঘ হাতী সাপ প্রভৃতি আরণ্য জন্তু ও জুলু দেশের স্বপ্ন দেখিত ও বলিত তাহার সেখানে যাইতে ইচ্ছা করে। তাহার পর সে খুব পীড়িত হইল। তাহার স্ত্রীরা তাহার মৃত্যু আশঙ্কায় কাঁদিতে লাগিল তাহার বাপ একজন গণৎকারকে তাহার রোগ মুক্ত করিতে আনয়ন করিল। গণৎকার বলিল তাহার শরীরে ভূত প্রবেশ করিয়াছে অতএব ভুতের উদ্দেশে বৃষ বলি দেওয়া উচিত। বলি দেওয়া হইল, রোগী ক্রমে সবল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকিতে লাগিল। চারি দিক হইতে জ্ঞাতিরা দেখিতে আসিল কিন্তু সে তাহার দুটী ছোট ছেলে মেয়ে ছাড়া কাহাকেও নিকটে আসিতে দিত না। এক দিন সে কুটীর হইতে চলিয়া গেল তাহার ছেলে মেয়েও তাহার সঙ্গে গেল। তাহারা সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইয়া আর তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ২।৩ দিন রোগীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না তাহার পর সে এক বিকট মূর্ত্তিতে তাহার অশ্রুসিক্ত স্ত্রীবৃন্দ ও শোকাকুল আত্মীয়দের নিকট উপস্থিত হইল। অসুস্থতা ও অনাহারে অস্থিচর্ম্মসার শবাকার দেহে চোখ দুটী দীপ্তভাবে জ্বলিতেছে। মাথার চুল সব ছিঁড়িয়া তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি খড় দিয়া মস্তক সজ্জা করিয়াছে, গলায় একটা জীবিত সর্প জড়ান। এই বেশে কুটীরে আসিয়া বলিল লোকে আমায় বলে পাগল কিন্তু তা নয় আমি পাগল নই। আমি প্রেতাত্মার অনুগৃহীত। তাহার পর নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। গীতের মর্ম্ম—" আমি ভাবলুম ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমি ঘুমই নি'। এই সময় তাহার স্ত্রীরা তাহার রোগ ও সমুদ্র গমনের কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে আরও নৃত্য গীত করিতে লাগিল, গীতের মধ্যে এক জায়-গায় বলিল আমি স্বপ্নে অমুক স্থানে অজাগর সাপ দেখিয়াছি। লোকে যাইয়া খুঁড়িয়া ২টা অজাগর সর্প বাহির করিল। সে একটা ধরিতে গেল, কিন্তু ধরিবার পূর্ব্বেই তাহার পুত্র সর্পের মাথায় এক সজোর আঘাত করিল। সর্প মরিল না কিন্তু হতবল হইল—রোগী সেটা গলায় জড়াইল। আর একবার বলিল অমুক স্থানে বাঘ আছে। লোকেরা

যাইয়া সেই স্থানে বাঘ পাইয়া হত্যা করিল। ভাবী গণৎকার কিছু দিন কুটীরে থাকিয়া নিজের সব বৃষগুলিকে ক্রমে ক্রমে প্রেতাত্মার উদ্দেশে বলি দিয়া অবশেষে একজন বিখ্যাত গণৎকারের শিষ্য হইয়া কিছু দিন তাহার সঙ্গে বাস করিল। তাহার পর অন্য গণৎকার মণ্ডলীর দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া গণৎকার হইবার অধিকার পাইল। এইরূপ অধিকার পাইবা মাত্র যে একজন সাধারণের নিকট গণৎকারের প্রতিপত্তি লাভ করে এমন নহে। প্রথম ২।৪ বার গণনায় যদি সফল হয় তবেই লোকের তাহার উপর বিশ্বাস জন্মে ও সে ক্রমে প্রতিপত্তি ও অর্থ লাভ করে। যদি প্রথমে বিফল হয় তবে লোকে বুঝে যে প্রেতাত্মার তাহারা উপর অনুগ্রহ নাই সুতরাং কেহ তাঁহাকে ডাকে না। কি করিয়া তাহারা গণনা কার্য্য সম্পন্ন করে ও কেমন করিয়া এত ক্ষমতা লাভ করে তাহা আগামী বারে বলিব।

কবি, নাস্তিকতা ও সেলি।

কবি কে? ছন্দোবন্ধে যিনি পুস্তক লিখিতে পারেন তিনিই কবি নহেন; যিনি যত ভাবুক তিনিই তত কবি। প্রকৃত ভাবুক হইতে গেলে একটি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি থাকা চাই, যাহা দ্বারা তিনি জগৎ সংসারের অন্তর-নিহিত ভাবটি গ্রহণ করিতে পারেন।

আমরা একটি ফুল দেখিলাম, তাহার গন্ধে প্রাণখানি মুহূর্ত্তের জন্য উল্লাসিত হইয়া উঠিল, তার পর সে কথা ভুলিয়া গেলাম, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ফুলের সঙ্গে কবির চিরন্তন সম্পর্ক জন্মিল, তাহার মধ্যে কবি আজীবন আত্মহারা হইলেন, সে সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি বিশ্বের জীবন্ত অমর আত্মাখানি প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই সৌরভের মধ্যে এক অনন্ত জীবনের অনন্ত প্রেম-কাহিনী শুনিতে পাইলেন।

আমরা, একজনের প্রেমে, মিলনে, বিরহে বিষাদে, নিজের ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়া তাহার হৃদয়ের কতকটা সুখ দুঃখ অনুভব করিলাম, কিন্তু কবি বিশ্বের হৃদয় দিয়া সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির রহস্য ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সুতরাং তাহার সুখ দুঃখ কবি যতদূর আয়ত্ত করিলেন, আমরা তাহা পারিলাম না। কবির নিকট ক্ষুদ্র মহান হইয়া উঠিল, এ জগৎ যে জগৎ-ছাড়া সম্পর্কে আবদ্ধ, একটি ক্ষুদ্র মনুষ্যের ক্ষুদ্রতম জীবন কাহিনী হইতে কবি তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। এইরূপে কবির দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে মিথ্যার মধ্যে যাহা সত্য, জড়ের মধ্যে যাহা প্রাণ, শরীরের মধ্যে যাহা আত্মা, স্থূলের মধ্যে যাহা সূক্ষ্ম, জগতের মধ্যে যাহা জগদতীত, অসম্বদ্ধতা, অশোভনতা, বৈষম্যের মধ্যে, যাহা সুন্দর, সুশোভন, সাম্য, তাহা প্রকাশিত হয়।

কবি তাঁহার সেই স্বতোলব্ধ সত্য, কল্পনায় সাজাইয়া, ভাষায় ফুটাইয়া লোককে সজ্ঞান করিতে প্রয়াস করেন। যে বুঝিল সে বুঝিল, যে বুঝিল না, সেও তাঁহার কল্পনা ক্ষমতায়, তাঁহার হৃদয়ের অনন্ত প্রসারতায় আশ্চর্য্য মুগ্ধ হইয়া গেল।

বিজ্ঞান বলিতে আজ কাল জড় বিজ্ঞানই বুঝায়; যতটুক সত্য ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের আয়ত্ত এ বিজ্ঞানের তাহা লইয়াই কারবার। কিন্তু যিনি যত উচ্চ কবি তিনি তত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, কেন না ইন্দ্রিয়াতীত দিব্য সত্য তিনি তত অধিক আয়ত্ত করিতে পারেন। আমাদের পুরাতন ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান শাস্ত্রকারগণ উচ্চ কবি বলিয়াই প্রকৃত জ্ঞান ধর্ম্মের মূলে পৌঁছিয়াছিলেন।

সুতরাং কবি কখনো প্রকৃত অর্থে নাস্তিক হইতে পারেন না। জর্জ এলিয়ট বলিতে পারিয়াছিলেন, আমি অনু পরমাণু লইয়াই সন্তুষ্ট আছি, কিন্তু কবি টেনিসন তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

অণু হইতে অণুর অন্তরে প্রবেশ করাই কবির আকাঙ্ক্ষা, অন্ত হইতে অনন্তে মিলন লাভ করাই কবির বাসনা; সুতরাং সংসারের ক্ষুদ্র সুখ ঐশ্বর্য্য লইয়াই কবি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, কবির হৃদয় অণুর অণু, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা অনুসন্ধান করিতেই ব্যস্ত, তাঁহার দিব্য দৃষ্টি তাঁহাকে উচ্চ জ্ঞানের উচ্চানন্দের যে সমুদ্র দেখাইয়াছে, তিনি অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহার মধ্যে ডুবিতে, তলাইয়া যাইতে ব্যগ্র। ইংরাজ কবি সেলিকে গোঁড়া খৃষ্ট সমাজ নাস্তিকতা অপবাদে দূষিত করেন, কিন্তু সেলির ঈশ্বরভাব খৃষ্টানদিগের হইতে কত দূর উচ্চ তাহা না বুঝিয়াই তাঁহারা এরূপ বলেন। সেলির সংসারে কতখানি অতৃপ্তি, উচ্চ প্রেম, জ্ঞান লাভ করিতে তিনি কত দূর লালায়িত তাহা তাঁহার 'আলেষ্টরে' তিনি দেখাইয়াছেন।

সেলি যে ঈশ্বর ধারণা করিতে পারেন না, তাহা খৃষ্টানদের প্রতিহিংসা-পরতন্ত্র, মনুষ্য গুণাগুণ-বিশিষ্ট ঈশ্বর, তাঁহার ঈশ্বর অদ্বৈত বাদী হিন্দুর পরব্রহ্ম, তাহা নির্গুণ অথচ অন্ধ শক্তি মাত্র নহে। তাহা সর্ব্বভূতে বিরাজমান সর্ব্বভূত পরিচালক অনন্ত জ্ঞান শক্তির আধার পরমাত্মা। সেলির একটি মাত্র কাব্য 'কুইন ম্যাব' হইতে আমরা দেখাইব সেলির ঈশ্বর অদ্বৈত বাদী হিন্দুর ঈশ্বর কি না।

কুইন ম্যাব স্বপ্নের অধিষ্ঠাত্রী পরী রাণী নিদ্রাভিভূতা, পবিত্র প্রাণা, শুদ্ধাত্মা-মানবী ইয়ানথির নিকটে গিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, বলিলেন "জগতের যিনি মহানাত্মা (The world's supremest Spirit) পুরস্কারের যোগ্য পাত্র তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এক মহৎ বর প্রদান করিতেছেন। প্রধান প্রধান জ্ঞানী কবিরাও যে সকল সত্য পরিষ্কার রূপে দেখিতে পান না, তুমি তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইবে।"

পুরস্কারের যোগ্যপাত্র কিসে?—না—

"লোকাচার, অন্ধ বিশ্বাস, ক্ষমতাকে তুমি তাচ্ছিল্য কর, ভয় বিদ্বেষ ঘৃণা হইতে তোমার হৃদয় স্বাধীন, দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল ও পবিত্র-তুমি, অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন প্রেমাতপ বিহীন মানব প্রকৃতির পক্ষে পথ প্রদর্শক জীবন্ত আলোক স্বরূপ, তোমাকে দর্শন করিয়া মানব সংসারের আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবে—"

"অতএব, হে মহতি আত্মা, এস প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে মন্দিরে দেবাসুরগণ একত্রে উপাসনায় নতজানু, সেখানকার হোমাগ্নি শিখা স্পর্শ কর, যে মন্দিরে কালরূপ-অনন্ত সর্প মোহনিদ্রায় চিরকাল শয়ান আছে, তোমার দ্বারাই তাহার দ্বার উন্মুক্ত হউক। তোমার স্বরে, দৃষ্টিতে, দেহে যেখানে যাহা কিছু আছে সে সমুদায়কে আমি আহ্বান করিতেছি, 'হে আত্মা, তুমি পৃথিবীর ধূলিখেলা পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত চলিয়া এস"

যদি আর অধিক দূর না যাওয়া যায়—তবে কেবল এই কয়েক ছত্র হইতেই সেলির ধর্ম্ম বিশ্বাস কিরূপ, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

অন্ধ বিশ্বাস ও মিথ্যা ধর্ম্মের প্রতি যে তাঁহার বিশেষ ঘৃণা ছিল, জগতের মূল আত্মা ও ন্যায় ধর্ম্মের প্রতি যে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, দিব্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে যে তিনি লালায়িত ছিলেন এই কয় ছত্রেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু আমরা এই খানেই থামিব না, আরো কিছুদূর যাইব।

"অশরীরী পাবিত্রতার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া ইয়ানথির আত্মা সহসা উত্থিত হইল, পার্থিব ভাবের বিন্দুমাত্র কলঙ্ক শূন্য হইয়া, স্বাভাবিক আত্ম মহিমাময়ী রূপে মরজগতে অমররূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

"শরীর নিদ্রাভিভূত হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল, ইহার প্রত্যেক অবয়ব এখন অর্থ-শূন্য নির্জীব, তবু জীবন ইহাতে সঞ্চরণ করিতেছিল, প্রত্যেক যন্ত্র আপন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। শরীর ও আত্মার একত্র দর্শনলাভ কি চমৎকার ব্যাপার!

"উভয়ে সেই একই ব্যক্তি, উভয়ে সেই একজনেরি চিহ্ন বিদ্যমান, তবু উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! একটি স্বর্গের দিকে উন্মুখ, তাহার পৈতৃক সম্পত্তি অসীমতা লাভের জন্য লালায়িত, এবং চির পরিবর্ত্তমান, চির উন্নতিশীল অবস্থায় অনন্ত জীবরূপে বিচরণ কারী"—

(One aspires to heaven, pants for its sempiternal heritage. And ever changings ever rising still. Wantons in endless being.)

আর একটি অল্পক্ষণের নিমিত্ত অবস্থা ও প্রবৃত্তির খেলার সামগ্রী হইয়া দ্রুত গতি

আপনার দুঃখময় কাল পূর্ণ করিয়া সহসা অনাবশ্যকীয় ভাঙ্গা চোরা যন্ত্রের মত পড়িয়া পচিয়া, অবশেষে ধ্বংশ প্রাপ্ত।”

পাঠক দেখুন সেলি আত্মা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমাদের হিন্দু শাস্ত্রকারগণের সহিত তাহার কিরূপ মিল!

মায়া রথ চলিল, পরীর সহিত আত্মা তাহার মেঘময় মায়া প্রাসাদে উপনীত হইলেন, তখন পরী আত্মাকে সেই প্রাসাদ দেখাইয়া বলিলেন—

“ইহা কি বিচিত্র! মনুষ্যের উৎকৃষ্টতম প্রাসাদও ইহার নিকট উপহাস যোগ্য। কিন্তু স্বর্গীয় প্রাসাদে আবদ্ধ থাকিয়া, নিজের সুখ ভোগে রত থাকাই যদি পুণ্যের একমাত্র পুরস্কার হইত তাহা হইলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। অন্যকে সুখী করিতে শিক্ষা কর। হে আত্মা, এস, ইহাই তোমার যোগ্য পুরস্কার, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তোমার নিকট উন্মুক্ত করি”

খৃষ্টানদিগের ন্যায় সেলির নিকট সুখভোগই পুণ্যের পুরস্কার নহে, পুণ্যলাভের উদ্দেশ্য, নহে, আবার হিন্দুর সেই নিষ্কাম পরোপকার তিনি এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

নিম্নস্থিত পৃথিবী-বিন্দুকে দেখাইয়া পরী তখন আত্মার নিকট পৃথিবীর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাহিনা বলিতে লাগিলেন। সেই কাহিনী সেলি নিজের হৃদয় গলাইয়া তাহা দিয়া যেন লিখিয়াছেন। এখন ধর্ম্মের নামে কিরূপ অধর্ম্মে ন্যায়ের নামে কিরূপ অন্যায় অত্যাচারে পৃথিবী পীড়িত তাহা বলিতে বলিতে সেলির বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে। অর্থচ তাহাতে নিরাশার ভাব কিছু মাত্র নাই, ভবিষ্যতে যে এই মঙ্গলময় রাজ্যে সমস্ত মঙ্গল হইয়া দাঁড়াইবে এ সম্বন্ধে তিনি স্থির চিত্ত, মনুষ্য মাত্রেতেই সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ আত্মার প্রসাদ ব্যাপ্ত, কালে ইহা হইতে মনুষ্য পূর্ণতা লাভ করিবে, তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ও পবিত্রতা ও ধর্ম্মের প্রতি একটি অটল অনুরাগ এই কাহিনীতে দেদীপ্যমান।

বর্ত্তমানের কথা বলিতে বলিতে পরী একস্থানে বলিতেছেন -“ঐ পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখ, ক্ষেত্র সুবর্ণ শষ্য উৎপন্ন করিতেছে, ফল ফুল বৃক্ষ ক্রমান্বয়ে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, সকলেই সুখশান্তি প্রেমের কথা গান করিতেছে। প্রকৃতির নীরব সুস্পষ্ট জলন্ত ভাষায় বিশ্ব সংসার ঘোষণা করিতেছে যে আর সকলেই প্রেম ও আনন্দের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে কেবল অভাগা মানুষই তাহা করিতেছে না। সে নিজে যে অসি নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহাতে নিজের শান্তি হনন করিতেছে, যে সর্প তাহার হৃদয় শোনিত পান করিতেছে তাহাকেই সে পোষণ করিতেছে, তাহার দুঃখেই যাহার

আনন্দ, তাহার কষ্ট লইয়াই যাহার খেলা এমন অত্যাচারীকেই সে বড় করিয়া তুলিতেছে।

"কিন্তু ঐ যে সূর্য্য তাহা কি কেবল ক্ষমতাশালীদেরই আলোক বিতরণ করে? ঐ যে রজতকিরণ তাহা কি রাজ প্রাসাদ অপেক্ষা কুটীর শয্যায় কমসুখে নিদ্রাযায়? পৃথিবীর যে সকল অসংখ্য সন্তানেরা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহার অবিভক্ত দান উপার্জ্জন করে, পৃথিবী কি সেই সন্তানদিগের বিমাতা, আর ঐ যে পুতুল শিশুগণ—যাহারা আরাম বিলাসে লালিত পালিত হইয়া মানুষদিগকে আপনাদের শৈশবের খেলার জিনিস করে, এবং মানুষেই মাত্র যে শান্তির মর্য্যাদা বোঝে, শিশুত্বের আত্মম্ভরিতায় স্ফীত হইয়া, সেই শান্তি নষ্ট করে—পৃথিবী কি উহাদেরি আপনার মা?"

"হে প্রকৃতির আত্মা (Spirit of Nature)তাহা নহে, তোমার পবিত্র অংশ প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে সমানরূপ সঞ্চরণ করিতেছে, তোমার অসীম ক্ষমতা সিংহাসন তুমি ঐ খানেই স্থাপন করিয়াছ। তুমিই সেই বিচারক, যাহার ন্যায় দণ্ডের শাসনে মনুষ্যের ক্ষণস্থায়ী চপল প্রভুত্ব মৃদুল বাতাসের মত ক্ষমতাহীন। মানুষের তুলনায় যেমন ঈশ্বর (এখানে ঈশ্বর অর্থে খৃষ্টান ঈশ্বর—তাহা পাঠক ভুলিবেন না) তোমার ন্যায়ের তুলনায় মানুষের ন্যায় তেমনি ধূলি খেলা মাত্র।

"হে প্রকৃতির আত্মা, তুমিই এই অনন্ত জগৎ সংসারের জীবন, ঐযে বিশাল গ্রহতারা নক্ষত্র, স্বর্গের গভীর স্তব্ধতার মধ্যে যাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় কক্ষ বিরাজমান তুমি তাহাদিগেরও আত্মা আবার ঐ যে ক্ষুদ্রতম জীব—যাহা এক বিন্দু-এপ্রিল সূর্য্য কিরণেমাত্র বাস করে—তাহারও তুমি আত্মা। ঐ সকল পদার্থদিগের ন্যায় মনুষ্য ও অজ্ঞানভাবে তোমার উদ্দেশ্য সাধন করে, উহাদিগের ন্যায় মানুষেরও চির শান্তির যুগ দ্রুতগতিতে নিশ্চয় আসিতেছে।"

* * * * * * *

"প্রকৃতির যে আত্মা এই বিশ্বকে এত রমণীয় করিয়াছেন, ধরাকে প্রচুর শষ্য শালিনী করিয়াছেন, এবং জীবনের ক্ষুদ্রতম তারতন্ত্রটিকেও অপরিবর্ত্তনীয় এক তানে বাঁধিয়াছেন, যিনি সুখীপক্ষীদিগের বাসের নিমিত্ত কুঞ্জবন দিয়াছেন—অগাধ সমুদ্র তলবাসী জীবদিগকে চির শান্তিময় বাসস্থান দিয়াছেন এবং হেয়তম যে পতঙ্গটি ধূলির উপর বিচরণ করে—তাহাকেও আত্মা চিন্তা প্রেম দিয়াছেন—তিনি কি কেবল মানুষকেই অসুখী করিয়াছেন? তাহার আত্মাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং ধূমকেতুরূপ সুখকে দূরে রাখিয়াছেন যাহা মনুষ্যের আলিঙ্গন তাচ্ছিল্য করিয়া তাহার মাথার উপর হইতে পদ নিম্নের গভীর অগাধ গহ্বর দেখাইয়া দিতেছে?

"হে প্রকৃতি, না। রাজা পুরোহিত আর রাজপুরুষ এই তিন শ্রেণীর লোকে মানব পুষ্পকে মুকুলে বিনষ্ট করিয়াছে, তাহারা সমাজে খল কপটতা প্রবিষ্ট করাইয়াছে মিথ্যাকে

সত্য করিয়া সাজাইয়াছে, মানুষে মানুষে বিবাদ বাধাইয়া দিয়াছে এবং এইরূপে প্রকৃতির সদুদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে।"

কিন্তু ঐ সকল অত্যাচারী পাপীও সেলির নিকট হেয় নহে, তিনি বলিতেছেন—

"তথাপি প্রত্যেক অন্তঃকরণেই পূর্ণ সততার বীজ আছে। ধার্ম্মিক পুরুষের তুলনায় মহান জ্ঞানী ব্যক্তিও ক্ষুদ্র বালকের ন্যায়। ধার্ম্মিক পুরুষের বুদ্ধি পরিষ্কার,' প্রবৃত্তি পবিত্র এবং উদ্দেশ্য উচ্চ। যে সকল ব্যক্তিরা সহরের নানা প্রকার কুকার্য্যে জীবন কাটায় তাহারা ঐ ধার্ম্মিক পুরুষকে অনুকরণ করিয়া তাহার সমান হইতে পারে।

আর ভবিষ্যতে যে সমান হইবে—তাহাই তাঁহার স্থির বিশ্বাস।

"এই বিচিত্র জগতে আত্মাই একমাত্র চিরস্থায়ী বস্তু। * * * জড় বস্তুই মঙ্গল অমঙ্গল, সত্য মিথ্যা, ইচ্ছা চিন্তা কার্য্য, সুখদুঃখ, সহানুভূতি বিদ্বেষ এই সমুদায়ের আকর। সূর্য্য কিরণ যেরূপ পবিত্র, পৃথিবীর বায়ু হইতে অপবিত্রতা প্রাপ্ত হয়, আত্মাও সেইরূপ পবিত্র, শরীরের সংস্পর্শে অপবিত্র হয়।"

"মানুষ আত্মা ও দেহ এই দুয়ে গঠিত, উচ্চ উদ্দেশ্য সাধন করিতে ইহাদের আবির্ভাব। এখন যে নীচ, দুঃখতাপপূর্ণ পাশব ভাবাপন্ন মানুষ দেখা যায় তাহা পাপের ফল। পরে যে মানুষ হইবে মহৎ মহৎ কার্য্য করিবে সুখে কল্পনা রাজ্যে ভ্রমণ করিবে, চিরশান্তি লাভ করিবে, এবং দেহ ও আত্মা এতদুভয়ের সামঞ্জস্য জাত আনন্দ সমূহ আস্বাদন করিবে।" তবে আর কি—

হে আত্মা "নিশ্চিন্ত থাক, তোমার সন্দেহ তাড়াইয়া দেও, পাপ তাপ মিথ্যাভ্রান্তি ঐ পৃথিবীতে আছে সত্য, কিন্তু এ অনন্ত জগতে মন্দের সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্দ নিবারণের ঔষধও রহিয়াছে। ঘোর পাপ কলুষিত দিনেও ধার্ম্মিক লোক আবির্ভূত হইবেন, তাহাদের পবিত্র মুখ নির্গত অমর সত্য মিথ্যা রূপ বৃশ্চিককে চিরস্থায়ী অগ্নি মালায় আবদ্ধ করিয়া রাখিবে—উহা আপনাকে আপনি দংশন করিয়া তন্মধ্যে মৃত হইবে।"

এ ঠিক হিন্দুর অবতার বিশ্বাস। সেলি খৃষ্টান হইয়া জন্মিয়া জ্ঞানী হিন্দুর চক্ষে জগৎ দেখিয়াছেন, খৃষ্টান তাঁহাকে বুঝিবে কি করিয়া? তিনি মানবাত্মাকে সম্বোধন করিয়া জগৎব্যাপী আত্মার স্তব করিয়াছেন খৃষ্টান তাঁহাকে নাস্তিক ভাবিয়াছে।

এক স্থানে পরী ইয়ানথিকে বলিতেছেন—"ঈশ্বর নাই। * * অন্তরে অসীমতা বাহিরে অসীমতা, সৃষ্টিকর্ত্তা মিথ্যা করিয়া দিতেছে। প্রকৃতি যে অনন্ত আত্মাতে ওতপ্রোত আছে, তাহাই প্রকৃতির একমাত্র ঈশ্বর। (Infinity within, infinity without, belie creation ; The exterminable spirit it contains is nature's only God.)

কিন্তু এ ঈশ্বর খৃষ্টান ঈশ্বর—তিনি যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া কথিত কবি

বলিতেছেন, সমস্ত জগৎ সংসার সেরূপ সৃষ্টি অপ্রমাণ করিতেছে। পরেও তিনি খৃষ্টান ঈশ্বরকে, তাঁহার প্রতিহিংসাপরায়ণতাকে অতিমাত্রায় আক্রমণ করিয়াছেন, আমরা বাহুল্য ভয়ে আর তাহা এখানে উঠাইলাম না। উঠাইবার আবশ্যকও নাই, সেলি খৃষ্টান ঈশ্বর না মানুন তিনি যে নাস্তিক ছিলেন না, জগতের অন্তরভূত ঐশীশক্তিতে তাঁহার যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল পাঠক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের উপসংহার কালে তিনি মানবাত্মাকে যাহা বলিয়াছেন—আমরা পাঠককে তাহার অত্যল্প সংক্ষেপে উপহার দিয়া এই খানেই প্রবন্ধ শেষ করি।

"মানবাত্মা, সাহসে ভর করিয়া চলিতে থাক, ধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া পরিবর্ত্তন-শীল ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হও। জন্ম জীবন মৃত্যু এবং মৃত্যুর সেই পরবর্ত্তী অবস্থা যখনো উলঙ্গ আত্মা তাহার বাসস্থান পায় নাই, সকলি পূর্ণ সুখের পথে অগ্রসর হইতেছে এবং জীবদিগের শ্রান্তিহীন চক্রকে সেই দিকে চালাইতেছে, যাহা অনন্তজীবনের আশায় লক্ষ্যস্থানে পৌছিবার জন্য ব্যগ্র। জন্ম কেবল আত্মাকে বাহ্য জগতের সম্পর্কে জাগ্রত করে, জগৎ নূতন প্রকার প্রবৃত্তিতে আত্মাকে বন্ধন করে। জীবন আত্মার কার্য্যক্ষেত্র, এবং ঘটনা সমষ্টির ভাণ্ডার গৃহ, যাহা দ্বারা অনন্ত জগৎ ভিন্ন ভিন্ন সাজে প্রতিভাত হইতেছে। মৃত্যু একটি ভীষণ অন্ধকার ময় দ্বার, যাহা দ্বারা অনন্ত সুখ আশার রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। অতএব হে আত্মা নির্ভয়ে চলিতে থাক, যদিও ঝটিকায় তৃণ ফুলের (প্রিমরোজের) বৃন্ত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে যদিও তুষারে ইহার লাবণ্য ম্লান হইয়া পড়িতেছে, তবুও বসন্তের নিশ্বাস আবার পৃথিবীর প্রেমের ফুলগুলি ফুটাইয়া তুলিবে তাহার উজ্জ্বল হাসিতে শ্যামল বন প্রান্তর আবার উজ্জ্বল হইবে শৈবালময়তীর ও অন্ধকার উপত্যকা সুশোভিত হইয়া উঠিবে।"

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সমালোচনা মালা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম এ, প্রণীত।

পূর্ব্বে আর্য্যদর্শনে লিখিত গ্রন্থকারের কতকগুলি সমালোচনা এক্ষণে সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত সমালোচনা গুলিতেই গ্রন্থকর্ত্তার বিশিষ্ট চিন্তা শীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহার মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ ও বিষ-বৃক্ষের সমালোচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যোগেন্দ্র বাবু যেরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক তাহাতে তাঁহার রচনার বাহুল্য-সমালোচনা অনাবশ্যক, আমরা সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হই পুস্তকখানি যে কেহ পড়িবেন তিনিই পরিতোষ লাভ করিবেন।

ওয়ালেসের জীবন বৃত্ত — ঐ। এখানি স্বদেশানুরাগী মহাবীর এবং স্বদেশ উদ্ধার কর্ত্তা রবার্ট ব্রুসের পরম-বন্ধু ও সহযোগী মহাত্মা সার উইলিয়ম ওয়ালেসের জীবন চরিত। তাঁহার জীবন নিঃস্বার্থ স্বদেশানুরাগের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি প্রথম এডওয়ার্ডের দৌরাত্ম্য হইতে স্বীয় জন্ম ভূমি স্কটলণ্ডের উদ্ধারার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজ্জ্বলিত স্বদেশানুরাগবহ্নি হৃদয়ে ধারণ করিয়াই তাঁহার সহযোগী বন্ধুবর ব্রুস তাঁহার মৃত্যুর পর ছয়বার অকৃত কার্য্য হইয়াও সপ্তমবার ইংলণ্ডের আশা ভস্মসাৎ করিয়া জন্ম ভূমি উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাহার জীবন্ত স্বদেশানুরাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রভাবেই তৎকাল হইতে ষষ্ঠ জেম্‌সের ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিরোহন সময় পর্য্যন্ত স্কটলণ্ড স্বাধীন ছিল।

গ্রন্থকারের দার্শনিক মিলের জীবনী এবং ইটালীর উর্দ্ধার কর্ত্তা ম্যাটসিনির জীবন বৃত্তান্তের ন্যায় এখানিও অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম ভরষা করি বঙ্গবাসী মাত্রেই এখানি পাঠ করিয়া আমাদের ন্যায় আহ্লাদিত হইবেন।

বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন। লেখকের নাম নাই। বইখানিতে ইউরোপের অনেক স্থানের বর্ণনা আছে। লেখক তাঁহার ভ্রমণ কালে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই মোটামুটি ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানিতে বর্ণনা কোশলের অভাব। বর্ণনা কৌশল থাকিলে ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক হইতে পারিত। মোটের উপর বইখানি মন্দ নহে।

পিশাচ সহোদর। প্রথম খণ্ড। রচয়িতার নাম নাই। এ খানি একটী উপন্যাস। গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় খণ্ড না পাইলে আমরা গ্রন্থের সম্যক সমালোচনা করিতে পারি না। প্রথম খণ্ডের নায়িকা ইন্দিরার জীবন প্রথম খণ্ডেই শেষ হইয়াছে। ইন্দিরার চরিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। লেখা একটু কাঁচা, বইখানি পড়িলে মনে হয় লেখকের এই প্রথম উদ্যম। লেখকের ক্ষমতা আছে, যত্ন করিলে সুলেখক হইতে পারেন। আশা করি দ্বিতীয় খণ্ডে অধিক সফলতা দেখাইতে পারিবেন।

ভারত কোকিল। (কাব্য) শ্রীতারিণীচরণ সেন প্রণীত। ভারতের অতীত সুখ স্মৃতি, বর্ত্তমান দুঃখ দশা ও ভবিষ্যৎ আশার কথা লইয়া এই আক্ষেপময় কাব্যখানি রচিত। পুস্তকের ভাবগুলি পুরাতন। ভাষা মন্দ নহে।

বিগত-স্বপন। শ্রীবরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এ পুস্তকখানিতেও লেখকের নাম নাই। ইহাও একখানি কবিতা পুস্তক। ২।৪ টী কবিতার

প্রথমাংশ ভাল হইয়াছে, কিন্তু সমুদয় পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিতে পারিলাম না।

উদ্গীথা। শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রণীত। বেদের কয়েকটী শ্লোক হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকখানি রচিত। ইহার ভাবগুলি যেমন মধুর ভাষাও তেমনি লালিত্য পূর্ণ। আমরা পুস্তকখানি হইতে একটী কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিই গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

অতিথি।

মরমে মরমে মেঘে বহে জল,
মেঘ তা ভাবিয়া আনে না।
প্রাণে প্রাণে পূরে রয়েছে মরুত,
সে সম্বাদ সেত জানে না।
শত রশ্মি রবি না পাইত যদি,
সে কি তা ভাবিয়া আনিত ?
বিদ্যুতাগ্নি নাহি বহিলে মরমে,
বিজলি কি নিজে চকিত ?
কেন নদী পূরে সলিলে সাগর,
নদীরে যোগায় কেই বা ?
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে ফল,
কালে কালে আনে কেই বা ?
যার যা রয়েছে সে তাহা পেয়েছে,
যাহার যা পাইবে, রীতি ;
আপন ভাবনা ভাবে না ত কেউ,
জগতে ইহারা অতিথি।

কেন গো ইহারা আপন ভাবনা,
ভুলিয়াও আছে আরামে ?
এ তত্ত্ব নিগূঢ় করিলে স্মরণ,
আনন্দ উথলে মরমে।
অজ আত্মযোনি অদ্বিতীয় এক
ভাবেন বিশ্বের ভাবনা
অকাম আপনি পরের লাগিয়া
রাখেন মঙ্গল কামনা।
ঘুম পাড়াইয়া সকলেরে, যিনি
আপনি থাকেন জাগিয়া,
খেতে দিয়া মুখে, রসনায় দেন
মধুর আস্বাদ আনিয়া।
তারি প্রেম সুধা হয়ে বিকশিত
যার যা অভাব পূরিছে,
তাঁরি গূঢ় প্রেমে মগন সবাই
আপন ভাবনা ভুলিছে।

উপহার—(অবকাশে রচিত কয়েকটী কবিতা) শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহা একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। 'জীবন মরণ' নামক ইহার একটী কবিতা পূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের কবিত্ব শক্তি আছে। তাঁহার অনেকগুলি কবিতাই ভাল হইয়াছে। কিন্তু ইঁহার ভাষা কাঁচা ও ইনি সমান ভাবে সকল স্থানে কবিতার সৌন্দর্য্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। বেশ লিখিয়া যাইতেছেন হঠাৎ মাঝখানে এক একটি নিতান্ত শ্রীসৌন্দর্য্য হীন ছত্র, আমরা একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ইহা দেখাইয়া দিতেছি।

শেষে কি।

ধূমকেতু কোথা হ'তে আসে?
মহাবেগে ছুটে তারা—অধীর পাগল পারা—
জ্ঞান নাই হেন ছুটে,—তাদের কিরণ টুটে
পথে পথে ছড়াইয়া পড়ে তার ধারা,
কোথা হতে আসে তারা
　উর্দ্ধশ্বাসে কোথা ছুটে যায়?
এ সংসারে আমরাও
　নহি কি গো ইহাদেরি প্রায়?

হুহুকরে বহে ঝড়—
কোথায় জনম তার পার কি বলিতে?
তোল পাড় করে তারা জ্ঞানহারা দিশেহারা
　ধরা যেন করে সরা জ্ঞান;
বাড়ি পড়ে　গাছ ওড়ে
সাগর তরাসে কেঁপে উচ্ছ সিয়া পড়ে;
'তটিনীর কথাই ত নাই—
ভীমগিরি উচ্চশিরে ভয়েতে কাঁপিয়া মরে
　শিশুগিরি ভাবে কোথা যাই।
সমস্ত জগত যেন পায়ের ঠোকরে,
(অথবা তাহার এক ফুৎকারের জোরে)
উড়াইয়া ফেলে দিতে চায় কোন দূরে।
এমন যে মহাঝড়　প্রলয়ের সহোদর
কিছুক্ষণ পরে এর খেলা হয়ে যায় শেষ;
রবির কিরণে যথা　কোয়াসার ঘন ঘোর
কোথায়—কোথায় গিয়ে মিলাইয়ে যায়।
তেমতি ফুরালে ঝড়　সকলি নীরব, যেন
　এক মহা মৃত্যু করে দেয়।
প্রলয় নিরাশ হয়ে　কোথা যায় লুকাইয়ে
ধীরে ধীরে পা টিপিয়ে কোথায় পালায়।
আমরাও আমরাও
　এসেছি এমনি　করে,
খেলা ধূলা শেষ করে
　এমনি যাইব ফিরে।
যে দেশে যাইব ফিরে—
সেথায় কি শান্তি আছে?
　শান্তি তরে আকুল যে মন।
সেথায়ও এমন যদি
প্রলয় সেথায়ও যদি
　তবে হেথা নিবুক জীবন।

কবিতাটি মোটের উপর বেশ হইয়াছে, তবে কি, কবিতার যাহা না হইলে নয়, সর্ব্বাঙ্গ নিখুঁত হয় নাই। যেমন—

> "বাড়ী পড়ে গাছ ওড়ে
> সাগর তরাসে কেঁপে উচ্ছসিয়া পড়ে,
> তটিনীর কথাই ত নাই"—

প্রথমতঃ কোথায় বাড়ী ঘর, কোথায় সাগর, বর্ণনাটা যে বড় ভাল হইল তাহা নহে, বাড়ী ঘরের সঙ্গে তটিনীরই প্রথম সম্বন্ধ, যাহা হউক যখন সাগরই উচ্ছসিয়া উঠিল—তখন তাহার এই দুর্দ্দাম উচ্ছাসের পর—"তটিনীর কথাইত নাই" এ কিরূপ অদ্ভুত শোনায়? এ বর্ণনাও নহে, বর্ণনায় ভাষাও নহে। তার পর

"ভীম গিরি উচ্চ শিরে, ভয়েতে কাঁপিয়া মরে, শিশু-গিরি ভাবে কোথা যাই,"

ঝড়ে ভীম গিরি কাঁপিতেছে বলিয়া শিশু গিরি যে অধিক কাঁপিবে এমন কথা নাই, বরং ঝড়ে বড়ই বেশী কাঁপে, ঝড়ে বড় গাছের যত ভাবনা ক্ষুদ্র দুর্ব্বার তেমন নহে! আরো স্থানে স্থানে ভাষা বড় কাঁচা, যেমন, "এক মহা মৃত্যু করে দেয়"। কাণে খট করিয়া বাজে! যাই হউক, এ সকল দোষ সত্বেও বইখানিতে কবিত্ব আছে, এবং সেই জন্যই আমরা এ সম্বন্ধে এতটা বলিলাম, লেখক তাঁহার দোষ বুঝিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুলেখক হইতে পারিবেন।

আমি ভালবাসি বা ভালবাসা। প্রথম কল্পনা। শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। লেখক কাহাদের ভালবাসেন ইহাতে তাহাই বলিয়াছেন। লেখক ভালবাসেন 'প্রেম ভক্তি ভালবাসা' 'স্নিগ্ধ প্রভাতের শোভা'। আর ভালবাসেন 'পূর্ণিমা নিশি' 'আর কার কে জানে কাহার মুখখানি'। আর ভালবাসেন 'খেলাইতে দাবাখেলা' আর ভালবাসেন 'দেবী সংস্কৃত ভাষা' আর ভালবাসেন 'ইংরাজী কবি এডসন, বাইরণ কত কত কত আর' আর ভালবাসেন 'তাঁর শোভার মুখ কমল, ইত্যাদি আরও সহস্র জিনিস ভালবাসেন। কিন্তু এ সকল জিনিস ত আরো দশ জনে ভালবাসেন, হইলে কি হয়, এমন ভাষায় এমন ছন্দে এমন ভঙ্গাতে আর একজন কেহ এসব লইয়া এমন করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া ত জানি না। পাঠক বইখানি একবার পড়িয়া দেখুন; স্থানাভাব, তবুও তাহার মধ্য হইতে কতক পাঠককে উপহার না দিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না।

"আমি ভালবাসি খেলাইতে দাবাখেলা,
কিন্তু পুরুষের সঙ্গে কভু নয়—নয়,
রাগ হয়,—অপমান বোধ সেই বেলা
যদি হারি,—জিতিলে আনন্দ বড়—নয়?
সেই জন্য স্ত্রীর সঙ্গে খেলাইতে ভাল,
জিতিলে ঘরের ভাত হারিলেও তাই—
বরং বেশী করে তাতে উষ্ণ ঘৃত ঢাল
হারে চুমু—জিতে চুমু—ক্ষতি কিছু নাই

... ...

আমি ভালবাসি মম প্রিয় প্রাণেশ্বরী,
গৃহ সরোবরে যেন ফুটে পদ্ম ফুল!
লোকে মদ মদ বলে আর ধান্যেশ্বরী,
বলিতে পারি না আমি মদ মদ বোল,

আমি বলি ভালবাসি—'মধু—কাদম্বরী'
আর ভালবাসি মূর্ত্তি আধ শ্যামাহরি।
... ...
মন মেঘে ভালবাসা হয় ক্ষণ প্রভা
শ্রীমতি ... .. দেবী কিম্বা 'শোভা'
সোহাগ আদর করে, তোমার লো শোভা,
দিলাম হে কেন জান মিষ্ট নাম ... ...
শোভা ... দুটী নাম ফুটে আছে হৃদে—
আর সব কুঁড়ি যেন আছে ফুল মুদে
ফুটিল দেখ লো ফুল্ল যাহা বায়ু ভরে
সোহাগ আদর,
চন্দ্রমুখী চন্দ্র প্রভা ভালবাসা হীরা
... ... ভালবাসা হার!
আমি লো আকাশ তুমি ঝিকিমিকি তারা,
তুমি ফুল মালা—আমি হই গলা,
তোমার অধরে পানের পিক—

শোভা হও কি ফুল তুমি?
দেখিনেক পারিজাত—
কিন্তু এমন কি হবে? আমি—
তুমি পূর্ণিমার রাত,
না না তাও এমন না!
কোথায় পাব তোমার তুল!
তুমি মধুর গাও না—না তাও না—
তুমি অপরূপ অতুল।
আমি নেড়ামাথা—তুমি চুল
বলিয়াছি আগে হে তোমায়
আমি তরু—তুমি লতা পাতা ফুল!
আমি কণ্ঠ হার তব গলায়,—
আলতা তো আছিই পায়,—

শোভা চন্দ্র উঠ না ভাই—
ছড়া না জ্যোৎস্না হৃদয় পরে ?
আমি ভাল বাসি শোভা তোমারে !

... ...

করিতেছি বর্ণনা এত যে মোর স্ত্রীর,
অনেকে বলিতে পারে, আমি বড় স্ত্রৈণ,
বল তা যা ক্ষতি নাই—বঙ্কিম কবির
বলেছিল শ্রীশচন্দ্র প্রফুল্লিত মন,
ছিঃ ছিঃ বড় স্ত্রৈণ শ্রীশ আমাদের—
বলিল বন্ধু বান্ধব শ্রীশের যখন,
আজ মম বাড়ী ওরে হয় বাবুদের
বাবুরা খাবেন ভাল করে—নিমন্ত্রণ !

... ...

কথা আছে, পাগলামী কবির একটি গুণ। পুস্তকখানিতে আর কোন গুণ না থাক এ গুণটি যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না।

বইখানি লেখকের "প্রথম কল্পনা" দ্বিতীয় কল্পনায় চড়িলে তিনি যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন কিছুই বুঝিতে পারি না।

আদিশূর।

প্রবাদ ও কুলজি গ্রন্থের মতানুসারে বাঙ্গালাদেশে আদিশূর নামে একজন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তিনি কোন সময়ে গৌড়ের রাজাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তাঁহার নামাঙ্কিত কোন তাম্রশাসন কিম্বা প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের কয়েকখানা কুলজি গ্রন্থ আছে, তৎসমুদয়ে লিখিত আছে যে, বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া আদিশূর গৌড়ের রাজাসন অধিকার করেন।

কুলজি গ্রন্থগুলিকে কোন ইতিহাস লেখক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না, আমরাও তাহা করিতে প্রস্তুত নহি। ঘটকদিগের গ্রন্থে ক্রমে ক্রমে এত অধিক পরিমাণে মিথ্যা কথা প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, তন্মধ্য হইতে খাঁটি সত্য বাহির করিয়া লওয়া নিতান্ত দুরূহ। অথচ আদিশূর সম্বন্ধে কোন বিষয় লিখিতে হইলেই কুলজি গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং আমরা বিশেষ সতর্কতার সহিত কুলজি গ্রন্থের মত সমূহ সমালোচনা করিব।

কুলজিকারগণ বলেন, "আদিশূর বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া গৌড়ে হিন্দু-রাজপতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।" এইকথা কতদূর সত্য তাহা যদিচ আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি না, তথাপি ইহা একরূপ নিশ্চয় যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন এক রাজবংশকে পরাজয় করিয়া কোন হিন্দু রাজবংশ গৌড়াধিকার করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীর সাহায্যে ইহা দেখা যায় যে, ৬৯৫ শকাব্দে গৌড়ের রাজদণ্ড জনৈক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নরপতির হস্তে সুশোভিত হইয়াছিল; আমাদিগের বিবেচনায় ইহার অল্পকাল পরেই বাঙ্গালায় হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপিত হয়। এই সময়েই আদিশূরের অভ্যুদয়। আদিশূরের পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এমন কি মুসলমানদিগের নবদ্বীপ বিজয়ের অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় বৌদ্ধের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে, কিন্তু তাহা বৌদ্ধদিগের মুমূর্ষু অবস্থা। শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর পর বাঙ্গালায় যাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা কেবল নাম মাত্র বৌদ্ধ, এক্ষণ যেমন শাক্ত বৈষ্ণবে মেশামিশী তখনও সেইরূপ হিন্দু বৌদ্ধে মেশামিশী হইয়াছিল। এই সকল বিষয় পালরাজগণের ইতিহাসে বিস্তৃত ভাবে দেখান যাইবে, তজ্জন্য এস্থলে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার উল্লেখ করা গেল। শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আদিশূর বাঙ্গালার রাজদণ্ড ধারণ করেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। তাহার কারণ এই যে, আমরা সেনরাজগণের ইতিহাসে দেখাইয়াছি যে, বল্লালসেন দেব ৭৮৮ শকাব্দে গৌড়ের রাজাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পুরুষানুক্রমে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার প্রায় তিনশতাব্দী

পূর্ব্বে অর্থাৎ শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আদিশূর জীবিত ছিলেন। তৎপর আদিশূরের সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশাবলী গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ক্রমে তাঁহাদের উত্তর—পুরুষগণ ৩৭ হইতে ৩৯ পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়াছে। কোন কোন বংশ যেরূপ ৩৪ পুরুষের ন্যূন আছে সেইরূপ আবার কোন কোন বংশে ৩৯ পুরুষেরও অধিক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বংশাবলী গণনা করিয়া সময়াবধারণ জন্য তিন পুরুষে একশতাব্দী গণনা করিয়াছেন। ১ যদি আমরা মিত্র মহাশয়ের প্রদর্শিত মতানুসারে গণনা করি, তাহা হইলে ৩৩ পুরুষেই ২ একাদশ শতাব্দী গণনা করিতে পারি। কিন্তু যদি আমরা আরও কিঞ্চিৎ ঔদার্য্য অবলম্বন করিয়া সাড়ে তিন পুরুষে একশতাব্দী গণনা করি তাহা হইলে ৩৮, ৩৯ পুরুষে ৩ আমরা একাদশ শতাব্দী প্রাপ্ত হইতেছি। সুতরাং এই ত্রিবিধ গণনা দ্বারা ৭০০ শকাব্দে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পরে কিম্বা পূর্ব্বে আমরা আদিশূরকে জীবিত দেখিতে পাই।

কুলাচার্য্যগণ প্রায় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, যে, গৌড়েশ্বর আদিশূর কান্যকুব্জপতি বীরসিংহের নিকট প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই বীরসিংহের অনুসন্ধান জন্য আমরা প্রতাপশীল প্রভাকর বর্দ্ধনের রাজ্যারম্ভকাল ৪৯৭ শকাব্দ হইতে মুসলমানদিগের কনোজ অধিকার পর্য্যন্ত (১১১৬ শকাব্দ) কনোজ রাজবংশাবলী প্রস্তুত করিয়াছি। ৪ কিন্তু এই দীর্ঘকাল মধ্যে আমরা

১ Journal. As. So. Bengal Vol. XXXIII. p. 325. and Vol. XXXIV Part 1. P. 139.

২ নবদ্বীপের রাজাদিগের বংশাবলী গণনা কর।

৩ কলিকাতার সুবিখ্যাত ঠাকুর ও পুঁটিয়ার রাজাদিগের বংশাবলী গণনা কর।

৪ কনোজ রাজমালা।

৪৯৭ শকাব্দ—প্রতাপশীল প্রভাকর বর্দ্ধন।
৫২২ শকাব্দ—রাজ্যবর্দ্ধন।
৫৩০ শকাব্দ—হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য।
৫৭০ শকাব্দ—রণসিংহ ধর্ম্মাদিত্য। (হর্ষের মন্ত্রী)
৬০০ শকাব্দ—জয়াদিত্য। (গোরক্ষপুরের তাম্রশাসন দেখ।)
৬২২ শকাব্দ—রণমল্ল দেব। (সিন্ধু আক্রমণ করেন।)
৬৩৭ শকাব্দ—হরচাঁদ। (মহম্মদ বিন-কাশিমের সমসাময়িক।)
৬৫২ শকাব্দ—যশোব্রহ্ম। (বাক্‌পতি, রাজশ্রী, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ ইহার সভাসদ ছিলেন। ইনি কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন।)

বীরসিংহ নামে একজন রাজাকেও কনোজের সিংহাসনে দেখিতে পাইতেছি না। ইতিপূর্ব্বে আমরা আদিশূরের যে সময় নির্ণয় করিয়াছি ঠিক সেই সময়ে আমরা শ্রীদেবশক্তিদেব ও তাঁহার পুত্র শ্রীবৎসরাজ দেবকে কনোজের সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতেছি। রাষ্ট্রকোটাপতি গোবিন্দরাজের ৭৩০, শকাব্দের শাসনপত্রে লিখিত আছে যে, "তাঁহার পিতা পৌররাজ, বৎসরাজকে জয় করিয়াছিলেন। এই বৎসরাজ গৌড়রাজ্য জয় করত অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়া ধনমদে মত্ত হইয়াছিলেন।" বৎসরাজ ৭০২ শকাব্দে সিংহাসন আরোহন করেন। সুতরাং গোবিন্দ রাজের পিতার সমসাময়িক বৎসরাজ যে এই কান্যকুব্জপতি দেবশক্তির পুত্র হইতেছেন, তৎপক্ষে

৬৭৯ শকাব্দ—শ্রীদেবশক্তি দেব।
৭০২ শকাব্দ—শ্রীবৎসরাজ দেব। (গৌড় বিজেতা। J. R. A. S. Vol. V. P 350.)
৭২৭ শকাব্দ—শ্রীনাগভট্ট দেব।
৭৫২ শকাব্দ—শ্রীরামভদ্র দেব।
৭৭৭ শকাব্দ—শ্রীভোজ দেব।
৮০০ শকাব্দ—শ্রীমহেন্দ্র পাল দেব। মহাকবি রাজশেখর ইঁহার সভাসদ ছিলেন।
৮৩০ শকাব্দ—শ্রীভোজ দেব। (ত্রিপুরাপতি কোকাল্লর সহিত ইনি ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন।
৮৬০ শকাব্দ হইতে ৮৯৭ শকাব্দ—শ্রীবিনায়ক পাল দেব। ইনি ভোজ দেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, এবং মহেন্দ্রপালের দ্বিতীয় পুত্র। শ্রীহর্ষ নামক কবি ইঁহার সভাসদ ছিলেন।

বিনায়ক পাল দেবের মৃত্যুর পর কনোজে রাজ বিপ্লব উপস্থিত হয়। তদ্দ্বারা কনোজ রাজ্যের পশ্চিমাংশ দিল্লীর তুঁয়ারগণ ও দক্ষিণাংশ চেদী অর্থাৎ ত্রিপুরাপতিগণ ও পূর্ব্বাংশ গৌড়েশ্বর পাল রাজগণ অধিকার করেন। অবশেষে ৯৭২ শকাব্দে গাহরবার বা ঘরওয়ার বংশজ যশোবিগ্রহের পৌত্র ও মহীচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রদেব ভুজবলে শত্রুগণকে দমন করিয়া কনোজ নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। ডাক্তার হরেন্‌লি সাহেব অনুমান করেন যে এই যশোবিগ্রহ ও মহীচন্দ্র, বিগ্রহপাল ও মহীপালের নামান্তর। গৌড়েশ্বর মহীপালকে জয় করিয়া বিজয় সেন বাঙ্গালা অধিকার করিলে পালবংশ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধ শাখা বিহারে ও হিন্দু শাখা কনোজে রাজপাট স্থাপন করেন। হরেন্‌লি সাহেবের এই অনুমান আমাদের নিকট নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

৯৭২ শকাব্দ—শ্রীচন্দ্র দেব।
১০১৯ শকাব্দ—মদন পাল।
১০৪০ শকাব্দ—গোবিন্দ চন্দ্র।
১০৯০ শকাব্দে—বিজয় চন্দ্র পরলোক গমন করেন।
১১১৬ শকাব্দে—জয়চন্দ্রকে জয় করিয়া মুসলমানগণ কনৌজ অধিকার করেন।

কোন সন্দেহ নাই। বৎসরাজ কর্তৃক গৌড় বিজয় বৃত্তান্ত যখন সুদূর নাসিক হইতে আবিষ্কৃত তাম্রফলক পাঠে অবগত হওয়া যাইতেছে, তখন ইহা অবশ্য ইতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

আবিষ্কৃত তাম্রশাসন, প্রাচীন মুসলমান লেখক মছৌদি ও আবু রিহান আল বিরোনি প্রভৃতির লিখিত বৃত্তান্ত সমূহ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এই সময় কনোজপতিগণ আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বপ্রধান নরপতি ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের রাজ্য-সীমা পশ্চিম দিকে মালব ও কাশ্মীর, পূর্ব্বদিকে গৌড়দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং ঈদৃশ পরাক্রম শালী সম্রাট বৎসরাজ কর্তৃক গৌড়বিজয় নিতান্ত স্বাভাবিক। আর সামান্য বিজয় নহে, গৌড়েশ্বর কেবল মৌখিক বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই; গৌড়ের সমস্ত ধন সম্পত্তি বৎসরাজের করায়ত্ব হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ইহা সমজেই অনুমিত হয় যে বৎসরাজ গৌড়ের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জনৈক হিন্দুকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় ইনিই আদিশূর। বৎসরাজ শৈব ছিলেন, সুতরাং তৎ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজা আদিশূরও শৈব হওয়ারই সম্ভব। আদিশূর কোন বংশীয় নরপতি তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু আদিশূর কিম্বা তাহার উত্তর পুরুষ কোন রাজা দিনাজপুর অঞ্চলে যে শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মন্দির স্তম্ভে খোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ইহাঁরা আপনাদিগকে কাম্বোজ বংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ৫ সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৎসরাজ কাম্বোজ বংশীয় কোন সেনাপতিকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের বাঙ্গালায় আগমন সম্বন্ধে কুলজিকারগণ বলেন, আদিশূর সিংহাসন আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে বৌদ্ধ রাজার অত্যাচারে বাঙ্গালার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ লোপ পাইয়াছে। মতান্তরে তাঁহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রয়োজন হইয়াছিল, কোন কোন গ্রন্থের মতে রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও প্রাসাদোপরি গৃধ্রপাত প্রভৃতি দৈবোৎপাত দর্শনে তাহার শান্তি কামনায় একটি যজ্ঞের প্রয়োজন হইয়াছিল; যে কারণেই হউক বাঙ্গালায় বেদবিৎ

৫ দুর্ব্বারারি বরূথিনী প্রমথনে দানেচ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণ গুণ গ্রাম গ্রহোগীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দু মৌলেরয়ম্
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥

অর্থ—দুর্ব্বার অরি সৈন্যের প্রমথনে ও ছেদনে যাহার অস্ত্র শক্তি বিদ্যাধরগণ কর্তৃক স্বর্গলোকে গীত হইয়া থাকে, কাম্বোজ বংশজাত সেই গৌড়পতি কর্তৃক কুঞ্জর ঘটা বর্ষ দ্বারা (বহু সংখ্যক হস্তী উৎকীর্ণ থাকা বশতঃ) পৃথিবীর শোভা স্বরূপ এই চন্দ্রাপীড় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণের অভাব দর্শনে আদিশূর কান্যকুব্জপতির নিকট বেদবিৎ পাঁচজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কেবল যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়াছিলেন এমত নহে, পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন শূদ্রও ভিক্ষা করিয়াছিলেন, "ভূমি দেবান সশূদ্রান।" অদ্যাপিও ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। কিন্তু তৎসহ ভৃত্যের নিমন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা যায় না। এই এক কথা দ্বারাই অনুমিত হইতেছে যে কুলজি গ্রন্থের এই সকল বর্ণনা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক। বিশেষত এই সকল ভৃত্যগণ সামান্য ব্যক্তি নহেন। বাঙ্গালার কায়স্থ সম্প্রদায়ের চূড়ামণি স্বরূপ। এই চূড়ামণিগণ সামান্য তল্পি বাহক কিম্বা সহিসরূপে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন ইহা কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে যেজাতি হিন্দু রাজন্য বর্গের শাসন সংক্রান্ত প্রধান পদগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, যাহারা ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেছিলেন, সেই জাতির চূড়ামণি স্বরূপ পাঁচজন কায়স্থ তল্পি বহন করিয়া কিম্বা সহিসের কার্য্য করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন ইহা নিতান্তই অবিশ্বাস্য। পক্ষান্তরে কায়স্তকৌস্তুভ-প্রণেতা কবিভট্ট শালিবাহনধৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন কায়স্থ, ইহাঁরা দশজনেই আদিশূরের যজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়া গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইহাও আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ কনোজে এমন কি ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছিল যে, কান্যকুব্জ পতি পাঁচজন কায়স্থ দ্বারা সেই অভাব পূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস কায়স্থহিতৈষী ও কায়স্থবিদ্বেষী উভয় পক্ষই সত্যের শীর্ষে পদাঘাত করিয়া মিথ্যা কথা দেশ মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। আমাদের মতে কান্যকুব্জ পতি গৌড় জয় করিয়া রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন কায়স্থকে আদিশূরের সহিত গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণ যেমন তেলি, তাম্বুলি, গোয়ালা, ধোপা প্রভৃতি সকলেই ইংরাজের কৃপায় স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া রাজ কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছেন, হিন্দু শাসনকালে সেরূপ ছিল না। সেই সময় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণই প্রধানত রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। দুই একজন ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্যকেও রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহা নিতান্ত বিরল। কোন নূতন রাজা কর্ত্তৃক অভিনব দেশ অধিকৃত হইলে, তাঁহার যেরূপ বিশ্বস্ত রাজ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইয়া থাকে, আদিশূরেরও সেইরূপ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইয়াছিল এবং এই জন্যই আদিশূরের সময়ে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন কায়স্থ বাঙ্গালায় প্রেরিত হন। এই ঘটনার কয়েক শতাব্দীর পূর্ব্বে যখন মগধের গুপ্ত সম্রাটগণ ৬

৬ গুপ্ত সম্রাটগণ মৌর্য্য নহেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীতে বাবু শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মৌর্য্য সম্রাটকে গুপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই জন্য আমরা

বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করত নূতন হিন্দু রাজা নিয়োগ করেন সেই সময় তাঁহারাও রাজ্য শাসন জন্য ব্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদিগকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আদিশূরের রাজ্যাধিকার, তাহার সময় ও ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণের বাঙ্গালায় আগমনের কারণ আমাদের বিবেচনায় যাহা প্রামাণ্য ও যুক্তি সঙ্গত তাহা বলিয়াছি। কুলজি গ্রন্থে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় এস্থলে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি। কুলাচার্য্যগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে আদিশূর বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনি কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া গৌড়াধিকার করিয়াছিলেন তাহা কেহই বলেন নাই।

নবদ্বীপের অধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তদানীন্তন গবর্ণর হেষ্টীংশ সাহেবের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া সভাসদ পণ্ডিত বর্গ দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় স্বীয় বংশের যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত। এই গ্রন্থে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস যাহা সংকলিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অপ্রামাণ্য, অযৌক্তিক ও বিশ্বাসের অনুপযুক্ত। ৭ যাহা হউক ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে লিখিত আছে যে আদিশূর বঙ্গের তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞ সম্পাদনে অসমর্থ দর্শনে কান্যকুব্জ পতির নিকট প্রার্থনা করিয়া, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দর এবং বেদগর্ভ নামে পাঁচজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে গৌড়ে আনয়ন করেন। তাঁহারা পত্নী ও ভৃত্য সহ এদেশে আসিয়াছিলেন। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতের মতে ৯৯৯ শকাব্দে ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আগমন করেন। ৮

ঘটক চূড়ামণি দেবীবরের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুধানিধি, বাৎসগোত্রজ বীতরাগ, ভরদ্বাজ গোত্রজ তিথিমেধা, (বা মেধাতিথি) ও সাবর্ণ গোত্রজ

বলিতেছি গ্রীকরাজ সেলিউকাসের জামাতা—মুরাদাসার গর্ভজাত-চন্দ্রগুপ্ত ও তদবংশধরগণ মৌর্য্য নামে পরিচিত। আর যে বংশে শ্রীগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাই গুপ্ত বংশ।

৭ পঞ্চম খণ্ড ভারতীতে ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতের সমালোচনা দেখ।

৮ ইতিপূর্ব্বে কনোজের রাজাদিগের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, ৯৯৯ শকাব্দে মহারাজ শ্রীচন্দ্রদেব কনোজাধিপতি ছিলেন। এই সময়ে বল্লাল সেন বাঙ্গালার রাজা। ডাক্তর হরেন্‌লি সাহেব বলেন বিজয় সেন আদিশূরের নামান্তর মাত্র। সুতরাং তাঁহার মতে বল্লালের পিতার রাজ্য শাসনকালে ব্রাহ্মণগণ কনোজ হইতে গৌড় আসিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশাবলী গণনা দ্বারা আদিশূরের সহিত বল্লালের ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ও ১৫ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হইতেছে। (সেনরাজগণ পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।) পিতা পুত্রের মধ্যে কখনই এত অন্তর হইতে পারে না। এরূপ অন্তর হইতে প্রায় ৩০০ বৎসরের প্রয়োজন।

সৌভরি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করেন। ৯ কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র গৌড়ে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের নাম যাহা লিখিয়াছেন,১০ তাহাই ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং রাঢ়ীয় ঘটকদিগের মধ্যেই ব্রাহ্মণদিগের নাম সম্বন্ধে দ্বিমত হইতেছে।

গৌড়ে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের নাম সম্বন্ধে বারেন্দ্র কুলজ্ঞদিগেরও ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন "শাণ্ডিল্য গোত্রজ নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রজ সুষেণ, বাৎস গোত্রের ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রজ গৌতম ও সাবর্ণ গোত্রজ পরাশর গৌড়ে আসিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ কে কোন গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে অনেক মতভেদ রহিয়াছে, সেই সকলের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিস্প্রয়োজন। কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কুলজি গ্রন্থ গুলি সমালোচনা করিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, মূল পিতৃ পুরুষের নাম পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকেই গৌড়ে সমাগত ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন্। প্রকৃত পক্ষে গৌড়ে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের নাম দেবীবর যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সত্য হইতে পারে। তৎপর ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণের (বা নারায়ণ ভট্টের) উত্তর পুরুষগণ রাঢ়ীয় এবং দামোদর ও নারায়ণ ভট্টের পুত্র আদিগাঞিঃর সন্তানগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হইয়াছেন। তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষ হইতে রাঢ়ী ও গৌতম হইতে বারেন্দ্র কুলের উৎপত্তি। বীতরাগের পুত্র দক্ষ হইতে রাঢ়ী ও সুষেণ হইতে বারেন্দ্র শাখা হইয়াছে। সুধানিধির পুত্র ছান্দর হইতে রাঢ়ী ও ধরাধর হইতে বারেন্দ্র বংশের উৎপত্তি। সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ হইতে রাঢ়ী ও পরাশর এবং রত্নগর্ভ হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। কুলজিগ্রন্থের সাহায্যে তাহাদের বংশাবলী নিম্নলিখিত রূপ প্রস্তুত হইল।

কান্যকুব্জাগত মূল পুরুষ

রাঢ়ী শাখা　　　　বারেন্দ্র শাখা

শাণ্ডিল্য গোত্রজ

৯ শ্রীক্ষিতীশস্তিথিমেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলে॥
দেবীবর।

১০ শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠঃ ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠঃ বাৎস্য শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ।
ভারদ্বাজিক গোত্রেচ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে যথাবেদ প্রসিদ্ধকঃ।
কুলরাম।
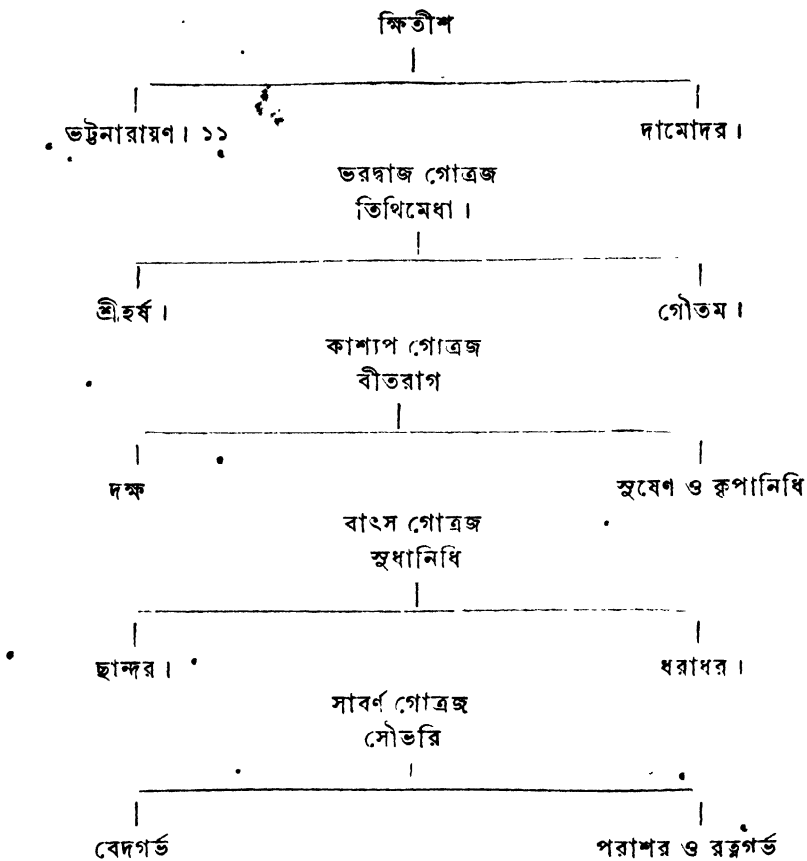
এক্ষণে দেখা উচিত যে, কি কারণে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সন্তানগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে ইহাও আলোচনা করিতে হইবে যে আদিশূরের রাজধানী কোন স্থানে স্থাপিত ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ কোন স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম গ্রন্থে লিখিত আছে, আদিশূর কাশী-শ্বরকে যুদ্ধে জয় করিয়া পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর স্বরূপ পাইয়াছিলেন। ১২ কোন কোন বারেন্দ্র কুলজি লেখক বলেন, আদিশূর কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে

---

১১ কিন্তু ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি ওঝার সন্তানগণ রাঢ়ি ও বারেন্দ্র উভয় শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

১২ অশ্ব প্রভৃতি পশুই কর দেওয়ার প্রথা আছে। কিন্তু হিন্দু রাজা যে বর্ণ গুরু ব্রাহ্মণ কর স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন, ইহাও কুলচার্য্যদিগের নিকট নূতনশ্রবণ করিলাম।

বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিলে এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাহা সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজা রাজ্ঞীর অনুরোধ ক্রমে স্বীয় শ্বশুরকে সাগ্নীক ১৩ ব্রাহ্মণ প্রেরণ জন্য পত্র লিখিলেন। অন্যান্য কুলজি গ্রন্থে অন্যান্য কারণ লিখিত আছে। যজ্ঞই হউক আর ব্রতানুষ্ঠানই হউক, আদিশূর তাহা সম্পন্ন করিবার কারণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রেরণ জন্য কান্যকুব্জপতিকে এক পত্র লিখিলেন। ১৪ কান্যকুব্জপতি তদনুসারে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও "পাঁচজন শূদ্র" গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা মস্তকে উষ্ণীষ, হস্তে ধনুর্ব্বান ধারণকরত, পদে পাদুকা মণ্ডিত করিয়া অশ্বারোহণে গৌড়দেশে উপস্থিত হইলেন। (ঋষির উপযুক্ত বেশই বটে! আর সেই পাঁচটা শূদ্র বোধ হয় ঘোড়ার সহিস ছিল, বৈদ্য মহাশয়গণ কি বলেন?)

যাহা হউক গৌড় ত দেশ, তাহার রাজধানী কোথায়? সেই প্রাচীন চীন পরিব্রাজক হিয়োনসাঙের ভ্রমণ সময় হইতে সেনরাজগণের অধঃপতন পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল মধ্যে কোন সময়ে নিজ গৌড় নগরীতে বাঙ্গলার রাজপাট স্থাপিত ছিল না। উত্তর দিকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও দক্ষিণদিকে সমতট এই দুইটী প্রাচীন রাজধানী। সেন রাজগণের শাসনকালে সমতট বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অধুনা ইহা রামপাল নামে পরিচিত। প্রবাদ অনুসারে এই রামপাল নগরীতে ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ তৎপ্রকাশিত বেণীসংহার নাটকের ভূমিকায় ইহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রবাদ অনুসারে ব্রাহ্মণগণ এইরূপ যোদ্ধৃবেশে বিক্রমপুরে উপস্থিত হইলে রাজা তাহাদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু আত্মমহিমা প্রকাশ জন্য শুষ্ক মল্ল কাষ্ঠোপরি আপনাদের আশীর্ব্বাদ স্থাপন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই শুষ্ক কাষ্ঠ একটী জীবিত বৃক্ষে পরিণত হইল। দৌবারিকগণ দ্বারা রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া

১৩ সাগ্নীক অর্থে কেহ এরূপ মনে না করেন যে, ইহাঁদের মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইত। অদ্যাপি ভারতের কোন কোন স্থানে সাগ্নীক অর্থাৎ "অগ্নিহোত্রী" ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। উপবীত গ্রহণ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহারা গৃহে একটী কুণ্ড মধ্যে অগ্নি রক্ষা করিয়া বৈদিক নিয়মানুসারে প্রত্যহ তাহাতে আহুতি প্রদান করেন।

১৪ সুকৃত সুকৃত সংঘাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ দক্ষা,
দর্পিতহতবিপক্ষাঃ স্বাস্তবাক্য প্রতিজ্ঞাঃ।
সুজিত সুগতবৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে,
দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রায়ান্ত॥
নৃপতি সুকৃতিসারঃ স্বীয় বংশাবতারঃ,
প্রবলবিচারো বীরসিংহোঽতিবীরঃ।
মন্ত্রিবর সখিতাস্তে ভূমিদেবানসশূদ্রান্,
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপ যত্নং নিতান্তং॥

তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করত বিবিধ প্রকার স্তুতিবাদ করিলেন। ব্রাহ্মণ-গণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর যথা সময়ে যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া গেল। রাজা নানাবিধ ধন রত্ন প্রদান পূর্ব্বক পঞ্চকোটি, কাম-কোটি, হরি-কোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম দান করিয়া সেই সেই গ্রামে তাহাদিগকে স্থাপন করিলেন।

কিন্তু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ ইহা স্বীকার করিতে নিতান্তই নারাজ। তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণগণ প্রথমত গৌড়ে আসিয়াছিলেন। তথা হইতে তাহাদের সন্তানগণ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া রাঢ় ও বারেন্দ্র দেশে বাস নিবন্ধন রাঢ়ীও বারেন্দ্র নামে পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাসস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনুসন্ধান ও চিন্তা করিয়াছি। কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। চিন্তার দ্বারা অবশেষে ইহাই উপলব্ধি হয় যে ঘটক চূড়ামণিদিগের এই সকল বর্ণনা সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত। অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাপুরুষ দেবীবর মুসলমান শাসিত বিশৃঙ্খল বঙ্গ সমাজের শৃঙ্খলাবন্ধন জন্য যদিচ্ছা লেখনী সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী শিবা-দল সেই পুরুষ সিংহের পদ লেহন পূর্ব্বক মিথ্যার স্কন্ধে মিথ্যা চাপাইয়া এক প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন।

যাহা হউক, কোন কোন কুলজ্ঞি লেখক বলেন, ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ সমাধা পূর্ব্বক ধন রত্ন লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তাহারা অনার্য্য ভূমি মগধ হইয়া গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া কান্যকুব্জবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিলেন। (ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, বৈদিক কালে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, প্রভৃতি অনার্য্য ভূমি ছিল সত্য, কিন্তু বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রারম্ভে ও আদিশূরের বহু পূর্ব্বেই আর্য্যগণ এই সকল দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার রাশি রাশি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।) কিন্তু বৈদ্যকুলভূষণগণ বলেন যে, অনার্য্য দেশে গমন করত "অযাজ্য যাজন" করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। (অযাজ্য যাজন না বলিলে যে আদিশূরকে বৈদ্য বংশজ লেখা যাইতে পারে না?)

সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ এইরূপে অপমানিত হইয়া পুনর্ব্বার গৌড়েশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগের বাস ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, ক্রমে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাঙ্গলার আদিম নিবাসী "সপ্তসতী" ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করিয়া তাহাদের গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আদি পুরুষ অর্থাৎ ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ও ছান্দর। ইহার কিছু কাল পরে যখন সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের স্বদেশ নিবাসী পত্নীগণের গর্ভজাত সন্তানগণ এদেশে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন তখন রাজা তাঁহাদিগকে বারেন্দ্র দেশে স্থাপন করিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ হইতে বারেন্দ্র বংশের উৎপত্তি। আবার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ বলেন, তাঁহারাই সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের স্বদেশ বাসী প্রথম পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। আর সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ এদেশে

আসিয়া যে সকল সপ্তসতী ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ করেন তাহাদিগের গর্ভেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি। (আবার কেহ বা রঙ্গের উপর রং চড়াইয়া বলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের উপপত্নীর গর্ভজাত।) এই সকল তর্কের মীমাংসা করা আমাদের সাধ্যাতীত।

এক্ষণে পাঁচজন ভৃত্যের কথা আলোচনা করা যাউক। যে সকল কুলজি গ্রন্থে আদিশূরের পত্রের "নকল" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে "ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত শূদ্রগণকেও পাঠাইবেন। এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য পত্র দ্বারা শূদ্রদিগকেও আহ্বান করার কি প্রয়োজন হইয়াছিল! তৎপর ব্রাহ্মণগণ ত অশ্বরোহণে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ হস্তে কি পথে অশ্বের সেবা করিতেন, প্রত্যেকের সঙ্গে যে স্থলে এক একটী ভৃত্য ছিল সে স্থলে তাঁহারা কখনই স্বয়ং অশ্বের পরিচর্য্যা করিতেন না। সেই পাঁচজন ভৃত্য দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। যদি ইহাই হয় তবে এই পঞ্চ "সাহস" শূদ্রের অধম হইতেছে। * এই জন্য কি বল্লালকৃত কৌলিন্য প্রথাকে লক্ষ্য করিয়া বারেন্দ্র কায়স্থ কুলজি লেখক বলিয়াছেন :—

বারেন্দ্র কায়স্থ আর বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লইল দুইজন॥

* না কেবল ইহা হইতেই সেই পঞ্চ কায়স্থ শূদ্রাধম হইতেছে না। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের জন্য কোন কার্য্যই অপমানের ছিল না, সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের সহিত আগত সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ সত্যই যদি পথে ব্রাহ্মণদিগের সহিসি কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে কেবল এই ঘটনা হইতে তাঁহারা সম্ভ্রান্ত নহেন—দাস মাত্র, এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না। তাহার অন্য কারণ থাকিতে পারে। উহাত পুরাতন কথা, আজ কাল পাশ্চাত্য সভ্যতার এ হেন যে প্রভুত্বের সময়, এ সময়েও কি কোন ক্ষত্রিয় রাজা প্রয়োজন স্থলে তাঁহার ব্রাহ্মণ গুরুর সহিসি কার্য্য করিতে অপমান জ্ঞান করিবেন—না এই কারণ হইতে তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব লোপ পাইবে? সুতরাং পথে সহিসি কার্য্য করিয়াছেন এই অপরাধে লেখক মহাশয় উক্ত পঞ্চ কায়স্থের যেরূপ পতন সম্ভাবনা দেখিতেছেন, সে সময় তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এই কথাটির উপর লেখক কেন যে এতটা জোর দিতেছেন তাহা বুঝিলাম না।

ভা ও বা সং।

উত্তর—অন্যান্য বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণ সেবা হিন্দুদিগের মধ্যে অপমানের কার্য্য নহে, ইহা প্রবন্ধ লেখক অবগত আছেন। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবন্ধের লিখিত পঞ্চ কায়স্থকে অনেকেই সেই ভাবে দেখেন না, তাহা বলিয়াই অদ্য আমরা এই সকল কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রবন্ধটী লইয়া যদি বঙ্গীয় বিজ্ঞ সম্পাদক মণ্ডলী ও সুযোগ্য পাঠকগণ একটুকু আন্দোলন করেন তাহা হইলে আমরা নিতান্ত উপকৃত হইব।

প্রবন্ধ লেখক।

উৎপাত করিয়া রাজা না থুইল দেশে।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষে॥
দৈব শুভ বল্লাল যাহা করে তাহার তা হয়।
উত্তমকে ছোট করি, নীচকে বাড়ায়॥
শূদ্রকে দিল কুল কায়স্থ নিন্দিত।
আত্ম প্রভুত্ব করি করে অনুচিত॥
একদিন মনে কৈলা বসি সিংহাসনে।
অনাচার আচরিব ভাবি মনে মনে॥
নীচ অন্ত্যজ জাতির জল নাহি খায়।
তাহাকে আচারে রাজা হইয়া নির্ভয়॥
কুক্রিয়া করিতে রাজার নাহি ধর্ম্ম ভয়।
যে কেহ নিন্দয়ে তারে দূর করি দেয়॥১৫

কেমন রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনগণ! তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই রূপই ছিলেন কি? হয় কুলাচার্য্যদিগকে মিথ্যাবাদী বল। নয় আপনাদিগকে তল্পী বাহক কিম্বা "সহিশের" বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে থাক।

কুলদীপিকা গ্রন্থ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ-প্রভু ও তাহাদের ভৃত্যগণের তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহাতে পঞ্চ দাসের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রভুর নাম	দাসের নাম	উপাধি	গোত্র
ভট্টনারায়ণ	মকরন্দ	ঘোষ	সৌকালীন।
দক্ষ	দশরথ	বসু	গৌতম।
বেদগর্ভ	কালিদাস	মিত্র	বিশ্বামিত্র।
শ্রীহর্ষ	বিরাট নামান্তর দাশরথী	গুহ	কাশ্যপ। *
ছান্দড়	পুরুষোত্তম	দত্ত	মৌদগল্য। ১৬

১৫ এস্থলে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে কাকীনিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু রায় হস্তলিখিত একখণ্ড প্রাচীন (ঢাকুর) বারেন্দ্র কায়স্থ কুল-পঞ্জিকা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থ হইতেই এই পংক্তি গুলি উদ্ধৃত করিলাম।

* দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলজি গ্রন্থে লিখিত আছে গুহ ও দত্ত দাসত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। এজন্য তাহারা কৌলিন্য প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু বঙ্গজ কায়স্থ কুলজি গ্রন্থে গুহকে কুলীন শ্রেণীতে গ্রথিত করা হইয়াছে। সুতরাং "বিসমল্লায় গলদ" বাহির হইতেছে।

১৬ মতান্তরে পুরুষোত্তম দত্ত ভরদ্বাজ গোত্রজ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্নামগোত্রকে।
কাশ্যপেচৈব গোত্রেচ দক্ষনামা মহামতিঃ॥
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ।
শাণ্ডিল্যগোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতীঃ॥
সৌকালীনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ।
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ॥
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
সাবর্ণ গোত্রো নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ং॥
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতিখ্যাতঃ শূদ্রবংশ সমুদ্ভবঃ॥
বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতিসংজ্ঞিতঃ।
মৌদগল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তম সংজ্ঞকঃ॥
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে।

কায়স্থ কুলদীপিকা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ঘটক চূড়ামণি দেবীবরের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড় শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আগমন করেন নাই। ইহাদের পিতৃগণ গৌড়ে আসিয়াছিলেন। সুতরাং কায়স্থ কুল-দীপকার এই সকল বর্ণনা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইতেছে। অধিকন্তু কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের ভৃত্যগণ এইরূপ দুই শাখায় বিভক্ত হন নাই। উত্তর রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কায়স্থগণ এইরূপ ঘৃণীত দাসত্বের মুকুট শিরে ধারণ করিয়া আপনাদের পদ মর্য্যাদা লাভ করেন নাই। কেবল দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনগণই এইরূপ দাস বংশজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সুতরাং এই সকল বর্ণনা আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত বলিয়া অনুমিত হই-তেছে।

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পাঠকগণ স্ব স্ব মত প্রকাশ করিলে প্রবন্ধ লেখক নিতান্ত অনুগৃহীত হইবেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

কাফ্রিগণৎকার।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কাফ্রিগণ অতি সামান্য কারণে গণৎকারকে ডাকে বটে, কিন্তু কি কারণে যে ডাকিয়াছে গণৎকার আসিলে তাহা তাহাকে বলে না, গণৎকারের তাহা গণনা করিয়া জানিয়া লইতে হয়। গণৎকার আসিয়াই প্রথমে তাহার প্রাপ্য স্বরূপ কিছু চায়,—লোকেরা বলে এখন দেবার মত কিছু নাই পরে যাহা হউক কিছু দিব!'

গণৎকার বলে—'তাহা হইবে না, তোমরা আমাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিতেছ, আগে মূল্য না পাইলে আমি কিছু বলিব না'।

লোকেরা একটা ছোট খাট কোন জিনিস দিতে রাজী হয়।

গণৎকার একটা বড় জিনিস দেখাইয়া বলে যে "এইটে লইব ছোটটা লইব না'!

লোকেরা বলে 'এটা আমাদের নয় অন্য লোকের'।

এই রকম খানিকক্ষণ বচসা চলে, অবশেষে বড় জিনিসটা দেওয়াই ঠিক হয়। গণৎকার তখন মাটীতে লাঠির এক ঘা মারিয়া বলে 'লোকরা, তোমরাও মাটীতে ঘা মার ও শোন'।

লোকেরাও ছোট ছোট লাঠি লইয়া গণৎকারের চারদিকে বসিয়া মাটীতে ঘা মারিতে থাকে আর বলে 'শুনছি'। তখন গণৎকার গণনা আরম্ভ করেন। আমাদের দেশে গণকেরা গণনার সময় যে কৌশল অবলম্বন করেন, তিনিও তাহাই করেন। গণৎকার এই রকম ভাবে কথা কহিতে থাকে যেন সে সত্য ব্যাপারটা দেখিতে পাইতেছে অথচ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছে না—

'কি হয়েছে? কি জানতে চাও? কোন লোমযুক্ত জন্তুর কথা জানতে চাও? একটা গরুর অসুখ হয়েছে? কি অসুখ? তার গায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখছি। না আমার ভুল হয়েছে—একটা গরু হারিয়েছে—আমি জঙ্গলে একটা গরু দেখতে পাচ্ছি। না না তা নয়, আমার ভুলহয়েছে, একটা কুকুরের কথা জানিতে চাও? কুকুর ঘরে ঢুকেছিল—না না এখন দেখতে পাচ্ছি তা নয়। এ মানুষের বিষয়, কারো অসুখ করেছে?—কোন মেয়ের? তার একবছর বিয়ে হয়েছে, সে কোথা?—না ভুল হয়েছে, আমি এখনও ভাল দেখতে পাচ্ছিনে।

এইরূপে যদি প্রথমেই ঠিকটা আঁচিয়া লইতে না পারে, তবে মাঝে একটু বিশ্রাম করিয়া আবার আরম্ভ করে এবং উল্লিখিত পদ্ধতিতে এক শ্রেণীর পর অন্য শ্রেণী, শ্রেণী ঠিক হইলে তখন তাহার সম্পর্কে যত কথা আসিতে পারে তাঁহার একটির পর একটির নাম করিতে করিতে অবশেষে ঠিকটি ধরিয়া লয়। ইংরাজদের এক রকম

খেলা আছে তাহাতে একজন কোন একটি দ্রব্য বা ব্যক্তিকে ভাবে, আর একজন তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সেই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের হাঁ কিম্বা 'না' কেবল এই সংক্ষেপ উত্তর হইতে ঠিক কথাটি বাহির করিয়া দেয়। কাফ্রিরা 'হাঁ' 'না' বলে না বটে, কিন্তু প্রশ্ন ঠিক হইলে তাহাদের আহ্লাদ ও উৎসাহের ভাবে গণৎকার সহজেই উত্তর পায়।

একজন ইংরাজের হাতে একবার একজন গণৎকারিণী বড় ধরা পড়িয়াছিল। (স্ত্রীলোকেরাও গণৎকার হয়)। উক্ত সাহেবের একবার কয়েকজন চাকরের অসুখ করে—চাকরদের অনুরোধে তিনি একজন বিখ্যাত গণৎকারিণীকে ডাকাইয়া পাঠান। গণৎকারিণী বলিল 'সাহেব তাহাকে একটা গরু দিন—সে লুক্কায়িত যাদুদ্রব্য বাহির করিয়া দিবে ও বাহির করিবার সময় তাহাদের সঙ্গে সাহেবকে উপস্থিত থাকিতে দিবে'। সাহেব গরু পাঠাইয়া দিলেন। দুই দিন পরে গণৎকারিণী আবার বলিয়া পাঠাইল 'গরুটা ছোট, তাই সে একটুকরা কালিকো কাপড় ও তাঁর মাশালাশ নামক চাকরকে একবার চায়'।

সাহেব কাপড় দিলেন, কিন্তু চাকরকে দিলেন না, কারণ তাহার সাহায্যে সাহেবের বাড়ীতে গণৎকারিণী কোন যাদু দ্রব্য লুকাইয়া রাখিবার সুবিধা পাইবে, তাহা তিনি জানিতেন।

গণনার দিন আসিল, দেখিবার নিমিত্ত দলে দলে সহস্র লোক আসিয়া জড় হইল। গণৎকারিণীর আগমন বার্ত্তা লইয়া ৭।৮ বার লোক আসিল, কিন্তু তখনও নিজে গণৎকারিণীর কোন খোঁজ নাই। অবশেষে একজন আসিয়া বলিল 'কতকগুলি পুঁতি না দিলে ভূত গণৎকারিণীকে আসিতে দিবে না'।

পুঁতিই কাফ্রিদিগের প্রধান রত্ন, যে রমণী পুঁতির অলঙ্কার পরিতে পায়, তাহার মহাভাগ্য। পুঁতি পাঠান হইল। ৫০ জন সশস্ত্র কাফ্র-পরিবেষ্টিত-গণৎকারিণী খড়্গ হস্তে সভায় উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে সাহেবের চাকর মাসালাশও উপস্থিত হইল। সভায় আসিয়া গণৎকারিণী আরও পুঁতি চাহিল, আরও পুঁতি পাইবার পর উন্মত্ত ভাবে লম্ফ ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। এবং এই অবস্থায় চতুর্দ্দিকস্থ বাড়ী আঘ্রাণ করিতে করিতে হঠাৎ ইংরাজদের নিকট আসিয়া বলিল 'সে আর একটা গরু চায়'।

সাহেব বলিলেন 'সে যদি যাদু বাহির করিতে পারে তবে পরে দিবেন'। তখন গণৎকারিণী নৃত্য গীত লম্ফ ঝম্প নানা কারখানার পর হঠাৎ একস্থান খুঁড়িতে বলিল। ক্রমাগত তাহার কথামতে তিন চারিটী স্থান খণন করা হইল তবুও যাদু বাহির হইল না। সাহেবেরা গণৎকারিণীর প্রতি এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন যে সে কোন মতে অলক্ষিতে মাটীর মধ্যে যাদুদ্রব্য ফেলিবার সুবিধা পাইল না।

তখন হঠাৎ বাগানে যাইয়া একটি স্থান খুঁড়িতে বলিয়া তাহার স্বামীকে তাহার নস্যের ডিবা আনিতে বলিল। নস্যের নীচে এই ডিপেতে শিকড় ছিল। ডিবা পাইয়া তখন সে খননকারীর হাত হইতে খোন্তা লইয়া নিজে খুঁড়িতে লাগিল—খুঁড়িবার সময় তাহার হাতের আঙ্গুলের মধ্যে শিকড় চাপা দিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে সেই হাতটা মাটীর মধ্যে দিয়া শিকড় ফেলিয়া আবার তাহা তুলিয়া লোকদিগকে বলিল—'এই দেখ'!

বলা বাহুল্য সাহেব তাহার জুয়াচুরী সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। গণৎকারিণী অপমানিত হইয়া প্রস্থান করিল।

নিজেদের অসুখ ভিন্ন গরুদের অসুখেও ইহাদের গণৎকারের আবশ্যক হয়। গো চিকিৎসাও অদ্ভুত রকম। সাধারণতঃ দেখা যায় একটা গরুর অসুখ হইলেই পালশুদ্ধ গরুর অসুখ হয়। গরুরা পীড়িত হইলে ইহারা একটা বেড়া বদ্ধ স্থানে তাহাদিগকে রাখিয়া তাহাদের অসুখের কারণ শরীরাবিষ্ট ভূতকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত একটা গরু বলি দেয়। এই মৃত গরুটীকে একটা ঘরে লইয়া গিয়া ভূতের আহারের জন্য রাখিয়া ঘরের দরজা অনেকক্ষণ বদ্ধ করিয়া রাখে। তাহার পর গণৎকার ভূতকে চলিয়া যাইতে বলে ও নানা রকম ভয় দেখায়, এবং মুখে একটুকরা চর্ব্বি লইয়া হাতের মশালালোকে সেই চর্ব্বী গলাইয়া একে একে সমস্ত গরুদিগকে ছাঁকা দিতে থাকে, সে সময় ৩।৪ জন লোকে গরুদিগকে ধরিয়া রাখে। ছাঁকা শেষ হইলে তখন বেড়ার দরজা খুলিয়া দিয়া স্ত্রী পুরুষে লাঠি হাতে চীৎকার করিতে করিতে গরুদিগকে তাড়া করে। গরম ঘিএর যন্ত্রণায় গরুরা একে উন্মত্ত প্রায় তাহার উপর এই তাড়না, তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছুটিতে থাকে। অনেক সময় এ চিকিৎসায় উপকার দর্শে—কারণ এইরূপে শরীরে রক্তের বিলক্ষণ চলাচল হয়।

কাফ্রিদের মধ্যে আরও এক রকম যাদু বিদ্যায় খুব বিশ্বাস আছে। তাহারা মনে করে যাদুকরেরা মৃত শরীরে প্রাণ দিতে পারে ও মনুষ্য দেহ পশুদেহে পরিণত করিতে পারে, এবং এইরূপ মনুষ্য-পশু-দ্বারা যাদুকরেরা অপ্রিয় ব্যক্তির অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকে।

গভীর রাত্রে গৃহস্থেরা মাঝে মাঝে শুনিতে পায় বাটীর বাহিরে, কেহ বিকট স্বরে—এ বাড়ী উৎসন্ন যাক-যাক, বলিয়া যায়। তাহাদের বিশ্বাস ইহারা যাদুকর প্রেরিত মনুষ্য পশু। কাফ্রিরা কম্পিত হৃদয়ে এ কথা শোনে কিন্তু কেহ কখন বাটীর বাহিরে গিয়া দেখিতে সাহস করে না—তাহা হইলে আরও অমঙ্গল হইবে। এই বিশ্বাসের জন্য ইহারা কখন বন্য পশুর সংশ্রবে আসে না, সকল বন্য পশুই ইহাদের মতে যাদুকার গঠিত মনুষ্য পশু। যদি কখন কাহাকেও বন্য পশুর সংশ্রবে বা নিকটে দেখা যায় তবে সে একজন অমঙ্গলকারী যাদুকর বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হয়। অনেক নির্দ্দোষী এরূপে প্রাণ হারাইয়াছে। যুদ্ধ জয়ের নিমিত্ত, যুদ্ধে অক্ষত থাকিবার নিমিত্ত, শত্রুর বলক্ষয় করিবার নিমিত্ত, বিবাহ করিবার পূর্ব্বে বালিকার সম্মতি পাইবার জন্য,

তাহার পিতার যাচিত গো সংখ্যা কমাইবার জন্য, বজ্র ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি আরণ্য জন্তু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইত্যাদি সব কারণেই কাফ্রিরা যাদু ক্রয় করে। এক এক জনের দেহে ১২।১৩ টা রক্ষাকারী যাদু দ্রব্য রক্ষিত হয়। হাঁড় দাঁত পালক শিকড় কাট ইত্যাদি গাত্রের চারিদিকে ঝুলিতে থাকে। ইহাতে তাহাদিগকে বড় অদ্ভুত দেখিতে হয়। এই যাদু দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা গণৎকারগণ খুব লাভ করে। ইহা যদি ফলদায়ী না হয় তাহাতে গণৎকারের দোষ নাই। গণৎকার বলে "ও ব্যক্তি ছাগল দিয়েছিল আমি তাই অল্প গুণের যাদু দিয়েছি, যদি তেমন তেমন যাদু চায় ত গরু দেওয়া উচিত ছিল"।

কিন্তু কেহ গরু দিয়াও যদি যাদুর কোন ফল না পায়—তখন গণক বলে—'ও ব্যক্তি লোক ভাল নয়, উহার উপর ভূতের অনুগ্রহ নাই, আমি কি করিব'।

এ কথায় কাফ্রিদের অবিশ্বাস নাই।

কাফ্রিগণৎকারদের আর এক প্রধান কাজ বৃষ্টি করা। যখন বৃষ্টি অনেক দিন না হয় দেশে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হয় তখন গণৎকারকে বৃষ্টি করিতে বলা হয়। বৃষ্টিকারীরা সাধারণতঃ বায়ুর পরিবর্ত্তন অন্য লোক অপেক্ষা বেশী বোঝে এবং সেই অনুসারে যতদিন না বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে বৃষ্টি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নানা রকম দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য চায়। সে সকল দ্রব্য জুটাইতে জুটাইতে বৃষ্টির সময় আসে। একবার একজন গণৎকার অনেক চেষ্টা করিয়াও বৃষ্টি করিতে পারিল না। একদিন দুপুর বেলা হঠাৎ বৃষ্টি আসিল, গণৎকার তখন ঘুমাইতেছিল, কিছুই জানিল না। এ দিকে লোকেরা তাহারই কার্য্য ভাবিয়া যখন তাহাকে ধন্যবাদ দিতে আসিল তখন বৃষ্টি থামিয়া গেছে, গণৎকার জাগিয়া আর বৃষ্টি দেখিতে পাইল না, সুতরাং লোকদিগের এখানে আসিবার কারণ প্রথমে বুঝিতে অক্ষম হইল, তাহার পর বুঝিবা মাত্র এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল তাহার স্ত্রী মাখন উঠাইতেছে, বলিল 'ঐ দেখ আমার স্ত্রী বৃষ্টি প্রস্তুত করিতেছে'।

দেশে রাষ্ট্র হইল গণৎকার দুধ হইতে বৃষ্টি করিয়াছেন।

একজন গণৎকার বৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বাবুল নামক একপ্রকার দ্রুতগামী পাহাড়ী পশু চাহিয়া বসিলেন,—'কিন্তু বলিলেন তাহার একটী লোমও যেন নষ্ট না হয়'। একটী লোম নষ্ট না করিয়া এ দুষ্প্রাপ্য পশু ধরা অসম্ভব। যত ধরা হইল কিছু না কিছু লোম ছিন্ন হইলই, সুতরাং বৃষ্টি হইল না। কেহ বা সিংহের বুক চায়। তাহাও বড় সহজে মিলে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃষ্টিকারীরা নিজেদের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে। তাহারা মনে করে দুষ্প্রাপ্য জিনিস না দিলে মেঘদিগকে সন্তুষ্ট করা যায় না, দেরী হইয়া যে বৃষ্টি হয় তাহা তাহারা বোঝে না। এক একটা বৃষ্টি করিতে ছয় মাসও হইয়া যায় সুতরাং বৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

কাফ্রি-গণৎকারেরা অনেক সময় জুয়াচুরী করে বটে কিন্তু সে শেষ কালে। প্রথমে নিজেদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করিয়া কাজ করে, যদি বিফল হয় তবে পরে লোকের ভয়ে জুয়াচুরি করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বিফল হইয়াও যে নিজের ক্ষমতায় উপর তাহাদের বিশ্বাস চলিয়া যায় এমন নহে, তাহাদের শক্তি বিপরীত শক্তি অপেক্ষা অল্প ক্ষমতাশালী তখন এই নিষ্পত্তিতে আসিয়া মাত্র পৌছায়। তাহারা নিজেদের ক্ষমতায় কতদূর বিশ্বাস করে তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটী দেখিলেই বুঝা যাইবে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কাফ্রিদের হঠাৎ হুঁস হইল যে ইংরাজেরা তাহাদের দেশে ক্রমে অধিক ক্ষমতাশালী হইতেছে ও তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। সেই জন্য তাহারা ইংরাজদের উচ্ছেদ সাধনে মনস্থ করিল। ইহার পূর্ব্বেও ইংরাজদের সঙ্গে তাহাদের দুই একবার বিবাদ হইয়া গিয়াছিল। ক্রেলী নামক স্থানে কাফ্রিরা মহা সভা করিয়া ইংরাজউচ্ছেদের উপায় নির্ণয় জন্য একজন প্রসিদ্ধ গণৎকারকে ডাকিয়া পাঠাইল। গণৎকার না আসিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, কেবল ১টা গরু ও ১টা ছাগল বাকী রাখিয়া সকলে সমুদয় গরু ছাগল বধ করুক, যাহার ঘরে যত শষ্য আছে ফেলিয়া দিক, তাহা হইলে ভুতেরা সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজদের উচ্ছেদ করিবে। ৮ দিন পরে উক্ত অবশিষ্ট গরু ও ছাগলের প্রাণের সাহায্যে সমুদয় হত জন্তু পুনর্জ্জীবিত হইবে। গণনা বাক্য যে সত্য তাহার প্রমাণ স্বরূপ, অষ্টম বা নবম দিনে সূর্য্য ৮ টার আগে উঠিবে না। ৮ টার সময় উঠিয়া ১০ টার মধ্যেই অস্ত যাইবে। তাহার পর প্রলয় আরম্ভ হইবে।"

কাফ্রিরা সমুদয় শস্য নষ্ট ও জন্তু বধ করিল। অষ্টম দিন গেল, নবম দিনে তাহারা গণকের ভবিষৎবাণীর সফলতা দেখিবার জন্য বিশ্বস্ত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সূর্য্য রোজ যেমন ওঠে সেই রূপ উঠিয়া নিয়মিত কালে অস্ত গেল। প্রলয়ের ত চিহ্নই নাই। কাফ্রিদের তখন কষ্ট ও হাহাকার দেখে কে ? দেশে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই। ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইল। প্রতিদিন সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। সবলকায়-দিগের অল্প সংখ্যক যে কয়জন বাঁচিল তাহারাও অনাহারে মৃত প্রায়, দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য। কাফ্রিরা ইংরাজদের অধীনতা স্বীকার করিবে না বলিয়া এ ভয়ানক কাণ্ড করিল ইহা দ্বারাই তাহাদের সে অধীনতা সহজে স্বীকার করিতে হইল।

যে গণৎকারদিগের কথা এ সর্ব্বনাশের মূল তাহারাও ইহার ফল ভোগ করিল। তাহারা নিজেও শষ্যাদি নষ্ট করিয়াছে, খাদ্যাভাবে তাহারাও সপরিবারে প্রাণত্যাগ করিল। নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তাহারা এ কাজ করিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা তাহাদের বিশ্বাসের প্রমাণ আর অধিক কি হইতে পারে ?

লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ।

(বৈশাখ মাসের পর)

আমরা কি কুক্ষণেই দুর্য্যোগ সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম—তাহা বলিতে পারি না। মোগল সরাইয়ে যখন গাড়ী উপস্থিত হইল—তখন সন্ধ্যা হইয়াছে—কিন্তু আকাশ ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন। আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত পূ—বাবুর, লক্ষ্ণৌ হইতে মোগল সরাইয়ে উপস্থিত হইবার কথা ছিল—তিনিও সেই কথা-মত, আমাদের টেলিগ্রামের নির্দ্ধারিত সময়ে মোগল সরাইয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন—কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে, হাবড়ায় মধ্যাহ্ন ট্রেন ফেল হওয়াতে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল না। তিনি আমাদের নির্দ্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাল পর্য্যন্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া দুর্য্যোগ দেখিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালেই বেণারসে ফিরিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা রাজঘাটে যাইবার জন্য গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা পরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল, ঠিক রাত্রি আট ঘটিকার সময় আমরা রাজঘাট ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। এই বার যেন আমাদিগকে শেষ কষ্ট দিবার জন্যই বৃষ্টি প্রবল বেগে পড়িতে লাগিল—চারিদিক ঘন ঘটাচ্ছন্ন মধ্যে মধ্যে সৌদামিনীর ক্ষণিক স্ফূরণ, বজ্রের কড়াক্কড় ধ্বনি, আর অনবরত বাতাসের সন্ সন্ শব্দ। এই প্রকার দুর্য্যোগ দেখিয়া সেরাত্রে গঙ্গা পার হইতে ইচ্ছা হইল না। তত্রাচ এক জন লোক পাঠাইয়া নৌকার তথ্য লইলাম। ঘাটে একখানিও নৌকা ছিল না—সুতরাং মনে মনে সুখী হইয়া বাকী কয়েক ঘণ্টা রাত্রি ষ্টেসনে কাটাইয়া দিবার সংকল্প করিলাম। বন্ধুরও আমার মতে সম্মতি হইল। আমরা ষ্টেশন মাষ্টারের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। দেখিলাম তিনি নাট্যশালার ম্যানেজারের ন্যায়, সওদাগরের বাড়ীর দালালের ন্যায়, আদ্য শ্রাদ্ধবাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তার ন্যায় ইতস্তত ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। একেত রেলওয়ে ষ্টেসন ব্যস্ততার আবাস স্থান, তাহার উপর আবার ষ্টেসন বাবু কার্য্য গতিকে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন সুতরাং আমাদের তাঁহার সহিত বিশেষ রূপ আলাপ পরিচয়ের সাবকাশ হইল না। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে আমাদের সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া সামান্যতঃ একটু আলাপ করিয়া লইলাম। তিনি বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া চাপরাশিকে ষ্টেসনস্থ "জেণ্টেলম্যান"দিগের ঘরটী আমাদের ব্যবহারার্থে খুলিয়া দিতে বলিলেন। ষ্টেসনে জেণ্টেল ম্যান্ শব্দে সকল স্থলেই "সাহেব ও ফিরিঙ্গি" বুঝিতে হইবে। আমাদের পরমসৌভাগ্য—যে কোন "জেণ্টেলম্যান" সেই রাত্রে সেই গৃহ অধিকার করিতে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং আমরা নির্ব্বিবাদে সেই ঘরটী অধি-

কার করিয়া বসিলাম ও ষ্টেসনমাষ্টার বাবুর সহৃদয়তার জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম।

যেমন বহুকালব্যাপী দুঃখের পর সুখাস্বাদন করিতে, অন্ধতমসাবৃত স্থান হইতে বাহির হইবা মাত্র আলোক উপভোগ করিতে, স্বতঃই বাসনা হয় তেমনি কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী অবিচ্ছিন্ন ঘনঘটাময় বৃষ্টির পর আমাদের সূর্য্যের মুখ দেখিবার প্রবল বাসনা উপস্থিত হইল। মনে বড় আশা ছিল—পথি মধ্যে ঝড় বৃষ্টিতে যে কষ্ট পাইয়াছি প্রভাতে নবোদিত সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত ধনুকাকার বারাণসীর সুদৃশ্য ও ভাগিরথীর ঈষচ্চঞ্চল বক্ষে, বালার্ক মিশ্রিত ঈষৎ সংক্ষুব্ধ উর্ম্মিমালার লীলাময় নৃত্য দেখিতে দেখিতে পরপারে গমন করিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ধৈর্য্য পরীক্ষার জন্য যেন তখনও আকাশ পরিষ্কার হইল না। বৃষ্টি থামিল বটে কিন্তু সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিম্নে নদী বক্ষে অসংখ্য বীচি মালা উৎপাদন করিয়া প্রবলবেগে বাতাস বহিতে লাগিল। এবারে আমরা এবাধা অগ্রাহ্য করিয়া নৌকায় গিয়া উঠিলাম ও তরঙ্গ রাজির সহিত যুঝিতে যুঝিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই আনন্দময় কাশীধামে উপস্থিত হইলাম।

কাশীধামের মাটীতে পদার্পণ না করিতে করিতেই মধুচক্র বেষ্টনকারী মক্ষিকা বৃন্দের ন্যায় কতকগুলি যাত্রাওয়ালা ও গঙ্গাপুত্র আসিয়া আমাদিগকে চারিদিক হইতে বেড়িয়া ফেলিল, সকলেই আমাদের পরিচয় লইতে ব্যস্ত। বৈদ্যনাথের পাণ্ডারা যেমন ষ্টেসন হইতে নামিতে না নামিতে যাত্রীদিগের উপর ভয়ানক উৎপাৎ করিয়া থাকে, কাশীতে সেই প্রকার উৎপাৎ অনেকটা অধিক বলিয়া বোধ হইল। গঙ্গাপুত্রেরা তীর্থযাত্রীদিগকে কাশীধামের গঙ্গার ঘাটে স্নানের মন্ত্র পড়াইয়া পয়সা আদায় করে। যাত্রাওয়ালারা যাত্রীদিগকে নগরের চারিদিক ও বিখ্যাত দেব মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় দ্রব্য সমূহ দেখাইয়া আনে। ধরিতে গেলে যাত্রাওয়ালারা এক প্রকার "Guide" শ্রেণীভুক্ত। উভয় শ্রেণীই ব্যবসাদার। যে সময়ে পশ্চিমে রেল পথ হয় নাই সেই সময়ে গঙ্গাপুত্রদের যথেষ্ট অত্যাচার ছিল। সেই সময়ে তাহারা প্রকারান্তরে ধর্ম্মের ভান করিয়া দস্যুবৃত্তি করিত। নিতান্ত ধনীলোক না হইলে—পূর্ব্বে কেহ সহসা কাশী যাইতে পারক হইতেন না—ইহাদের মধ্যে যাঁহাদের লোকবল অল্প থাকিত, সন্ধান পাইলে গঙ্গাপুত্রেরা যাত্রী সংগ্রহের ছলে দল বাঁধিয়া নৌকায় গিয়া তাহাদের সমস্ত দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া আরোহীদিগকে জলে ভাসাইয়া দিত, জলপন্থী ঠগ ও নৌকাওয়ালাদের সহিত ইহাদের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিত। কিন্তু সুদক্ষ মাজিষ্ট্রেট স্যামুয়েল সাহেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গঙ্গাপুত্রদের অত্যাচার আজকাল যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে।

কোন প্রকার গতিকে আমরা গঙ্গাপুত্র ও যাত্রাওয়ালাদের হাত এড়াইয়া, বাঙ্গালী-

টোলায় আমাদের বারাণসীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। যথোপযুক্ত বিশ্রাম করিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সমাপন করিয়া পুরীদর্শনে বাহির হইলাম।

হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, অবন্তিকা, অযোধ্যা মথুরা, দ্বারিকা, অমরাবতী, গঙ্গাসাগর সঙ্গম, সরস্বতী-সিন্ধুসঙ্গম, কাঞ্চী, ত্র্যম্বক, গোদাবরী, কালঞ্জর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, মহালয়, ওঙ্কার, পুরুষোত্তম, গোকর্ণ, ভৃগুকচ্ছ, ভৃগুতুঙ্গ, পুষ্কর, শ্রীপর্ব্বত, মানসতীর্থ, গয়া প্রভৃতি কয়েকটী তীর্থক্ষেত্র মুক্তিদায়ক বলিয়া উল্লিখিত হয়। বারাণসী ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বারাণসীর প্রাচীন নাম কাশী ও হিন্দুরা ইহাকে "অবিমুক্ত ক্ষেত্র" বলিয়া থাকেন। বরণা ও অসিনামক নদী দ্বয়ের মধ্য স্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম বারাণসী হইয়াছে। * বারাণসী সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় প্রাচীনা নগরী। ইহার সমকালবর্ত্তিনী নগরীগুলির ত কথাই নাই যাহারা ইহার পরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল—তাহারা সকলেই আজ কালের আধিপত্যে বিস্মৃতির গর্ভে লুকায়িত। কেবল একমাত্র বারাণসী যেন সদর্পে কালের শাসন উপেক্ষা করিয়া উত্তাল তরঙ্গ প্রতিহত, স্পর্দ্ধাবান্ সমুদ্র-মধ্যস্থ গিরির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যে সময়ে প্রাচীনতম নগরী বেবিলন, নিনেভের সহিত প্রাধান্য লইয়া বিবাদে ব্যাপৃত ছিল, টায়ার যখন নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিল—সুপ্রসিদ্ধ এথেন্স যখন ধীরে ধীরে বল সঞ্চয় করিতেছিল—বীরপ্রসবিনী রোম যখন জগতে বিশেষরূপে পরিচিত হয় নাই তখন ও এই বারাণসী সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষাস্থল রূপে সগর্ব্বে দণ্ডায়মানা। যখন সমগ্র পৃথিবীর কথা ছাড়িয়া দিয়া ভারতের কথা ভাবিয়া দেখি—তখন মনশ্চক্ষে পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাই অতি প্রাচীনা কোশল ও ইন্দ্রপ্রস্থ, পাটলীপুত্র ও গৌড়, কবে কালের করাল কবলস্থ হইয়াছে—কিন্তু বারাণসী আজিও বর্ত্তমান। যদিও প্রাচীন বারাণসীর সহিত আধুনিক বেনারসের অনেক বিষয়ে বিভিন্নতা ও পরিবর্ত্তন দাঁড়াইয়াছে তথাপি তাহাতে ইহার প্রাচীনত্ব লোপ হয় নাই। যদিও বোধিসত্ত্ব কপিল, শঙ্করাচার্য্য, হিয়াংসাঙ ফাহিয়ান প্রভৃতি, বর্ত্তমান বেণারস দেখিলে প্রাচীন কাশীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন সন্দেহ নাই—তত্রাচ ইহার মধ্যে এমন অনেক প্রাচীন দর্শন আছে—যাহা দেখিলে তাঁহাদের মনে প্রাচীন কাশীর পরিস্ফুট ছায়া উপস্থিত হইতে পারে। অতি প্রাচীন পূর্ব্বপরিচিত কাশীর কি প্রকার অবস্থা ছিল—তাহা নির্ণয় করা অতিশয় দুরূহ। কাশীখণ্ডে কাশীর বিবরণ সম্বন্ধে যতকথা নাই থাক শিবের ও কাশীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে ইহা পরিপূর্ণ। ইহা

---

* বরণা পিঙ্গলা নাড়ীস্তদন্তংস্ত বিমুক্তকং
সা সুষুম্না পরানাড়ী এয়ং বারাণসীত্বসৌ।
কাশীখণ্ড পঞ্চম অধ্যায়।

অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা জড়িত সুষুম্না নাড়ীর ন্যায় বরণা এবং অসি এই উভয়ের অন্তঃপাতিনী বলিয়া এই কাশী বারাণসী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হইতে ইতিহাসের কোন উপকার হইতে পারে না। তবে ফাহিয়ান হিয়াঙসাং প্রভৃতি ভ্রমণকারীদের পুস্তক হইতে তৎকালীন কাশীর প্রাচীন চিত্র পাঠকবর্গকে দেখাইতে চেষ্টা করিব। হিয়াঙসাং তাঁহার ভ্রমণ বিবরণীতে বারাণসীকে 'পোলনিসি' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই সময়ে বারাণসী প্রদেশ বিস্তারে তিনশত ক্রোশেরও উপর ছিল—তিনি একস্থলে লিখিতেছেন—"গঙ্গার উপরি ভাগে পশ্চিম-দিকেই বারাণসী নগরী স্থাপিত ছিল—নগরীর আশে পাশে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রাম ছিল। বারাণসী নগরীতে যেমন বহুসংখ্যক লোক বাস করিত—এই সমস্ত পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেও লোক সংখ্যা তাহা অপেক্ষা নিতান্ত অল্প ছিল না। বারাণসী নগরীতে অনেক ধনীর বাস ছিল—এইস্থানের সাধারণ অধিবাসীরা শান্ত স্বভাব, সুমার্জ্জিত রুচি, ও জ্ঞানের সম্মান-রক্ষাকারী। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ, নগরী ধনধান্যে পরিপূর্ণ—নগরের মধ্যস্থ উদ্যানসমূহ সুমিষ্ট ফলে পরিপূর্ণ—নগরপান্তস্থ গ্রাম্য ক্ষেত্রগুলি—হরিতবর্ণ শস্যে পরিপূরিত। নগরীর মধ্যে ভ্রান্ত মতাবলম্বীদিগের (হিন্দুদিগের ?) সংখ্যাই অধিক। অতি অল্প লোকেই মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের নিয়মাদি পালন করিয়া থাকে। নগরীর মধ্যে একশতের উপরও হিন্দুদেবমন্দির আছে। এই সকল মন্দির সুন্দর কারুকার্য্যময় প্রস্তরনির্ম্মিত ও গগণস্পর্শী চূড়া সম্বলিত। কাশীর সীমাভুক্তস্থলে প্রাচীন বৌদ্ধ রাজা-দিগের (অশোক প্রভৃতির) অনেক "স্তূপ" বা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত আছে,—নিজ নগরীর মধ্যে ও তাহার আশেপাশে কতকগুলি বৌদ্ধ আশ্রমও আছে সেইস্থানে অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করে। নগরের লোক সংখ্যা বৌদ্ধ অপেক্ষা হিন্দুই অধিক। হিন্দুরা সকলেই বিশ্বেশ্বর দেবের উপাসক। শিবোপাসকদের অধিকাংশই মস্তকমুণ্ডন করিয়া তদুপরি প্রলম্বমান শিখা রক্ষা করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ জটা রাখে ও ভস্ম দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করে ও নানাবিধ দুঃসাধ্য কঠোর তপস্যা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আবার অনেকেই কৌপীনধারী, কেহ বা সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ।

হিয়ঙসাঙের এই বিবরণ হইতে এই প্রতিপন্ন হয়—যে তাঁহার সময়ে বারাণসী উন্নতির অভিমুখে ক্রমশঃ ধাবিত হইতেছিল। এই উন্নতি অবশ্য একদিনে সংসাধিত হয় নাই। যদি কেহ একটী প্রাচীনতম আর্য্য নগরীর চিত্র মানসপটে দেখিতে চান্, তাহা হইলে তিনি বারাণসীর মুসলমান কীর্ত্তি গুলি বাদ দিয়া দেখিলেই সেই বিষয়ে কৃতকার্য্য হই-বেন। বহুকাল হইতেই বারাণসী হিন্দুর চক্ষে অতি পবিত্র ক্ষেত্র। হিন্দুর মতে মহা-পাপী আসিয়া বারাণসীতে মরিলে সদ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই অবিমুক্তক্ষেত্র—প্রাচীনতম হিন্দুতীর্থ বারাণসীর বর্ত্তমান শোচনীয় পরিণাম দেখিলে মনে যথেষ্ট বিষাদ উপস্থিত হয়। যে বারাণসীতে বসিয়া মহর্ষি কপিল সাংখ্যসূত্র প্রচার করিয়াছিলেন, যে মহাক্ষেত্রে বসিয়া মহামতি যাস্ক, "নিরুক্ত" ও পণ্ডিত প্রবর পাণিনী গভীর গবেষণা-পূর্ণ স্বীয় ব্যাকরণ সূত্র গুলি জগৎকে জানাইয়াছিলেন, যেখানে বসিয়া কুল্লুক ভট্ট হিন্দুর

প্রধান ধর্ম্ম শাস্ত্র মনুর টীকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন—যেখানে বসিয়া মহামতি মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব, বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময় সূত্রগুলি সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন, যেখানে বসিয়া সাধক প্রবর তুলসীদাস স্বীয় মধুময় রামায়ণ গানে সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই বারাণসী বর্ত্তমানে যেরূপ অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা দেখিলে কার না মনে আঘাত লাগে?

কেহ কেহ বলেন প্রাচীন কাশীর অধিকৃত স্থলে বর্ত্তমান বারাণসী সংস্থাপিত নহে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার সময়ে কাশী ক্ষেত্র এক সময়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পরে কালক্রমে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সময়ে বৌদ্ধেরা কাশী হইতে হিন্দুদিগের দ্বারা দূরীভূত হয়। এই সময়ে হিন্দুরা প্রাচীন কাশী হইতে একটু সরিয়া আসিয়া বরণা ও অসির মধ্যবর্ত্তী একটী নূতন স্থলে মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া তাহাকে বারাণসী আখ্যা প্রদান করেন। *

* একখানি প্রাচীন তামিল নাটকে কাশীক্ষেত্রের সেই সময়ের বর্ণনা আছে। নাটকখানি অযোধ্যাপতি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লইয়া সংগঠিত। সিংহলের মন্ত্রী-সভার সভ্য বারিষ্টার মুথুকুমার স্বামী এই নাটকখানির ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন। এই প্রাচীন তামিল গ্রন্থখানি কোন সময়ের তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ। সম্ভবতঃ বোধ হয় বারাণসীতে যবনাধিকার ব্যাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেই ইহা লিখিত। ইহাতে কাশীর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত আছে তাহা হইতে বারাণসীর তৎকালীন প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যে সময়ে বিশ্বামিত্রের ছলনায় রাজচ্যুত হইয়া কাশী প্রবেশ করিতেছেন সেই সময়ে তাঁহার মুখ দিয়া গ্রন্থকার তাঁহার সময়ের কাশীর অবস্থা সাধারণকে জানাইয়াছেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন—"প্রিয়তমে ঐ দেখ—ভারতের পবিত্রতম তীর্থক্ষেত্রের—রাজপ্রাসাদের ন্যায় গৃহগুলির পবিত্র চূড়া অদূরে দেখা যাইতেছে—ঐ দেখ আমরা মেখলার ন্যায় নগর বেষ্টনকারী অত্যুচ্চ প্রাচীরের সন্নিহিত হইয়াছি। ঐ দেখ কত শত গগণস্পর্শী গৃহ চূড়া সগর্ব্বে উত্থিত হইয়া মেঘের কোল স্পর্শ করিতেছে আবার দেখ, এই সকলের উপরি ভাগে দেবদেব বিশ্বনাথের স্বর্ণ ও মণি মুক্তাদি খচিত অত্যুচ্চ মন্দির চূড়া মণিমুক্তাদি খচিত পতাকা শোভিত হইয়া কতই শোভা পাইতেছে। রাজ্ঞী দেবাদিদেবকে প্রণাম কর। দেখ বায়ুতে যেমন জলদজালকে ক্ষণমাত্রে দূরীভূত করে তেমনি এই পবিত্র ক্ষেত্র কাশীর দর্শনেই পাপীর জন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষণমাত্রেই মুক্ত হয়। * * এই দেখ প্রিয়ে!—আমরা নগর দ্বারের নিকট হইয়াছি। দেখ! কত শত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী বীর পুরুষেরা নগর রক্ষা করিতেছে। চল আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। (ভিতরে প্রবেশ করিয়া) আহা কি সুন্দরী নগরী! ধন দেবতা কুবেরের এত ঐশ্বর্য্য আছে কি না—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এই দেখ পার্শ্ববর্ত্তী এই সকল অত্যুচ্চ গৃহে ব্রাহ্মণদিগের বাস, ঐ শোন, উন্মুক্ত গবাক্ষ পথ দিয়া—দূর নিঃসৃত সঙ্গীত প্রবাহবৎ—ব্রাহ্মণ ও তাঁহার শিষ্যের মুখোচ্চারিত বেদধ্বনি কেমন আমাদের কানে আসিয়া মধুরতার সহিত বাজিতেছে। ঐ দেখ, গৃহে গৃহে পূজাপয়ায়ণ

ভারতে যবনাধিকারের পর প্রাতস্মরণীয় মোগল-বাদসাহ আকবরের সময়েই প্রকৃত পক্ষে বারাণসীর যথেষ্ট উন্নতি আরম্ভ হয়। দিল্লীর বিধর্ম্মী সম্রাটদিগের মধ্যে আকবর যেরূপ হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান রক্ষক ছিলেন এমন আর কেহই নহে। তিনি বুন্দীর সর্দ্দার, রাজপুত কুল-গৌরব, রাও সজ্জন সিংহকে এই সময়ে বারাণসীর শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সজ্জন সিংহ অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ও ধর্ম্ম পরায়ণ লোক ছিলেন; তিনি কাশীর অনেক স্থলের বন জঙ্গল কাটাইয়া অত্যুচ্চ মন্দির ও কয়েকটী অন্নছত্র স্থাপন করেন। তাঁহার বাস-ভবনের চারি পার্শ্বে অনেক সুদৃশ্য গগণস্পর্শী সুন্দর প্রাসাদ ও জাহ্নবী-কুলে কয়েকটী বড় বড় ঘাট নির্ম্মিত হয়। তাঁহার শাসনের প্রভাবে—সেই সময়ে গুণ্ডার-আবাসস্থল-কাশীতে "চৌর্য্যবৃত্তি" বা "কোন প্রকার ডাকাতির কথা শোনা যাইত না। পথিকেরা বহু মূল্য দ্রব্যাদি লইয়াও রাস্তায় পড়িয়া থাকিলে কেহ তাহা স্পর্শ করিতে সাহসী হইত না। এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়া ইহার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে বারাণসীর যথাসম্ভব উন্নতি হয়। বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের শাসন বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাই—"বারাণসীতে পঞ্চদশ শত মন্দির—অগণ্য প্রাসাদ, ও বহুদূরব্যাপী সর্পাকারে বেষ্টিত রাজপথ, ও তাহার দুই পার্শ্বে বহুল বিপণি-

---

ব্রাহ্মণদিগের অস্ফুট মন্ত্রধ্বনি আমরা স্পষ্ট রূপে শুনিতে পাইতেছি। আহা! এই পবিত্র ক্ষেত্র কাশী, বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী বীণাপানির আবাস স্থান। এস্থানে কেবল বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র, পুরাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতির আলোচনা হইয়া থাকে। ঐ শোন সুদূর কঠিন জ্যা-নির্ঘোষ ও তরবারির ঝঞ্ঝণা দ্বারা বোধ হইতেছে এস্থানে ক্ষত্রিয়ের যথেষ্ট প্রাতুর্ভাব আছে। * * * * এই দেখ এক্ষণে আমারা লক্ষ্মীর বর-পুত্র বৈশ্যদিগের শ্রী সম্পন্ন অত্যুন্নত প্রাসাদ গুলির সন্নিহিত হইয়াছি—আহা! ইহাদের কি অতুল ঐশ্বর্য্য! রাস্তার দুই পার্শ্বে কত শত বিপণি রাজি বহু মূল্য দ্রব্যজাত পরিপূর্ণ হইয়া নগরীর শোভা সম্পাদন করিতেছে। নগরের যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য ও উৎপন্ন দ্রব্য—তাহা সকলই এইস্থানে একাধারে বিরাজিত। ঐ দেখ বণিকেরা (পোদ্দারেরা) স্তূপাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লইয়া বসিয়া আছে ও সকলে উহাদের নিকটে গিয়া মুদ্রাদি বিনিময় করিতেছে,—কি আশ্চর্য্য! মুদ্রাদির ক্রমাগত সঞ্চালন শব্দ এই ক্রেতা বিক্রেতাদিগের উচ্চরব ছাড়াইয়া আমাদের কর্ণে পশিতেছে। এই দেখ এক্ষণে আমরা ঐশ্বর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদের মৃৎ কুটীরের সন্নিহিত হইয়াছি। ঐ দেখ! শ্রমজীবীরা কেহবা গোচারণ করিতেছে—কেহবা ভূমি কর্ষণার্থে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে—কেহবা হল নিযুক্ত অবাধ্য বৃষদ্বয়কে তাড়না করিতেছে আবার দেখ রাখাল বালকেরা কেমন সুমধুর বংশীধ্বনি করিতেছে—— * * এই যে আমরা ভূত ভাবন বিশ্বনাথের মন্দির সন্নিকটস্থ হইয়াছি। চল মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিশ্বনাথকে দর্শন করি।"

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে সেই সময়ের কাশীর ঐশ্বর্য্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়ে বারাণসীতে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের বাস ছিল ও তাহা ধন রত্নাদিতে পরিপূর্ণ ছিল ইহারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রেণী বাণিজ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ হইয়া শোভিত হইতেছে।" বাদসাহ জাহাঙ্গীরও তাঁহার নিজ জীবন বৃত্তান্তে এই সময়ে বারাণসীকে "মন্দিরময়ী নগরী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে বারাণসীর যে উপকার ও উন্নতি হইয়াছিল আরঙ্গীবের সময়ে তাহার শত গুণ অপকার ও অবনতি আরম্ভ হয়। এই দেবদ্বেষী দুরাত্মা সম্রাট্ দিক্‌বিদিগ জ্ঞান শূন্য হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন। বারাণসীর তৎকালীন উন্নতি তাঁহার চক্ষুশূল হওয়াতে তিনি ইহার বিনাশ সাধনের সংকল্প করেন। অনেক দেব মন্দির ভগ্ন ও ভূমিসাৎ করিয়া সেই স্থলে মস্‌জিদাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আমরা পরে আরঙ্গীবের অত্যাচারের সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রদান করিব।

হিন্দুদ্বেষী আরঙ্গীবের মৃত্যুর পর বারাণসীর উপর আর কোন বিধর্ম্মী রাজা হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইংরাজ রাজত্বে অন্যান্য সুখ যেরূপ হউক না কেন—হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে কোন রূপে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ নারাজ। এই জন্য আরঙ্গীবের মৃত্যুর পর হইতে বারাণসীর আবার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে বারাণসীতে কত মন্দির ও কত মুসলমানকীর্ত্তি আছে তাহার মোটামুটি নকসার স্বরূপ আমরা প্রিন্সেপ সাহেবের বিবরণী হইতে নিম্ন লিখিত তালিকাটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

	নগর বিভাগ		মন্দির সংখ্যা		মস্‌জিদ্ সংখ্যা
১।	কোতয়ালি	...	২৬১	...	১৯
২।	কাল ভৈরব	...	২১৬	...	২০
৩।	আদমপুর	...	৪৮	...	৫৪
৪।	জৈতপুর	.	৩০	...	৯৭
৫।	চেৎগঞ্জ	...	৫৩	...	৩২
৬।	ভেলুপুর	...	১৫৪	...	১৬
৭।	দশশ্বমেধ	...	৬৯২	...	৩৪
			১৪৫৪		২৭২

এই তালিকা হইতে নিঃসংশয় রূপে প্রতিপন্ন হইবে আরঙ্গীবের আক্রমণের ও ধ্বংশ সাধনের পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাহ্য সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বারাণসীর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সমস্ত মন্দির ও মসজিদ্ ছাড়া আরও কতশত সৌধ ও কুটীরে বারাণসী পরিপূর্ণ তাহা কে বলিতে পারে?

বারাণসীর পনর আনা অট্টালিকাই উত্তম বালুকা প্রস্তরে (Sand Stone) নির্ম্মিত। আমরা দেখিতে পাই যে দেশে প্রকৃতির যেরূপ গঠন সেই দেশে বাড়ী ঘরও তদ্রূপ

হইয়া থাকে। শস্য শ্যামলা, ফল জলপূর্ণা আমাদের মাতৃভূমি বাঙ্গালার কোন স্থলেই পাহাড়ের লেশমাত্রই নাই। চারি দিক কোমল মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ। সুতরাং আমাদের দেশে সমস্ত অট্টালিকা এমারতাদিও ইষ্টক নির্ম্মিত। যে কলিকাতা নগরী বর্ত্তমানে—প্রাসাদ নগরী বলিয়া আখ্যা পাইয়াছে সেই কলিকাতা ধরিতে গেলে এক প্রকার "মৃত্তিকাময়ী" বলিলে অত্যুক্তি হয় না।—কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আমরা সকল বিষয়েই বাঙ্গলার সহিত বিভিন্নতা দেখিতে পাই—বারাণসীর নিকটে-সুপ্রসিদ্ধ চুনারের পাহাড় থাকাতে—প্রস্তরাদি উপকরণের কোন অভাব নাই—এখানকার অধিকাংশ ঘর দ্বার সুতরাং প্রস্তর নির্ম্মিত। ভবানীপতির অত্যুচ্চ মন্দির হইতে—মধ্যবিত্তের সামান্য অট্টালিকা পর্য্যন্ত সকল গৃহেই প্রস্তরের যথেষ্ট সমাবেশ আছে। এই সকল গৃহের গঠন প্রণালী ততদুর উৎকৃষ্ট নহে। দূর-দৃশ্য মনোমুগ্ধকর হইলেও কাছে আসিলে ইহাতে শিল্পনৈপুন্যের তত পরিচয় পাওয়া যায় না। এখানকার ঘর গুলি একতল হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তাহাদের উর্দ্ধ আমাদের দেশের একটী সাহেবী ত্রিতল বাটীর সমান নহে। এস্থানের ঘরগুলি আমাদের দেশের সহিত তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্র ও এক প্রকার বায়ুপথ বিহীন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বারাণসীর বাড়ীগুলি যেরূপ অতিশয় সংশ্লিষ্ট ভাবে অবস্থিত—ইহার মধ্যবর্ত্তী পথগুলি ও তদ্রূপ সংকীর্ণ। কয়েকটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত গলিরাস্তা ও সদর রাস্তা ভিন্ন—অন্যান্য সমস্ত গুলিই অপ্রশস্ত ও লোক যাতায়াতে কখনও কখনও দুর্গম হইয়া উঠে। গলিরাস্তা গুলির অধিকাংশই বড় বড় চৌকা প্রস্তর খণ্ডে নির্ম্মিত—এবং কোন স্থলে বা ক্রমোচ্চ ও কোন স্থলে ক্রম-নিম্ন। এ সকল পথে কোন প্রকার যানবাহনের সুবিধা নাই। এই সকল রাস্তার নিম্নে আবার ড্রেন গিয়াছে—সুতরাং জলবৃষ্টি হইলে অনেক সময়ে দুর্গন্ধের জ্বালায় রাস্তা চলা ভার হইয়া উঠে। বাহিরের রাস্তাগুলি—অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও খুটিং নির্ম্মিত। এ সমস্ত রাস্তায় সকল প্রকার গাড়ীই চলিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কাশীধাম স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল—কিন্তু আজকাল নানা কারণে ইহা ক্রমশঃ পূর্ব্ব-গৌরবচ্যুত হইতেছে। কাশীর স্বাস্থ্যের অবস্থা আজকাল কতদূর মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহা বোধ হয় গত চৈত্র—বৈশাখের ভীষণ সংক্রামক বিসূচিকার প্রাদুর্ভাবেই বেশ জানা গিয়াছে। এস্থানের সকলেই বলেন—পয়ঃপ্রণালীর অসংস্কৃত ও অপরিণত অবস্থাতেই দিন দিন বেনারসের জলবায়ু খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সর্ব্বাংশে সত্য। পয়ঃপ্রণালীর দোষ সমূহ দূর করিয়া বেণারসে উত্তম সুপরিস্কৃত কলের জলের ব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েক জন প্রধান প্রধান হিন্দুধনী একত্রিত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধি হইলে বেনারসের অবস্থা যে আরও উন্নত হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ।

আশা।

নিরাশার ম্লানমুখের উপর একটা গভীর আচ্ছাদন টানিয়া দিয়া বঙ্গসন্তান ধীরে ধীরে জগতে বাহির হইতেছে—বহুদিন পরে সে একবার পৃথিবীর মুখ দেখিয়া প্রাণ শীতল করিবে। এতদিনকার সযতনে পালিত জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া জগতের কঠোর অনুগ্রহের সম্মুখে সে আজ একবার জীবন পরীক্ষা করিবে—দেখিবে, পূর্ব্ব, পশ্চিমের সমকক্ষ হইতে পারিবে কি না। শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী স্বদেশের জন্য কাজ করিতেছে—স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি করিয়া। বাঙ্গালী বুঝিয়াছে যে চুপি চাপি বসিয়া থাকিবার দিন এখন নয়। এই জীবন সংগ্রামের মহাকোলাহলে সেও তাই আপনার ক্ষীণ কণ্ঠ জাহির করিতে বাহির হইয়াছে। সে চাহে, যেখানে ইংলণ্ড দাঁড়াইবে, সেও সেইখানে দাঁড়াইবে—লেজ গুটাইয়া নীচের মত দাঁড়াইবে না—দাঁড়াইবে, বীরের মত প্রসারিত বক্ষে।

তাই আজ বঙ্গের অভিশপ্ত সন্তান চারিদিক হইতে মধু আহরণ করিয়া স্বদেশীয় সাহিত্যের পুষ্টসাধন করিতে অগ্রসর, চতুর্দ্দিকের বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া একমনে আপনার কার্য্যে মগ্ন। আশার বলে বলীয়ান হইয়া বাঙ্গালী যেরূপ উৎসাহে কাজে লাগিয়াছে, তাহাতে বিফল মনোরথ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

কাগজে পত্রে মধ্যে মধ্যে ভারতের সাধারণ ভাষা সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়। সম্পাদকবর্গ সাধারণতঃ ইংরাজী অথবা সংস্কৃতকেই সাধারণের ভাষা করিয়া তুলিতে চাহেন। ইংরাজী যেদিন আমাদের ভাষা হইবে সেইদিন আমরা ইংলণ্ডের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইব। ইংলণ্ড গর্ব্ব করিবে, ভারতবাসীকে আমরা কথা কহিতে শিক্ষা দিয়াছি। ইহাপেক্ষা কি বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া মরা ভাল নয়? ডুবিয়া মরিতে কি এতই কষ্ট?

সংস্কৃতের দিনকাল এখন গিয়াছে। সংস্কৃত সাধারণের ভাষা ত কিছুতেই হইতে পারে না। আধুনিক কোনও সাহিত্যের সাহায্য ভিন্ন সংস্কৃত নূতন জ্ঞানোপার্জ্জনের পক্ষেও বিশেষ সুবিধাজনক নহে—সেই পুরাতন কালের হ য ব র এবং লয়ের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইবে।

বাঙ্গলা সাহিত্য প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানে পুষ্ট। যোগ্যতা ও উন্নতি দেখিয়া সহজেই মনে হয় বাঙ্গালা একদিন বোম্বাই মাদ্রাজে সাদরে গৃহীত হইবে। বাঙ্গালী কবি তখন ভারতের কবি হইবেন; শস্য-শ্যামলবঙ্গভূমির উর্ব্বরা ক্ষেত্র দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে লোকে ছুটিয়া আসিবে।

বাঙ্গলা এখন উন্নতিশীল। কাগজে আঁচড় কাটিয়া বঙ্গদেশ যাহা রাখিয়া যাইবে কুরুক্ষেত্রের সমস্ত রক্তে তাহা মুছিতে পারিবে না। রুধির কলঙ্কিত দেহে

পঞ্জাব হাঁ করিয়া দেখিবে কাগজে আঁচড় কাটিয়া বঙ্গ কি করিয়া গেল। হয়ত কিছুদিন পরে এই দেবভাষা পঞ্জাব-কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে—কাশ্মীরের নিস্তব্ধ উপত্যকা কম্পিত করিয়া হিমালয়ের তুষার-ধবল শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হইবে। তখন লোকে বলিবে বাঙ্গালী মানুষ বটে।

এখন আর সেদিন নাই; পাশব বল এখন বড় কার্য্যকরী নহে। কালের প্রস্তর পটে নাম খোদিত করিবার জন্য জগতে একটা যোঝাযুঝি পড়িয়াছে; সেই যোঝা যুঝিতে মাতোয়ারা হইয়া ইংলণ্ড ছুটিয়াছে; ফ্রান্স ছুটিয়াছে, ইতালী ছুটিতে ছুটিতে পড়িয়া গিয়াছিল আবার উঠিয়া ছুটিয়াছে। বঙ্গদেশও সেই সঙ্গে ভারতকে পৃষ্ঠে লইয়া ছুটিয়াছে। ভাব দেখিয়া আশা হয় যে বঙ্গদেশ ইহাদিগকে ধরিতে পারিবে। তখন দেখিবে বাঙ্গলা স্বাধীন—শ্বেত দ্বীপের অবিরাম জুতাবর্ষণে কম্পিত কলেবর নহে।

অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গ-সাহিত্য যেরূপ উন্নতি করিয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে য়ুরোপের সাহিত্যের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতে পারিবে। য়ুরোপ কান খাড়া করিয়া শুনিবে—ঐ সুদূর পূরবে কে বীণা বাজাইতেছে।

এখন আমাদের উন্নতি অবনতি সকলই সাহিত্যের উপর নির্ভর করে। বাহুবল অবশ্য আবশ্যক কিন্তু বিজ্ঞান-বলের নিকট তাহা কিছুই নহে। আমরা সাহিত্যের বলে যাহা করিব অন্য দেশ বাহুবলে তাহা করিতে পারিবে না। বাহু বলের জন্য কাহার গৌরব? প্রাচীন ভারতের গৌরব—বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি। নব্য ইংলণ্ডের গৌরব--সেক্সপীয়র, মিল্টন, শেলী। সাহিত্য দুর্ব্বলের হৃদয়েও বলসঞ্চার করিয়া দেয়। সাহিত্যে বলের অভাব?

বাঙ্গালী এখন বুঝিয়াছে, উদরের প্রসর-বৃদ্ধির উপর কাহারও উন্নতি নির্ভর করে না। সাহিত্য উন্নতির পথের দ্বার-স্বরূপ। ইহা বুঝিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যের অনুশীলনে মনোযোগ দিয়াছে। পথে হাটে প্রতিদিন প্রাতে যে সকল মিথ্যা কথার স্তূপ দু এক পয়সায় বিতরিত হয় তাহারা যে বাঙ্গালীকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে ইহা কেহ মনে না করেন। সাহিত্য অর্থে গালিগালাজ বুঝায় না।

অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বঙ্গ সাহিত্যের এই তরুণাবস্থায় এই সকল মিথ্যার স্তূপ আমদানি দেখিয়া তাহার উন্নতির বিষয় হতাশ হইয়া পড়েন। হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। সকল দেশে, সকল সময়ে ভালর সঙ্গে মন্দ মিশ্রিত থাকিবেই, এ মন্দের যে ফল কিছুই নাই এমনো নহে, অন্ধকার আছে বলিয়া আলোকের এত সম্মান; এ মন্দ ভালকে ক্রমশঃ উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া—আপনার অন্ধকারের মধ্যে আপনি মরিয়া থাকিবে।

নবীন আশায় বাঙ্গালী হৃদয় উথলিয়া উঠিয়াছে। এতদিন কার দাসত্বের ভাবের প্রতি তাহার একটা অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে। সে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে চায়—

স্বাধীনভাবে কাজ করিতে চায়। সাহিত্য তাহাকে দিন দিন স্বাধীনচেতা করিয়া তুলিতেছে। আশা হয় বাঙ্গালী একদিন স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারিবে।

পাশ্চাত্য দেশ হইতে বাঙ্গলায় যে একটা বিপ্লবের তরঙ্গ আসিয়াছে তাহার ফল ভাল বই মন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিপ্লব সঙ্কোচের ভাবকে ভাঙ্গিয়া দিয়া আত্ম-নির্ভরের ভাব রাখিয়া যায়। বাঙ্গালী অল্পে অল্পে আত্ম নির্ভর শিখিতেছে—সকল বিষয়ে তাহার য়ুরোপের আর মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে না।

ভবিষ্যতের দূর আশার বাঁশী শুনিয়া আজ বঙ্গদেশ যে নব উৎসাহে ছুটিয়াছে, তাহার গতি রোধ করে কে? তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট দেহে ছুটিতে ছুটিতে সে শত বার পড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে মরিবে না। হৃদয়ের বলে সে জগতের তুচ্ছ আঘাতকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে। দূর ভবিষ্যতের পৃষ্ঠায় তাহার জয়শঙ্খধ্বনি ফুটিয়া উঠিবে—বহু দিন পরে ক্ল্যারিয়নেটের কঠোর স্বরের পরিবর্ত্তে সেই চির সুমধুর পবিত্র শান্ত শঙ্খধ্বনি শুনিয়া পৃথিবী সুখী হইবে। এখন যাহা দূর স্মৃতি মাত্র তখন আবার সেই ঋষিদের গান—সেই স্নিগ্ধ শ্যামল তপোবনের স্নেহ মাখা হোম ধূম—সেই প্রভাত বিহঙ্গের স্বাধীনতাময় ভাব প্রত্যক্ষ করিবে।

সাহিত্যের বলে, হৃদয়ের বলে, ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ বাঙ্গালী পৃথিবীর বুকের উপর বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিবে—সেই জয়-চিহ্নের পাদদেশে বসিয়া ভারত বাঙ্গালীর ভাবে বাঙ্গালীর সুরে বাঙ্গালীর গান গাহিবে—"বন্দে মাতরং"।

শ্রী ব না ঠা।

কবিতা গুচ্ছ।

মহাপ্রাণ।

তরঙ্গ বুকেতে ধরি নদী হয়ে ভেসে যাই
　অনন্তে মিশিতে সদা কত গান গেয়ে,
সুখের নিশ্বাস ফেলি খেলাইয়া সমীরণে
　চলে যাই আপনারে সমাধিতে ছেয়ে।
কত আমি রহে যাই চাঁদের কিরণ মাঝে,
　কত আমি মিশে যাই কোকিলের স্বরে,
বিরহীর গীত মাঝে অনুভূতি-ময় হয়ে
　আমি-রূপী করুণার বেদনা বিচরে।
একা আমি হতে যে রে অনন্তের ঢাকে তনু,
　আমি রবি হীন আঁধা, আমি রবিময়,
আমা হতে পাপ পুণ্য শোক মোহ সুখশান্তি
　জড়িমা জড়তা জ্ঞান চেতনা নিচয়।
প্রলোভন উদ্দীপন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আদি
　একা আমি কত রূপে করি অভিনয়,
এ আমার চরাচরে জানি না কাহার শাপে
　দাঁড়াবার একটুও নাহি স্থান হয়।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

আমি।

দীরঘ স্বপন একি
ভাবিতে বিদরে বুক,
প্রভাতে মিলাবে সব
মিছে এই সুখ দুঃখ,
সাধের ধরণীখানি
চিত্র বই কিছু নয় ?
তুমি আমি জীবমেলা
কলের পুতলীচয় ?
বাসনা, ধারণা, আশা,
বর্ণের যোজনা ছার !
ছায়াবাজী সম খেলা,
জীবন, মরণ-সার ?
তাই যদি সত্য হয়,
বিড়ম্বনা এই প্রাণ,
দর্শন বিজ্ঞান বৃথা,
বৃথা আমি অভিমান !

বসন্তের পাখী।

প্রভাত মলয় বায়
সুধীরে বহিয়ে যায়
সরসে হরষে ভাসে নলিনীর প্রাণ,
কম্পিত হিয়ার পরে
তরুণ আলোক ঝরে
প্রকৃতি হাসিয়া গাহে বসন্তের গান।
স্নিগ্ধ কাননের কোলে
যৌবন গরবে দোলে
নব কিশলয় বেশে শ্যাম তরু রাশি,
গোলাপ মল্লিকা বেলা
ছুলে ছুলে করে খেলা
সুরভি অধরে ভাসে মধুময় হাসি।
পাতার কোলেতে শুয়ে
বুকে তার মাথা থুয়ে
হেথা হোথা উঁকি মারে ছু একটী কলি,
সারাটী কানন জুড়ে
শূন্যে শূন্যে উড়ে উড়ে
কি জানি কুসুম-কাণে কি যে কহে অলি।
মধুময় সুখ সাজে
নূতন বসন্ত রাজে
কেনরে সহসা তুই বসন্তের পাখি ?
অমন আকুল প্রাণে
অমন বিলাপ তানে
শিহরি কানন প্রাণ উঠিলিরে ডাকি ?
বসন্ত উদ্যান লতা
মাঝে কেন দুখ কথা ?
সুখে থেকে পাখি তুমি দুখে কেন ডাকো?
বসন্ত পথিক বেশে
সদা বসন্তের দেশে
নূতন বসন্ত সাথে চিরদিন থাকো !
না যাও শীতের দেশ
না জান দুখের লেশ
সুখের রাজত্বে তব চিরকাল বাস !
চারি পাশে ফুল ফোটে
আকুল সৌরভ ছোটে
তোমারি আজ্ঞায় রহে মলয় বাতাস।
তবে পাখী কেন কেন
বিষাদ সঙ্গীত হেন
না জানি কিসের দুখ ছুঁয়েছে ও প্রাণ
বসন্ত স্বপনে আছে
তাহার প্রাণের কাছে
কেনরে ঢালিস তুই বিলাপের গান ?
বন পথে যেতে যেতে
নবীন প্রেমেতে মেতে
কোন দূর উপবনে বুঝি একদিন ?

একটী কুসুম কলি
এসেছ রাখিয়ে দলি
শুখায়ে হয়েছে বুঝি মাটীতে বিলীন ?
সরল বিশ্বাস ভরে
একদিন তোমা তরে
প্রেমের স্বপনে বালা উঠেছিল ফুটি
প্রবাসী পথিক হা'রে
ছলনা করিয়ে তারে
দুদিনে এসেছ বুঝি হৃদিখানি টুটি !
হৃদয়ে বিষাদ ভার
নয়নে সলিল ধার
কাঁদো কাঁদো মলিন সে মুখখানি তার—
মনে কি পড়েছে আজি
ঘুমন্ত বীণাটী বাজি
উঠেছে কি পাখী তাই হৃদয়ে তোমার ?
সাধ যায় একবার
কাছে বুঝি যেতে তার ?
বসন্তের প্রাণে বুঝি তাই হাহাকার ?
কাঁদো পাখী যত পার
মিটিবে না সাধ আরও
যে ফুল ঝরিয়া যায় ফুটে নাত আর।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

লজ্জাবতী।

নিশীথ ঘুমায় যবে—
স্তব্ধতার-সুখ-কোলে—
কামিনী কানন-বালা
মুখখানি ধীরে খোলে
লজ্জাবতী চুপে চুপে
ভালবেসে হেসে চায়,
কে জানে বোঝে কি চাঁদ ?
নীলাকাশে ভেসে যায়।
তটিনী ঘুমের ঘোরে—
গায় তারে উপহাসি,
কোথা কোন দূর হতে,
বেজে কার উঠে বাঁশি।
শিয়রে তারকা দুটি—
হেসে ঢোলে পড়ে যায়,
মরমে মরম ঢাকি,
সরমে সে ঝরে যায়।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

শান্তামারীয়া।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কোন রূপে দিন কাটিয়া গেল। শান্তার অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইল না। আমি নিতান্ত এই পৃথিবীর জীব। ফিরিয়া আসিতে আসিতে বালিকার মুখের সহিত শান্তার মুখের যে সাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম তা ভুলিয়া গেলাম। পথের দুই ধারে জনতার মধ্যে পড়িয়া, দুই চারিটা গুতা খাইয়া সব ভুলিয়া গেলাম। আর কত নূতন ধরণের লোক, নূতন ধরণের দোকান, জিনিস পত্র দেখে আমার মন হইতে খানিকটার জন্য

সেই বালিকার শাদা মুখখানি একেবারে মুছিয়া গিয়াছিল। আমার আর কিছু মনে পড়ে না, শুদ্ধ মাত্র দুই স্থানে বড় বড় অক্ষরে শান্তামারীয়ার বিজ্ঞাপন দেয়ালে মারা দেখিয়াছিলাম। শান্তার কথা তাহাতেই পুনরায় মনে হইল। দ্রুত পদে রোসনের বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

আমি আসিয়া রোসনকে দেখিতে পাইলাম না। শান্তার শয্যার পার্শ্বে কি একটা যেন পড়িয়া আছে মনে হইল। দেখিলাম যে রোসন লাল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাকে আর নিদ্রা হইতে উঠাইলাম না। আপন মনে সংবাদ পত্র পড়িতে লাগিলাম। বিলাতের টাইম্‌স্ সংবাদ পত্র যে একবার পড়িয়াছে তাহার পক্ষে জগত যে কত বিস্তৃত তাহা অনুমান করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কোথা লণ্ডন সহর, কোথায় ইয়কহামা, কিন্তু সেই নগরের সংবাদ যাহা কিছু, গৃহ দাহ, কি হত্যা, কি রাজার অভিষেক, কি রাজ-কন্যার বিবাহ—সমস্তই টাইম্‌সে পাইবে। ইউরোপের ত কথাই নাই। ভিয়েনাতে কোন নূতন গীতি নাট্য গত রাত্রি অভিনয় হইয়াছে—কে কোন গান গাহিয়াছিল, সে গান শুনিয়া দর্শকেরা কি রূপে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল, সে গান গুলির আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস—সমস্ত কথা পাইবে। পারিসে নূতন পোষাকের ধরণ কিরূপ, তাহার নূতনত্ব কোথা, সে পোষাক কে পরিয়াছিল, তাহা অন্য লোক পরিতে পারে কি না, জানিতে চাও টাইমস্ দেখ। আবার যদি যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধির কথা, ধন, বাণিজ্য, কৃষির বিষয় জানিতে চাও ইউরোপের প্রত্যেক সহরের কোথা কি হইতেছে সবই জানিতে পাইবে। আর ইংলণ্ডের প্রত্যেক গ্রামের সংবাদ, রাজা প্রজার সংবাদ, রাজসভার সংবাদ গত রাত্রে তিনটা পর্য্যন্ত সে বিষয় লইয়া তর্ক হইয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেক কথাটি যদি জানিতে চাও টাইমসে পাইবে। তুমি যদি শিক্ষিত জগতের জীব হও, অন্যের সুখ দুঃখের সহিত তোমার যদি সহানুভূতি থাকে, যদি বিশ্বের অদৃষ্টের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে মনে কর, তাহা হইলে তুমি এই বিপুল জগতের সুখ দুঃখের শান্তি অশান্তির কথা পড়িয়া মনে করিবে না, যে সময় নষ্ট হইতেছে। টাইমস এই বিপুল বিশ্বের মানচিত্র স্বরূপ। যেখানে যাহা মহান ও বিপুল কিছু আছে, যেখানে যাহার অভাব, ক্লেদ কি গ্লানি আছে—হইতে পারে তাহার চিত্র কোন সংবাদ পত্রেই সম্ভব নহে,—কিন্তু তাহার খানিকটা আভাস টাইমস্ সংবাদ পত্রে পাইবে।

আমি টাইমস্ পড়িতেছি এমন সময় দাসী আসিয়া বলিল ডাক্তার আসিয়াছেন। ডাক্তার শান্তার হাত দেখিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন। আমার আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না কেন তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। আমি স্থির চক্ষে শান্তার মুখখানি একবার দেখিলাম। সেই বালিকার মুখ মনে পড়িল। শান্তার চোখের রঙ কি দেখি নাই। কিন্তু তাহার চোখের পাতার নীলিমা এ জগতের কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না।

দূর আকাশের কোণে বাষ্প দিয়া আবৃত নীলের যেমন মলিন একটু ভাব আছে, সমুদ্রের নীল জলের উপর চন্দ্রের আলো পড়িলে স্থানে স্থানে যেমন অপার্থিব একরকম আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আধখানা যেমন ছায়া, আর আধখানা যেমন অস্ফুট কিন্তু নীল, শান্তার চোখের পাতায় সেই আকাশের কোণের, সেই জ্যোৎস্না স্নাত সমুদ্রের নীলের ছায়া। শান্তার এখনও জ্ঞান হয় নাই। তাহার চুল যেমন আলু থালু ছিল সেইরূপ বিছাইয়া আছে। তাহার অধরের কোণে জীবনের ভাতি তেমনই লুকাইয়া আছে। তাহার নিশ্বাস সন্ধ্যার কুসুমকলিকার নিশ্বাসের ন্যায়। যৌবনের সৌন্দর্য্য বর্ষার জলের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতে পড়িতে কিসের বাধা যেন আর অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহার বিষণ্ণ মলিন মুখখানির উপর মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে তবু তাহার নীচ হইতে জীবনের, যৌবনের আলোক ভাসিয়া উঠিয়াছে—নিদ্রিতের স্বপ্নের মত। শান্তার শরীরের খানিকটা খানিকটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। তাহার অস্পষ্ট ভাব কত মধুর। নিদ্রাকাতর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশ্রাম কত সুন্দর, নদী যেন ঢলিয়া পড়িয়াছে, পল্লব যেন লতাইয়া আছে—তাহা দেখিতে দেখিতে বনভূমি, নদী স্রোতের কথা মনে পড়ে। যৌবনের স্বপ্নময় শান্তার শরীর দেখিতে দেখিতে আমারও চোখে জল আসিল। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে বালিকার মুখখানি যেন চোখের উপর ভাসিতেছে বোধ হইল।

ডাক্তার আমার নিকট আসিয়া বলিলেন "শান্তার জীবনের কোন আশা নাই, তবে যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ আশা। হইতে পারে যে জ্ঞান হইবে। তখন সাবধানে চিকিৎসা করিলে বালিকা সারিতে পারে। আমি ও বেলা আবার আসিব। কেহ যেন শান্তার ঘুম ভাঙায় না।" তিনি চলিয়া গেলেন। আমি আবার টাইমস্ সংবাদ পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ফ্রান্স ও জারমানীর মধ্যে দিন দিন অধিক গোল বাধিয়া উঠিতেছে বলিয়া সমস্ত ইউরোপ যুদ্ধ সজ্জায় ব্যস্ত। এমন অনেক কথা পড়িতে পড়িতে এক কোণে দেখিলাম গত রাত্রি যে কয়েকটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহারই বিবরণ। "মৃত বালিকা দেহ। বয়স আন্দাজ মাস কতক, মুখ ও চুল দেখিলে মনে হয় কোন ইতালীয়ানের কন্যা, কাল টেমস্ নদীতে পাওয়া গিয়াছে। শরীরে এখন কিছুই নাই যাহার দ্বারা জানা যায় তাহার পিতা মাতা কে। তবে বাম হস্তের উপর একটি কথা ও সন লেখা আছে। তাহারই সাহায্যে কিছু জানা যাইতে পারে। পুলিসে যত্ন সহকারে তদন্ত করিতেছে।" তাহার নীচেই আবার একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম। "অনাথা, গৃহে প্রত্যাগমন কর। সব বিস্মৃত হও, মাপ কর। আমার জন্যেও যদি না হয় তবে আমাদিগের কন্যাটির জন্য ফিরিয়া আইস। সে পিতার স্নেহ পাইবে। জানি আমার পাপ অনেক, জানি আমি তোমার অনুপযুক্ত কিন্তু আমার গৃহ তোমারই আর আমাদিগের কন্যার! অনাথা, গৃহে প্রত্যাগমন ক'র সব বিস্মৃত হও।"

পড়িতে পড়িতে ভাবিলাম এ কোন আর্ত্ত প্রাণের কথা। কে এত কাতর ভাবে স্ত্রীকে গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছে। তাহার এমন কি পাপ যে স্ত্রীর গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়। অনাথ হইয়া নির্ম্মম লণ্ডনে অনাহারে দিন কাটাইতে তাহার ভয় হয় না। জগতে কতই শোক আছে, কতই লুকান ক্লেদ আছে, আমরা তাহার আভাস মাত্র পাই না। পাপ পুণ্যের জগত। সেই জগতের নিতান্ত অঞ্চল স্পর্শ করিয়া কত সময় আমরা ভাবি যে তাহার ইতিহাস সবই জানি। সংসার তোমাকে আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তাহা যদি না বলিতে চাও, সংসারের যে নিয়তি তুমি আমি ভালবাসি আর নাই বাসি সে নিয়তির অধীন। ক্ষুদ্র গৃহের কোণে লুকাইয়া সেই নিয়তি হইতে নিষ্কৃতি পাই না। কাতর প্রাণের কাতর কথা কত ভাবে আমাদিগের নিকট পঁহুছে। জাগ্রতে দুঃস্বপ্নের মত, নিদ্রায় রাত্রির নিশ্বাসের মত, সূর্য্য শূন্য আকাশের তারকার নিভু নিভু আলোকের মত—আঁধার দেখাইয়া দেয়। শোক যাহাকে যেমন ভাবে স্পর্শ করিয়াছে তাহার শরীর মন সেই পরিমাণে পবিত্র হইয়াছে। অগ্নিদগ্ধপ্রাণ সুবর্ণের মত অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য নিষ্কলঙ্ক থাকে। শোকই এই জগতের শিক্ষা। সুখ অন্য জগতের ছায়া, অন্য জীবনের স্বপ্ন। সদ্য প্রসূত শিশু দেখিয়া কাহার এত আনন্দ হইয়াছে যে সে এ জগৎ বিস্মৃত হইয়া পূর্ণ পবিত্র জীবন, পূর্ণ শুভ্র গ্লানিশূন্য প্রাণ পাইয়াছে, মনে করিয়াছে। মার কোলে নবজাত শিশু অতি সুন্দর চিত্র। কিন্তু সে চিত্রে জগতের মায়া আছে। জীবনের অমল আরম্ভ সেই স্নেহ মমতায় লুকাইয়া যায়। আর ভালবাসা, শিশুর হাসি, আমাদিগকে এই জগতই মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু সদ্য মৃত দেহ দেখিয়া এমন কোন পাপী আছে, এমন কোন নাস্তিক আছে যে মুহূর্ত্তের জন্য সব ভুলিয়া যায় নাই, এই জীবন, এই পৃথিবী, গৃহ পরিবার সব বিস্মৃত হয় নাই। আর কাহার হৃদয়ে পাণ্ডু জীবনশূন্য মুখের ছবি থাকিয়া যায় না। সদ্যজাত শিশু দেখিলে জগত মনে পড়ে, কিন্তু মরণের সম্মুখে অন্য জগত বিস্তৃত।

শান্তা জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। বালিকার মরা মুখখানি এখনও ভুলিতে পারি নাই। আর সংবাদ পত্রে কাতর প্রাণের কাহিনী এই মাত্র পড়িয়াছি। আমার পক্ষেও যেন উপস্থিত সব বিলুপ্ত হইয়া গেল। আমিও কি জানি কি ভাবিতে লাগিলাম।

হঠাৎ নিস্তব্ধ গৃহে কাহার কণ্ঠ? আকাশ হইতে যেন তাহা ভাসিয়া আসিতেছে বোধ হইল। অর্দ্ধ উচ্চারিত, অর্দ্ধ নিশ্বাসমাখা কথা গুলি কাহার? আমি প্রথমে আকাশের দিকে কেন তাকাইলাম তাহা বলিতে চাহি না। লোকে আমাকে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী বলিতে পারে, এই ভয়। আকাশে আবার কি দেখিব? কিছুই দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু চক্ষু নামাইতে নামাইতে যে চিত্র দেখিলাম তাহা সহজে ভুলিব না।

শান্তার পার্শ্বে রোসন হৃদয় ঢালিয়া যেন তাহার স্ফুরিত অধর হইতে অস্পষ্ট যে শব্দ বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল তাহাই বুঝিবার জন্য, শুনিবার জন্য লালায়িত।

শান্তার চক্ষু এখনও নিদ্রাচ্ছন্ন। কিন্তু তাহার সুন্দর দেবী মুখখানিতে দেবভূমির আলোক হাসিয়া উঠিয়াছে। সুন্দর কেশ রাশি, হেম মুকুটের মত শোভা পাইতেছে। আলু থালু কেশ এখানে ওখানে হেম রশ্মির মত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। রোসনের কণ্ঠে বক্ষের উপর দুই একটি কেশ সুবর্ণ উপবীতের মত দেখাইতেছে। শান্তার দক্ষিণ হস্ত তাহার কেশ রাশির উপর লতাইয়া পড়িয়াছে। সে চিত্র যে একবার দেখিয়াছে সে কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

শান্তা কি বলিতে ছিল, কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। রোসন নিস্পন্দ হইয়া তাহার মুখের ভাব হইতে তাহা বুঝিবার যেন চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ শান্তা একবার রোসনের দিকে তাকাইয়া,—সে দৃষ্টি এ জগতের নহে, সে দৃষ্টি তোমার আমার জন্য নহে—অচকিত নেত্রে তাহার মুখ দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিল—"দেবতা দেবতা—তোমার ক্রোড়ে আমাকে লও'।

হেঁয়ালিনাট্য। *

বৈকুণ্ঠ, তস্য পুত্র খগেশ এবং অন্যান্য পাঁচজন।

বৈ। আমার ছেলের কি বুদ্ধি! প্রায় আমারই মত। যখন তর্ক করে মুখের কাছে দাঁড়ান যায় না! বাবা খগেশ, অনেক লোক উপস্থিত আছেন, এইখেনে একবার তর্ক কর্ত্তে আরম্ভ কর দেখি!

অন্য পাঁচজন। (মনে মনে) তা হলে পালাতে হয় বুঝি!

খগেশ। আচ্ছা রাজি আছি। এখন কাকে ওড়াতে হবে কাকে রাখতে হবে বলে দাও!

অন্য পাঁচ জন। (মনে মনে) আপনাকে আর বাবাকে রেখে বাকি সকলকে উড়িয়ে দাও!

বৈ। বাবা, যেটা হাতের কাছে পাও সেইটেই ওড়াও। ইহকাল ওড়াও, পরকাল ওড়াও।

খ। তা হলে রোস বাবা, আগে dinnerটা খেয়ে নেওয়া যাক্, তার পরে খেয়ে দেয়ে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে রয়ে-বসে চুরট টান্‌তে টান্‌তে চুরটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আরামে উড়িয়ে দেব, যারা যারা উপস্থিত থাকবে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

বৈ। That's right খগেশ! আপনারা সকলেই দেখ্‌চেন, আমার খগেশ কেমন sensible। ওর মাথায় কোন রকম nonsense নেই। যেটা real এবং immediate

* গত বারের হেঁয়ালি নাট্টের উত্তর "আমার"। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

want তার প্রতি ওর প্রথম নজর—তার পরে সেটা satisfied হলে পরে কাগজের চুরটের মত জগতের ডগায় তর্কের দেশলাই ধরিয়ে ওটাকে quietly বসে বসে ধোঁয়া করেই ওড়াও বা ছাই করেই ফেল তাতে আরাম বই কারো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

খ। হাঃ হাঃ হাঃ, বাবা has put the matter very well indeed. আমি দেখেছি বাবা যেমন clearly and with great precision একটা proposition lay down কর্ত্তে পারেন, এমন there are very few men who—

বৈ। সে আর তোমার বলবার দরকার নেই। I know that. আর কিছু না, এর secret হচ্চে clear head এবং proper training। আমাদের দেশের লোকের ঐ দুটো জিনিষেরই বিশেষ অভাব and in consequence none of them has the least idea how to think out a subject.

খ। And I must confess তুমি আমার বাবা হওয়াতে আমার ঐ এক মস্ত advantage হয়েছে, certainly I possess a clear head, আর তার জন্যে আমি তোমার কাছে really grateful আছি বাবা।

অন্য পাঁচজন। বাপ-বেটার কি বিনয়।

খ। Nonsense! বিনয়! আচ্ছা এস এই বিষয়ে একটা settle করা যাক্! I don't believe in বিনয়। It must be either hypocrisy or ignorance, যারা really clever they know they are clever and why should they not make it known to other people! Now come বিনয় কাকে বলে, let us have a definition of it.

অন্য পাঁচজন। (মাথা চাপ্‌ড়াইয়া) Clear head নেই। খগেশ বাবু, তোমার বাবার মত বাবা আমাদের ছিল না। বিনয়ের definition আমাদের ঠাহর হচ্চে না!

বৈকুণ্ঠ। ওহে ও যজ্ঞেশ্বর, শুনে যাও শুনে যাও, আমার ছেলে খগেশ এদিকে তর্ক কর্ত্তে আরম্ভ করেছে—It's a treat to hear him argue। (খগেশের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া) Go on খগেশ।

যা। আজ আমাদের ওখেনে খেতে গেলে না যে!

খগেশ। (হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) Now come কেন খেতে যাব!

যজ্ঞে। কথা ছিল যে।

খ। কি কথা ছিল ভাল করে analyze করে দেখা যাক্। তুমি আমাকে বল্লে খগি কাল আমাদের বাড়ি খেতে যাবে কি? আমি বল্লুম "হাঁ" ভেবে দেখ it was no promise। তুমি simply একটি fact জান্‌তে চেয়েছিলে, এবং তখন যেটা likely answer বোধহল সেইটে তোমাকে বল্লুম। মনে কর if you had asked me খগি, কাল তুমি কি কালো মোজা পরবে, and if I happened to have answered হাঁ,

এবং আজ যদি আমি কালো মোজা না পরতুম, what then ! কিন্তু তুমি যদি বল্‌তে—

যজ্ঞে। বুঝেছি খগেশ, আর কাজ নেই।

খ। কাজ আছে। তুমি না কি হঠাৎ এসে একটা wrong statement করে সকলের মনে একটা vague impression create করে দিয়েছ যে আমি আমার promise রাখিনে তারি absurdity আমি প্রমাণ করে দিতে চাই ! Now to the point—তুমি আমাকে next question জিজ্ঞাসা করলে "কখন্ আস্‌বে ?" আমি বল্লুম "তা বল্‌তে পারিনে আমি ঘড়ি ধ'রে কাজ করিনে।" তুমি একটা further question জিজ্ঞাসা করলে আমি তার এক indefinite উত্তর দিলুম—and the last question was "তুমি কি খাবে ? মাংস না ডাল ভাত ?" আমি বল্লুম "যা পাব তাই খাব।" there it ended, এর থেকে কি কি প্রমাণ হচ্চে দেখা যাক্—

যজ্ঞে। রক্ষে কর বাপু আমার বাড়িতে যে তোমার পা পড়েনি সে আমার পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।

অন্য পাঁচ জন। পা পড়েনি বলচেন কি, মাথা পড়েনি বলুন—আপনার নেমন্তন্নের মধ্যে যদি ওঁর clear headটা হঠাৎ গিয়ে পড়ত সে ত কামানের গোলা পড়ত, আপনার বন্ধু বান্ধবেরা সশঙ্কিত হয়ে উঠত। clear head অতি ভয়ানক জিনিষ ! বিশেষ, সভাস্থলে।

যজ্ঞে। তা ঠিক বলেছেন।

বৈ। (পিঠ থাব্‌ড়াইয়া) তুমি বলে যাও না খগেশ। থাম্‌লে কেন। বেশ বল্‌ছিলে।

খ। যার এক পাতা logic পড়া আছে সে কখনো deny কর্ত্তে পার্ব্বে না যে—

য। তোমার যা বল্‌বার বল আমরা চল্লুম।

বৈ। কেন কেন ?

যজ্ঞে। ভদ্র সমাজে নিমন্ত্রণে বা বন্ধুবান্ধবের সভায় ভদ্রলোকেরা গল্প সল্প করে আমোদ করে, আলোচনা করে, কিন্তু পারতপক্ষে তর্ক করে না। যারা কথায় কথায় তর্ক উঁচিয়ে খেঁকিয়ে আসে, তাদের এক রকম সঙ্কীর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাক্‌তে পারে বটে কিন্তু তারা ভদ্র নয়।

বৈ। কিন্তু ideaর precision—

খ। Perceptionএর clearness,

বৈ। Exepressionএর luminous lucidity.

খ। The sense of utter futility of all fog and fallacy—

যজ্ঞে। ও সবই থাক্‌তে পারে কিন্তু তাই বলে তার্কিকতা নামক তীক্ষ্ণ ও নর্ত্তনশীল জিহ্বাগ্রভাগ সগর্ব্বে সকলকে প্রদর্শন করবার জন্যে সর্ব্বদা বের করে উঁচিয়ে রেখে দিতে হবে ভদ্রসমাজে তার কোন আবশ্যক নেই।

খ। "ভদ্রসমাজের" definition কি?

বৈ। And what is "তর্ক।"

খ। জিহ্বাই বা কি? Where is the analogy?

বৈ। এবং "আবশ্যক" কাকে বলে?

খ। তোমার idea of "সর্ব্বদা"ই বা কি রকম!

সকলে। আর এক দণ্ড এখানে থাকা নয়।

খ। দেখেছ বাবা, একটা proposition-এর মধ্যে string of inaccuracies!

বৈ। Want of precision and proper training!

এসেছি ভুলে।

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে!
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে!
দেখি ও নয়নে নিমেষের তরে
সে দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখি পাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে!
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙ্গায়ো না
এসেছি ভুলে!

বেল কুঁড়ি দুটি করে ফুটি ফুটি
অধর-খোলা।
মনে পড়ে গেল সেকালের সেই
কুসুম তোলা!
সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়া বেড়ায়,
ঊষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তার
গগন মূলে;
সে দিন যে গেছে ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে!

ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে!
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে!
শুধু মনে পড়ে হাসি মুখখানি,
শুধু লাজে-ঢাকা সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই প্রেমের উছাস
নয়ন কূলে!
তুমি ভুলেছ যে ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে!

কাননের ফুল, এরা ত ভোলে নি,
আমরা ভুলি?
সেই ত ফুটেছে পাতায় পাতায়
কামিনী গুলি!
চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণ-কিরণ কোমল করিয়া,

বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে?
কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে!

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি!
দখিনে বাতাসে কেহ নাই পাশে
সাথের সাথী!
চারিদিক হতে বাঁশি শোনা যাবে,
গভীর নিশীথে কারা গান গাবে;
আকুল বাতাসে মদির সুবাসে
বিকচ ফুলে,
তখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ
আসিলে ভুলে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিথাগোরস।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে একটী কথা চলিত আছে যে, "সূর্য্যালোকের ন্যায় জ্ঞানালোকের উদয়ও পূর্ব্বদিক হইতে"। পূর্ব্বদেশ আসিয়া হইতে সর্ব্বাগ্রে ইয়ুরোপের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত গ্রীসদেশে এবং গ্রীস হইতে পরে যে ইউরোপে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন, সেই কারণেই এই কথাটীর উৎপত্তি। গ্রীকেরা যে তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জাতির অনেক পূর্ব্বে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত হইয়াছিল তাহার একটি কারণ গ্রীস নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ। ইয়ুরোপের উত্তর প্রান্তবাসীদিগের ন্যায় এক পক্ষে গ্রীকদিগের দারুণ শীতের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন রক্ষা করিতেই শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যাইত না, অথবা অপর পক্ষে দক্ষিণ আসিয়াবাসীর ন্যায় রৌদ্রতাপে পীড়িত থাকিয়া তাহাদিগের মস্তিষ্ক তেজোহীন হইয়াও পড়িত না। এই উভয় প্রকার দুরবস্থা-বিমুক্ত গ্রীকগণ ক্রমে ক্রমে ইয়ুরোপের মধ্যে প্রধান বলবিক্রমশালী জাতি হইয়া উঠে, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি-সহকারে দূরে দূরে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। গ্রীস ও আসিয়া মাইনারের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ তাহাদের বসতিতে আবৃত হয়। ইহাতেও তাহাদের ধন পিপাসা নিবৃত্ত না হওয়ায় তাহারা বাণিজ্যার্থে ইজিপ্টাদি দূরদেশে গমন করিতে আরম্ভ করে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষেও আসিয়াছিল। মিলিটস দ্বীপবাসী হেকটাইয়সের লিখিত গ্রন্থে ভারতবর্ষের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। হেকটাইয়স খৃষ্ট পূর্ব্ব ছয় শতাব্দীর লোক মাত্র, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও যে গ্রীকগণ ভারতবর্ষের কথা জানিত তাহার অন্য প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি পুরাতন গ্রীক কবি হোমরের লেখাতেও ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের উল্লেখ দেখা যায়, এবং এই সকল দ্রব্যের সংস্কৃত নাম—কোন কোন স্থলে তাহার অপভ্রংশ শব্দ তাহা-

দিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। সুতরাং গ্রীক বণিকগণের মধ্যে কেহ কেহ অতি পুরাকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

সকলদেশেই ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বৃদ্ধি লাভ করে। গ্রীকগণের ধনসম্পত্তি যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যা চর্চ্চার প্রতি অনুরাগও ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল। গ্রীকবণিকগণ অর্থ লাভের আশায় অর্ণবপোতে ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশে যাইত, ক্রমে গ্রীকবিদ্যার্থীগণও জ্ঞানলাভের আশায় ঐ সকল দেশে যাইতে আরম্ভ করিলেন। গ্রীকদের মধ্যে অক্ষয় কীর্ত্তি থেলিসই প্রথম জ্ঞানাপোর্জ্জন উদ্দেশে বিদেশ যাত্রা করেন। আসিয়া মাইনরের উপকূলে আইয়োনিয়-দ্বীপপুঞ্জ গ্রীক উপনিবেশ ছিল, এই দ্বীপ বক্ষঃস্থিত মিলিটস নামক নগরে খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার জন্ম হয়। গ্রীক পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই মহাত্মাই সর্ব্ব প্রথমে মিশর দেশে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করেন এবং তিনি সে দেশ হইতে যে জ্ঞানদীপ আনিয়া স্বদেশে প্রজ্জ্বালিত করেন তাঁহার পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ তাহার আলোকেই দীপ্তিমান হইয়াছিলেন মাত্র, কেহই তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে খৃষ্ট শতাব্দীর প্রায় পাঁচ শত সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আইয়োনিয়-দিগের অধিকৃত সামোদ্বীপে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। ইনি বিদ্যা বুদ্ধিতে থেলিসকেও ছাড়াইয়া উঠেন। ইনিই গ্রীক মনীষীকুলের তিলক স্বরূপ জগদ্বিখ্যাত পিথাগোরস। পিথাগোরসের নাম কে না শুনিয়াছেন? দর্শন গণিতে যিনি সে সময় ইয়োরপের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, কোপর্নিকস কর্ত্তৃক আধুনিক সময়ে আবিষ্কৃত সৌর জগতের আবর্ত্তন প্রণালী যাঁহা কতৃক ইয়োরপে প্রথম প্রচারিত, সঙ্গীত শাস্ত্রকে যিনি প্রথমে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন, যিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া স্বদেশ পূজ্য ছিলেন, তাঁহার নাম অতি অল্প লোকের নিকটেই নূতন বলিয়া মনে হইবে। এই জ্ঞানীবরের জীবনাখ্যায়িকা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এ স্থলে আমরা আর একটী কথা বলিয়া লই। গ্রীকদিগের অনেক পূর্ব্বে মিশর, পারস্য, ভারতবর্ষ সভ্য হয়; কিন্তু এই সকল দেশ তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়া আবার অল্পে অল্পে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রীকগণ ঐ সকলজাতির জ্ঞান ও তাহার রত্ন সমূহ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে যে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া গিয়াছেন—তাহাই ক্রমশঃ দীপ্তিমান হইয়া সমস্ত ইয়োরপ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

পিথাগোরসের পিতা নিসারকস দেশের মধ্যে একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও ধনীব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং পিথাগোরস বাল্যকাল হইতেই উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পটুতা লাভ করেন এবং শারীরিক বল ও ব্যায়ামনিপুণতার জন্য সাধারণে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮ বৎসর বয়সের সময় তিনি গ্রীসের 'অলিম্পিক ক্রীড়া' নামক বিখ্যাত

প্রদর্শনীতে জয় মাল্য প্রাপ্ত হয়েন। ইহাতে জয় মাল্য পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যে গ্রীকদের চক্ষে কত দূর গৌরবের বিষয় তাহা বোধ করি একজন গ্রীক ভিন্ন কেহই ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। ইহার উৎপত্তি যে প্রথম কি প্রকারে হয় তাহা এখন বলা যায় না; তবে লোকের বিশ্বাস যে আগিয়সকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যুদ্ধদেবতা জুপিটারের সম্মানার্থে ১২২২ পূর্ব্বে খৃষ্টাব্দে হারকিউলস ইহার প্রথম সৃষ্টি করেন। ইহাতে নানা প্রকার ব্যায়াম ক্রীড়া ও কাব্য সাহিত্য চিত্র প্রভৃতির প্রদর্শন হইত। পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী উভয়েরই এখানে অনেক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইত। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা আর এখানে উল্লেখ করিলাম না। প্রথম একদিনেই খেলা সমাপন হইত কিন্তু শেষে ৫ দিন করিয়া ক্রীড়ার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই খেলার পুরস্কার একগাছি অলিভ পত্রের মালা মাত্র—কিন্তু এই মালার জন্য সমুদয় গ্রীক যুবকগণ আকাঙ্ক্ষী। সমুদয় প্রধান গ্রীকগণ এই খেলা দেখিতে সমবেত হইতেন, শত শত পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে কেবল একজন মাত্র পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। যে এ মালা লাভ করিতে পারিত তাহার সম্মানের সীমা নাই। তাহার পুর প্রবেশের নিমিত্ত নূতন দ্বার রচিত হইত। ক্রীড়া সমাপন হইলে মাল্য ভূষিত বীর চতুরশ্ব রথে নগর পরিবেষ্টন করিয়া এই নূতন দ্বার দিয়া নিজাবাসে গমন করিতেন। চারিদিক হইতে তাঁহার প্রশংসা ধ্বনি উত্থিত হইত। সেই দিন হইতে তিনি গ্রীকদের মধ্যে একজন মহা পূজ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

এই জয় মাল্য লাভ করিবার পর পিথাগোরসের নাম গ্রীসে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইহার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি অধ্যয়নে মগ্ন ছিলেন। আনাক্সিমাণ্ডর-বাসী থেলিস ও সাইরো-নিবাসী ফেরিকেডস নামক পণ্ডিত দ্বয় এই সময় পিথাগোরসের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই অধ্যয়নের গুণে পিথাগোরস শীঘ্রই গ্রীসের এক জন প্রধান বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইলেন। কিন্তু এ বিদ্যা দ্বারা তাঁহার জ্ঞান পিপাসা মিটিল না; জ্ঞানলাভার্থে পিথাগোরস বিদেশ যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট, ক্যালডিয়া প্রভৃতি নানা দেশে ভ্রমণ করেন, অবশেষে ইজিপ্টে অধিক দিন বাস করিয়া এবং ইজিপ্টের পুরোহিতদের প্রিয় শিষ্য হইয়া তাঁহাদের নিকট নানা বিষয় বিশেষ জ্যামিতি শাস্ত্র শিক্ষা করেন। এই পুরোহিতেরা ইজিপ্টের এক রকম গুপ্ত সম্প্রদায় বিশেষ ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেক গুপ্ত রহস্য ছিল। তাঁহাদের গুপ্ত রহস্যে দীক্ষিত পিথাগোরস স্বদেশে আসিয়াও তাঁহাদের অনুরূপ পরিচ্ছদাদি ধারণ এবং নিরামিষ ভোজন করিতেন। ইজিপ্টে জ্যামিতি শিক্ষা করা ভিন্ন পিথাগোরস কাল্ডিয়দের নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যা ফিনিসীয়দের নিকট অঙ্ক শাস্ত্র এবং ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রবাসে যাপন করিয়া অবশেষে নানা বিদ্যা পারদর্শী পিথাগোরস স্বদেশ সামো দ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু অধিক দিন

তথায় বাস করিতে পারিলেন না। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অত্যাচারী পোলিক্রেটস এই সময়ে সামো দ্বীপের অধিপতি ছিলেন, পোলিক্রেটসের অত্যাচারে পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপ এমন কি সুদূর ইজিপ্টদেশ পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং ভাগ্যদেবী পোলিক্রেটসের সহায় ছিলেন সুতরাং কেহই তাঁহার অত্যাচারে বাধা প্রদান করিতে পারিত না। তাঁহার সৌভাগ্য সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। কথিত আছে ইজিপ্টরাজ আমাসিস একদিন তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহার এত অধিক সুখ সম্পদ হইয়াছে যে নিজ ইচ্ছায় ইহার কিছু তাঁহার পরিত্যাগ করা উচিত, নহিলে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। পোলিক্রেটস সেই কথা অনুসারে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও সর্ব্বাপেক্ষা বহু মূল্য একখানি রত্ন সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। ইহার ৩।৪ দিন পরে পোলিক্রেটস একটী মৎস্য উপহার পাইলেন এবং সেই মৎস্যের গর্ভে তাঁহার অমূল্য মণিও পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। পিথাগোরস নিজে পোলিক্রেটসের প্রিয়পাত্র ছিলেন কিন্তু তিনি এরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধ ও ন্যায়-সঙ্গত-স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন সুতরাং নীরবে এ অত্যাচার দর্শন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইল। সেই জন্য তিনি সামো পরিত্যাগ করিয়া গ্রীসে গমন করিলেন। সেখানে তিনি দ্বিতীয়বার অলিম্পিক খেলায় জয় মাল্য অর্জ্জন করিলেন। লোকেরা মহা সন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহাকে সোফিষ্ট বা জ্ঞানী উপাধি প্রদান করিল। কিন্তু পিথাগোরস তাহা গ্রহণ করিলেন না, তিনি নিজেকে ফিলজফার বা জ্ঞানের বন্ধু বলিয়া পরিচিত করিলেন। এই স্থান হইতে তিনি ইলিস ও স্পার্টা নগর দর্শনার্থে গমন করেন উক্ত নগরদ্বয় দর্শনের পর মাগনা গ্রীসীয়া যাইয়া প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে ক্রোটনা নগরে আপন বাসস্থান স্থাপন করিলেন।

পিথাগোরস যে সময় ক্রোটনায় গমন করেন ক্রোটনা তখন একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর বলিয়া খ্যাত ছিল কিন্তু নগরবাসীগণ বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরতায় ঘোরতর নিমগ্ন ছিল। পিথাগোরস তাহাদিগকে সংশোধিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার অনুপম-শ্রী-সৌন্দর্য্য, দেবোপম কান্তি ও জ্বলন্ত বাগ্মীতাতে অনেককে বশ করিয়া আনিলেন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতাতেই দুই হাজার লোক তাঁহার অনুগামী হইল। ক্রমে সমুদয় নগরবাসীগণ পাপ পথ ত্যাগ করিয়া তাঁহার দর্শিত ধর্ম্ম পথ অনুসরণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা কলহ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান চর্চ্চায় কালক্ষেপ করিতে সচেষ্ট হইল। যুবকেরা পাপ কার্য্য মন্দ কার্য্য ত্যাগ করিয়া শিক্ষায় মন দিল। পিথাগোরসের স্ত্রী ও কন্যাকে শীর্ষ স্থানীয় আসন প্রদান করিয়া মহিলারা সাজ সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নানা প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানে সময় যাপন করিতে লাগিল। এই সময়ে ক্রোটনায় পিথাগোরস একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ৩০০ জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক তাঁহার শিষ্য হইল।

পিথাগোরস ছাত্রদিগকে পুরাতন প্রথা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে শিক্ষা দিতেন।

প্রথমেই তিনি ছাত্রদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন না, যাহার স্বভাবে যে দোষ অধিক বলবৎ প্রথমে তাহাই শুধরাইবার চেষ্টা করিতেন। যে অত্যন্ত বাকপ্রিয় ৫ বৎসরের আগে পিথাগোরসের সম্মুখে সে কথা কহিতে পারিত না, যে অত্যন্ত তর্কপ্রিয় ৩ বৎসরের আগে সে পিথাগোরসের কোন মত সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না; এই রূপে তিনি দোষ শুধরাইয়া লইয়া তবে শিক্ষা প্রদান করিতেন, এবং দোষ সংশোধনের এই সময়টা আলস্যের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে ব্যয়াম শিক্ষায় নিযুক্ত রাখিতেন। রাজনীতি ধর্ম্মনীতি বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই চারি বিষয়েই পিথাগোরস শিক্ষা দিতেন। ছাত্রেরা যাহাতে কোন অন্যায় কর্ম্ম না করে নিষ্পাপ পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করে সে বিষয়ে পিথাগোরসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং ছাত্রেরাও বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ পালনকরিয়া চলিত। পিথাগোরস তাঁহার ছাত্রদিগকে আজকাল ফ্রি-মেশন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায় কতকগুলি গুপ্ত চিহ্ন ও গুপ্ত লেখা শিখাইতেন তাহা দ্বারা তাঁহার ছাত্রগণ পরস্পরের অপরিচিত হইলেও সকলকে সকলে চিনিয়া লইতে পারিত এবং অন্যের অবোধগম্য রূপে আপনাদের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিত। ক্রমে ইটালীর অন্তঃপাতী অন্যান্য নগরেও এই বিদ্যালয়ের কতকগুলি শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। পিথাগোরস সকল গুলিরই নেতা ছিলেন। এবং ছাত্রেরা সকলেই পিথাগোরসকে দেবতায় ন্যায় ভক্তি করিত। এই ছাত্রবৃন্দের সাহায্যে ক্রমে ক্রোটনা এবং ইটালী ও সিসিলস্থ অন্যান্য নগর যথা সাইবেরিস, মেটাপণ্টম রেগিয়ন, কাটনা, হিমেরা প্রভৃতি নগরে তাঁহার অদ্বিতীয় আধিপত্য স্থাপিত হইল। ইহাদের অধিপতিগণ গর্ব্বের সহিত আপনাদিগকে পিথাগোরসের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শে চালিত হইতেন। তাঁহার ছাত্রেরা সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়, তাহাদিগের হস্তে প্রভূত রাজ ক্ষমতা, সুতরাং রাজনীতি বিষয়ক কর্ম্মেও পিথাগোরস আধিপত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই আধিপত্যই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। ইহার অনেক দিন পরে সক্রেটিসের সময় ক্রিটিয়াস এবং আলকিবিডাসের সহিত সক্রেটিসের রাজনৈতিক যোগ আছে এই মিথ্যা বিশ্বাসে লোকেরা সক্রেটিসের কত ক্ষতি করিয়াছিল সুতরাং রাজনৈতিক বিষয়ে এইরূপ প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করিয়া যে পিথাগোরসের সর্ব্বনাশ হইল তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কাইলন ও নিলন নামক পিথাগোরসের দুই জন শত্রু ছিল। ইহারা তাঁহার শিষ্য হইবার ইচ্ছা করে কিন্তু তাহাদের স্বভাব মন্দ বলিয়া পিথাগোরস তাহাদিগকে গ্রহণ না করায় তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিথাগোরস প্রজাদের উপর অত্যাচার বা তাহাদের স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেন না কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অযথা স্বাধীনতা প্রদান করাও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী ছিল না। এই সময় হিতাহিত শূন্য প্রজাগণ এইরূপ অযথা স্বাধীনতা

লাভে অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল প্রজাতন্ত্র স্থাপন ও বিপ্লব সাধনে উদ্যত হয়, পিথাগোরস তাহাদের সে উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট বাধা প্রদান করেন। সেই জন্য সাধারণ লোকেরা তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। সময় বুঝিয়া কাইলন ও নিলন সাধারণের এই ক্রোধাগ্নিতে ঘৃত ঢালিতে লাগিল। নানা উপায়ে তাহাদিগকে পিথাগোরসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এই জনসাধারণ পিথাগোরসের শিক্ষায় বঞ্চিত হইত, কেন না বিনা নির্ব্বাচনে তিনি কাহাকেও তাঁহার ছাত্র করিতেন না, অথচ রাজনীতি বিষয়ে ইহাদের একটা মতামত ছিল সুতরাং সহজেই কাইলন ও নিলন তাহাদিগকে স্বকর্ম্ম সাধনের উপযোগী করিয়া লইল। এক দিন পিথাগোরসের ছাত্রগণ কোন বিশেষ কারণে সভা করিয়া একত্রিত হইয়াছেন এমন সময় উত্তেজিত প্রজাবৃন্দ সেই গৃহে অগ্নি প্রদান করিল। অনেক ছাত্র দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কয়েক জন মাত্র পলায়নে জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইল। কেহ কেহ বলে যে পিথাগোরসও ইহাদের সঙ্গে দগ্ধ হয়েন। আবার কেহ কেহ বলে ইহার কিছু দিন পরে ৪০ দিন উপবাসের পর মেটাপণ্টম নগরে ইহাঁর স্বেচ্ছা মৃত্যু হয়। ইহার কোনটা ঠিক তাহা এখন বলা যায় না তবে সিসিরোর সময় পর্য্যন্ত মেটাপণ্টম নগরে তাঁহার কবর প্রদর্শিত হইত।

পিথাগোরস সুদীর্ঘ-কেশশালী সৌম্য মূর্ত্তি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন তাঁহাকে দেখিতে এত সুন্দর ছিল যে লোকে তাঁহাকে সূর্য্যদেব-আপোলোর পুত্র বলিত।

পিথাগোরস যে সকল মত প্রচার করেন তাহার মধ্যে সর্ব্ব প্রসিদ্ধটী এই —

সংখ্যাই সংসারের মূল ধর্ম্ম ; অর্থাৎ সংখ্যা হইতেই সর্ব্ব প্রকার বস্তুভেদ জন্মিয়াছে।

পিথাগোরস এই কথা দ্বারা কি অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা এতদিন পরে ঠিক করা সুকঠিন। ফলতঃ প্লেটোর পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতগণের সকলের সম্বন্ধেই ঐ কথা বলা যাইতে পারে ; তাঁহাদিগের কাহারও স্বরচিত পুস্তক একেবারেই পাওয়া যায় না, কাহারও কাহারও বা পুস্তকের ভগ্নাংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আবার কেহ কেহ নিজে কোন পুস্তক রচনা করেন নাই ; তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রগণ তাঁহাদিগের মত সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কোন কোন স্থলে তাঁহাদিগের বিপক্ষ-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ খণ্ডন করিবার উদ্দেশে তাঁহাদিগের কোন কোন মতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে পুরাতন দার্শনিক মত গুলির ব্যাখ্যা করা কত দুরূহ ব্যাপার। তবে যতদূর বুঝা যায়—বর্ত্তমানকালীন বিজ্ঞানের গতিও পিথাগোরসের উক্ত মতের এক প্রকার অনুগামী মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে আমরা যাহা কিছু জানি তাহা হয় আমাদিগের মনোগত ভাব আর না হয় কোন বস্তুর কার্য্য। আমাদিগের মনোগত ভাবগুলি সাধারণতঃ কোন বস্তুর কার্য্য দ্বারা সংঘটিত, যেমন আলোকের জ্ঞান-সূর্য্যরশ্মি চক্ষুতে পতন দ্বারা। অতএব

আমাদিগের লক্ষিত বস্তু সমূহের কার্য্যাবলী এবং আমাদিগের মনোগত ভাব সমূহের মধ্যে একরূপ ঘাত প্রতিঘাত সম্বন্ধ। অর্থাৎ যাহা এক দিকে কোন বস্তুর কার্য্য, তাহা অন্যদিকে আবার আমাদিগের মনোগত ভাব। অতএব মনোগত ভাব সমূহও এক প্রকার কার্য্য ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং আমরা যাহা কিছু জানি তাহা কোন না কোন প্রকার কার্য্য, কিন্তু কার্য্য, গতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেখানে কার্য্য হয়, সেখানেই তাহা গতির সাহায্যে ঘটিয়া থাকে; ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গতি। যেমন আলোক একরূপ গতি, শব্দ আর একরূপ গতি ইত্যাদি, আবার আলোকের মধ্যে লোহিত সবুজ নীলাদি আলোক পরস্পর হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন (কিন্তু এক জাতীয়) কতকগুলি গতি বিশেষ। সেইরূপ উচ্চ নিম্ন মিষ্ট কর্কশ প্রভৃতি শব্দও কতকগুলি গতিবিশেষ। আমরা সংসারে যাহা যাহা দেখিতে পাই, সে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন গতি বলিয়া ধরিলে তাহাদিগকে একই গতির ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা ও অনুপাত হইতে উদ্ভূত বলা যাইতে পারে। যেমন কোন একটী সুর আর তাহার অষ্টম এই দুয়ে কেবল অনুপাত গত ভেদ আছে, কোন জাতিগত ভেদ নাই। প্রথম সুর যত শব্দ তরঙ্গে উৎপন্ন হয়, তাহার অষ্টম তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক তরঙ্গজাত ইহা অনেকেই জানেন। এক্ষণে যদি আমরা এমন মনে করি যে সর্ব্বপ্রথমে গতি ছিল এবং তাহারই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা ও অনুপাত হইতে পদার্থ সমূহের যাবতীয় গুণ জন্মিয়াছে, তাহা হইলে আমাদিগের কথা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ হইবে না। কিন্তু মাত্রা ও অনুপাত ইহারা কি? সংখ্যা মাত্র। সুতরাং আশ্চর্য্য কি যে পিথাগোরস সংখ্যাকে বস্তুর মূল ধর্ম্ম অর্থাৎ সংখ্যা ধর্ম্ম হইতেই অন্যান্য সব ধর্ম্ম বা গুণ জন্মে এইরূপ বলিবেন। "পিথাগোরসই যে কেবল সংখ্যাকে মূল ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন এমত নহে; কথিত আছে যে প্লেটোও তাঁহার শেষকালে সংখ্যাকে মূল ধর্ম্ম বলিয়া এক রূপ অনুমান করেন। সংখ্যার মধ্যে আবার পিথাগোরসের শিষ্যদের নিকট দুই একটী সংখ্যার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। ১+২+৩+৪ এই প্রথম চারিটী সংখ্যার যোগে দশ হয় এবং মিশরবাসীদিগের" ধর্ম্মের সহিত ইহার সংস্রব ছিল বলিয়া দশ ইহাদের একটী প্রধান সংখ্যা। সকল দ্রব্যেরই প্রথম মধ্য ও শেষ এই তিন ভাগ আছে বলিয়া তিন ইহাদের প্রধান সংখ্যা। সংখ্যার উপর এইরূপ ভাল মন্দ বিশ্বাস সকল দেশেই সকল সময়েই প্রায় দেখা যায়। আমাদের দেশেও কতকগুলি সংখ্যা মঙ্গলবাচক ও কতকগুলি সংখ্যা অমঙ্গলবাচক বলিয়া বিবেচিত হয়।

পিথাগোরসই প্রথম রীতিমত অঙ্কশাস্ত্র প্রণয়ন ও শিক্ষা প্রদান করেন। নামতার ঘর এবং গণনা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্কুলে যে আবেকস নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহা তাঁহারি নির্ম্মিত, পরিমাণ ও পরিমাণ প্রথা তিনিই গ্রীসে চালিত করেন। জ্যামিতির কতকগুলি প্রধান সত্য তাঁহার আবিষ্কৃত। প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ প্রতিজ্ঞা

অর্থাৎ ‘কোন সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত দিকস্থ বাহুর উপর অঙ্কিত চতুর্ভুজ সমকোণাবদ্ধ বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত চতুর্ভুজদ্বয়ের সমান’ ইহা পিথাগোরসই আবিষ্কার করিয়াছেন।

সঙ্গীত বিদ্যার বিজ্ঞান যে পিথাগোরস আবিষ্কার করেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কথিত আছে একদিন এক কামারের দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে কামারের হাতুড়ি-আহত লৌহ দণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর উৎপন্ন হইতেছে শুনিয়া এ বিষয়টি তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া পড়ে,—এবং এই চিন্তা হইতেই পরে তাহা কর্ত্তৃক সুর বিজ্ঞান উদ্ভাবিত হয়। পিথাগোরসের মতে গ্রহ উপগ্রহগণের গতিতেও এইরূপ শব্দ উৎপন্ন হইতেছে এবং গতির তারতম্য অনুসারে সুরের ভিন্নতা হইতেছে; তবে আমরা যে এই ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি না সে কেবল জন্ম জন্ম কাল শুনিয়া আসিতেছি বলিয়া, অর্থাৎ মুহূর্ত্তের জন্যও সে শব্দের বিরাম নাই বলিয়া।

সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ও গ্রহগণ ঘুরিতেছে এবং পৃথিবীর দৈনিক নিজা-বর্ত্তনে দিন রাত্র হইতেছে সৌরজগতের এই যে আবর্ত্তন প্রণালী—যাহা বর্ত্তমান যুগে কোপর্নিকস সিদ্ধান্ত করেন এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া যাহা অব্যর্থ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়—পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিথাগোরস তাহাও বলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান মতে প্রতিপন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয় তাহা পূর্ব্বে গ্রাহ্য হয় নাই এবং তৎপরবর্ত্তী ভ্রান্ত টলেমিক মত আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল।

পিথাগোরস বলিতেন আত্মা অমর এবং আত্মা থাকিবার তিনটী স্থান আছে। প্রথম স্বর্গ বা যেখানে পুণ্যাত্মা বিশ্রাম পায়। দ্বিতীয় নরক বা যেখানে পাপাত্মার বাস-স্থান। তৃতীয় মর্ত্ত্য বা শরীরীবাসস্থান। পিথাগোরস জন্ম ও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন ও বলিতেন তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কথা সব স্মরণ আছে। প্রথম জন্মে তিনি মারকিউরীর পুত্র এথেনিডস দিলেন, ২য় জন্মে পানথুবপুত্র ইউক্রেবস ছিলেন, (এই ইউক্রেবস হোমরের ইলিয়াডে পেট্রকলাসকে হত্যা করেন) ৩য় জন্মে ক্লাজ-মেনির ভবিষ্যদ্বক্তা পুরোহিত ছিলেন ৪র্থ জন্মে একজন ধীবর ছিলেন এবং ৫ম জন্মে পিথাগোরস হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পিথাগোরস আপনাকে ইউক্রেবস বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তাঁহাকে হীরা মন্দিরে লইয়া গিয়া তথায় ইলিয়াড বর্ণিত যুদ্ধের যে অস্ত্রাদি ছিল তাহার মধ্যে ইউক্রেবস যে অস্ত্রে পেট্রকলসকে হত্যা করেন তাহা প্রদর্শন করিতে বলা হয়। পিথাগোরস যদিও ইতি পূর্ব্বে সে সকল অস্ত্র দেখেন নাই তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে তাহার মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রখানি দেখাইয়া দিলেন। মেসমেরাইজ শাস্ত্রে পিথাগোরস অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। স্পর্শ বা শুধু দৃষ্টি মাত্র দ্বারা বন্য পশু বশ করিতে পারিতেন। কথিত আছে পিথাগোরস সুবর্ণজানু

ছিলেন, অলিম্পিক খেলায় ও হাইপারবিয়সের পুরোহিত আরবিয়াসকে. তিনি এই জানু দেখাইয়া ছিলেন, তাহাতে প্রসন্ন হইয়া আরবিয়াস তাঁহাকে একটী তীর উপহার প্রদান করেন সেই তীরের গুণে পিথাগোরস ইচ্ছা করিলেই অদৃশ্য হইতে, সমুদ্র পার হইতে, পর্ব্বত আরোহণ করিতে, ঝড় নিবারণ করিতে ইত্যাদি অনেক দুষ্কর্ম্ম সাধন করিতে পারিতেন; পিথাগোরস আয়নার উপর রক্ত দিয়া লিখিয়া সেই লেখা চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত করিতে পারিতেন। পিথাগোরসের সম্বন্ধে এইরূপ এত অধিক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনা যায় যে তাহা লিখিতে গেলে আলাদা একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয় সুতরাং সে বিষয়ে আমরা আর অধিক বলিতে চাহি না। ইউরোপীয়েরা এ সমস্তই চাতুরী বা মিথ্যা প্রবাদ বলিয়া উপহাস করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য কি যে পিথাগোরস একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।

গিল্‌টির বাজার।

কে তুমি বাঙ্গালি, খাঁটি জিনিস হাতে লইয়া এ গিল্টির বাজারে উদারতা কিনিতে আসিয়া ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া আছ? এখানে খাঁটির আদর নাই, ঘরের কড়ি দিয়াও এখানে খাঁটি জিনিস বিকান দায়। ভাণের কানাকড়ি দিয়া ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ এখানকার উদারতার ভাণ্ডারকে ভাণ্ডার কিনিয়া লইয়াছেন, তুমি আস্ত কড়ি ফেলিয়া আর কিনিবে কি? অদৃষ্টের জোর বড় জোর! তোমার অদৃষ্ট মন্দ তুমি আর এখানে কেন? তুমি যদি সর্ব্বস্ব পণ কর সমস্ত পুজি খোয়াও তোমার ভাগ্যে উঠিবে অপযশের টিকিট। উদারতার ভাণ্ডার শূন্য করিয়া লইবার সময় ভাগ্যবানেরা ইহাই মাত্র এখানে ফেলিয়া গিয়াছেন। তুমি যে নয়নের জল দিয়া অত্যাচারীর চরণ ধৌত করিতেছ তুমি যে বুকের রক্ত দিয়া শত্রু পালন করিতেছ তুমি যে ঈর্ষার বিষময় ভ্রুকুটিকে হাসিয়া ক্ষমা করিতেছ তবুও উদারতা নাম তোমার ভাগ্যে নাই। দুর্ভাগা হইলে এইরূপই হয়, তুমি আগেও যা ছিলে এখনো তাই, তোমার সাত গাঁ মাগিলেও যা এক গাঁ মাগিলেও তাই। তবে আর কাজ কি? তোমার খাঁটি সম্পত্তি টুকু আর ঝুটার দোকানে খোয়াইবে কেন? খাঁটি দিয়া ঝুটা নামে তোমার আবশ্যকই কি? তোমার খাঁটি লইয়া তুমি খাঁটি বাজারে যাও, সেখানে খাঁটিতে খাঁটি চিনিবে, খাঁটি দিয়া অনেক খাঁটি কাজ করিতে পারিবে, নহিলে এখানে তোমার একূল ওকূল দুকূল যায়।

এখানে যদি তুমি প্রতিপত্তি চাও ত কষিয়া হাঁকিতে শিখ, ঝুটাকে খাঁটি খাঁটি করিয়া

পূর্ণ বলে চীৎকার কর, তাহা হইলে তোমার গিল্‌টি মালও Not guilty হইয়া খাঁটি সোণার দরে বিক্রয় হইবে।

নাম কিনিতে গেলে চীৎকার তোমাকে করিতেই হইবে, যদি নেহাত গলাবাজি করিতে না চাও ত নীরবেও দমবাজি করা চাই। অধিক সেয়ানা লোকেরা এইরূপই করিয়া থাকেন, তাঁহারা কথায় কথায় বলেন তাঁহাদের কোন উদারতা নাই। আছে আছে অপেক্ষা নাই নাই করিয়া অনেক সময় তাঁহারা অধিক জয়ী হন, নাই নাই বলিয়া এমন বুক ফুলাইয়া গম্ভীর ভাবে গোঁপে চাড়া দিতে থাকেন, যে তাহাদের নীরব মাহাত্ম্যের ছটা চারি দিকে বিকীর্ণ হয়। যদি তুমি এই ঝুটার বাজারে উদার নাম পাইতে চাও তবে গলাবাজি নয় দম বাজি তোমাকে করিতেই হইবে, নহিলে পরের দুঃখ নিবারণের জন্য তুমি যতই কর, দুর্ভিক্ষপীড়িত দিগকে লক্ষমুদ্রাই দাও আর সরজন লরেন্‌সের মৃত যাত্রীদিগের বিপন্ন আত্মীয়দিগকে নীরবে সাহায্যই কর—ইংলিসম্যানের ফণ্ডে চার গণ্ডা পয়সা দানের ঝনঝনানিতে যতক্ষণ সকলের কানে তালা না লাগাইতে পার ততক্ষণ উদার ডিগ্রির ডিপ্লোমা কিছুতেই পাইবে না—উদার-মহাত্মাগণ তোমার করুণার প্রতি, তোমার দানশীলতার তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিবেন—"গভর্ণমেণ্ট জোর করিয়া দান না করাইলে তোমরা দান করিতে চাহ না, যদিও এরূপ জবরদস্তি করিয়া দান করান অন্যায়, কিন্তু ইহা ছাড়া বাঙ্গালিদিগকে দান করাইবার অন্য উপায় নাই।"

ঐ যে দেখিতেছ উদার ব্যক্তিগণ,—তোমার প্রতি সুতীব্র কটাক্ষপাত করিয়া—তোমার প্রতি পদক্ষেপের সুতীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন তোমার ওষ্ঠাধরের প্রত্যেক স্ফূরণের সহস্র ব্যাখ্যা করিতেছেন—সাবধান উহাদের উদারতায় সন্দেহ করিও না, কি জান এ রকম উদারতা বড় শক্ত জিনিস, ইহার খাঁটিত্ব সম্বন্ধে তুমি যে নিশ্বাস ফেলিবে, সে নিশ্বাস তোমার উপরই আসিয়া পড়িবে। তাঁহারা যে কেবল মাত্র ছাঁকা নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার জন্য দেশ ভূঁই আত্মজন পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে পীড়ন করিবার এই কার্য্যে নিশি দিন যাপন করিতেছেন,—ইহার পর নিষ্কাম ধর্ম্ম কি আছে? যদি তুমি ইহার উপর একটি কথা কও, তাহা হইলে তোমার মতন অনুদার নীচ, কৃতঘ্ন ব্যক্তি আর নাই। উদার ব্যক্তিগণ নিন্দা করিতে জানেন না, তবে যে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তোমার নামে দশ সহস্র মিথ্যা কথা না কহিয়া জল গ্রহণ করেন না,—সে তোমারি ধৈর্য্য পরীক্ষার জন্য। কি উদারতা! তুমি যদি এই উদারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া, আত্মরক্ষার অনুরোধে এই মিথ্যা কথার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ দু এক কথা বল,—তবে বল দেখি তুমি কি পাষণ্ড নরাধম!

তাঁহার প্রতি যদি তুমি এইরূপ ব্যবহার করিতে, এইরূপ সহৃদয়তা দেখাইতে, তাহা হইলে তিনি কি একটি কথা কহিতেন, তখনি নীরবে দুই হস্তে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন।

হে ম্লান মুখ বাঙ্গালি, যদি উদার নাম চাও, ত স্বার্থপরতাকে নিঃস্বার্থতা, নিষ্ঠুরতাকে দয়া বলিয়া উদার ব্যক্তিগণের কাণের কাছে দিন রাত চীৎকার কর—যদি তা না পার—ত ওখান হইতে চলিয়া এস, এস, নামের আশা. ছাড়িয়া নীরবে কাজ করিয়া আমাদের আনন্দের আলিঙ্গনে, আমাদের বন্ধুত্বের প্রশংসায় ,তাহার প্রতিদান গ্রহণ কর; ঝুটা নাম হইতে, এ খাঁটি সহৃদয়তা কি তোমাকে অধিক আনন্দ দিবে না, তোমার অধিক সম্মান-জনক নহে ? আর তাহা যদি না চাও ত উদার ব্যক্তির আঘাত অনুগ্রহ বলিয়া আস্ফালন করিতে কুণ্ঠিত হইও না।

ঐ যে ব্যাঘ্র মেষশাবককে উদরস্থ করিল, কি করুণা! শাবক তাহার পালকের নিকট কত অত্যাচারই সহিতেছিল,—নিমেষে ব্যাঘ্র তাহার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা শেষ করিয়া দিল! যদি কোন আক্রান্ত বক্তি ইহাতে সন্দেহ করিয়া প্রাণের দায়ে চীৎকার করিয়া ওঠে, আঘাত খাইয়া অমৃত বলিয়া উদার ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ না করে, এবং সমবেদনা পাইবার জন্য সে কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করে, তাহা হইলে আর কি বেচারাদের দুর্দ্দশা রাখিবার স্থান থাকে ? নীচমনা অকৃতজ্ঞ নিন্দুক নামে তাহাদের চিরকলঙ্ক থাকিয়া যায়। এ বাজারের এই নিয়ম, ক্ষমতাবান ব্যক্তিগণ অত্যাচার করিয়া উদারতা কেনেন, আর নিঃক্ষম বেচারাগণ প্রাণের দায়ে অশ্রুজল ফেলিলেও অকৃতজ্ঞ নাম লাভ করে।

এইরূপ উদারতা গুণেই ইংরাজগণ ভারতকে রুষদিগের নিকট হইতে রক্ষা করিতেছেন, ব্রহ্মদেশকে আশ্রয় দিয়াছেন,—এইরূপ উদারতা গুণেই তাঁহারা ইলবার্ট বিলের সৃষ্টি করিয়াছেন, হীন নেটিভ দিগকে অবিরত পিট থাপড়াইয়া নীচু স্থানে বসাইয়া রাখিতেছেন, উচ্চে দাঁড়াইবার সামান্য কষ্টটুকু পর্য্যন্ত তাহারা যেন না পায়! আর এই উদারতা গুণেই প্রতিদিন ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালীদিগের উপর অজস্র মিথ্যার বর্ষণ দেখা যাইতেছে।

হে উদার চেতা মহাত্মাগণ, তোমাদের চরণে সহস্র সহস্র নমস্কার করিয়া এই মাত্র ভিক্ষা চাই, অনুগ্রহ করিয়া গরীব আমাদের উপর তোমাদের উদারতা বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হও।

কৃষাণ কবি বার্ণ্‌স্।

বার্ণসের প্রণয় সর্ব্বালিঙ্গনকারী। আমরা দেখিয়াছি তিনি শুধু যৌবনেরই প্রেম কবিতায় চিত্রিত করেন নাই। শ্বেতকেশা রমণীর হৃদয়ে শ্বেতশীর্ষ স্বামীর জন্য যে উচ্ছাস তাহারও তিনি অপূর্ব্ব চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রেম মনুষ্য জাতিতে বা স্ত্রীপুরুষে বদ্ধ নয়; প্রাণিজগতেও বদ্ধ নয়। গোরুবাছুরের দুঃখে, ইঁদুরের দুঃখে, ডেইজি ফুলের দুঃখে তাঁহার গণ্ড অশ্রুজলে ভাসিয়া যায়, প্রাণ আকুলিত হইয়া তাহাদিগের দুঃখে কবিতা গান গাহিয়া উঠে। "A Winter Night" বা "শীতের রাত্রি" নামে বার্ণ্‌সের একটি প্রসিদ্ধ কবিতা আছে। শীতের রাত্রির কত কবি কত রকম বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বার্ণ্‌স শীতের রাত্রির (কলিকাতার শীতের রাত্রি নয়) একটা ভয়ানক, জীবন্ত, গায়ে-কাঁটা-দেওয়া বর্ণনা লিখিয়া সকলের আগে কাহাকে মনে করিতেছেন?

"দরজা আর জানালা গুলির ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনিয়া আমার শীতে কম্পমান গোরু আর নির্ব্বোধ মেষগুলির কথা মনে পড়িল। গো মেষ গুলি পাহাড়ের কোন চূড়ার নীচে আশ্রয় লইয়া এই শীত-যুদ্ধের ঝড়ের অবসান প্রতীক্ষা করিতেছে।

"ওরে তোরা ছোট ছোট লাফানে পাখী, বসন্তের আনন্দ-মাসে যাহাদের গান শুনিয়া আমার এত সুখ হইত—তোদের এখন কি দশা হয়েছে? কোথা তোরা এখন তোদের শাদা ছিট্‌ছিট্‌কারী পাখা গুটিয়ে চোখ বুজিবি!"

বার্ণ্‌স্ একদিন ক্ষেতে হল চালাইতেছিলেন। এমন সময়ে একটি ইন্দুর তাঁহার হলের সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া গেল। ব্লেন নামে তাঁহার সহচর ইন্দুরটাকে মারিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ ছুটিল। বার্ণ্‌স তাহাকে বারণ করিলেন। ব্লেন দেখিল হলের উপরে বার্ণস্ আর সে দিন কথাবার্ত্তা হাসি ঠাট্টা কিছুই করিলেন না, চিন্তামগ্ন রহিলেন। রাত্রে ব্লেনকে জাগাইয়া বার্ণ্‌স "To a Mouse" বা "ইন্দুরের প্রতি" নামে তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতাটি পড়িয়া শুনাইলেন, শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্লেন এখন ইন্দুরটার বিষয় তুমি কি মনে কর?"

সে অমূল্য কবিতাটির অনুবাদ এইঃ—

"ওরে ক্ষুদ্র, মসৃণশরীর ভীরু প্রাণি, তোর হৃদয় টুকুর ভিতরে না জানি কি ভয়ের ঝঞ্ঝা বয়ে যাচ্চে! তোর অত শীগ্‌গির দৌড়ে পালাবার কোন দরকার নাই—প্রাণ-নাশকারী হলটা নিয়ে তোর পিছনে দৌড়তে আমার প্রাণ চায় না।

"আমি বড় দুঃখিত যে মানুষ আপনার শাসন বিস্তার করিয়া প্রকৃতির যে জাতিতে জাতিতে সম্মিলন তাহা নষ্ট করিয়াছে—আর তাই তোর মনে মানুষ সম্বন্ধে সে খারাপ বিশ্বাসটা হয়েছে যার জন্যে তুই আমাকে দেখে, যে আমি তোরই মত মাটীর গড়া আর মরো সহচর, চম্‌কে উঠচিস্।

"আমি জানি তুই কখন কখন চুরি চামারি করিস্; তা তুই কি করবি, তোকেও তো বেঁচে থাকতে হবে। একটা ধানের শীষে একটা ধান কিছু একটা মস্ত ভিক্ষা নয়—বাকী যা থাকবে তার সঙ্গে আমি তোর আশীর্ব্বাদ পাব, আর শীষের ধানটা আমার কখনো কম হবে না।

"তোর ছোট্টো ঘরটুকুও ভেঙ্গে গেছে। তার দেয়াল হাওয়ায় উড়ে গেছে। এখন লতা পাতা এমন কিছু নাই যে তুই আবার ঘর তৈয়ের করবি—আর এ দিকে হাড়ভাঙ্গা মাঘের শীত এসে পড়েছে।

"তুই দেখ্‌ছিলি ক্ষেতগুলি সব খালি পড়ে আছে—শস্য বা ঘাস কিছু নাই—শীত ঘনিয়ে আসছে—মনে মনে ভেবেছিলি তোর ঘরটিতে সুখে বাস করবি, কিন্তু নিষ্ঠুর হল তোর গর্ত্তের ভিতর দিয়ে চলে গেল।

"ঐ যে খরকুটোর তুই ছোট্টো একটি স্তুপ করেছিস্ তার জন্যে তোর অনেক খরকুটো দাতে কাটতে হয়েছে। সব পরিশ্রমের তোর এখন এই ফল হলো যে তোর গর্ত্ত ছেড়ে যেতে হলো—শীতের যে বরফ বৃষ্টি তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ঘরবাড়ী তোর কিছুই রইলো না।

"কিন্তু ক্ষুদ্র ইন্দুর, ভবিষ্যতের জন্যে বন্দোবস্ত করা যে মিথ্যা হতে পারে তার দৃষ্টান্ত কেবল তুই ই না। ইন্দুরের আর মানুষের মস্ত মস্ত চিন্তা ও বিবেচনার কাজও অনেক সময় মিথ্যা হয়ে যায়, আর আকাঙ্খিত আনন্দের স্থানে দুঃখ ও বেদনা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

"তবু তুই আমার তুলনায় মহাসুখী! বর্ত্তমানেরই সহিত তোর সম্বন্ধ। কিন্তু হায়! আমি পশ্চাৎদিকে, ঘোর দৃশ্য দেখিতে পাই, এবং সম্মুখে যদিও দেখিতে পাইনা, কল্পনা করি ও ভয় পাই।"

ইন্দুরটাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বার্ণ্‌সের মনে হইল, আমি তো ওর কিছু করি নাই, তবে যে ও আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিল সে কেবল মানুষ ইহাদের উপর নির্ম্মম ব্যবহার করে বলিয়া। বার্ণ্‌স্ বলিলেন, "আমি তোরই মত ধরণীসম্ভূত আমি তোরই মত মরণশীল আমাকে দেখিয়া পালাচ্চিস্ কেন? আমার প্রাণ তোকে ব্যথা দিতে পারিবে না।" আর এ স্থানটিই বা কি সুন্দরঃ "আমি জানি তুই কখন কখন চুরিচামারি করিস', তা তুই কি করবি? তোকেও তো বেঁচে থাকতে হবে। আমার একটা ধানে কিছু কমিবে না, কিন্তু তোর Blessing বা শুভাশীর্ব্বাদ পাব।"

ইন্দুর খাবার জিনিষ পেয়ে বাঁচবে, আহ্লাদ করবে, বার্ণসের তাতে কত আহ্লাদ— ইন্দুরকেও তো প্রাণে বাঁচতে হবে। থরকুটো কাটিয়া তাহার দাঁতগুলির কষ্ট হইয়াছে তাহাও বার্ণস ভুলিতে পারিলেন না। এ কবিতাটি অনন্ত করুণা, অগাধ স্নেহপূর্ণ হইলেও ইহার ভিতরে তাহার মুখে আমরা যেন একটু হাসির রেখা দেখিতে পাই। কবি যে বলিতেছেন—"কিন্তু ক্ষুদ্র ইন্দুর, ভবিষ্যতের জন্য বন্দোবস্ত যে মিথ্যা হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত কেবল তুই না—ইত্যাদি। এখানে বার্ণসের প্রাণের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা ও আশা, তাহার অনন্ত অতৃপ্তি ও নিরাশা, অনুতাপের প্রদাহ হৃদয়শোণিতাক্ষরে চিত্রিত হইয়াছে। গ ীর বেদনা শমিত করিতে করিতে বলিতেছেন—

"Still thou art blest compared wi' me !
"The present only toucheth thee :
"But, och ! I backward cast my ee
"On prospects drear !
"And forward, though I canna see
"I guess and fear."

"তবু তুই আমার তুলনায় মহাসুখী বর্ত্তমানেরই সহিত তোর সম্বন্ধ। কিন্তু হায়! আমি পশ্চাৎ দিকে ঘোর দৃশ্য দেখিতে পাই এবং সম্মুখে যদিও দেখিতে পাই'না, আমি কল্পনা করি ও ভয় পাই"।

এই শেষ কথাটি মহাকবি শেলী এইরূপে কহিয়াছেন—

"We look before and after,
"And pine for what is not."

"আমরা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, এবং যাহা নাই তাহার জন্য কাঁদি।"

"ইন্দুরের প্রতি" এই শ্রেণীর কবিতা বোধ হয় আর কোন কবি লিখেন নাই। এই শ্রেণীর আর একটি অপূর্ব্ব কবিতা আমি পাঠককে উপহার না দিয়া থাকিতে পারি না। সে কবিতাটির নাম "To a Mountain Daisy" অথবা "একটি পার্ব্বত্য ডেইজির প্রতি।" ডেইজি ফুল আমাদের দেশে বোধ হয় নাই—থাকিলেও আমি জানিনা। ডেইজি বৈলাতিক কবির বড় প্রিয় কুসুম। পদ্ম যেমন আমাদের কবির, গোলাপ যেমন পারশিক কবির, বৈলাতিক কবির ডেইজি তেমন নয়। বেল, কামিনী, শিঁউলী যেমন আমাদের, ডেইজি তেমনি বৈলাতিকের। ডেইজি কথাটার মানে দিনের চক্ষু। ইন্দুরের কবিতার আর ডেইজির কবিতার জন্ম উভয়ই এক রকমের—হলের পরে। কবিতাটির অনুবাদ এই—

"ওলো ছোট্টো, নম্র, রক্তশির ফুলটি, তুই বড় কুক্ষণে আমার সাক্ষাৎ পেয়েছিস, কেননা আমাকে তোর সরু বোঁটাটিকে ধূলোতে এখনি মারাতে হবে, তোকে যে বাঁচানো এখন তাতো আমার সাধ্যই নাই, ওলো সুন্দর মুক্তটি।

"পূর্ব্বাকাশ যখন লাল হয়ে ওঠে, তাহাকে সম্ভাষণ করিবার জন্য তোর প্রিয় প্রতিবেশী, তোর উপযুক্ত সাথী সুন্দর লার্ক পাখী তোর উপরে ভর করিয়া তোকে শিশির স্নাত তৃণশষ্পের মধ্যে ডুবাইয়া, নানারঙ্গে রঞ্জিত বুক ফুলাইয়া, আহ্লাদে মাতিয়া আকাশে উঠে, এ তোর সে প্রিয় পাখী নয়।

"তুই যখন জন্মেছিলি তখন উত্তর দিক হইতে অতিতীক্ষ্ণ হাড়ভাঙ্গা (bitter biting north) বায়ু বহিতেছিল। তবু প্রফুল্লমুখে তুই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে উঁকি মারিয়া উঠিয়াছিলি, আর তোর ঐ কোমল দেহটি জননী ধরণীর বক্ষ হইতে ঈষৎ উঁচু হইয়াছিল।

"জেঁকো রংচঙ্গে ফুল যা বাগানে হয় তাহারা বৃক্ষ বা প্রাচীরের আশ্রয় পায়; কিন্তু তুই তোর মাটীর ঢিবি বা একটা প্রস্তর খণ্ডের অনিশ্চিত আশ্রয়ে থাকিয়া অদৃশ্য ও একাকী অনুর্ব্বর পড়ো ক্ষেতের শোভা কচ্চিস।

"সেখানে তোর সামান্য বসনে পরিহিত হইয়া, তোর তুষারশ্বেত বক্ষস্থল সূর্য্যের দিকে বিস্তার করিয়া, এই তোর শিরটি নম্রভাবে উঠাইয়া রহিয়াছিস। কিন্তু এখন আমার হল তোর মূল উৎপাটন করিল, আর ঐ তুই মাটীতে ঢলিয়া পড়িলি!

"গ্রাম্যচ্ছায়ার মধুর কুসুমিকা সরলা বালিকা যে প্রেমের সারল্য ও সরল বিশ্বাসের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছে তাহারও অদৃষ্ট তোরই মত। তোরই মত সে কলঙ্কিত হইয়া মৃত্তিকা নিহিত হয়।

"সরল কবির অদৃষ্টও তোরই মত। জীবনের তরঙ্গময় সমুদ্রে প্রতিকূল নক্ষত্র তাহাকে হাবুডুবু খাওয়ায়। পৃথিবীতে যাতে ভাল হয় সে তত্ত্ব যে কার্ডে লেখা আছে সে কার্ড সে কখনো চিনিতে পারে না। অবশেষে তরঙ্গ তর্জ্জন করে, বায়ু গর্জ্জন করে, অভাগা কবি সমুদ্রে ডুবিয়া যায়।

"অর্থহীন গুণীব্যক্তি যে বহুকাল দারিদ্র্য ও দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া, লোকের অহঙ্কারে বা বঞ্চনা ও চাতুরীতে দারিদ্র্য ও দুঃখের নিম্নতলে ডুবিয়া, জগদীশ্বর ভিন্ন সর্ব্বপ্রকারের অবলম্বন হীন হইয়া অবশেষে প্রাণ হারায় তাহারও অদৃষ্ট তোরই মত।

"আর তুমি ঐ ডেইজির অদৃষ্ট দেখিয়া যে শোক করিতেছ তোমারও সেই অদৃষ্ট—সে দিন দূর নয়। নির্ম্মম বিনাশের হল তোমার প্রস্ফুটন-পরে উল্লাসে চলিতেছে, অচিরে তুমি চূর্ণ হইয়া যাইবে।"

"এ তোমার প্রিয় প্রতিবেশী লার্ক নয়," ইত্যাদি ছত্র কটি কি প্রভাতমাখা অপূর্ব্ব কবিতা! ক্ষুদ্র লার্ক আসিয়া ডেইজির গায়ে বসিয়াছে, বসিয়া গান শুনাইতেছে, লার্কের

লঘুভারেও কোমল ডেইজিদেহ শিশিরস্নাত তৃণশষ্পে নুইয়া পড়িয়াছে, ইতিমধ্যে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যকিরণের পূর্ব্বাভাস দেখা দিয়াছে, আর দুষ্ট লার্ক আনন্দে অধীর হইয়া বেচারী ডেইজিকে ছাড়িয়া আকাশে উড়িয়াছে! Such is the fate of artless maid আদি ছত্রেই বা কত মাধুরী! ডেইজি ফুল হলে নষ্ট হইল দেখিয়া বার্ণসের মনে হইল, গ্রাম্যচ্ছায়ার মধুর কুসুম সরলা বালিকা যে প্রেমের সরলতা ও বিশ্বাসে প্রতারিত ও কলঙ্কিত হইয়াছে তাহার দশাও এই ডেইজির মত। দুঃখিনী গ্রাম্য বালিকার কথা মনে হইতে হইতে আপনার কথা—অনাদৃত দুঃখী কবির কথা—মনে পড়িল। গাইলেন—

"Such is the fate of simple bard,
"On life's rough ocean luckless starr'd!
"Unskilful he to note the card
"Of prudent lore,
"Till billows rage and gales blow hard,
"And whelm him o'er!"

Prudent loreএর তাস বা কিসে পৃথিবীতে টাকা কড়ি হয়,—বড় লোকের তোষামোদ করা, প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা বলা, লোককে ঠকান—এসব জ্ঞানের তাস কখনো দুঃখী কবি চিনিতে পারে না—সংসার সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। শেষ কটা ছত্র সম্পূর্ণই নিজের সম্বন্ধে। কি গভীর দুঃখের অভিব্যক্তি! বার্ণস্ জানিতেন তিনি মহাকবি। মহাকবি হল চালাইতেছেন; যে কৃষি করিয়াছিলেন সকল নষ্ট হইয়াছে, ধার হইয়াছে, নৃশংস মহাজন টাকার তাগাদা করিয়া মহাকবির শরীর ও প্রাণের রক্ত শোষণ করিতেছে, মহাকবি ডেইজির নাশে আপনার আশুনাশ দেখিতেছেন—গাইতেছেন

"Even thou who mourn'st the Daisy's fate,
"That fate is thine—no distant date;
"Stern ruin's plough hare drives, elate,
"Full on thy bloom,
"Till, crush'd beneath the furrow's weight
"Shall be thy doom!"

ক্রমশঃ

শ্রী শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট বালিকা।

১

শোনা হ'লোনাক কার কথা,
বোঝা গেলোনাক কার ব্যথা,
যেন—এত কথা, এত গানে!
দেখা হ'লো নাক কার মুখ,
জগতের এত সুখ-দুখ—
প্রাণীময় সংসারের প্রাণে!

২

জীবনের পূরিত' সকল,
কে যদি গো আসিত কেবল!
গানে বাকি সুর দিতে,ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্নে বাকি—জমাতে তরল!
কে যদি গো আসিত কেবল!

৩

অযতনে খ'সে পড়ে সবি!
ধরিয়া তুলিটি সুধু, দুটো রেখা টেনে গেলে—
শূন্য হৃদি হ'য়ে যায় ছবি!
কোন্‌টা ধরিতে হবে কথাটা বলিয়া গেলে—
লক্ষ্য-হারা হ'য়ে যায় কবি!

৪

কোথা সেই ফুটিয়াছে ফুল,
এ শুষ্ক তরুর!
কোথা সেই বহিছে তটিনী,
এ তপ্ত মরুর!
শীতল যুথির মৃদু বাস,
বায়ু সুধু আনিছে হেথায়
কার মুখ চুমি!
কে আছ, কোথায় আছ তুমি!
কোথা তুমি চির মধু-মাস!
কোথা তুমি চির উষা-হাস!

৫

বিহঙ্গম ডাকে যে প্রত্যুষে,
ডাকে সে কি বৃথায়—বৃথায়!
ফোটে না কি তাহার আলোক,
সে ডাক্ কি বৃথা ভেসে যায়?
জীবনের এই আধ-খানা,
দরশ-পরশাতীত আশা—
এ রহস্যে কোন অর্থ নাই?
একি সুধু ভাব-হীন ভাষা?

৬

একি সুধু ভাব-হীন ভাষা?
এই যে কথার পিছে প্রাণান্ত পিপাসা!
এই যে চাহনি কাছে কি অশ্রু ফুটিয়া আছে,
কি শ্বাস—নিশ্বাস পাছে দিন-রাত যোঝে!
এই যে সুরের পরে কত গান হাহা করে,
কত ছবি আছে প'ড়ে খসরার খোঁজে!
একি ভাব-হীন ভাষা, কেহ নাহি বোঝে!

৭

এই যে কল্পনা-শ্বাস, যেন সেফালির বাস,
থেকে থেকে ধীর বায়ে উঠিছে শিহরি;
এই যে আশার লতা কাঁপিতেছে পেয়ে ব্যথা,
নুইয়া পড়িছে মাথা, পড়ে ফুল ঝরি;
এই যে নীরব প্রেম, শারদ জোছনা যেন,
আপন হৃদয়-ভারে আকুল আপনি;
সুখের বাঁশরী দূরে— বাজিছে বেহাগ-সুরে,
এই আছে, এই নাই, উছলিছে ধ্বনি;

এই যে দুখের বায় ফুল-বন দিয়ে যায়,
অথচ জানে না নিজে কি দুখে বিভল ;—
কিছু নয়—কিছু নয় তবে এ সকল !

৮

এই যে তরুর মূলে, নদীর নির্জ্জন কূলে,
দণ্ডে দণ্ডে ঘুরি ভুলে যেন কার তরে ;
গাঁথিয়া ফুলের মালা, কেহ কি করে না খেলা?
পথিক চলিয়া যায়,—যে মালা সে করে !

৯

এই কুটীরের দ্বারে, এই ভাঙা বেড়া-পারে,
কেহ কি বসিয়া নাই কারো অপেক্ষায় !
চমকি উঠিলে বায়ু চমকিয়া চায় !

১০

এই যে নদীর বুকে ভেসে যায় তরী,—
কেহ কি এ কূল-পানে, চেয়ে নাই শূন্য প্রাণে !
ঢলিয়া পড়িছে রবি, কাঁদে না গুমরি ?

১১

পরিত্যক্ত ভগ্ন ঘরে, এঘর ওঘর করে,
কেহ কি, কি যেন তার না পেয়ে খুঁজিয়া,
কখন কি কেঁদে উঠে দ্বার-পানে নাহি ছুটে?
আপনার পদ-শব্দে কাহারে বুঝিয়া !

১২

যায় আসে কত লোক, কাহারো কাতর চোখ
পড়িবে না মোর পরে,—হবে না মিলন ?
এ জীবন-হেঁয়ালির চরণ পূরণ !
একটি না কথা ক'য়ে, কথার না দেরি স'য়ে,
অমনি বুকেতে বাঁধা চির আলিঙ্গন !

১৩

কোথা কথা-হীন ব্যথা, কোথা তুমি—তুমি !
জোছনার মেঘ-ছায়ে, শীতল মলয়-বায়ে,
সাগর লহরী-লীলা ভ্রমিছ কি তুমি ?
পাখী-কণ্ঠে, মৃগ-নেত্রে, কম্পিত শ্যামলক্ষেত্রে,
প্রভাত কমল-পত্রে র'য়েছ কি ঘুমি ?
কোথা কথা হীন ব্যথা, কোথা তুমি – তুমি !

১৪

ছাড়া ছাড়া হ'য়ে কেন বেড়াইছ ভাসি ?
ভাঙিয়া স্বপন-কারা, সমুখে আসিয়া দাঁড়া !
নয়ন জলেতে ভরা, ঠোঁটে ভরা হাসি !
নাহিকথা, নাহিব্যথা, নাহিপড়েআঁখি-পাতা,—
কে যেন আঁকিয়া গেছে ভালবাসাবাসি,
চির নব সুর, রূপ, প্রাণ রাশি রাশি !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সমালোচনা।

সরল পদার্থ বিজ্ঞান। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ প্রণীত।

উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ ও তড়িৎ, শব্দ, বারি এবং বায়ু এই কয়েকটি বিষয়ের বিজ্ঞান, নানা পরীক্ষা দ্বারা ইহাতে বিবৃত। লেখক কণ্ঠস্থ বিদ্যার নিতান্ত বিরোধী, কণ্ঠস্থ বিদ্যার যে কোনই ফল নাই একথা যদিও আমরা বলি না—তবে হাতে কলমে শিক্ষার যে আমাদের দিন আসিয়াছে এবং ইহার নিতান্ত অভাব দেখা যাইতেছে এ সম্বন্ধে আমাদের দ্বি বাক্য নাই। তবে কি, পরীক্ষা পুস্তকে পড়া যত সহজ, হাতে করা তত সহজ

নহে। বিশেষতঃ যোগেশ বাবু যে সকল পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা করিতে হইলে পূর্ব্বে সে বিষয়ের অনেকখানি জ্ঞান থাকা চাই। আর তাহা ভিন্ন কথঞ্চিৎ অর্থেরও প্রয়োজন। আমাদিগের দেশে নর্ম্মাণ স্কুল সমূহে যদি ঐ সকল ও অন্যান্য পরীক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়া কতকগুলি শিক্ষক বাহির হয়েন এবং বাঙ্গলা ও মাইনর্ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ আজি কালি বিদ্যালয়ের বেঞ্চ চেয়ার বোর্ড পুস্তকাদির নিমিত্ত যেরূপ কিছু কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির নিমিত্তও কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করেন তবেই এ উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। সমালোচ্য পুস্তকখানি পড়িয়া বঙ্গীয় পাঠকের যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মে, এবং যোগেশ বাবুর উক্ত শুভ উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সাধিত হয় তবে আমরা বড়ই আহ্লাদিত হই।

পুস্তকখানির সম্বন্ধে আমাদের অল্প বিস্তর বক্তব্যও কিছু আছে।

প্রথমতঃ, পুস্তকখানি হইতে গতি বিজ্ঞান ও স্থিতি বিজ্ঞান লেখক একপ্রকার বাদ দিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের মতে এই দুই বিষয় বাদ দিয়া যোগেশ বাবু ভাল করেন নাই। যে ব্যক্তি পদার্থ বিদ্যার পুস্তক পড়িবে অথচ কূপে একটি ঢিল পড়িলে উহা প্রথম সেকেণ্ডেই বা কতখানি পড়িবে, দ্বিতীয় সেকেণ্ডেই বা কতখানি পড়িবে এবং কুপের নীচে পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই বা উহার কত সময় লাগিবে তাহা যদি না জানিল, তবে আর হইল কি ?

দ্বিতীয়তঃ, ভাষার অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ততাবশতঃ পুস্তকখানির স্থানের স্থানের বর্ণনা ও উদাহরণ যেন অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ ১৫ পৃষ্ঠায় ; (১) "কোন পর্ব্বতের তলদেশে পারদের যত উচ্চতা তাহা হইতে পর্ব্বত শিখরে যত উচ্চতা তাহা বিয়োগ করিলে, পর্ব্বতের উচ্চতা-নিবন্ধন পারদ-উচ্চতা পাওয়া যাইবে।" (২) "ভিন্ন ভিন্ন উচ্চপ্রদেশের বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব ও সাধারণ বায়ু চাপ বিচার করিয়া অনুমান করা যায় যে এই বায়ু সাগরের গভীরতা ৭০।৮০ মাইলের অধিক হইবে না।" ২৬ পৃষ্ঠায় সাবানমিশ্রিত জলে বুদ্বুদের উদাহরণ। সাধারণ পাঠকদিগের এরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বুঝিতে কষ্ট হইতে পারে। তরল দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণের উপায় যোগেশ বাবু একটী বলিয়াছেন—অথচ সহজ উপায়টী বলেন নাই। (একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে নিমজ্জিত করা।) জলে লবণ মিশ্রিত করিলে উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় একথাটী বলিয়া দিলে হংসডিম্বের পরীক্ষাটী বুঝিতে সহজ হইত। সোলা ও অন্যান্য যে সকল কঠিন দ্রব্য জলে নিমজ্জিত হয় না (পরন্তু ভাসিয়া বেড়ায়) তাহাদিগের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণের উপায় বর্ণনা করা উচিত ছিল। স্তম্ভ দ্বারা বায়ুর চাপ নিরূপিত করা পরীক্ষাটী টরিসেলি প্রথম করেন, এ কথাটী বলিলে ভাল হইত। যাঁহারা সংসারের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম সকলেরই জানা উচিত। বক্রনালীর দুইমুখ কিরূপে সম-

তলে আনিতে হইবে তাহা চিত্র দ্বারা দেখান উচিত ছিল। বক্রনালীর লম্বা বাহু দিয়া কেন জল পড়ে ইহার যে কারণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বোধ হয় ঠিক হয় নাই—বক্র-নালীর দুই বাহুস্থিত দুই জলস্তম্ভের ভার বাহুদ্বয়ের প্রান্তভাগে কার্য্য করিবে, বাহু-দ্বয়ের সংযোগ স্থলে নহে। বলা উচিত ছিল ছোট বাহু হইতে (বায়ুর চাপ—উহার জলস্তম্ভের ভার) যে উর্দ্ধচাপ হইবে তাহা লম্বা বাহুর উর্দ্ধচাপ হইতে অধিক হইবে এই নিমিত্ত জল প্রথমোক্ত চাপ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া লম্বা বাহু দিয়া পড়িবে।

যোগেশ বাবুর ভাষা আবার স্থানে স্থানে বাঙ্গালা হয় নাই। তিনি বলেন একটা কাপড়, একটা কাষ্ঠ, একটি থালের—যদি একজন ইংরেজ মিসনরি এসকল কথা বলিতেন তবে আমরা আশ্চর্য্য হইতাম না। আমাদিগের চলিত বাঙ্গলায় বলে একখান কাপড় একখান কাষ্ঠ, একখান থালার।

কোন কোন স্থলে যোগেশ বাবু নূতন যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা না দিয়া পুরাতন কথা দিয়াছেন। তিনি বলেন মৌলিক ৬৪টী, কিন্তু মৌলিকের সংখ্যা এক্ষণে ৭০, আর উপরেই দেখা গিয়াছে তিনি বলেন বায়ুর গভীরতা ৭০।৮০ মাইল, কিন্তু কেহ কেহ সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা উহা অপেক্ষা উচ্চতর রাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক জনের মতে উক্ত গভীরতা ১৯৮। ২১২ মাইল হইবে। যোগেশ বাবু অনেকগুলি ছবি দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। তাহাদিগের মধ্যে কোন কোনটীতে আর দুই একটী অক্ষর কিম্বা আর দুই একটী রেখা বসাইয়া দিলে ঠিক হইত। যেমন, বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্রের চিত্রে (১৯) কবাট দুটী যদি তিনি দুইটী অক্ষর দিয়া দেখাইয়া দিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রের কার্য্যের তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সহজ বোধ্য হয় নাই—উহা আরও একটু বিস্তারিত রূপে বুঝাইলে ঠিক হইত। ৩৫ চিত্রে কেবল একটী আলোক-কিরণের গতি দেখান হইয়াছে; কিন্তু একটী কিরণে একটী বস্তু দেখা যায় না। ৩৬ চিত্রে কোন্ অংশ যষ্টির নিমজ্জিত ভাগ, তাহা হইতে কোন কোন রেখা জলের উপরিভাগে যাইতেছে এবং কোন কোন রেখায় তাহারা বক্রীভূত হইতেছে এসব অক্ষর দ্বারা দেখাইলে সাধারণ পাঠকদিগের বুঝিবার পক্ষে সহজ হইত।

আর একটী কথা, যোগেশ বাবু জ্যামিতি সূত্রের ন্যায় করিয়া পদার্থবিদ্যার নিয়মা-বলী ব্যক্ত করার বিরোধী—কিন্তু ওরূপ না হইলে ছাত্রদিগের শিখিবার অসুবিধা হয়। ছাত্রগণ যে এখানে একটী, ওখানে আধটী এইরূপ করিয়া নিয়ম কুড়াইয়া তাহা একত্র করিতে পারিবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। যোগেশ বাবু যদি পরীক্ষা বর্ণনার পর-নিয়মটী এক এক করিয়া অমনি বিধি বদ্ধ করিয়া দিতেন তবে বড় ভাল হইত।

আমরা এই পুস্তকের দীর্ঘ সমালোচনা করিলাম—কারণ পুস্তক খানি ইহার উপযুক্ত। যোগেশ বাবুর পুস্তকখানি, মোটের উপর ভাল হইয়াছে ইহা আমরা বলিতে পারি।

আশা করি গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা যে যব দোষ দেখাইয়া দিয়াছি সে গুলি সংশোধন করিয়া দিবেন। যোগেশ বাবু যে বিষয়ে লিখিয়াছেন সে বিষয় যে তিনি বেশ জানেন তাঁহার পুস্তক হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার জ্ঞানটী তিনি উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিলেই অধিকতর কৃতকার্য্য হইবেন। যোগেশ বাবু যেরূপ ধরণে পুস্তক লিখিয়াছেন এরূপ ধরণে পূর্ব্বে আর কেহ বাঙ্গলায় লিখিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার পুস্তকখানি পাঠকগণের নিকট আদৃত হইলে আমরা খুসী হইব।

শ্রী ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ভারত ইতিবৃত্ত সার। হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্ব। শ্রীশ্রীনাথ সিকদার এম এল প্রণীত।

বাঙ্গলায় রমেশ বাবু, তারিণী বাবু, কৃষ্ণচন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেকেরই লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস আছে বটে, কিন্তু এই ইতিহাস গুলিতে একটী বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার কোনটিতেই হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজ এই তিন রাজত্বের ইতিহাস সমান ভাবে পাওয়া যায় না। রমেশ বাবুর ইতিহাসে ইংরাজ ও মুসলমান রাজত্ব অপেক্ষা হিন্দু রাজত্ব অধিক বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত। তারিণী বাবুর ইতিহাসেও হিন্দু ও ইংরাজ রাজত্ব হইতে মুসলমান রাজত্ব অধিক বিস্তৃত রূপে বর্ণিত। কৃষ্ণচন্দ্র বাবুও হিন্দু মুসলমান রাজত্ব অতি সংক্ষেপে শেষ করিয়া ইংরাজ রাজত্ব বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই জন্য বালকদের বিশেষতঃ মাইনর পরীক্ষার্থী বালকদের খানিকটা অসুবিধায় পড়িতে হয়, প্রথমতঃ ভালরূপে তিনটী রাজত্ব জানিবার জন্য তাহাদিগকে ৩।৪ খানি বই পড়িতে হয়; দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে মাইনর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র ছাত্র— এতগুলি বই কিনিতে সম্ভবতঃ তাহাদিগের কষ্ট হয়। শ্রীনাথ বাবুর ইতিহাসে এই অভাবগুলি দূরীকৃত হইয়াছে। এলফিলষ্টোন, লেথব্রিজ, ম্যাক্‌ডলাণ্ড মার্সমান টড প্রভৃতি ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ ও রাজকৃষ্ণ বাবু, রজনী বাবু, তারিণী বাবু, কৃষ্ণচন্দ্র বাবু প্রভৃতি বাঙ্গলা ইতিহাস লেখকগণের গ্রন্থের সার সংগ্রহ করিয়া এ গ্রন্থে গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারত ইতিহাসের অবশ্য জ্ঞাতব্য সমুদায় বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে। দেশের সাধারণ অবস্থা ধর্ম্ম ও শাসন প্রণালী, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য এবং ধর্ম্ম প্রচারক, কবি, সেনানী, রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট প্রভৃতির নাম ও জীবনী এবং যুদ্ধাদি প্রসিদ্ধ ঘটনা গুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা দ্বারা বালকদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। এই পুস্তক খানি মাইনর পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

সেক্সপিয়রের গল্প। প্রথম ভাগ। শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকার পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিতেছেন—"সেক্সপিয়ার অনেক গুলি নাটক লিখিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কুড়িটি নাটকের উপাখ্যান ভাগ লইয়া ল্যাম্ব সাহেব সুপ্রসিদ্ধ Lambs' Tales from shakespeare নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই পুস্তকখানিকে আদর্শ করিয়াই আমি এই গল্পগুলি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। পরে স্থানে স্থানে মূল সেক্সপিয়ার হইতে অনেক কথা যোজনা করিয়া দিয়াছি। অতএব আমার সংকলিত এই গল্পগুলি ল্যাম্ব সাহেবের পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে"—এবং ল্যাম্বের পুস্তকের সকল গল্পগুলিও ইহাতে অনুবাদিত হয় নাই। ল্যাম্বের কুড়িটি গল্পের মধ্যে নয়টি গল্প যদুগোপাল বাবু সমালোচ্য পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন—অবশিষ্টগুলি দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ করিবার মানস ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমরা সাতিশয় পরিতোষের সহিত প্রথম ভাগখানি পাঠ করিয়া আগ্রহ সহকারে গ্রন্থকারের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় ভাগের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ভিন্ন ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী বাঙ্গলায় যতই অনুবাদ হয় ততই ভাল, ততই বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধিত হইবে।

এইখানে বলা উচিত, এই বই খানি সেক্সপিয়ারের গল্পের প্রথম অনুবাদ নহে। অনেক দিন হইতে বাঙ্গলা ভাষায় সেক্সপিয়ারের আর একখানি গল্প পুস্তক আছে। তবে সমালোচ্য পুস্তকখানি যে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

বইখানির ছাপা পরিষ্কার, বাঁধাই উত্তম, ভাষা সাধারণতঃ সরল ও পরিচ্ছন্ন, বুঝিতে গোলযোগ নাই। তবে স্থানে স্থানে "কোপ কলুষিত যোষিৎ পঙ্কিলীকৃত সর্ষিতের ন্যায় পরিহার্য্য" এইরূপ ঘোর ঘনাঘটাচ্ছন্ন ভাষা ব্যবহৃত না হইলে আরো ভাল হইত, ইহা দ্বারা পুস্তকের স্থানে স্থানের ভাষার সরল সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

বসন্ত-নির্ণয়। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

এক রাজকন্যা ও তাঁহার চারি সখী বসন্তকালে প্রণয় পীড়িত, হইয়া কিরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহাই ইহাতে ছন্দে লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পড়িবার কিছুই নাই, সকলি ছাই পাঁশ অপাঠ্য।

অভিনয়।

এই ত জীবন-অভিনয়!
কেহ কাঁদে কেহ হাসে—
দাঁড়াইয়ে পাশে পাশে;—
তবু ও কাহারো কেহ নয়!
এই ত জীবন অভিনয়!

বিশ্ব ঘোর থমথ'মে!
বৃষ্টি পড়ে ঝমঝমে!
নিশীথিনী বিরহে চমকে!
থেকে থেকে ক্ষণে খণ—
নীরদের গরজন!
বায়ু বহে দমকে দমকে।

গাছ পালা জেগে উঠে
এ উহার গায়ে লুটে,
বিজলি চমকি চলি যায়!
লতা পাতা শূন্য জুড়ে,
বৃষ্টির কণিকা উড়ে;
তুষার বরণ ধুম ভায়।

শ্রান্ত ক্লান্ত ম্লান দীন—
রমণী আশ্রয় হীন—
দাঁড়াইয়ে ভিজিছে কাননে।
জানালার পথ দিয়া
আলো উঠে ঝলকিয়া,
এক দিঠে নেহারে নয়নে।

কে তুমি দুখিনি মেয়ে?
অশ্রুধারা পড়ে বেয়ে!

এ বুঝি তোমারি ছিল ঘর?
অভিমান ব্যথা ভরে
গিয়াছিলে ছলিবারে?
আসিয়া দেখিছ সব পর!

কি আর চাহিয়া দেখ—
সাড়া আর দিও নাক—
আমোদে রয়েছে ওরা থাক।
এখানে নাহিক স্থান
ফির নিয়ে অভিমান;
পরাণ নিভিয়া যাবে—যাক।

রমণী আশ্রয় চায়
কেহ না শুনিতে পায়
রুনু ঝুনু নুপুর উথলে।
সুখের সাহানা তান
উথলে বৃষ্টির প্রাণ
অভাগিনী কেঁদে যায় চলে।

নিজের বিষাদ ভুলে
আকুল নিশ্বাস তুলে
নিশীথিনী শোক গীত গায়।
গৃহেতে উথলে গান—
রুনুঝু নুপুর তান—
অবিশ্রাম এই অভিনায়।

কেহ কাঁদে কেহ হাসে
দাঁড়াইয়ে পাশে পাশে;
তবুও কাহারো কেহ নয়!
এই ত জীবন অভিনয়!

গ্রীসের জাতীয় ক্রীড়া ও তাহার ফল।

সম্মিলনে জাতীয় একতার ভাব কতদূর বদ্ধমূল হয় তাহা পুরাতন গ্রীক জাতিরা বিলক্ষণ বুঝিত এবং নানা উপায়ে এই সম্মিলন সংস্থাপনের চেষ্টা করিত। যদিও লোক সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে গ্রীকগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল, তথাপি এই সম্মিলনের গুণে, গ্রীসই যে তাহাদের সাধারণ মাতৃ ভূমি গ্রীকই যে তাহাদের জাতীয় ভাষা এ কথা সর্ব্বদা তাহাদের হৃদয়ে জাগ্রত থাকিত। গ্রীক ভিন্ন আর সকলকে তাহারা 'বারবেরিয়ান' বলিত। এখন ইংরাজীতে বারবেরিয়ন অর্থে অসভ্য,কিন্তু তখন ঠিক তাহা ছিল না। গ্রীকরা "বিদেশী"অর্থে ঘৃণার সহিত বারবেরিয়ান কথাটী ব্যবহার করিত। গ্রীক ব্যতীত ইয়োরপ খণ্ডের অন্য সমস্ত জাতিই বাররেরিয়ন নামে অভিহিত হইত। বারবেরিয়ানদের সহিত তাহাদের সহানুভূতি ছিল না; কিন্তু এক জন গ্রীক যতই কেন দূরদেশে থাকুক না—গ্রীসবাসীদিগের সে নিতান্ত আপনার। এই আপনার ভাবের মূল তাহাদের সম্মিলন। তাহাদের দুই প্রকার সম্মিলন ছিল। প্রথম ধর্ম্মোৎসবজনিত-সম্মিলন দ্বিতীয় ব্যায়াম প্রভৃতি ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদ-জনিত সম্মিলন। এখানে আমরা গ্রীস দেশের জাতীয় ক্রীড়ার কথা বলিতেছি সুতরাং ধর্ম্মোৎসব জনিত সম্মিলনের বিষয় ২।৪ কথা বলিয়াই সংক্ষেপে শেষ করিব।

ধর্ম্ম সমিতির মধ্যে আম্ফিটিওনিক নামক সভাই তাহাদের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম সভা ছিল। গ্রীসের সর্ব্বপ্রধান মন্দির ডেলফিনের কর্ত্তৃত্ব ভার ইহার হস্তে থাকাই ইহার প্রধানত্বের কারণ। হেলেন্‌সের পুত্র আম্ফিটিওন প্রথম এই সভা স্থাপন করেন। বৎসরে দুইবার করিয়া এই সভার অধিবেশন হইত। বসন্তকালে আপোলোর মন্দিরে ডেলপাই নগরে একবার এবং শরৎকালে ডেমেটরের মন্দিরে থারমাপলি নগরে একবার ইহার অধিবেশন হইত। প্রথমতঃ আয়োনিয়া, জেরিয়া, কারেবিয়া, বোটিয়া, মাগনেসিয়া, ফাথিয়া, লোকিয়া, মালিয়া, ফোসিয়া, থেসেনিয়া, ডোলোপ এবং ইটা এই বারটী প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইত। ক্রমে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও ইহাতে যোগদিতে লাগিল এবং আণ্টোনিয়স পিয়সের সময় প্রতিনিধিগণের সংখ্যা ৩০ জন হইয়াছিল। এই সভায় বিভিন্ন প্রদেশবাসী গ্রীকদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গোলমালের মীমাংসা ও ধর্ম্ম আলোচনা হইত।

কিন্তু আমোদ প্রমোদ সাধারণকে যতদূর আকর্ষণ করে ধর্ম্মের গভীর গম্ভীর ভাব তাহা পারে না,—বলা বাহুল্য জাতীয় ক্রীড়া-উৎসবে জন-সমাগম সংখ্যা উক্ত ধর্ম্মোৎসব সময়ের অপেক্ষা বিস্তর অধিক হইত, এবং এই ক্রীড়া-উৎসব দ্বারা গ্রীকদিগের একতা-ভাবও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইত।

গ্রীসে অনেকগুলি জাতীয় ক্রীড়া প্রচলিত ছিল কিন্তু তাহাদের মধ্যে অলিম্পিক, পাইথিয়ান, নিমান ও ইস্‌থ্‌মিয়ান এই চারিটী ক্রীড়াই প্রধান ছিল এবং আমরা এখানে এই চারিটী খেলারই বর্ণনা করিব।

এই চারিটী খেলার মধ্যে অলিম্পিক সর্ব্ব প্রধান। ইলিস প্রদেশস্থ আলফিয়স নদীতীরস্থ অলিম্পিয়া নামক স্থানে অলিম্পিয়সদেবের সম্মানার্থে এই ক্রীড়া সম্পন্ন হইত বলিয়া ইহার নাম অলিম্পিক ক্রীড়া। কে এ খেলায় প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা কেহ ঠিক বলিতে পারে না। এ সম্বন্ধে অনেক প্রকার প্রবাদ গল্প আছে। একটি প্রবাদ টিটানগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সেই উপলক্ষে জুপিটর এই খেলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জুপিটারের পিতা সেটার্নের (Saturn) টিটান নামক এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে পৃথিবী শাসন করিবার ভার টিটানের হস্তে ন্যস্ত হয় কিন্তু তিনি এ ভার কনিষ্ঠ সেটার্নকে প্রদান করেন। কিন্তু রাজ্য প্রদান করিবার পূর্ব্বে টিটান ভ্রাতাকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লয়েন যে তাঁহার কখন পুত্র সন্তান হইবে না। জুপিটরের জন্ম হইলে সেটার্নের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষে ক্রুদ্ধ হইয়া টিটান তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণের সাহায্যে সেটার্নকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। পরে জুপিটর টিটানগণকে পরাজিত করিয়া পিতাকে সিংহাসন পুনঃ প্রদান করেন ও ১৪৫৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এই খেলার সৃষ্টি করেন।

অন্য প্রবাদে পেলপস এই খেলার সৃষ্টি কর্ত্তা। পিসার রাজা ইনোমকের হিপোডেমিয়া নামে একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। অনেক রাজ পুত্র এই কন্যার বিবাহার্থী ছিলেন। রাজা বলিলেন যে যাঁহার রথ তাঁহার রথাপেক্ষা দ্রুত গমন করিবে তাহাকে তিনি কন্যা দান করিবেন। আর যাঁহারা পরাজিত হইবেন তাঁহাদের প্রাণ লইবেন। অনেক রাজ পুত্র এইরূপে পরাজিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অবশেষে পেলপস, রাজার শকট প্রস্তুতকারককে উৎকোচে বশীভূত করিয়া জয়লাভ করিলেন। শকট-প্রস্তুতকারক সে দিন রাজাকে একটী ভগ্নচক্র-রথ দিল। জয় হওয়া দূরের কথা রাজা শকট হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পেলপস হিপোডেমিয়াকে বিবাহ করিলেন ও সেই উপলক্ষে এই খেলার সৃষ্টি করিলেন।

আর একটি প্রবাদ, হারকিউলিস এ খেলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইলিসের রাজা আগিয়সের অসংখ্য গো অশ্ব ছিল। এই পশ্বালয় প্রথম কিছু দিন পরিষ্কার না করায় পশুদিগের মলরাশিতে এরূপ পূর্ণ হইয়া উঠে যে তখন তাহা পরিষ্কার করা মনুষ্যের অসাধ্য হইয়া উঠিল। হারকিউলিস বলিলেন আগিয়স যদি তাঁহাকে চতুর্থাংশ পশু দান করেন তবে তিনি তাহা পরিষ্কার করিবেন। আগিয়স স্বীকৃত হইলেন। হারকিউলিস নূতন খাল কাটিয়া আলফিয়স নদীর গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। নদী এই পশুশালার ভিতর দিয়া চলিয়া গেল ও সেই সঙ্গে সমুদয় পরিষ্কার হইয়া গেল।

তখন আগিয়স আর পশু প্রদানে সম্মত হইলেন না, হারকিউলিস নিজে গৃহ পরিষ্কার করেন নাই, কৌশল দ্বারা করাইয়াছেন এই আপত্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পুত্র পিতার ইহা অন্যায় আপত্তি বলাতে পুত্রকে অবধি তিনি নির্ব্বাসিত করিলেন। হারকিউলিস যুদ্ধ করিয়া তখন আগিয়সকে পরাজিত ও নিহত করিলেন এবং ১২২২ পূঃ খৃষ্টাব্দে জুপিটরের সম্মানার্থে এই খেলার সৃষ্টি করিলেন।

গ্রীক লেখক ষ্ট্রাবো বলেন ইহা সত্য নহে, কারণ তাহা হইলে হোমরের গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যাইত। কিন্তু তাহা না হউক সম্ভবতঃ এই সময়েই ইহার সৃষ্টি হয় কিন্তু তাহার পর নিয়মিত রূপে সম্পন্ন হয় নাই। ৪৮৮৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ইফিটস এই ক্রীড়া পুনঃস্থাপিত করেন এবং এই সময় হইতে অলিম্পিক অব্দের উৎপত্তি হয়। ৪বৎসর অন্তর একবার করিয়া অলিম্পিক ক্রীড়া সম্পন্ন হইত। এক অলিম্পিক হইতে আর এক অলিম্পিক পর্য্যন্ত এই ৫ বৎসর কালকে এক অলিম্পিক বৎসর বলা হইত। এইরূপে অলিম্পিক বৎসর অনুসারে গ্রীকেরা তাহাদের বৎসর গণনা করিত। অনেক পরে অলিম্পিক কালের পরিবর্ত্তে খৃষ্টাব্দের চলিত হয়।

ইফিটস এই খেলা স্থাপন করিবার কিছু দিন পরে আবার ইহা উঠিয়া যায় এবং ৭৭৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কোরিবস ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমতঃ ইলিস নগরবাসীদিগের হস্তে এই ক্রীড়ার তত্ত্বাবধারণ ভার ছিল পরে ৩৬৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে পিসা নগর নষ্ট হইবার পর পিসিয়ানদের হস্তে এই ভার সংস্থাপিত হয়। যে নগরবাসীদের হস্তে এই ক্রীড়ার তত্ত্বাবধান ভার থাকিত সেই নগরবাসীদের সহিত অন্য নগরের কেহ যুদ্ধ বা বিবাদ করিতে পারিত না। তাহা হইলে সমুদয় গ্রীক নগরবাসীগণ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইত। অলিম্পিক ক্রীড়ার সময়ে ক্রীড়ায় কয়দিন সমুদয় গ্রীসের মধ্যে কেহ কাহারো সহিত কলহ বিবাদ করিতে পারিত না তাহা সম্পূর্ণ নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। ৫০ অলিম্পিক বৎসর অবধি এক জনের হস্তে এই ক্রীড়ার তত্ত্বাবধান ভার ন্যস্ত ছিল। ৫০ বৎসরে ২ জনের হস্তে এই ভার ন্যস্ত হয়। ১০৩ অলিম্পিক অব্দে ১২ জন তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হয় কিন্তু তাহার পর বৎসর আবার কমিয়া ৮ জন হয়। তাহার পর বৎসর দশ জন নিযুক্ত হয় এবং শেষে বরাবর এই সংখ্যাই স্থির ছিল। তত্ত্বাবধারকদের শপথ করিতে হইত যে তাঁহারা কোন রূপ পক্ষপাতিতা করিবেন না বা উৎকোচ গ্রহণ করিবেন না বা কোন গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিবেন না। ক্রীড়ার সময় ইহাঁরা বিবস্ত্র হইয়া এবং হস্তে পুরস্কার মাল্য লইয়া ক্রীড়া দেখিতেন। নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য প্রহরীও নিযুক্ত থাকিত। এই ক্রীড়ায় স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার ছিল না এবং তাহাদিগকে শাসিত রাখিবার জন্য, কেহ প্রবেশ করিলে তাহাকে পাহাড় হইতে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ বধ করার নিয়ম ছিল; কিন্তু তথাপি অনেক সময় ইহাতে স্ত্রী দর্শক থাকিত এবং কখন কখন পরীক্ষার্থী হইয়া জয়মাল্য উপার্জ্জন করিত।

হেলেনিক বংশ সম্ভূত না হইলে কেহ এ পরীক্ষা প্রদান-করিতে পারিত না, এবং পরীক্ষার পূর্ব্বে দশ মাস কাল ইলিসের ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ছাত্র না হইলে কোন ব্যক্তি পরীক্ষার্থে গৃহীত হইত না। তাহা ভিন্ন চরিত্রে কোন রূপ দোষ থাকিলেও সে ব্যক্তি পরীক্ষার উপযুক্ত বিবেচিত হইত না। প্রথমতঃ এই ক্রীড়ায় শুধু নানা প্রকার ব্যায়াম প্রদর্শিত হইত এবং একদিনেই খেলার শেষ হইত। পরে ইহার সহিত অশ্ব পরিচালন রথ পরিচালন এবং সাহিত্য কাব্য চিত্র প্রভৃতির পরিদর্শনও হইত এবং ৫ দিন ধরিয়া এ ক্রীড়া চলিত। সাধারণতঃ স্থূর্ত্তি দ্বারা নিম্নলিখিত প্রণালীতে পরীক্ষার্থী-দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ব্বাচিত হইত।

মনে কর ১২ জন পরীক্ষার্থী। বার টুকরা কাগজের দুইখানিতে এক, দুইখানিতে দুই, দুইখানি তিন, দুই খানিতে চার, দুইখানিতে পাঁচ, দুইখানিতে ছয় লেখা হইল। যে দুইজন ১টানিবে তাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী যে দুইজন দুই টানিবে তাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, এইরূপে ৬টী দল হইল। ছয় দলের মধ্যে পরীক্ষায় যে ছয়জন জয় লাভ করিল উক্ত উপায়ে তাহাদের মধ্যে তখন আবার তিনটী দল নির্ব্বাচিত হইল। তিন দলের ভিতর অবশ্য তিনজন জয়ী হইবে—জয়ী তিন জনেব মধ্যে আবার যে দুইজন সমান সংখ্যার কাগজ উঠাইল তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল—আর একজন দাঁড়া-ইয়া রহিল। পূর্ব্বোক্ত দুই জনের মধ্যে যে জয় লাভ করিত তাহার সহিত সর্ব্বশেষে এই অবশিষ্ট ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। তাহা দ্বারা শেষ পরীক্ষার্থীর যথেষ্ট সুবিধা হইত, কারণ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্ব্ব ব্যায়ামেই শ্রান্ত বল, কিন্তু বিশ্রামের অবসর পাইয়া সে তখন সবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জয় লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিত।

পরীক্ষার্থীদিগের বিবস্ত্র অবস্থায় ক্রীড়া করিতে হইত। হারকিউলিস পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়াছিলেন কিন্তু তজ্জন্য কোন মূল্যবান পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই। হারকিউলিসই এ খেলার স্থাপয়িতা সুতরাং তাঁহার নিঃস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত দেখাইবার উদ্দেশে এ ক্রীড়ায় কোন প্রকার মূল্যবান পুরস্কার প্রদত্ত হইত না। এক গাছি সামান্য অলিভ পাতার মালা মাত্র ইহার পুরস্কার। কিন্তু এই মালা যে গ্রীক-দের নিকট কতদূর অমূল্য তাহা বলা যায় না। সমুদয় গ্রীক যুবকগণ এই মালার প্রার্থী। যে এ মালা লাভ করিত তাহার পরিবার ও দেশকে সে সম্মানিত করিত। তাহার নিজের সম্মানের ত কথাই নাই। তাহার প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া জুপিটরের মন্দিরে রাখা হইত। কবি ও চিত্রকর দ্বারা তাহার যশ বর্ণিত হইত। ক্রীড়ার পর তাহার আবাসে গমন করিবার জন্য নূতন দ্বার রচিত হইত। মাল্য-ভূষিত বীর চতুরশ্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক নগর প্রদক্ষিণ করিয়া এই দ্বার দিয়া আবাসে গমন করিতেন। গ্রীসের সমুদয় নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই খেলা দেখিতে সমবেত হইতেন।

অলিম্পিক ক্রীড়ার নীচেই পাইথিয়ান খেলার মান। আপোলোর মাতা লাটোনাকে বধ করিবার জন্য জুনোদেবী পাইথন নামক অজাগর সর্পকে প্রেরণ করেন। জুপিটরের সাহায্যে লাটোনা প্রাণ রক্ষা করেন। পরে আপোলা জন্ম গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পাইথনকে বধ করেন এবং সেই উপলক্ষে এই খেলার সৃষ্টি করেন। প্রবাদ এই যে প্রথমবার দেবতারা স্বয়ং ইহার পরীক্ষার্থী ছিলেন।

ডেলপাইতে আপোলোর মন্দিরে এই খেলা সম্পন্ন হইত। প্রথমে ৯ বৎসর ও পরে ৫ বৎসর অন্তর এই ক্রীড়া হইত। ইহাতেও নানা প্রকার ব্যায়াম পরীক্ষা হইত এবং অলিম্পিক ক্রীড়ার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য ছিল। কেবল ইহার একটী বিশেষত্ব ছিল এই, নৃত্য গীত না জানিলে কেহ এ পরীক্ষার পরীক্ষার্থী হইতে পারিত না। নৃত্য গীত এই ক্রীড়ার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। এ ক্রীড়ার পুরস্কার তাল পাতার একগাছি মালা।

নিমান ও ইস্থ্মিয়ান অনেকটা এই একই প্রকারের খেলা। আরকিমোরস নামক একজন রাজপুত্র অতি শৈশবে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্মরণার্থে লোকেরা প্রথম নিমান ক্রীড়ার সৃষ্টি করে কিন্তু কিছু দিন পরেই ইহা লোপ পায়। পরে হারকিউলিস নিমিয়া-অরণ্যবাসী সিংহকে বধ করিয়া সেই উপলক্ষে এই খেলা পুনঃস্থাপিত করেন। তাঁহার ১২টী কীর্ত্তির মধ্যে ইহা প্রথম কীর্ত্তি। এখেলার একটী প্রধান অঙ্গ আরকিমোরসের জন্য গানে শোক প্রকাশ করা। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর এখেলা সম্পন্ন হইত। এই খেলার পুরস্কার একগাছি পারসনীর মালা।

ইস্থ্মিয়ান খেলাতেও পাইথিয়ান ক্রীড়ার ন্যায় সঙ্গীত ও ব্যায়াম প্রদর্শিত হইত। নেপচুনের সম্মানার্থে করিন্থ প্রদেশে প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এ ক্রীড়া সম্পন্ন হইত।

এইরূপে এই সকল এবং অন্যান্য ক্রীড়া-উপলক্ষে বহুগ্রীক প্রতি বৎসরই একত্রে সমবেত হইত। ইহা দ্বারা গ্রীকদিগের একতাভাব বর্দ্ধিত হইত, প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের পরিচিত হইবার সুবিধা হইত এবং বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইত।

আমাদের দেশে ক্রীড়া কৌতুক-জনিত কোনরূপ জাতীয় সম্মিলনের সম্পূর্ণ অভাব। মধ্যে বঙ্গ দেশে হিন্দুমেলা নামে যে বাৎসরিক উৎসব হইত তাহাকে উক্তরূপ একটি জাতীয় মেলা বলা যাইতে পারে; দুঃখের বিষয় তাহাও এখন নাই। হিন্দুমেলাতেও বালকদের ব্যায়াম পরীক্ষা গৃহীত হইত, নানা প্রকার শিল্প দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইত এবং জাতীয় ভাব উদ্দীপক কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ করা হইত। মেলার কয় দিন ছেলেদের কত আনন্দ কত উৎসাহই ছিল! হিন্দুমেলা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত তবে অন্ততঃ কতক পরিমাণেও যে তাহা দ্বারা আমাদের জাতীয় ভাব ও একতা বর্দ্ধিত হইত, ব্যায়াম শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হইত তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু

যাহাদের ক্রীড়া কৌতুকই নাই—তাহাদের আবার জাতীয় ক্রীড়া! দুদিনের মধ্যেই হিন্দু-মেলার অস্তিত্ব লোপ পাইল। এখন এত দিন পরে সম্প্রতি এদেশে একটি রাজনৈতিক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে; তাহাই আমাদের একমাত্র জাতীয় সম্মিলনী। ইহা ছাড়া ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে আমাদের দেশে মেলা মেশা সম্মিলন যা দেখা যায়,—তাহা জাতীয় সম্মিলন নহে সাম্প্রদায়িক সম্মিলন মাত্র। কিন্তু তথাপি ইহা দ্বারাও আমাদের অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে—স্থানে স্থানের নির্দ্দিষ্ট পর্ব্ব উপলক্ষে বহু লোকের সম্মিলনে গৌণ ভাবেও শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি এবং জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

যাহা হউক এতদিন পরে এদেশে একটিও যে প্রকৃত জাতীয় সভা স্থাপিত হইয়াছে তাহা এই নিরানন্দ দেশে বড়ই আনন্দ ও আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। রাজনীতি আলোচনা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও—অন্য নানারূপ উন্নতির যে ইহা সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যদি উন্নতির পথে দ্রুত চলিতে চাই ত কেবল এই একটি রাজনৈতিক সম্মিলনে সন্তুষ্ট না হইয়া নানা প্রকারের সম্মিলনী স্থাপন করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। জাতির নৈতিক উন্নতি সাধিত করিবার জন্য একটি জাতীয় সম্মিলনী সভা এবং হিন্দুমেলার মত ক্রীড়া কৌতুক চিত্র বিদ্যার একটি প্রদর্শনী যাহাতে অবিলম্বে স্থাপিত হয়—তজ্জন্য বিশেষ সচেষ্ট হওয়াউচিত।

লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ।

কাশীধামের ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিলে—প্রাচীন ভারতের ইতি-বৃত্তেরই এক প্রকার আলোচনা করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রকার আলোচনার কোন বিশেষ উপকরণ পাওয়া যায় না। পুরাণাদি হইতে, ও কাশীখণ্ড হইতে বারাণসী সম্বন্ধে, যাঁহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতে বর্ত্তমান প্রণালীর ইতিহাসের কোন অভাব পূরণ হয় না। সুপ্রসিদ্ধ কনিংহাম সাহেব বারাণসীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ করেন নাই—তিনি বৌদ্ধ প্রধান কালের প্রাচীন দর্শন (Relics) প্রভৃতি গ্রন্থাদির সাহায্যে বারাণসীর সেই সময়ের ইতিহাস উদ্ধার করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। কনিংহাম এই কার্য্যে প্রকৃত উপযুক্ত, ও তীক্ষ্ণদর্শী হইলেও একজন বিদেশী। যদি ডাক্তার রাজেন্দ্র লালের ন্যায় কোন দেশীয় প্রত্নতত্ত্ব বিৎ পণ্ডিতকে সহযোগী করিয়া তিনি এই কার্য্যে হস্ত নিক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় উভয়ের সমীকৃত চেষ্টায় অনেক

অধিক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পরিতেন। আমরা পরে এই বিষয়ের একটু আলোচনা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বারাণসী "মন্দির নগরী"। জাহাঙ্গীর নিজ জীবন বৃত্তান্তে বারাণসীকে এই প্রকার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ বারাণসীর যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি—কেবল দেব মন্দির, পবিত্র ধর্ম্মকূপ, ও পবিত্র সরোবরে পূর্ণ দেখিতে পাই। ঘাটের ত কথাই নাই—সমস্ত বারাণসী পরিভ্রমণ করিয়া এমন কোন স্থলে উপনীত হওয়া যায় না—যেখানে ঘাটের অভাব আছে। এই অসংখ্য পরিমাণ ঘাটের মধ্যে মণিকর্ণিকা ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, মণিমন্দির ঘাট, পিশাচমোচন ঘাট, সিন্ধির ঘাট, নাগপুররাজ-ঘাট, ত্রিলোচন ঘাট, গয়া ঘাট, পঞ্চগঙ্গাঘাট, শঙ্কটাঘাট, রামঘাট, বরুণাঘাট শিবলাঘাট গোস্বামীঘাট ও পাঁড়েঘাট প্রভৃতি কয়েকটীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই ঘাটগুলি ছাড়া কয়েকটি পবিত্রকূপ ও পুষ্করিণী আছে, তাহাদের সংখ্যা এক প্রকার নির্দ্ধারিত, সুতরাং এস্থলে তাহাদের নামোল্লেখ করা আবশ্যক। জ্ঞানবাপী কূপ, কাশীকরায়ৎ কূপ, কালকূপ, মণিকর্ণিকা কূপ, ধর্ম্মকূপ, নাগকূপ, লোলরিকাকূপ, ও চন্দ্রকূপই ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত আর ও কয়েকটী পবিত্র পুষ্করিণী ও কুণ্ড আছে; ইহাদের মধ্যে কর্ণঘণ্টা তালাও (তালাও অর্থাৎ পুষ্করিণী) পিশাচমোচন তালাও, ভৈরবতালাও মানস সরোবর, দুর্গাকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড ও কুরুক্ষেত্র কুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত গুলির যথাযথ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রদান করিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে সুতরাং আমরা দুই চারিটী প্রধান প্রধান গুলির বিবরণ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

মণিকর্ণিকা। একদা বিষ্ণু আসিয়া কাশীধামে ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া নিজ চক্রের দ্বারা এক পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা নিজ স্বেদ-জলে পরিপূর্ণ করিলেন। ঐ সরোবরের তীরে বহুকাল ব্যাপী তপস্যা করিলে আশুতোষ তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিতে আসিলেন। মহাবিষ্ণুর ঘোর তপস্যা দেখিয়া বিশ্বেশ্বরের বিস্ময় জন্মিল—সেই বিস্ময় বশে তাঁহার শিরকম্পন হওয়াতে মণিময় কর্ণভূষণ এই পুষ্করিণী মধ্যে স্খলিত হইয়া পড়িল—মহাবিষ্ণু মহাদেবকে দেখিয়া হর্ষ গদগদ স্বরে কহিলেন—হে নাথ, স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ জীবগণের মঙ্গলার্থে আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি এই পঞ্চক্রোশী বারাণসীর মধ্যে কি মনুষ্য, কি পশু, কি কীট, কি পতঙ্গ যে কেহ প্রাণত্যাগ করিবে তাহাকে নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। মহাদেবও তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। চক্রদ্বারা খণিত হইয়া ছিল বলিয়া ইহা চক্রতীর্থ বলিয়াও উল্লেখিত হয়। ইহার বহুকাল পরে যখন ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেন সেই সময়ে মণিকর্ণিকা গঙ্গার সহিত মিলিত হওয়াতে মহাতীর্থরূপে পরিণত হয়। অন্যমতে—কেহ কেহ বলেন যে মহাদেবও

পার্ব্বতী এক দিবস কাশী ধামের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে এই মণিকর্ণিকা তীরে উপস্থিত হন—সেই সময়ে সহসা পার্ব্বতীর মণিময় স্বর্ণালঙ্কার কূপ মধ্যে পতিত হওয়াতে ইহা মণিকর্ণিকা বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুখনিত কূপটী আজও বর্ত্তমান আছে। *

মণিকর্ণিকার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আমরা উপরে প্রদান করিলাম। হিন্দুতীর্থযাত্রীর পক্ষে, মণিকর্ণিকা পরম পবিত্র। সমস্ত কাশীর মতে যতঘাট সংস্থাপিত আছে মণিকর্ণিকা তাহাদের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত, মণিকর্ণিকা হইতে বারাণসীর উভয় দিকের বিস্তৃতি সমান। এইস্থলে সিদ্ধ বিনায়ক নামক এক দেবমন্দির আছে। মন্দিরটীর গঠনাদি দেখিয়া অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। মন্দির মধ্যে এক প্রস্তরময় বিনায়ক (গণেশ) প্রতিমূর্ত্তি ও তাহার দুইপাশে সিদ্ধি ও বুদ্ধির প্রতিকৃতি আছে। কাশীখণ্ডের মতে মণিকর্ণিকা, বরণা ও অসি সঙ্গম, পঞ্চগঙ্গা ও দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিলে পাপীর সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া কাশীদর্শনের সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। নাগপুর রাজের ঘাট ও সিন্ধির ঘাট মণিকর্ণিকার অতি সান্নিধ্যে সংস্থাপিত। নদী গর্ভ হইতে সিন্ধিয়া ও নাগপুর রাজের ঘাটের দৃশ্য অতিশয় মনোহর। সিন্ধিয়া ঘাট, মারহাট্টা রাণী বৈজা (ব্রজ) বাইএর কীর্ত্তি। কেহ কেহ বলেন ইহাতে অহল্যা বাইয়েরও সংশ্রব আছে। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম এই ঘাট যখন প্রথম আরম্ভ হয়—তখন ভিত্তি স্থাপন সম্বন্ধে বড়ই অসুবিধা হইয়াছিল। যদিও কাশীর গঙ্গার ভাঙ্গন নাই—তত্রাচ, দুই তিন বার ভিত্তিমূল গাঁথা শেষ হইয়া গেলেও ইহা মহাশব্দে জাহ্নবী গর্ভে বিলীন হইয়াছিল। পরে অনেক যাগ যজ্ঞ করিয়া বহুকালব্যাপী পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের পর ইহা সম্পূর্ণ হয়। নাগপুর রাজের ঘাটও অতিশয় সুদৃঢ় রূপে নির্ম্মিত। গঙ্গা গর্ভ হইতে একতালার সমান করিয়া পোস্তাটী প্রস্তর মণ্ডিত করিয়া সুদৃঢ় করা হইয়াছে। এই একতালার উপর—একটী ত্রিতল বাটী সংস্থাপিত। দ্বিতলের উপর একটী বারান্দা এই বারান্দায় উঠিলে গঙ্গার শোভা অতিশয় চমৎকার বোধ হয়। বস্তুত এইস্থলে, সিন্ধিয়া ঘাট, নাগপুর রাজের ঘাট ও আমেটীর রাজার মন্দিরগুলি দেখিলে হিন্দু স্থপতি বিদ্যার প্রশংসা করিতে হয়।

দশাশ্বমেধ ঘাট—মনিকর্ণিকার নিম্নেই দশাশ্বমেধ ঘাট কাশীক্ষেত্রের মধ্যে প্রসিদ্ধ। এই ঘাটের উপর দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাহিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা দশাশ্বমেধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দশটী অশ্বমেধের কারণ কি বলিতে হইলেই দিবোদাসের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অবতারণা করিতে হয়। সুতরাং আমরা

* এই মণিকর্ণিকাতেই চণ্ডালরূপী মহারাজ হরিশ্চন্দ্র শ্মশানচণ্ডালের কার্য্য করিতেন। এই স্থানের সান্নিধ্যে আজও শবদাহ হইয়া থাকে।

দিবোদাসের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদান করিতেছি। রাজা দিবোদাস, মহাতপ ও নিষ্ঠা-বৃত্তি দ্বারা বিশ্বেশ্বর ও প্রজাপতিকে সন্তুষ্ট করিলে—প্রজাপতির অনুরোধে মহাদেব দিবোদাসকে কাশীতে বাস করিবার অনুমতি দিয়া মন্দরাচলে প্রস্থান করিলেন। দিবোদাস ধর্ম্মবলে অতিশয় বলীয়ান ছিলেন—তাঁহাতে পাপের লেশমাত্রও ছিল না সুতরাং বহুকাল ধরিয়া নির্ব্বিবাদে কাশীর উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্বেশ্বরের বন্দোবস্ত উল্টাইয়া দিয়া নিজ বন্দোবস্তে কাশীর শাসন করিতে লাগিলেন। কাশীধাম বিশ্বেশ্বরের সাধের জিনিস্—তিনি কাশী বিরহে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পুনরায় কাশীতে প্রত্যাগমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্ঠাপরায়ণ, ধার্ম্মিক-ভক্ত তখন কাশীতে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছেন বিশ্বেশ্বর দেখিলেন ছলনা দ্বারা দিবোদাসকে কাশীচ্যুত করা ভিন্ন কাশীলাভের অন্য কোন উপায় নাই। দিবোদাসকে কাশীরাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার জন্য তিনি যোগিনীগণ, সূর্য্যদেব ও ব্রহ্মাকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা দিবোদাসকে দূরীভূত করা দূরে থাকুক আপ-নারাই কাশীর অনুপম শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সকলের শেষে আসিয়া নূতনবিধ কৌশলের উদ্ভাবন করিলেন। ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়া দিবোদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব তুমি তাহার আয়োজন কর।

ব্রহ্মার উদ্দেশ্য এই অশ্বমেধের বহুল প্রমাণ বিবিধ দ্রব্যের আয়োজন করিতে দিবো-দাসের অবশ্য কোন না কোন ত্রুটি হইবে—এই ত্রুটি হইতেই তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইবেন—তাহা হইলে তাঁহাকে কাশী হইতে দূরীভূত করা অতিশয় সহজ হইয়া উঠিবে। কিন্তু দিবোদাস কোন মতেই পিছ্পাও হইবার নহেন—তিনি ব্রাহ্মণরূপী ব্রহ্মাকে বলিলেন, দেব! একটী অশ্বমেধ কেন আপনি দশটী অশ্বমেধের আয়োজন চাহিলে এ দাস সাধ্য মতে তাহা সম্পন্ন করিতে পারে। ব্রহ্মা সুযোগ পাইয়া ইহাতে সম্মত হইলেন ও এক একটী করিয়া দিবোদাসের আয়োজন মতে দশটী অশ্বমেধ সমাপন করিলেন। দ্রব্য সং-গ্রহে বা কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি না পাইয়া তিনি অতিশয় লজ্জিত হইলেন ও মন্দরাচলে প্রস্থান না করিয়া কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা যেস্থানে দশটী অশ্বমেধ সমাপন করিয়াছিলেন—সেইস্থলই "দশাশ্বমেধ বলিয়া কথিত হয়। এই কারণে "দশাশ্ব-মেধ" আজও হিন্দু তীর্থযাত্রীর চক্ষে অতি পবিত্র স্থান, তীর্থ দর্শনার্থে যে কেহ কাশীতে গমন করে দশাশ্বমেধে স্নান না করিলে তাহারা তীর্থ ফল পায় না।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা দিবোদাসের কাহিনী অনুসরণ করিব। ব্রহ্মার অপার-কতার কথা বিশ্বেশ্বরের কর্ণগোচর হইলে তিনি সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধিদায়ক গণপতি ও মহা-বিষ্ণুকে কাশীধামে প্রেরণ করিলেন। গজানন, কাশীতে উপস্থিত হইয়া নিশিযোগে কাশীবাসীকে ভয়ানক স্বপ্ন দিলেন, ও প্রাতঃকালে গণক বেশে তাহাদের গৃহে গৃহে

উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া কাশীধাম পরিত্যাগ করাইতে লাগিলেন। পরে রাজা দিবোদাসের শয়নাগারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভীষণ স্বপ্ন দিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন রাজলক্ষ্মী রোরুদ্যমানা হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছেন ও কাশীধামের রাজপতাকা ভগ্ন হইয়াছে। এই স্বপ্ন দেখিয়া রাজা ব্যাকুল চিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া স্বচক্ষে কেতন ভঙ্গ, প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল—স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ সত্য বিবেচনা করিয়া অতিশয় ম্রিয়মান হইলেন। মহিষী লীলাবতী কহিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি একজন বিখ্যাতগণক আপনার রাজধানীতে আগমন করিয়াছেন—তাঁহাকে সভায় আনিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা শুনিয়া চিন্তাদূর করুন। ছদ্মবেশীগণক আসিয়া কহিলেন—মহারাজ! অদ্য হইতে অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে কোন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্রাহ্মণকুমার আপনার নিকট আসিবেন—তিনি আপনাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন তদনুযায়ী কার্য্য করিলে আপনার কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। গণক ব্রাহ্মণের বাক্যে মহারাজ দিবোদাস বিগত চিন্তা হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে চাহিলে তিনি কহিলেন, শুনিয়াছি মহারাজ অতিশয় বিখ্যাত রাজা, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ও আমার পিতার বাসের নিমিত্ত, কাশীধামে কিয়দংশ ভূমিখণ্ড প্রদান করেন—তবে চরিতার্থ হই। আপনার রাজধানীতে বাস করিতে আমাদের বড়ই বাসনা।

দিবোদাস এই প্রার্থনানুযায়ী আংশিক ভূমি খণ্ডের পরিবর্ত্তে সমস্ত কাশীধাম অর্পণ করিলেন। ছদ্মবেশী গণপতি অভীষ্ট লাভ করিয়া স্বেচ্ছামত প্রহরী নিয়োগ দ্বারা কাশীধাম রক্ষা করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই গণেশই বারাণসীতে ঢুণ্ডিগণেশ বলিয়া বিখ্যাত। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সান্নিধ্যেই ইহার মন্দির সংস্থাপিত। তীর্থ যাত্রীরা পুরী প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তিললড্ডক দ্বারা ঢুণ্ডিগণেশের পূজা করিয়া পরে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন।

ইহার পর মহাবিষ্ণু আদিকেশব মূর্ত্তি ধরিয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি বৌদ্ধরূপী হইয়া পূর্ণকীর্ত্তি নাম গ্রহণ করিয়া কাশীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিতে লাগিলেন। নারায়ণীও বিজ্ঞান কুমুদী নাম ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে বৌদ্ধমত প্রচার দ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে আচার ভ্রষ্টা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধমত প্রচারে সকলে প্রকারান্তরে আস্তিকতা পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিকতা আরম্ভ করিল সুতরাং নানাস্থানে পাপাচার ঘটিতে লাগিল। অকালমৃত্যু দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দৈবনিগ্রহ কাশীতে দেখা দিতে লাগিল। সতীরা কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ব্রাহ্মণেরা আচার ভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। দিবোদাস এই বিপদ সময়ে নারায়ণের আরাধনা করিলে তিনি আদেশ করিলেন, দিবোদাস! তুমি শিবের আনন্দ কানন অন্যায় উপায়ে নিজাধিকারে রাখিয়াছ বলিয়াই এই সমস্ত পাপাচরণ ঘটিতেছে। কাশীতে আধিপত্য করা তোমার কর্ম্ম নহে

তুমি বিশ্বেশ্বরকে কাশী অর্পণ করিয়া মুক্তপাপ হও। দিবোদাস বিশ্বেশ্বরকে সেই মুহূর্ত্তেই বারাণসী অর্পণ করিলেন ও এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম দিবোদাসেশ্বর রাখিলেন। আজও দিবোদাসেশ্বর-লিঙ্গ মন্দিরে সর্ব্বদাই উৎসব হইয়া থাকে। কাশী-খণ্ডের মতে, দশাশ্বমেধ, মনিকর্ণিকা ও পঞ্চগঙ্গায় * স্নানকরিলে পাপী ব্যক্তি সদ্য পাপ মুক্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বারাণসীতে দেবমন্দির অসংখ্য ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত। ইহার এমন কোন অংশ নাই—যেখানে কোন না কোন দেবদেবীর মন্দির অথবা দুই চারিটা শিবলিঙ্গ না আছে। ইহার মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বারাণসীর সর্ব্বপ্রধান দেবতা অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর। এই দুই মুক্তিই ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়া নানাস্থানে নানারূপে কথিত হয়। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার নিম্নে ঢুণ্ডিগণেশ, কাল ভৈরব, ভূতভৈরব, (ভঁয়রো) ভৈরবনাথ, অষ্টাঙ্গ ভৈরব, শুক্রেশ্বর, তারকেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, দক্ষেশ্বর, অগ্নমিত্রেশ্বর, ধ্বজেশ্বর, দিবোদাসেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কোটীলিঙ্গেশ্বর, নির্ব্বুদেশ্বর, কানেশ্বর, যোগেশ্বর, ধ্রুবেশ্বর, সোমেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর, দুলালেশ্বর, মানেশ্বর, শনিচর, দণ্ডপানি, মহাকাল, বৃদ্ধকাল, রাজেশ্বরী, জ্বরহরেশ্বরী, আদিমহাদেব, কাশীদেবী, গৌরজী, বড়গণেশ, জগন্নাথ, সতীশ, সিদ্ধেশ্বরী, শঙ্কটাদেবী, বালকৃষ্ণ, ছত্রভুজ ও আদিকেশব, প্রভৃতি কয়েকটী অতিশয় বিখ্যাত। সমস্ত গুলির অতি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিলেও, ভারতীতে স্থান হইবার সম্ভাবনা অল্প সুতরাং আমরা ইহাদের মধ্যে দুই চারিটীর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

আমরা যে দিবস বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম সেই দিন শারদীয় মহাষ্টমী, সুতরাং অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দির যে নিতান্ত লোকারণ্যময় হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মন্দিরের ত কথাই নাই—রাজপথেও এত জনতা যে তাহার মধ্য দিয়া যাইতে আমাদের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। এ সকল জায়গায় গলিপথে, শকটাদি গতায়াতের কোন সুবিধা নাই বলিয়া কি ইতর, কি ভদ্র সকল জাতীয় মহিলারাই পদব্রজে তীর্থ দর্শন করিতে বাধ্য হন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইবার পথে একটী গলিমুখে ঢুণ্ডিগণেশ মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহার উৎপত্তি বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাশীতে আসিয়া অগ্রে ঢুণ্ডিগণেশের পূজা না করিলে কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বোক্ত গলিপথ দিয়া কিছুদুর গেলেই বিশ্বেশ্বরের মন্দির। কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই "হর হর ব্যোমের" সহিত সুপরিস্ফুট বেদধ্বনি আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিল।

---

* কিরণা ধূতপাপা চ পুণ্যতোয়া স্বরস্বতী।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব, পঞ্চ নদ্যোত্র কীর্ত্তিতা॥
অতঃ পঞ্চনদং নাম তীর্থম্ ত্রৈলোক্য বিশ্রুতম।
ইতি কাশী খণ্ড।

মন্দিরের আশে পাশে চকে ও রোয়াকে বসিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় ঘন সংযুক্ত ব্রাহ্মণগণ ও পরমহংসগণ বেদ পাঠ করিতেছেন। একবাহু; ঊর্দ্ধবাহু, গৈরিকভূষিত, ত্রিপুণ্ড্রালঙ্কৃত, রুদ্রাক্ষ শোভিত, বিভূতি মণ্ডিত, কত শত সন্ন্যাসী বসিয়া মুদ্রিত নয়নে "ব্যোম মহাদেব" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। কোথাও বা দণ্ডী, বেণু দণ্ড হস্তে, জটা জুট সমন্বিত হইয়া গম্ভীর ভাবে পাদচারনা করিতেছেন. কোথাও বা সিন্দূর মণ্ডিতা, রুদ্রাক্ষ শোভিতা ত্রিশূল ধারিণী ভৈরবী আলুয়ায়িত জটাজাল সমন্বিত হইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কোথাও পুরোহিত, যজমানের উদ্দেশে হোম ও চণ্ডীপাঠ করিতেছেন কোথাও বা কেহ উল্লাসে মাতিয়া উচ্চকণ্ঠে শিব গুণানুকীর্ত্তন করিতেছে। কেহ বা শিবশতকের স্তোত্র আওড়াইতেছে—কেহ বা মন্দির মধ্যস্থ দোদুল্যমান ঘণ্টা নাড়িয়া বাজাইয়া কেহ বা অন্যের সহিত শাস্ত্রীয় তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও আর পাঁচজন তাহাদের চারি পাশে বসিয়া তাহা স্থির কর্ণে শুনিতেছে। মন্দির মধ্যে বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি বিল্বপত্র ও পুষ্পাচ্ছাদিত হইয়া শোভা পাইতেছে। এস্থানে সকলেরই অবারিত দ্বার—উচ্চবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ফল পুষ্প অর্ঘ্য চন্দনাদি দ্বারা স্বহস্তে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া যাইতেছে।

বিশ্বেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দিরটী তিনটী চূড়া সমন্বিত ও আদ্যোপান্ত সুবর্ণ পাতে মণ্ডিত। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ—মন্দির চূড়াটী আদ্যোপান্ত সুবর্ণ মণ্ডিত করিয়া দেন—ও প্রাতঃস্মরণীয়া লক্ষ্মীরূপিণী রাণী অহল্যাবাই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণে যথেষ্ট সাহায্য করেন। বিশ্বেশ্বরের আসি-মন্দির, যাহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয় তাহা আরঙ্গজীবের কবলস্থ হইয়া বহুকাল পূর্ব্বে ভূমিসাৎ হইয়াছে ও সেই স্থলে তৎপরিবর্ত্তে একটী মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্দিরের সমস্তাংশই বোধ হয় প্রস্তর নির্ম্মিত। চারিদিকে প্রশস্ত চক, ও তাহার আশে পাশে চারিদিকেই ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত শিবলিঙ্গে পরিপূর্ণ। প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইয়া মন্দির চূড়া দেখিবার জিনিস বটে। যখন প্রভাতে, নবোদ্ভাসিত রবি কিরণে, মন্দির শিখর আচ্ছাদিত হয় ও প্রদোষের চঞ্চল রশ্মি তাহার উপর ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে থাকে—তখন সেই শোভা দেখিয়া প্রাণ মন স্বতই পরিতৃপ্ত হইয়া উঠে।

মন্দির হইতে বাহির হইতে যাইতেছি—এমন সময়ে প্রবেশ পথে—বিশ্বেশ্বরের প্রকাণ্ড বণ্ড, আসিয়া আমাদের পথ রোধ করিল। এ প্রকার সুদীর্ঘ নন্দদুলালী ধরণের বৃষভ ইতিপূর্ব্বে কখনও আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। যাত্রীরা সকলেই ইহাকে, আতপ তণ্ডুল, বিল্বপত্র, ও নানাবিধ ফল মূলে পরিতুষ্ট করিতেছে। ও বৃষভবর সেই গুলি উদরস্থ করিয়া রোমন্থন করিতে করিতে বিষয়ী লোকের ন্যায় গম্ভীর ভাবে অন্য দিকে চলিয়া যাইতেছে।

বিশ্বেশ্বরের অভিষেক ও আরতির দৃশ্য অতি চমৎকার। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার

অব্যবহিত পরেই অভিষেক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। লিঙ্গ মূর্ত্তির চারিপাশে এক গহ্বর আছে, সন্ধ্যার পর কয়েক জন উপবাসী ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই লিঙ্গ মূর্ত্তির মস্তকে এক-তাল নবনীত, ও এক কলসী মধু ও অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য ঢালিয়া দিয়া মর্দ্দিত করে। তাহার পর তাহা গঙ্গোদকে পরিধৌত করা হয়। ইহার পর প্রকাণ্ড চন্দনের তাল ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গ মূর্ত্তি সাজাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পরেই আরতি আরম্ভ হয়। আরতীর সময়ে ৫।৭ জন রুদ্রাক্ষ শোভিত ত্রিপুণ্ডকধারী ব্রাহ্মণ প্রত্যেকে এক একটী পঞ্চপ্রদীপ লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেব দেবের আরতি করিতে থাকে। অন্যান্য লোকেরা চারিদিক হইতে স্বেচ্ছামত, শিঙ্গা ডম্বুর, ও একতারা প্রভৃতি বাজাইয়া তালে তালে নাচিতে থাকে।

বিশ্বেশ্বর দেখিয়া আমরা অন্নপূর্ণার মন্দিরে গেলাম—প্রশস্ত নাটমন্দির চারিদিকে প্রস্তরময় স্তম্ভে পরিব্যাপ্ত হইয়া, সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৈদ্য-নাথের মন্দির গুলির যেমন এক প্রকার নীরস কর্কশ ভাব, বেনারসের মন্দির গুলি তদ্রূপ নহে। প্রশস্ত নাটমন্দিরের উত্তর দিকে অন্নপূর্ণার মন্দির—মন্দির মধ্যে প্রস্তরময়ী, দীর্ঘহস্তা, প্রফুল্ল বদনা দেবী মাল্যপুষ্পাচ্ছাদিতা হইয়া উপবিষ্টা রহিয়া-ছেন। সম্মুখে প্রলম্বমান শিকলে সুগন্ধিঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে। দেবীর অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ প্রস্তর নির্ম্মিত কেবল মুখখানি সুবর্ণ মণ্ডিত, সর্ব্বাঙ্গ পুষ্প-মাল্যাচ্ছাদিত ও বস্ত্র মণ্ডিত। অন্নপূর্ণার মন্দিরেও একবাহু উর্দ্ধবাহু, পরমহংস প্রভৃতির অভাব নাই। এই মন্দিরও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ।

ইহার পর আমার জ্ঞানবাপী দেখিতে চলিলাম। জ্ঞানবাপীর চারিধার লোহার জালে ও রেলিংএ আচ্ছাদিত। এই সুগভীর কূপ মধ্যে শত শত বৎসরের অগণ্য বিল্ব-পত্র, ফল পুষ্পাদি পচিয়া এক বিপ্লবকারী দুর্গন্ধ উপস্থিত করিয়াছে। কূপটী বিস্তারে আন্দাজ আট দশ হাত হইবে। একটী সিঁড়ি দিয়া জ্ঞানবাপীর তলদেশে যাইবার উপায় আছে—এই তলদেশের সহিত গঙ্গার সংস্রব আছে। সম্মুখেই প্রস্তর ময় বৃষভ ও নন্দী মূর্ত্তি। কূপের পার্শ্বে পাণ্ডাঠাকুর বসিয়া শক্রদিগকে কূপোদক পান করা-ইতেছেন ও পয়সা আদায় করিতেছেন। পাণ্ডারা বলিয়া থাকে যখন আরঙ্গজীব বিশ্বে-শ্বরের পুরী মধ্যে অত্যাচার আরম্ভ করেন তখন তিনি এই কূপ মধ্য দিয়া পলায়ন করিয়া নিস্তার পান। জ্ঞানবাপীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এক পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে। যখন, দেবগণ ও গণপতি কাশী সৃষ্টির অব্যবহিত পরে কাশীতে আসিয়া দেখিলেন সেস্থানে বিশ্বেশ্বরকে স্নান করাইবার উপযুক্ত কোন জলাশয় নাই তখন তাঁহারা অতিশয় বিমর্ষ হইলেন। গজানন দেবগণের এই বিমর্ষ ভাব অপনোদন করিবার নিমিত্ত, স্বীয় ত্রিশূল দ্বারা তৎক্ষণাৎ এক কূপ খনন করিলেন। এই কূপোদকে মহা-দেবের স্নান কার্য্য সমাধা হইল। সদাশিব এই সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিতে

চাহিলে গণপতি প্রার্থনা করিলেন—"হে দেব, এই তীর্থ যেন একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয়। কাশীতে আসিয়া যে লোক ইহার পূজা করিবে বা জলস্পর্শ করিবে সেই ব্যক্তি যেন দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করে।" মহাদেব তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই সময় হইতেই জ্ঞানবাপী কাশীধামে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছে।

কাশীর কথা বলিতে গেলে কালভৈরবের ইতিবৃত্ত দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিশ্বেশ্বর যেমন এই আনন্দ কাননের একমাত্র অধীশ্বর ও অন্নপূর্ণা যেমন একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেইরূপ কালভৈরব এই নগরীর সর্ব্ব প্রধান রক্ষক বা কোতোয়াল। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত কাহিনী প্রচলিত আছে। একদা ব্রহ্মা ও নারায়ণ উভয়ে সুমেরুশৃঙ্গে দেবসভায় উপস্থিত হইলে—ঋষিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে পিতামহ! অব্যয় ব্রহ্ম কে?' ব্রহ্মা ও নারায়ণ উভয়ে শিব মায়ায় মুগ্ধ হইলেন। প্রথমে ব্রহ্মা বলিলেন—'আমিই অব্যয় ব্রহ্ম'

তৎপরে নারায়ণ উত্তর করিলেন 'আমিই অব্যয়, এই জগতের আমিই প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক'।

ব্রহ্মা ও নারায়ণ এই প্রকার বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে চারিবেদ মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনারা কেহই অব্যয় নহেন—একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবই এই আখ্যা প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত।

ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া বেদ সকলকে তিরস্কার করিলেন—কিন্তু বিবাদ মিটিল না। বিবাদ শান্তি করিবার জন্য পরিশেষে সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া এক মহাজ্যোতি উপস্থিত হইলেন—জ্যোতির্ম্মধ্যে শূলপাণি রুদ্রকে দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন—"রুদ্র আমি তোমার পিতা আমাকে প্রণাম কর।" রুদ্রদেব এই কথা শুনিয়া কুপিত হইলে—তাঁহার ললাট হইতে এক ভয়ানক পুরুষ বাহির হয় তাঁহার নামই কালভৈরব। ঐ কালভৈরব, রুদ্রের আজ্ঞায় ব্রহ্মার উর্দ্ধদিকের এক মস্তক ছেদন করিলেন। তথন ব্রহ্মা ও নারায়ণ স্তব দ্বারা তাঁহাকে শান্ত করিয়া বিবাদ হইতে ক্ষান্ত হইলেন। কালভৈরব ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তক হস্তে করিয়া রুদ্রের আজ্ঞায় সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেন কিন্তু কোথাও সেই মস্তক পতিত হইল না। কিন্তু এই ছিন্ন মস্তক লইয়া কাশীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত বিচ্যুত হইয়া পড়িল। কালভৈরব উল্লাসিত চিত্তে কহিয়া উঠিলেন—"আহা! কাশী কি পবিত্র তীর্থ! আমি অদ্যাবধি এই তীর্থে বাস করিয়া ইহাকে রক্ষা করিব কখনই অন্যত্র গমন করিব না।' সেই অবধি কালভৈরব কাশীতে বাস করিতেছেন। কাশীধামে প্রবেশ করিয়া ইহার পূজা না করিলে কাশীরাজের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। কাশীতে গিয়া দুর্গ-বাড়ী দেখা নিতান্ত আবশ্যক। দুর্গাবাড়ীতে প্রাতস্মরণীয় রাণী ভবানীর অনেক কীর্ত্তি আছে। বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে ইহা কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। দুর্গাকুণ্ডে বার-

মাসই আনন্দোৎসব কিন্তু শারদীয় পূজার সময় সমারোহ কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়। শ্রাবণ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে এইস্থানে একটী করিয়া মেলা হইয়া থাকে। দুর্গাকুণ্ড অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় অবস্থিত বলিয়া মেলার জাঁকটা কিছু বাড়িয়া উঠে। দুর্গাকুণ্ডে যাইবার আশে পাশে বৃক্ষ কোটরে ও শাখা প্রশাখায় অনেক বানর দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা সহসা কাহারও কিছু অনিষ্ট করে না—কিন্তু পূজা না লইয়াও ছাড়ে না। আহার্য্য দ্রব্য ছড়াইয়া দিলে ইহারা সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্যের অংশ না দিয়া ইহাদের সম্মুখ দিয়া তাহা খুলিয়া আনিলে তৎক্ষণাৎ লুঠ করিয়া লয়। আমরা স্বচক্ষে একটী লোকের এই প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়াছি।

এক্ষণে দেবদেবীর কথা ছাড়িয়া আমরা বারাণসীর অন্যান্য বিবরণ প্রদান করিব। মানমন্দির বারাণসীর মধ্যে হিন্দু মনীষার জাজ্জল্যমান কীর্ত্তি। যে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষামুগ্ধ মহাত্মারা "হিন্দুদের কিছুই নাই" বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেন—তাঁহাদের একবার মানমন্দির দেখিতে অনুরোধ করি। যদিও আজ কাল মানমন্দিরের সেই পূর্ব্বশ্রী, সর্ব্বাবয়বপূর্ণ মূর্ত্তি নাই—যদিও ইহা কালের কঠিন হস্ত পীড়নে ভগ্ন প্রায় হইয়াছে তথাপি ইহাতে যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহা দেখিলে হিন্দুর উদ্ভাবনী শক্তির প্রখরতা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মানমন্দির একটী প্রকাণ্ড সৌধ। নদীতীর হইতে ইহার দৃশ্য বড় মনোহর। জনশ্রুতি এই পূর্ব্বে এইস্থলে অম্বররাজ মানসিংহের আবাসস্থান ছিল পরে মহারাজ জয়সিংহ সেই আবাস স্থান ভঙ্গ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই মানমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

অম্বর রাজ জয়সিংহ, বাদসাহ মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নূতন বৎসর গণনায় সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি নিরূপণ কবিবার জন্য এই মন্দির প্রস্তুত করেন। এই মানমন্দির স্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে পাঠক, ৫ম খণ্ড আসিয়াটিক রিসার্চ্চস্ নামক প্রাচীন পুস্তকে পাইতে পারেন। বারাণসী ভিন্ন, জয়সিংহ দিল্লী, জয়পুর, মথুরা ও উজ্জয়িনীতে আরও চারিটী মানমন্দির স্থাপিত করেন। মহারাজ জয়সিংহ শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যাতেই সুদক্ষ ছিলেন—যে সময়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নাম গন্ধ আমাদের দেশে প্রবেশ করে নাই সেই সময়ে তিনি গভীর গবেষণা দ্বারা জ্যোতিষিক কূটতত্ত্বের অনুশীলন করিয়া অনেক নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত ভিত্তি যন্ত্র, চক্র যন্ত্র, যন্ত্র সম্রাট, দিগাংশচন্দ্র প্রভৃতি ভগ্নাবস্থাতেও তাঁহার কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। নিজ চক্ষে দেখা ভিন্ন লেখনীতে চিত্রের বিনা সাহায্যে এ সমস্ত বিষয় বিশদ রূপে বুঝান নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং এবিষয়ে যাঁহাদের কৌতূহল জন্মিবে স্বচক্ষে এই সমস্ত দেখিবার নিমিত্ত তাঁহাদের অনুরোধ করি।

এই মানমন্দিরে বসিয়া জয়সিংহের পরবর্ত্তী কয়েক জন কৃতবিদ্য রাজপুত রাজ

যুবাগণ জ্যোতিষালোচনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী এম্ বর্ণিয়ার এই স্থলে কয়েকটী রাজপুতকুমারকে জ্যোতিষালোচনা করিতে দেখিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

নূতন প্রেম।

আবার মোরে পাগল করে্য
দিবে কে!
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন,
বিরাগ-ভরা বিবেকে!
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী,
পাষাণ হ'তে উছল-স্রোতে
বহায় যদি!
আবার দুটী নয়নে লুটি
হৃদয় হরে্য নিবে কে!
আবার মোরে পাগল করে্য
দিবে কে!

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা!
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে্য
স্বরগ হ'তে করুণা!
নিশীথ নভে শুনিব কবে
গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব
নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী উষা অরুণা!
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা!

এমনধারা নয়ন তারা
কোথা বল্,
যাহারে হেরি আকাশ ঘেরি
তারার লাগে কুতুহল!
মালতী যারে চিনিতে পারে
আপনা বলি,
হেরিয়া যাহে ঝাঁপিতে চাহে
আকুল অলি!
আলোকে যার ঘরের বা'র
লাজুক শোভা দলে-দল,
এমন ধারা নয়ন তারা
কোথা বল!

কোথা এ মোর জীবন ডোর
বাঁধা রে!
প্রেমের ফুল ফুটে্য আকুল
কোথায় কোন আঁধারে!
গভীরতম বাসনা মম
কোথায় আছে!
আমার গান আমার প্রাণ
কাহার কাছে!

কোন্ গগণে মেঘের কোণে
লুকায়ে কোন্ চাঁদ রে,
কোথা এ মোর জীবন ডোর
বাঁধা রে !

কাহারে পেল্যে আবার মেলে
আপনা !
কাহার সনে গত জীবনে
করেছি নিশি যাপনা !
মিলন মোহে ছিলাম দোঁহে,—
কুহক বলে
মিশাল হায় লতা পাতায়
ঝরণা জলে !
উঠিছে কাঁপি জগতব্যাপী
বিরহ-তাপ-তাপনা !
তাহারে পেল্যে আবার মেলে
আপনা !

অনেক দিন পরাণহীন
ধরণী !
খাঁচায় বাঁধা বসনে আঁধা
তামস-ঘন-বরণী।
নাই সে শাখা নাই সে পাখা
নাই সে পাতা,
নাই সে ছবি নাই সে রবি
নাই সে গাথা !
জীবন চলে আঁধার জলে
আলোকহীন তরণী,
অনেক দিন পরাণহীন
ধরণী !

গেয়েছে পাখী ছেয়েছে শাখী
মুকুলে !
গানের গান প্রাণের প্রাণ
কোথায় তারা লুকোলে !
ফুটে গো বটে আকাশ পটে
তারার হার,
চাহে না মুখে হাসে না সুখে
ডাকে না আর !
জগৎ, আঁখি রেখেছে ঢাকি
অভিমানের দুকুলে !
গায় কি পাখী, ছায় কি শাখী
মুকুলে ?

মায়া-কারায় মৃতের প্রায়
সকলি !
শতেক পাকে জড়ায়ে রাখে
ঘুমের ঘোর শিকলি !
দানব-হেন আছে কে যেন
দুয়ার আঁটি !
কাহার কাছে না জানি আছে
সোণার কাঠি !
পরশ লেগ্যে উঠিবে জেগ্যে
হরষ-রস-কাকলি !
মায়া-কারায় মৃতের প্রায়
সকলি !

দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি-
আবরণ !
তাহার হাতে আঁখির পাতে
জগৎ-জাগা-জাগরণ !
সে হাসিখানি আনিবে টানি
সবার হাসি !
গড়িবে গেহ জাগাবে স্নেহ
জীবন রাশি !

প্রকৃতি-বধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ,
সে দিবে খুলি এ ঘোর ধূলি-
আবরণ!

পাগল করে্য দিবে সে মোরে
চাহিয়া—
হৃদয়ে এস্যে মধুর হেস্যে
প্রাণের গান গাহিয়া!

আপনা-থাকি ভাসিবে আঁখি
আকুল নীরে;
ঝরণা সম জগৎ, মম
ঝরিবে শিরে!
তাহার বাণী' দিবে গো আনি
সকল বাণী বাহিয়া,
পাগল করে্য দিবে সে মোরে
চাহিয়া!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলস্য ও সাহিত্য।

অবসরের মধ্যেই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সাহিত্যের বিকাশ কিন্তু তাই বলিয়া আলস্যের মধ্যে নহে। মানবের সহস্র কার্য্যের মধ্যে সাহিত্যও একটি কার্য্য। সুকুমার বিকশিত পুষ্প যেমন সমগ্র কঠিন ও বৃহৎ বৃক্ষের নিয়তশ্রমশীল জীবনের লক্ষণ, তেমনি সাহিত্যও মানবসমাজের জীবন, স্বাস্থ্য ও উদ্যমেরই পরিচয় দেয়। যেখানে সকল জীবনের অভাব সেখানে যে সাহিত্য জন্মিবে ইহা আশা করা দুরাশা। বৃহৎ বটবৃক্ষ জন্মিতে ফাঁকা জমির আবশ্যক, কিন্তু মরুভূমির আবশ্যক এমন কথা কেহই বলিবে না।

সুশৃঙ্খল অবসর সে ত প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল, আর উচ্ছৃঙ্খল জড়ত্ব অলসের অনায়াসলব্ধ অধিকার। উন্নত সাহিত্য, যাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যাইতে পারে, তাহা উদ্যমপূর্ণ সজীব সভ্যতার সহিত সংলগ্ন স্বাস্থ্যময়, সৌন্দর্য্য ময় আনন্দময় অবসর। যে পরিমাণে জড়ত্ব, সাহিত্য সেই পরিমাণে খর্ব্ব ও স্বাস্থ্যরহিত, সেই পরিমাণে তাহা কল্পনার/উদার দৃষ্টি ও হৃদয়ের স্বাধীন গতির প্রতিরোধক। অযত্নে যে সাহিত্য ঘনাইয়া উঠে তাহা জঙ্গলের মত আমাদের স্বচ্ছ নীলাকাশ, শুভ্র আলোক, বিশুদ্ধ সুগন্ধ সমীরণকে বাধা দিয়া রোগ ও অন্ধকারকে পোষণ করিতে থাকে।

দেখ, আমাদের সমাজে কার্য্য নাই, আমাদের সমাজে কল্পনাও নাই, আমাদের সমাজে অনুভাবশক্তিও তেমন প্রবল নহে। অথচ একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে বাঙ্গালিদের অনুভাবশক্তি ও কল্পনাশক্তি সবিশেষ তীব্র। বাঙ্গালীরা যে কাজের লোক এ কথা এ পর্য্যন্ত সাহস করিয়া কেহই বলিতে পারে নাই। কিন্তু

বাঙ্গালিরা যে অত্যন্ত কাল্পনিক ও সহৃদয় এ কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে বিস্তর অপবাদের ভাগী হইতে হয়।

কাজ যাহারা করে না তাহারা যে কল্পনা করে ও অনুভব করে এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়! সুস্থ কল্পনা ও সরল অনুভাবের গতিই কাজের দিকে, আস্‌মান ও আলস্যের দিকে নহে। চিত্রকরের কল্পনা তাহাকে ছবি আঁকিতেই প্রবৃত্ত করে, ছবিতেই সে কল্পনা আপনার পরিণাম লাভ করে। আমাদের মানসিক সমুদয় বৃত্তিই নানা আকারে প্রকাশ পাইবার জন্য ব্যাকুল। বাঙ্গালীর মন সে নিয়মের বহির্ভূত নহে! যদি একথা স্বীকার করা হয় সহজে বাঙ্গালীকে কাজে প্রবৃত্ত করা যায় না, তবে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি সকল দুর্ব্বল।

কল্পনা যাহাদের প্রবল বিশ্বাস তাহাদের প্রবল, বিশ্বাস যাহাদের প্রবল তাহারা আশ্চর্য্য বলের সহিত কাজ করে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির ন্যায় বিশ্বাসহীন জাতি নাই। ভূতপ্রেত, হাঁচিটিক্‌টিকি, আধ্যাত্মিক জাতিভেদ ও বিজ্ঞানবহির্ভূত অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সকলের প্রতি একপ্রকার জীবনহীন জড় বিশ্বাস থাকিতে পারে কিন্তু মহত্ত্বের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই। আফিসযানের চক্রচিহ্নিত পথ ছাড়িলে বৃহৎ জগতে আর কোথাও যে কোন গন্তব্য পাওয়া যাইবে ইহা কিছুতেই মনে লয় না। বড় ভাব ও বড় কাজকে যাহারা নীহার ও মরীচিকা বলিয়া মনে করে তাহাদের কল্পনা যে সবিশেষ সজীব তাহার প্রমাণ কি? স্পেনদেশ কলম্বসকে বিশ্বাস করিতে বহু বিলম্ব করিয়াছিল, কিন্তু যদি কোন সুযোগে বিধির কোন বিপাকে বঙ্গদেশে কোন কলম্বস্ জন্মগ্রহণ করিত তবে দালান ও দাওয়ার আর্য্য দলপতি এবং আফিসের হেডকেরাণীগণ কি কাণ্ডটাই করিত। দুইচারিজন অনুগ্রহপূর্ব্বক সরল ভাবে তাহাকে পাগল ঠাহরাইত এবং অবশিষ্ট সুচতুরবর্গ যাহারা কিছুতেই ঠকে না, এবং যাহাদের যুক্তিশক্তি অতিশয় প্রখর অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বদা সজাগ এবং কথায় কথায় চোখ টিপিয়া থাকে তাহারা বক্রবুদ্ধিতে দুইচারি পেঁচ লাগাইয়া আমাদের কৃষ্ণকায় কলম্বসের সহস্র সঙ্কীর্ণ নিগূঢ় মৎলব আবিষ্কার করিত—এবং আপন আফিসও দর্‌দালানের স্থানসঙ্কীর্ণতা হেতুই অতিশয় আরাম অনুভব করিত।

বাঙ্গালীরা কাজের লোক নহে কিন্তু বিষয়ী লোক। অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে "কাজ কি বাপু!" ভরসা করিয়া তাহারা বুদ্ধিকে ছাড়া দিতে পারে না; সমস্তই কোলের কাছে জমা করিয়া রাখে, এবং যত সব ক্ষুদ্র কাজে সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বুদ্ধিকে অত্যন্ত প্রচুর বলিয়া বোধ করে। সুতরাং বড় কাজ, মহৎ লক্ষ্য, সুদূর সাধনাকে ইহারা সর্ব্বদা উপহাস অবিশ্বাস ও ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু কল্পনাকে এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবার ফল হয় এই,

জগতের বৃহত্ত্ব দেখিতে না পাইয়া আপনাকে বড় বলিয়া ভুল হয়। নিরুদ্যম কল্পনা অধিকতর নিরুদ্যম হইয়া মৃতপ্রায় হয়। তাহার আকাঙ্খার পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অভিমানস্ফীত হৃদয়ের মধ্যে রুদ্ধ কল্পনা রুগ্ন ও রোগের আকর হইয়া বিরাজ করিতে থাকে।

ইহার প্রমাণ স্বরূপে দেখ আমরা আজকাল আপনাকে কতই বড় মনে করিতেছি। চতুর্দ্দিকে অষ্টাদশ সংহিতা এবং বিংশতি পুরাণ গাঁথিয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে ক্রমাগত অন্ধকার ও অহঙ্কার সঞ্চয় করিতেছি। বহুসহস্রবৎসর পূর্ব্বে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্বজাতিকে পার্শ্ববর্ত্তী কৃষ্ণচর্ম্ম অসভ্য জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের ও তাঁহাদের দাসবর্গের হীনবুদ্ধি, ক্ষীণকায়, দীনপ্রাণ, অজ্ঞান-অধীনতায় অভিভূত সন্ততি ও পোষ্যসন্ততিগণ আপনাকে পবিত্র, আর্য্য ও সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া আস্ফালন করিতেছি এবং প্রভাতের স্ফীতপুচ্ছ ঊর্দ্ধগ্রীব কুক্কুটের ন্যায় সমস্ত জাগ্রত জগতের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার তারস্বর উত্থাপন করিতেছি! পশ্চিমের বৃহৎ সাহিত্য ও বিচিত্র জ্ঞানের প্রভাবে এক অভ্যুন্নত, তেজস্বী, নিয়তগতিশীল, জীবন্তমানব সমাজের বিদ্যুৎপ্রাণিতস্পর্শ লাভ করিয়াও তাহাদের মহত্ত্ব যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না এবং বিবিধভঙ্গীসহকারে ক্ষীণ তীক্ষ্ণ সানুনাসিকস্বরে তাহাকে ম্লেচ্ছ ও অনুন্নত বলিয়া প্রচার করিতেছি ইহাতে কেবল মাত্র আমাদের অজ্ঞতার অন্ধ অভিমান প্রকাশ পাইতেছে না ইহাতে আমাদের কল্পনার জড়ত্ব প্রমাণ করিতেছে। আপনাকে বড় বলিয়া ঠাহরাইতে অধিক কল্পনার আবশ্যক করে না—কিন্তু যথার্থ বড়কে বড় বলিয়া সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে উন্নত কল্পনার আবশ্যক।

অলস কল্পনা পবিত্র জীবনের অভাবে দেখিতে দেখিতে এইরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। আলস্যের সাহিত্যও তদনুসারে বিকৃত আকার ধারণ করে। ছিন্নবল্গ রথভ্রষ্ট অশ্বের ন্যায় অসংযত কল্পনা পথ হইতে বিপথে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে দক্ষিণও যেমন বামও তেমনি—কেন যে এদিকে না গিয়া ওদিকে যাই তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেখানে আকার আয়তনের মাত্রা পরিমাণ থাকে না। বলা নাই কহা নাই সুন্দর হঠাৎ কদর্য্য হইয়া উঠে। সুন্দরীর দেহ সুমেরু ডমরু মেদিনী গৃধিনী শুকচঞ্চু কদলী হস্তিশুণ্ড প্রভৃতির বিষম সংযোগে গঠিত হইয়া রাক্ষসীমূর্ত্তি গ্রহণ করে। হৃদয়ের আবেগ কল্পনার তেজ হারাইয়া কেবল বঙ্কিম কথা-কৌশলে পরিণত হয়। যথা—

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা,
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা।

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা,
একরাতি মোর দোষে না কহিল কথা ;
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে,
ছলে হাঁচিলাম "জীব" বাক্য বলাইতে।
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল,
জানায়ে পরিল কানে কনককুণ্ডল। বিদ্যাসুন্দর।

এইরূপ অত্যদ্ভুত মানসিক ব্যায়ামচর্চ্চার মধ্যে শৈশব-কল্পনার আত্মবিস্মৃত সরলতাও নাই এবং পরিণত কল্পনার সুবিচারসঙ্গত সংযমও নাই। শাসন মাত্র বিরহিত আদর ও আলস্যে পালিত হইলে মনুষ্য যেমন পুত্তলীর মত হইয়া উঠে, শৈশব হারায় অথচ কোনকালে বয়োলাভ করে না এবং এইরূপে একপ্রকার কিম্ভূত বিকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, অনিয়ন্ত্রিত আলস্যের মধ্যে পুষ্ট হইলে সাহিত্যও সেইরূপ অদ্ভূত বামণমূর্ত্তি ধারণ করে।

চিরকালই সকল বিষয়েই আলস্যের সহিত দারিদ্র্যের যোগ। সাহিত্যেও তাহার প্রমাণ দেখা যায়। অলস কল্পনা আর সমস্ত ছাড়িয়া উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে। প্রকৃতির মহৎ সৌন্দর্য্যসম্পদে তাহার অধিকার থাকে না, পরম সন্তুষ্টচিত্তে আবর্জ্জনা-কণিকার মধ্যে সে আপনার জীবিকা সঞ্চয় করিতে থাকে। কুমারসম্ভবের মহাদেবের সহিত অন্নদামঙ্গলের মহাদেবের তুলনা কর। কল্পনার দারিদ্র্য যদি দেখিতে চাও অন্নদামঙ্গলে মদনভস্ম পাঠ করিয়া দেখ। বদ্ধ মলিন জলে যেমন দূষিত বাষ্পস্ফীত গাঢ় বুদ্বুদশ্রেণী ভাসিয়া উঠে তেমনি আমাদের এই বিলাস কলুষিত অলস বঙ্গ-সমাজের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতা ও ইন্দ্রিয় বিকারে পরিপূর্ণ হইয়া অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন আলস্যের মধ্যে এইরূপ সাহিত্যই সম্ভব।

ক্ষুদ্র কল্পনা হয় আপনাকে সহস্র মলিন ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত লিপ্ত করিয়া রাখে নয় সমস্ত আকার আয়তন পরিহার করিয়া বাষ্পরূপে মেঘরাজ্য নির্ম্মাণ করিতে থাকে। তাহার ঠিকঠিকানা পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে দৈবাৎ এক একটা আকৃতিমতী মূর্ত্তির মত দেখা যায় কিন্তু মনোযোগ করিয়া দেখিতে গেলে তাহার মধ্যে কোন অভিব্যক্তি বা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাকে ঘন বলিয়া মনে হয় তাহা বাষ্প, যাহাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয় তাহা মরীচিকা। কেহ কেহ বলিতেছেন আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ কল্পনা-কুজ্ঝটিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহা যদি সত্য হয় তবে ইহাও আমাদের ক্ষীণ ও অলস কল্পনার পরিচায়ক।

বলা বাহুল্য ইতিপূর্ব্বে যখন আমি লিখিয়াছিলাম যে অবসরের মধ্যেই সাহিত্যের বিকাশ তখন আমি এরূপ মনে করি নাই যে অবসর ও আলস্য একই। কারণ আলস্য কার্য্যের বিঘ্নজনক এবং অবসর কার্য্যের জন্মভূমি।

কতকগুলি কাজ আছে যাহা সমস্ত অবসর হরণ করিয়া লইবার প্রয়াস পায়। সেইরূপ কাজের বাহুল্যে সাহিত্যের ক্ষতি করে। যাহা নিতান্তই আপনার ছোট কাজ, যাহার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে দাপিয়া বেড়াইতে হয়, যাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝঞ্ঝনি খিটিমিটি খুঁটিনাটি দুশ্চিন্তা লাগিয়াই আছে, তাহাই কল্পনার ব্যাঘাত-জনক। বৃহৎ-কাজ আপনি আপনার অবসর সঙ্গে লইয়া চলিতে থাকে। খুচ্‌রা কাজের অপেক্ষা তাহাতে কাজ বেশী এবং বিরামও বেশী। বৃহৎ কাজে মানবহৃদয় আপন সঞ্চরণের স্থান পায়। সে আপন কাজের মহত্ত্বে মহৎ আনন্দ লাভ করিতে থাকে। মহৎ কাজের মধ্যে বৃহৎ সৌন্দর্য্য আছে, সেই সৌন্দর্য্যই আপন বলে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়কে কাজ করায় এবং সেই সৌন্দর্য্যই আপন সুধাহিল্লোলে হৃদয়ের শ্রান্তিদূর করে। মানুষ কখনও ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কাজ করে কখন ঝঞ্ঝটে পড়িয়া কাজ করে। কতক-গুলি কাজে তাহার জীবনের প্রসর বৃদ্ধি করিয়া দেয় কতকগুলি কাজে তাহার জীবনকে একটা যন্ত্রের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। কোন কোন কাজে সে আপনাকে কর্ত্তা আপনাকে দেবসন্তান বলিয়া অনুভব করে আবার কোন কোন কাজে সে আপ-নাকে কঠিন নিয়মে অবিশ্রাম পরিচালিত এই বৃহৎ যন্ত্র-জগতের এক ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া মনে করে। মানুষের মধ্যে মানবও আছে যন্ত্রও আছে উভয়েই একসঙ্গে কাজ করিতে থাকে, কাজের গতিকে কেহ কখনও প্রবল হইয়া উঠে। যখন যন্ত্রই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে তখন আনন্দ থাকে না, সাহিত্য চলিয়া যায়, অথবা সাহিত্য যন্ত্রজাত জীবন-হীন পরিপাটি পণ্যদ্রব্যের আকার ধারণ করে।

বাঙ্গালা দেশে একদল লোক কোন কাজ করে না, আর একদল লোক খুচ্‌রা কাজে নিযুক্ত। এখানে মহৎ উদ্দেশ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান নাই, সুতরাং জাতির হৃদয়ে উন্নত সাহিত্যের চির-আকরভূমি গভীর আনন্দ নাই। বসন্তের প্রভাতে যেমন বিহঙ্গেরা গান গাহে তেমনি বৃহৎ-জীবনের আনন্দে সাহিত্য জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই জীবন কোথায়! বঙ্গদর্শন যখন ভগীরথের ন্যায় পাশ্চাত্যশিখর হইতে স্বাধীন ভাবস্রোত বাঙ্গালার হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিলেন তখন বাঙ্গালা একবার নিদ্রো-খিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে এক নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার আকাঙ্খা জাগ্রত বিহঙ্গের ন্যায় নূতন ভাবালোকে বিহার করিবার জন্য উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সে এক সুন্দর ও মহৎজীবনের সঙ্গসুখ লাভ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে সহসা নবযৌবনের পুলক অনুভব করিতেছিল। পৃথিবীর কাজ করিবার জন্য একদিন বাঙ্গালীর প্রাণ যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—সেই সময়ে বঙ্গসাহিত্য মুকুলিত হইতেছিল। এমন সময়ে কোথা হইতে বার্দ্ধক্যের শীতবায়ু বহিল। প্রবীন লোকেরা কহিতে লাগিল "এ কি মত্ততা! ছেলেরা সৌন্দর্য্য দেখিয়াই ভুলিল এ দিকে তত্ত্বজ্ঞান যে ধূলি-ধূসর হইতেছে!" আমরা চিরদিনের সেই তত্ত্বজ্ঞানী জাতি। তত্ত্বজ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া আবার

সৌন্দর্য্য ভুলিলাম। প্রেমের পরিবর্ত্তে অহঙ্কার আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। এখন বলিতেছি, আমরা মস্তলোক, কারণ আমরা কুলীন, আমাদের অপেক্ষা বড় কেহই নাই। পশ্চিমের শিক্ষা ভ্রান্তশিক্ষা। মনু অভ্রান্ত! কথাগুলা আওড়াইতেছি অথচ ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কুটিল ব্যাখ্যা দ্বারা অবিশ্বাসকে বিশ্বাস বলিয়া প্রমাণ করিতেছি। এ উপায়ে প্রকৃত বিশ্বাস বাড়ে না, কিন্তু অহঙ্কার বাড়ে। বুদ্ধিকৌশলে দেবতাকে গড়িয়া তুলিয়া আপনাকেই দেবতার দেবতা বলিয়া মনে হয়। দিনকতকের জন্য অনুষ্ঠানের বাহুল্য হয় কিন্তু ভক্তির সজীবতা থাকে না। যাহা আছে তাহাই ভাল, মিথ্যা তর্কের দ্বারা এইরূপ মন ভুলাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার ইচ্ছা হয়। জীবন্ত জগতের মধ্যে কোথাও যথার্থ মহত্ত্ব নাই— আছে কেবল এক মৃত জাতির অঙ্গবিকারের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাসের ভান করিয়া আমরা আরামে মৃত্যুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরম নিশ্চেষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্বগর্ব্বসুখ ভোগ করিতে থাকি। এরূপ অবস্থায় উদ্যমহীন, আকাঙ্খাহীন, প্রেমহীন, ছিন্নপক্ষ সাহিত্য যে ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! এখন সকলে মিলিয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মাভিমান প্রচার করিতেছে।

এই জড়ত্ব, অবিশ্বাস ও অহঙ্কার চিরদিন থাকিবে না। দীপ আপন নির্ব্বাপিত শিখার স্মৃতিমাত্র লইয়া কেবল অহর্নিশি দুর্গন্ধধূম বিস্তার করিয়াই আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। জ্বলন্ত প্রদীপের স্পর্শে সে আবার জ্বলিয়া উঠিবে এবং সে আলোক তাহার নিজেরই আলোক হইবে। দ্বার রোধপূর্ব্বক অন্ধকারে ইহসংসারের মধ্যে আপনাকেই একাকী বিরাজমান মনে করিয়া একপ্রকার নিশ্চেষ্ট পরিতোষ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু একবার যখন বাহির হইয়া সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইব, এই বৃহৎ বিক্ষুব্ধ মানবজীবনের মধ্যে আপন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিব, আপন নাভিপদ্মের উপর হইতে স্তিমিতদৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া মুক্ত আকাশের মধ্যে বিকশিত আন্দোলিত জ্যোতির্ম্ময় সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব, তখনই আমরা আমাদের যথার্থ মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব—তখন জানিতে পারিব সহস্র মানবের জন্য আমার জীবন, এবং আমার জন্য সহস্র মানবের জীবন। তখন সঙ্কীর্ণ সুখ ও অন্ধ গর্ব্ব উপভোগ করিবার জন্য কতকগুলা ঘরগড়া তুচ্ছ মিথ্যারাশি ও ক্ষুদ্রতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যকতা চলিয়া যাইবে। তখন যে সাহিত্য জন্মিবে তাহা সমস্ত মানবের সাহিত্য হইবে, এবং সে সাহিত্য উপভোগ করিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুদ্র মত ও বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যাকৌশলের প্রয়োজন থাকিবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উদ্ভিদের জীবন রক্ষার নবাবিষ্কৃত উপায়।

একটী কথা আছে 'মানুষ সব পারে কিন্তু প্রাণ দিতে পারে না'। পদার্থ বিজ্ঞান আমাদিগকে অনেক বিদ্যা শিখাইয়াছে—কিন্তু এখনো সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিখাইতে পারে নাই। বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সচ্ছন্দে যাতায়াত করিতেছে আকাশের বিদ্যুৎ ধরিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংবাদ বহন করিতেছে, পৃথিবীর উপর বসিয়া আকাশের অন্তর ভেদ করিতেছে, বিজ্ঞানের বলে মানুষ অনেক দূর উঠিয়াছে কিন্তু এখনো অতদূর উঠিতে পারে নাই।

এখনও পারে নাই সত্য কিন্তু কে জানে আর কতদিন ও কথাটীর দর্প থাকিবে। উনবিংশ শতাব্দীতে যাহা হয় নাই বিংশ শতাব্দীতে হয়ত তাহা সফল হইবে। মহাবীর নেপলিয়ন বলিয়াছিলেন অভিধান হইতে 'অসম্ভব' এই কথাটী উঠাইয়া দেওয়া উচিত কারণ অসম্ভব কথার কোন অর্থ নাই, কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না। আজ এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষের বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা দেখিয়া আমাদেরও কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

সকলেই জানেন উদ্ভিদ চেতন বস্তু, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, প্রকৃতি উদ্ভিদের জীবন-দাতা। এতদিন কেবল সূর্য্যই উদ্ভিদের জীবন রক্ষক বলিয়া দর্প করিতে পারিত এখন তাহার সে দর্প চূর্ণ হইয়াছে। মানুষ সূর্য্যের উত্তাপ না লইয়া উদ্ভিদের জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমাদিগের জীবন যেমন খাদ্য জল ও বায়ুর উপর নির্ভর করে উদ্ভিদগণের জীবনও সেইরূপ বায়ুস্থিত জলীয়বাষ্প ও কার্ব্বনিক আসিডের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদগণ ক্লোরোফিলের অর্থাৎ পাতা মধ্যস্থিত সবুজ-বর্ণ পদার্থের সাহায্যে বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক আসিডের অণুগুলিতে রাসায়নিক বিয়োগ ঘটাইয়া তাহা হইতে অঙ্গারের অণু গ্রহণ করে। এই অঙ্গার অণু ও জলীয় অণু তাহাদের শরীর গঠনের প্রধান উপকরণ। অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় উদ্ভিদের গাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠময়। প্রথম এই প্রকোষ্ঠ গুলিতে প্রটোপ্লাজম নামে এক প্রকার বর্ণহীন জীবন্ত অর্দ্ধ তরল পদার্থ থাকে, সূর্য্যের উত্তাপে পুষ্টি লাভ করিয়া ক্রমে এই পদার্থ সবুজ বর্ণ ধারণ করে। তখন ইহা অঙ্গার গ্রহণ কারী-ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সূর্য্য-তাপই যে ক্লোরোফিলের উৎপত্তির কারণ, তাহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। রৌদ্র-হীন স্থানে কোন উদ্ভিদ রাখিলে দেখা যায় ক্রমে তাহার ক্লোরোফিলের অণুগুলি হ্রাস হইয়া আসে ও অবশেষে বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া বৃক্ষের প্রাণ হানি করে। সুতরাং বৃক্ষের জীবন রক্ষার্থে সূর্য্য তাপ বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু কিছুদিন হইল পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে সূর্য্য তাপের পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক তাপে উদ্ভিদকে বাঁচাইয়া রাখা যাইতে

পারে। তড়িৎ বিদ্যাবিৎ প্রসিদ্ধ ডাক্তার সিমেন্স ইহার আবিষ্কারক। সূর্য্যতাপে আমাদের যেরূপ গাত্র দহন হয়, তড়িৎতাপেও অনেকটা সেইরূপ গাত্র দহন হয়, উভয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখিয়া সূর্য্যের পরিবর্ত্তে তড়িৎ দ্বারা উদ্ভিদের জীবন রক্ষার কথা তাঁহার মনে প্রথম উদয় হয় এবং তিনি ইহার পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

বৈদ্যুতিক আলোক উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ডাক্তার সিমেনস্ যে যন্ত্র ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহার নিজের প্রস্তুত এবং তাঁহার স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ। এই যন্ত্র এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই, যে নিয়মে ইহার কার্য্য হইয়া থাকে তাহা আমরা এস্থলে সংক্ষেপে বলিতেছি। তড়িতের গুণ এই যে তাহা দ্বারা লৌহে চুম্বকের ধর্ম্ম জন্মে আবার চুম্বকের গুণ এই যে তাহার দ্বারা ধাতুনির্ম্মিত তারে তড়িতের ধর্ম্ম জন্মে। সিমেন্স্ প্রণীত ও অন্যান্য যন্ত্রে এই দুইটি গুণের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। সিমেন্সের যন্ত্রে একটী ঢাকের আকার লৌহ খণ্ডের উপর লম্বালম্বি ভাবে অনেকখানি তার জড়ান আছে, তারের উপর ও নীচে কতকগুলি বক্র লৌহের পাত আছে ঐ পাতগুলি ঢাকটীকে আবরণ করিয়া দুই পাশে বাহির হইয়া থাকে। বহির্গত অংশগুলি আলগা না রাখিয়া তার দিয়া জড়ান হইয়া থাকে, এই তারের সহিত ঢাকের তারের সংযোগ আছে। এক্ষণে ঢাকটীকে উহার লম্বা অক্ষদণ্ডের উপর ঘুরাইতে থাকিলে উপরিস্থিত লৌহপাতের মধ্যস্থ চৌম্বক শক্তি দ্বারা ঢাকের উপরে জড়ান তারগুলিতে তড়িৎ জন্মে এবং সেই তড়িৎ, পাতের বহির্গত অংশগুলির উপর জড়ান তারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাতের চৌম্বক শক্তির বৃদ্ধি সাধন করে, ইহাতে আবার ঢাকের তারের তড়িৎ বৃদ্ধি পায়। এই রূপে ঢাক ও পাত পরস্পরের উপর কার্য্য করে, অর্থাৎ পাতে ঢাকের তড়িৎ বৃদ্ধি করে ঢাকে পাতের চৌম্বক শক্তি বৃদ্ধি করে। এই রূপে যে প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ পাওয়া যায় তাহা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী অঙ্গার দুই খণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে উজ্জ্বল আলোক পাওয়া যায়। ইহাই তড়িত জনিত আলোক। ডাক্তার সিমেন্স যে আলোকটী ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার তেজ ১৪০০ বাতীর তেজের সমান ও তাহার অঙ্গারদ্বয়ের একটীর পরিধি ১০ অপরটীর ১২ মিলিমিটর * এবং অঙ্গারদ্বয় গ্যাসের উত্তাপ দ্বারা চালিত হইয়াছিল। প্রথম পরীক্ষায় একটী 'মেলনপিটে' গাছ গুলি রাখা হইয়াছিল। কাঁকুড় ফুটী প্রভৃতি উৎপন্ন করিবার জন্য বিলাতে মাটীর মধ্যে এক প্রকার ঘর করা হয় তাহাকে মেলনপিট বলে। ইহার ভিতরটা দেখিতে পায়রার খোপের ন্যায়, উপরে আয়না দ্বারা মুখ বন্ধ। এই আয়নার দ্বারা ভিতরে উত্তাপ যাইতে পারে, কিন্তু বাতাস যাইতে পারে না।

মাটী হইতে ৭ ফুট উঁচুতে আলোটী এরূপ ভাবে স্থাপন করা হইল যে সমুদয় আলোক আসিয়া এই আয়নার মুখে পড়িল। তখন পরীক্ষার্থে কতকগুলি গাছ মেলন-পিটে রাখা হইল। তিন প্রকার প্রণালীতে উদ্ভিদ উত্তপ্ত করিয়া পরীক্ষা করা হইয়া-

* ৩৯.৩৭ ইঞ্চে এক মিটর। মিটরের এক সহস্রাংশ মিলিমিটর।

ছিল। কতকগুলি কেবল মাত্র সূর্য্য কিরণ দ্বারা এবং কতকগুলি কেবল মাত্র তড়িৎ তাপের দ্বারা আর কতকগুলি একবার সূর্য্যতাপ একবার তড়িৎতাপ এইরূপে উভয় বিধ তাপ দ্বারাই পরে পরে উত্তপ্ত করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত প্রণালী-পরীক্ষিত গাছগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় পরীক্ষায় তড়িতালোকটী একটী উদ্যান গৃহের কড়ির নিকটে রাখিয়া সপ্তাহকাল সমস্ত রাত্রি প্রজ্জলিত রাখা হইয়াছিল। আলোকের নিকটবর্ত্তী গাছগুলি অন্যান্য গাছগুলি অপেক্ষা সমধিক শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং বর্ণশ্রীতে অধিক উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছিল।

তড়িৎ তাপে ফলও খুব শীঘ্র পক্বতা লাভ করে। তড়িৎ ও সূর্য্য উভয়বিধ তাপ প্রভাবে কতকগুলি ষ্ট্রবেরী গাছের ফল ১০ দিনে পূর্ণতা লাভ করিয়া পাকিয়া লালবর্ণ হইয়াছিল কিন্তু কেবল সূর্য্য তাপে উত্তপ্ত তাহাদের সহজন্ম অন্যান্য গাছ গুলির ফল তখনও কঠিন ও হরিৎ বর্ণ ছিল।

Royal Institution এ এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিবার সময়ে ডাক্তার সিমেন্স কতকগুলি ফুলের কচি মুকুলে এই আলোক প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ২০ মিনিট পরেই মুকুল ফুটিয়া পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পাকারে পরিণত হইল।

বাজিকরগণ দু দশ মিনিটে আমগাছ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফল ধরায়, এই ব্যাপার আমরা তাহাদের হাতের একটা অপূর্ব্ব কৌশল মাত্র অন্য কথায় নিতান্ত জুয়াচুরি মাত্র বলিয়া মনে করি। কে জানে তাহারা উক্ত রূপ অজ্ঞাত কোন প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারাই এইরূপ ব্যাপার সাধিত করে কি না? ইহার পর আর তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

সূর্য্য তাপ অপেক্ষা তড়িৎ তাপ যে উদ্ভিদের সমধিক শ্রীবৃদ্ধিকারী, সূর্য্য তাপ হইতে তড়িৎ তাপে যে গাছ পাতা ফল ফুল প্রভৃতি অল্প সময়েও সুচারুরূপে পূর্ণতা লাভ করে সিমেন্সের পরীক্ষা দ্বারা তাহা সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। যদি এই কার্য্যের জন্য অল্প ব্যয়ে তড়িতের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে যে ইহা দ্বারা আমাদের অনেক সুবিধা হইবে এবং ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন তাহাও নিঃসন্দেহ। ডাক্তার সিমেন্স যে আলোক ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা ১৪০০ বাতীর আলোকের সমতেজবান এবং সে আলোক জন্মাইবার খরচ ঘণ্টায় প্রায় ৵০ দুই আনা হিসাবে পড়িয়াছিল। তাহা ভিন্ন মজুরী খরচ অবশ্য স্বতন্ত্র আছে। ডাক্তার সিমেন্স বলেন যে মাটী হইতে ২০ ফুট উর্দ্ধে স্থাপিত ৬০০০ বাতীর আলোকের সমতেজ একটী তড়িতালোকের সাহায্যে এত উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে গাছ ফল ফুল প্রভৃতি উৎপন্ন করা যাইতে পারে যে সে হিসাবে মোটের উপর তাহা অল্প ব্যয় সাধ্য ও লাভকর হইবার কথা। এখন তড়িৎ দ্বারা টেলিগ্রাফ প্রভৃতি অনেক কর্ম্ম সাধিত হয় এবং ক্রমেই তড়িতের মূল্য কমিয়া

আসিতেছে। এখন গ্যাসের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে তড়িতালোক ব্যবহৃত হয়, আর কিছুদিন পরে বোধ হয় তড়িৎ আরও সহজ প্রাপ্য হইবে এবং গ্যাসের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র তড়িতালোক প্রচলিত হইবে। তখন তড়িৎ দ্বারা উদ্ভিদ উৎপাদন প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মও সহজে সম্পাদিত হইতে পারিবে।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

সরলতা কি নিন্দাপ্রিয়তা?

সরলতার নিবাস স্বর্গে, কুটিলতার বসতি নরকে। সরলতা তাহার সরল সোজা সুগম্য একটি মাত্র পথে প্রশস্ত উদার রাজ্যের দিকে মনুষ্যকে অগ্রসর করে, কুটিলতা তাহার সহস্র বাঁকাচোরা ঘোরপ্যাচ, গলি ঘুঁজির মধ্যে মনুষ্যকে দিশাহারা করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব বিনাশ করে। স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় সরল ব্যক্তির অন্তরে বাহিরে নির্ম্মলতা বিরাজ করে, তাহার মনোভাব তাহার ভাষায় পরিব্যক্ত হয়। তাহার সরল মনের সরল ধর্ম্ম দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সে বিচার করে, তাহার সহজ সুবুদ্ধি জগৎ সংসারে সে প্রতিফলিত দেখে।

ধারাল পেঁচাল বাঁকাবুদ্ধিদিগের ন্যায় সে প্রত্যেকের সোজা কথার মধ্য হইতে বাঁকা মৎলব, সহজ কাজের মধ্য হইতে গূঢ় উদ্দেশ্য টানিয়া বাহির করিয়া আত্মাভিমানে স্ফীত হইতে থাকে না। সত্যের প্রতি, মহত্বের প্রতি, মঙ্গলের প্রতি তাহার সহজ হৃদয়ের সহজ বিশ্বাস লইয়া সে কাজ করে। এই জন্য অনেক সময় তাহার ঠকিতেও হয়, কুটিল লোকের মিথ্যা ছলনায় প্রতারিত হইয়া অনেক সময় সে যন্ত্রণা ভোগ করে, অনেক সময় সে প্রাণও হারায়।

কিন্তু নিজের বাঁকা নয়নের বাঁকা দৃষ্টিতে সমস্তই মন্দ দেখিয়া, পৃথিবী শুদ্ধ লোককে অবিশ্বাসী ভাবিয়া দিন দিন তিল তিল করিয়া সংশয়ে আধ্যাত্মপ্রাণ হারান অপেক্ষা বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইয়া যন্ত্রণাভোগ করা—এমন কি প্রাণ হারাণও কি সহস্র গুণে ভাল নহে? বিশ্বাস করিয়া যে যন্ত্রণাভোগ করা যায় সেকি যন্ত্রণা? সে যন্ত্রণার মধ্যে কত খানি তৃপ্তি কতখানি সুখ বিরাজ করিতেছে? বিশ্বাস করিয়া যে মরে, মরিবার কষ্ট তাহার নাই। সে মরে না আত্মবিসর্জ্জন করে, যে আত্মবিসর্জ্জন করে সে অমর।

সরলতা শব্দের প্রকৃত অর্থ যাহা, সরল লোকের প্রকৃত ছবি যাহা তাহাই উপরে বলিলাম। কিন্তু অধিকাংশ সময় প্রকৃত যাহা তাহা কল্পনার রাজ্যেই বিচরণ করে,

প্রকৃত জগতের সহিত প্রকৃতের সম্বন্ধ অল্পই দেখা যায়। সরল ব্যক্তির উল্লিখিত পোষাকি ছবি—কল্পনা দ্বারা আমরা যাহা মনশ্চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করি—তাহার সহিত যদি আমরা আমাদের দৈনিক জীবনের আটপৌরে সরল ব্যক্তিদের—যাহাদের আমরা সচরাচর সরল নামে সম্বোধন করিয়া থাকি—সাদৃশ্য অনুসন্ধান করি তাহা হইলে বিষম অসাদৃশ্য বই আর কিছুই দেখিতে পাই না।

প্রকৃত জগতে সরল শব্দের প্রকৃত অর্থ একেবারেই লোপ পাইয়াছে। লঘুহৃদয়, নির্ব্বোধ বা নিন্দাপ্রিয় ব্যক্তিই সংসারে সরল বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যেখানে একাধারে এই সমস্ত গুণগুলি বিরাজ করে, সেখানে সোনায় সোহাগা, তাঁহার সারল্যে জগৎ বিমুক্ত হয়।

আমি একজনকে জানি, তাহার প্রকাণ্ড শরীরের উপর ক্ষুদ্র গড়ানে মাথাটি দেখিবামাত্র তাঁহাকে নির্ব্বুদ্ধিতার একটি অবতার বলিয়া মনে হয়। সে ভাল্লুক মূর্ত্তি দেখিলে হঠাৎ ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ মনে পড়িয়া যায়, মতটা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। সরল বলিয়া ইঁহার দেশে বিদেশে একটা খ্যাতি আছে! ইনি দুদণ্ডের জন্য পরিচিত অপরিচিত যাহাকেই নিকটে পান তাঁহার কাছেই মুক্ত কণ্ঠ হইয়া কিন্তু অতি গোপনে আপনার প্রাণের সমস্ত লুকান কথা প্রকাশ করেন! লুকান কথাটা আর কিছুই নহে—তাঁহার আত্মীয় লোকের নিন্দা,—সম্পূর্ণ মিথ্যা নিন্দা।

যে বেচারীদের নিন্দা লইয়াই এইরূপে তিনি দিন যাপন করেন—তাঁহারা তাঁহার নিকট অন্য কোন অপরাধ করেন নাই—অপরাধের মধ্যে আজন্মকাল তাঁহার উপকারই করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে তাঁহার পরিবারগণকে চিরকাল প্রতিপালনই করিয়া আসিতেছেন, কেবল তাহাই নহে—আপনার স্ত্রীপুত্র ছাড়া মানুষ মানুষকে তেমন যত্ন করিয়া কদাচ প্রতিপালন করে। নিজের সম্বন্ধে যেখানে তাঁহারা হাত গুটাইয়া চলেন তাঁহার সম্বন্ধে সেখানেও তাঁহারা মুক্তহস্ত।

পরের নিন্দা শুনিতে ভাল লাগে না এমন অল্পই লোক আছে, বিশেষ বড় ঘরের নিন্দা—তা আবার ঘরের লোকেরি মুখে। নিন্দাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ঐ নিন্দাগুলা বড়ই আস্বাদে ভোগ করেন, এবং চিরস্থায়ী বন্দবস্তে ঐ মজাটাকে ভোগ দখল করিবার অভিপ্রায়ে নানারূপ প্রশংসা ও উৎসাহ বাক্যে উক্ত সরল ব্যক্তির সরলতা প্রবৃত্তিটাকে অনবরত প্রবল প্রতাপে বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

মজা এই, যাঁহারা বাস্তবিক নিন্দাপ্রিয় লোক নহেন, নিন্দার জন্যই নিন্দা শুনিয়া যাঁহারা আমোদ প্রাপ্ত হয়েন না—তাঁহারাও ঘরের লোকের মুখে ঘরের লোকের ঐরূপ গুপ্ত নিন্দা শুনিয়া আপ্যায়িত হইয়া যান। তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করেন—তিনিই একা—কিম্বা তাঁহারি মত দুচার জন মাত্র ঐ সরল ব্যক্তির বিশ্বাসভাজন—তাঁহাদিগকেই মাত্র অসাধারণ বিশ্বাস করিয়া লোকটা নিজের ঘরের কথা সব খুলিয়া বলে! এই মুক্ত-

কণ্ঠতায় তাঁহারাও দ্রবীভূত হইয়া যান, বন্ধুর সরলতায় আহাহা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

পরের বিশ্বাস লাভ করিয়াছি এই অহঙ্কার বড় অহঙ্কার। ইহাতে ভুলিয়া লোকে চারিদিক আর দেখিতে পায় না। যত দিন এবিশ্বাসটা ভাঙ্গিবার কারণ না ঘটে তত দিন নিন্দাকারীকে যথার্থই তাহার সরল বলিয়া মনে হয় এবং তাহার বন্ধুত্ব সে উপভোগ করে।

সে দিন আমি একটি বন্ধু লোকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম; তিনি সর্ব্বাগ্রেই আহ্লাদ সহকারে আমাকে খবর দিলেন—যে "সম্প্রতি তাঁহার সহিত একজনের আলাপ হইয়াছে, সে লোকটা এতই সরল যে ঘণ্টাকতকের মধ্যেই তাহার পেটের যত কথা সমস্তই তাঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছে।"

বলা বাহুল্য—সেই লুকান কথার অন্ততঃ অর্দ্ধেক তাহার নিজের আত্মীয়জনের নিন্দা।

আমার বন্ধুটি যদি জানিতেন—তাঁহার নব লভ্য বন্ধুটি—তাঁহার নিকট বলিয়া নহে সকলের নিকটেই ঐরূপ হৃদয় খুলিয়া থাকেন—তাহা হইলে বোধ করি তাঁহার আনন্দটা অত মারাত্মক হইত না। বসুধা যাহার কুটুম্ব তাহার প্রেম আদর্শপ্রেম সন্দেহ নাই—কিন্তু বসুধার কেহ সে প্রেমের জন্য আকাঙ্ক্ষী হইবে এরূপ বোধ হয় না।

এইখানে একটি কথা উঠিতে পারে—কেহ বলিতে পারেন, কেন অল্পক্ষণের মধ্যে কি প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন হইতে পারে না? আর অল্পক্ষণেই হৌক বেশীক্ষণেই হৌক একবার বন্ধু বলিয়া মনে হইলে তাহার কাছে ত প্রাণ খোলাই স্বাভাবিক। নিন্দা বল, প্রশংসা বল, সুখ বল, দুঃখ বল—যাহা নিজের মনের ভিতর রহিয়াছে এবং যাহা প্রকাশ করিলে লোকের বিশ্বাস ভাঙ্গিতে হয় না—নিজের বন্ধুর কাছে তাহা বলিব না ত কি? ওরূপ স্থলে যে নিন্দা—তাহার অভিপ্রায় বাস্তবিক নিন্দা করা নহে,—তাহার অভিপ্রায় আপনার মনের কথা খুলিয়া মনের ভার লাঘব করা, সুখ দুঃখ দুজনে একত্র ভোগ করা, কথোপকথনে মনুষ্য চরিত্র সমালোচনা করা ইত্যাদি।

প্রকৃত বন্ধু মনে করিলে তাহাকে সব কথা (যাহা বলিলে পরের বিশ্বাস ভঙ্গ হয় না) বলা স্বাভাবিক—ইহা আমি অস্বীকার করিনা। কিন্তু প্রকৃত বন্ধুত্ব বাস্তবিক দুদণ্ডের মধ্যে যার তার সঙ্গে স্থাপিত হইতে পারে এরূপ ত মনে হয় না। যাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি, যাহার স্বভাবের ভিতর প্রবেশ করিয়া সহানুভূতি সূত্রে যাহার সহিত গ্রথিত হইতে পারি তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করিতে পারি, কিন্তু দুদণ্ডের মধ্যে কি এরূপ বিশ্বাস স্থাপনের অবসর পাওয়া যায়? আমার ত বিশ্বাস প্রথম দৃষ্টিতে একজনের উপর ভালবাসা জন্মাইতে পারে—কিন্তু তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে পারে না।

আর যদিই বা এমন হয়—সরলতার প্রভাবেই একজন মুহূর্ত্ত মধ্যে একজনকে অকপট

বিশ্বাস করিয়াই ফেলে সেই বিশ্বাসের সেই বন্ধুতার আরম্ভই কি—পরনিন্দা পরচর্চ্চা? তাহা ছাড়া বন্ধুতার আর কি কোন কথা কোন আলাপ নাই?

যাহার যে প্রবৃত্তি যত প্রবল তাহাই বাহিরে প্রকাশ পাইবার জন্য তত ব্যগ্র। মুহূর্ত্তের ভাবে যাহার তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া এই রূপ যে নিন্দা করা ইহা সরলতার লক্ষণ নহে, লঘু হৃদয়তা, নিন্দাপ্রিয়তা, ঢাক বাজান স্বভাবেরই লক্ষণ। প্রকৃত সরল ব্যক্তি যে কখনো কাহারো নিন্দা করে না তাহা বলিতেছি না। কথা প্রসঙ্গে ভাল মন্দ নিন্দা প্রশংসা সকল কথাই উঠিতে পারে, কিন্তু নিন্দা করিবার জন্য প্রাণের যে একটা আকুলি ব্যাকুলি—তাহা সে নিন্দায় থাকে না; কাহারো হানি করা সে নিন্দার উদ্দেশ্য নহে, কিম্বা নিন্দার জন্যই সে নিন্দা নহে। সরল হৃদয় মুক্ত প্রাণ বটে, কিন্তু মুক্ত বাতাস যেমন ঝড় নহে, মুক্তপ্রাণ তেমনি লঘুহৃদয় নিন্দুক ব্যক্তি নহে। সরল ব্যক্তির মনে এক মুখে আর নাই তাই সে মুক্ত প্রাণ, অযথা লুকোচুরি করিয়া কথায় কার্য্যে ভাবে ভঙ্গীতে সে কাহারো নিকট হেঁয়ালি হইয়া দাঁড়ায় না, সরল ভাবে সরল প্রাণে সে কথা কহে, সরল ভাবে সরল প্রাণে সে জগৎকে বিশ্বাস করে তাই সে মুক্ত প্রাণ।

সরোবর যেমন পাঁকডোবা নহে, মুক্ত বাতাস যেমন ঝড় নহে, ভালবাসা যেমন ইন্দ্রিয়পরতা নহে, পরের নামে ঢাক বাজানই তেমনি সরলহৃদয় মুক্তপ্রাণ ব্যক্তির লক্ষণ নহে। অথচ ইন্দ্রিয় পরতাকেই আমরা ভালবাসা বলি, নিন্দাপ্রিয়তাকেই আমরা সরলতা বলি। পৃথিবীতে ইহার অপেক্ষা স্বভাবে অভাব আর কি হইতে পারে?

কলঙ্ক।

ললিতে সুধাই ফিরে তোরে,
লাগে তোরে শপথ রাধার—
যমুনার পথে দেখে মোরে
গোপিনী কি দেয় ধিক্কার?
ঘরে ঘরে বলে কিরে সবে
রাধিকারে কুল কলঙ্কিনী,
তিলাঞ্জলি দিনু কুল মানে
বলে যত গোপের গেহিনী?

কাহারে কলঙ্ক বলে সই
বুঝিতে পারিনি এতদিন,
দেখি নাই কভু শ্যামচাঁদে
আছিলাম কলঙ্ক বিহীন।
ননদিনী বলিত আমারে
কলঙ্ক সে বিষম জঞ্জাল;
ভাবিতাম মনে মনে আমি
নিষ্কলঙ্ক রব চিরকাল।

কুসুমেতে মত্ত মধুকর
কিছু কি কলঙ্ক নাহি তায়;
বংশীস্বরে গোপিনীর সম
চন্দ্রমা বেষ্টিত তারকায়;

শিশু রবি উদিলে আকাশে
কমলিনী চাহে তার পানে ;
কোকিলের পুলক ঝঙ্কার
বসন্তের শুভ আগমনে ;
থল থল তরল চরণে
নাচে সিন্ধু হেরি চন্দ্রমায় ;
ফুল্ল মনে কল কল রবে
নির্ঝরিণী সাগরে মিশায় ;
বাঞ্ছিত রতনে সবে পায়
তাহে নাহি কলঙ্ক পরশে,
ত্রিভুবনে কলঙ্কিনী রাধা
মজিয়াছে পাপ প্রেমরসে !

কোটি কোটি পুণ্য ফলে আজি
মিলিয়াছে নীলকান্তমণি—
শ্যামের পিরীতি হেন ধন
জগতে কি আছে লো সজনি !
ওরে নিরখিয়ে শ্যাম অঙ্গ
কালো দেখ যমুনার জল !
শ্যামাঙ্গিনী হের ধরারাণী,
ঘন শ্যাম আকাশের তল ;
নব ঘন ধরে শ্যাম রূপ,
শ্যাম শোভা জগতে বিকাশে,
উদিয়াছে হেন শ্যামচাঁদ
রাধিকার যৌবন আকাশে !
আমি সখি মুগুধা গোপিনী,
গুণমণি সে যে বনমালী,
তার তরে তুলিয়াছি শিরে
বৃন্দাবনে কলঙ্কের ডালি।
এমন শোভন আভরণ
মিলিবে না জগতে রাধার,
আহা মরি শ্যামের কলঙ্ক
হৃদয়ের হরেছে আঁধার !
হবে কি এমন শুভ দিন,
ঘটিবে কি রাধার ললাটে,
পুণ্যময় কলঙ্কের কথা
রটিবে চৌদিকে ঘাটে বাটে !
ললিতারে মিনতি আমার
রাধা বলে ডেক না আমায় ;
মধু মাখা কলঙ্কিণী নাম
শ্রবণেতে পরাণ জুড়ায়।
শ্যামনামে মিশাইব নাম,
মনে হলে গলে যেন যাই ;
বল শুনি কালা-কলঙ্কিনী,
বল দেখি কলঙ্কিনী রাই !
বৃন্দাবনে যত গোপবালা
কলঙ্কিনী বলিবে রে সবে,
দাঁড়াইয়া কদম্বের ছায়
কলঙ্কিনী কলঙ্কিনী কবে !
কলঙ্ক সে বহিবে বাতাসে,
রাধা নামে বাজিবে না বাঁশী,
'আয় আয় কালা-কলঙ্কিনী'
সমীরণে আসিবেক ভাসি।
গুঞ্জরিয়া ভ্রমর ভ্রমরী
বলিবে সে কুসুমের কানে,
'কলঙ্কিনী সেই রাধাপ্যারী
মজিয়াছে কালার নয়ানে।'
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে শুকসারী,
'কলঙ্কিনী রাধিকা হেথায়
ছি ছি পাশরিয়া কুলমান
নিত্য দেখ পূজে শ্যামরায় !'
সুশীতল শ্যামল যমুনা—
শ্যাম অঙ্গ লাগে যেন মনে—
'কলঙ্কিনী কালা-কলঙ্কিনী,'
গেয়ে যাবে কুলু কুলু স্বনে ;

সলিলেতে পশিব যখন
উছলিবে যমুনা সুন্দরী,
জল ফেলি মারিবে হাসিয়া
কলঙ্কিনী কলঙ্কিনী করি!

যত দিন রবে বৃন্দাবন,
ধরাতলে যমুনা বহিবে,
রাধিকার কলঙ্কের খ্যাতি
তত দিন ধরায় রহিবে;
রটিয়াছে আজি যে কলঙ্ক
পাইয়াছি কত পুণ্যফলে;
রহে যেন কলঙ্কের কথা
চিরদিন জগতের তলে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রণাম।

জীবনের একটা মহা-শূন্যের উপরে দাঁড়াইয়া নিজের সঙ্কীর্ণতার স্ফীততায় আমরা প্রতিনিমেষে জগৎকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিতে চাই, আত্মাভিমানে ভেকের মত এমনি স্ফীত হইয়া উঠি যে হস্তীকে দেখিলে মূষিক শাবক বলিয়া মনে হয়—মনে হয় এই স্ফীত অহঙ্কারের মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড একরত্তি ধূলি কণার মত মিশিয়া গিয়াছে। মানবের হৃদয় জগৎকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইতে পারে, যখন আপনার উদারতায় জগতের প্রতি-পরমাণুর গভীরতা তাহার নিকট প্রকাশ পায়—যখন সে জগদতীতে বাস করিতে থাকে। নয়ত যখন অহঙ্কার তাহার বত্রিশপাটী দন্তচ্ছটা বাহির করিয়া নির্লজ্জের মত রুদ্ধ-হৃদয়ের অন্ধকারের উপর আসন বিছাইয়া বসে তখন সেই ছটার মধ্যে জগৎ লুকাইয়া পড়ে।

অহঙ্কার স-সীমত্বের আড়ম্বরে অসীমকে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়—আপনার চারিদিকে পৃথিবীর কলঙ্কিত-ধূলিস্তূপ সংগ্রহ করিয়া অসীমের আলোকের প্রতিবন্ধকতা করে—মোহ-পাপের চাপে হৃদয়কে দলিত করিয়া মারিয়া ফেলে। অসীমের জ্যোতি অহঙ্কারের ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়—তাহার জীর্ণ দেহের উপর হইতে স্বাস্থ্যের অলীক আবরণ তুলিয়া লইয়া তাহার অন্তঃসার-শূন্যতার পরিচয় প্রদান করে; অহঙ্কার নিজের ক্ষীণ অস্তিত্বের অন্ধকারে মিলাইয়া যায়।

বর্ত্তমান বাঙ্গলায় এই অহঙ্কারের একটা ভাব দেখা দিয়াছে—হৃদয়কে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য অনেক উদ্যম আয়োজন হইতেছে। গৃহলক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিয়া পর-পদসেবা—পরের গালিগালাজ ঝাঁটা লাথি সহ্য করিয়া গৃহের মান্য গণ্য গুরু-ব্যক্তি-দিগকে কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই জন্য প্রতি প্রান্তের নালা-নর্দ্দামা গলি-ঘুঁজি-প্রসূত অর্থহীন খেয়াল প্রলাপ গুলিকে নানাবর্ণের একটা আলথাল্লা পরাইয়া ব্যাখ্যা টীকা ও ভাষ্য-সমেত সংস্কৃত পকেট-সমূহ বোঝাই করিয়া সাধা-

রণের নিকট লইয়া আসা হয়; দৈবাৎ যদি কেহ আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া দলবৃদ্ধি করণে মনোযোগ দেয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের অনেক বিষয় উন্নতি হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া যাহা কিছু পাশ্চাত্য তাহাই যে পরম সেবনীয় এরূপ নহে। পশ্চিমের দুর্দ্দমনীয় উদ্যম অধ্যবসায়--জীবনের এক ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তকে পর্য্যন্তও আলস্যের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার বাসনা—হৃদয়ের শোণিত দিয়াও স্বদেশের স্বত্ব রক্ষা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা, এ সকলের প্রতি কৈ আমাদের ত তেমন লক্ষ্য নাই। ভবিষ্যতের রঙ্গ ভূমিতে আমাদের অনেক আশা আছে বলিয়া ঘরের কোণে বসিয়া বসিয়া স্বদেশের স্ব-স্ব লোপ করিবার জন্য বিদেশীয় হৃদয়-হীনতার জঞ্জাল টানিয়া আনিবার আবশ্যক কি? বিদেশীয় উদ্যম অধ্যবসায় শিক্ষা কর—স্বদেশের চির প্রচলিত সুপ্রথার বিসর্জ্জন দিও না।

অনুকরণে উন্মত্ত হইয়া আপনাকে যখন মানব জাতি হইতে অনেক উচ্চে মনে হয়—আত্মাভিমানে যখন আর সকলই ক্ষুদ্র হইয়া উঠে তখনই এই সকল দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে; বিদেশীয় চটুল হস্ত পীড়নের অনুরোধে স্বদেশীয় প্রণাম প্রথার উপরে একটা ঘৃণা জন্মিয়া যায়; আপনার মহত্বে এতটা স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে জগতে অন্যের মহত্ব উপলব্ধি করা দায় হইয়া উঠে—সুতরাং প্রণামকে নীচতার কার্য্য বলিয়া মনে হয়।

রাজা দিলীপ যখন সস্ত্রীক বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়া গুরু ও গুরুপত্নীকে প্রণাম করিলেন তখন সেই প্রণামের মধ্যে তপোবনের কেমন একটী পবিত্র শান্ত ভাব যেন ফুটিয়া উঠিল—সংসারের সমস্ত শোক তাপ দুঃখ ভয় ধীরে ধীরে মুছিয়া গেল—সুখ, বাসনা, কিছুই রহিল না—রহিল শুধু এক শান্তি।

প্রণামের সহিত আমাদের চির সম্পর্ক। তাহার বিপুল ছায়ায় আমাদের সেই প্রাচীন তপোবনের সরলতার-প্রতিমা ঋষি কন্যাগণের প্রতিদিনের সান্ধ্য জল সিঞ্চন—তৃষিতাক্ষী হরিণ হরিণীর নিবার-রোমন্থন—অনাসক্ত হৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং"—এই সকল স্মৃতির মত জাগিয়া আছে। আজ আমরা সহসা যদি আমাদের এতদিনকার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া হৃদয়হীন পাশ্চাত্য প্রথার অনুরোধে ইহাকে বিসর্জ্জন করি তাহা হইলে আমরা কি মনুষ্য?

মিল্ স্পেন্সরের গদীর উপরে স্বর্ণ সিংহাসন স্থাপন করিয়া যদি কেহ প্রণামকে হেয় বলিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করে—করুক্। আমাদের প্রণামের মধ্যে অহঙ্কার নাই—লালসা নাই—কৃত্রিমতা নাই। উচ্ছ্বাসিত ভক্তির আবেগে হৃদয় স্বতঃই নত হইয়া পড়ে। হিংসা দ্বেষ কটাক্ষ তাচ্ছল্য তাহার নিকট ঘেঁষিতে পারে না। বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী সেখানে পরাজিত হয়।

আমরা আজ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পথ-পার্শ্বে বসিয়া যে অনর্গল অশ্রুপাত করিতেছি ইহাতে কোনও ফল হইবে না। এ নির্ম্মম জগতে পরের নিকট কে কবে কি আশা

করিয়াছে? এখানে বিদ্রুপের হাসি অজস্র মিলিবে—কিন্তু পরের দুঃখে দুঃখী মিলিবে না।

তাই বলি স্বদেশীয় সুপ্রথায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রয়োজন নাই। হৃদয়হীনতা মনুষ্যকে দুর্ব্বল করিয়া তুলে। বিদেশীয় হৃদয়হীনতার আমদানিতে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িব। প্রণাম আমাদের নৈরাশ্যের ক্ষুব্ধ গর্জ্জনের মধ্যে আশা ফুটাইয়া দেয়—গৃহহীন অনাথকে সগৃহ করিয়া তুলে। প্রণাম আমাদের নিজস্ব। আমাদের মাতৃদুগ্ধের সহিত সে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। প্রাচীনত্বের অজ্ঞাত ইতিহাসের সহিত সে আমাদের যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

তাই বলি বঙ্গ সন্তান, ভক্তির সহিত একবার মাতাকে প্রণাম কর। তাঁহার স্নেহ-আশীর্ব্বাদ ফুটিয়া উঠিয়া আমাদিগকে চিরদিন জয়যুক্ত করিবে।

শ্রীব, না, ঠা।

শান্তামারীয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তাহার খানিকটা পরে দাসী আসিয়া বলিল ‘কে একজন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে’। আমি দ্বারে গিয়া দেখি ইনস্পেকটর বার্ণার্ড। হঠাৎ বাড়ীতে একজন পুলিসের লোক শুনিলে দাস দাসীর মনে কোন রূপ ভয় কিম্বা সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে বলিয়াই তিনি দাসীকে তাঁহার নাম বলেন নাই। তিনি একবারে শান্তাকে দেখিতে চাহিলেন। অন্য সময়ে তাঁহার গম্ভীর মুখে যেমন এক রকম প্রসন্নতা দেখিয়াছিলাম তাহা যেমন গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল বোধ হইয়াছিল এখন তাহা শুদ্ধ মাত্র গম্ভীর বোধ হইল। তাঁহার মনে কি যেন একটা গভীর চিন্তা, যেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না বোধ হইল। শান্তাকে দেখিতে চাহিয়াই একবার জিজ্ঞাসা করিলেন ‘আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না ত?’ আমি বলিলাম, ‘না, আসুন’। ধীরে ধীরে আমরা উপরে উঠিলাম ধীরে ধীরে রোসনের গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। আমি যে চিত্র দেখিয়া জগৎ সংসার ভুলিয়া গিয়াছিলাম এখনও আমরা সেই চিত্র দেখিলাম। বার্ণার্ড গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে যেন একটু সঙ্কোচ করিতেছিলেন। দ্রুত চক্ষে একবার চারিদিক দেখিলেন। তাহার নিকট সবই কেমন নূতন বোধ হইল। রোসনের জিনিষ পত্র এমনই সাজান যে তাহাতে

আপনা হইতেই মনে চিন্তার উদয় হয়, জগৎ যেন সব হাসি নয় মনে হয়, জগতে যে কান্না আছে তাহা যদিচ মনে হয় না, তবে সূর্য্যালোকের সঙ্গে ছায়া, চন্দ্রালোকের পশ্চাতে আঁধার, কেমন আপনি মনে পড়ে। যেখানে দাঁড়াইলে মনে নূতন কোন ভাবের উদয় হয় সে ভাব প্রায়ই আলোকপূর্ণ হর্ষের ভাব নহে। আকাশ ভেদী পর্ব্বত শৃঙ্গ, বিশাল সমুদ্র, আঁধার আকাশ, যোজন ব্যাপী তুষার হ্রদের উপর চন্দ্রালোক, দেখিলে মনুষ্য হৃদয় স্তম্ভিত হয়, হঠাৎ যেন পৃথিবীর সহিত আমাদিগের মত ক্ষুদ্র জীবীর এক পলের সম্বন্ধ তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেক সুন্দর দৃশ্যে, প্রত্যেক আশার চিত্রের সহিত কেমন যেন আমাদিগের আমিত্ব খানিকটা মুছিয়া যায় আর ততটুকু ছায়া আমাদিগের চোখের উপর ভাসিয়া উঠে।

বার্ণার্ড রোসনের গৃহের ভিতর আসিয়া আরও যেন গম্ভীর হইয়া গেলেন। অতি মৃদু স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যিনি বসিয়া আছেন তিনি কি আপনার বন্ধু? এবং তাঁহার উরুদেশে যে বালিকার মাথা তাঁহার কথাই বুঝি আপনি বলিয়াছেন!" স্থির চক্ষে বালিকার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আমাকে বলিলেন "আপনার কি কোন আবশ্যক আছে—যদি না থাকে—আমার সহিত একবার আসিতে পারেন কি?"

বার্ণার্ডের গলার স্বর কেমন হঠাৎ যেন ভাঙা ভাঙা বোধ হইল। একটু আশ্চর্য্য হইলাম যে বালিকার মৃত্যুর ছায়া ঢাকা মুখখানি দেখিয়া একজন বার্ণার্ডের মত লোক যিনি প্রত্যেক দিন কত শত এরূপ দৃশ্য দেখিতেছেন, তাহারও চোখে জল আসে। বার্ণার্ড, আমার বোধ হইল, বুঝিতে পারিলেন আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমাকে কিছু না বলিয়া আমার আগে আগেই গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। "আপনার বন্ধু দেখিতে অতি সুন্দর এদেশে আমরা ওরূপ চোখ দেখিতে পাই না। চোখের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছে।" বার্ণার্ড এই রূপ ভাবে খানিকটা রোসনের চেহারার প্রশংসা করিতে করিতে চলিলেন। পরে রোসনের ঘরের কথা উঠিল। বার্ণার্ড খানিকটা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন যে একজন হিন্দু কেমন করিয়া এরূপ ভাবে নিজের ঘর সাজাইতে পারে। তাঁহার কথার ভাবে আমার মনে হইল যে তিনি বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছেন না যে একজন বর্ব্বর কেমন করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতর বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার পর আবার সেই পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজের উপযোগী করিয়া লইতে পারে। অনেক ইংরাজের এই কথা মনে হয়। প্রথমে আমাদিগের সহিত কাফ্রিদিগের তুলনা করে। তখন ক্রমে আশ্চর্য্য হইতে থাকে এবং বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা আমাদিগের বিষয় বলে তাহা তাহাদিগের মনে পড়ে। আমরা যে আর্য্য তাহা অনিচ্ছা সত্বেও বিশ্বাস করে কিন্তু যতবারই আমাদিগের কিছু প্রশংসা করে, যতবারই আমাদিগের কিছু দেখিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করে তাহার নীচে এই ভাবটুকু আছে—"এরা কাল লোক, নিশ্চয় আমাদিগের অপেক্ষা অনেক হীন। তবে যাহা দেখিতেছি তাহা কাল লোকের পক্ষে আশ্চর্য্য।" এই কথাটি

মনে রাখিলে ইংরাজের প্রশংসা শুনিয়া আজ কাল যেমন নাচিয়া উঠি তাহা উঠিতাম না।

খানিকটা পরে বার্ণার্ড হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকাল বেলা যে মেয়েটিকে দেখিয়াছিলেন তাহার সহিত শান্তার চেহারার কি কিছু সাদৃশ্য আছে?" আমি তখন বলিলাম যে 'বালিকাকে দেখিয়া প্রথমেই আমার তাহা মনে হইয়াছিল। যেন শান্তার বালিকা এইরূপ মনে হইয়াছিল, এবং বাড়ী আসিয়াও শান্তাকে দেখিয়া পুনর্ব্বার সেই বালিকার মুখ মনে পড়িয়াছিল'। বার্ণার্ড তখন বলিলেন যে 'তাঁহার মনে সেই সন্দেহ হয়, কিন্তু আর একজনের এইরূপ কিছু হইয়াছিল কি না তানা জানিলে তিনি সাদৃশ্যের কথা বলিতে সাহস করিতেছিলেন না'। বার্ণার্ড পরে বলিলেন যে তিনি সারাদিন বালিকাটি কে তাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কিন্তু সন্ধান করিতে করিতে তিনটি কি চারিটি বালিকার খবর পাইয়াছেন, কিন্তু কোনটি কে তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন এবং কি খবর পান তাহা আমাকে বলিতে বলিতে চলিলেন। শেষে কোনটি তাহার বিশেষ সম্ভব মনে হইয়াছিল তাহা বলিলেন।

"আজ প্রায় দুই বৎসর হইল লণ্ডনের দূর পূর্ব্ব ভাগে একজন পোল আসিয়া বাস করিতেছেন। তিনি দেশে একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তখন পোলাণ্ডে একটি সম্প্রদায় বিপ্লবের উদ্যোগী হয়। আমাদিগের কাউন্ট সেই সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দেন। যখন তাহা বাহির হইয়া পড়ে তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। গৃহে তখন তাঁহার একমাত্র যুবতী স্ত্রী। তিনি স্বামীর সহিত দেশ হইতে চলিয়া আসিবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীকে—কোথা হইতে কোন্ দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয় তাহার কোন খোঁজ পান না। এক বৎসর দুই বৎসর কাটিয়া গেল কোন সংবাদ পান না। এ দিকে কাউন্ট কোন দিন এখানে, কোন দিন ওখানে, প্রায় সর্ব্বদাই নাইহিলিষ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তাহারা যেখানে লইয়া যায়, সেইখানে যাইতে লাগিলেন। তাহাদিগের আশ্রয় ভিন্ন তাহার বড় অন্য কোন স্থানে যাইবারও উপায় ছিল না। নাহিলিষ্টদিগের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত, গৃহ শূন্য, পাপাসক্ত স্বেচ্ছাচারী। কাউণ্ট ক্রমে তাহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া চরিত্রের উদারতা জীবনের পবিত্রতা হারাইলেন। ক্রমে ইংলণ্ডে আসিয়া পঁহুছিলেন। ইংলণ্ডে আপনি জানেন, যে ইচ্ছা সে আসিতে পারে, যে ইচ্ছা সে যাইতে পারে—আমাদিগের রাজ্যে কোন রূপ বাধা নাই। আমাদিগের আইন সকলের জন্যই এক। আমরা পাসপোর্ট (ভ্রমণের আজ্ঞা লিপি) দেখিতে চাহি না। দেখুন লণ্ডনে কত সহস্র বিদেশীয় লোক আছে। তাহারা সুখে আছে, তাহারা আমাদিগের মত একভাবে আছে। কিন্তু কাউণ্ট এখানে আসিয়া ফিনিয়ানদিগের সহিত মিশিলেন। আমাদিগের কানে সব কথা আসিল! আমরা কিছু গোল না করিয়া সমস্ত

খোঁজ লইতে লাগিলাম। এই সময় ফিনিয়ানেরা দেশ বিদেশে টাকার চেষ্টা করিতে-ছিল। তাহারা ভাবিল এই কাউণ্টের নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে পারে কি না। কিছু দিন পরে কাউণ্ট দেশে পত্র লিখিলেন। কাউণ্টেশের কথা এতদিন পরে মনে পড়িল। আমরা সে পত্রে কি আছে তাহার খবর পোষ্ট আফিস হইতে পাইলাম। কাউণ্ট টাকার জন্য বাড়ী পত্র লিখিতেছেন। আমরা সে পত্র পাঠাইতে কোন আপত্তি করিলাম না। পত্র পাইবার দিন কতকের মধ্যে সেই দীন দরিদ্র, অসৎ হেয় সঙ্গী পরি-বৃত কাউণ্টের ভগ্ন গৃহের দ্বারে দীনা কাউণ্টেস উপস্থিত হইলেন।

স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল।

এখন আর সেকাল নাই, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি পুরুষদিগের আর তেমন হতাদর, অনাস্থা নাই, বরঞ্চ বিপরীত। এমন কি, এখন নাকি বিবাহের সম্বন্ধের সময় কন্যা দর্শনে আসিয়া বরপক্ষীয়গণ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন মেয়েটি কেমন লেখাপড়া জানে, কখানা বই পড়িয়াছে? আর বই পড়ার সংখ্যা বেশী হইলে বরের পণের টাকা নাকি কমে।

কথাটা কতদূর সত্য বলিতে পারি না, তবে এরূপ গুজব উঠাও শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। স্ত্রীশিক্ষার দিকে বঙ্গসমাজ অন্ততঃ কতক পরিমাণেও না ঝুঁকিলে আদৌ এ কথা উঠিবেই বা কেন? মহিলাগণ সুশিক্ষিত হইলে পুরুষদিগেরই যে সুখ সন্তোষ বৃদ্ধি হইবে, স্ত্রীলোকে মার্জ্জিত রুচি, মার্জ্জিত বুদ্ধি, মার্জ্জিত জ্ঞান হইলে নিজের কর্ত্তব্য যে সুচারুরূপে পালন করিতে পারিবেন, উপযুক্ত গৃহিনী, উপযুক্ত সঙ্গিনী, উপযুক্ত মাতা হইতে পারিবেন,—পুরুষেরা ইহা যে কতকটা বুঝিয়াছেন চারিদিক দেখিয়া তাহা বেশ মনে হয়।

কিন্তু ইহা সত্বেও কার্য্যতঃ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কতদূর হইয়াছে? কতকটা উন্নতি যে হইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে, গ্রামে গ্রামে পর্য্যন্ত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু শিক্ষার এই ছড়াছড়িতে শিক্ষা কতটুক হইতেছে ইহাই মাত্র আমাদের জিজ্ঞাস্য? স্ত্রীশি-ক্ষার বিস্তৃতি যেমন বাড়িয়াছে তেমন গম্ভীরতা কই? ইহার আড়ম্বর যতটা দেখি-তেছি অন্তঃসারতা ততটা কই?

কেহ বলিবেন, স্ত্রীলোকে বি, এ, এম, এ, পাশ করিতেছে তবু বল শিক্ষার গভীরতা কই? ইহাপেক্ষা অন্তঃসার-শিক্ষা আবার কি চাও?

বি, এ, এম, এ, পাশ করা স্ত্রীলোকের উপযুক্ত শিক্ষা কি না এবং ইহার গভীরতাই

বা কতদূর ইহা লইয়া অনেক তর্ক উঠিতে পারে—মাঝে মাঝে উঠিয়াও থাকে, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সব কথা থাক, আমরা মানিয়াই লইতেছি বি এ, এম্ এ পর্য্যন্ত পড়া আপাততঃ স্ত্রীলোকের যথেষ্ট শিক্ষা। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি বি, এ, এম, এ পাশ করে সে কয় জন? আর যে কয় জনই করুক সাধারণ হিন্দু সমাজের সহিত তাহাদের কতদূর সম্পর্ক?

যাহারা আপন কন্যা ভগিনীদিগকে ইয়ুনিবর্সিটির পরীক্ষার জন্য পড়ান তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় সাধারণ হিন্দুসমাজ-ভুক্তই নহেন, হিন্দুসমাজের সম্প্রদায় বিশেষ মাত্র। সুতরাং বঙ্গসমাজের সম্প্রদায় বিশেষের মহিলাদিগের শিক্ষা ভাল হয় বলিয়া কি করিয়া বলিব বঙ্গ-মহিলাদিগের বেশ শিক্ষা হইতেছে।

সাধারণ বঙ্গ সমাজে বড় জোর ১০।১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালিকাগণ অবিবাহিত থাকে, পিতা মাতা ইচ্ছা করিলেও সমাজ ভয়ে আর বেশী দিন কন্যাগণকে অবিবাহিত রাখিতে পারেন না। অথচ এই বিষয়ে কথা উঠিলে প্রায় সকলেই এজন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন, সমাজের এই অসামাজিক নিয়ম নিতান্তই অত্যাচার জোর জবরদস্তি এইরূপ বলিয়া থাকেন, অথচ সমাজ ভয়ে কেহই প্রায় ইহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস করেন না; তাঁহারা বুঝেন না, সমাজ বলিয়া স্বতন্ত্র একটা ভয়ঙ্কর জিনিষ কিছুই নাই, তাঁহাদের প্রতি জনের সমষ্টিতেই সমাজ। তাঁহারা প্রতি জনে মুখে যাহা বলিতেছেন সত্যই যদি মনের অভিপ্রায় তাহাই হয় এবং কার্য্যতঃ তাহা করেন তবে তাহাই আবার সমাজের নিয়ম হইয়া যায়, সমাজ ভাঙ্গা গড়া তাঁহাদেরি হাতে। আসল কথা আমাদের অতটুক সাহসের এখনো অভাব।

বিবাহ হইয়া গেলে তখন বাঙ্গালী ঘরে রীতি মত শিক্ষা একেবারে অসম্ভব। একে সংসারের কাজ কর্ম্ম, অবসর অল্প, তারপর শিখাইবার লোক নাই, স্বামী হয় নিজের পড়া কিম্বা আফিসের কাজ লইয়া ব্যস্ত, ঘরে আসিয়া তিনি বিশ্রাম করিবেন না স্ত্রীর মাষ্টারি করিতে বসিবেন। মিশনারি মহিলাগণ কোন কোন স্থানে শিক্ষা দিয়া থাকেন কিন্তু বিদ্যা শিক্ষা দান ত আর তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যানুসারে তাহারা শিক্ষা দান করেন, খৃষ্টানী ধর্ম্মপুস্তকের কুৎসিৎ অপরূপ বাঙ্গলায় তাঁহারা বাঙ্গালীর মেয়েকে বাঙ্গলা শিক্ষা দিয়া থাকেন। শিক্ষার মধ্যে তাহাদের কাছে মেয়েরা সেলাই শিখিতে পারে বটে, তাহাদের কাছে ভাষা শিক্ষা অশিক্ষা মাত্র।

এই সকল কারণে দেখা যায় বালিকাগণ বিবাহের পূর্ব্বে ১০।১১ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে যতটুক শেখে তাহাই তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার একরূপ সীমা। এই অবস্থাতে বালিকাগণ অবিবাহিত বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা পায়—সেই শিক্ষাই যাহাতে বিশেষ ভাল হয়, সেই শিক্ষার গুণে বিদ্যার প্রতি অনুরাগী হইয়া অন্যের সাহায্য না পাইলেও নিজের অনুশীলন দ্বারা বালিকাগণ যাহাতে পরে শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে

পারে, তাহারি প্রতি লক্ষ্য দেওয়া কি আমাদের আপাততঃ কর্ত্তব্য নহে ? এক মাত্র এই উপায়েই সামাজিক নিয়ম অভঙ্গ রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। নহিলে লোকনিন্দা সমাজ ভয় অতিক্রম করিয়া—সাধারণ বঙ্গসমাজ যে বালিকাদিগকে বয়স্থা॰ করিয়া রাখিয়া শিক্ষাদান করিবেন—এ আশা দুরাশা মাত্র।

উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রথমে দেখা আবশ্যক এখন বালিকাগণ ১০।১১ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে কি প্রণালীতে কতদূর শেখে ? বেথুন স্কুলই মহিলাদিগের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয় সুতরাং ইহার স্কুল বিভাগের শিক্ষা প্রণালী আলোচনা করিলেই আমরা সে সমস্ত পাইব। কলেজ বিভাগের সংশ্রবে আসিবার আমাদের এখন প্রয়োজন নাই। উল্লিখিত সাধারণ হিন্দুসমাজের বালিকা যে কলেজ বিভাগে একটিও নাই ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

স্কুল বিভাগ	ব্রাহ্ম	খ্রীষ্টিয়ান	হিন্দু
প্রথম শ্রেণী	৪	২	০
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫	০	০
তৃতীয় শ্রেণী	১২	৩	০
চতুর্থ শ্রেণী	১১	৩	২
পঞ্চম শ্রেণী	৬	১	২
ষষ্ঠ শ্রেণী	৩	১	১২
সপ্তম শ্রেণী	২	০	৫
অষ্টম শ্রেণী	১	০	৯
নবম শ্রেণী	দুইটী ভিন্ন সব হিন্দু।		

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে চতুর্থ শ্রেণীর উপর আর হিন্দু বালিকা নাই, সুতরাং নীচের ক্লাশ হইতে এই ক্লাশ পর্য্যন্ত কিরূপ পড়া হয়—তাহাই এখন দেখা যাক।

৯ম শ্রেণী বা সর্ব্বনিম্ন ক্লাশ।

প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়
দ্বিতীয়ভাগ বর্ণপরিচয়
শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ
সরল নীতিপাঠ
ধারাপাত।

৮ম শ্রেণী।

বোধোদয়
সরল পাঠ
পদ্য মালা ২য় ভাগ
ভূগোল সূত্র
First book of reading.
ধারাপাত।

৭ম শ্রেণী।

আখ্যান মঞ্জরী ১ম ভাগ
কবিতা মালা
ভূগোল সূত্র
ধারাপাত
First Book of reading.

৬ষ্ঠ শ্রেণী।

First book of reading
Royal reader No I.
চারুবোধ ২য় ভাগ
পদ্যপাঠ ২য় ভাগ
প্রথম শিক্ষা ব্যাকরণ
প্রথম শিক্ষা ভূগোল
প্রথম শিক্ষা ইতিহাস
অঙ্ক লঘুকরণ পর্য্যন্ত।

৫ম শ্রেণী

Royal reader No II and III
Child's F. grammar.
বনবাস
পদ্য পাঠ ৩য় ভাগ
ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রথম ভাগ
ভূগোলপরিচয়
অঙ্ক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

৪র্থ শ্রেণী।

Royal reader No IV
Little Arther's History of England
Lennies Grammar
Blochmans F Geography
Gangadhar B's Composition
ঐতিহাসিক সন্দর্ভ
কবিগাথা
উপক্রমণিকা
অঙ্ক বহুরাশিক পর্য্যন্ত

শিক্ষা পুস্তকের তালিকায় দেখা যাইতেছে—অষ্টম ক্লাশ হইতেই ইংরাজি আরম্ভ—আর চতুর্থ ক্লাশের মত উচ্চক্লাশেও উচ্চ বাঙ্গলা শিক্ষার অভাব। এমন কি একাশে বাঙ্গলাতে সহজ বিজ্ঞান পুস্তকও একখানা পড়া হয় না।

এরূপ শিক্ষায় লাভ কতটুক? যাঁহারা প্রথম ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়া চালাইতে পারিবেন কিম্বা স্কুল ছাড়িয়াও যাঁহারা ঘরে পড়া চালাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের এরূপ শিক্ষায় লাভ আছে, কেন না ইংরাজিটা তাঁহাদের এইরূপে কতকটা আয়ত্ত হইয়া আসিলে পরে ঘরে সহজ সহজ ইংরাজি পুস্তক তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। কিন্তু যাহাদের চতুর্থ ক্লাশ পর্য্যন্তও উঠিবার অবসর মেলা ভার, ষষ্ঠ ক্লাশ হইতেই যাহাদের প্রায় সরিয়া পড়িতে হয়, বিদ্যালয়ের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সহিত যাহাদের একরূপ বিদায় লইতে হয়, ইংরাজি দু চারখানা বই পড়িয়া তাহাদের কি লাভ? লাভ ত কিছুই দেখি না সম্পূর্ণই লোকসান। ইহাতে একূল ওকূল দুকুল যায়। প্রথমতঃ ইংরাজি দু একখানা বই পড়িয়া কিছু ইংরাজি শেখা যায় না, দুদিন পড়া বন্ধ হইলেই আগাগোড়া সমস্তই ভুলিয়া যাইতে হয়।—ইংরাজি ভাষা বিদেশীয় ভাষা, পুরুষগণ কত পরিশ্রমে তবু সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন না, আর বালিকাগণ ছেলেবেলা একবার দু এক খানা বই পড়িয়া যে ইংরাজিতে পণ্ডিত হইয়া যাইবেন—পাগলেই এরূপ মনে করিতে পারে। তবে লাভে হইতে অতটা পরিশ্রম, অতটা সময় নষ্ট কেন? যে সময়টা স্কুলের ইংরাজি পড়া তৈয়ার করিতে যায়—সেই সময়টাও বঙ্গলাতে দিলে বাঙ্গলা বেশ ভাল করিয়া শেখা যাইতে

পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ—তাহার উদ্দেশ্য গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারা নহে যে আমার মেয়ে দুখানা ইংরাজিও পড়িয়াছে। বাঙ্গলা ভাষা আজ কাল যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে, সাহিত্যের ত কথাই নাই, বিজ্ঞান, দর্শনের জ্ঞানও বাঙ্গলাভাষা হইতে মোটামুটি বেশ পাওয়া যাইতে পারে। আর তাহা ছাড়া—আবশ্যক, অভাব যত বাড়িবে ভাষার উন্নতিও তত শীঘ্র হইবে। বাঙ্গালীগণ বাঙ্গলাতেই বিজ্ঞান-দর্শন আলোচনা করিতে যত চাহিবেন—ততই ইহার অভাব দূর হইবে, আমাদের জাতীয় ভাষা ততই পুর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। বালিকাগণ ইংরাজি পুস্তক হইতে ইতিহাস অঙ্ক প্রভৃতি না শিখিয়া যদি বাঙ্গলা পুস্তক হইতে পড়েন ত কেবল যে বাঙ্গালা ভাল শিখিতে পারিবেন এমন নহে, দেশের ভাষা বশতঃ তাহা অতি সহজে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। আর, একটা ভাষা যদি ভাল করিয়া শেখা যায়—অন্য ভাষা শিক্ষাও পরে সহজ হইয়া আইসে। বাঙ্গলা আমাদের দেশের ভাষা ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে ভাল করিয়া শেখা উচিত। বাঙ্গলাটা ভাল করিয়া শিখিবার পর—যদি কেহ ইংরাজি শিখিতে ইচ্ছা করেন তাহাও তখন তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া আসিবে। এখনকার মত সমস্তই খিচুড়ি হইবে না।

বঙ্গ সমাজ এ বিষয়ে একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখুন দেখিবেন,—অল্প বয়সে যে সকল বালিকাদিগের বিবাহ হইবে—বেথুন স্কুলের আধুনিক শিক্ষা প্রণালী তাহাদিগের উপযুক্ত হইতেই পারে না—তাহাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত অন্যরূপ হওয়া উচিত। স্কুলে বাঙ্গলাই তাহাদের প্রধান—এবং একমাত্র শিক্ষা হওয়া উচিত।

বলিতে আহ্লাদ হইতেছে, সম্প্রতি বেথুন স্কুলে এইরূপ উচ্চ বাঙ্গলা শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র বন্দবস্তের কথা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বালিকাদের জন্য একটি বাঙ্গলা শিক্ষা-বিভাগ খুলিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সে বিভাগে বাঙ্গলাই মাত্র ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং এখনকার ষষ্ঠ ক্লাশ তাহার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা-ক্লাশ হইবে। আমরা উপরের তালিকায় দেখিয়া আসিয়াছি ষষ্ঠ ক্লাশে হিন্দু বালিকার সংখ্যাই অধিক সুতরাং এবন্দবস্তে তাহারাই যে উপকার প্রাপ্ত হইবে বলা বাহুল্য। ষষ্ঠ ক্লাশের কথাইত ত নাই এমন কি পঞ্চম ক্লাশ পর্য্যন্ত বালিকারা স্কুলে বেশ পড়িতে পারে। ৫ বৎসর বয়সে তাহাদিগকে যদি স্কুলে দেওয়া হয় ত ১১ বৎসরে তাহারা পঞ্চম ক্লাশে বেশ উঠিতে পারে। প্রতি বৎসরে যদি তাহারা এক ক্লাশ করিয়া উঠে—তাহা হইলে ১০ বৎসরেই পঞ্চমক্লাশে উঠিতে পারে—কিন্তু প্রতি বৎসরে যদি নাই ক্লাশ উঠিতে পারে তাই এক বৎসর হাতে রাখা গেল। ১১ বৎসর পর্য্যন্ত আজ কাল অনেকেই অবিবাহিত থাকে—সুতরাং ছাত্রবৃত্তির পরও এক বৎসর তাহারা পড়া বেশ চালাইতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে স্ত্রী শিক্ষার যে উন্নতি সাধন হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম ছাত্রীগণের পিতাগণ একজন ব্যতীত

সকলেই এ বিভাগে কন্যা দিতে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা চান তাঁহাদের মেয়েরা একটু ইংরাজিও শিখিবে। কিন্তু কন্যাদিগকে তাঁহারা যদি উচ্চ ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়াইতে না চাহেন—একটু ইংরাজি শিখা যে কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র—তাহাতে যে কোন শিক্ষাই ভাল করিয়া হয় না—ইহা যে তাঁহারা কেন বুঝিতেছেন না তাহা বুঝিতে পারি না। কন্যার শিক্ষাই যদি তাঁহাদের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়—তবে উল্লিখিত সুবিধা অবিলম্বে গ্রহণ করা তাঁহাদের নিতান্তই কর্ত্তব্য। এখন যদি এ বিভাগে যথেষ্ট কন্যা পাওয়া না যায়—সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্ট এ বন্দোবস্ত উল্টাইয়া ফেলিবেন; কেন না এরূপ বন্দোবস্ত ত আর অমনি হয় না—ইহার জন্য স্কুলের খরচ অবশ্যই কিছু না কিছু বাড়িবে। আর গভর্ণমেণ্ট এ বন্দবস্ত তুলিয়া দিলে এমন সুবিধা আমাদের হেলায় হারাইতে হইবে। সেই জন্য আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে, যে পিতাগণ তাঁহাদের কন্যাকে এই বিভাগে দিতে অসম্মত হইয়াছেন তাঁহারা আর একবার মনোনিবেশ পূর্ব্বক এ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখুন—আমাদের বিশ্বাস তাহা হইলে তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইবে, তাঁহারা এই নব বিভাগে কন্যাদিগকে ভর্ত্তি করিবার কোনই আপত্তি দেখিবেন না। বাস্তবিক এরূপ শিক্ষায় স্ত্রীশিক্ষার মূল যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইবে, তাহাতে কাহার সন্দেহ হইতে পারে?

সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের প্রতি নিবেদন এই, এই বিষয়টি লইয়া তাঁহারা একটুকু আন্দোলন আলোচনা করুন। যদি সুবিধা বিবেচনা করেন ত এই প্রস্তাবটি তাঁহাদের পত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিতেও আমরা অনুরোধ করি।

অবশেষে বেথুন স্কুলের কমিটির প্রতি আমাদের একটি বক্তব্য আছে। বালিকাদিগের জন্য এই যে বাঙ্গলা বিভাগ প্রতিষ্টিত হইতেছে, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি অবশ্য পাঠ্য পুরাতন কাহিনী পুস্তক সকল এই বিভাগের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। আগে কথকতা প্রভৃতি যে সকল উপায়ে ঐ সকল কাহিনী জনসমাজে প্রচার হইত তাহা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। তাহার পর ছাত্র সমাজ নিজের পাঠ্য পুস্তক লইয়াই ব্যস্ত, যে সকল মেয়েরা স্কুলে পড়েন তাঁহাদেরও সেই দশা, পরে বড় হইয়া অতবড় বইগুলা শেষ করা—তাহাও দুর্ঘট। যদি শিক্ষার পরিণাম শেষে এই দাঁড়ায় পরের জিনিস শিখিতে গিয়া নিজের সব ভুলিয়া যাওয়া, তাহা হইলে সে পরিণাম যে নিতান্তই শোচনীয় তাহা বিস্তারিয় করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। আমাদের জাতীয় গর্ব্ব, জাতীয় প্রবাদ, জাতীয় গৌরব যাহা কিছু আছে তাহা রামায়ণ মহাভারতেই আছে—তাহা যদি আমাদের ভুলিয়া যাইতে হয় তবে আর আমাদের রহিবে কি? তাহা আছে বলিয়াই—সেই আদর্শ সম্মুখে রহিয়াছে বলিয়াই এখনো আমরা আমাদের নিজত্ব যাহা কিছু রাখিতে পারিয়াছি, এই পদাবনত অবস্থাতেও জাপানীদিগের ন্যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্তিত্বে আমাদিগের ধর্ম্মের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এখনো বিলীন হইয়া যায় নাই। কমিটিগণ এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া মহাভারত রামায়ণাদি বালিকাদের পাঠ্যপুস্তক করুন এই আমাদের প্রার্থনা। উহাতে তাহাদের শিক্ষাও হইবে আমোদও হইবে।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

মগ্ন তরী।

দোলেরে প্রলয় দোলে
অকুল সমুদ্র কোলে,
উৎসব ভীষণ!
শত পক্ষ ঝাপটিয়া
বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দ্দম পবন!
আকাশ, সমুদ্র সাথে
প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
নিখিলের আঁখিপাতে
আবরি তিমির!
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি,
হা হা করে ফেণ রাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি
জড় প্রকৃতির!
চক্ষুহীন কর্ণহীন
গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা ছিঁড়েছে বন্ধন!

হারাইয়া চারিধার
নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে, ক্রন্দনে,
রোষে, ত্রাসে, ঊর্দ্ধশ্বাসে,
অট্টরোলে, অট্টহাসে,
উন্মাদ গর্জ্জনে,
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে,
চূর্ণ হয়ে যায় টুটে,
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে
আপনার কূল।

যেন রে পৃথিবী ফেলি
বাসুকী করিছে কেলি—
সহস্রৈক ফণা মেলি
আছাড়ি লাঙ্গুল!
যেন রে তরল নিশি
টলমলি দশদিশি
উঠেছে নড়িয়া,—
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া!

নাই সুর, নাই ছন্দ,
অর্থহীন, নিরানন্দ
জড়ের নাচন!
সহস্র জীবনে বেঁচে
ওই কি উঠেছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ?
জল, বাষ্প, বজ্র, বায়ু,
লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবন-স্নায়ু
টানিছে হতাশে,
দিগ্বিদিক্ নাহি জানে,
বাধা বিঘ্ন নাহি মানে,
ছুটেছে প্রলয় পানে
আপনারি ত্রাসে!
হের, মাঝখানে তারি
আট শত নরনারী
বাহু বাঁধি বুকে,
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ, চাহিয়া সম্মুখে!

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে,
রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে
"দাও, দাও, দাও !"
সিন্ধু ফেণোচ্ছল-ছলে
কোটি ঊর্দ্ধ-করে বলে
"দাও, দাও, দাও !"
ক্ষুদ্র তরী গুরু ভার
সহিতে পারে না আর,
লৌহ বক্ষ' আজি তা'র
যায় বুঝি টুট্যে !
সে আর বাঁচিবে কিসে !
বিলম্বে, বিষম রীষে
নীল মৃত্যু চারি দিশে
শ্বেত হয়্যে উঠে !
অধোউর্দ্ধ এক হয়্যে
ক্ষুদ্র এ খেলেনা লয়্যে
খেলিবারে চায়,
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায় !

নরনারী কম্পমান
ডাকিতেছে—ভগবান
হায় ভগবান !
দয়া কর' দয়া কর'
উঠিছে করুণ স্বর,
রাখ' রাখ' প্রাণ !
কোথা সেই পুরাতন
রবি শশি তারাগণ,
কোথা আপনার ধন
ধরণীর কোল !
আজন্মের স্নেহসার
কোথা সেই ঘর দ্বার !
পিশাচী এ বিমাতার
হিংস্র উতরোল !
যে দিকে ফিরিয়া চাই
পরিচিত কিছু নাই—
নাই আপনার !
সহস্র করাল মুখ সহস্র আকার !

ফেটেছে তরণীতল
সবেগে উঠিছে জল,
সিন্ধু মেলে গ্রাস !
নাই তুমি ভগবান,
নাই দয়া, নাই প্রাণ !
জড়ের বিলাস !
ভয় দেখ্যে ভয় পায়
শিশু কাঁদে উভরায় ;
নিদারুণ হায় হায়
থামিল চকিতে !
নিমেষেই ফুরাইল,
কখন্ জীবন ছিল,
কখন্ মরণ এল
নারিল লখিতে !
যেন রে একই ঝড়ে
নিবে গেল একত্তরে
শত দীপ আলো,
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো !

প্রাণহীন এ মত্ততা
না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন !
এর মাঝে কেন রয়
ব্যথাভরা, স্নেহময়
মানবের মন !

মা কেন রে এইখানে,
শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে
কেন পড়ে বুকে!
মধুর রবির করে
কত ভালবাসাভরে
কতদিন খেলা করে
কত সুখে দুখে!
কেন করে টলমল
দুটি ছোট অশ্রুজল,
সকরুণ আশা!
দীপ-শিখা সম কাঁপে ভীত ভালবাসা।

নিষ্ঠুর উন্মত্ত জড়
এ বজ্র-বিকট-ঝড়,
পাগল পাথার!—
দেখ সব ছাড়াইয়া
উঠিছে মানব হিয়া
মরণের পার!
ওই যে জন্মের তরে
জননী ঝাঁপায়ে পড়ে,
তবু বক্ষে বেঁধে ধরে
সন্তান আপন।
মরণের মুখে ধায়,
সেথাও দিবে না তায়,
কাড়িয়া রাখিতে চায়
হৃদয়ের ধন!
আকাশেতে পারাবারে
দাঁড়ায়েছে একধারে,
একধারে নারী,
র্বল শিশুটি তা'র কে লইবে কাড়ি!

তুমি জগতের নাথ
আছ নিখিলের সাথ,
সদা জাগরিত।
তোমা ছাড়া নহে ভব,
জীবনে মরণে তব
ক্রোড় প্রসারিত!
নিরাশা কভু না জানে,
বিপদ কিছু না মানে,
অপূর্ব্ব অমৃত পানে
অনন্ত নবীন
—এমন মায়ের প্রাণ
যে বিশ্বের কোন খান
তিলেক পেয়েছে স্থান,
সে কি মাতৃহীন!
এ প্রলয় মাঝখানে
অবলা জননী প্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী,—
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী!

সন্ধ্যায় আঁধার এলে
মা'র বুকে কাঁদে ছেলে,
মিছে করে গোল।
মনে করে ঘুমঘোরে,
ওই বুঝি গেল সরে
জননীর কোল!
বিপদ তেমনি ছলে
ভাসায় নয়ন জলে,
তুমি জান কারে বলে
জীবন মরণ!
যারা আছে, তারা আছে
তোমারি আঁখির কাছে,
যারা গেছে, লভিয়াছে
তোমারি চরণ!
কেন মোরা সাথীহারা
কাঁদিয়া হতেছি সারা,
কে বুঝিতে পারে!
মিলেছে সকল সাথী তোমার মাঝারে!

হেঁয়ালিনাট্য।*

যুবতী পুকুর ধারের সোপানে একখানি বই হাতে আসীন, স্বামীর প্রবেশ ও নিকটে উপবেশন।

স্বামী। কি পড়া হচ্ছে? রসময়ের অসময়ে আবির্ভাব হোল না কি?

স্ত্রী। না না এস এস, একলা পড়ে মন উঠছে না—একবার শোন দেখি, এবার আর বলতে হবে না যে ইংরাজিতে অমন ঢের আছে—

স্বামী। "যে মত্ত দেখছি ভয় হচ্ছে যে? একেবারে দেখ মনটা হারিয়ে ফেলো না। আমার যেন শেষে হাহা করে বেড়াতে না হয়।"

স্ত্রী। (হাসিয়া) মন হারানই বটে—আহা কি চমৎকার বর্ণনা সত্যই মোহিত না হয়ে থাকা যায় না—

সুকোমল চরণ কমল দুটি
ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটী, আঁচল ধরায় পড়ে লুট।
করে পদ্ম ফুল
করে দুল দুল
অলসিত আঁখি সম অধো আধো ফুটি—

কি চমৎকার—বল দেখি?"

স্বামী। তাইত। (বইখানি হাতে লইয়া) স্বপ্নপ্রয়াণ। নামটি ভাল। তা পড়ব এখন, এখন থাক। আমার কি ভাই জান—সৌন্দর্য্য রসে মিছরির মত আমাকে এত শীঘ্র গলিয়ে ফেলে যে ওসব পড়তে আমার ভয় করে। বিশেষ এখন তোমার সঙ্গে দুট কথা কইতে এলুম—তাহলে আর তা হবে না। কিন্তু তুমি ভাই ঐ বর্ণনার সৌন্দর্য্য টুক realy কতটা appreciate করেছ—

স্ত্রী। আবার ইংরাজি—বাঙ্গলা বেরোয় না বুঝি?

স্বামী। কতটা তুমি অনুভব করেছ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে—স্ত্রীলোকের Aesthetic faculty—দূর হ—সৌন্দর্য্যরসজ্ঞান আদপে যে নেই এটা এক রকম সিদ্ধান্তই হয়ে গেছে—

স্ত্রী। বটে! কে সে বল দেখি বিদ্যাবাগীশ—যিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন?

---

* গত বারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর 'পাতা'। কিন্তু 'বাকিও' হয়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল, শ্রীমতী,সরোজিনী দেবী,মৃনালিনী দাসী—উত্তর দিয়াছেন 'পাতা'। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ, অনঙ্গমোহন দাস—বলিয়াছেন 'বাকি'।

স্বামী। (স্বগত) (তুমিত আর প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ি বি, এ, নও কিম্বা দিগম্বর গড়-গড়ি এম্ এ বিএল্ ও নও—যে তোমার কাছে মুখ বুজে বসে থাকতে হবে, একটা যার তার নাম করলে ত আর ভুল ধরবার যো নাই—কি সুবিধা!) (প্রকাশ্যে) কার সিদ্ধান্ত শুনতে চাও? লোকটা কে জান? আর কেউ না—স্বয়ং স্পেনসার!

স্ত্রী। "পেনসর প্রাণেশ্বর যিনিই হ'ন না কেন স্বয়ং আমার প্রাণেশ্বর বল্লেও ওকথা আমি মানিনে। মিন্সের রকম দেখ না! ও কথা বল্লে কি করে—তার পেটে কি দুকড়ার বিদ্যে নেই?

স্বামী। "বটে প্রাণেশ্বর গুলো বুঝি মানুষের মধ্যেই নয়?

স্ত্রী। (হাসিয়া) আমার প্রাণেশ্বর ছাড়া।

স্বামী। তা সে লোকটা কে জান? একজন মহা পণ্ডিত। তাঁর কথা অগ্রাহ্য করার যো কি?

স্ত্রী। সত্যি নাকি? কখানা ইংরাজি বই পড়েছে?

স্বামী। হা হা—সে যে ইংরাজ—

স্ত্রী। "ইংরাজ হলেই বা? সে কি তোমার মত অতগুলা ইংরাজি বই পড়েছে তাই জিজ্ঞাসা করছি?

স্বামী। "তা আমার মত অতগুলা পড়েছেন কি না জানি না—তবে তিনিও এক-জন মস্ত বিদ্বান এই কথা বলতে পারি।"

স্ত্রী। কক্ষনো না। তবে সে ও কথা বলবে কেন? আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ নেই এ আবার কি কথা! তবে বুঝি সেটা এ কালের নারদ অবতার, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তার ঝগড়া বাধাবার ফন্দী?

স্বামী। (হাসিয়া) তিনি একলা না—কাণ্ট কমটি প্রভৃতি আজকালকার বড় লোক-দের সকলেরি ঐ মত। কিন্তু তুমিত সে সব কথা অত বুঝবে না—আমি তোমাকে আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাই"

স্ত্রী। (গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া স্বগত) কি বিদ্বান স্বামীই আমি পেয়েছিলুম—সরস্বতী যেন কণ্ঠাগ্রে। কিন্তু এ কথাটি যে কেন বলছেন তাত বুঝতে পারছিনে—বুঝি বা আমার বুদ্ধির পরীক্ষা করছেন। দাঁড়াও আমিও ছাড়ছি কি না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বল।

স্বামী। "দেখ ঐ যে ঐ খানে গোলাপ ফুলটি ফুটিয়া আছে, দেখ কত সুন্দর—

স্ত্রী। তাত দেখছিই, সে কি আর আমাদের চেয়ে তোমরা বেশী দেখবে? শোন—

কি চক্ষে দেখে যে ফুল বিরহিনী!
ফুরায় না দেখা আর! পড়ে যেন দুঃখের কাহিনী!

পড়া শিখিয়াছে, ফুলধনু কাছে
ফুলের তেঁই সে এত মরম গ্রাহিণী

পুষ্প নারী হৃদয়ের দরপণ,
অবলা লালিত্য যেন করিয়াছে ছবি অরপণ
তা'র দলে দলে, তেঁই গীতচ্ছলে
মনোজ্বালা করে বালা ফুলে আরোপণ—

কবি এ কথা বলেছেন।"

স্বামী। আহা কথাটাই শেষ করিতে দাও। মেয়েরা যে ফুল, আমি অস্বীকার করি-তেছি নাকি! কিন্তু ফুল যে নিজের সৌন্দর্য্যে জগৎ মুগ্ধ করে সে কি নিজে সে সৌন্দর্য্য অনুভব করে? তেমনি তোমরা সৌন্দর্য্যভাব প্রস্ফুটিত কর সৌন্দর্য্য রস অনুভব করিতে পার না"

স্ত্রী। "কি কথাই বল্লে—মরে যাই আর কি? ফুলের সঙ্গে আমরা সমান হলুম—কেন আমরা ফুলের মত জড় নাকি? মেয়ে বলে আমাদের কি মন টন কিছুই নেই? তা বলবে বই কি! হা অদৃষ্ট! (মুখ ভার)

স্বামী। (শশব্যস্তে) তাই কি আমি বলছি?

স্ত্রী। তবে কি বলছ?

স্বামী। আমি বলছি মেয়েদের পুরুষদের মত অতটা সৌন্দর্য্য জ্ঞান নেই?

স্ত্রী। তাই বা নয় কেন? কথা একটা ত বল্লেই হোলনা বুঝিয়ে দাও?

স্বামী। রুচির উৎকর্ষ সাধিত না হলে যথার্থ সৌন্দর্য্য জ্ঞান কখনই স্ফূর্ত্তি পেতে পারে না। তোমাদের রুচির অভাব তোমাদের বেশেই প্রকাশ পায়, অসভ্যদিগের মেয়েদেরও এরূপ নির্লজ্জবেশ নয়। বিশেষ যখন তোমরা নিমন্ত্রণে যাও—দশজনের মাঝে ভদ্র রকম বেশের যেখানে নিতান্তই আবশ্যক—সেইখানেই তোমাদের চূড়ান্ত রুচি প্রকাশ পায়।

স্ত্রী। "প্রভু সে কার দোষ? আমাদের না আপনাদের? আপনারা আমাদের যেমন রাখেন সেইরূপ থাকি যে পথে নিয়ে যান সেই পথে যাই। আপনারা আমাদের এই বেশ ভাল বাসেন তাই আমরা পরি—যদি দেশ শুদ্ধ পুরুষের এবেশ নিন্দনীয় মনে হয়—ত এক দিনেই ইহার অন্য ব্যবস্থা হয়।"

স্বামী। "কেন আমি অনেকবার এরূপ কাপড় পরার নিন্দা করেছি।"

স্ত্রী। "আমি ত সেরূপ নিন্দার মানে প্রশংসাই বুঝেছি। সে দিন বোসেদের বাড়ীর বৌয়ের কাপড়পরা দেখে আমি সে কথা যখন বলি তখন তার উপর কতটা আক্রমণ হয়েছিল মনে আছে কি?"

স্বামী। "দূর কর ছাই—তোমরা এমন কথাটাকে বাঁকিয়ে ফেলতে জান? নূতন কিছু হলেই লোকে অমন দুএকটা কথা কয়। তাতে আর হয়েছে কি। আমি তোমাকে ঐ রকম কাপড় পরতে মানাও কর‍ছিনে কিছুই না—কিন্তু তাতে ত আর তোমাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান আছে বলে প্রমাণ হচ্ছেনা।

ভারতচন্দ্র বিদ্যাপতি প্রভৃতি আমাদের কবিদের বর্ণনায় দেখ, আর আসলেও দেখ—বাঁকা হাসি, আড়চাহনি, তেড়িফেরান-সৌখিনতা ভাবেই আমাদের দেশের মেয়েরা পাগল, যথার্থ মহত্ব, মনুষ্যত্ব, পুরুষের একটা পুরুষত্ব ভাব এ আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা কজন Appreciate—দূর কর বুঝে বল দেখি? এই খানেই ত প্রকৃত রুচির অভাব!

স্ত্রী। তা দেশের পুরুষরা যদি সব মেয়েই হয় তার জন্য আমরা কি করব?

স্বামী। "তা কেন? তোমরা যদি বাস্তবিক পুরুষের পৌরুষিকগুণ ভালবাসতে তা হলে কি পুরুষরা মেয়ে হতে পারে? তা হলে দেশের স্বতন্ত্র শ্রী হয়ে পড়ত। এই সে দিন আমি এক রকম নূতন রকম কাপড় ও পাগড়ি তৈরি করলুম—তা দেখেই তুমি নাক তুলতে আরম্ভ করলে। তোমার সেই বাহারে ধুতী চাদরটি না হলে মনঃপুত হয় না"—

(ভ্রাতৃবধূর প্রবেশ)

স্ত্রী। (হাসিয়া) ও বউ—মজা শুনসে? তুই যদি ভাই সেই ধুম্ব পাগড়িটা—আর মালকোচা সাটের কাপড় পরাটা দেখতিস—ত হাসি রাখতে পারতিস নে।

তা যখন যুদ্ধে যাবে সে রকম কাপড় পরো—এখন ঘরে বসে আর ওতে কি হবে?

স্বামী। "তা তুমি যেতে দিলেত?

স্ত্রী। "তা দেব না কেন? এই যে সে দিন হারার মাকে হারা মদ খেয়ে মারতে লাগলো—আমি জানালা দিয়ে দেখে ছাড়িয়ে দেবার জন্য তোমাকে কত ডাকলুম—তা তুমিইত গেলে না!"

স্বামী। (স্বগত) বেশ স্ত্রী যাহক! মাতালের হাতে গিয়ে, তখন প্রাণটা খুইয়ে আসি। (প্রকাশ্যে) সে তখন আমার মাথা ধরেছিল কি করি বল?

স্ত্রী। মাথা আবার কখন ধরলে? তুমি ত বল্লে কে আবার যায়।

স্বামী। "আমি যদি না গিয়ে থাকি—সেও তোমার দোষ? তুমি যদি যশোবন্তের স্ত্রীর মত আমাকে উত্তেজিত করতে তাহলে কি আমি না গিয়ে থাকতে পারতুম?

স্ত্রী। সে আবার কোন বইয়ে আছে?

স্বামী। "টডের রাজস্থানে।

স্ত্রী। ইংরাজি না বাঙ্গলা?

স্বামী। "ইংরাজি।"

স্ত্রী। সেটা কার দোষ। তুমি আমাকে ইংরাজি পড়ালে না কেন—তাহলে ত সে বক্তৃতাটা মুখস্থ করে রাখতে পারতুম"

স্বামী। (স্বগতঃ) তাহলেই হয়েছিল আর কি। এখানে এসে বিদ্যে ফলিয়ে যে সুখটুক আছে তাও থাকত না) প্রকাশ্যে "তা আমিত তোমাকে ইংরাজি শেখার জন্য ঢের বলেছিলুম—তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে মিল স্পেনসর পড়ে যদি দুজনে সকল রকম ভাবের আদান প্রদান করতে পারতুম—তাহলে কি সুখই হোত—"

ভ্রাতৃজায়া। বলি ব্যাপারখানা কি—আমি ত তোদের ঝগড়ার মানে মোদ্দা কিছু পাচ্ছিনে।

স্ত্রী। "উনি বলছেন কি জান—মেয়েদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান নেই— ?

ভ্রাতৃজায়া। সে কি কথা! কার কেমন রূপ কে কেমন দেখতে—কে সুরূপ—কে কুরূপ তা আমরা বুঝতে পারিনে ? আমরা কি কানা নাকি ?

স্বামী। "ঠিক কানা নয়—এক চোখে। তোমরা কুরূপই দেখতে পাও—সুরূপ কারো কখনো দেখ না। এই মনে কর—আমরা একটা সুন্দর —ী এই সৌন্দর্য্য দেখলে যতটা আনন্দ লাভ করি—তাকি তোমরা কর—তোমাদের মুখে কাউকে ত প্রায় সুন্দর বলতেই শোনা যায় না— !

স্ত্রী। "ওমা কি হবে ? কেন জগৎ বাবু—

স্বামী। (রাগিয়া) জগৎ বাবু! সে কথা কে বলছে ? আমি বলছি—যথার্থ সৌন্দয্য তোমাদের চোখে লাগে না—লাগে কেবল তার খুঁৎটা। সৌন্দর্য্য দেখে তোমরা আনন্দ উপভোগ কর না—ঈর্ষা উপভোগ কর"

স্ত্রী। কেন কাকেই বা আমি ঈর্ষা নয়নে দেখলুম—আর কারই বা খুঁৎ ধরতে গেছি—"

স্বামী। কেন—ললিতা—অমন সুন্দরী তুমি—"

স্ত্রী। "যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল!"

ভ্রাতৃজায়া। "ও পোড়া কপাল সে আবার সুন্দরী, তার পায়ের আঙ্গুলের নখগুলা যেন শালপাত পানা চটাল চটাল। হাতের কুনুইটা ঢিবলে বার হয়ে আছে। তারপর আবার মেয়ে মানুষের অত বড় কপাল, অত ট্যাকাল নাক—শ্রী যে কোন খানটায় তাত বুঝতে পারিনে। চুলটা ছাই যদি পেটে পেড়ে কপালটা ঢাকে তবু না হয় চলে—তা না আবার ঐ চাঁদপারা কপালে আলবর্ট ফ্যাসানে চুলবাঁধা—মরে যাই আর কি! মেয়ে মানুষ ছোট খাট কপালটি হবে—খাঁদাপারা নাকটি হবে। হ্যাঁ তবে চোখ দুটি ডাগর ডাগর দেখায় ভাল। কেন তার চেয়ে আমাদের ঠাকুরঝি কি কম সুন্দরী ?

স্বামী। (মনে মনে) হ্যাঁ ঠিক ঐরূপ খ্যাঁদা পারা শ্রীটিই বটে।

স্ত্রী। "তা ভাই আমি যেন নাই সুন্দরী হলুম—তাই বলে কি আর কেউ সুন্দর নেই—ঐ একজনই কি বিশ্বে সুন্দর জন্মেছে? অমন পটল চেরা চোখ আমি ঢের দেখিছি—

স্বামী। কোথায় বল দেখি?

স্ত্রী। "কেন আমার দিদির—আর আমার ভগিনীপতির বা কম কি? দেখেছ ত বৌ?

স্বামী। (রাগিয়া) জগৎ বাবু—! সেই বানরটা আবার!

স্ত্রী। আর আমার মেজ ভগিনীপতিই বা কি সুশ্রী! যেমন রং—তেমনি চেহারা।

স্বামী। "সে হনুমানটার নাম শুনলে গা জলে!

স্ত্রী। "আর সেজও যেন কার্ত্তিক—

স্বামী। (ক্রোধভরে উঠিয়া) আমি চল্লুম। বুঝেছি সবাই সুন্দর—আমিই কেবল কুশ্রী, আমার মুখ আর তোমার দেখে কাজ নেই।

স্ত্রী। কেন গো—এতে রাগ কি? সুন্দরকে সুন্দর বলেছি বইত নয়!

স্বামী। তাই জন্ম জন্ম কাল বল, আমি চল্লুম—

(পুষ্করিণী সোপানে দ্রুতবেগে অবতরণ)

ভ্রাতৃজায়া। এ কি! হাসতে হাসতে সমস্তটাই শেষে হাহাকার যে!

স্ত্রী। (কাঁদিয়া) কর কি, কর কি—সব ঠাট্টা! আমি এমন কথা আর বলব না—

ভ্রাতৃজায়া। "ঠাকুর জামাই কর কি—মর তাহাতে ক্ষতি নাই, সিঁড়িতে পড়িয়া গেলে—অমন চাঁদপারা মুখে চিরকাল কলঙ্ক ধরিয়া থাকিবে যে।

স্বামী। "(জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া) সে কথা বড় মিথ্যা নয়, তবে দেখ্‌ছি এখান থেকেই আবার ফিরতে হোল।

ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

এশ কে লাহিড়ী কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত।

জুবিলি উপলক্ষে গ্রন্থকার বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকা সমাজকে ভিক্টোরিয়ার উক্ত জীবন কাহিনী খানি উপহার প্রদান করিয়াছেন। এমন সুন্দর উপহার যিনি দিয়াছেন তাঁহার নাম জানিতে অনেকেরই আগ্রহ হইবে কিন্তু গ্রন্থে তাঁহার নাম নাই। গ্রন্থকার যিনিই হউন উদ্দেশে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি বইখানি পড়িয়া আমরা নিতান্তই পরিতৃপ্ত

হইয়াছি। এখানি কেবল রাজা রাণীদের আড়ম্বর পূর্ণ চক্রান্তময় জীবন-কাহিনী নহে। ইহা একটী অনুপমা গুণবতী রমণীর চিত্র। মহারাণীর বংশাবলী, জন্ম, বিবাহ, সন্তানাদির কাহিনী, তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বকার এবং সমসময়ের রাজনৈতিক অবস্থা, যুদ্ধ, সন্ধি, মন্ত্রীসভার বিবরণ প্রভৃতি রাণীর ঐতিহাসিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম দয়া ন্যায় প্রেম স্নেহ ভক্তি সত্যনিষ্ঠা উদারতা প্রভৃতি রমণীয় গুণগুলিও সুন্দর রূপে ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন "দুঃখের বিষয় এই বিবিধ গুণ বিভূষিত রমণীর রমণীয় চরিতাখ্যান আজি পর্য্যন্ত এদেশের জন সাধারণে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয় নাই। সাধারণ লোকে তাঁহাকে মহারাণী বলিয়াই জানে, রাজভক্তি-প্রধান ভারতসন্তান কেবল রাণী বলিয়াই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে। তাহাদের অপেক্ষাকৃত অজ্ঞতা নিবন্ধন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের মাধুর্য্যগুণে তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্রের প্রতি তাহারা এখনও বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় নাই। রাজ্ঞীরূপে তিনি আমাদিগের যতটুকু বরণীয়া, আদর্শ রমণীরূপে যে ততোধিক পূজনীয়া ইহা আমরা এখনও ভাল করিয়া জানি না। এই অভাব মোচনোদ্দেশেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই জীবন কাহিনী বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকা সমাজে প্রচারিত হইল।" বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকা সমাজ যে ভিক্টোরিয়ার মনোহর চরিত্রের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন ও লেখকের বর্ণনা শক্তিতে পুলকিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভিক্টোরিয়ার এই চরিত্র মাধুর্য্যের কথা বলিয়া লেখক বলিতেছেন 'রমণী চরিতের মাধুর্য্য ভারতক্ষেত্রে চির বিকশিত। নারীপূজা ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম। শক্তিরূপে ভগবতী, সতীরূপে সীতা সাবিত্রী ভারতের চিরারাধ্যা দেবতা। নারীচরিতের পরম-মাধুর্য্যে বিমোহিত হওয়া কবিত্ব-প্রধান ভারতবাসীর পৈত্রিক প্রকৃতি। মহারাণী ভিক্টোরিয়া আদর্শ রমণী। তাঁহার রমণীজনোচিত চরিত্র প্রভাবে আজ ইংরাজ রমণী-সমাজের মুখোজ্জ্বল। তাঁহার সরল ভক্তি মাধুর্য্যে ইংরাজ ধার্ম্মিক-সমাজ আজ বিমোহিত। কন্যারূপে তিনি দুহিতৃকুলের শিরোভূষণ; পত্নীরূপে তিনি একাগ্রমনা পতি-পরায়ণতার পরম দৃষ্টান্তস্থল, বৈধব্যে তিনি প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র আদর্শ, এবং জননীরূপে তিনি মাতৃসমাজের শিরোমণি! এই রমণী শিরোমণির সুমধুর চরিতের আদর ভারতবাসী না করিলে আর কে করিবে।"

ভিক্টোরিয়া ভারতের অধীশ্বরী, ভারত সন্তানের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, তাঁহার দেবী ভাবাপন্ন চরিত্রে যে এই শ্রদ্ধা ভক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। শুধু ভারত-বাসীর কেন এরূপ গুণবতী রমণী সমস্ত জগৎবাসীরই আদরের বস্তু।

মাতার শৈশব শিক্ষাই ভিক্টোরিয়ার সুচারু চরিত্র বিকাশের মূল।

ভিক্টোরিয়ার মাতা "লুইসা আপনার প্রিয়তমা কন্যার শৈশব শিক্ষারভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণ দশঘটিকা হইতে দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিনি

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তিনি জানিতেন যে জীবনে সচ্চরিত্র সর্ব্ব প্রকার সুখ ও সম্মানের নিদান। তাই অতি শৈশবকাল হইতেই যাহাতে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার জীবনে সুনীতির বীজ রোপিত হইতে পারে শৈশব দোলা হইতেই যাহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়-মনের গতি ধর্ম্ম ও পবিত্রতার দিকে প্রধাবিত হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তাঁহার এই চেষ্টা বিশেষ ফলবতীও হইয়াছিল।" * * * * *

"রাজবধূ লুইসা কিরূপ একাগ্রতা সহকারে আপনার তনয়ার শৈশব শিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন, কিরূপ ঐকান্তিক শিক্ষা সহকারে তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনে সর্ব্বপ্রকার সদ্ভাবের বীজরোপণ করিয়া দিয়াছিলেন, কিরূপ অবিশ্রান্ত যত্ন সহকারে বালিকা ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে এই সকল সদ্ভাব ও সদ্‌প্রবৃত্তির অঙ্কুর সকলকে পূর্ণবিকশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ইংলণ্ডের ব্যবস্থাপক-সমাজ মহাসভা-পার্লামেণ্টের সভ্যগণ একরূপ এক বাক্যে পরে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।"

এই শিক্ষার গুণে শৈশব কাল হইতেই ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে উদারতা সত্যনিষ্ঠা এবং সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত।

"একদা প্রাতঃকালে বাল স্বভাব সুলভ চপলতা নিবন্ধন রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া বিদ্যাভ্যাসে নিতান্ত অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে লেজেন নাম্নী জনৈক উচ্চবংশীয়া ভদ্র মহিলা তাঁহার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। রাজকুমারীর দুরন্ত ব্যবহারের কথা রাজবধূ লুইসার কর্ণে পৌঁছিল, তিনি অমনি তনয়ার অধ্যয়নের তত্ত্বাবধান করিতে আসিলেন। ভিক্টোরিয়া কিরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিলে, শিক্ষয়িত্রী বলিলেন যে "রাজকুমারী কেবল মাত্র একবার আমাকে কিছু বিরক্ত করিয়াছিলেন"। এই কথা শুনিবামাত্র রাজকুমারী অতি মৃদুভাবে শিক্ষয়িত্রীর বাহুস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "না লেজেন, দুইবার, তোমার কি মনে নাই?" সত্যপ্রিয়তা এই বালিকার কোমল চরিত্রের এমন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইয়াছিল যে তাহার অনুরোধে তিনি আপনার বিরুদ্ধে আপনি অযাচিত ভাবে সাক্ষ্যদান করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না।"

হৃদয়ের এইরূপ উচ্চভাব উদ্দীপন করা ভিন্ন সাধারণ দৈনিক কার্য্যে ধৈর্য্য, আত্মসংযম প্রভৃতি গুণে ভিক্টোরিয়াকে গুণবতী করিতেও লুইসা যথেষ্ট যত্ন করিতেন। "রাজকুমারীর মানসিক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশে অতি শিশুকাল হইতেই কি অধ্যয়নে কি আমোদে প্রমোদে কোনও বিষয়ে একটী কাজ একবার আরম্ভ করিলে তাহা শেষ না করিয়া তাঁহাকে কখনও কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া হইত না। একদা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া রাজপ্রাসাদ সংশ্লিষ্ট প্রমোদ উদ্যানে শুষ্ক দূর্ব্বাদল লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। এই ক্রীড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই সহসা তাঁহার মনের

গতি ফিরিয়া গেল। কিন্তু এই অর্দ্ধ নির্ম্মিত দূর্ব্বাদল স্তূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ক্রীড়ান্তরে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার বুদ্ধিমতী জননী আরব্ধ ক্রীড়া সমাপন না করিয়া তাঁহাকে ক্রীড়ান্তরে যাইতে নিষেধ করিলেন। মাতৃ আজ্ঞায় রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াও অগ্রে আরব্ধ ক্রীড়া সমাপন করিয়া পরে ক্রীড়ান্তর অন্বেষণে গমন করিলেন।”

এইরূপে আত্মসংযম বিষয়েও ভিক্টোরিয়া কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহার একটী পরিচয় দিতেছি। “রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার পিতার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল ছিল। সুস্থ কালে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জন্য উপযুক্ত জীবনোপায় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই প্রত্যুত সমূহ ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চরম পত্র দ্বারা তিনি যে সামান্য সম্পত্তি আপনার প্রিয়তমা পত্নী ও বালিকা কন্যার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন; বিবেকের অনুরোধে আপনারা সুখসচ্ছন্দে থাকা অপেক্ষা স্বর্গগত পতিকে ঋণ মুক্ত করা শ্রেয়স্কর মনে করিয়া রাজবধূ লুইসা সে সামান্য সম্পত্তিও উত্তমর্ণদিগকে দান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার উচ্চপদ ও সম্মানের সঙ্গে যে তাঁহার আর্থিক অবস্থার সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য ছিল, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ তাঁহার ভ্রাতা লিওপোলডের অসঙ্কোচ-অর্থ সাহায্য না পাইলে সংসারের দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত। সুতরাং রাজবধূ লুইসাকে অসাধারণ আত্মসংযম ও নৈপুণ্য সহকারে আপনার পরিবারের ব্যয় সঙ্কলন করিতে হইত”।

“এমন কি আজ যিনি সমগ্র ব্রিটিশ রাজ্যের অধীশ্বরী, তাঁহাকেই শৈশবে অর্থাভাবে সময়ে সময়ে বিশেষ সঙ্কুচিত থাকিতে হইত। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া আপনার ইচ্ছামত ব্যয় করিবার জন্য মাতার ক্ষীণ অর্থাধার হইতে প্রতিমাসে কিঞ্চিৎ বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন কিন্তু যাহাতে তিনি এই বৃত্তির অতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও না ব্যয় করেন, তৎপ্রতি তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতা সর্ব্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। একদা রাজ পরিবারের বন্ধু বান্ধবদিগকে উপহার দিবার জন্য বাজারে যাইয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া অনেকগুলি দ্রব্যজাত মনোনীত করিলেন। এক দুই করিয়া এই সকল দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া দেখা গেল যে, শেষ নির্ব্বাচিত উপহারটী ক্রয় করিতে গেলে তাঁহার বৃত্তির অতিরিক্ত ব্যয় হয়। বিক্রেতা সেটীও অপরাপর দ্রব্যের সঙ্গে বাঁধিয়া দিতেছে দেখিয়া রাজকুমারীর শিক্ষয়িত্রী বলিলেন “রাজকুমারীর ঐটী কিনিবার অর্থ নাই।” বিক্রেতা তথাপি তাহা ধারে বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল কিন্তু রাজকুমারী তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, তবে সে যদি ঐ দ্রব্যটী তাঁহার জন্য তুলিয়া রাখে, তাহা হইলে কিছুদিন পরে তাঁহার আগামী মাসের বৃত্তি পাইলে, তিনি আসিয়া ক্রয় করিতে পারেন,—এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। বিক্রেতা তাহাতেই সম্মত হইল এবং রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া যথাসময়ে আসিয়া আপনার মনোনীত দ্রব্যটী ক্রয় করিয়া লইলেন।”

একজন বালিকার পক্ষে ইহা কি অসাধারণ আত্মসংযম নহে ?

"রাজবধূ লুইসা সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তনয়ার উপযুক্ত রূপে ধর্ম্ম শিক্ষাও হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এই উদ্দেশে তাঁহার নিয়োগানুসারে প্রতিদিন প্রাতে পার্দি ডেভিস সর্ব্বাগ্রে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল শিক্ষা দিতেন। তাঁহার নিষ্ঠাবান শিক্ষকের ও ধার্ম্মিকা জননীর জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ এবং জীবন্ত দৃষ্টান্ত হইতেও রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া শৈশবাবধিই ধর্ম্ম জীবন শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজ বধূ লুইসা কি একাগ্রতা সহকারে তাঁহার তনয়ার প্রাণে ধর্ম্মভাব মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন জনৈক ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্রী তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার শিশুকালে এই লেখিকা ক্লেরমোণ্ট রাজবাটীর নিকটে বাস করিতেন, এবং রাজবধূ লুইসার পরিবারবর্গের সঙ্গে এক উপাসনালয়ে প্রতি রবিবারে উপাসনা করিতেন। একদা উপাসনা মন্দিরে উপাসনা-কালে একটী বোলতা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সুকুমার মুখখানির চতুষ্পার্শ্বে ভন ভন করিয়া ঘুরিয়া সেই দিকে এই গ্রন্থকর্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কি জানি দুরন্ত বোলতা রাজকুমারীর মুখে হুল ফুটাইয়া দেয় এই ভয়ে তিনি একটুকু উৎকণ্ঠিতও হইলেন। কিন্তু রাজকুমারীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে এই বোলতার প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি অনিমেষলোচনে একাগ্রমনে ধর্ম্মযাজকের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। এই ধর্ম্ম যাজক রাজকুমারীর সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, এবং তাঁহার মুখচ্ছবিতেও এমন কিছু ছিল না যাহাতে বালিকা ভিক্টোরিয়ার মন তৎপ্রতি এরূপ গভীর একাগ্রতাসহকারে আকৃষ্ট হইতে পারে। লেখিকা রাজকুমারীর এই নিবিষ্টচিত্ততা ও অনিমিষ দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু পরদিবস রাজবাটীর একটী ভদ্র মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলেন যে প্রতি রবিবারে উপাসনার পরে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে মাতার নিকট উপাসনালয়ে প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশের সার মর্ম্ম পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইত। এবং তজ্জন্যই তিনি ঐরূপ একাগ্রতা সহকারে এই ধর্ম্ম যাজকের উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন।"

এই শিক্ষার গুণে ভিক্টোরিয়ার জীবনে বরাবর সরল ধর্ম্মভাব দেখা যায় এবং তাঁহার সাধারণ জীবন ও রাজ জীবনের কোন কর্ম্মেই তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে বিস্মৃত হয়েন নাই।

লুইসা যে শুধু এইরূপ তনয়ার চরিত্র উন্নতি করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে অতি অল্প বয়সেই ভিক্টোরিয়া নানা দেশীয় ভাষার সাহিত্য কবিতাতে এবং বিদেশীয় ও স্বদেশীয় ইতিহাসে, উদ্ভিদ জীবতত্ব গৌতত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানে এবং নৃত্য গীত সূচী কর্ম্ম ও চিত্র প্রভৃতি কলা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন এবং সমাজের রীতি নীতি ভদ্রতা প্রভৃতি সামাজিকতা সুচারুরূপে শিক্ষা ও নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা

লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং আশ্চর্য্য কি যে ১৮ বৎসর বয়সে যখন এই সর্ব্বগুণ বিভূষিতা রমণীরত্ন সিংহাসন আরোহণ করিলেন তখন তাঁহার সৌজন্য বিনয় নিরহঙ্কারতা নম্রতা ন্যায় ধর্ম্মভাব প্রভৃতি রমণীয় গুণ ও রাজ্য শাসনোপযোগী তীক্ষ্ণ অথচ সরল বুদ্ধি ও গভীর জ্ঞান দেখিয়া পাত্র মিত্র সকলেই প্রীত হইবে, সকলে এক বাক্যে তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিবে এবং তাঁহার ন্যায় মাতা পাইয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিবে।

"ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব প্রারম্ভে দেশের যে বিষম রাজনৈতিক অবস্থা ছিল রাজনৈতিক দলাদলি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে ঘোরতর প্রাদুর্ভাব ছিল তাহাতে তাঁহার মত অল্প বয়স্কা যুবতীর এই নিরতিশয় কঠিন কার্য্য সাধন যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই গুরুতর অবস্থায় এত অল্প বয়সে এরূপ সামান্য অভিজ্ঞতা লইয়াও যে তিনি অতিশয় সুন্দর ও সুচারু সুশৃঙ্খলরূপে রাজ কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ বিচক্ষণতার বিশেষ প্রমাণ। অনেক সময় রাজারা নামে রাজা হয়েন মাত্র কিন্তু মন্ত্রীগণই প্রকৃত রাজ্য কর্ত্তা হয়। মহারাণী এরূপ সাক্ষীগোপাল স্বরূপ ছিলেন না। নিজের বিবেকানুসারে ন্যায়মত রাজ্য চালনা করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রিগণ যাহা কিছু রাজকীয় কাগজ পত্র তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করেন মহারাণী তৎসমুদায়ই অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তৎসম্বন্ধে আপনার মতামত প্রদান করিতে লাগিলেন। কোন বিষয়েরই সম্পূর্ণ তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না। এমন কি তাঁহার এই সকল ভাব স্বভাব দৃষ্টে প্রধান মন্ত্রী মেলবোরণ একদিন বলিয়াছিলেন, এরূপ একজন রাণীকে চালান অপেক্ষা দশজন রাজাকে চালান সহজ ব্যাপার। মহারাণীর স্বাক্ষর লাভার্থে কোনও কাগজ পত্র তাঁহার সমক্ষে স্থাপন করিলে তিনি তৎসম্বন্ধে অগ্রে অসংখ্য প্রশ্ন করিতেন এবং তাহাদের সদুত্তর না পাইয়া কখনও তাহাতে আপনার নাম অঙ্কিত করিতেন না। কখনও কখনও এই সকল প্রশ্নোত্তরের পরও বিশেষ বিবেচনা করিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করিবেন না বলিয়া তাহা স্থগিত রাখিয়া দিতেন। একদা মন্ত্রি সমাজ কর্ত্তৃক রচিত এক খণ্ড বিধান মহারাণীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়া কথোপকথনচ্ছলে প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে এই বিধান পাশ করা সুবিধাজনক হইবে; এই কথা শুনিয়া মহারাণী অমনি বলিয়া উঠিলেন "মহাশয় ভাল মন্দ বিচার করিতেই আমি শিখিয়াছি কিন্তু সুবিধা কথাটী আমি শুনিতেও চাহি না বুঝিতেও চাহি না।"

রাজ্যারোহণের কিছু দিন পরেই তাঁহার মাতুল পুত্র রাজকুমার আলবার্টের সহিত ভিক্টোরিয়ার পরিণয় হয়। "রাজন্যসমাজের গভীর সরল প্রেম অপেক্ষা কূট ও স্বার্থপর রাজনীতির খেলা অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

বিবাহ প্রকৃত প্রেমের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল।" ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট উভয়েই আত্মীয়তা সূত্রে উভয়ের নিকট উভয়ে পরিচিত ছিলেন। সেই কারণে রাজকুমার আলবার্ট আশৈশব ভিক্টোরিয়াকে ভালবাসিতেন। এই সুকুমার বালিকা-রত্নকে, আপনার হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহারই সুখের ও স্বার্থের মধ্যে আপনার জীবনের সমুদয় সুখ এবং স্বার্থ একেবারে নিমগ্ন করিয়া দেন ইহা তাঁহার প্রাণের গূঢ়তম আকাঙ্খা ছিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভিক্টোরিয়ার মনোরম রূপ গুণের বিকাশে এবং আপনার হৃদয়ের স্বাভাবিক পরিস্ফূর্ত্তিতে এই গভীরতর আকাঙ্ক্ষা গভীরতম হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়াও প্রাণে প্রাণে বহুকাল হইতে রাজকুমার এলবার্টকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পরে তিনি বারম্বার বলিয়াছিলেন যে রাজকুমার এলবার্ট ব্যতীত অপর কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না আশৈশব তাঁহার প্রাণে এই সঙ্কল্প ছিল। তাহাদের মিলন ধার্য্য হইয়া গেলে উভয়েই আত্মীয়বর্গের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও গভীর বিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু উভয়েই অপরের সমতুল্য নহেন বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। যেখানে প্রণয়ী যুগলের পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকে যেখানে উভয়েই আপনার প্রণয়পাত্র বা প্রণয় পাত্রী অপেক্ষা আপনাকে অনেক হীন মনে করেন সেখানেই প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হয়। কিন্তু এই কঠোর জগতে এই—আমি অতি-হীন-ভাব প্রেম সচরাচর দৃষ্ট হয় না"।

"কবিতা ও উপন্যাসে ইহার যেমন বিকাশ বাস্তব জীবনের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার তেমন বিকাশ হয় না। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে ভিক্টোরিয়া ও এলবার্টের এই পবিত্র প্রেমে এই গম্ভীর শ্রদ্ধার ও এই আমি অতি-হীন ভাবের পূর্ণ বিকাশ দৃষ্টে চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়।"

"এই রাজকীয় প্রেম কাহিনী পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন কোনও উচ্চাঙ্গের কাব্য বা উপন্যাস পাঠ করিতেছি। ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্টের এই প্রেমভাব দেখিয়া মনে হয় যেন সুকবি সেক্ষপীয়র বর্ণিত মিরান্দা ও ফার্দিনন্দকে দেখিতেছি, বা আমাদিগের মহাকবি কালিদাসের উমা ও মহাদেবের প্রেমলীলার নয়ন প্রীতিকর অভিনয় দর্শন করিতেছি।"

"ভিক্টোরিয়া রাণী হইয়াও অন্যান্য রমণীর ন্যায় স্বামীর সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া চলিতেন। প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে কন্যাকে অপরাপর প্রতিজ্ঞার সঙ্গে স্বামীর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। মহারাণীর পক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সুসঙ্গত হইবে না মনে করিয়া তাঁহার বিবাহকালে ক্যাণ্টারবরীর ধর্ম্ম যাজক মহাশয় প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতিতে বিশেষতঃ ঐ বশ্যতা স্বীকারের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে ভিক্টোরিয়া কোনও পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন কি না জানিতে চাহিলেন। তিনি তদুত্তরে ধর্ম্ম যাজক মহাশয়কে বলিলেন "চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের পবিত্র পদ্ধতি অনুসারে অপরাপর স্ত্রীলোকের মত আমি

বিবাহিত হইতে ইচ্ছা করি এবং রাজ্ঞী রূপে আমি বশ্যতা সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞা করিতে না পারিলেও রমণী রূপে প্রচলিত পদ্ধতি সমুদায় আমি প্রতিজ্ঞা করিতে প্রস্তুত আছি।"

"বিবাহিত জীবনে ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামী উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে রাজনৈতিক সংস্কার, সমাজসংস্কার, রঙ্গালয়সংস্কার, দেশে ধর্ম্মভাব প্রচার, ইহুদীদিগকে সমান অধিকার দান, অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী স্থাপন ও শিল্প সংগীতাদির উন্নতি প্রভৃতি অনেক লোকহিতৈষণা পূর্ণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এইরূপ নানাবিধ সৎকর্ম্মে বিংশতি বর্ষ এই সুখময় প্রেমপূর্ণ জীবন উপভোগ করিয়া তাঁহাদের সাতটী সন্তান হইবার পরে রাজকুমার এলবার্ট মহারাণীকে চির দুঃখে ডুবাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুন্দর জীবনের এই দারুণ বিষাদের চিত্র আর অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ফলতঃ ভিক্টোরিয়ার প্রকৃত জীবন যাহা রাজকুমার এলবার্টের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও এক রূপ শেষ হইয়া গেল। আর তাহার সেই প্রসন্নতা সেই উৎসাহ সেই উদ্যম সেই কিছুই প্রকাশিত হইল না। এখন হইতে সংসারের কার্য্য না করিলে চলে না তাই তিনি তাহা করিতে লাগিলেন। রাজ কার্য্যে মনোনিবেশ না করিলে কর্ত্তব্য হানি হয় তাই রাজ কার্য্য পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নতুবা তাঁহার জীবনের জীবন্ত ভাব প্রাণের প্রাণতা সৌন্দর্য্য প্রিয়তমের মৃত দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারই সমাধিক্ষেত্রে ভূগর্ভে নিহিত হইল। পতির মৃত্যুর পরে কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত মহারাণী ভিক্টোরিয়ারও জীবন সংশয় হইয়াছিল।"

ভিক্টোরিয়া নিজে যেরূপ সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন আপনার তনয় তনয়াদিগকেও সেইরূপ শিক্ষিত করিতে সর্ব্বদা যত্নবতী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে যাহাতে তাহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মে মতি হয় সেই চেষ্টা করিতেন।" তাহাদের অন্যায় অত্যাচার দেখিলে উপযুক্তরূপ শাসন করিতে কদাপি ত্রুটী করিতেন না। কথিত আছে একদা দুইজন রাজকুমারী বালস্বভাব সুলভ চাপল্য নিবন্ধন একটী পরিচারিকার মুখ ও পরিধেয় বস্ত্র বার্ণিস দিয়া রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। পরিচারিকা রাজবাটীর এক স্থানে বার্ণিস লাগাইতেছিল রাজকুমারী দ্বয় ঘটনাক্রমে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার ছলে বার্ণিসের তুলিকা খণ্ড আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহার মুখ রঞ্জিত করিয়া দিলেন। অনতি বিলম্বে এই ঘটনার সংবাদ মহারাণীর কর্ণগোচর হইল, তিনি বালিকা দ্বয় সমভিব্যাহারে একেবারে দাসদাসীদিগের বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলের সমক্ষে সেই দাসীর নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বালিকা দ্বয়কে আদেশ করিলেন। রাজকুমারী দ্বয় অগত্যা মাতৃ আজ্ঞায় গুরুতর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে তাহারা আপনাদিগের মাসিক বৃত্তি হইতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই পরিচারিকাকে একটী অভিনব পোষাক কিনিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। যথা সময়ে

রাজকুমারী দ্বয় বাজারে যাইয়া এই পোষাক ক্রয় করিয়া আনিয়া পরিচারিকাকে দান করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ ক্লেশ হইল না কেবল এরূপ ভাবে দাসীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতেই বড়ক্লেশ হইয়াছিল।” রাজকীয় কার্য্য কলা-পাদির ব্যস্ততায় মহারাণী ইচ্ছাসত্বেও সর্ব্বদা স্বয়ং পুত্র কন্যাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিতেন না কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দ্বারা যাহাতে তাহারা সুশিক্ষিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন রাখিতেন, “এবং এই সকল কার্য্য বাহুল্য সত্বেও তিনি এতদর্থে যতদূর চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহাকে আমরা জননী সমাজের শীর্ষে স্থাপিত করিতে পারি। এদেশের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডের অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত ও সুসভ্য মাতৃসমাজেও ভিক্টোরিয়ার মত কর্ত্তব্য পরায়ণ বুদ্ধিমতী জননী অতিবিরল।”

মহারাণীর জীবনের অনেকগুলি ঘটনা আমরা বর্ণনা করিয়াছি, আর একটী ঘটনা বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব। তাঁহার ভারতবাসী প্রজাদের সকলেরই এটী জানা উচিত।

“সিপাহী বিদ্রোহকালে অসহায় ইংরাজগণের উপর সিপাহীদিগের অত্যাচারে ইংরাজসমাজ ভারতবাসীগণের উপরে একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। বিদ্রো-হের বেগ যত প্রশমিত হইতে লাগিল এই সকল প্রতিহিংসা প্রবল ইংরাজদি-গেরও রক্তপিপাসা তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেহ কেহ সমগ্র সিপাহী শ্রেণীকে সবংশে নিপাত করিবার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, কেহ বা অন্য প্রকারে ভীষণতর উপায়ে তাহাদিগকে তাহাদিগের দুষ্কর্ম্মের জন্য দণ্ডিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিচক্ষণবুদ্ধি লর্ড ক্যানিং এই সকল নৃশংস মতের পক্ষ-পাতী ছিলেন না। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার স্বদেশবাসীগণের এই সকল মনোভাব জ্ঞাপন করিলে মহারাণী তদুত্তরে লিখিলেন “ভারতবাসীদিগের প্রতি বিশেষতঃ দোষী নির্দ্দোষী শত্রু মিত্র এবং সৎ অসৎ নির্ব্বিশেষে সিপাহীগণের প্রতি ইংলণ্ডের জনসাধারণেও অখৃষ্টান ভাব প্রকাশ করিতেছে, দেখিয়া, সম্পূর্ণরূপে লর্ড ক্যানিংএর মত মহারাণীর প্রাণেও যে যাতনা এবং ক্রোধভাবের উদয় হইতেছে—ইহা তিনি সহজেই বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু সম্ভবতঃ এই ভাব অধিক দিবস স্থায়ী হইবে না। নিরপরাধী অবলা এবং কোমলমতি শিশুগণের উপর যে অকথ্য অত্যা-চার হইয়াছে তাহার বিবরণ শুনিয়াই লোকের মনে এই ভীষণ ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে। এই সকল ভীষণ নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠাতা গণের পক্ষে কোনও দণ্ডই অযথারূপ কঠোর হইতে পারে না; এবং এইরূপ কঠোর দণ্ডবিধান করিবার সময় প্রাণে ক্লেশ হইলেও সমুদয় দোষীব্যক্তিদিগকে ন্যায়ের কঠোরতম শাসনে শাসিত করিতে হইবে। কিন্তু জাতি সাধারণের প্রতি—দেশের শান্ত অধিবাসীগণের প্রতি—যে সকল সুহৃদ ভারতবাসী আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, ইংরাজ পলাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন

এবং আমাদিগের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন তাঁহাদিগের সকলের প্রতি যার পর নাই সদয় ব্যবহার করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে জানিতে দেওয়া উচিত যে তাম্র চর্ম্মের প্রতি আমাদের কোনও ঘৃণা নাই—বিন্দু মাত্রও নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সুখী সন্তুষ্ট এবং বৰ্দ্ধিষ্ণু দেখাই তাঁহাদের রাজ্ঞীর প্রাণের প্রবলতমা ইচ্ছা।"

"সিপাহী যুদ্ধের অবসানে পার্লামেণ্টের নিয়োগানুসারে ভারতে ইংরাজবণিক কোম্পানীর আয়ুঃশেষ হইয়া মহারাণী সাক্ষাৎভাবে ভারত শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে প্রচারিত তাঁহার ঘোষণা পত্র ভারত শাসনের সর্ব্ব প্রকার রাজ নৈতিক সংস্কারের ভিত্তি ভূমি হইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ডে মন্ত্রিগণই প্রায় সমুদয় রাজ কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন বলিয়া এই ঘোষণা পত্রও তাঁহাদেরই রচিত এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এই ঘোষণা পত্রের যে যে অংশ অদ্য ভারতবাসীর কর্ণে অমৃত সঞ্চার করে ইহার যে যে কথা গুলির উপর ভারত সন্তান তাহার ভবিষ্য রাজনৈতিক উন্নতির ও ভারত শাসন সংস্কারের প্রিয়তম আশা প্রতিষ্টিত করেন; তৎসমুদায়ই মহারাণীর বিশেষ ইচ্ছায় ও আদেশে তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী জামাতৃ দর্শনে প্রুসিয়া রাজ্যে গমন করেন তথায় এই ঘোষণা পত্রের পাণ্ডুলিপি তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু এইরূপ একটী গুরুতর বিষয়ে যেরূপ ভাবে যেরূপ ভাষায় এই ঘোষণা পত্র লিখিত হওয়া উচিত ছিল এই পাণ্ডুলিপি সেই রূপ ভাবে ও সেইরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া মহারাণীর বোধ হইল না। রাজকুমার এলবার্ট এ সম্বন্ধে দৈনন্দিন পুস্তকে লিখিলেন বর্ত্তমান আকারে কখনই এ ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইতে পারে না" এই ঘোষণা পত্র সম্বন্ধে মহারাণীর আপত্তি সমূহ অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়া লর্ড মাল্‌মবারীর নিকট হইতে নিম্ন লিখিত পত্রখানির সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী লর্ড ডার্ব্বীর নিকটে লণ্ডনে প্রেরিত হইল।"

"ভারতের ঘোষণা পত্রের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে মহারাণীর কি কি আপত্তি আছে তৎসমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লর্ড ডার্ব্বীকে জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। লর্ড ডার্ব্বী স্বয়ং তাঁহার সুমার্জ্জিত ভাষায় এই ঘোষণা পত্রখানি রচনা করিলে মহারাণী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন। দেশব্যাপী ভীষণ আত্মদ্রোহের অবসানে, সাক্ষাৎভাবে তাহাদের মাতৃভূমি শাসনভার গ্রহণ করিবার সময়, মহারাণীর রাজত্বের ভাবীকালে যে সমুদয় প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইবে সেই সকল প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়া কি নীতি অবলম্বনে তিনি রাজ্যশাসন করিবেন তাহা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য তাঁহার কোটী কোটী পূর্ব্বদেশীয় প্রজাবর্গের নিকট এই ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইতেছে, এই সকল কথা উজ্জ্বল রূপে স্মরণ রাখিয়া যেন এই পত্র খানি রচনা করা হয়। বিশেষতঃ এই ঘোষণা পত্র একজন রমণীর নামে প্রচারিত হইতেছে এই কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিয়া যাহাতে লিখিত হয় মহারাণীর এই বিশেষ

অনুরোধ। এই রূপ একটী ঘোষণা পত্রের প্রতি পংক্তির মধ্য দিয়া উদারতার এবং ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার ভাব বহির্গত হওয়া প্রার্থনীয় এবং এতদ্দ্বারা ভারত-বাসীগণ মহারাণীর ইংরাজ প্রজাবর্গের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সমান অধিকার ভোগ করিয়া সভ্যতার পদাঙ্কচারী সর্ব্ব প্রকারের সুখ সম্পদ লাভ করিবে, এই ঘোষণা পত্রে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ইহা তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।"

"পূর্ব্ব প্রেরিত পাণ্ডুলিপি মহারাণীর অভিলাষ অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে তাঁহার সমক্ষে পুনরুপস্থিত হইল। ইহাতে আর মহারাণী কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলেন না কেবল ইহার শেষ ভাগে "সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বর আমা-দিগকে এবং আমাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণকে আমাদের প্রজাবর্গের হিতার্থ এই সকল সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী বলবিধান করুন, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা" এই কথাগুলি মহারাণী স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন।"

"যেমন রাজকীয় জীবনে সেই রূপ ব্যক্তি গত জীবনেও ভিক্টোরিয়ার চরিত মাধুর্য্য চির বিকশিত রহিয়াছে। একজন ওয়েল্‌স রমণী সত্য সত্যই বলিয়াছেন "মহারাণী এক জন গুণবতী রমণী, রাণী হইয়া তাঁহার যেমন শোভা হইয়াছে দরিদ্রের পত্নী হইলেও তেমনই শোভা হইত।"

"ভিক্টোরিয়া রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও দরিদ্র কুটীরে স্বয়ং গমন করিতেন। তাহা-দিগের দুঃখে দুঃখী হইতেন, ব্যথিত প্রাণের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তিনি যেমন সর্ব্বদা দুঃখীর দুঃখদূর করিতে সর্ব্বদা যত্নশীলা কয়জন রাণী সেরূপ করিয়াছেন।"

পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন মহারাণীর এতগুণ আছে দোষ কি কিছুই নাই কখনও কি তিনি ঔচিত্য কর্ম্ম হইতে বিরত হয়েন নাই? জীবনী লেখকদের সাধারণ এক দোষ এই যে তাঁহারা ব্যক্তিগণের গুণরাশি অতিরঞ্জিত করেন এবং দোষগুলি একেবারে উল্লেখই করেন না। কিন্তু লেখক সেরূপ লোকের চক্ষে ধূলা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। সার রবার্টপীল, লেডী ফ্লোরা, প্রভৃতির সহিত মহারাণী যে ব্যবহার করিয়া-ছিলেন তাহা যে স্পষ্ট অন্যায় তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়ার জীবন হইতে উদ্ধৃত করিবার অনেক আছে কিন্তু স্থানাভাবে আমরা এই খানেই শেষ করিতে বাধ্য হইলাম। পাঠক, স্বয়ং জীবন চরিত খানি একবার পাঠ করিয়া দেখুন এই আমাদের অনুরোধ। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় না যে কোন জীবনী পড়িতেছি মনে হয় একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছি। ইহার স্থানে স্থানে ভাষা একটু অপরিষ্কার হইয়াছে, ইংরাজী চিঠি গুলির অনুবাদে এই দোষটি বিশেষরূপে দেখা যায়। তাহা ছাড়া বইখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। পুস্তকস্থ চিত্রগুলির মধ্যে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ছবিখানি ঠিক হয় নাই। মহারাণীর দুইখানি ছবিই ভাল হইয়াছে। অন্যান্য ছবি গুলিও সুস্পষ্ট হইয়াছে। জুবিলি উপহার বলিয়া পুস্তকখানি লাল চামড়ায় বাঁধান সোণার জলে নামাঙ্কিত। ছাপা বড় বড় ও পরিষ্কার। গ্রন্থকার পুস্তকের মূল্য ২ টাকা করিয়াছেন। এরূপ বাঁধাই হইলে ২ টাকার কমে দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু আমা-দের দেশে এত অধিক মূল্যের পুস্তক জনসাধারণে ক্রয় করিতে পারে না। কতকগুলির কাগজের মলাট দিয়া সুলভমূল্য করিলে ভাল হয়, এরূপ একখানি পুস্তক সকলেই যাহাতে পড়িতে পারে তাহার প্রতি লেখকের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

মহাভিক্ষা।

অনন্ত কালের স্রোতে
ভেসে যায় নিশি দিন—
চলে যায় আলো অন্ধকার,
না জানি নীরবে কোথা
গঠিছে অনাদি কাল
আলোক-আঁধার-পারাবার।
না জানি নীরবে টুটি
অনন্তে মিশিছে কোথা
কোটি কোটি জীবের বাসনা,
না জানি লভিছে কোথা
বিজনে বিশ্রাম-সুখ
পথশ্রান্ত প্রাণের যাতনা।
অনন্তে—অসীমে শুয়ে
গভীর বিজন মাঝে,
জগতের অশ্রুজল দিয়ে,
না জানি খেলিছে কোথা
স্বপনে নিদ্রিত কাল
রোদন-সমুদ্র বিরচিয়ে।
এ আমি—অসীম মাঝে
ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর অতি—
পবনের পরমাণু প্রায়,
না জানি কিসের তরে
প্রাণে মহাভিক্ষা ল'য়ে
ছুটিয়াছি জাগ্রতে নিদ্রায়।
পুঞ্জ পরমাণুময়
বিশাল বিশ্বের এই
প্রতি অণু—পরমাণু কাছে,
প্রতি দিন—প্রতিক্ষণ—
স্বপ্নময়—মোহময়—
কি ভিক্ষা আমার যেন আছে।

কে যেন গঠিছে নিত্য
তাহাদের সাথে মোর
সংযোগের অচ্ছেদ্য বন্ধন,
এ আত্মা চাহিছে তাই
আগ্রহে সে সকলের
প্রতি আত্মা করিতে চুম্বন।
অথবা কি আছে সেথা
জন্মান্তের অপহৃত
সুখ শান্তি—জীবনের মূল,
প্রতি আত্মা কাছে, তাই
সাধিয়ে হতেছে সারা—
কাঁদিয়ে হতেছে প্রাণাকুল।
কেবলি এমনি ক'রে
শুধু খুঁজে খুঁজে প্রাণ
অসীমে ভ্রমিয়ে ঘুরে ঘুরে,
কি-যেন চাহিতে গিয়ে
পড়িয়াছে এসে শেষ
কি-যেন হইতে বহু দূরে!
উপরে অনন্ত শূন্য—
নিম্নে নীল পারাবার
পূর্ণ করি অনন্তের কোল,
উচ্ছ্বাসে অনন্ত ঊর্ম্মি
উঠিছে পড়িছে শুধু
ছুটিতেছে দারুণ কল্লোল।
অবিশ্রান্ত নেত্রযুগ
তারি পানে চেয়ে চেয়ে
তাতেই হয়েছে যেন লীন,
উদ্‌ভ্রান্ত শ্রবণ যেন
তারি শব্দ শুনে শুনে
হয়েছে সে শব্দ-জ্ঞানহীন।

কাল স্রোতে ভেসে গেছে
স্পর্শ-অনুভব যেন
ঘাত প্রতিঘাতে হয়ে সারা,
অসীম—অনন্ত মাঝে
ক্ষুদ্র— ক্ষুদ্রতর আমি
আপনি হয়েছি আত্মহারা।
আসে না ভাসে না প্রাণে
যেন আর কোন কথা—
অসীমে হয়েছে কোথা লয়,
প্রাণে মাত্র জাগে আশ—
মহাভিক্ষা—মহাভিক্ষা
তাহাতেই হয়েছি তন্ময়।
অজ্ঞাতে উঠিছে রবি,
অজ্ঞাতে ফুটিছে আলো—
তমঃপুঞ্জ পড়িছে টুটিয়া,
প্রচ্ছন্ন প্রাণের মাঝে
প্রভাতে ফুলের প্রায়
নব ভিক্ষা উঠিছে ফুটিয়া।
আবার আঁধার রাশি
অনন্তের কোথা হ'তে
গ্রাসিছে আলোক-পারাবার,
ঘুমন্ত প্রাণের বুকে
অজ্ঞাত স্বপনে যেন
নব ভিক্ষা জাগিছে আবার।

এমনি এমনি ক'রে
আসে খেলে কত তারা
নিশি দিন বুকে বার মাস,
এমনি এমনি ক'রে
এ মহাভিক্ষার প্রাণে
গঠে যায় অনন্ত নিবাস।
অনন্ত পিয়াসে তাই
আমিও চলেছি যেন
অতৃপ্ত বাসনা বুকে ধ'রে,
তরঙ্গের দ্বারে দ্বারে
কোলে কোলে ছুটিতেছি
মহা ভিক্ষা— মহাভিক্ষা করে।
জানি না ত কত দিনে
মহান্ অনন্তে কোন্
এ ভিক্ষার হবে অবসান,
অথবা অমনি হ'য়ে
যুগ— যুগান্তর ধরি
পূর্ণ করি থাকিবেক প্রাণ।
যুগ—যুগান্তর ধরি
কি অনন্ত পিপাসায়
ব্যাপ্ত করি অনন্ত বিশাল,
অনন্ত রোদন বুকে
গ্রহে গ্রহে ছুটি ছুটি
ভ্রমিবে অনন্ত কোটি কাল!

শ্রী নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। *

---

* শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ভারতীর পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহেন। তাঁহার কবিতা অনেক দিন হইতে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। গত আষাঢ় মাসে "নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য" স্বাক্ষরিত যে কবিতাটি ভারতীতে প্রকাশিত হয়, তাহা আমরা ডাকে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত নবকৃষ্ণ বাবুর লেখা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে তাঁহার নিকট শুনিলাম যে উহা তাঁহার লিখিত বা প্রেরিত নহে। সেই হইতে এইরূপ স্থির হইয়াছে যে আমাদিগের পরিচিত নবকৃষ্ণ বাবু স্বয়ং আমাদের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া যে কবিতা দিবেন তাহাই তাঁহার নামে প্রকাশিত হইবে, আর—"নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য স্বাক্ষরিত যদি কোন কবিতা আমরা ডাকে পাই—এবং তাহা ভারতীতে প্রকাশ যোগ্য মনে করি, তবে লেখকের নামের নীচে এমন কোন একটা কথা থাকিবে, যাহাতে পাঠকগণ তাঁহাকে আমাদিগের পরিচিত "নবকৃষ্ণ বাবু" হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারেন।

ভারতী কার্য্যাধ্যক্ষ।

লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ।

বারাণসী অতিশয় প্রাচীনানগরী বলিয়া বহুকাল প্রচলিত প্রথানুসারে এখানে অনেকগুলি মেলা আসিয়া জুটিয়াছে। মেলাগুলির মূলে ধর্ম্মভাব থাকিলেও তাহার অধিকাংশ এক্ষণে ধর্ম্মোদ্দেশ্য-হীন হইয়া পড়িয়াছে। সামাজিক আমোদই এক্ষণে মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং বাণিজ্যাদির উৎকর্ষতা-সাধন তাহার গৌণ উদ্দেশ্য। প্রত্যেক মেলাতেই বাজার হাট অনেক বসিয়া থাকে। তালিকা অনুসারে যতদূর জানা-গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় বারাণসীতে নানাবিধ মেলার যেরূপ প্রাদুর্ভাব ভারতের আর কোন স্থলেই সেরূপ নাই। কমবেশ ৪০। ৫০টী প্রধান মেলা প্রায় প্রতি মাসেই বা পক্ষান্তে এখানে হইয়া থাকে। আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটীর ইতিবৃত্ত এইখানে প্রকাশ করিতেছি।

নবরাত্রি মেলার সমবেত স্থান দুর্গাকুণ্ড। চৈত্রমাসে এই মেলার সমবেত হইয়া থাকে। হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই প্রাতঃকাল হইতে স্নানাদি সমাপন করিয়া শুদ্ধ হইয়া দুর্গাকুণ্ডে গিয়া দেবীপ্রতিমা দর্শন করে। মেলার শেষ দুই দিন মহাসমারোহ হয়। দুর্গাকুণ্ডে এই সময়ে দেবীর সম্মুখে অনেক বলিদানাদি হইয়া থাকে। দর্শকেরা দুর্গাকুণ্ড দেখিয়া অন্নপূর্ণা, শঙ্কটা ও বাগেশ্বরীর মন্দিরে পূজা দিয়া থাকে।

গৌবর মেলা রাজমন্দির ঘাটে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাশীবাসীর সহিত ইহার সংশ্রব অতি অল্প। জয়পুর ও অন্যান্য স্থান হইতে, যে সকল "মাড়োয়ারি" বা "দেশওয়ালী" কাশীতে সমবেত হয় তাহারাই চৈত্রমাসের ৩রা তারিখে, সন্ধ্যার সময় নৌকা করিয়া নদী বক্ষে বেড়াইতে যায়। স্ত্রী পুরুষ সমোৎসাহে এই মেলায় যোগদান করে। নদীর উপর দিয়া এই সময়ে কয়েকটা দেব প্রতিমা মহা সমারোহের সহিত নৌকা করিয়া লইয়া যাওয়া হয় ও সকলেই নদীবক্ষে ইহার অনুসরণ করে।

রামনবমী মেলার সমবেত স্থান রামঘাট। চৈত্র মাসে এই মেলার সমবেত হয়। প্রাতঃ-কালে স্ত্রী পুরুষে গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিয়া ঘাট তীরে ভগবান রামচন্দ্রের মূর্ত্তি পূজা করে। ইহা শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব।

নরসিংহ-চতুর্দ্দশমেলার স্থান বড়গণেশ মহল্লা। ১৪ই বৈশাখ এই মেলার দিন। নরসিংহের মূর্ত্তির সম্মানার্থে এই মেলা হইয়া থাকে। লোকে এই সময়ে নরসিংহের পূজা করে ও সন্ধ্যার সময় গণেশমহল্লায় "হিরণ্যকশিপু বধ" অভিনয় দেখিতে যায়।

গঙ্গাতীরে গঙ্গা সপ্তমী মেলা হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাস এই মেলার সময়। গঙ্গা যে দিবস জহ্নুমুনির উরুদেশ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া জাহ্নবী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন সেইদিনের স্মরণার্থে এই মেলা হইয়া থাকে। দিবসে গঙ্গার পূজা ও রাত্রে বারোয়ারির মত প্রকাশ্যস্থলে নৃত্য গীতাদি ইহার প্রধান আমোদ।

দশহরা মেলাও গঙ্গাতীরের মেলা। এই গঙ্গাপূজা দিনে সকল সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ গঙ্গাস্নান ও দান ধ্যানাদি করে। এই দিনে অনেক বালিকা ছিন্নবস্ত্র নির্ম্মিত পুতুল জলে ভাসাইয়া দেয়। এই ঘটনার পর চারি মাস ধরিয়া তাহাদের বাল্য স্বভাব সুলভ ক্রীড়াদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

নির্জ্জলা একাদশীমেলা ১১ই জ্যৈষ্ঠের দিন গঙ্গাতীরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ইহাকে ভীম একাদশী বলে। উপবাস ও স্নান ইহার প্রধান কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে কাশীবাসীরা সমবেত হইয়া এই দিবসে বাজি রাখিয়া নদীতে সাঁতার দিত তাহাতে বিবাদাদি হইত বলিয়া এক্ষণে সে প্রথা রহিত হইয়াছে।

স্নানযাত্রা মেলা জগন্নাথের স্নান যাত্রা। অসিঘাট ইহার স্থান।

রথযাত্রা মেলা পণ্ডিত বেণীরামের বাগানে সম্পন্ন হয়।

চৌখা ঘাটে গুরুপূর্ণিমা মেলা। এই দিবসে সকলে গুরুর উপাসনা করিয়া থাকে।

বৃদ্ধকালের মন্দিরের নিকটে বৃদ্ধকাল মেলা। শ্রাবণ মাসের প্রত্যেক রবিবারে এই মেলা হয়। এই স্থানে অমৃতকুণ্ড নামে এক ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। জনপ্রবাদ এই ভগবান ধন্বন্তরি তাঁহার অমোঘ ঔষধের কিয়দংশ এই কুণ্ডে ফেলিয়া দিয়াছিলেন তাই ইহার জল খাইলে সকল প্রকার রোগ আরাম হয়।

দুর্গাকুণ্ড-মেলা দুর্গাকুণ্ডের নিকটে হইয়া থাকে। দুর্গার পূজাই এই মেলার মূল উদ্দেশ্য। অনেক দেশ জাত দ্রব্য এই মেলাস্থলে আমদানী হয়।

ফাতিমা মেলা ফাতিমার দরগায়। ইটি মুসলমানের মেলা। নাচ গান ইহার মূলমন্ত্র।

নাগপঞ্চমী মেলা নাগ কুঁয়াতে হয়। ইহা শ্রাবণ মাসে হইয়া থাকে। মনসার পূজা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বিকালে মেলাস্থলে নানাবিধ কুস্তি ও ক্রীড়া হয়।

কাজরী মেলার স্থান শঙ্কুধর ঘাট। মির্জাপুরের কোন রাজা এই মেলার স্থাপয়িতা। ইহা পূর্ব্বে কেবল স্ত্রীলোকের মেলা ছিল· আজ কাল পুরুষও মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরাই এই মেলার দিন উপবাস স্নান ও দেবদর্শন করে। স্নানের সময় "ঘুনারি" (নীচ জাতির বেশ্যা) কাজরা গান করে বলিয়া ইহার নাম "কাজরী" মেলা হইয়াছে।

ঢেলা-চৌথমেলা—বড়গণেশের মন্দিরের নিকটে হইয়া থাকে।

ভাদ্রমাসে এই মেলার সময়। সাধারণের বিশ্বাস এই দিনে চন্দ্র দেখিলে সম্বৎসরের মধ্যে কোন না কোন প্রকার কলঙ্ক দর্শকের উপর পড়িবে। পূর্ব্বে এই দিনে লোক ভাড়া করিয়া আনিয়া সকলে স্ব স্ব বাটীতে ঢিল নিক্ষেপ করাইত। চন্দ্র দর্শনের পাপ ইহাতে মোচন হইয়া যাইত। অনেক বদমায়েস্ এই সুযোগে বড় বড় পাথর ফেলিয়া গৃহস্থের অনিষ্ট করিত। পুলিশ এই প্রথা অনেকটা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই দিনে গঙ্গাস্নানের বড় ধুম।

অসিসঙ্গমের নিকট লেলোরিক কূপ আছে, এইখানেই লেলোরিক ছত্র মেলা। এই কূপে স্নান করিয়া সূর্য্যমুখ দর্শন ও তাঁহার পূজা করাই এই মেলার উদ্দেশ্য এই দিনেও ঘুনারিরা গান গাহিয়া থাকে।

বামন দ্বাদশী মেলা বরুণা সঙ্গম ঘাটে ও চিত্রকূটে সম্পন্ন হয়। বামন দেবের সম্মানার্থে এই মেলার অনুষ্ঠান। ভাদ্রমাসের একদিন প্রাতে হিন্দু স্ত্রীপুরুষে বরুণা সঙ্গমে গিয়া স্নানাদি করে। বিকালে পুরুষেরা চিত্রকূটে গিয়া "বামন ভিক্ষা" অভিনয় দেখিয়া থাকে।

অনন্তচতুর্দ্দশ মেলার স্থান রামনগর। ভাদ্র মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে এই মেলা হইয়া থাকে। এই দিনে রামনগরের রামলীলার প্রথম সূত্রপাত হয়।

রামনগর ও চিত্রকূট রামলীলা মেলার স্থান। ইহাতে বড় বড় লোকের সহানুভূতি আছে। স্বয়ং বারাণসীর মহারাজা ইহার পৃষ্ঠ-পোষক। কাশীতে ৭। ৮ দিন ধরিয়া এই উৎসব উপলক্ষে সমারোহ হয়। ইহাই বারাণসার সর্ব্বপ্রধান মেলা। রামের রাবণ বধ সাঙ্গ হইয়া গেলে তথাকার লোকে চৌখা ঘাটের এক একটু মৃত্তিকা অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া যায়। ইহা তাহারা স্বর্ণালঙ্কার সদৃশ মূল্যবান মনে করে।

ধন তিরাশমেলার স্থান চৌখম্বা ও মাঠেরি বাজার। কার্ত্তিকী কৃষ্ণপক্ষ এই মেলার সময়। ইহা দোকানদার ও বেনিয়াদের উৎসবের দিন। কুবেরের পূজা করাই এ মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের এখানকার "নূতন খাতার" দিনের মত তাহারা সেই দিন দোকানাদি ভাল করিয়া সাজায়, স্থানে স্থানে রাত্রে নাচ গানের মজলিস বসিয়া থাকে।

অরণাক চতুর্দ্দশ মেলা মীর ঘাটে হয়। হনুমানের জন্মদিবসের স্মরণার্থে এই মেলা হয়। এই দিবসে তাঁহার পূজার বড়ধূম। কার্ত্তিকীকৃষ্ণ পক্ষ ইহার নির্দ্ধারিত দিন।

দেওয়ালী মেলা—সমস্ত বারাণসী কালীপূজার রাত্রে আলোকিত করা হয়। দেওয়ালী আমাদের "দীপান্বিতা অমাবস্যা"। ইহার পরিচয় বাহুল্য।

যমদ্বিতীয়ার স্থান যম ঘাট। ইহা আমাদের "ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।"

বরণাপিয়ালামেলা চৌখাঘাট ও শিবপুরে হয়। ছোট লোকেরা এই দিন মদ ও ভাঙ্গ খাইয়া নৃত্য ও গীতাদিতে মত্ত থাকে।

রোটা ভুট্টা মেলার স্থান পিশাচ মোচন ঘাট। এই দিন পিশাচ মোচনের জন্য স্ত্রী পুরুষে এই ঘাটে স্নান করিয়া ঘাটের উপরেই "রুটী" ও "ভুট্টা" খাইয়া থাকে। যাহাদের এই মেলার প্রতি আস্থা আছে—তাহারা মেলার দিন প্রাণান্তে বাটীতে আহার করে না।

নগরপীর-দক্ষিণমেলা বড়িয়া তালাও ও চৌখা ঘাটে হইয়া থাকে। এই মেলার সময় অগ্রহায়ণ মাস। এই দিনে গীত বাদ্য করিতে করিতে সকলে নগর প্রদক্ষিণ

করিয়া চৌখা ঘাটে জমা হয়। পূর্ব্বে এই মেলা উপলক্ষে—রামলীলার ন্যায় কৃষ্ণ লীলার অভিনয় হইত। এক্ষণে সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

গণেশ চতুর্থী মেলা বড় গণেশের মন্দিরে হয়। এই দিবসে বিদ্যার্থীরা (সংস্কৃত) সিদ্ধিদাতা গণপতির মন্দিরে গিয়ে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া পূজাদি করেন।

বেদব্যাস মেলা রামনগরের রাজার কেল্লায় হয়। রাজার বাসভবনের সান্নিধ্যে দুর্গমধ্যে ব্যাসদেবের এক মন্দির আছে। মহামুনি বেদব্যাসদেবের স্মরণার্থে মাঘ মাসের প্রতি সোমবারে সকলে সেইখানে গিয়া বেদব্যাসের অর্চ্চনা করে। শেষের দিনে অতিশয় জনতা হয়। স্বয়ং কাশীপতি এই মেলার পৃষ্ঠ পোষক।

শিবরাত্রি মেলা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে হইয়া থাকে। ইহাতে খুব সমারোহ। ইহা আমাদের দেশের শিবরাত্রি।

হোলী মেলার দিন বারাণসীর সর্ব্বস্থলেই উৎসব। পশ্চিমাঞ্চলে হোলীর দিন লোকের রাস্তাচলা ভার হইয়া থাকে। অশ্লীলগাল দাঙ্গাহাঙ্গামার অভাব নাই, নগরের প্রকাশ্য স্থানে "মেড়া" পোড়ান হইয়া থাকে।

বুধমঙ্গল মেলা গঙ্গাবক্ষে হয়। পূর্ব্বে এই মেলা হোলির পরের মঙ্গলবারে আরম্ভ হইত। কিন্তু মহারাজ চেৎ সিংহ ইহার আর একটি দিন বাড়াইয়া দেন। সেই সময় হইতে ইহা মঙ্গল ও বুধ দুই দিবস করিয়া হইয়া আসিতেছে। জনশ্রুতি এই যে চেৎসিংহ কোন সময়ে বিশেষ উত্তেজিত হইয়া এক ব্রহ্মহত্যা করাতে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তোদ্দেশে একরাত্রি গঙ্গাবক্ষে বাস করেন।

এই মেলার দিন গঙ্গার উপরের শোভা অতিশয় চমৎকার। নগরের ধনী মধ্যবিত্ত সকলেই নদীবক্ষে—নৌকাকরিয়া নৃত্যগীতাদিতে মত্ত হইয়া বেড়াইতে থাকে। নদীবক্ষে অসংখ্য আলোক মালার প্রতিবিম্ব পড়িয়া বড়চমৎকার শোভার সৃষ্টি করে। মৃদুল বাদ্যঝঙ্কার, নৃত্যকীগণের ভূষণ সিঞ্জন, লোকদের উল্লাসধ্বনি ক্ষেপনীচালনের শব্দ একত্র মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব কোলাহল উত্থিত হয়।

দঙ্গল মেলা রামনগরের মন্দিরে হয়। বুধ মঙ্গল মেলা শেষ হইলেই বৃহস্পতিবারে এই মেলা আরম্ভ হয়। এই দিন নৃত্য গীত-মহোৎসবে জাহ্নবী বক্ষ আলোড়িত। লোকেরা এই দিবসে কাশীর এপার হইতে রামনগরে গিয়া আমোদ প্রমোদ করে।

কাশী-রাজবংশ। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই বারাণসীতে অনেক রাজা রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ। বর্ত্তমান রাজ বংশের পূর্ব্বে কোন রাজ বংশ কাশীতে রাজত্ব করিতেন—তাহাই স্থির করা যখন কঠিন বলিয়া বোধ হয় তখন প্রাচীন রাজবংশ সমূহের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করা নিতান্ত অসম্ভব। মহম্মদ ঘোরি যে সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন সেই সময়ে কাশী প্রদেশ, কান্যকুব্জ-রাজ জয়চন্দ্রের শাসনাধীনে ছিল। মোগল রাজত্বে ইহা বরাবর বাদসাহদিগের খাসে

ছিল ও আকবর নামা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃস্মরণীয় আকবার বাদসাহের সময়ে ইহা মঙ্গলরাও নামক একজন রাজপুত সর্দ্দারের শাসনাধীনে ছিল। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, স্বয়ং বাদসাহ এই মঙ্গলরাওকে বারাণসীর শ্রীবৃদ্ধি করণোদ্দেশে শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। মঙ্গলরাওএর সময়ে বারাণসীর যথেষ্ট শ্রী বৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজ্যে চোর ডাকাতের কোন ভয় ছিল না—সকলেই এই ধর্ম্ম পরায়ণ রাজপুতের শাসনাধীনে থাকিয়া সুখে কালযাপন করিয়াছিল। ইহার পর কিয়ৎকালের জন্য ইহার তত্ত্বাবধারণ ভার রাজা মানসিংহের হস্তে আইসে। জনশ্রুতি এই মানসিংহ কোন বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপন উদ্দেশে বারণসীর মধ্যে এক দিনে সহস্রাধিক শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহার পর হইতে, বাদসাহের নিযুক্ত অযোধ্যার নবাবেরা বারাণসী শাসন করিয়া আসিয়াছিলেন। আরঙ্গীব যে সময়ে বারাণসী লুণ্ঠন করেন সেই সময়ে সম্ভবতঃ ইহা অযোধ্যার সুবাদারের হাতে ছিল।

বর্ত্তমান রাজবংশ দিল্লীর পতন সময়েই বিশেষ প্রাদুর্ভাব লাভ করেন। ইহাঁরা ক্ষেতুমিশ্রের বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ক্ষেতুমিশ্র বারাণসীর প্রাচীন রাজা বনাবের গুরু ছিলেন। এই বংশের মধ্যে মন্দ্রাঞ্জন সিংহ জমীদারি কিনিয়া কিঞ্চিৎ অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন। ইহার চারি পুত্র। তন্মধ্যে মনসারামই বর্ত্তমান রাজবংশের স্থাপয়িতা। রস্তম আলি নামক এক সুবাদারের অধীনে মনসারাম প্রথমে সামান্য কর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ও শারীরিক ক্ষমতার প্রভাবে তিনি শীঘ্রই রস্তমের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। রস্তম নিজে সকল সময় সকল কাজ কর্ম্ম দেখিতেন না—মনসারামের উপরেই সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। "বলবন্ত নামা" নামক পুস্তকে লিখিত আছে—"মনসারামের ক্ষমতা, সরকারে এই সময়ে বড় বৃদ্ধি পাইল—তিনিই প্রকারান্তরে চারি সরকারের কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। রস্তম আলি নাম মাত্র সুবাদার রহিলেন। রস্তম আলি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে মনসারামের জন্য "রাজা বাহাদুর" উপাধি ও "সনন্দ" চাহিয়া পাঠাইলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল—কিন্তু মনসারাম নিজে তাহা না লইয়া স্বীয় পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিলেন। সে প্রার্থনাও মঞ্জুর হইল।" মনসারাম ১৭৯৩ অব্দে ইহলোক ত্যাগ করিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র বলবন্ত সিংহ সিংহাসনে বসিলেন। বলবন্ত নামে বলবন্ত কাজেও তাই—সুতরাং প্রথম হইতেই তিনি অযোধ্যার সুবাদারকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। রাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়া চুণার; বেনারস, গাজিপুর, ও জোয়ানপুর সরকার হস্তগত করিয়া, গঙ্গাতীরের সমস্ত দুর্গ গুলি দখল করিয়া তিনি যথেষ্ট বল সঞ্চয় করিলেন। তিনি নাম মাত্র অযোধ্যার সুবাদারের অধীন ছিলেন যে কয়েকটা টাকা সুবাদারকে খাজানা স্বরূপে প্রদান করিতেন তাহা ইচ্ছা করিলেই বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৭৬৩ অব্দে যখন বাদসাহ সাহ আলম, ও

নবাব সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গলা আক্রমণ করেণ সেই সময়ে বলবন্ত সিংহ, সুজার ও বাদ-সাহের পক্ষ হইয়া সৈন্য লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রথম হইতেই চতুর বলবন্ত সিংহ বাদসাহ ও নবাবের পক্ষে ছিলেন কিন্তু বক্‌সারের যুদ্ধের পর যখন ইংরাজগণ জয়ী হইলেন সুচতুর বলবন্ত তৎক্ষণাৎ ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইহার পর বৎসর এলাহাবাদে গিয়া কর্ণেল ক্লাইব নবাবের সহিত সন্ধির সূত্রানুসারে বলবন্তের অধীনস্থ সমস্ত বিষয় গুলি কোম্পানির অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন কিন্তু এই প্রস্তাব ডাইরেক্টরেরা অগ্রাহ্য করায় বলবন্ত সিংহ পুনরায় সুজার অধীন হইয়া পড়েন। সুজাউদ্দৌলা বলবন্তের উপর বড়ই চটিয়া গিয়াছিলেন—বিশে-ষতঃ বক্সারের ব্যাপার তাঁহার মনে জাগিতেছিল তিনি এক্ষণে তাঁহাকে চত্বরে পাইয়া জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুজা দুইবার ছল ও কৌশলাবলম্বনে (১৭৬৭ ও ৭৮ খৃঃ অব্দ) তাঁহার জমীদারি গুলি বাজেরাপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু ক্লাইবের বলবন্তের উপর সহানুভূতি থাকায় কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

১৭৭০ খৃঃ অব্দে বলবন্ত সিংহ গতাসু হন। তাঁহার ঔরসজাত একমাত্র কন্যা গোলাপকুমারী তাঁহার পরিত্যজ্য বিষয়ের এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী। গোলাপকুমারীর মহীপনারায়ণ নামে এক নাবালক পুত্র ছিল। কিন্তু বলবন্তের ঔরসজাত দাসী পুত্র, চেত্‌সিংহ ইংরাজের সহায়তায় ও স্বীয় বুদ্ধিবলে গদী অধিকার করিলেন। ইংরাজ ১৭৭৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, এক সনন্দ দ্বারা চেত্‌ সিংহকে পাকা করিয়া দিলেন—আমিনী, ফৌজদারী ও টাঁকশালের ক্ষমতা তাঁহার উপর দেওয়া হইল ও তিনি তৎ-পরিবর্ত্তে কোম্পানীকে ২৩ লক্ষ টাকা বার্ষিক খাজানা দিতে স্বীকার করিলেন। যখন এই বন্দোবস্ত হইল তখন বারাণসী প্রদেশ প্রভৃতি নূতন সন্ধির সত্ত্বানুসারে অযোধ্যার নবাবের হস্তান্তরিত হইয়া ইংরাজের দখলে আসিয়াছে।

চেৎ সিংহের সহিত ইংরাজের সখ্যতা ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া উঠিলেও ওয়ারেণ হেষ্টিং সের প্রকৃত দোষে শীঘ্রই তাহা ভঙ্গ হইয়া যায়। হেষ্টিংস যে সময়ে কলিকাতা কৌন্সিলে ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিস্ প্রভৃতির, প্রবল ক্ষমতায়, মন্ত্রৌষধি রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় যথেচ্ছা চালিত হইতে ছিলেন—সেই সময়ে ফ্রান্সিস প্রমুখ সভাগণ, জোজেফ্ কক্ নামক এক ইংরাজকে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কক্ সাহেবের সহিত চেৎ সিংহের বড় ঘনিষ্টতা হইতেছে দেখিয়া হেষ্টিংস চেৎ সিংহের উপর মর্ম্মান্তিক চটিলেন ও তাঁহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মন্সন সাহেব মরিয়া গেলে হেষ্টিংসের ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিল তিনি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বীয় প্রিয়পাত্র গ্রেহামকে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এই গ্রেহাম অতি নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি বেনা-রসে গিয়া চেৎ সিংহের সহিত যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে (১৭৭৮ অব্দে) ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হওয়াতে হেষ্টিংস

চেৎ সিংহকে লিখিয়া পাঠাইলেন "নির্দ্ধারিত রাজস্ব ছাড়া এবৎসর আপনাকে উপরি পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হইবে।" চেৎ সিংহ বেগতিক দেখিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ তাহা অর্পণ করিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ছাড়িবার পাত্র নহেন, পর বৎসর পুন-রায় সেইরূপ দাবি করা হইল, চেৎ সিংহ প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন কিন্তু গবর্ণর জেনারেল সৈন্য পাঠাইবার আদেশ করাতে তিনি ভীত হইয়া পুনরায় সেই দাবির টাকা অর্পণ করিলেন। পর বৎসরে এই দাবির সহিত আর একটী নূতন দাবি উপস্থিত হইল। বাঙ্গলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় চেৎ সিংহ সৈন্য দিয়া ইংরাজের সাহায্য করিয়াছিলেন এই সূত্র ধরিয়া তাঁহার নিকট হেষ্টিংস সাহেব দুই হাজার অশ্ব-রোহীর দাবি করিলেন চেৎ সিংহ এবার পারিয়া উঠিলেন না। তিনি দুই হাজারের পরিবর্ত্তে সার্দ্ধ দুই শত অশ্বারোহী দিতে স্বীকার করিলেন। হেষ্টিংস শুনিয়াছিলেন বলবন্ত সিংহের অনেক টাকা ছিল, চেৎ সিংহ তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন ও সেই টাকা লইয়া বিজয়গড় ও লতীফ্‌পুরে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি বিবাদের ছল খুঁজিতেছিলেন এক্ষণে সুসিদ্ধ-কাম হইলেন।

চেৎ সিংহ তাহার আদেশ মত কাজ করিলেন না দেখিয়া হেষ্টিংস সাহেব লতীফ্‌পুর ও বিজয়গড়ের ধনের লোভে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। এবার আর চেৎ সিংহ সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি যুক্তির সহিত বিনয় পূর্ণ বচনে প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র পাঠাইলেন; তাহাতে কোন ফল হইল না। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ অব্দে স্বয়ং বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন ও চেৎ সিংহের নামে "বিদ্রোহ-চেষ্টা," "আজ্ঞা হেলা" প্রভৃতি কয়েকটী গুরুতর অপবাদ সাজাইয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। হেষ্টিংসের মতে, রাজা যাহা উত্তর দিলেন তাহা ঔদ্ধত্য দোষে পরিপূর্ণ ও তাঁহার (হেষ্টিংসের) পত্রের প্রকৃত উত্তর নহে। তিনি রেসিডেণ্ট মার্কহাম সাহেবকে, একদল সৈন্য লইয়া, রাজাকে আটক করিতে হুকুম দিলেন। রাজা এই সময়ে গঙ্গার উপরে শিবলা ঘাটে অবস্থান করিতেছিলেন। মার্কহাম সসৈন্যে উপ-স্থিত হইলে চেৎ সিংহ কোন রূপে বাধা না দিয়া সহজে ধরা দিলেন ইহার পর আরও তিন দল সৈন্য রেসিডেণ্টের সাহায্যার্থে আসিল। তিনি আনন্দিত চিত্তে রাজার অবরোধ বার্ত্তা হেষ্টিংসকে জানাইতে গেলেন। গড়ের ভিতর অবরুদ্ধ রাজা ও কয়েক দল ইংরাজসৈন্য ও সেনাপতি রহিলেন। এদিকে মহাবিপ্লবের আয়োজন হইতে লাগিল, রাজার লোকেরা প্রভুর এই বিপদ দেখিয়া তাঁহার উদ্ধাবের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। ফিরিঙ্গীকে তাড়াইয়া দিয়া দুর্গ অধিকার করিতে তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিল। সামনগর হইতে দলে দলে সহস্র সিপাহী বোটে করিয়া গঙ্গাপার হইতে লাগিল—সংবাদ হেষ্টিংসের নিকট পৌঁছিলে তিনি বড় চিন্তিত হইলেন। সৈন্যগণ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল ইংরাজ-সৈন্য রাজ ভবনের চারিদিক ঘেরিয়া দাঁড়া-

ইয়া আছে। তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে গুলি চালাইতে লাগিল। সে গুলির মুখে অনেক ইংরাজ সৈন্য হত, আহত, হইতে লাগিল—চারিদিকে মহাকোলাহল উঠিল। রঘুদয়াল সিংহ নামক একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রাজাকে সংবাদ দিল—"মহারাজ আপনার লোক আসিয়া ফিরিঙ্গীকে ঘাল করিয়াছে। নদী বক্ষে নৌকা প্রস্তুত, পারে ঘোড়া প্রস্তুত, আপনি শীঘ্র জানালা দিয়া বোটের উপরে পড়িয়া পলায়ন করুন। ইংরাজ আবার নূতন ফৌজ পাঠাইতেছে—চেৎ সিং ধীরে ধীরে জানালার নিকট উপস্থিত হইলেন—জন্মের মত একবার চিরপ্রিয় রাজভবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—পরে জানালার গরাদে বহু মুল্য মণিখচিত উষ্ণীষ বস্ত্র বাঁধিয়া তাহা ধরিয়া নদীর কিনারার পড়িলেন ও একটী ক্ষুদ্র গেট দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নৌকা তাঁহাকে লইয়া চলিল। চেৎসিং নিরাপদে ইংরাজের কবল হইতে মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু একদিনেই সেই বিপুল রাজ্যেশ্বর পথের ভিখারী হইলেন। ভবিষ্যতে উদর পূরণের জন্য তাঁহাকে সিন্ধিয়ের অধীনে দৈনিকের কাজ করিতে হইয়াছিল এই স্থানেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। বহুকাল হইল চেৎ সিং মরিয়া গিয়াছেন কিন্তু তত্রাচ তিনি অমর। মহামতি এড্‌মণ্ড বর্ক তাঁহাকে যে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন যতদিন ইংরাজের রাজত্ব থাকিবে ততদিন কেহ তাহা লোপ করিতে পারিবে না।

সহসা বিপদ সংবাদ পাইয়া হেষ্টিংস প্রাণভয়ে মধুদাসের বাগান হইতে চুনারে পলাইলেন। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে ৩।৪ শত ইংরাজ নিহত হইল। হেষ্টিংস পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন সৈন্যেরা আসিয়া রাজপুরী লুঠ করিতে লাগিল। হেষ্টিংসের সঙ্গে তাঁহার প্রিয় দেওয়ান কান্ত বাবু বারাণসীতে আসিয়াছিলেন—যখন উন্মত্ত প্রায় ইংরাজ সৈন্য দ্রুতবেগে অন্তঃপুর অভিমুখে ধাবিত হইল তখন কান্ত বাবু অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু রাজরাণীদিগের উপর অত্যাচার আশঙ্কা করিলেন—হিন্দু রমণী যবনের দ্বারা পীড়িতা ও অবমানিতা হইবে হিন্দুর তীর্থ বারাণসীতেই এই বীভৎস কাণ্ডের সূচনা হইবে ইহা কান্ত বাবুর সহ্য হইল না। সৈন্যগণ যতক্ষণ বহির্ব্বাটীতে লুণ্ঠনাদি কার্য্যে ব্যস্ত ছিল—ততক্ষণ কান্ত বাবু কিছুই বলেন নাই, কিন্তু তাহাদিগকে, সজোরে সশস্ত্রে অন্তঃপুরের দিকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভীষণ ঝটিকা বহিল। তিনি হৃদয়ে শতগুণ বল পাইলেন। সদর্পে সরোষে তড়িদ্বেগে অন্তঃপুরের দ্বারস্থ হইয়া দুই হস্তে বাহির দিক হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া শিকল দিয়া সেই দ্বার মুখে দাঁড়াইয়া সৈন্যদিগকে বাধা দিতে লাগিলেন ও হেষ্টিংসের নিকট এই ভয়ানক সংবাদ পাঠাইলেন। কান্ত বাবুর অনুরোধে হেষ্টিংস সৈন্যদিগকে অন্যত্র যাইতে আজ্ঞা করিলেন। কান্ত বাবুও নিজ জীবনের সহিত অন্তঃপুরিকাগণের জীবন রক্ষা করিয়া প্রীত হইলেন। অন্তঃপুরে রাজ্ঞীরা বাঙ্গালীর এই মহত্ত্বের কথা স্থির কর্ণে শুনিলেন। কান্তবাবু পালকী করিয়া রাণীদের নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। রাজ্ঞীরা এই উপকারে কৃতজ্ঞ চিত্ত হইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য মণিময় অলঙ্কার দিয়া পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন। কান্ত বাবু প্রথমে অসম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু পীড়াপীড়িতে শেষে স্বীকার করিলেন। এতদ্ভিন্ন বারাণসীর রাণীদিগের নিকট হইতে তিনি লক্ষ্মীনারায়ণশীলা, একমুখরুদ্র, প্রভৃতি বিগ্রহ ও দক্ষিণাব্রত শঙ্খ ও আর দুই একটী শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। ইহা আজও কাশীমবাজারের রাজবাটীতে আছে। এই কান্ত বাবুই কাশিম বাজার রাজ বংশের সংস্থাপয়িতা।

চৈত্‌সিংহের বিদ্রোহ শান্তি করিয়া, হেষ্টিংস সাহেব বলবন্ত সিংহের দৌহিত্র মহীপ-নারায়ণকে গদী প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার হস্ত হইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারি ক্ষমতা কাড়িয়া লয়েন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ডন্‌কান সাহেব বারাণসীতে দশশালা বন্দোবস্ত প্রচার করেন। মহীপনারায়ণের পর উদিতনারায়ণ বারাণসীর রাজা হন। এই সময়ে ১৮২৮ অব্দের পাঁচ আইন বেনারসে প্রচলিত হয়। বারাণসীর রাজা স্বাধীন বলিয়া ইংরাজের নিকট কতকগুলি স্বত্বের দাবি করেন—কিন্তু ইংরাজের বিচারে তিনি সামান্য জমীদার বলিয়া পরিগণিত হন। উদিতনারায়ণের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ বারাণসীর রাজা হন। রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ বরাবরই ইংরাজের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। সিপাহী যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ১৮৭৭ অব্দে ইনি "মহারাজা বাহাদুর" ও জি, সি, এস্ আই উপাধি প্রাপ্ত হন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্মানার্থে ইনি তেরটী তোপ পাইয়া থাকেন। অপুত্রতা হেতু মহারাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ পোষ্যপুত্র লইয়াছেন ও এই পোষ্যপুত্রই এক্ষণে রাজার অতুল বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

বারাণসী বহুকাল হইতেই বিদ্যা চর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। যে কয়েক জন, মহামহোপাধ্যায় মনীষা সম্পন্ন পণ্ডিত ও জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থকার প্রাচীনকাল হইতে বারা-ণসীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন—আমরা বহু কষ্টে তাঁহাদের এক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছি পাঠকবর্গের গোচরার্থে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই তালিকার গ্রন্থকারগণের প্রাদুর্ভাবের সময়।

সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ।

গ্রন্থকারের নাম।	পুস্তকের নাম।	গ্রন্থকারের নাম।	পুস্তকের নাম।
নারায়ণ ভট্ট —	প্রয়োগরত্ন	রঘুবীর—	মুহূর্ত্ত সর্ব্বস্ব
শঙ্কু বা শঙ্কর ভট্ট— (নারায়ণের পুত্র)	দায়াদ নির্ণয়	বামাচার্য্য—	মুহূর্ত্ত—চিন্তামণি
কমলাকর—	নির্ণয়সিন্ধু	নীলকণ্ঠ—	নীলকণ্ঠী
লক্ষ্মীধর সূরি—	অদ্বৈত মকরন্দ		
ভট্টজি দীক্ষিত (লক্ষ্মীধরের পুত্র)	সিদ্ধান্তকৌমুদী মনোরমা শব্দকৌস্তভ মণি মেথলা		
নাগেশ ভট্ট—	শব্দেন্দু শেখর পরিভাষেন্দু শেখর মনাঙ্কুশ		

হিন্দী গ্রন্থকারগণ।

গ্রন্থকারের নাম।	পুস্তকের নাম।	গ্রন্থকারের নাম।	পুস্তকের নাম।	মন্তব্য।
কবীর—	শাখী রামায়ণ	মণিদেব (১৮৩৫)	মহাভারত	কবীর, মোগল সম্রাট সেকেন্দর লোদীর সমকালবর্ত্তী। ইনি "কবীর পন্থী" নামক বিখ্যাত সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা। তুলসীদাস সম্ভবতঃ ১৬২৩ খৃঃ অব্দে প্রাদুর্ভাব হন। তাঁহার রামায়ণ ও দোঁহা পশ্চিমাঞ্চলে ঘরে ঘরে গীত হয়। ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য শতকের" নিম্নে তুলসীদাসের "বৈরাগ্যময় দোঁহাগুলি" স্থান পাইবার উপযুক্ত।
তুলসীদাস—	রামায়ণ গীতাবলী বিনয় পত্রিকা দোঁহাবলী জানকী মঙ্গল	নারাদীনদয়াল (১৮০০)	অনুরাগবাগ অন্যোক্তিকলঙ্ক বৈরাগ্য দীনেশ দৃষ্টান্ত তরঙ্গিণী ইত্যাদি	
কবীন্দ্র সরস্বতী	কবীন্দ্র কল্পলতা (সাহজাহান বাদশাহের সমকালবর্ত্তী)	বিবি রতন কুমারী (রাজা শিবপ্রসাদের পিতামহী) (১৮৩০)	প্রেমরত্ন	
		বোপুদেব শাস্ত্রী (গবর্ণমেণ্ট কলেজের জ্যোতিষ অধ্যক্ষ)	বীজগণিত।	

প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ বারাণসীতে আজও অসংখ্য দৃষ্ট হয়। অতি প্রাচীনতম বৌদ্ধকীর্ত্তির মধ্যে "ষাঁড়নাথের" বৌদ্ধ আশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; ইহার নিম্নে—বকায়িয়া কুণ্ড, প্রাচীন রাজঘাট দুর্গ, বুদাঁও মহল্লার ক্ষুদ্র মস্‌জিদ, তিলেয়া লালালাট্‌ভৈরব," বত্রিশ কুম্ভ, আড়াই কঙ্গুরা মস্‌জিদ, কীর্ত্তি বিশ্বেশ্বরের মন্দির—আদি বিশ্বে-

শ্বরের মন্দির, আলমগিরি মস্‌জিদ্‌, সোনতালাওএর নিকট প্রস্তর স্তম্ভ, প্রভৃতিতে আজও হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে বেনারসের শাসনকার্য্য—একজন কমিশনারের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহাঁর অধীনে, একজন, সিবিল ও সেসন্স জজ আছেন। কমিসনার আবার গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট, ও বারাণসী রাজঘাটের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। ইহা ভিন্ন কয়েক জন কলেক্টার মাজিষ্ট্রেট, দুইজন জয়েণ্ট, কয়েকটী ডেপুটী ও সিবিল বিভাকে জনকয়েক মুন্‌সেফ দ্বারা বারাণসীর শাসনকার্য্য সম্পাদিত হয়।

বেনারসে বাণিজ্য কার্য্য নদীর দ্বারাই সুচারুরূপে চলিয়া থাকে। আজ কাল রেল হওয়াতে আরও সুবিধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গঙ্গা ও গোমতীর দ্বারা গোরখপুর হইতে নানাবিধ শস্য, ফরেক্কাবাদ হইতে গম অরহর ও অন্যন্য বাণিজ্য দ্রব্য ও বাঙ্গলার দিনাজপুর অঞ্চল হইতে চাউল, বারাণসীতে নিয়মিত রপ্তানী হয়। এতদ্ভিন্ন, অরৌনা হইতে ঘৃত মির্জ্জাপুর হইতে "ভূসা" ও চুণার হইতে প্রস্তরাদি আসিয়া থাকে। বারাণসীর জড়োয়ার কাজ ও অন্যান্য শিল্প প্রশংসনীয়। বাঙ্গালীর নিকট বারাণসীর সুবিখ্যাত শাটী অপরিচিত নহে।

কোন বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে আমরা কালবিলম্ব না করিয়া লক্ষ্ণৌ যাইবার জন্য সিক্‌রোলে চলিলাম। সিকরোল, বারাণসীর চৌরঙ্গীক্ষেত্র। এখানে অনেক সাহেবের বাস। এই সিক্‌রোলে অযোধ্যার নির্ব্বাসিত নবাব উজীর আলি কর্তৃক রেসিডেণ্ট চেরি সাহেব নিহত হন। লক্ষ্ণৌএর বিবরণে পাঠক চেরিহত্যার বিবরণ পাইবেন।

আমরা সন্ধ্যার ট্রেণে সিক্‌রোলের গাড়িতে উঠিলাম। সিক্‌রোল হইতে রেলওয়ের বন্দবস্ত আউড্‌ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেল কোম্পানির হাতে। এমন গাড়ির বেবন্দোবস্ত আমরা কোথায় দেখি নাই। সিক্‌রোল হইতে জোয়ানপুর পর্য্যন্ত আমাদের অন্ধকারে যাইতে হইয়াছিল। জোয়ানপুরে সর্ব্ব প্রথমে গাড়িতে আলো দেওয়া হয়। যাহা হউক আমরা রাত্রি তিন ঘটিকার সময় লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। লক্ষ্ণৌএ উপস্থিত হইয়া মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। ভগবান রামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র, কোশলরাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী হইয়াছি ভাবিয়া আমাদের প্রাণ পুলকে পুরিয়া উঠিল। আমরা ষ্টেসন ত্যাগ করিয়া একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া আমাদের আমিনাবাদের বাসার উদ্দেশে চলিলাম।

ক্রমশঃ।

প্লেটো।

গ্রীক জাতিতে যে সকল তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত আবির্ভূত হয়েন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্লেটো ও আরিষ্টোট্‌ল্ এই দুই জনের নামই সর্ব্ব প্রধান। উভয়েই পুরাতন কালের অন্যান্য পণ্ডিতদিগের ন্যায় সমধিক চিন্তাপ্রিয়। এক্ষণকার অধিকাংশ পণ্ডিতগণ যেমন কোন্ বস্তুর কি গুণ ইহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানগোচর করিতে ভালবাসেন, পুরাতন কালের পণ্ডিতগণের মধ্যে সেরূপ ভাব তত প্রবল ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এতদূর পর্য্যন্তও বলিয়া গিয়াছেন যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে; তাঁহাদিগের মতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ সমুদয় ইন্দ্রিয়-দ্বার বন্ধ করিয়া কেবল মনে মনে বস্তুগণের প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন আর তাহা হইলেই কেবল তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপ প্রণালী দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে সে জ্ঞান যে পদে পদে ভ্রমময় হওয়ারই কথা * তাহা আর এই উনবিংশ শতাব্দীতে কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না—তত্ত্ববিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ বস্তুগণের বাহ্যিক গুণ সমূহ অবগত হওয়া আবশ্যক, কারণ কোন বস্তু প্রকৃত পক্ষে কি ইহা নির্ণয় করিতে হইলে সেই বস্তুর গুণ সমূহ সবিশেষ অবগত হইয়া পরে ঐ সকল গুণের মূলে কি থাকিতে পারে এই কথা বিচার করিতে হয়। এক্ষণে যদি গুণ সমূহের জ্ঞান লাভ না করিয়া কেহ একেবারেই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে উৎসুক হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার 'হস্তী রজ্জুবৎ জ্ঞান জন্মিবারই নিতান্ত সম্ভাবনা, আর বাস্তবিকও পুরাতন কালে প্রায় সকল পণ্ডিতেরই আর বর্ত্তমান কালেও কোন কোন পণ্ডিতের ঐরূপ জ্ঞানই ছিল। ঘরের এক কোণে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া চিন্তা করা সহজ; আর দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সংগ্রহ করিয়া সূক্ষ্ম রূপ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ সকল পদার্থের গুণ সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করা কঠিন। † এই দুয়ের মধ্যে যে প্রথম প্রণালীই পুরাতন পণ্ডিতদিগের অধিক প্রিয় ছিল তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি। যাহা হউক, পাঠক যেন এমন মনে না করেন যে পুরা-

---

* অস্বীকার্য্য। যদি অতীন্দ্রিয় হইয়া জ্ঞানলাভ করা সম্ভবপর হয়, (আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজ যাহা প্রমাণ করিয়াছেন) তাহা হইলে এই প্রণালীর আয়ত্ত দ্বারাই বরঞ্চ সত্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়ারই সম্ভাবনা। সাধারণতঃ আমাদের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি নাই বলিয়া—এত ভূরি ভূরি প্রমাণ সত্ত্বেও ইহার প্রাধান্য অস্বীকার করা নিতান্তই অযৌক্তিক। ভাং সং।

† লেখক যাহা সহজ বলিতেছেন তাহাই কঠিন যাহা কঠিন বলিতেছেন তাহাই যে সহজ ইহা লেখক ছাড়া বোধ করি আর কেহই অস্বীকার করিবেন না।

ভাং সং।

তন কালে বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক কেহ ছিলেন না—থেলিস আর্কিমিডিসাদি পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানে পুরাতন কালের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। প্লেটো ও আরিষ্টোট্‌ল্ উভয়েই চিন্তাপ্রিয় একথা সত্য কিন্তু দুয়ের মধ্যে প্রভেদ ঐকান্তিক। প্লেটো অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়া অনেক প্রকার বিদ্যাভ্যাস করেন, আরিষ্টোট্‌ল্ কখনও তাঁহার মাতৃভূমির বাহিরে অধিক দূরে গমন করেন নাই; অথচ প্লেটো কেবল কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করিতেন আর আরিষ্টোট্‌ল্ অনেক পরিমাণে আধুনিক পণ্ডিতদিগের ন্যায় বস্তু সমূহ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া তবে তাহাদিগের সম্বন্ধে মত স্থির করিতেন। এতৎ সত্ত্বেও প্লেটোর রচিত গ্রন্থাবলীতে অনেকগুলি উচ্চ উচ্চ ভাব আছে বলিয়া ঐ সকল গ্রন্থ অনেকের নিকট সাতিশয় আদরের পাত্র হইয়াছে; জগতে এ পর্য্যন্ত কত লোকে প্লেটোর দর্শনশাস্ত্র দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছেন তাহার অনুশীলনে জীবন দান করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা হয় না। ফলতঃ কি ইয়োরোপ কি আসিয়া, কি পুরাতন কাল কি বর্ত্তমান কাল—কোন দেশে কোন কালে প্লেটোর অপেক্ষা উচ্চতর দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়। আমরা এস্থলে প্লেটোর জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিখিয়া পরে তাঁহার প্রধান প্রধান কয়েকটী মত বিবৃত করিব।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪২৮ কিম্বা ৪২৭ অব্দে প্লেটোর জন্ম হয়, কেহ কেহ বলেন তাঁহার জন্ম স্থান আথেন্‌স্ এবং অপর কেহ কেহ বলেন ঈজিনা। তাঁহার পিতার নাম আরিষ্টো; তাঁহার মাতা পেরিক্‌টিওনী বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত সোলনের আত্মীয় ড্রোপিডীসের প্রপৌত্রী ছিলেন। প্লেটোর নাম প্রথমতঃ (তাঁহার পিতামহের নামানুসারে) আরিষ্টক্লীস্ রাখা হয়—পরে তাঁহার এক শিক্ষক (আরিষ্ট) তাঁহাকে প্লেটো নাম প্রদান করেন এইরূপ এক প্রবাদ আছে। প্লেটোর দুই সহোদর ও এক সহোদরী জন্মে—জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম আডাইমাণ্টস্; অপর সহোদর গ্লাউকো তাঁহার অনুজ ছিলেন এবং তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠা পোটোনী নামে এক ভগিনী ছিলেন। ইহাঁর পুত্র স্পিউসিপ্পস প্লেটোর মৃত্যুর পর তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়ের নায়ক হয়েন। জীবনের আদিভাগে প্লেটো লিখন পঠন, ব্যায়াম ও সঙ্গীত এই কয় বিষয়ে বিখ্যাত কয়েকজন ব্যক্তির নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। আথেন্‌স্ নগরের নিয়মানুসারে তথাকার যুবকদিগের অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কাল হইতে সৈনিকের কার্য্য করিতে হইত; তৎকালে দেশ রক্ষার নিমিত্ত বেতন দিয়া এক বিশেষ শ্রেণীকে সৈনিক করিয়া লওয়া হইত না, দেশ রক্ষার্থে কিম্বা দেশের গৌরব রক্ষার্থে যখন প্রয়োজন হইত তখন দেশের অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে যাহারা বয়স কিম্বা ব্যাধি নিবন্ধন যুদ্ধ কার্য্যে অসমর্থ তাহারা ব্যতীত অপর সমুদয় পুরুষদিগকে আহ্বান করা হইত। কথিত আছে প্লেটো এইরূপে কয়েকটী যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন; খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩৯৪ অব্দে করিন্থে যে যুদ্ধ হয়, প্লেটো সম্ভবতঃ তাহাতেও যোগদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি সক্রেটিসের সহিত পরিচিত হয়েন এবং তখন হইতে তাঁহার জীবনে একটী নূতন যুগ আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি হিরাক্লিটস্ প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মত সমূহ ক্রাটীলস্ নামক ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন করেন—সক্রেটিসের নিকট আসিয়া তাঁহার নূতন আর এক প্রকার শিক্ষা হইল। যাঁহারা সক্রেটিসের বিষয় কিছুমাত্র অবগত আছেন তাঁহারাই জানেন যে এই মহাপুরুষ নীতি বিষয়ক প্রশ্ন সমূহ উত্থাপন করিয়া লোকের সহিত তর্ক করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে তিনি কেবল তর্কের নিমিত্তই তর্ক করিতেন; জনগণ যাহাতে তাহাদিগের অজ্ঞান তিমিরের আয়তন অবগত হইতে পারে, যাহাতে তাহারা তদ্দারা আর দৃষ্টিবিহীন না থাকিয়া জ্ঞানালোক হইতে দৃষ্টি শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে সক্রেটিস রৌদ্র বৃষ্টি শীত তাপ অগ্রাহ্য করিয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক বিষয় সমূহের আলোচনা করিতেন। এইরূপ আলোচনা তিনি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতেন, এবং প্রশ্নোত্তর উত্থাপন ও তাহাদিগের সদুত্তর প্রদান এই উভয় কার্য্যই তিনি নিয়মানুযায়ী রূপে করিতেন। যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিত তাহারা শৃঙ্খলার সহিত বিচার করিতে শিখিত। তাঁহার সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, নিঃস্বার্থতা ও স্বদেশানুরাগ দেখিয়া প্লেটো মুগ্ধ হইয়া যান, পরে যখন অতগুলি সদ্গুণের পুরস্কার স্বরূপ সক্রেটিসের অন্যায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল তখন প্লেটো সংসার অন্ধকারময় দেখেন এবং তখন তাঁহার জীবনের একটি তন্ত্র যেন হঠাৎ ছিঁড়িয়া যায়। সক্রেটিসের বিচারের সময় প্লেটো উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার জন্য যে কোন পরিমাণ জরিমানা সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন—কিন্তু হায়! সক্রেটিস তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুবর্গের এই সকল শুভাকাঙ্খা কার্য্যে পরিণত হইতে দিলেন না, তিনি অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। প্লেটো তাঁহার রচিত ফীডো নামক গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন যে অসুখ বশতঃ তিনি সক্রেটিসের সর্ব্বশেষদিনে তাহার মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। যাহা হউক প্রায় আট বৎসর কাল সক্রেটিসের সংসর্গে থাকিয়া প্লেটো যাহা শিখিলেন তাহা আর ভুলিলেন না; সত্যের প্রতি অনুরাগ, সত্যের অনুশীলনে জীবনের সর্ব্বসুখ জলাঞ্জলি প্রদান এই যে মহামন্ত্রে তিনি তাঁহার গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হয়েন, তাহা আর কখনো তাঁহার মনোমন্দিরের অন্তরায় হইল না। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রশান্তমূর্ত্তি প্লেটোর হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে নিহিত হইল। তখন হইতে প্লেটো কেবল সক্রেটিস সক্রেটিস করিতেন, তাঁহার রচিত সমুদয় গ্রন্থেই সক্রেটিসের নাম করিতেন এবং স্বীয় মত সমূহ সক্রেটিসের মুখে প্রকাশ করিতেন। প্লেটোর আত্মীয় ক্রিটিয়াস ও কার্মাইডীস উভয়েই সক্রেটিসের পরিচিত ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্লেটো প্রথমে সক্রেটিসের নিকট আনীত হয়েন। তাঁহার এই নূতন শিক্ষক প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে প্লেটো মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিতেন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তাঁহার সংসর্গে আসিবামাত্র তিনি অন্য

প্রকার (দর্শন) কবিতা অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্লেটো তাঁহার গুরুর অপর কয়েকটী ছাত্রের সহিত মেগারা নগরীতে ইউক্লিড (জ্যামিতি প্রণেতা ইউক্লিড নহে) নামক দার্শনিকের ভবনে গমন করেন; এখান হইতে তিনি মিসর, সাইরীনি ও সম্ভবতঃ আসিয়া মাইনর এই তিন দেশে ভ্রমণ করেন। এই দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে প্লেটো ইউক্লিডের নিকট হইতে ফিরিয়া একবার কিছু দিনের জন্য পুনরায় আথেন্সে আসিয়া সম্ভবতঃ ৩৯৪ অব্দে করিন্থের যুদ্ধে যোগ দান করিয়াছিলেন, তবে এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। সাইরীনি নগরে অবস্থান কালে প্লেটো থিওডোরস্ নামক অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের নিকট উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; এই থিওডোরসের সহিত তাঁহার আথেন্স নগরে সক্রেটিসের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে আলাপ হয়। কথিত আছে মিসর দেশের পুরোহিতদিগের নিকট অঙ্ক ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষাকরণাভিপ্রায়ে প্লেটো তথায় যাইয়া কিছুকাল বাস করেন। প্লেটোর এই দুই স্থলে ভ্রমণ ও আসিয়ামাইনরে ভ্রমণের কথা কতদূর সত্য তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে প্লেটোর গ্রন্থাবলীতে মিসর দেশের বিষয় যে সব উল্লেখ আছে তাহাতে উক্ত দেশে তিনি কিছুকাল বাস করিয়া আসিয়া ছিলেন এ কথা অত্যন্ত সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। আন্দাজ চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় প্লেটো ইটালী ও সিসিলী যাত্রা করেন—ইটালীতে তিনি পিথাগোরসের মতাবলম্বীদিগের দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং তাহাদিগের শিক্ষাপ্রণালী ও বৈজ্ঞানিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সমূহ সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করেন। সিসিলী দেশের রাজধানী সাইরাকিউস্ নগরীতে তিনি তথাকার অধিপতি ডাইওনীসিয়সের শ্যালক ডাইওকে স্বকীয় মতে আনয়ন করিতে সক্ষম হয়েন; ডাইওর বয়ঃক্রম তখন কেবল কুড়ি বৎসর মাত্র। যুবককে স্বমত গ্রহণ করাইতে প্লেটো সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু বয়স্ক ডাইওনীসিয়স তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বরং বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধের বন্দী করিলেন। ৩৮৭ অব্দে করিন্থের যুদ্ধ শেষ হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে প্লেটো ঈজাইনা নগরীতে বিক্রীত হয়েন, আনিসেরিস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার মূল্য দিয়া তাঁহাতে মুক্তি প্রদান করেন। প্লেটোর বন্ধুগণ যখন উক্ত মূল্য তাঁহাকে দিতে যান তখন তিনি গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় উহা দ্বারা আথেন্স নগরে একটী বাগানবাটী কেনা হয়—এবং এখানে আকাডেমী নাম দিয়া প্লেটো একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব আসিয়া তাঁহার সহিত দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিতেন, প্লেটোর অধ্যাপনা সাধারণতঃ কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে নিষ্পন্ন হইত, কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি বিশেষ বিশেষ প্রস্তাব লইয়া একাক্রমে উপদেশ বক্তৃতা প্রদানও করিতেন বলিয়া বোধ হয়। এত দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণের পর, জীবনের অর্দ্ধেকভাগ এত কষ্ট স্বীকার করিয়া প্লেটো এক্ষণে একটী বিদ্যালয়ের অধিনায়ক হইলেন—সত্যের প্রতি গাঢ় অনুরাগ থাকাতেই, মানবজাতির প্রতি

সাতিশয় মমতা থাকাতেই তিনি জগতের মহৎ উপকার করিবার উদ্দেশ্যে ওরূপ শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই তিনি রাজপুরুষের জীবন অবলম্বন না করিয়া পণ্ডিতের জীবনে ব্রতী হইলেন। আমরা এস্থলে এই কয়টী কথায় যাহা বলিয়াছি, ভাবিতে গেলে তাহার মধ্যে প্লেটোর কতদূর স্বার্থত্যাগ, কতদূর মাহাত্ম্য নিহিত রহিয়াছে। আমাদিগের দেশে আজিকালি সংবাদ পত্রের সম্পাদক হওয়া কিম্বা রাজনৈতিক বক্তৃতাকারক হওয়া যেমন সহজে প্রতিপত্তি করিবার প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—গ্রীসদেশে, বিশেষতঃ আথেন্স্ নগরে, পুরাতন কালে রাজপুরুষ হওয়াও সেইরূপ ছিল। যাহারা সমাজের আশু কোন প্রকার শুভফল উৎপন্ন করিতে চাহিত, কিম্বা যাহারা কেবল তাহাদিগের সময়ে প্রতিপত্তি করিতে চাহিত তাহারা রাজপুরুষ হইত; আর যাহাদিগের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার থাকিত, যাহারা সক্রেটিস প্লেটো আরিষ্টোটলের ন্যায় অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ঐ দুয়ের তথ্য অবগত হইতে অভিলাষী হইত তাহারা ইহজীবনের সুখ দুঃখ মান সম্ভ্রম তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনায় জীবন দান করিত। মহৎ ব্যক্তিরাই কেবল এইরূপ মহৎব্রত উদ্‌যাপনে সমর্থ হয়েন। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে আবার প্লেটোর জীবন বৃত্তান্তে ফিরিয়া আসি; আকাডেমী বিদ্যালয় সংস্থাপনের পরেও আবার প্লেটো দুইবার সিসিলী যাত্রা করেন। একবার ৩৬৭ অব্দে যখন ডাইওনীসিয়সের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র (ডাইওনীয়স্) রাজা হয়েন, তখন ডাইওর সাহায্যে এই যুবককে স্বকীয় মতাবলী অবলম্বন করাইবার উদ্দেশ্যে প্লেটো সাইরাকিউস্ গমন করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া আথেন্স্ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ডাইও এই সময় নির্ব্বাসিত হয়েন এবং ডাইওনীয়সের সহিত যাহাতে তাঁহার পুনরায় মৈত্রী হয় এই উদ্দেশে তিনি তৃতীয়বার সাইরাকিউস্ যাত্রা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, বরং তাঁহার জীবন নাশের সম্ভাবনা ঘটিল। কেবল মাত্র আর্কাইটাস্ নামক এক ব্যক্তির সাহায্যে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইলেন। ৩৬১ কিম্বা ৩৬০ পূর্ব্বাব্দে আথেন্সে ফিরিয়া আসিয়া প্লেটো এক্ষণে কেবল অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু ডাইও তাঁহার কতকগুলি শিষ্য ও বন্ধুর সাহায্যে (৩৫৮—৫৭ পূর্ব্বাব্দে) সিসিলী আক্রমণ করেন এবং ডাইওনীয়স্‌কে পরাজিত করেন। কিন্তু কালিপস্ নামক এক বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি ৩৫৩ অব্দে তাঁহাকে বধ করে। ডাইওনীয়স ৩৪৬ পূর্ব্বাব্দে পুনরায় সাইরাকিউসের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন; কিন্তু ইহার তিন বৎসর পরে তিনি টিমলিয়ন কর্ত্তৃক তথা হইতে অপসারিত হয়েন। প্লেটো ৩৬১ অব্দ হইতে ৩৪৭ অব্দ পর্য্যন্ত শাস্ত্রালোচনাতেই রত ছিলেন; এই শেষ অব্দে একাশীতি বয়ঃক্রমকালে তিনি মানবলীলা সমাপন করেন, তাঁহার পরলোক গমন কালে থিওফাইলস্ আথেন্স্ নগরের অধিপতি ছিলেন।

আমরা উপরে সংক্ষেপে প্লেটোর জীবনী লিখিয়াছি; এস্থলে বলা আবশ্যক যে ইবারবেগ রচিত দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস হইতে আমরা এই জীবনী গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে আবার ঐ পুস্তক হইতে প্লেটোর রচিত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া পরে তাঁহার প্রধান প্রধান কয়েকটী মতের অবতারণা করিব। সর্ব্বসমেত ছত্রিশখানি গ্রন্থ প্লেটোর নামে চলিত আছে; ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি গ্রন্থ অপর লোকে তাঁহার নাম দিয়া চলিত করিয়াছে, কিন্তু সে গুলি বাস্তবিক তাঁহার রচিত নহে এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। অতএব প্লেটোর গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে প্রথম গোলযোগ এই যে কোন্ গুলি তাঁহার স্বরচিত আর কোন্ গুলি অনুকরণ মাত্র। দ্বিতীয় গোলযোগ এই যে তিনি কোন্ সময়ে কোন্ গ্রন্থ লিখেন, আর তৃতীয় গোলযোগ এই যে তিনি কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এক পুস্তকের পর অপর পুস্তক রচনা করেন, কিম্বা যখন যেমন সুবিধা বা প্রয়োজন হইয়াছে তখন সেইরূপ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রশ্নের কেহ এ পর্য্যন্ত সদুত্তর প্রদান করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়। হাম্মান ও গ্রোট বলেন প্লেটো কোন বিশেষ প্রণালীতে পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই; অপর পক্ষে শ্লায়ারমাখের বলেন যে যেরূপ প্রণালীতে লিখিলে পাঠকগণ এক স্তর হইতে অপর স্তরে ক্রমান্বয়ে জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতে পারে প্লেটো সেইরূপ প্রণালীতেই পুস্তকগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন। মঙ্ক বলেন যে প্লেটো সক্রেটিস্‌কে কল্পনা চক্ষে দার্শনিক চূড়ামণি স্থির করিয়া লইয়া এই কাল্পনিক সক্রেটিস্ কিরূপে বয়ঃ-ক্রম-বৃদ্ধি সহকারে ক্রমান্বয়ে প্রকৃত জ্ঞানের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থসমূহের প্রণয়ন ক্রম-দ্বারা উক্ত জ্ঞানবৃদ্ধির ক্রম দেখাইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আপাতত আমাদের এই সকল আকাশকুসুম চিন্তা লইয়া শিরঃপীড়া জন্মাইবার প্রয়োজন নাই; প্লেটোর গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে যাহা নিশ্চয় জানা আছে তাহা এস্থলে বলা যাইতেছে। 'সাধারণতন্ত্র,' 'টিমীয়স্,' ও 'আইন' এই তিনখানি গ্রন্থ প্লেটোর রচিত তাহা তাঁহার ছাত্র আরিষ্টোট্‌ল্ বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন; ইহা ছাড়া 'ফীডো,' 'বাঙকোয়েট,' 'ফীড্রস্,' ও 'গার্জিয়াস্' এই চারিখানি পুস্তকের নামও আরিষ্টোট্‌ল্ উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেগুলি প্লেটোর রচিত তাহা তাঁহার কথার ভাবে বুঝিতে পারা যায়। 'মিনো,' 'হিপ্পিয়াস (মাইনর),' ও 'মিনিক্সিনস্' এই তিনখানি গ্রন্থের নাম আরিষ্টোট্‌ল্ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্লেটোর রচিত কি না স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। থিইটিটস্ ও ফিলিবস্ এই দুই গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করিয়া আরিষ্টোট্‌ল্ উহাদিগের হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ দুখানি প্লেটোর রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অপর পাঁচ কিম্বা সাতখানি গ্রন্থ হইতে (যাহা এক্ষণে প্লেটোর নামে চলিত) আরিষ্টোট্‌ল্ কতকগুলি স্থলের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল পুস্তকের নাম কিম্বা তদুপলক্ষে প্লেটোর নাম উল্লেখ করেন নাই। যাহা

হউক সর্ব্বসমেত উনিশ থানি পুস্তক আরিষ্টোট্‌লের বর্ত্তমান গ্রন্থ সমূহের বচন দৃষ্টান্তে প্লেটোর রচিত; ইহা ব্যতীত 'সফিষ্টস্‌' নামক আর একখানি পুস্তক আরিষ্টোট্‌ল্‌ কোন কোন স্থলে প্লেটোর কথিত উক্তির লিপি আবার কোন কোন স্থলে প্লেটোর শিষ্যদিগের মতাবলী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্লেটোর গ্রন্থাবলীর সম্বন্ধে কিছু অবগত হইতে হইলে আরিষ্টোট্‌লের কথার প্রতি এত মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে ইহার কারণ এই যে আরিষ্টোট্‌ল্‌ প্লেটোর শিষ্য ছিলেন। প্লেটোর গ্রন্থগুলি কোন্‌ কোন্‌ সময়ে লিখিত হয় তাহা সব ঠিক বলিবার যো নাই; কেবল ইহা এক রূপ স্থির হইয়াছে যে 'বাঙ্কোয়েট' নামক গ্রন্থ ৩৮৫ অব্দের কিছু পরে লিখিত হয়; এবং 'আইন' নামক গ্রন্থ 'সাধারণ তন্ত্রের পরে লিখিত হয়। এবং ইহা ছাড়া এরূপও সম্ভবপর যে প্লেটো আন্দাজ চল্লিশ বৎসর বয়সে যখন আকাডেমি বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, তখন হইতে তাঁহার গ্রন্থগুলি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ঈবারবেগের মতে 'আপলজি' নামক গ্রন্থ, যাহাতে প্লেটো সক্রেটিসের নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করেন তাহা সক্রেটিসের বিচারের পরে অবিলম্বে লিখিত হয়; আকাডেমি সংস্থাপনের পর 'প্রটাগোরাস' আদিভাগে, 'সাধারণ তন্ত্র' ও 'টিমীয়স্‌' মধ্যভাগে, এবং 'ফীডো,' ও 'আইন' শেষ ভাগে রচিত হয়। শেষোক্ত পুস্তকখানি প্লেটো সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই এইরূপ কথিত আছে। ইহা ছাড়া প্লেটোর গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সাধারণতঃ একটী কথা এই বলা যাইতে পারে যে সেগুলি কথোপকথন আকারে লিখিত হওয়ায় পাঠ করিতে আমোদ বোধ হয় এবং তাহাদিগের মধ্যে যে সকল উচ্চ উচ্চ উদার ভাব আছে সে সমুদয় মানব চিন্তার অপূর্ব্ব ফল বিশেষ, যে তাহা একবার আস্বাদন করিয়াছে সে আর তাহা জন্মে ভুলিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত অপর গুলির সুস্পষ্ট ইংরেজী অনুবাদ নাই, সুতরাং যাঁহারা কেবল ইংরেজী জানেন তাঁহারা প্লেটোর সমুদায় চিন্তার উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না।

আমরা এক্ষণে প্লেটোর প্রধান প্রধান মত গুলি পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইহা বলিয়া লওয়া আবশ্যক প্লেটো রচিত খান তিন চারিক পুস্তকে তিনি বাস্তবিক সক্রেটিসের জীবন ও চরিত্রের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন—ইহাতে যে সমুদয় মত প্রকাশিত আছে তাহার অধিকাংশ সক্রেটিসেরই হওয়ার সম্ভব। 'আপলজি' বা দোষ মোচন নামক পুস্তকে তিনি সক্রেটিসের নির্দ্দোষিতা দেখাইতে চেষ্টা করেন এবং 'ফীডো' নামক পুস্তকে সক্রেটিস্‌ শেষ দিনে কি রূপে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করেন আর কি কি কারণেই বা সক্রেটিস্‌ আত্মা অবিনশ্বর মনে করিতেন, এ সমুদায় লিখিত হইয়াছে। প্লেটোর অপর গ্রন্থগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ন্যায়শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, ও নীতিশাস্ত্র। আমরা এস্থলে প্রথমটী হইতে প্লেটোর প্রবর্ত্তিত একটী মত প্রথম আলোচনা করিব।

রাম বলিলে আমরা কোন ব্যক্তি বিশেষকে বুঝি; সেই রূপ কৃষ্ণ, হরি, চন্দ্র ইত্যাদি নামে আমরা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝি। এই সকল ব্যক্তি কিরূপ তাহা হয় আমরা নিজ চক্ষে দেখিয়াছি অথবা অন্য কাহারও মুখে তাহাদিগের বর্ণনা শুনিয়াছি—সুতরাং ঐ সকল নাম শ্রবণ করিলে আমাদিগের মনে ঐ সকল ব্যক্তির কথা উপস্থিত হয় এবং নামগুলি কাল্পনিক বস্তুর নাম নহে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এইরূপে আমরা যে কোন বিশেষ বস্তুর নাম শুনি তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের কোন সন্দেহ হয় না, কিম্বা সন্দেহ হইলেও সে বস্তু আছে কি না ইহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি। কিন্তু যখন আমরা মানুষ, ঘোটক, কুকুর ইত্যাদি জাতিবাচক শব্দের প্রয়োগ করি, তখন কি ঐ সকল নামের সহিত সম্বদ্ধ এক একটী বস্তু আছে—একথা বলিতে পারি। কথাটী স্পষ্ট করিয়া বলি; রাম বলিলে একটী বস্তু বুঝায়, সেইরূপ শ্যাম বলিলে একটী বস্তু বুঝায়, ইত্যাদি ইহারা সকলেই এক এক জন মনুষ্য; আমি যখন শুদ্ধ মানুষ এই কথাটী প্রয়োগ করি, তখন রাম শ্যাম যদু সব মানুষকেই লক্ষ্য করি, কিন্তু বিশেষ কাহাকে নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে বিশেষ নামের সহিত যেমন একটী বিশেষ বস্তু সম্বদ্ধ আছে, নামটী বলিলেই বস্তুটী বুঝায় এবং বস্তুটীর কথা বলিতে হইলে নামটী বলিতে হয়—সেইরূপ সাধারণ নামের বেলা ওরূপ কোন সাধারণ বস্তু আছে কি না। যেমন রাম শ্যাম যদু প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানুষ আছে সেইরূপ আবার কোন সাধারণ মানুষ আছে কি না। প্লেটো এই বিষয় লইয়া প্রথম আলোচনা করেন, এবং তিনি যে মতে উপনীত হয়েন তাহা সাধারণ লোকের নিকট অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন জগতে সার বস্তুগুলি সব সাধারণ বস্তু; আমরা চতুর্দ্দিকে যে সকল বিশেষ বস্তু দেখিতে পাই তাহা সেই সকল সাধারণ বস্তুর ছায়া মাত্র। আমরা একটী সুন্দর গোলাপ দেখিলাম, একটী সুন্দর গোবৎস দেখিলাম, একটী সুন্দর তাল-বৃক্ষ দেখিলাম— ইহারা সকলেই সুন্দর বটে, ইহারা প্রত্যেকে এক একটী সুন্দর বস্তু। কিন্তু ইহাদিগের সৌন্দর্য্য কোথা হইতে আসিল?—এক আদিম সৌন্দর্য্য হইতে। জগতে প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ সৌন্দর্য্য সেই এক আদিম সাধারণ সৌন্দর্য্যের ছায়া মাত্র। এইরূপে জগতে যত কিছু বিশেষ সৌন্দর্য্য কিম্বা বিশেষ মাধুর্য্য, কিম্বা বিশেষ সততা, কিম্বা বিশেষ লোহিততা, কিম্বা বিশেষ অন্য যাহা কিছু দেখিবে, তাহারা সমুদয় এক এক সাধারণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদির প্রতিমূর্ত্তি মাত্র। সার ধরিতে গেলে ঐ সকল সাধারণ বস্তুগুলি; বিশেষ বস্তু যাহা যাহা দেখ তাহা উহাদিগের ছায়ামাত্র, সে সব আজি আছে কালি নাই—তাহারা একরূপ অসার, অন্ততঃ তাহাদিগের যাহা কিছু সারবত্তা আছে তাহা তাহাদিগের স্বজাত নহে তাহা তাহাদিগের আদর্শ ঐ সকল সাধারণ গুণ হইতে উদ্ভূত। প্লেটো এইরূপে বলিয়া গিয়াছেন যে কোন বিশেষ নামের সহিত সম্বদ্ধ যেমন একটী বিশেষ বস্তু আছে, সেইরূপ কোন সাধারণ নামের সহিত সম্বদ্ধ

একটী সাধারণ বস্তু থাকিতে পারে—তবে তিনি এমন বলেন নাই যে প্রত্যেক সাধারণ নামের সহিত সম্বদ্ধ একটী সাধারণ বস্তু আছে। এক্ষণে দেখা যাউক তিনি এই সকল সাধারণ বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, কথন কথন তিনি এরূপ ভাবে তাহাদিগের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে তাহারা যেন এক একটী জাতির সাধারণ গুণের আধার মাত্র, আবার কথন কথন তিনি তাহাদিগকে গতিশীল জীবন্ত বস্তু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আদিতে কেবল মাত্র সততা এই সাধারণ বস্তু ছিল, তাহা হইতে অস্তিত্ব এই সাধারণ বস্তু এবং তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সাধারণ বস্তু সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পর ঐ সকল সাধারণ বস্তু হইতে অসংখ্য অসংখ্য বিশেষ বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে—দর্শন ঐ সকল সাধারণ বস্তুর জ্ঞান মাত্র। সাধারণ ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ বস্তু লইয়া ব্যস্ত থাকে, হাট বাজার কেনা বেচা এই তাহাদিগের ব্যবসায়; আর দার্শনিক সে সব তুচ্ছ করিয়া ঐ সকল সার আদিম বস্তুদিগের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। ইহ লোকে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আত্মা ঐ সকল বস্তুর সহিত পরিচিত ছিল, ঐ সকল বস্তুর কি প্রকৃতি তাহা জানিত; যখনই দেহের সহিত সংলগ্ন হইল, তখনই সে পূর্ব্বস্মৃতি হারাইল, তাহার দিব্য চক্ষে আবরণ পড়িল। সাধারণ লোকের এই আবরণ ইহজন্ম রহিয়া যায়, তাহারা কখনও পূর্ব্বস্মৃতি ইহজন্মে পুনরায় প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুই একজন ক্ষণ জন্মা ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েন, তাঁহাদিগের কি এক অমানুষিক ক্ষমতা গুণে তাঁহাদিগের দিব্যচক্ষু একবার দৃষ্টি হীন হইয়াও তাহা ইহা সংসারে পুনরায় দৃষ্টিলাভ করে। ইহাঁরাই প্রকৃত দার্শানক, ইহাঁরা পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের সুধা পান করেন। এইরূপ ধরণের অনেক উচ্চ অঙ্গের কবিতাময় বাক্য প্লেটোর রচনায় দৃষ্ট হয়; তিনি বলেন সাধারণ বস্তুদিগের প্রকৃতি অবগত হইতে হইলে আমাদিগের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত করিতে হয় এবং তাহা করিবার প্রধান উপায় ঐ সকল বস্তুর যে সকল উৎকৃষ্ট বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা। যেমন সাধারণ সৌন্দর্য্য কি তাহা অবগত হইতে হইলে বিশেষ বিশেষ যে সকল সুন্দরতম বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখা; পরে তাহাদিগের জ্ঞান হইতে সাধারণ বস্তুটীর জ্ঞানে উপনীত হওয়া। সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে প্লেটো এই কথা বলিয়া থাকেন আবার বর্ত্তমান বিজ্ঞানও এই কথা বলে; তবে অর্থের প্রভেদ আছে। প্লেটোর মতে সাধারণ বস্তুই সার, আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশেষ বস্তুই সার। প্লেটোর মতে বিশেষ বস্তু সাধারণ বস্তুর ছায়া মাত্র; বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মতে প্লেটোর 'সাধারণ বস্তু' বস্তু নহে, বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ গুণ মাত্র। প্লেটোর সাধারণ বস্তু-বিষয়ক মত সম্বন্ধে যে অনেক আপত্তি উঠিতে পারে তাহা তিনি নিজেই দেখিতে পান বলিয়া বোধ হয়; তাঁহার পরে অন্য লোকেও আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু আরিষ্টোটলের পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বে কেহ আপত্তি দেখাইয়া পরে নিজে অন্য একটী মত দিতে সমর্থ হয়েন

নাই। আরিষ্টোট্‌ল্ প্লেটোর মত সম্বন্ধে কি কি আপত্তি উত্থাপন করেন, এবং তিনি নিজেই বা কি মত প্রচার করেন তাহা পরে লেখা যাইবে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বন্দিনী।

অত্যাচারের দারুণ কঠোরতার হস্তে প্রতিমুহূর্ত্তে নিষ্পেশিত হইয়া জগতের একজন ভিখারিণী পরের দুয়ারে একমুষ্টি তণ্ডুলের জন্য দাঁড়াইয়া অশ্রুপাত করিতেছে—লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সন্তানের মঙ্গলের জন্য যুক্ত করে মঙ্গলনিদানের নিকট আপনার দুঃখ জানাইয়া অবসন্ন হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতেছে। উদারতার গভীরতম প্রদেশ শূন্য দেখিয়া মনুষ্যের মমতায় তাহার আর আস্থা নাই। সে বুঝিয়াছে, মনুষ্যের নিকট উপকার প্রত্যাশা করা নিতান্তই অধর্ম্মের ভোগ।

বন্দিনী সেই জন্য ভিখারিণীবেশে পরের দুয়ারে দাঁড়াইয়াও ভিক্ষা মাগিতে পারিতেছে না। নৈরাশ্যের আঁধারের মধ্য দিয়া তাহার নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে এক একবার আশার বিজলী হানিতেছে—কারাযন্ত্রণার সমস্ত কষ্টের উপর দিয়া যেন একটা বজ্রের কম্পন চলিয়া যাইতেছে। তৃষিত নয়নে সে দূর গৃহের পানে চাহিয়া দেখিতেছে—কুজ্‌ঝটিকা ভিন্ন কিছুই চক্ষে পড়ে না।

এখানে একটা ভাঙ্গাচোরা পড়িয়াছে—পুরাতন নূতনে অবিশ্রাম সংঘর্ষণে একটা মহা-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখানে নিদ্রা স্বপ্নে—স্বপ্ন আশায়—আশা উৎসাহে—উৎসাহ উদ্যমে পরিণত হইতেছে। ভবিষ্যতের নূতন পৃষ্ঠার প্রতিই সকলের দৃষ্টি।

অত্যাচার আপনার উনপঞ্চাশ অহঙ্কারের উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষুদ্র জীবনের বহু কষ্ট রচিত নীড়টুকুর পানে এমনি ভাবে ভ্রুকুটী করিতেছে যেন একটুকু সুবিধা পাইলেই সেই ক্ষুদ্র নীড়টুকু ভাঙ্গিয়া দেয়। ক্ষমতা, ধন, তাহার সাহায্যার্থে চারিদিক হইতে অযাচিত চাটুকারের মত ছুটিয়া আসিতেছে—যদি অত্যাচারের কৃপাবলে দেহ খানির আয়তন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়।

সাধুতার আবরণ দিয়া অত্যাচার স্বীয় অসদভিসন্ধি চাপিয়া রাখে। তাহার অধরোষ্ঠের উপরে একটা বিদ্রুপের রেখা—ঘৃণার ঔদাস্য। আপনার কিষ্কিন্ধ্যা-পর্য্যন্ত প্রসারিত লাঙ্গুলের জটিল কুণ্ডলীর মধ্যে সে জগতের সমস্ত নিরীহকে চাপিয়া মারিতে চায়।

বন্দিনী অত্যাচারের নিজ-কক্ষে অবরুদ্ধা, নিষ্ঠুর পাষাণের প্রতি কঠোর অবজ্ঞা

কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা। গৃহে বসিয়া শীর্ণদেহ-সন্তান ক্রমাগত অশ্রু মুছিতেছে। এ সংসারে দুর্ব্বলের অশ্রু ভিন্ন গতি নাই।

আজ বহুদিন পরে সন্তান মাতার উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে চায়—নির্ম্মমতার দুয়ারে অশ্রুবিসর্জ্জনে কোনও ফল নাই। কমলাসনা ভারতীর ছিন্নতন্ত্রী বীণায় তাই আজ পুনরায় আঘাত লাগিয়াছে—স্তব্ধ বীণা বহুদিনের নিস্তব্ধতা পরিত্যাগ করিয়া মৃদুল ঝঙ্কারে জগৎকে আপনার কাহিনী উপহার দিতেছে। জগতে সকলে জানুক সভ্যতার আবরণে অত্যাচার কিরূপে লুকাইয়া থাকে। জগৎ জাগিয়া উঠিলে—দিবালোকে মাতাকে নাগপাশে কে আবদ্ধ রাখিতে পারে? সন্তান স্বহস্তে সে নাগপাশ ছিন্ন করিয়া দিবে—আমাদের গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতী একাসনে বিরাজ করিবেন।

ভগবানের নাম লইয়া কোটীকণ্ঠে একবারে মাতার জয়গানে জগৎকে কাঁপাইয়া তোল—প্রাণ খুলিয়া এক হৃদয়ে একবার সকলে বল 'মা'। সংসারের হাহাকার ঘুচিয়া যাইবে—দুর্ভিক্ষ মারী নিমেষের মধ্যে কোথায় অন্তর্ধান করিবে কেহ জানিতেও পারিবে না।

জগতে যাহার জননী বন্দিনী তাহার শান্তি কোথা? পরের নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়া সহস্র সুখ লাভ ঘটিতে পারে কিন্তু তাহাতে অশান্তি বই শান্তি বৃদ্ধি হইবে না। ঐ দেখ জননী বন্দিনী হইয়াও ভিক্ষার দুয়ারে যাইতে সঙ্কুচিত। তিতিল বসনা দেবী কারাগারের অশেষ যন্ত্রণার মধ্যেও অনুগ্রহের দান লইতে চাহেন না—পুত্রের জন্য এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা মাগিতে গিয়াও পশ্চাৎপদ। আজ তাঁহার সন্তান কি ভিক্ষা-বৃত্তিকে জীবনের প্রতিষ্ঠাভূমি করিতে পারে?

পুরাতন স্বাধীনতার উপর নূতন স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা পুরাতন জাতীয়ত্বের উপর নূতন জাতীয়ত্বের ভিত্তি। আমাদের এক কালে স্বাধীনতা ছিল—এককালে মান সম্ভ্রম সকলই ছিল। এখন তাহা নাই। কিন্তু নাই বলিয়া যে তাহা আর হইবে না এমন নহে। বাঙ্গালী পুরাতন জাতি—কিন্তু পুরাতন হইয়াও আজ সে এক নূতন জাতি। নূতন আশা ভরসায়, নব উদ্যমে সে দিন দিন উন্নত হইতেছে। পুরাতনের প্রতিষ্ঠা ভূমির উপরে দৃঢ়পদ দাঁড়াইয়া সে স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে।

সম্মুখে চাহিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির দাসত্ব ছাড়িয়া আপনার কাজ আপনি না করিলে করিবে কে? পূর্ব্ব-গৌরবের পদানুসরণ করিয়া একদিন আমরা জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে পারি। প্রাচীনতার উপর খড়্গাহস্ত হইলে—অতীতের প্রতি নির্ম্মমের মত কলঙ্কিত দন্তপংক্তি বাহির করিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।

প্রেম চাই—যে কার্য্য সাধন করিতে হইবে তাহার প্রতি আন্তরিক টান চাই। বিদেশীয়ের দুয়ারে আমরা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছি—হৃদয়টুকুও কি বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

সত্যের দুয়ারে—ধর্ম্মের দুয়ারে—ন্যায়ের দুয়ারে হৃদয়ের সাধু ইচ্ছাকে উপহার দাও। জগতে চিরদিন পশুত্ব থাকিবে না। আজ এই যে এখানে সেখানে পশুত্বের উল্লাস শুনা যাইতেছে দুই দিন পরে ইহা কোথায় মিলাইয়া যাইবে। নিভ নিভ উল্কা শেষ মুহূর্ত্তে একবার জ্বলিয়া উঠে—নিভ নিভ পাপ শেষ মুহূর্ত্তে একবার প্রতাপ দেখাইয়া যায়।

হৃদয়কে প্রেম দিয়া বাঁধিয়া একবার ডাক 'মা'। সেই ধ্বনিতে মিলাইয়া গিয়া জগৎ একাকার হইয়া যাক্ আর্য্যাবর্ত্তের নূতন জাতির গৌরবে বিশ্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠুক্।

শ্রী র না ঠা।

বিদ্রোহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঝড়।

পার্ব্বত্য প্রদেশ। ঝড় উঠিয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহর সন্ধ্যার অন্ধকারে মগ্ন। সজোর বাতাসে, ঘনীভূত মেঘ রাশি পাহাড়ে পাহাড়ে ক্ষত বিক্ষত খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ছুটিতেছে, দিক-বিদিক-ব্যাপী বৃষ্টিধারা শত শত ক্ষুদ্র নীহারস্ফুলিঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া উড়িতেছে, পাহাড় গাত্রে তরুরাজি সজোরে হেলিয়া দুলিয়া, ছিন্নভিন্ন পত্রশাখ হইয়া নুইয়া নুইয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে শৈলমালা দুর্দ্দান্ত ঝড় দেবতার চরণে সভয়ে যেন প্রণিপাত করিতেছে। সেই বৃক্ষ পল্লব তরঙ্গায়িত পাহাড়ের আঁধার শৃঙ্গে বিদ্যুৎ চমকিয়া যাইতেছে, মেঘ প্রতি-ধ্বনিত হইয়া ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে।

নদীতে ভীম তুফাণ, স্রোতের বেগ দুর্দ্দম্য, নৌকা যায় যায় আর থাকে না। নৌকার মধ্যে যাত্রী চারি জন, একটি শিশু, দুই জন স্ত্রীলোক, পুরুষ এক জন। শিশু কাঁদিয়া কাঁদিয়া কিছু পূর্ব্বেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আর সকলে বিবর্ণমুখে ভয়াকুল দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভগবানের নাম জপিতেছিল।

ঝড় বাড়িতে লাগিল, মাঝিদের কোলাহল নিশ্চিৎ মৃত্যুর মত তাহাদের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, ঘুমন্ত শিশুকে এক রমণী অন্যের ক্রোড় হইতে সহসা তুলিয়া লইয়া আপনার বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল, এ বুক হইতে যেন আর মৃত্যু তাহাকে কাড়িতে পারিবে না! অন্যের মুখে তাহাতে চকিতের মত ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশিত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে এ বিরক্তি আবার পূর্ব্বের ঘন ঘোর আকুলতায় বিলীন হইয়া গেল,

রমণী কাতর দৃষ্টিতে শিশুর মুখ হইতে পুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া দুই হাতে তাঁহার বক্ষ বেষ্টন করিয়া ধরিল। তিন জনের অস্ফুট আকুলকণ্ঠের প্রার্থনা এক সঙ্গে সহসা ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

পুরুষটি রমণীর হস্ত বন্ধন ছাড়াইয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলন, না পারিয়া সেইখান হইতেই মাঝিদের অনুজ্ঞা দিতে লাগিলেন। সহসা ঝটিকার প্রাণ ভেদ করিয়া হৃদয় বিদারক রব উঠিল—"গেল গেল"। মাঝিরা চীৎকার করিয়া উঠিল "গেল গেল," মেঘ বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতে রাষ্ট্র হইল "গেল গেল," দিকবিদিকে ঘোষণা উঠিল—"গেল গেল।" পুরুষটি বলে রমণীর হাত ছাড়াইয়া বাহিরে আসিলেন, রমণী অচেতন হইয়া পড়িল, অন্যজন শিশু বক্ষে অর্দ্ধ অচেতন ভাবে উঠিয়া পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে চারিদিকে অন্ধকার, উপরে আকাশের অন্ধকার, আশে পাশে পাহাড়ের অন্ধকার, নীচে জলের অন্ধকার। এই অন্ধকারে বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, তুফাণের খেলা, তাহা হইতে আরো ভয়ানক, এই অন্ধকারে অন্ধকারের খেলা,—একটা উচ্চ অন্ধকার উন্মত্ত মহিষের মত শৃঙ্গ তুলিয়া এই অন্ধকারের মধ্য দিয়া হন হন করিয়া নৌকার কাছে সরিয়া আসিতেছিল, এ অন্ধকার আর কিছু নহে, একটি পাহাড় শৃঙ্গ। তাই মাঝিরা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, গেল গেল। স্রোতের টানে নৌকা তাহার উপর গিয়া পড়িতেছিল—এই পড়ে পড়ে—এই পড়িল! মাঝি দুই এক জন প্রাণভয়ে লাফাইয়া পড়িল. 'জোরে বাহ জোরে বাহ' বলিয়া পুরুষটি উন্মত্ত ভাবে নিজে একটি দাঁড় ধরিলেন—কিন্তু সে কতক্ষণ? দেখিতে দেখিতে পাহাড় ঢুঁ মারিল। নৌকা সবলে পাহাড়ের উপর পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

... ...

বিকাল বেলা, এখনো অল্প অল্প মেঘ করিয়া আছে, কিন্তু ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ আর নাই। নদী বক্ষ প্রশান্ত, আর্দ্র গাছ পালা নিস্তব্ধ, স্তব্ধ তরুশিখরে বসিয়া কাকের দল আর্দ্র পাখনা ঝাড়া দিয়া কা কা করিতেছে। গাছের ভিতরে ভিতরে এক একটা হনুমান লম্বা লম্বা লেজ ঝুলাইয়া গম্ভীর ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন রহস্য ধ্যানেই যেন তাহারা মহামগ্ন, কিন্তু অবশেষে নিতান্তই যখন ইহা ভেদ করিতে অক্ষম হইতেছে তখন অগত্যা উত্তর বংশের উপর ইহার আয়ত্তভার রাখিয়া দিয়া আকাশকে আপন আপন দন্তচ্ছটা দেখাইয়া বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিয়া বসিতেছে। এই সময় একজন পথিক নদীতীর দিয়া গমন করিতেছিলেন, সহসা পায়ের নিকট শৈলতলে শিশুবক্ষ, আহত, নির্জ্জীব রমণীকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া রমণীকে এখনো জীবিত বলিয়া মনে হইল, নদী হইতে জল তুলিয়া পথিক রমণীর আহত রক্তাক্ত মস্তকে, মুখে চক্ষে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, রমণী ঈষৎ নড়িয়া

উঠিল, পথিক তখন আশা পূর্ণ চিত্তে রমণীর হাতের বন্ধন হইতে আস্তে আস্তে শিশুকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, শিশু জীবিত কি না এইবার দেখিবেন। রমণী সহসা আরো বল পূর্ব্বক শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মেলিল, তাহার বিহ্বল বিবর্ণ দৃষ্টি পথিকের নয়নের উপর স্থাপিত হইল, পথিক সচকিতে শিশুকে ছাড়িয়া দিলেন। রমণী তখন অস্ফুট স্বরে বলিল "দেব, ক্ষত্রিয়ানীর শিশু ক্ষত্রিয়ানী ফিরাইয়া আনিয়াছে, এই লও এখন তোমার ধন তুমি লও"

বলিয়া দুই হাতে বক্ষ হইতে শিশুকে উঠাইয়া ধরিল। পথিক নির্জীব শিশুকে হাত পাতিয়া ধরিলেন, রমণী প্রাণ ত্যাগ করিল।—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্ধুতা।

গুহা ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য সময়ে ইদরে যে ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া যান এখন অষ্টম শতাব্দীর মধ্য সময়ে তাহা মিবারের অন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; শতাব্দী কাল হইল গুহার প্রপৌত্র আশাদিত্য আহর পর্য্যন্ত স্বাধিকারভুক্ত করিয়া এইখানে আশা পুর নামে রাজধানী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আহরের নাম হইতে গুহার বংশধরগণ এখন আহরিয় নামে খ্যাত। আশাপুরই এতদিন গুহলুট আহরিয়-দিগের প্রধান বাসস্থান ছিল, মৃগয়া-উপলক্ষে কখনো কখনো তাঁহারা ইদরে আসিয়া বাস করিতেন, মাত্র। কিন্তু আশাদিত্যের পৌত্র নাগাদিত্য রাজা হইয়া অবধি ইদর আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। ইদরই এখন রাজনিবাস। কিন্তু 'মিবাররাজে' আমরা যে ইদর দেখিয়া আসিয়াছি—এখনকার ইদর আর সে ইদর নহে। ইদরের মন্দিরপুর গ্রাম এখন আর গ্রাম নাই, এখন তাহা রাজপুরী। গুহা এই পার্ব্বত্য প্রদেশে রাজা হইয়া মন্দিরপুরের চারিদিক লইয়া রাজধানীতে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, দুর্গপ্রসাদ মন্দিরাদিতে ইহার এখন স্বতন্ত্র শ্রী। একলিঙ্গদেবের সেই পুরাতন কুটীর মন্দির, যাহা হইতে মন্দিরপুর নামের সৃষ্টি, তাহা এখন উচ্চ স্বর্ণচূড়া-যুক্ত নূতন বেশে রাজপ্রাসাদের উদ্যান মধ্যে বিরাজিত। মন্দিরপুরের সুহারমতী নদী—যাহা দুরন্ত দরিদ্র বালক গুহা ও তাহার সহচরগণের প্রচণ্ড সন্তরণে প্রতিদিন মন্থিত আলোড়িত হইয়া, মন্দির নিম্নের তরুলতা-তৃণ শষ্পময় আঁকাবাঁকা পাষাণ ভূমির মধ্য দিয়া, তীরে দণ্ডায়মান বালিকা সত্যবতীর ভয় চকিত দৃষ্টির সম্মুখে বহিয়া যাইত, তাহা এখন মন্দির সংলগ্ন সুরম্য পাষাণ সোপানাবলী নির্ম্মিত ঘাটে সুসজ্জিত হইয়া রাজপুরুষদিগের স্নানের জন্য নিয়োজিত।

আজ মাঘের ভানু সপ্তমী, ঊষাকালেই মহারাজ নাগাদিত্য সহচরবর্গের সহিত এই ঘাটে সূর্য্য পূজা করিতে আসিয়াছেন। নাগাদিত্যের আর এক নাম গ্রহাদিত্য। কুগ্রহের

দৃষ্টিতে নাগাদিত্যের জন্ম, জন্মের অল্প দিন পরেই নাগাদিত্য পিতৃমাতৃহীন (মাতা, পিতার সহিত সহমরণ গমন করেন)—তাই নাগাদিত্যের কনিষ্ঠ-তাত বুধাদিত্য ইহাঁর আর একটি নাম রাখিয়াছিলেন গ্রহাদিত্য।

যেখানে যে বিষয়ের অভাব অনুভব করা যায়, সেইখানে তাহার ভানেতেও একটি পরিতৃপ্তি। যে ধনী তাহাকে ধনী বল তাহার তাহাতে আনন্দ নাই। কিন্তু যিনি ধনী নহেন ধনী নামে সম্ভাষিত হইতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ। এক জন ইংরাজ যদি দৈবাৎ দু চার ছত্র সংস্কৃত শিখিয়া থাকেন ত তাহা লইয়াই তাঁহার বিশেষ আড়ম্বর। এমন কি ইংরাজি ভাষাতে তিনি মূর্খ কেহ এরূপ বলিলেও তিনি সহিতে পারেন কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় দৈবাৎ কেহ একটা ভুল দেখাইয়া দিলে তিনি রাগে ফুলিয়া উঠেন এবং তাঁহার সেই চারি ছত্র সংস্কৃত বিদ্যা দিয়া বড় বড় সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের ভুল ধরিয়া তাহার উপর অসঙ্কোচে অনর্গল লেখনী ও বক্তৃতা চালাইতে থাকেন।

ইংরাজি সম্বন্ধে বাঙ্গালীদিগেরও খানিকটা এইরূপ গতিক। তাঁহারা দুই চারজন একত্র হইয়াছেন কি ইংরাজি বোল চাল উচ্চারণ লইয়া বিষম তর্ক উঠিয়াছে এবং প্রত্যেকেই আপনাকে ওয়েবষ্টার হইতেও অধিক অকাট্য বলিয়া অনুভব করিতেছেন। দেশের ভাষার জন্য যদি তাঁহারা ইহার অর্দ্ধেকও অভাব অনুভব করিয়া ইহাতে মান্য লাভের প্রয়াস পাইতেন ত বাঙ্গালী এতদিন আর এক জাতি হইয়া দাঁড়াইত। যাক্।

নাগাদিত্যের উক্ত নামে গ্রহগণ কতদূর ভীত হইয়াছিল জানি না, তবে এই নাম রাখিয়া অবধি কাকা মহাশয় অনেকটা মনের সন্তোষে ছিলেন। বিশেষ মিবারের আদি রাজ গুহার গ্রহাদিত্য নাম ছিল, তিনি ছেলেবেলা কত বিপদে পড়িয়াও পরে রাজ্যেশ্বর হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। সেই নাম ধারণ করিলে নাগাদিত্যও যে তাঁহার ভাগ্য লাভ করিবেন কাকা মহাশয়ের এই ধারণা ছিল। ইচ্ছা হইতেই কিনা অনেক সময় মানুষের ধারণা আকার প্রাপ্ত হয়।

নাগাদিত্য যাঁহার নাম লইয়াছেন দেখিতে তাঁহার মত গৌরবর্ণ সুদীর্ঘ বলিষ্ঠদেহ নহেন। তবে উভয়ের মধ্যে বংশ সাদৃশ্য কিছু যে নাই তাহা নহে। ষোড়শ বর্ষীয় যুবক নাগাদিত্য উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, কমনীয় কান্তি, সুকুমার, ঈষৎ-উন্নত দেহ, উন্নত নাসিকা, আয়তলোচন-সুশ্রী মুখ। কিন্তু সভাসদগণ যখন গুহার ছবির সহিত তাঁহাকে মিলাইতে বসেন—তখন এক চুলও তাঁহার সহিত তফাৎ দেখিতে পান না, সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা নীরব—স্তম্ভিত আত্মহারা হইয়া মুহুর্মুহু 'আহা' করিতে থাকেন। আসল কথা কেবল নামে নহে, সকল বিষয়ে দ্বিতীয় গ্রহাদিত্য হওয়া নাগাদিত্যের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। নাগাদিত্য এ কথাটা কাহাকে মুখ ফুটিয়া বলিয়াছেন তাহা নহে, তবে সভাসদেরা কেমন করিয়া ইহা আঁচিয়া লইয়াছে। অট্টালিকা উপবন-শোভিত, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ ভূষিত আশাপুর উপত্যকা সহর অপেক্ষা অরণ্য পর্ব্বত শোভিত ইদরের ভীল ভূমি তাঁহার

অধিক ভাল লাগে।—অস্ত্র বিদ্যায় গুহার মত যে নাগাদিত্য সুদক্ষ তাহা নহেন তবে নৃত্যগীত প্রভৃতি রাজকীয় আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা শীকার অস্ত্র খেলা প্রভৃতি লইয়াই তিনি অধিক সময় থাকেন, এবং সভাসদদিগের সম্ভাষণে তাঁহার মত শীকার দক্ষ ব্যক্তি আর তাঁহাদের বংশে জন্মে নাই।

এখন বেলা প্রায় এক প্রহর। সূর্য্য পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, বন্দনা গান নীরব হইয়া পড়িয়াছে, শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল থামিয়া গিয়াছে। মন্দিরের রসানচৌকির ললিত রাগিণী তান এখনও কেবল মৃদু মধুর সৌরভের মত অলক্ষ্য ভাবে চারিদিক সুবাসিত করিতেছে। স্নান পূজা শেষ করিয়া মহারাজ সসভাসদ ঘাটের উপরে, বিচিত্র কারুকার্য্য ভূষিত মন্দির দালানে গালিচার উপর আসিয়া বসিয়াছেন; অনুচর সৈন্য সামন্ত উদ্যানে, ঘাটে, সোপানে, যেখানে সেখানে সারবন্দী দণ্ডায়মান। পরশু বসন্ত পঞ্চমী গিয়াছে, রাজা হইতে সামান্য সৈনিকটির পর্য্যন্ত পরিধানে আগাগোড়া বসন্ত রং, বাতাসে শত শত দণ্ডায়মান সৈনিকের বসন্ত চাদর ও বসন্ত পাগড়ির আঁচল দুলিয়া দুলিয়া প্রভাত সূর্য্যকিরণে বসন্তের তরঙ্গ তুলিয়াছে। চারিদিকের এই নবীন বসন্ত দৃশ্যের মধ্যে, বাগানের গাছে গাছে, রাজবাটী ও মন্দিরের স্তম্ভে প্রাচীরে—পরশুকার বসন্ত উৎসবের শুকনো ফুলের মালা। নূতন প্রেমের মাঝখানে পুরাতন ভগ্ন প্রেমের স্মৃতির মত চারি দিকের নবীনত্ব ইহাতে ঈষৎ ম্লানাভ করিয়াও সতেজ করিয়া রাখিয়াছে।

রাজার আশে পাশে সভাসদগণ, পশ্চাতে সুসজ্জ আলবোলাধারী স্বর্ণ-আলবোলা ধরিয়া দণ্ডায়মান, সম্মুখে কুশাসনোপরি আচার্য্য পাঁজি হস্তে উপবিষ্ট। ফাল্গুন মাস আগত প্রায়, ফাল্গুনের প্রথমেই আহরিয়-উৎসব, (শীকার উৎসব,) আচার্য্য এই দিনের শাকারের একটি শুভ মুহূর্ত্ত নির্ণয় করিয়া দিবেন, সেই মুহূর্ত্তে শীকার সিদ্ধ হইলে সম্বৎসর শুভ কাটিবে, সকলে উৎসুক নেত্রে আচার্য্যের মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন। আচার্য্য পুঁথি হইতে মুখ উঠাইতে না উঠাইতে রাজা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ঠাকুর—কি দেখিলেন?—"

গণপতি ঠাকুর আপাততঃ এই মন্দিরের পুরোহিত। প্রধান পুরোহিত কয়েক বৎসর তীর্থ করিতে গিয়াছেন, এখনো ফেরেন নাই। ইহাঁর বয়স অল্প—বিশ বৎসরের অধিক হইবে না, পুরোহিতের গাম্ভীর্য্য দৃঢ়তা ইহাঁতে কিছুই নাই, মাথার জটাবদ্ধ কেশ, শরীরের বিভূতি, গলার পদ্মবীজ মালা, এই তরলমতি বালকে অশোভন হইয়াছে। পৌরহিত্যের এই মুখোষের মধ্য হইতে গণপতির মুখে চোখে হাব ভাবে একটা ক্ষুদ্র মোসাহিবি ধরণ উঁকি মারিতেছে; সভাসদগণও পুরোহিত অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অনেকটা বিদূষকের মতই ব্যবহার করেন, ঠাকুরকে লইয়া অহরহ তাঁহাদের ঠাট্টা তামাসা চলে, ঠাকুরও তাহাতে সন্তুষ্ট ছাড়া অসন্তুষ্ট নহেন, তিনিও সুযোগ পাইলে তাহাদের তামাসা তাহাদেরি ফিরাইয়া দিয়া থাকেন।

রাজার জিজ্ঞাসায় হাসিবার যে বড় কিছু ছিল তাহা নহে—তবু ঠাকুর হাসিলেন,—বলিলেন "বেলা দ্বিতীয় প্রহর, দুই যাম, তিন দণ্ড, চারি পল, শুভ লগ্ন, শুভ মুহূর্ত্ত, শুভ সিদ্ধি, ইহার কোন মার নাই, মুনি বচন।"

নাগাদিত্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "সে প্রায় তৃতীয় প্রহর! ভোর হইতে অতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে? সেত বিষম ব্যাপার। ইহার আগে একটা মুহূর্ত্ত নাই?"

ঠাকুর বলিলেন—"থাকিবে না কেন? প্রাতঃকাল—এক প্রহর, অর্দ্ধ যাম, তিন দণ্ড, এক পল, ছাই ধরিলে স্বর্ণ মুষ্টি হইবার সময়—"

সেনাপতি গজপতি সিংহ কহিলেন—"তবে আগেই এ মুহূর্ত্তের কথা বলিলেন না কেন"?

মন্ত্রী বলিলেন "গৃহিনীও ত ঘরে নাই, যে এতটা বেঠিক!

বিদূষক বলিল "হা হাঃ গৃহিণী! গৃহিণী থাকিলে বড় বেঠিক হইতে হইত না, ঠাকুর বিলক্ষণ ঠিক হইয়া যাইতেন। ঠাকুর, গৃহিণীর অভাবে আমিত ঠিকে ভুল? আবার"—

রাজা এক মনে আলবোলা টানিতেছিলেন সহসা কহিলেন—"বিদূষক, একটু থামহে। ঠাকুর, তবে সকাল বেলাই লগ্ন স্থির রহিল?"

বিদূষকের মুখের কথাটা মুখেই থাকিয়া গেল—ঠাকুরও একটা চোখা উত্তরের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা হইতে রেহাই পাইয়া সজোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"আজ্ঞে রহিল বই কি?"

মন্ত্রী স্বভাবতঃ কিছু মুখফোঁড়, তিনি বলিলেন "কিন্তু তৃতীয় প্রহরের মুহূর্ত্তটাই অধিক শুভ, তাহার কথাই ঠাকুর আগে বলিয়াছেন"—

নাগাদিত্যের বালক মুখে বিরক্তি প্রকাশিত হইল—দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"না প্রথম প্রহরই শীকারের সময়—"

কেহ আর কথা কহিল না। বৎসর খানেক মাত্র বুধাদিত্যের মৃত্যু হইয়াছে, নাগাদিত্য স্বহস্তে রাজ্য ভার পাইয়াছেন। ক্ষুব্ধ সিংহের ন্যায় তিনি এতদিন অধীনতা সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। এখন সে কাকা নাই, সে বৃদ্ধ মন্ত্রীও নাই, (কাকার আগেই তাঁহার মৃত্যু হয়)—এমন কি এই মন্দিরের পুরোহিত যিনি থাকিলে সম্ভবতঃ যাঁহার রাশ এখনো কতকটা তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইত তিনিও নাই, নাগাদিত্য এখন নিতান্ত বন্ধনমুক্ত। তিনি যে আর অধীন বালক নহেন—তিনি যে এখন প্রকৃত গ্রহাদিত্য, সুযোগ পাইলেই প্রতি পদে সভাসদদিগকে তাহা বুঝাইয়া দেন।

প্রাতঃকালই শীকারের সময় স্থির রহিল, সে সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথা কহিল না, অন্য বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, গজপতি সিংহ কহিলেন "ঠাকুর দেখুন দেখি এবার শীকার কিরূপ মিলিবে? পুঁথিতে কি বলে?"

আচার্য্য গণনা না করিয়াই বলিলেন "শুভ মুহূর্ত্তে শীকার শুভই মেলে, এইটুক বুদ্ধি হইল না বাবা।"

বিদূষক বলিলেন—"বুদ্ধি ওঁর যত তা নামেই প্রকাশ পাইতেছে—বুদ্ধিতে উনি চার পা—" রাজার মুখ হইতে নল পড়িয়া গেল, তিনি হাসিয়া উঠিলেন, সকলেই হাসিয়া অস্থির হইল। গজপতি অপ্রস্তুত হইয়া মনে মনে একটু ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সামলাইয়া বলিলেন "ঠাকুর আপনি শুভ কাহাকে বলেন জানি না, আরবারেও শুভ বলিয়াছিলেন—তবে কি না আরবারে একটিও বড় বরাহ মিলে নাই।"

রাজা বলিলেন—"সত্য কথা। এবার কিন্তু বড় বরাহ চাই"

ঠাকুর বলিলেন—"যে আজ্ঞা তাহাই হইবে। আপনি যখন বড় চাহেন, তখন আর কি কথা।"

গজপতি বলিলেন—"যদি হয় সে আপনার কথায় নহে, আর বারে আপনি কি বলিয়াছিলেন মনে আছে ত?"

বিদূষক বলিলেন—"ঠাকুরেব সব কথাই অমনি। আমার যে উনি কি দশা করিয়াছেন—তা উনিই জানেন। কিগো ঠাকুর বলেন কি? গৃহিনী ত দিন দিন গোকুলেই বাড়িতেছেন, আপনার ভরষায় আর কদিন থাকি?"

কথাটায় আর কেহ হাসিল না, বিদূষক নিজেই হাসিতে আরম্ভ করিলেন, সংসারে এ এক রকম শস্তাদরের রহস্য সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

সভাসদ শ্রীমন্ত সিংহ কহিলেন—"ঠাট্টা নয়, ঠাকুরের গণনার গতিকই ঐ, ঠাকুর বলিলেন, আমার ছেলে হইবে—হইল মেয়ে'

ঠাকুর সহজে দমিবার পাত্র নহেন, বলিলেন 'আরে বাবা মেয়ে কি আর ছেলে নয় মেয়েছেলে ত বটে! অশুভ খবরটা কি হঠাৎ দেওয়া যায়, বুদ্ধিমান হইলে আপনিই বুঝিয়া লয়। আর অমন যে একটু তরতফাৎ সে গণনার দোষ নয়, কালের দোষ। গণনার নিয়ম সব কালেই এক, তবে কি না ত্রেতাযুগের আজানুলম্বিত বলিলে বুঝিতে হয় রামচন্দ্র, আর কলিযুগের আজানুলম্বিত"—বলিয়া ঠাকুর বিদূষকের দিকে হাসিয়া চাহিলেন—রাজা হাসিয়া তাহার কথাটা শেষ করিলেন, বলিলেন—

"আমাদের হনুমানি।" হাসিটা বেশ ভাল করিয়া জমিল, কেবল বিদূষক একটু থমকিয়া গেলেন, তাঁহার নাম হনুমানপ্রসাদ। কি উত্তর দিবেন হঠাৎ যোগাইল না, তিনি নামের উপযুক্ত একটু মুখভঙ্গী করিলেন। যখন কথা যোগায় না তখন মুখভঙ্গীই তাঁহার অস্ত্র। এই সময় মন্ত্রী বিদূষককের মুখ রাখিলেন, আচার্য্যকে বলিলেন "ঠাকুর তবে এখন হইতে আপনি তালগাছ বলিলে আমরা আখের গাছ বুঝিব?"

পুরোহিত বলিলেন—"আমি তা বলিতেছি না—তবে কি গতিক তাই বটে,—চাহিয়া দেখ"

একজন সৈনিক সোপানের উপর দাঁড়াইয়া পাশের একটি গাছড়া বামহাতে টানিয়া তুলিতেছিল, দুইবার টানিয়া তাহা আমূল উঠিল না, ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া আসিল, এই সময় কতকগুলা চোখ তাহার উপর পড়িল—সে শশব্যস্ত হইয়া দুই হাতে তাড়াতাড়ি গাছটা টানিয়া তুলিল।

পুরোহিত বলিলেন—"শুনিয়াছি রাজা গ্রহাদিত্যের সৈনিকেরা এক একটা গাছ উপড়াইয়া তুলিতে পারিত, আর ঐ দেখ একটা তৃণ তুলিতে উহার কষ্ট!"

সেনাপতি গজপতি সিংহ বলিলেন—"আপনি যখন গাছ বলিতেছেন, তখন অবশ্য তাহা তৃণই হইবে"

ঠাকুর বলিলেন "আজ্ঞে না। এ বাড়ান কথা নহে। গ্রহাদিত্যের সৈনিকেরা যে গাছ টানিয়া তুলিত ইহা প্রসিদ্ধ কথা।"

কথাটা রাজার ভাল লাগিল না, গ্রহাদিত্যের সৈন্যেরা যাহা পারিত তাঁহার সৈন্যেরা তাহা পারে না ইহা তাঁহার পক্ষে মানের কথা নহে। রাজা অনবরত গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন। গজপতি সিংহ তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন, বলিলেন—"ঠাকুর মশায়,তৃণ না হইয়া যদি সে গাছ হয় ত বুঝি ঐরূপ গাছ হইবে?" তিনি নদী তীরের একটি গাছে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, জলের তোড়ে তোড়ে সে গাছটা এমন শিথিল শিকড় হইয়া পড়িয়াছে—যে দেখিলে মনে হয় একবার টানিতে না টানিতে উঠিয়া পড়ে। কিন্তু পুরোহিত জানিতেন দেখিতে উহা যতই শিথিল মূল হউক—উহাকে উঠান বড় সহজ হইবে না। ঠাকুর বলিলেন—"আপনার সৈনিকদের ইহাই উঠাইতে আজ্ঞা হউক"।

রাজার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সেনাপতি কোন কথা কহিবার অগ্রে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে বলিলেন—"যে তোমাদের মধ্যে ঐ গাছটা এক টানে উঠাইতে পারিবে—সে পুরস্কৃত হইবে—"

অবাক সৈনিক বৃন্দ রাজার দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিল, রাজা আবার আজ্ঞা করিলেন, সহসা একটা কোলাহল উত্থাপিত হইল, গাছের চারিদিকে লোক জমিয়া গেল—সহস্র দৃষ্টি সেই গাছটার প্রতি নিবদ্ধ হইল, অথচ কেহ সাহস করিয়া তাহার অঙ্গে হস্ত নিক্ষেপ করিল না, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আগে চেষ্টা করিতে অনুনয় করিতে লাগিল—সেনাপতি কম্পিতকণ্ঠে আবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন, রাজা তীব্র স্বরে বলিলেন "আমার এমন সৈনিক কেহ নাই, যে ঐ গাছটা তুলিতে সাহস করে!"—একজন অগ্রসর হইল, গাছ ধরিয়া টানিল, নিষ্ফল হইয়া লজ্জায় সরিয়া দাঁড়াইল, সেনাপতি লজ্জায় লাল হইলেন, রাজার হৃৎকম্প হইল—আবার একজন গাছ ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিল, সেও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল, আরো দুই একজন গেল, ঐরূপে নিষ্ফল হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল; আর কেহ যাইতে সাহস করে না, রাজা সেনাপতির দিকে চাহিয়া বলিলেন "সত্যই আমার রাজ্যে এমন সৈনিক নাই, যে ঐ গাছ উঠাইতে পারে?"

সেনাপতি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন—রাজা মাটিতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন—"আমি উঠাইব" দালান হইতে তিনি লাফাইয়া নামিলেন,—এমন সময় একজন ভীল গাছটার কাছে আসিয়া বলিল "ইহা উপড়াইতে হইবে" ? বলিতে বলিতে সহস্র মুখী শিকড়শুদ্ধ গাছটা উপড়াইয়া ফেলিল, অন্য সৈনিকেরা এতক্ষণ নিজের পরিশ্রমে তাহারি যশো-দ্বার যেন উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেছিল—তাহাদের হাতের টানে টানে ঐ শিথিল মূল গাছ আরো শিথিল মূল হইয়া ভীলের হাতে উঠিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছিল। সংসারে অনবরত এইরূপই হইতেছে। শত ক্ষুদ্রের প্রাণপণ পরিশ্রম কাহারো চখে পড়ে না তাহার স্থলে একজন ভাগ্যবানকেই সকলে দেখিতে পায়। অদৃষ্ট শত জনের ধন দিয়া আপনার এক প্রিয় ব্যক্তিকে পোষণ করে। সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাহারো মুখে এক বার জয়ধ্বনি উঠিল না। রাজা দ্রুতপদে আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সে তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। কে বলিতে পারে রাজাও তাঁহার সৈনিকদিগের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একে আর।

এখনো রাত্র প্রভাত হয় নাই, কিন্তু দীপালোকে দুর্গ-প্রাঙ্গন দিনের ন্যায় আলো-কিত। ফুল চন্দন ধূপ ধূনার গন্ধ-পূর্ণ আলোকিত প্রাঙ্গন শঙ্খধ্বনিতে মাঝে মাঝে শিহরিত হইয়া উঠিতেছে। বাদকগণ ঢাক ঢোল স্কন্ধে শানাই বাঁশি হস্তে, সৈন্য সামন্তগণ অশ্বের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সকলেই ফুল চন্দনে ও শ্যাম বস্ত্রে সজ্জিত। আহরিয় শীকারোৎসব উপলক্ষে রাজা স্বহস্তে এই শ্যাম বস্ত্র সকলকে উপহার দিয়াছেন। রাজা আসিলে বাদকেরা বাজনা বাজাইয়া উঠিবে, সৈনিক সভাসদেরা অশ্বারূঢ় হইবেন। এই সময় প্রান্তরের এক নির্জ্জন প্রান্তে কয়েক জন সভাসদ চক্র করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কি যেন একটা কানাকানি চলিতেছিল। আজ কাল দুইচার জন সভাসদ একত্র মিলিলেই এইরূপ হইয়া থাকে। সেই দিন হইতে জুমিয়া-ভীল মহারাজের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। জুমিয়া বন্য পশুর সহিত দ্বন্দযুদ্ধ করিয়া আশ্চর্য্যরূপে জয় লাভ করে, জুমিয়া একজন সুনিপুণ তীরন্দাজ, কুস্তিতে রাজসভায় জুমিয়াকে কেহ পারিয়া উঠেনা, অল্প দিনের মধ্যেই জুমিয়ার এই-রূপ নানাগুণ রাজা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। সভাসদগণ ইহাতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এতদিন যে একটা রেষারেষি ছিল, সে সকল ভুলিয়া পাঁচজন একত্র হইলেই তাহারা আজকাল একপ্রাণ হইয়া পড়ে, মুখে আর কোন কথা থাকে না, রাজার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য অরাজকীয় ব্যবহারের উপর

অবিশ্রাম হাস্য চলে, ভাষ্য চলে, কিন্তু যেহেতু তাহাদের পক্ষে ইহা বড় একটা হাসির কথা নহে—তাই অবশেষে তাহাদের সে সমস্ত হাসি কানাকানি ক্রুদ্ধ তর্জন গর্জনে পরিণত হয়।

উহাদের মধ্যে দুই একজন বিজ্ঞ যাহারা, তাঁহারা কেবল বড় একটা কথা কন না, আর সকলের তর্জনগর্জ্জনের মধ্যে গম্ভীর ভাবে এমন ঘাড় নাড়িতে থাকেন আর সেই ঘাড় নাড়ার মাঝে মাঝে ধীর শান্ত ভাবে—বেশা নয়—কিন্তু এমন দু একটী বুলি ঝাড়েন যে অন্যের সহস্র কথার অপেক্ষা তাহার অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—এবং উত্তেজিত সভাসদগণ সহস্রগুণ অধিক উত্তেজিত হইয়া রাজা ও জুমিয়ার বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হইতে কৃত সঙ্কল্প হয়, ও এই সঙ্কল্প অসঙ্কোচে রাজার নিকট তখনি গিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। অথচ অল্পক্ষণের মধ্যেই এই আস্ফালন আপনা হইতে তাহাদের সেই ক্ষুদ্র চক্র সীমানাতেই বিলীন হইয়া পড়ে, রাজার কাছ পর্য্যন্ত তাহার একটী অণু এ পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই, কেননা সেনাপতি একদিন রাজার কাছে জুমিয়ার বিরুদ্ধে কি একটা কথা বলিতে গিয়া রাজার চোখে আগুণ দেখিয়াছিলেন।

জুমিয়া আজ এখনো এখানে আসে নাই, তাই বিদূষক গাহিতেছিলেন—

কোথায় গেলে কালরূপ
কেঁদে সারা নন্দ ভূপ
যশোদার কোল অন্ধকার—
দাঁড়ায়ে যমুনা জলে
গোপিনী ভাসিছে জলে—
বাজে না যে কদম মূলে
রাধা রাধা বাঁশরীটি আর।

জুমিয়ার প্রতি সেনাপতি সকলের অপেক্ষা বেশী চটা, জুমিয়া তাঁহারই অধিক ক্ষতি করিয়াছে। তিনি চারিদিক চাহিয়া "তাইত" বলিয়া গোঁপ জোড়ায় ভালরূপে তা দিতে লাগিলেন। তাপর বলিলেন—"আজ যদি সে আমাদের সঙ্গে শীকারে যায়—তাহ'লে কিন্তু আমি আজ আর ধনুক ধরছিনে। সে দিন যে আমার তীরটা হরিণ স্পর্শ করিল না, রাজা ত বুঝিলেন না ব্যাপারটা কি? একজন ভীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা—এ অপমানে একজন ভদ্রলোকের হাত ঠিক থাকে!

শ্রীমন্ত বলিলেন—"রাম রাম! তোমার আমার যাতে অপমান মনে হয়—রাজা স্বচ্ছন্দে তাই করছেন।"

বিদূষক গান বন্ধ করিয়া নীরবে ভ্রূভঙ্গী করিলেন।

মন্ত্র বলিলেন, রাজা কি আর রাজা—রাজা ত বালক।

শ্রীমন্ত বলিলেন "দেশটা অরাজক হোল।"

মন্ত্রী গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেন।

সেনাপতি বলিলেন "বেশী দিন আর টিকছেনা, এই আমি বলে দিলেম। ভীলেদের অত প্রশ্রয় দেওয়া!

মন্ত্রী বলিলেন—মহারাজ আশাদিত্যকে একজন ভীল ত মারতে যায়।"

সেনাপতি। সেই পর্য্যন্তই ত ভীলেদের সঙ্গে রাজাদের মেশামেশি ছিল না—

শ্রীমন্ত বলিলেন—আবার যে এই আরম্ভ হোল, দেখাযাক গড়ায় কোথায়?

মন্ত্রী বলিলেন—আর এরা যে সেই নির্ব্বাসিত ভীলের বংশ নয়—তাই বা কে বলতে পারে? সম্প্রতি না এসেছে?

মুরলীধরের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল—বলিলেন—"তবে রাজার জীবনের উপর যে জুমিয়ার লক্ষ্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ কই"?

কলের পুতুলের মত চারিদিকে একটা নীরব ঘাড় নাড়ানাড়ি পড়িয়া গেল, রাজার জীবনের জন্য সকলে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সময় পুরোহিত এইখানে আসিলেন—বিদূষক বলিল—"ঠাকুর মশায় তোমারি এ কীর্ত্তি"

ঠাকুর জড়সড় হইয়া বলিলেন "কেন করিয়াছি কি?" সেনাপতি বলিলেন—"হু, করিয়াছেন কি? জুমিয়া ভীল যে রাজার এমন প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তার মূলটা কে"?

পুরোহিত নিজের জটার মধ্যে পাঁচটা আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া বলিলেন "তাহাতে ত আর ক্ষতি কিছু হয় নাই"।

শ্রীমন্ত বলিলেন—"আপনার ক্ষতি নাই হোক—রাজ্যের ক্ষতি।

মন্ত্রী বলিলেন—"আপনার ক্ষতিই বা নয় কেন? আগে আপনাকে মহারাজ যত ভালবাসতেন জুমিয়া এসে পর্য্যন্ত তাকি বাসেন?"

পুরোহিত বলিলেন—"কি করিতে হইবে কি?

সেনাপতি বলিলেন—"যা করিতে হইবে আপনি বুঝুন। আমাদের আর মান না খোয়াইতে হইলেই হইল।"

শ্রীমন্ত বলিলেন—"আপনার জন্যই এরূপ হয়েছে আপনিই এখন বুঝিয়ে তাঁর চোখটা খুলে দিন"—

পুরোহিত কহিলেন—"রাজা কোথায়?"

শুনিলেন শিশামহলে। পুরোহিত শিশামহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিশামহল—আয়না মহল—অর্থাৎ সজ্জাগৃহ। রাজা এই গৃহে শীকার সজ্জা করিতেছিলেন। সাজ একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছে বম্মাবৃত দেহে অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাইতেছে, লম্বিত কেশজাল সিঁতিতে বিভক্ত হইয়া পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে। ভৃত্য মুকুট হস্তে দণ্ডায়মান, মুকুট মাথায় পরিলেই সজ্জা শেষ হয়—কিন্তু রাজা তাঁহার ক্ষুদ্র স্বল্পকেশ গোঁপ লইয়া মহাব্যস্ত,

তাহার আগাটায় অবিশ্রাম চাড়া দিয়া কোনমতে তাহাকে পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—আর মাঝে মাঝে দেয়ালের একখানি আকর্ণ বিস্তৃত বৃহৎগুম্ফ ছবির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন—ছবিখানি তাহার পূর্ব্বপুরুষ গুহার। নাগাদিত্য মনে করেন—গুহার মত গোঁপজোড়া হইলেই মাত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে গুহা হইতে পারেন। এমন সময় পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজা গোঁপ হইতে হাত উঠাইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"নিবেদন কি ? ঠাকুর আশীষ করিয়া বলিলেন—"আর কিছু নহে, মহারাজের বিলম্ব দেখিয়া আগেই আশীষ করিতে আসিলাম।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করুন যেন বড় বরাহ পাই"

পুরোহিত বলিলেন—"তাহাই হউক। যাইবার বিলম্ব কি ?"

রাজা বলিলেন—"বিলম্ব কিছুই নাই, এখনি যাইতেছি ?"

রাজা মুকুট পরিয়া অগ্রসর হইলেন, সহসা পুরোহিত গলার পদ্মবীজ মালার বীজগুলি সরাইতে সরাইতে বলিলেন—"মহারাজ জুমিয়া এখনো আসে নাই।"

রাজা বিস্ফারিত নয়নে চাহিলেন, পুরোহিত নিতান্তই সহসা ওকথা বলিয়াছিলেন, তাহার পর বলিলেন "হ্যাঁ জুমিয়ার আসিবার কথা ছিল বটে।"

পুরোহিত বলিলেন—"কিন্তু আসে নাই—তা না আসিলেই কি ভাল হয় না—" নাগাদিত্যের আবার গোঁপে হাত পড়িল—বলিলেন "ভাল হয়! কেন ?"

পুরোহিত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"সে ভীল আপনি রাজা—সবাই বলে—"

নাগাদিত্যের বড় বড় কাল পাতার মধ্যে কাল কাল চোখের তারাগুলা পর্য্যন্ত যেন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "মহারাজ গ্রহাদিত্য যে ভীলের সহিত মিশিতেন সবাই কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে ? তিনি যাহা পারিতেন—তাঁহার বংশধরের তাহাতে অপমান নাই।—সবাই যাহা বলে বলুক—আপনিও কি তাই বলেন নাকি ?"

পুরোহিত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—পদ্মবীজগুলি ঘন ঘন ঘুরপাক খাইতে লাগিল—তিনি বলিলেন, "না তাহা বলি না,—দোষটাই বা তাতে কি,—তবে"—

রাজা বলিলেন—" 'তবে' থাক্। আপনার আজ্ঞাই আমি পালন করিব—সবাই যাহা বলে বলিতে দিন"।

রাজা দুর্গপ্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ভাট নকীব ফুঁকিল, জয়ধ্বনি বাদ্য নাদ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল, রাজা আশ্বারোহণ করিলেন, সৈনিক-সভাসদেরা অশ্বারোহণ করিল—আবার কোলাহল থামিয়া গেল, সকলে রাজার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল—রাজা একবার সভাসদদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"জুমিয়া ভীলের বাড়ীর দিকে চল।"

যদি পুরোহিত রাজার চোখ ফুটাইতে না যাইতেন ত এতদূর হইত না, সভাসদগণ অবনত-মস্তকে রাজার অনুবর্ত্তী হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বালিকা।

মন্দিরপুরের নিকটে—রাজধানীর সীমানার অব্যবহিত পারে জুমিয়ার পর্ণকুটীর। অল্পক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য অশ্বারোহীপুরুষ জুমিয়ার কুটীর-নিকটের বিজন প্রান্তর পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইল।

সূর্য্য উঠিয়াছে—তাহার অরুণ শুভ্র কিরণ সহস্র সৈনিকের শ্যাম উষ্ণীষে, শ্যাম পরিচ্ছদে, শত সহস্র উন্মুক্ত বর্ষা ফলকে, সহস্র অশ্বের ঝলসিত সাজ সজ্জার উপর বিভাসিত হইয়াছে। প্রান্তরের দিকদিগন্তে স্তব্ধ তরুরাজি, সূর্য্যকিরণ-দীপ্ত শুভ্র ধূমকান্তি-শৈল শৃঙ্গরাজি, সূর্য্যের অগ্নিময় মূর্ত্তির দিকে স্তব্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে, আর তাহাদেরই মত স্তব্ধ নেত্রে রাখাল দুচারিজন গরুর গাত্রে হাত রাখিয়া—অশ্বারোহীদিগকে উন্মুখ হইয়া দেখিতেছে। প্রান্তরে দাঁড়াইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন জুমিয়ার বাড়ী কোনটি।" একজন সৈনিক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল—হুকুম হইলে খবর দিয়া আসি" রাজা বলিলেন "না আমি যাইতেছি"—

রাজার ইচ্ছা হঠাৎ জুমিয়াকে বিস্মিত করিবেন—এবং এইরূপে সভাসদদিগকেও ক্ষুণ্ণ করিবেন। রাজা অশ্ব হইতে নামিলেন সভাসদগণ—সকলেই রাজার সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল, রাজা বলিলেন "আবশ্যক নাই।" নাগাদিত্য ভীলের গৃহের কাছাকাছি আসিয়া দেখিলেন কুটীর-সম্মুখে একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া একটি বালিকা অশ্বারোহীদিগকে দেখিতেছে। রাজাকে দেখিয়া সে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইল—রাজাও সহসা সেইখানে দাঁড়াইলেন। সে বড় বড় চোখে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি কে?"

রাজা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না—বলিলেন—"আমি—" মেয়েটি বলিল—"তুমি রাজা?" রাজা বলিলেন 'হাঁ'।

বালিকা এক রাজা ও তাহার মৃগয়ার গল্প জানিত। তাহার সেই গল্পের রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া পথ হারাইয়া এক কুটীরে আসিয়াছিলেন, কুটীরে এক কন্যা ছিল তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যান, তাহার মনে হইল—এ বুঝি সেই রাজা—তাই সে জিজাসা করিল—"তুমি রাজা"? রাজা যখন বলিলেন 'হাঁ' তাহার কচিমুখ খানিতে হাসি ধরিল না। সে তখন আর একটু কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি বর?" রাজা হাসিলেন, সে ছুটিয়া কুটীর ধারের একটা তরুময় ক্ষুদ্র কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেইখান হইতে দুই

একটি নাগকেশর ফুল কুড়াইয়া আনিয়া রাজার হাতে দিয়া বলিল "বর —তুমি ফুল নেবে ?" রাজা ফুল হাতে লইলেন, বালিকার মুখটি শুভ্র আনন্দের হাসিতে প্রফুল্ল হইল, রাজা পলকহীন নেত্রে তাহার সেই হাসি ভরা কচি মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন,— উষার শুভ্র সৌন্দর্য্য সে মুখে তিনি বিভাসিত দেখিলেন, এলোকেশের মধ্যে শুভ্র ক্ষুদ্র মুখখানি—সেই মুখে ক্ষুদ্র ভ্রূ রেখার উপরে স্বচ্ছ ললাট, নীচে চঞ্চল সুনীল চক্ষু, সুন্দর নাসিকা, গোলাপবর্ণ ওষ্ঠাধর—ক্ষুদ্র সুঠাম চিবুক, রঙ্গিন কাপড় পরা ক্ষুদ্র দেহ, সে মূর্ত্তিতে অপার্থিব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন--নির্ম্মল উষাকালে উষাদেবী শরীরী হইয়া জগতে কল্যাণ বিতরণ করিতে আসিয়াছেন মনে হইল। রাজা কিজন্য আসিয়াছেন ভুলিয়া গেলেন,—বালিকা বলিল—"বাবাকে বলে আসি—বর এয়েছে" বালিকা যাইতে উদ্যত হইল, রাজা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তোমার বাবা কে ?" বালিকা বলিল "আমার বাবা কে ? আমার বাবা।

রাজা হাসিয়া বলিলেন—'তাহার নাম কি'

"জুমিয়া ভীল"

রাজা অবাক হইলেন, বলিলেন—"তাকে বল রাজা আসিয়াছেন।"

বালিকা দৌড়িয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, রাজা ফিরিয়া আসিয়া অশ্বারূঢ় হইলেন।

ক্রমশঃ।

নিউহ্যাম কলেজ।

অনেক গোলমালের পর, অনেক আপত্তির পর আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে—স্ত্রীকলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এখনো কতলোক স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের কোনই কারণ নাই। নূতন কোন একটা প্রথা—তাহা যতই ভাল হউক না কেন, প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ এইরূপ হইয়াই থাকে। স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী—এহেন উন্নতমত-ইংলণ্ড—যেখান হইতে আমরা স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছি সেখানেও যে কিছু দিন পূর্ব্বে স্ত্রীদিগের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে কি ঘোরতর আপত্তি ছিল কত গোলমালের পর স্ত্রী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এমন কি এখন যদিও বিলাতে স্ত্রী শিক্ষার যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে, স্ত্রী কলেজ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে,—সাধারণতঃ বালিকারা স্কুলের পড়া শেষ করিলে তাহাদিগের স্বামী শীকারের জন্য তাহাদিগকে আমোদ প্রমোদ পূর্ণ সমাজে লইয়া যাওয়া যেমন বিলাতের সকল শ্রেণীর রীতি, তাহার পরিবর্ত্তে

এখন স্কুলের পড়া শেষ করিয়া বালিকাদের কলেজে যাইবার রীতি এখন যদিও অনেক পরিবারে চলিত হইয়াছে কিন্তু তথাপি সেখানেও এখনও অনেকে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, এবং কলেজের যথার্থ প্রকৃতি কিছুই জানেন না। এই সকল স্ত্রীশিক্ষা বিরোধীদিগের এবং সাধারণের স্ত্রীকলেজ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা যাহাতে হইতে পারে সেই জন্য বিলাতের 'একটী প্রধান স্ত্রীকলেজ নিউহামের একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী নিউহাম কলেজের সম্বন্ধে নাইন্‌টিন্‌থ্ সেনচুরি পত্রিকাতে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষা—মেয়েদের এম, এ, বিএ পাশ করা এদেশে নূতন বিলাতি আমদানী, আমাদের দেশের স্ত্রীকলেজ বিলাতের নকল মাত্র, সুতরাং আসলের অর্থাৎ বিলাতের স্ত্রী কলেজের বিবরণ জানিতে সাধারণের কৌতূহল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু নাইনটিন্‌থ সেনচুরি পড়িয়া এ কৌতূহল নিবৃত্তি করা সকলের পক্ষে সুবিধা জনক নহে সেই জন্য এখানে আমরা বাঙ্গলায় তাহার মর্ম্মটী প্রকাশ করিলাম।

১৭ বৎসর পূর্ব্বে ইউনিভারসিটীর কোন কোন শিক্ষক প্রধানতঃ প্রোফেশর হেনরী সিজউইক ও ফ্রেডারিক ডেনিসন মরিস কেম্ব্রিজের ছাত্রীদিগকে প্রথম লেকচর শুনাইতে আরম্ভ করেন। এই লেকচর শুনিতে আগ্রহের সহিত ছাত্রীরা সমবেত হইত এবং কিছু দিন পরে ইংলণ্ডের আর এক অংশ হইতে একজন স্ত্রীলোক এই লেকচরে আসিবার অনুমতি প্রার্থনা করে। কর্ত্তৃপক্ষরা বিবেচনা করিয়া এই আবেদন গ্রাহ্য করিলেন এবং আবেদনকারিণীর থাকিবার জন্য একটী বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রী সংখ্যা এত অধিক হইল যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নিউহামের বর্ত্তমান প্রিন্সিপল মিশক্লোর (Clough) তত্ত্বাবধানে একটী ছাত্রী আবাস খোলা হইল। একাধিক বার স্থান পরিবর্ত্তনের পর ৪ বৎসর পরে এই বর্দ্ধিত সংখ্যা ছাত্রীদের জন্য একটী প্রশস্ত বাটী—নিউহাম কলেজের আধুনিক দক্ষিণ হল—তখনকার নিউহান হল প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ হলের সংলগ্ন কমপাউণ্ডে তিনটী টেনিসকার্ট, একটি ব্যায়ামক্ষেত্র ও একটি ল্যাবরেটরি আছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভাইস-প্রিনসিপল মিসেশ হেনরি সিজউইকের তত্ত্বাবধানে (মিশ হেলেন গ্যালষ্টোন এখন এই পদের অধিকারী। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাইস-প্রিনসিপ্‌ল্ হন) দক্ষিণ হলের পাশেই উত্তর হল নামক আর একটী ছাত্রী আবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতেও ছাত্রীদিগের স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় নিউহাম কলেজের নিকটে লালবাড়ী নামক একটী বাটীতে কলেজের একজন প্রোফেসরের তত্ত্বাবধানে ২০টী বালিকার আবাস নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং নূতন ছাত্রীদিগের জন্য উত্তর হলের দিকে আর একটী বাটী নির্ম্মিত হইতেছে। পরে ইহার নাম বোধ হয় পশ্চিম হল হইবে।

নিউহাম কলেজের প্রথম প্রতিষ্ঠা সময়ে কেম্ব্রিজের উচ্চতর স্থানীয় পরীক্ষার জন্যই ছাত্রীরা পড়িতেন। এখনও সকলেই এই পরীক্ষার জন্য পড়েন কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রী এই পরীক্ষার পর ট্রিপোর (আমাদের দেশের

বিএর কাছাকাছি) সম্মান লাভার্থে পরীক্ষা প্রদান করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রথমে মহিলাগণ ট্রিপোপরীক্ষা প্রদান করেন এবং ৬ বৎসরের মধ্যে ৩১ জন সম্মান লাভ করেন। কিন্তু এত দিন ছেলেদের ন্যায় বাঁধাবাধি নিয়মে মেয়েদের পরীক্ষা গৃহীত হইত না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ছাত্র ছাত্রী উভয়ের পক্ষে ট্রিপো পরীক্ষা প্রদানের নিয়ম এক হইল। ছেলেদের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট কাল নিউহাম বা গির্টন কলেজে থাকিলে এবং স্থানীয় পরীক্ষা বা ট্রিপোর পূর্ব্ব পরীক্ষা প্রদান করিলে স্ত্রীলোকেরাও ট্রিপো পরীক্ষার্থিনী হইতে ক্ষমতা পাইলেন।

লণ্ডন ইউনির্ভাসিটীর মত কেম্ব্রিজে মেয়েদিগকে পাশের পর উপাধিদান করা হয় না কেবল ট্রিপোর ফলাঙ্কিত একখানি প্রশংসা পত্র দেওয়া হয়।

নিম্ন লিখিত বিষয়ে এ পর্য্যন্ত মেয়েরা উপাধি পাইয়াছেন। গণিত, সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতন ও আধুনিক ভাষা।

ছাত্রীরা আপনার ইচ্ছা ও বুদ্ধি অনুসারে পরীক্ষার বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লয়েন। বালিকা বিদ্যালয়ে সাহিত্য ও গণিত ভাল শিক্ষা হয় না সেই জন্য সাহিত্য ও গণিতে মহিলাগণ এ পর্য্যন্ত অতি উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারেন নাই * কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে বিশেষতঃ ইতিহাস ও আধুনিক ভাষায় তাঁহাদের বেশ ব্যুৎপত্তি দেখা যায় বরং ১৮ বৎসরের একজন বালিকা, বালক বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র অপেক্ষা এ বিষয়ে যে অধিক দক্ষ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষা ফল দেখিলে এ কথাটীর প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক ভাষা পরীক্ষায় দুই জন মাত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সে দুই জনই নিউহাম কলেজের ছাত্রী। আর একজন ছাত্রী ইতিহাস ট্রিপোয় প্রথম হয়েন। নিউহাম কলেজের প্রায় চতুর্থ পঞ্চমাংশ ছাত্রীর লক্ষ্য ট্রিপো পরীক্ষা কিন্তু তাহারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। ইচ্ছা করিলে তাহারা স্থানীয় অন্য পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। পাঠের ফল দেখাইতে পারিলে ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা নাও দিতে পারে। এইরূপে তাহাদের স্বাস্থ্যের হানিকর অধিক পরিশ্রমেরও ভয় নাই, আর এইরূপ নিয়মিত কর্ম্মে স্বাস্থ্য হানির বদলে স্বাস্থ্যের উন্নতিই হইয়া থাকে। এরূপ নিয়মিত জীবন যে বাস্তবিক কতরকমে শরীরের পক্ষে উপকারী তাহা এখনও লোকে জানে না। লণ্ডনের আমোদ প্রিয় সমাজের নৃত্য গীত রাত জাগরণ, নৃত্য-গৃহের উত্তাপ হইতে হিমে বাড়ী যাওয়া প্রভৃতি সামাজিকতার স্বাস্থ্যভঙ্গকর পরিশ্রম হইতে কলেজের পরিশ্রম যে অনেক কম এবং স্বাস্থ্যকর তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথম পরিশ্রমের জন্য কেহ ভাবিত হয়েন না তাহা সমাজের চিরন্তন রীতি। শেষ পরিশ্রমের দোষ সকলেই এক মুখে স্বীকার করিয়া অতিরঞ্জিত করিতে ক্রটী করেন না। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই পরীক্ষা

---

* মিশ হ্যাগিসেন এই প্রস্তাবটি লিখিবার পরে সম্প্রতি মিশ রাঁমজে গণিতে প্রথম হইয়াছেন। ভাং সং

দেওয়া ভাল কি মন্দ এ বিষয়ে চিরকালই দুইটী মত থাকিবে। কিন্তু আমার বোধ হয় ইহার উপকার অপকারের চেয়ে বেশী, এবং এইরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য অন্ততঃ জীবনে একবার চেষ্টা করা উচিত। সকল বিষয়ই অল্প অল্প জানা কিন্তু কোন বিষয়ই ভাল না জানা মেয়েদের স্বভাবের প্রধান দোষ। ট্রিপো পরীক্ষার সাহায্যে মেয়েরা এই দোষ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইতে পারেন।

লেকচর দ্বারাই নিউহাম কলেজে প্রধানতঃ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কতকগুলি লেকচর কলেজে এবং কতকগুলি কলেজের বাহিরে অন্যত্র দেওয়া হইয়া থাকে। কলেজে পাঁচ জন স্ত্রীশিক্ষক আছেন। একজন সাহিত্যে, দুইজন গণিতে, একজন আধুনিক ভাষায় ও একজন ইতিহাসে লেকচার প্রদান করেন। ইহাঁরা সকলেই কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী। ইহা ভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তিনজন পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সহরে বাস করেন। এই কয়জন এবং ইউনিভার্সিটীর প্রফেসরগণ কর্ত্তৃক নিউহামে শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রফেসরদের লেকচর শুনিতে সময়ে সময়ে মেয়েরা ছেলেদের কলেজেও যায়। ইহা ভিন্ন অন্য শিক্ষকের সাহায্যে ছুটীর সময়ও অনেক ছাত্রী রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। জুলাই হইতে অগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত এই উদ্দেশে ছাত্রীদের ছুটীর সময় দক্ষিণ হলে তাহাদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ছাত্রীগণ ৮ ঘণ্টার বেশী এবং ৭ ঘণ্টার কম কেহ পড়ে না। যেরূপ পদ্ধতি দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হয় পরীক্ষার দ্বারা তাহা নির্ণীত হইয়া সেই অনুসারে নিউহাম কলেজের কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকালবেলা ৮ টার সময় উত্তর দক্ষিণ উভয় হলেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং সকল ছাত্রীই (যাহারা অনিচ্ছুক নহে) উপাসনার্থে নিজ নিজ খাবার ঘরে সমবেত হয়। প্রিন্সিপল তাহার পর একটী ক্ষুদ্র উপদেশ পাঠ করিলে, অনেকগুলি ছোট ছোট টেবিলে ছাত্রীদের খাবার আসে। একএকটিতে আটজন করিয়া লোক বসিতে পারে। খাবার সময় বসিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই যার যেখানে ইচ্ছা বসিতে পারে। কিন্তু ছাত্রীদের আপনাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর বালিকারা ভিন্ন প্রিন্সিপলের টেবিলে কেহ বসিবে না এইরূপ উহ্য নিয়ম আছে। খাবার সময় ছাত্রীদের মধ্যে কোনরূপ আদব কায়দা থাকে না। তাহারা ইচ্ছা মত হাসে গল্প করে, যার ইচ্ছা খাওয়া হইলেই চলিয়া যায়, যার ইচ্ছা পরে আসে। এইরূপ আমোদ প্রমোদে ৯ টার সময় খাওয়া শেষ হইয়া গেলে তাহারা ইচ্ছামত পড়িতে বা লেকচর শুনিতে যায়। ছাত্রীদের প্রত্যেকের বসিবার ও শুইবার জন্য একটী মাত্র গৃহ থাকাতে সকালে অনেকেই প্রায় পুস্তকাগারে, বা সাধারণ বসিবার গৃহে কাজ করে। ১২॥ টার সময় পূর্ব্বেকার ন্যায় আর একবার মধ্যাহ্ন-ভোজন হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ছাত্রীরা টেনিসক্রীড়া ব্যায়াম বা হণ্টনক্রীয়া প্রভৃতি শারীরিক স্বাস্থ্যকর কর্ম্ম করে। কেহ কেহ বা লাইব্রেরীতে সংবাদ পত্র পড়ে। অক্টোবরের প্রথমে ছাত্রীদের মধ্যে একটী

'সংবাদ পত্র সভা' হয় এবং পক্ষপাতিতাহীন ভাবে সকল দল প্রমুখ সংবাদ পত্র লওয়াই স্থির হয়। তিনটার সময় চা পানের পর ছাত্রীরা স্থির ভাবে কিছুক্ষণ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে, ৬॥ টার সময় ছাত্রীদের ডিনার আসে। এই সময়ে ছাত্রীদিগকে আদব কায়দা মত ব্যবহার করিতে হয়। প্রিন্সিপল প্রতি দিন কয়জন ছাত্রী নিমন্ত্রণ করেন। বিনা নিমন্ত্রণে কেহ ডিনারের সময় তাঁহার টেবিলে যায় না। ডিনারে দুই প্রকার খাদ্য থাকে এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল সময় লাগে।

এই সময় প্রিন্সিপলের প্রাইভেট সেক্রেটরী কর্ত্তৃক ছাত্রীদের (রোল) সংখ্যা লিখিয়া নেওয়া হয়।

এক হলের ছাত্রীরা ইচ্ছা করিলে অন্য হলের ছাত্রী এবং কলেজ বহির্ভূত যে কোন স্ত্রী বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে, এবং নির্দ্দিষ্ট ব্যয় ভার প্রদান করিয়া ইচ্ছা করিলে বোন বা কোন বন্ধুকে ২।১ দিন আপনার কাছে রাখিতে পারে।

ডিনারের পর বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন কাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে সময় ব্যয়িত হয়। এপ্রিল হইতে জুন মাস ৮॥ পর্য্যন্ত ছাত্রীরা প্রায় বাহিরে থাকে কিন্তু মাইকেলমাস ও লেণ্টের সময় কনর্সাট প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কারণে কেহ বাহিরে যায় না কিন্তু কলেজে ছোট বড় নানা প্রকার সভার এই সময় অধিবেশন হয়। এই সমিতির বিষয় পরে বলিব। ৮ টার সময় ছাত্রীদের জন্য পুনরায় চা থাকে এবং তাহার পর দুই ঘণ্টাকাল সকলেই প্রায় পড়ে। ২ ঘণ্টা পরে নিকটবর্ত্তী সিনউইল ও রিডলী কলেজের ১০ টার ঘণ্টা শুনিলে সকলেই প্রায় পাঠ বন্ধ করে। এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই কিন্তু সাধারণতঃ নিজ ইচ্ছামত ছাত্রীরা যেরূপ করে এখানে তাহাই আমি বলিতেছি। ইহার পরের ঘণ্টায় ছাত্রীরা বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত দেখা শুনা করে এবং এই সময়ই নিউহাম ছাত্রী জীবনের প্রধান আমোদ কোকোর্পাটী দেওয়া হয়। এ নিমন্ত্রণে বর্ণনার কিছুই নাই কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর পরস্পরের সহবাসে কথা বার্ত্তায় হাস্য কৌতুকে ছাত্রীরা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করে। নিউহাম কলেজের ঘর গুলি বড় নয়, কিন্তু তাহাই কত রকমে এবং কেমন সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। প্রত্যেক ছাত্রীর একটী বিছানা আছে, এই খাটটী এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে দিনে তাহাকে কোচে পরিণত করা যায়। অনেক সময় দর্শকেরা 'দিনে ঘর দেখিয়া বলে বেশ গোছান কিন্তু ছাত্রীরা শোয় কোথায় ?

এই খাট ভিন্ন কলেজ হইতে প্রত্যেক ছাত্রীকে, একটী আলমারী, টেবিল, বাক্স, পুস্তকাধার এবং একটী হেলান দেওয়ার চৌকী দেওয়া হয়, অন্য জিনিস আবশ্যক মত ছাত্রীদের নিজের লইয়া আসিতে হয়।

অনেকে গাঢ় নীল, গাঢ় সবুজ বা টেরাকোটা রং এর কাগজে তাহাদের ঘরের দেয়াল মণ্ডিত করিয়া আপনাদের গম্ভীর রুচি প্রকাশ করে কেহ কেহ তাহাদের অপেক্ষা বা একটু

উজ্জ্বল রং ভালবাসে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই বোধ হয় আমেরিকার একটী বালিকার উপদেশ অনুসরণ করে নাই। এই বালিকাটী আমাদের কলেজ দেখিয়া বলিয়াছিল আমি যদি ইহার একটা ঘর পাই, লাল ও সোণালি রংএ মণ্ডিত করি।

সন্ধ্যাবেলা কোকো পার্টির সময় ঘরগুলি যেমন সুন্দর দেখায় আর কখনও বোধ হয় তত সুন্দর হয় না। এই সময় কখন বা নানাপ্রকার খেলা হয়, কখন গল্প বলা হয়; কোন নিমন্ত্রিকা নিমন্ত্রিতাগণকে পদ্য গদ্য প্রভৃতির বাছা বাছা অংশ মুখস্থ বলিতে বলেন কেহ বা নিমন্ত্রিতাগণের আমোদের জন্য বাদাম ভাঙ্গার জন্য বাদাম আনয়ন করেন। সেণ্ট-ক্লেমেণ্ট-সন্ধ্যাতে প্রায় আপেল টাঙ্গান খেলার বন্দোবস্ত হয়। এরকম বড় বড় গোলমাল পূর্ণ পার্টি ভিন্ন অপেক্ষাকৃত ছোট অল্প বন্ধু নিমন্ত্রিত অনেক পার্টিও হইয়া থাকে। কিন্তু ১১টার বেশী কোন পার্টিই থাকে না। নিয়ম না থাকিলেও ছাত্রীদের মধ্যে উহ্য নিয়ম আছে যে ১১ টার পর আর কোন গোলমাল হইবে না। ছাত্রীরা নিজে প্রত্যেক মহলে একজন করিয়া ছাত্রীকে শান্তিরক্ষক পদে বরণ করে। ১১ টার পর কোন গোলমাল হইলে অন্য ছাত্রীরা এই শান্তিরক্ষকের নিকট অভিযোগ করিতে পারে।

কলেজের যতগুলি সমিতি আছে তাহার মধ্যে আলোচনা-সমিতিই সর্ব্বপ্রধান। সমুদায় ছাত্রীবৃন্দ এবং কলেজের কর্ম্মচারিণীগণ ইহার সভ্য এবং বৎসরের প্রথমে নির্ব্বাচিত একজন প্রেসিডেণ্ট একজন ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও একটী কমিটি-কর্ত্তৃক ইহার কার্য্য সম্পন্ন হয়। আলোচনার দিন স্থির করা—এবং প্রস্তাবিত বিষয় সকলের মধ্য হইতে কোন গুলি আলোচনা হইবে তাহা নির্ব্বাচন করা ইহাদের কাজ। যিনি ইচ্ছা প্রস্তাব প্রেরণ করিতে প্রতিবাদ করিতে পারেন। যখন এই প্রেরিত প্রস্তাব গুলির মধ্যে কোনটি আলোচনা হইবে তাহা নির্ব্বাচনার্থে কমিটীর অধিবেশন হয় তখন ছাত্রীদের মধ্যে অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মে। আলোচনা দিনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রস্তাব নির্ব্বাচন করা হয়। প্রস্তাবকারী এবং প্রতিবাদকারী উভয়েই তাঁহাদের বক্তৃতা স্থির করিবার এক সপ্তাহ সময় প্রাপ্ত হয়েন। আলোচনার দিন প্রায় শনিবারে ধার্য্য হয় এবং সেই দিন ৭টার সময় কেম্‌ব্রিজ মহিলাগণকে ও গির্টিনের ছাত্রীগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। উত্তর হলের প্রশস্ত ডিনার গৃহ আলোচনার দিন লোকে পূর্ণ হইয়া যায়। একদল ছাত্রীর হস্তে অন্যান্য ঘর হইতে চৌকী আনা ও ঘর সাজানর ভার ন্যস্ত করা হয়। ঘরের একপাশে একটী উচ্চস্থানে প্রেসিডেণ্ট আসন গ্রহণ করেন তাঁহার নিম্নে ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং সেক্রেটরী আসন গ্রহণ করেন এবং নিকটেই কলেজের প্রিন্সিপল প্রভৃতি মাননীয় কর্ম্মচারিণীগণ উপবেশন করেন। প্রথম গত আলোচনার কার্য্য বিবরণ সেক্রেটরী কর্ত্তৃক পঠিত হয়। তাহার পর সমিতি সংক্রান্ত কোন কার্য্য থাকিলে তাহা সম্পন্ন করা হয়। এই কার্য্য গুলির পর

প্রস্তাবকারী ও প্রতিবাদকারী উভয়েই নিজ নিজ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা সম্বন্ধে যিনি যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কিন্তু কেবল প্রস্তাবকারী ও প্রতিবাদকারী ভিন্ন কেহ ১০ মিনিটের অধিক কথা কহিবার সময় পান না। নানা বিষয়ক এবং নানা ধরণের প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। গত কয়েক বৎসরের প্রস্তাব হইতে বাছিয়া নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

"যে জীবনে অবসর নাই সে জীবন অপব্যয়িত"। ইহার স্বপক্ষে অল্প সংখ্যক ভোট বেশী হইয়াছিল।

* * * * *

"সভ্যজাতিদিগের মধ্যে যুদ্ধ কখন ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে না।" অগ্রাহ্য।

"আমাদের দিদিমাদের চেয়ে আমরা ভাল।" গ্রাহ্য। (দিদিমারা সেখানে থাকিলে মুস্কিল হইত।)

"বর্ত্তমান সময়ে সাদাসিদে খাওয়া উচ্চ চিন্তার সহায়তা করিবে।" গ্রাহ্য।

"এখন শিক্ষকদের যেরূপ শিক্ষা হয় তাহা উপযুক্ত নহে।" অগ্রাহ্য।

লেণ্টের সময় দুইবার গির্টন কলেজে দুইটী কলেজ সম্মিলনী আলোচনা খুব উদ্যমের সহিতআলোচিত হইয়াছিল।

একটী, মানুষকে কোন সৎকর্ম্মের জন্য দেব ভাবে পূজা করা পূজক এবং পূজ্য উভয়েরই ক্ষতি কারক।

আর একটী, কলেজজীবনে চরিত্রের নিঃস্বার্থ ভাবের হ্রাস হইয়া স্বার্থপরতার বৃদ্ধি হয়।

দুইটী প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হইল। নিউহামে সাধারণ আলোচনা দিনে প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক সভা ভঙ্গ করা হয়। প্রতিবাদবক্তৃতা শেষ হইলে প্রেসিডেণ্ট প্রস্তাবকারীকে তাহার প্রত্যুত্তর দিতে বলেন এবং তাহার পর সকলের মত সংগ্রহ করিয়া প্রস্তাবের ফলাফল নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহার পর ছাত্রীদের নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদে সে সন্ধ্যা কাটিয়া যায়।

আর একটী প্রধান সভা রাজনৈতিক সভা। প্রত্যেক সোমবার রাত্রিতে দক্ষিণ হলে মেয়েদের রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হয় এবং ইহাতে কেবল মাত্র রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হয়। এই "মাননীয় সভা"র (সভ্যগণ কর্ত্তৃক এই নামে এ সভা অভিহিত হয়) একঘণ্টা কাল মাত্র অধিবেশন হয়। এই সভায় একজন গোঁড়া বক্তা, গভর্ণমেণ্ট ও তাহার বিপক্ষ দল আছে। বৎসরের প্রথমে কিম্বা পদখালি হইলে ব্যালট দ্বারা একজন প্রধান রাজমন্ত্রী নিযুক্ত হয়। এই রাজমন্ত্রী ও তাঁহার সভাসদগণ কর্ত্তৃক এ সভায় নূতন বিল অর্থাৎ নূতন আইনাদি সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। নূতন

আইনের ভাল মন্দ সম্বন্ধে সভ্যদের মতভেদ হইলে—তিন দিন ধরিয়া ডিনারের পর চা-এর সময় পর্য্যন্ত—মন্ত্রী সভা বসিয়া থাকে।

প্রত্যেক তৃতীয় সোমবারে কেবল গোপনীয় রাজকর্ম্মচারীগণের সভা হয়। সাধারণ সভ্যেরা ইহাতে উপস্থিত থাকিতে পারেন না।

সভার অধিকাংশ সভ্যই উদারনৈতিক। রক্ষণশীল দলের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প কিন্তু মাঝে মাঝে উন্নতিশীল দলের যোগে ইহারা উদার-নৈতিক শাসন ভঙ্গ করিয়া থাকে। গ্লাডষ্টোনের হোম রুল বিল বাহির হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে সভার উন্নতিশীল দলেরা একটী হোম রুল বিল আনয়ন করেন কিন্তু উদার-নৈতিক দল কর্তৃক পরাজিত হয়েন। এ সভার সভ্যগণের রাজনৈতিক বিষয়ে এত উৎসাহ যে খার্টুম যুদ্ধের খবর সংবাদ পত্রের আগে তারে পাইবার জন্য—সে সময় এ সভা ইংলণ্ডে একজন স্ত্রী এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। একদিন মাননীয় সভার অধিবেশন কালে টেলিগ্রাম আসিল গর্ডন বোধ হয় এখনও সহরে দুর্গে আছেন। ছাত্রীদের আনন্দ উৎসাহ আর দেখে কে? প্রায় অধিকাংশ ছাত্রীই রাজনৈতিক সভার সভ্য।

রাজনৈতিক সভার পর সঙ্গীত সভা প্রধান। রাজকলেজের অরগান বাদক প্রত্যেক সপ্তাহে এখানকার বাজনার তত্ত্বাবধান করেন। ছাত্রী সংখ্যা প্রতি বৎসর সমান থাকে না কিন্তু মোটের উপর অনেকে সঙ্গীত ও বাদ্য শিক্ষা করে। অনেক ছাত্রী ইউনিভারসটীর সঙ্গীত বিজ্ঞানের লেকচর শুনিতে যান কিন্তু এপর্য্যন্ত মোট একজন ছাত্রী সঙ্গীতই একমাত্র শিক্ষার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন ছাত্রী নিউহাম ও ইউনির্ভার্সিটী দুই স্থানেই সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করে।

ইহা ভিন্ন মাসে মাসে "আধুনিক ভাষা" ঐতিহাসিক 'সাহিত্য' 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' নীতি বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক সভা হয় ও তাহাতে লেখা রচনা প্রভৃতি পাঠ করা হয়। একটী পারিবারিক সভা আছে প্রতি রবিবার সন্ধ্যা বেলায় ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। তাহা ভিন্ন আর একটী শিক্ষা সমিতি আছে, তথায় শিক্ষা সম্বন্ধীয় রচনা পাঠ করা হয়। এই সব সভা ভিন্ন প্রতিদিন ইংরাজী পড়া জর্ম্মান নাটক পড়া ব্রাউনিংয়ের কবিতা পড়া এই সকলের জন্য মাঝে মাঝে যে কত সভা হইতেছে এবং দুদিন পরে আবার উঠিয়া যাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। এ রকম চুটকী সভার মধ্যে একটী মাত্র সভা স্থায়ী হইয়াছে। এ সভার নাম 'অপারক সভা' এবং ইহার নিয়ম গুলিও নিতান্ত অদ্ভুত। ডিনারের পর সভার প্রত্যেকে একটা কাগজে একটী প্রস্তাবের নাম ও আর একটা কাগজে আপনার নাম লিখিয়া এই কাগজ গুলি লইয়া প্রেসিডেণ্টের গৃহে উপস্থিত হয়। প্রেসিডেণ্ট প্রস্তাবের নামাঙ্কিত কাগজগুলি স্বতন্ত্র ও সভ্যদের নামের কাগজগুলি স্বতন্ত্র রাখিয়া প্রথমে প্রস্তাবের কাগজের মধ্য হইতে বিনা

নির্ব্বাচনে একখানি কাগজ টানিয়া লয়েন ও সেই প্রস্তাব টি পড়িয়া বলেন "এই প্রস্তাবটী অদ্যকার আলোচনার বিষয়" তাহার পর দুই মিনিটকাল নীরবে থাকিয়া নামের কাগজ হইতে বিনা নির্ব্বাচনে একটী নাম টানিয়া লয়েন ও এই নামের সভ্যকে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের স্বপক্ষতা করিতে বলেন। তিন মিনিটের কম ৫ মিনিটের অধিক কথা কহিবার নিয়ম নাই। প্রথমের বক্তৃতা হইয়া গেলে নামের কাগজ হইতে আর একটী নাম টানা হয় ও দ্বিতীয় সভ্যকে প্রস্তাবের বিপক্ষে বলিতে বলা হয়। পুনরায় নাম টানিয়া স্বপক্ষে বলিতে বলা হয়। এইরূপে সমুদয় নাম শেষ হইলে সকলের মতামত সংগ্রহ করিয়া ফল ঠিক হয়। এই সভায় অদ্ভুত অদ্ভুত হাস্য জনক বিষয়ও বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত আলোচিত হয়। একবার সভার প্রস্তাব ছিল "এই সভার মতে কার্য্য উদ্ধারার্থে অল্প ও নিয়মিত বেতনে কনসারবেটীভ ভাড়া করা রাজনৈতিক সভার পক্ষে সুবিধাজনক।"

এই সভার একটী বিশেষ হাস্য জনক অঙ্গ আছে। যে ছাত্রীদের নাম ডাকা হয় তাহাদের মধ্যে অনেকে কিছুই বলিতে পারেনা। দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে দুইচারিবার 'মহাশয়া' 'মহাশয়া' বলে, তাহার পর প্রেসিডেণ্ট গম্ভীর ভাবে বলেন "মাননীয়া সভ্য মহাশয়াকে জানাইতেছি যে তিনি তিন মিনিট কাল বক্তৃতা করিয়াছেন" সময় ফুরাইয়াছে, বেচারী অপ্রস্তুত হইয়া বসিয়া পড়ে, অন্যান্য ছাত্রীরা হাসিয়া অস্থির হয়। বক্তৃতা করিবার একটা সহজ উপায় এই, প্রস্তাব সম্বন্ধে যথার্থ যাহা মনের ভাব তাহা মনে করিয়া বলা। ভাগ্য দোষে যদি মনের ভাবের বিরুদ্ধই বলিতে হয়—তবে প্রথমত নিজের মত বলিয়া সময় ফুরাইবার কালে বলিতে হয়—আমি যাহা বলিলাম আমার বিপক্ষেরা এই কথা বলিতে পারেন—কিন্তু স্বপক্ষে বলিবার ইহা অপেক্ষা বেশী আছে, কিন্তু আজ আর দেখছি সময় নাই সুতরাং এখন তাহা বলা হইল না।

শীতকালের রাত্রিতে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে উত্তর হলে ছাত্রীদের নৃত্য হয়। মধ্যে মধ্যে ছাত্রীরা আপনাদের মধ্যে ফ্যান্সি-বলও করিয়া থাকে। বলের ঠিক আগের দিন রাত্রে বলের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সুতরাং সাজ সজ্জায় সময় নষ্ট করার দিনও থাকে না। কিন্তু তবুও তাহাদের সাজ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অগ্নিদাহ-নিবারণের জন্যও কলেজে যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে। এজন্য উভয় হলের ছাত্রীগণ অগ্নি-সৈনিকের কার্য্য শিক্ষা করেন—এবং নিয়মিত অভ্যাস রাখেন। কখনও কখনও এই অভ্যাসের সময় ভয়াত্মক কারণ জ্ঞাপনকারী শিঙ্গাও বাজান হইয়া থাকে। এই সৈনিক দলের কাপ্তেন ও সহকারী নিযুক্ত আছে। একবার একজন সহকারী, ছাত্রীদের পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না দিয়া, শিঙ্গাটা বাজে কি না দেখিবার জন্য শিঙ্গা বাজাইয়াছিলেন। সমুদয় কলেজে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছিল।

বাড়ীর বাহিরের আমোদের মধ্যে টেনিস এবং ফাইফ খেলাই প্রধান, কিন্তু

ফাইফ খুব কম জন খেলে। কলেজে টেনিস খেলার একটী সভা আছে তাহার সভ্যরা গির্টন কলেজের সভ্যদের সহিত প্রতি বৎসর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উভয়ের মধ্যে একটী রূপার বাটী বাজী থাকে। ইহা ভিন্ন গির্টন ও নিউহামের ছাত্রীরা একত্রে, লেডী মার্গারেট ও সমারভিল হলের ছাত্রীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ক্রীড়া করে। নিউহামের উত্তর হল ও দক্ষিণ হলের ছাত্রীরাও পরস্পর ক্রীড়া করে; ইহাতে তাহাদের সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি হয়। দুইটী হলের ছাত্রীদের মধ্যে বন্দোবস্তের কোন বিভিন্নতা নাই, এবং লেকচর সভা নৃত্য গীত প্রভৃতিতে সর্ব্বদাই ইহাদের মধ্যে দেখা শুনা কথাবার্ত্তা হয়। কিন্তু তবুও যে ছাত্রী যে বাটীর সেই বাটীই তাহার অধিক প্রিয়। দুইটী বাটীরই ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সুবিধা আছে। দক্ষিণ হলে পুস্তকাগার, ব্যায়ামক্ষেত্র এবং রাসায়নিক গৃহ আছে, উত্তর হলে লেকচর গৃহ সর্ব্বাপেক্ষা বড় খাবার ঘর এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টেনিস খেলিবার স্থান আছে। দক্ষিণ হলের ছাত্রী সংখ্যা এখন ৪০, উত্তর হলের ৫৩ এবং লাল বাড়ীর ২০। নূতন হলে ৫০ জনের উপযুক্ত স্থান হইবে। নূতন হল ও উত্তর হলের মধ্যে একটী ঢাকাঢোকা পথ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কলেজের বহির্ভূত ছাত্রী অর্থাৎ পিতা মাতার সহিত বাসকরে এরূপ ছাত্রী ও ৩০ বৎসরের অধিক ছাত্রীও অনেক আছে। ৩০ বৎসরের অধিক বয়স্কা ছাত্রী কলেজে লওয়া হয় না, ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস প্রিন্সিপল নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। আমেরিকা ও অন্যান্য উপনিবেশ হইতেও অনেক ছাত্রী আসে। কবিবর লংফেলোর কন্যাগণ অনেক দিন এই কলেজে ছিলেন। যে সকল শিক্ষা ও পরীক্ষার কথা বলিলাম তাহা অন্য স্থানেও হইতে পারে কিন্তু কেম্ব্রিজে বাস করাই যে ছাত্রী-দের শিক্ষার কতদূর সহায়তা করে তাহা বলা যায় না। ইউনিভার্সিটী সহরে থাকিবার নানা প্রকার উপকার স্বীকার করিয়াও যাঁহারা স্ত্রীলোকদের জন্য দূরে কলেজ স্থাপন করিতে চাহেন শুধু লেকচর ও পরীক্ষার দ্বারা যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না ইহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। পুরাতন কাহিনী ও মহৎ লোকদের স্মরণ চিহ্ন যুক্ত ঐতিহাসিক স্থানে বাস করাতেই যে মনে কত উৎসাহ জন্মে সে কথা তাঁহারা চিন্তা করেন না। রগবী কলেজ সম্বন্ধে আরনল্ডের মনে প্রধান দুঃখ এই ছিল যে এটন বা উইনচেষ্টারের ন্যায় তাহার কোন ঐতিহাসিক কাহিনী নাই।

স্ত্রীলোকেরা অনেক কাল হইতে কলেজের স্থাপয়িত্রী হইয়াছেন কিন্তু এই শতাব্দীতে তাঁহারা প্রথম ছাত্রী হইলেন। সেণ্ট জন; ক্রাইষ্ট, সিডনী, ক্লেয়ার, পেম্ব্রোক ও কুইন্স কলেজ এ সবগুলিই স্ত্রীলোকের প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আপনার পূর্ব্ববর্ত্তিনী স্ত্রীলোকের দানের উপকারের কতক অংশ স্ত্রীলোকদের ন্যায্য প্রাপ্য।

পুত্র এবং কন্যা উভয়েই একস্থলে শিক্ষা লাভ করে ইহা অনেক মাতা পছন্দ করেন না এবং স্ত্রী পুরুষের কলেজ এত কাছাকাছি হওয়া একটু অসুবিধা কি না

জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহার উত্তর এই যে কোন অসুবিধা হয় না। ছাত্রীদের কোথাও যাওয়া না যাওয়া সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম নাই। সহরবাসিনী অন্যান্য সাধারণ মহিলাগণের ন্যায় তাহারাও অন্য গির্জ্জায় পদব্রজে গমন করে এবং সাধারণ মহিলারা যেরূপ স্ত্রীপুরুষমিলিত স্থানে বক্তৃতাদি শুনিতে গমন করেন, ছাত্রীরাও সেইরূপ পুরুষ কলেজে লেকচর শুনিতে গমন করেন। অন্য জায়গার বা সহর বাসিনী মেয়েরাও যেরূপ বয়স্কা স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে ক্রেম্ব্রিজে বন্ধু-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান ছাত্রীরাও সেইরূপ প্রিন্সিপল বা শিক্ষয়িত্রীর সহিত বন্ধু দর্শন করিতে যান। তাঁহারা এ সম্বন্ধে ছাত্রীদিগকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ভগিনীকে দেখিবাব জন্য কি তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য ভ্রাতারা নিউহামে আসিতে পারেন কিন্তু অন্য কোন ছাত্রীর সঙ্গে তাহাদের আলাপ হয় না বা দেখা হয় না। ক্রেম্ব্রিজের ঐতিহাসিক আকর্ষণ ভিন্ন, সুশিক্ষিত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের সহিত আলাপ পরিচয় করা ও মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বক্তৃতা উপদেশ ও সঙ্গীত শ্রবণ করাতেও ছাত্রীরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন কলেজের প্রতি এবং যাঁহারা ধৈর্য্যময় পরিশ্রমে কলেজের উন্নতি করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি ছাত্রীদের আন্তরিক ভক্তি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা আছে। এ কলেজের ভিত্তি যে বহু পরিমাণ অর্থের উপর স্থাপিত হয় নাই, কেবল প্রতিষ্ঠাতাদের চরিত্র গুণেই কলেজের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ছাত্রী-দিগের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। ইউনিভার্সিটী যে দিন স্ত্রীলোকদের কলেজে প্রবেশ করিবার অধিকার দেন তাহার স্মরণার্থ প্রতিবৎসর ২৪ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্রীরা আলোকমালায় কলেজ সাজাইয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা যে আনন্দ প্রকাশ করে তাহা হইতেই তাহাদের কলেজের প্রতি ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র নিজত্ব ভুলিয়া সাধারণের উপকারী ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া হৃদয় সংস্কারার্থে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েরই আবশ্যক কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলো-কেরা নিজত্বময় গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রায় এ ভাব বুঝিতে পারেন না।

আমাদের দেশের অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মহীন "বাবু শ্রেণীর" "লোকগণ অধিকাংশ এখনও এরূপ জীবন অবলম্বন করেন নাই ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। বাস্তবিক পক্ষে কোন শ্রেণীর পুরুষকে কর্ম্মহীন বলা যায় না কিন্তু স্ত্রীলোকদের পক্ষে এ কথা খাটে না। গার্হস্থ্য কর্ম্ম ও দরিদ্রদিগকে সাহায্য করার কথা বলা সহজ কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে তাঁহারা (বাবু মেয়েরা') কত সময় দেন ?

নিউহাম কলেজের অনেক ছাত্রীই উচ্চতম স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী এবং তাঁহাদের কলেজ শিক্ষা শেষ হইলে তাঁহারা এই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হইতে ইচ্ছুক। কেহ বা পূর্ব্বেই শিক্ষা দান করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া সেই অর্থে কলেজে পড়িয়া আপনাকে শিক্ষয়িত্রী পদের আরও উপযুক্ত করিতেছেন। উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও কেন এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা করেন না ?

তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর বলিয়া তাঁহাদের উন্নত হাবভাব শিক্ষাদানের আরও উপযোগী, কিন্তু রবিবারিক স্কুলের ইতর শ্রেণীর বালিকাদিগকে ইঁহারা যা শিক্ষা দেন তাহা ভিন্ন ইঁহারা আর কোনরূপ শিক্ষাদান মানহানিকর বিবেচনা করেন। কিন্তু দুদিন পরে আর এরূপ থাকিবে না, যত উচ্চ শ্রেণীর মহিলা হউক না কেন পুরুষদের ন্যায় শিক্ষকতা করা তাঁহাদেরও মাননীয় কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পরে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া দুই তিন বৎসর কলেজজীবনের আরও উপকার আছে। বই পড়া বিদ্যা ভিন্ন এখানে অন্যরূপ অভিজ্ঞতা, আত্মনির্ভরতা ও সহানুভূতিও লাভ করা যায় এবং এইরূপে ভিন্ন প্রকৃতির নানা মহিলাগণের সঙ্গে একত্রবাস হেতু আপনার একটা স্থিরমত হয়। কলেজে যেমন আপনার গুণেই আপনার আদর আর কোথাও সেরূপ হয় না। বাড়ীতে মেয়েরা, ডাক্তার বা ধর্ম্মযাজক বা জমীদার কন্যা এবং পিতার পদনুসারে লোকের নিকট আদৃত ও পরিচিত কিন্তু কলেজে তাহার বংশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। তাহার নিজের চরিত্র স্বভাব ও গুণ অনুসারে লোকের নিকট আদৃত। এরূপ হওয়া খুব শুভ ফল প্রদ। ইহাতে যে বংশের উচ্চতা রক্ষার প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইতেছে তাহা নহে কিন্তু কলেজ জীবনে বংশের উচ্চ নিম্নতায় কোন প্রভেদ হয় না ইহাই বুঝাইতেছে। ছেলেদের কলেজ অপেক্ষা নিউহামে এ ভাব অধিক, কারণ ছেলেদের কলেজে বড় মানুষদের একটা দল আছে এবং সাধারণ বালকেরা প্রায়ই তাহাদের সহিত আলাপ করে না। নিউহামে তাহা হয় না এবং ছেলেদের কলেজ অপেক্ষা এখানকার জীবন সরল ভাবে নির্ব্বাহিত হয়—কেননা আপাততঃ নিউহামের সমুদয় ছাত্রীই যথার্থ শিক্ষার উদ্দেশে তথায় বাস করিতেছে।

অনেকেরু ভয় হয় পাছে কলেজের শিক্ষায় মেয়েরা অহঙ্কারী হয়। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা অল্পশিক্ষা ভয়ঙ্করী এ কথার যথার্থতা প্রমাণ হইয়াছে। পরিবারস্থ চতুরা বুদ্ধিমতী বালিকাই এদোষে অধিক দোষী। আপন আত্মীয় মধ্যস্থিতা যে বালিকা কাগজে একটা গল্প লেখে বা স্থানীয় কোন পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রশংসা লাভ করে সেই অহঙ্কারস্ফীতা হয় কিন্তু একজন কলেজের ছাত্রী যে জানে যথার্থ কাজ কি কষ্ট সাধ্য, যাহার চোখের উপর সর্ব্বদা বড় লোকদের জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় ভাসিতেছে সে আপনাকে এরূপে বড় মনে করিতে পারে না। পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেই যে লোকের ভালবাসা লাভ করা যায় তাহাও নহে। পরিশ্রম পূর্ণ কর্ম্মের সকলেই আদর করে এবং এই আদর লাভ করাই পরিশ্রমের প্রধান বাঞ্ছিত ফল। কিন্তু বাহিরের চাকচিক্য অপেক্ষা অন্তরের মাধুরী এত মনোহর যে শুধু বিদ্যাবতী রমণীর জন্য গুণবতী রমণী কখনও অনাদৃত হইবে না।

ছাত্রীদের মনের ভাব ভাল। তাহারা নিজের উন্নতির জন্য আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম, অন্যের উন্নতি লাভে আন্তরিক আনন্দ ও পরকে সাহায্য করিতে আন্তরিক

চেষ্টা করে। পড়া শুনা ভিন্ন অন্য বিষয়েও ছাত্রীদের যথেষ্ট বুদ্ধি দেখা যায়। সাধারণ মেয়েদের ন্যায় সাজ সজ্জার কথোপকথন করিতে ছাত্রীরা মোটেই ভালবাসে না এবং তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার জ্ঞান পূর্ণ আলোচনার কথাবার্ত্তা শোনা যায়। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ছাই ভস্ম কথাও অনেক থাকে কিন্তু তাহাতে পর-নিন্দার সম্পূর্ণ অভাব। কলেজ-ছাত্রীদের বয়স স্কুলের বালিকাদের ন্যায় অল্প নহে কারণ ১৮ বৎসরের নিম্ন বয়স্কা বালিকা কলেজে গৃহীত হয় না। অধিক যত ইচ্ছা হউক তাহাতে ক্ষতি নাই। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর হলের ছাত্রীদের বয়স গড় পরিমাণে ২২ এবং দক্ষিণ হলের ২৪ বৎসর হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা অধিক বয়স্কা অনেক ছাত্রীও কলেজে আছে।

আর একটি কথা। কলেজগুলি কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত নহে বলিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের কলেজের প্রতি আস্থা নাই এবং সাধারণেরও বিশ্বাস যে এক জন অল্প বুদ্ধি বালিকার এই নানা বিভিন্ন ধর্ম্ম ভাবাপন্ন আবাসে তিন বৎসর কাল বাস করিয়া নিজের ধর্ম্মমতের স্থিরতা রক্ষা করা সহজ কথা নহে।

নিউহাম যে কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত নহে এ কথা সত্য, আর নিউহাম কলেজের প্রতিষ্ঠা বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কোন বিশেষ সম্প্র-দায় ভুক্ত হওয়াও ইহার পক্ষে সম্ভব নহে। অন্যান্য পুরাতন কলেজগুলিও কোন সম্প্রদায় ভুক্ত নহে, সুতরাং বিশেষ কোন সম্প্রদায় ভুক্ত না হওয়া যদি দোষ হয় তবে সমুদয় কলেজই দোষী। এ কলেজ বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় ভুক্ত নহে বলিয়া যদি ছাত্রী-দের মধ্যে ধর্ম্মভাবের কোন অভাব পরিলক্ষিত হইত তাহা হইলে ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধারণ উভয়েরই ভয়ের কারণ থাকিত কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা তাহার বিপরীত প্রমাণ হয়। বিরোধী মতের সংস্পর্শে মতের স্থিরতা দূরীকৃত হইবার পরিবর্ত্তে আরও তাহা স্থির, পরি-ষ্কার ও দৃঢ় হয়। এই বিরোধী মতের সংস্পর্শে পরে আসিতে হইবে, সংসার ক্ষেত্রে নানা মতের লোকের পাশা পাশি দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হইবে। পরস্পর পরস্পরের এই ভিন্ন ধর্ম্মমত মার্জ্জনা চক্ষে না দেখিতে পারিলে সংসারে শান্তি থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের ইহা অবশ্য শিক্ষনীয় ভাব। পরে যাহা করিতে হইবে কলেজ হইতেই তাহা শিক্ষা করা ভাল কারণ এখানে সকলেরই এক উদ্দেশ্য, সকলেরই জীবন এক সূত্রে গ্রথিত সুতরাং পরস্পরের দোষও অন্যস্থান অপেক্ষা সহজে মার্জ্জনীয়। আর একটী কথা এখানে বলিয়া রাখি, এইরূপ অসাম্প্রদায়িকতা বশতঃ যাহাতে ছাত্রী-দের ধর্ম্ম ভাবের হানি না হয় সে জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ও সতর্ক এবং কোন ছাত্রী কলেজে প্রবেশ করিলেই সে কোন সাম্প্রদায়িক উপাসনালয়ে যাইবে তাহা প্রিন্সিপলকে জ্ঞাত করিতে হয়। দুই চারিজন অজ্ঞেয়তাবাদী আছে একথা সত্য, কিন্তু সাধারণ সমাজেও যেমন কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করে না কলেজেও কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করে

না এবং ইহারা জোর করিয়া অন্যকে আপনার মতে আনিতে চেষ্টা করা দূরে থাক অন্যদের মতকে মান্য ও শ্রদ্ধা চক্ষে দর্শন করে। এইরূপ গভীর বিষয়ে ছাত্রীরা কথায় কথায় তর্ক করে না এবং সাধারণ সম্মতিক্রমে কোন সাধারণ আলোচনা বা বক্তৃতায় ধর্ম্ম কথা আনা হয় না। আপনাদের মধ্যেও ধর্ম্ম তর্ক খুব কম হয়। প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন রূপ সন্দেহ বা কথা মনে উদয় হয় না এরূপ প্রকৃতির একজন ছাত্রীর সঙ্গে তিন বৎসরের মধ্যে কাহারও হয়ত ধর্ম্ম তর্ক উপস্থিত হইবে না। কিন্তু যাহারা একটু চিন্তাশীলা, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহাদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয় তাহাদের মধ্যে কথন কথন ধর্ম্ম তর্ক উপস্থিত হয় এবং ইহা দ্বারা নিজ নিজ মত এরূপ দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে যে লোকের কথায় তাহা টলিবার সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ চিন্তাশীলা বালিকাদের কলেজে একটী উপকার হয়, তাহারা আপনাকে একজন বিশেষ ব্যক্তি মনে করে না। বাড়ীতে সকলেই একধর্ম্মে পালিত হইলেও তাহারই মনে কেবল হয়ত এই সন্দেহময় প্রশ্ন উদয় হইত কিন্তু কলেজে সে আপনার মত অনেককে দেখিতে পায়, যে সব লোকের উপর তাহার বিশেষ আস্থা আছে যাহারা তাহার অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়াছে যাহাদের অভ্রান্ত বুদ্ধির উপর তাহার স্থির বিশ্বাস, তাহাদিগকে বিনা প্রশ্নে চলিত ধর্ম্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাহাদের সন্দেহ লোপ পায়, ধর্ম্মভাব দৃঢ় হয়।

আমি তিন বৎসর নিউহাম কলেজে থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি' তাহাই লিখিলাম. আশা করি ইহা দ্বারা সকলের এই উপকারী কলেজের প্রতি শ্রদ্ধা হইবে।

বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্যের গুণানুসারে শিশুদিগের জীবনী-শক্তির কি প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি হয় জর্ম্মানিতে তাহা অনুসন্ধান করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক বৎসর বয়স্ক শিশুগণের মধ্যে যাহারা মাতৃ দুগ্ধপালিত তাহাদিগের শত করা ১৮·২ জনের মৃত্যু হয়, যাহারা ধাত্রী দুগ্ধপালিত তাহাদের মধ্যে শত করা ২৯·৩৩ জনের মৃত্যু হয়, যাহারা অন্য দুগ্ধপালিত তাহাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন ও জর্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে পিতৃ মাতৃ হীন অনাথ শিশুদিগের প্রতিপালন জন্য যে শিশু-আবাস আছে সেই শিশু আবাস পালিত শিশুদিগের মধ্যে শত করা ৮০ জনের মৃত্যু হয়।

এতদ্ভিন্ন ১০০০ সুখ সচ্ছন্দতাসম্পন্ন ও ১০০০ দরিদ্র শিশুদিগের আয়ুকালের নিম্ন প্রকার প্রভেদ দেখা গিয়াছে। জন্মের ৫ বৎসর পরে স্বচ্ছন্দ অবস্থাপন্ন ১০০০ শিশুর

৯৪৩ জন আর দরিদ্র শিশুদের মধ্যে ৬৫৫ জন জীবিত ছিল। ৫০ বৎসর পরে স্বচ্ছন্দ অবস্থা-দিগের ৫৫৭ জন ও দরিদ্রগণের ২৪৩ জন জীবিত ছিল। ৭০ বৎসর পরে স্বচ্ছন্দ অবস্থাপন্ন ২৩৫ জন ও দরিদ্র ৬৫ জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ইহা হইতে গড়ে স্বচ্ছন্দ-অবস্থা-ব্যক্তিদের জীবনের পরিমাণ ৫০ বৎসর ও দরিদ্রের জীবনের গড় পরিমাণ ৩২ বৎসর নির্দ্ধারিত হয়।

লিমোজেশ-কৃষি সমিতির সভ্য এম রাফোর্ড রেড়ী গাছের একটী নূতন গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন। একদিন একটী মক্ষিকা পূর্ণ গৃহে একটী রেড়ীর গাছ আনিবা মাত্র মক্ষিকাগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া রাফোর্ড দেখিলেন বেড়ীর গাছের তলায় অনেকগুলি মরা মাছি পড়িয়া আছে, এবং গাছের পাতায় অনেক মৃত মাছি এখনও লাগিয়া আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে রেড়ীর পাতা হইতে কোন প্রকার তৈলবৎ পদার্থ বাহির হইয়া থাকে ও এই পদার্থ কীটের জীবনহানিকর। উদ্যানে দুই চারিটী রেড়ী গাছ রোপণ করিয়া নানাবিধ কীটের উৎপাৎ হইতে উদ্যানস্থ ফল ফুলকে বোধ হয় রক্ষা করা যায়।

বটস্ প্রদেশে মূল্যবান করণ্ডাম প্রস্তরের একটি খণি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হীরক ভিন্ন অন্যান্য সমুদয় প্রস্তর অপেক্ষা ইহা কঠিন। দেখিতে চুণির ন্যায় এবং উজ্জ্বল পালিসের উপযোগী।

কোন সূর্য্যকর-আলোকিত বরফাচ্ছাদিত ভূমিতে কয়েক ঘণ্টা থাকিলেই ক্ষণকালের জন্য বর্ণ-ভেদ জ্ঞান লোপ পায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমুদয় দ্রব্য সবুজবর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

ড্যাকোটা নগরে একটী অতি গভীর কৃত্রিম কূপ আছে। প্রথম ইহার ৫৬০ ফুট খনন করিয়া লবনাক্ত জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরও ২০ ফুট নিম্নে আবার একটী স্থানে লবনাক্ত জল পাওয়া যায়। ৬০৪ ফুট খনন করিবার পর একটী স্থানে লবনহীন কিন্তু বালি মিশ্রিত জল উঠে। এখন ৬৭৫ ফুট নিম্ন হইতে অধিবাসীগণ পরিস্কার জল পাইতেছেন।

নিউজীলাণ্ড অন্তর্গত অপোটিকি নগরের একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ধরাশায়ী হওয়াতে একটী আশ্চর্য্য বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গাছটীর গোড়ার ফাঁপাস্থান মনুষ্য কঙ্কাল পূর্ণ ছিল। গাছটী পড়িয়া যাইবা মাত্র তাহা হইতে রাশিকৃত কঙ্কাল বাহির

হইয়া এক আশ্চর্য্য কাণ্ড উপস্থিত হইল। কঙ্কালগুলির কতকগুলি সম্পূর্ণ আছে কতকগুলির হস্ত পদ মাথা প্রভৃতি স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা এ বিষয়ের কিছু মাত্র অবগত ছিল না। গাছটীর আকৃতি দেখিয়া বোধ হয় শত শত বৎসর পূর্ব্বে এ দেহ গুলি ইহার নিম্নে রক্ষিত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর উপর দিয়া যে টেলিগ্রাফের তারটী টাঙ্গান আছে পৃথিবীর মধ্যে সেইটী সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়তন-তার। ইহার দৈর্ঘ্য ৬০০০ ফুটেরও অধিক এবং ১২০০ ফুট উচ্চ দুইটী পাহাড়ের মধ্যে ইহা বিস্তৃত।

বিলাতে এক প্রকার রং আবিষ্কার হইয়াছে তদ্বারা লেপিত কোন দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হয় না। পরীক্ষার জন্য দুইটি কাঠের ঘর তৈয়ার করিয়া একটীতে এই রং ও আর একটিতে সাধারণ রং লেপন করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করা হয়। প্রথমটির রং কেবল কাল হইয়া যায় শেষোক্তটী একবারে দগ্ধ অঙ্গারে পরিণত হয়।

কানেডার চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকার একটী প্রবন্ধে ডাক্তার উড বলিয়াছেন তিনি আহার বন্ধ করিয়া অনেকগুলি বাত রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। রোগের তারতম্য অনুসারে ৪ হইতে ৮ দিন পর্য্যন্ত উপবাসী রাখিয়াছেন, কখনও বা দশ দিনও উপবাসী রাখা আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অধিক সময় লাগে নাই। রোগীরা যত ইচ্ছা জল ও ইচ্ছা করিলে অল্প লেমনেড খাইতে পারে। এই সহজ উপায়ে তিনি ৪০টীর অধিক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাক্তার উডের মতে বাতরোগ পরিপাক শক্তি হীনতা হইতে উৎপন্ন হয় এবং কিছু দিন পাকযন্ত্র ব্যবহার না করিলে এই রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

বার্লিনের বৈজ্ঞানিক সভায় প্রফেসর ক্রিশ্চিয়ান উদ্ভিদ ও জন্তুর মৃতদেহ তড়িৎ সাহায্যে নূতন প্রকারে গিল্টি করিয়া রক্ষা করিবার উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। আলকোহল ও সিলভারনাইট্রেট এই দুই দ্রব্য একত্রে মিসাইয়া তাহাতে একটী পাতা, একটী কাঁকড়া, একটী প্রজাপতি একটী গুবরেপোকা একটী খরগোস একটী গোলাপফুলের কুঁড়ি ইত্যাদি কতকগুলি দ্রব্য ডুবাইয়া লওয়া হইল। তাহার পরে এই গুলিকে শুষ্ক করিয়া তাহাতে ফসফরাস ও সলফারযুক্ত হাইড্রোজন প্রয়োগ করা হইল। তাহার পর তড়িৎ সাহায্যে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় তামা সোণা রূপা প্রভৃতি দ্বারা গিল্টি করা হয়। জিনিস গুলি ঠিক ধাতু প্রস্তুত দ্রব্যের ন্যায় আকার ধারণ করে।

কডলিভার তেলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত যত প্রকার তেল আবিষ্কৃত হইয়াছে, অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী ডং গং নামক একপ্রকার সামুদ্রিক জীবের তৈল তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট। ডং গং তেল কডলিভার তেলের ন্যায় দুর্গন্ধ ও বিস্বাদযুক্ত নহে এবং অধিক দিন ভাল অবস্থায় থাকে।

আমেরিকায় বন্য কাফি নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছ জন্মে। এ গাছ পূর্ব্বে কোন কাজে আসিত না বরং চারিদিকে জঙ্গল উৎপন্ন করাতে চাষের অত্যন্ত ক্ষতি হইত। একজন কাফ্রির একদিন মাঠে দড়ির আবশ্যক হওয়াতে সে এই গাছ কাটিয়া তাহা দিয়া দড়ি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহা দ্বারা পাটাপেক্ষাও ভাল দৃঢ় রজ্জু প্রস্তুত হইল। এখন আর বোধ হয় বন্যকাফি পূর্ব্বেকার ন্যায় অনাদৃত হইবে না।

হেঁয়ালি নাট্য।*

খুড়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রের কথোপকথন।

ভাইপো, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, কাল স্রোতে ভেসে যাই
মাঝা মাঝি এসে শেষে উজানে ফিরিতে নাই।
দেখ নীল সিন্ধু-জলে,
কোটী উর্ম্মি দলে দলে
হাসিতেছে নাচিতেছে ছুটিতেছে কারে চায়ি!
বিমল শারদ নিশি
মধুরে ডাকিছে বাঁশী
ও রবে কে রবে বসি আঁধারে মুখ লুকাই;
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও কাল স্রোতে ভেসে যাই।
আর বাহু পশারিয়া কত,
রোধিবে কবন্ধ মত!

* গত বারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর হাহাকার। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ পাল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী মৃণালিনী দাসী এই উত্তর দিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন 'কেমন' তাহাও হইতে পারে।

তব 'অতীত' পলিত কেশ কে মানে তার দোহাই,
থাকে যদি চক্ষু কাণ
দেখ চেয়ে 'বর্ত্তমান'
রাখিতে তরুণ মান, ভয়ে ভয়ে চলে যাই!
তোমার ঘরে মর্ত্তমান বুড়াটী থাওগে তাই!

খুড়া নিতান্তই যাবি যদি, যারে ধীরে ধীরে,
কাঁটা খোঁচা ময় পথ বিঘন সঙ্কুল,
যেতে যেতে পায় পায় দেখো ফিরে ফিরে,
কি জানি কি ঘটাবি যে মানস আকুল।
জানি না কেমনই মন 'নূতনেতে' রত
রূপ দেখে পুড়ে মরা পতঙ্গের ব্রত!

ভাইপো না, না, ভুলে গিয়ে থাক যদি
খুলে দেখ পাঁজী পুঁথী!
অতি nasty পোকায় কাটা!
জানি তোমার পুঁজী পাটা?
দেখ, আমরা কেমন সশস্ত্র?
তাও রেখেচি মুখস্থ!

'নব বস্ত্র, নব ছত্র, নব্যা স্ত্রী, নুতনং গৃহঃ'
আর কি চাও, ডিয়ার ডিয়ার!
এখন ঘুচলো কি না সন্দেহ?

(বলিয়া প্রস্থানোদ্যত)

খুড়া উঁহুঁ শেষ ভুলেচ, শোন, শোন,
'সেবকান্ন পুরাতনঃ'।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

তৃপ্তি।

'(জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,)

চিরদিনই এই এক অতৃপ্তির গান শুনিয়া আসিতেছি। শত শত প্রাণের অভ্যন্তর হইতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া একসুরে এই বিলাপ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তৃপ্তি যে কেবল রূপেই নাই তাহা নহে, গুণে প্রেমে সুখে কিসে তৃপ্তি আছে? এক কথায় যাহা কিছু সুন্দর তাহার মধ্যেই অতৃপ্তি বিরাজিত। সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে, ফুলের সৌরভ আঘ্রাণে, সুখের মিলনে কবে কাহাকে তৃপ্ত হইতে শোনা গিয়াছে, কে বলিয়াছে যে, আমি ধন, মান, রূপ যৌবনে তৃপ্ত, কে বলিয়াছে আমি ভাল বাসিয়া তৃপ্ত, বাস্তবিক প্রেম যশ ধন মান রূপ যৌবন কিছুতেই তৃপ্তি নাই, এমন কি জ্ঞানেতেও তৃপ্তি দিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সংসারে যে সুখ নাই তাহাও বলা যাইতে পারে না।

যাহা কিছু সুন্দর তাহার মধ্যেই অতৃপ্তি বিরাজিত, তাই যাহা কিছু সুন্দর তাহাই অনন্ত, তৃপ্তি সুখ নহে উহা পার্থিব বস্তু, অতৃপ্তিই সুখ অতৃপ্তি অনন্তের সোপান। আবার সুন্দর অনন্ত, অনন্তই সুন্দর। কিন্তু কুৎসিতের অপেক্ষাও যেমন কুৎসিত দেখা যায়, তেমনি সুন্দরের মধ্যে ও আবার সুন্দর আছে যেমন প্রেম। কতকগুলি সৌন্দর্য্য অনন্ত হইলেও সাময়িক ছেদ বিশিষ্ট, যেমন ফুল, ফুলের সৌন্দর্য্যের মধ্যে অনন্ত-অতৃপ্তি থাকিলেও তাহা শুকাইয়া যাইতেছে ঝরিয়া যাইতেছে, উহা তাহার সাময়িক ছেদ। কিন্তু সুন্দরের মধ্যে সুন্দর আছে প্রেম। প্রেমে ছেদ নাই ক্ষয় নাই প্রেম চিরযৌবনা, এই জ্যোৎস্না লাবণ্যময়ী, বিচিত্র পত্র পুষ্পাভরণা সুনীল নীরদ কুন্তলা ধরণীরও একদিন বার্দ্ধক্য আসিবে, কিন্তু প্রেমের শিশুত্ব ও কল্পনায় আসে না, প্রেম কখনও বুড়াও হইবে না। প্রেম সুন্দরের মধ্যে সুন্দর, প্রেম অনন্ত। সেই জন্যই প্রেমে এত অতৃপ্তি! প্রেম, তাই কি তোমাকে 'কোটী কোটী জনম হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল?' তুমি এক জন্মের আয়ত্তাধীন নও বলিয়া, তুমি অনন্ত বলিয়া তাই কি প্রকৃতি-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ প্রেমিক কবি তোমার উদ্দেশে বলিয়া গিয়াছেন 'লাখে না মিলন এক?' জানি না তুমি কোন মহাযামিনীর সুখ স্বপ্ন!

(ভোগ)

এ জগতে মানুষ চিরদিন সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছে, তবে দুঃখ লোকে যত অধিক ভোগ করিতে পায় সুখ ততটা পায় না,--সুখের অল্পতা এবং দুঃখের আধিক্য ও ইহার কারণ বলিয়া বোধ হয় না, পরম কারুণিক পরমেশ্বর কখনই এত নিষ্ঠুর ও প্রতারক হইতে পারেন না যে, পৃথিবীকে দুঃখ রূপ মৃত্তিকাতে গঠিত করিয়া, উপরে

একটু সুখের ঝক্ ঝকা মুড়িয়া দিয়াছেন। ভোগ কাহাকে বলে? বহুদিন আমরা যাহাতে জড়াইয়া থাকি, যাহার মধ্যে নিমগ্ন থাকি, তাহাই আমাদের ভোগাধীন বা তাহা আমরা ভোগ করিয়া থাকি। আহারীয় বা পানীয় বস্তু প্রভৃতি অতি অল্পক্ষণই আমাদের আয়ত্তাধীন, অতএব উহাকে ভোগ বলিয়া আমাদের তৃপ্তিহয় না, ঈপ্সিত বস্তু জনিত চিন্তা বা তাহার অভাবই আমাদের ভোগ, এই জন্যই সচরাচর আমরা সুখাপেক্ষা দুঃখই অধিক ভোগ করিয়া থাকি।

অভাব দুঃখ, আর ভাব পাওয়াই সুখ। কিন্তু এই ভোগ শব্দের মধ্যে কি দুঃখের রাজত্বই অধিক নহে? পূর্ব্বে বলিয়াছি অনেক সময় আমরা যাহাতে জড়িত থাকি তাহাই ভোগ। এখন দুঃখ আমাদের একবার উপস্থিত হইলে তাহা প্রায় আর ঘোচে না,(এখানে দরিদ্রতা দুঃখের মধ্যে উল্লিখিত হইতেছে না) সুতরাং উহা আমরা যাবজ্জীবন ভোগ ও করিয়া থাকি, আমরা পাইলে যতটা পাই, না পাইলে তাহার অধিক পাইয়া থাকি, এই জন্যই আমরা দুঃখ ছাড়া তিলার্দ্ধ নই, সুতরাং দুঃখই অধিক ভোগ করিতে পাই, সুখ ততটা নয়। তবে মনুষ্য মনুষ্যকে নাকি কখন সম্পূর্ণ রূপে পাইতে পারে না, সেই জন্যই আমরা পাইলেও একেবারে ভোগ হইতে বঞ্চিত হই না! লোকে বলে আহা অমুকের অমন স্ত্রী পুত্র বা স্বামী পুত্র ভোগ হইল না, অসময়ে বিসর্জ্জন দিয়াছে! (বিসর্জ্জন দেওয়া যে দুঃখ তাহার ত কথাই নাই?) কিন্তু যে যায় সে ত আপনাকে কতকটা রাখিয়া যায়? অবশিষ্ট যে টুকু লইয়া যায় তাহা আমাদের দর্শনাতীত অন্ধকারের মধ্যেই সে ভোগ করে কি না করে, তাহা কে জানে? কিন্তু যে থাকে, সেত পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী পরিমাণে ভোগ করে, এক ব্যক্তির চিন্তা তুমি যতক্ষণ করিতেছ ততক্ষণ কি তাহাকে ভোগ করিতেছ না? এখন এই ভোগ সুখ কি দুঃখ, তাহা কি বলিতে পারা যায়?

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বেদান্ত দর্শনের নূতন প্রকাশ।

সম্প্রতি বেদান্ত দর্শন--ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর-ভাষ্য ভামতী টীকা ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সমেত—পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ও তাহার কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট পরিতোষ লাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ ইহার প্রকাশক এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ ইহার বাঙ্গালা ব্যাখ্যার প্রণেতা। এ গ্রন্থখানি কবে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইবে তাহার প্রতীক্ষায় আমরা সতৃষ্ণ-

নয়নে পথ চাহিয়া রহিলাম; কেননা এ প্রকার সারগর্ভ গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় অতীব বিরল। অনেক দিন হইল স্বর্গস্থ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বেদান্ত দর্শন বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশ করিয়াছিলেন—অথবা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন – ঠিক্ স্মরণ হইতেছে না; যাহাই হউক্—তাঁহার বাঙ্গালা অনুবাদ নিতান্তই ভট্টাচার্য্যি ধরণের—তাহাতে এক বিন্দুও রস কস নাই। বর্ত্তমান বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঠিক্ তাহার বিপরীত; তাহার ভাষা এমনি সুন্দর—এমনি পরিষ্কার প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধ যে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। শিখা-লাঞ্ছিত ব্যাখ্যা কর্ত্তাদিগের হস্তে পড়িয়া, সহজ বিষয় প্রায়শই কঠিন হইয়া উঠে—কঠিন বিষয় সহজ হইয়া উঠিতে বড় একটা দেখা যায় না; কিন্তু এবারে ঠিক্ তাহার বিপরীত;—দর্শন-শাস্ত্রকে যাঁহারা ব্যাঘ্র-ভল্লূক মনে করেন তাঁহারা যদি আমাদের পরামর্শ শোনেন—তবে একবার বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কোন-একটি দার্শনিক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, ইহার অধিক আমরা আর কিছু বলিতে চাহি না। বেদান্তবাগীশ মহাশয় এ যেরূপ বৃহৎকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন—ইহা সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারই সদৃশ কার্য্য; আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তাঁহার মহৎ সংকল্প অচিরে কার্য্যে পরিণত হইয়া আমাদের দেশের প্রাচীন জ্ঞানের চিরাবরুদ্ধ উৎস পুনরায় নূতন উদ্যমের সহিত উৎসারিত হউক্ – ও স্বীয় পুণ্য স্রোতে দেশ বিদেশ প্লাবিত করুক্।

বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রতি একটি কথা আমাদের সবিনয়ে বক্তব্য, সেটি এই ;—আর আর ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় তিনিও যেন বেদান্ত দর্শনের দুর্গম পথকে দুর্গমতর করিয়া না তোলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক এরূপ কার্য্য ঘটিবার সম্ভাবনা অতীব বিরল—কিন্তু একটি স্থানে তাহা ঘটিয়াছে; অনবধানতা-গতিকেই হউক—অথবা ভাব-প্রকাশের অসম্পূর্ণতা দোষেই হউক্—তাহা ঘটিয়াছে,—শুদ্ধ কেবল একটি স্থানে এরূপ হইয়াছে—তদ্ভিন্ন আর কোন স্থানে নহে। আমাদের মতে গ্রন্থারম্ভ-স্থলে তিনি নিম্ন-লিখিত কথাগুলি না বলিলে ভাল করিতেন, যথা; তিনি বলিয়াছেন

"অহংবৃত্তিব প্রতি বিশ্বাস কি? উহা কখনো দেহাদি অবলম্বন করিয়া উদিত হইতেছে কখন বা কেবল মাত্র চৈতন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেছে।"

অহম্বৃত্তিকে যদি বিশ্বাস নাই তবে চৈতন্যকেই বা বিশ্বাস কি—আত্মাকেই বা বিশ্বাস কি? কেননা, "অহং" এই প্রকার ভাবনা আত্মার অস্তিত্বের একমাত্র পরিচায়ক—তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় পরিচায়ক নাই। ফরাশীশ দেশীয় দর্শনকার দেকার্ত্তের এই বচনটি সমস্ত ইউরোপময় প্রসিদ্ধ যে, I think therefore I am, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার আপনার ভাবনাই আমার আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি যদি আপনি আমাকে "অহং" বলিয়া না জানি, তবে শত-কোটি ব্যক্তি আমাকে "অহং" বলিয়া ভাবনা করিলেও তাহাতে আমার আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অহম্বৃত্তি-ছাড়া আত্মা,

আর, লক্ষীছাড়া লক্ষী দেবী, দুইই সমান। শুধু কি কেবল ফরাসীস দেশীয় দেকর্ত্তা ঐরূপ কথা বলিয়াছেন—আমাদের দেশের কোন গ্রন্থকার কি ওরূপ কথা বলেন নাই? বিজ্ঞান ভিক্ষু তাঁহার সাংখ্য-সারে বলিয়াছেন "দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতি ধী-বলাৎ" "আমি জানি" এইরূপ বুদ্ধি-বলেই (এক কথায় —অহংবৃত্তির বলেই) আত্মা সিদ্ধ হয়। শঙ্করাচার্য্য নিজে কি বলিয়াছেন? বেদান্তবাগীশ মহাশয় শঙ্করাচার্য্যের নিম্নলিখিত কথাটি ঠিক্‌ই লিখিয়াছেন, যথা;—

"আত্মা যখন "অহং" "আমি" এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাহাকে একান্ত অবিষয় বলা যায় না, এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও যায় না।"

কিন্তু এই সোজা কথাটির তিনি এরূপ ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাহাতে শঙ্করাচার্য্যের অধ্যাসবাদের পাকা ভিত্তি-মূল একেবারেই কাঁচিয়া গিয়াছে। তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা এইরূপ;—

"অভিপ্রায় এই যে চৈতন্য-মাত্র স্বভাব পরমাত্মা বস্তু কল্পে নিরুপাধিক ও অবিষয় হইলেও অবিদ্যা-কল্পিত অহং উপাধি দ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ... ... অবিদ্যা-কল্পিত অহং যতকাল থাকিবে ততকালই তিনি অহং বৃত্তির পরিচ্ছেদ্য বা বিষয়। সুতরাং অবিদ্যা কল্পিত অহং উপাধির বিলোপ বা বিগম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন। অর্থাৎ আত্মা এখন অহং বৃত্তির বিষয়।"

"আত্মা এখন অহং বৃত্তির বিষয়" অথবা "অবিদ্যা কল্পিত অহং উপাধি দ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন" এরূপ কথা শঙ্করাচার্য্য কোন স্থানেই বলেন নাই—প্রত্যুত ওরূপ কথা শঙ্করাচার্য্যের অধ্যাস-বাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। অধ্যাস-বাদের সহিত ও-কথার বিরোধ এইরূপ; যথা;—

গোড়ায় একটা বাস্তবিক সত্য থাকিলে তবেই তদুপলক্ষে ভ্রম হওয়া পশ্চাতে সম্ভবে; আকাশ অসীম এবং বর্ণরহিত এই সত্যটি গোড়ায় বিদ্যমান থাকাতেই "আকাশ নীলবর্ণ ও কটাহাকৃতি" এই কথাটি ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। তেমনি আত্মা অস্মৎ প্রত্যয়ের গোচর—এই সত্যটি গোড়ায় বিদ্যমান থাকাতেই "ইদম্প্রত্যয়-গোচর দেহাদিই আত্মা" এই কথাটি ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু আত্মা অস্মৎ প্রত্যয়ের গোচর—এই গোড়া'র সত্যটি নিজেই যদি ভ্রমাত্মক (অবিদ্যা কল্পিত) হয়, তবে "দেহাদিই আত্মা" একথাটি কি দোষ করিল? শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর আত্মা এবং যুষ্মৎপ্রত্যয়-গোচর দেহাদি এই দুয়ের পরস্পরাধ্যাসই অবিদ্যা। খিচুড়ি প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে যেমন চা'ল ও ডা'ল আবশ্যক, তেমনি অবিদ্যা বা ভ্রম সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর আত্মা এবং যুষ্মৎপ্রত্যয়-গোচর অনাত্মা আবশ্যক; যেমন চা'লও খিচুড়ি নহে—ডা'লও খিচুড়ি নহে, তেমনি "আত্মা অস্মৎপ্রত্যয় গোচর" ইহাও অসত্য নহে (অবিদ্যা-কল্পিত

নহে) অনাত্মা ইদম্প্রত্যয়-গোচর ইহাও অসত্য নহে; কি তবে অসত্য ও অবিদ্যা কল্পিত? না দুয়ের পরস্পরাধ্যাস, সহজ ভাষায়—দুয়ের খিচুড়ি। চা'ল নিজেই যদি খিচুড়ি হইত, তবে এই যে একটি কথা যে, খিচুড়ি—চাল এবং ডালের সন্মিশ্র, এ কথার কোন অর্থ থাকিত না; তেমনি আত্মার অস্মৎপ্রত্যয়-গোচরত্ব (অহংবৃত্তি-বিষয়ত্ব) যদি অবিদ্যা-কল্পিত হয় তবে "অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর আত্মা এবং যুষ্মৎপ্রত্যয়-গোচর অনাত্মা এই দুয়ের খিচুড়িই অবিদ্যা" এ কথার কোন অর্থ থাকে না—সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের অধ্যাসবাদ সমূলে নির্মূল হইয়া যায়।

বেদান্ত-বাগাশ মহাশয়ের ব্যাখ্যার সহিত অধ্যাস-বাদের কিরূপ বিরোধ তাহা উপরে দেখাইলাম, এখন শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত অভিপ্রায় কি—তাহা দেখা যা'ক্।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলেন যে, অহংবৃত্তিতে বিশ্বাস নাই কেন?—না যেহেতু "উহা কখন দেহাদি অবলম্বন করিয়া উদিত হইতেছে কখন বা কেবল মাত্র চৈতন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেছে;" কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে, দেহাদিতে যে, অহংজ্ঞান, তাহা প্রকৃত অহংজ্ঞান নহে—তাহা অহংভ্রম; আর, কেবল মাত্র চৈতন্য-রূপী আত্মাতে যে অহংজ্ঞান তাহাই প্রকৃত পক্ষে অহংজ্ঞান। অতএব বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই যে একটি কথা বলিয়াছেন যে "আমি বা আত্মা অহংবৃত্তির অর্থাৎ 'আমি' এতদ্রূপ জ্ঞানের স্থির বিষয় বা অব্যভিচরিত আলম্বন নহে" এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। বাস্তবিক-অহংজ্ঞানের বিষয় যৎপরোনাস্তি স্থির বিষয়—তাহা চৈতন্য-রূপী আত্মা; কিন্তু কাল্পনিক-অহংজ্ঞানের বিষয়, এক কথায়—অহংভ্রমের বিষয়, অস্থির; তাহা কখন স্থূল-দেহ—কখনও বা সূক্ষ্ম দেহ—কখন ও বা রাগদ্বেষাধীন মন ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে, আমি যদি ইদং বৃত্তির সহিত অহংবৃত্তির খিচুড়ি পাকাইয়া বলি "অহমিদং" (অর্থাৎ ইদম্বৃত্তির আস্পদ এই যে দেহাদি ইহাই আমি) তবেই আমি অবিদ্যায় আক্রান্ত হই; কিন্তু যদি আমি অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর আত্মাকে পঞ্চ কোষ হইতে বিবিক্ত করিয়া তাহাকেই অহং বলিয়া অবগত হই; দার্শনিক ভাষায়—যদি আমার অহংবৃত্তি পঞ্চকোষ হইতে ব্যতিরিক্ত হইয়া চৈতন্য-রূপী আত্মাতে অন্বিত হয়; তবে আমি যথার্থ তত্ত্বে উপনীত হই। শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত কথা এই যে, পরমার্থতঃ আত্মা শুদ্ধ কেবল অস্মৎপ্রত্যয়েরই বিষয়; কিন্তু লৌকিক ব্যবহার স্থলে দেহাদি যুষ্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় আত্মা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য কেবল বলিয়াছেন যে, আত্মা যুষ্মৎপ্রত্যয়-গোচর বিষয় নহে কিন্তু তাহা বলিয়া আত্মা যে, একান্তই বিষয় নহে—অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর বিষয়ও নহে—তাহা নহে, যথা,—"নায়ং একান্তেনা-বিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ।" শঙ্করাচার্য্য যেখানে অবাধে অসঙ্কোচে এবং মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, আত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের গোচর অথবা অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয়, সেখানে আমরা কেন ভয়ে ভয়ে বলিব যে, কেবল ব্যবহার কালেই আত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়—

সকল কালে নহে। যাঁহারা অর্দ্ধেক কথা পেটে অর্দ্ধেক কথা মুখে--এইরূপ ভাবে বচন বিন্যাস করেন, তাঁহারা নিতান্তই কাঁচা লেখক; ঐরূপ লেখকের সহিত শঙ্করাচার্য্যের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শঙ্করাচার্য্য যদি কোনও একটি স্থানে বলিতেন যে, আত্মা অবিষয়, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে পারিতাম যে, একবার যাঁহাকে তুমি অবিষয় বলিয়াছ—আবার তুমি তাহাকে কিরূপে অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় বল? কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কোন স্থানেই বলেন নাই যে, আত্মা মূলেই বিষয় নহে--তিনি কেবল বলিয়াছেন যে, আত্মা যুষ্মৎপ্রত্যয়-গোচর বিষয় নহে। কিন্তু আত্মা যুষ্মৎপ্রত্যয়-গোচর বিষয় নহে বলিলে এমন বুঝায় না যে, আত্মা মূলেই বিষয় নহে—অস্মৎপ্রত্যয় গোচর বিষয়ও নহে; অশ্ব—শৃঙ্গী পশু নহে বলিলে এরূপ বুঝায় না যে, অশ্ব মূলেই পশু নহে—খুরী পশুও নহে। শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত কথাটি নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর ছলে সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে;—

প্রশ্ন। আত্মা কি?

উত্তর। (১) আত্মা বিষয়ী। (২) আত্মা বিষয়;—কাহার বিষয়? অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়। বিষয়ীত্ব এবং বিষয়ত্ব দুইই আত্মাতে একাধারে বর্ত্তমান; যেহেতু আত্মা স্বপ্রকাশ—আপনার নিকট আপনি প্রকাশিত—আপনার নিকট আপনি জ্ঞাত—আপনার জ্ঞানের আপনি বিষয়।

প্রশ্ন। আত্মা কি নহে?

উত্তর। আত্মা যুষ্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় নহে।

প্রশ্ন। অনাত্মা কি?

উত্তর। অনাত্মা যুষ্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়।

প্রশ্ন। অনাত্মা কি নহে?

উত্তর। (১) অনাত্মা বিষয়ী নহে। (২) অনাত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় নহে।

প্রশ্ন। আত্মা এবং অনাত্মার ঐক্য কোন্ খানে?

উত্তর। উভয়ই বিষয়—উভয়ের কেহই অবিষয় নহে—এইখানেই উভয়ের ঐক্য।

প্রশ্ন। আত্মা এবং অনাত্মার প্রভেদ কোন্খানে?

উত্তর। আত্মা অস্মৎ প্রত্যয়েরই বিষয় যুষ্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় নহে—অনাত্মা যুষ্মৎপ্রত্যয়েরই বিষয় অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় নহে; এই খানেই উভয়ের প্রভেদ।

ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না।

অতএব শঙ্করাচার্য্যের মতে—দেহাদিতে যে, অহং বুদ্ধি, তাহাই অবিদ্যাকল্পিত অহং; আত্মাতে যে, অহংবুদ্ধি, তাহা অবিদ্যা-কল্পিত নহে,—তাহা ভ্রম নহে কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞান—স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। যদি বল যে, আত্মা স্বপ্রকাশ বটে কিন্তু আপনার নিকট আপনি অহং বলিয়া প্রকাশ পা'ন না, তবে তাহার উত্তর এই যে, প্রকাশ পাইতে

হইলে আত্মা আপনার নিকটে অহং বলিয়াই প্রকাশ পা'ন—কদাপি ইদং বলিয়া প্রকাশ পা'ন না। লৌকিক ব্যবহার স্থলেই আত্মা ইদং বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন যথা—আমরা স্বীয় বক্ষঃ স্থলে করাঘাত করিয়া নির্দেশ করি যে, আমি এই; অথচ ভিতরে ভিতরে জানিতেছি যে, আমি আমার বক্ষস্থল হইতে ভিন্ন; ইহাকেই বলে পেটে এক মুখে এক—সত্য-মিথ্যার খিচুড়ি—পরস্পরাধ্যাস—ইত্যাদি। পরমার্থতঃ আত্মা শুদ্ধ কেবল অহংবৃত্তিরই গম্য—কিন্তু লৌকিক ব্যবহার-কালে আত্মা ইদম্বৃত্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, শঙ্করাচার্য্যের নিজের জ্ঞানোজ্জ্বল বাক্যের মূল্য স্বতন্ত্র, আর, বেদান্ত সম্বন্ধীয় ভাসা ভাসা অন্ধকারাচ্ছন্ন নানা কথা যাহা আমাদের দেশে ছড়াইয়া আছে তাহার মূল্য স্বতন্ত্র; দুয়ের খিচুড়ি না পাকাইয়া শুদ্ধ যদি কেবল শঙ্করাচার্য্যের নিজের যুক্তি-পূর্ণ উক্তিগুলির প্রতি আবদ্ধ থাকা যায়, তবে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃকল্প। অনেক আধুনিক বেদান্ত-বেত্তাদিগের কথা শুনিলে এইরূপ বোধ হয়—যেন আত্মা স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ নহে কিন্তু অপ্রকাশ—শুদ্ধ কেবল ব্যবহার কালেই আত্মা স্বপ্রকাশ; অর্থাৎ আত্মা গোড়ায় আপনাকে আপনি জানে না, অথবা যাহা একই কথা—আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয় নহে, শুদ্ধ কেবল ব্যবহার কালেই আপনি আপনাকে জানে,—কি ভয়ানক ভ্রম! আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন—চন্দ্র একেবারেই নিরুদ্দেশ, কিন্তু সমুদ্রের জল ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; তুমি বলিতেছ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; আমি বলিতেছি যে, চন্দ্র যখন আকাশে প্রকাশ পাইতেছে না তখন কেমন করিয়া বলিব যে, জলের ঐরূপ ঔজ্জ্বল্য চন্দ্রের প্রতিবিম্ব,—উহা জল-স্থিত কোন তৈজস পদার্থের ঔজ্জ্বল্য হইবে;—আত্মা যিনি মূল-স্থিত চৈতন্য তিনিই যদি আপনার নিকট (সুতরাং সকলেরই নিকট অর্থাৎ একান্তই) অপ্রকাশ হ'ন তবে আত্মার প্রতিবিম্ব কিরূপে প্রকাশধর্ম্মী হইবে? আত্মা নিজে প্রকাশ-ধর্ম্মী নহেন (অর্থাৎ আপনার নিকটে আপনি প্রকাশ পা'ন না—সুতরাং অন্যের নিকটেও প্রকাশ পা'ন না—একেবারেই অপ্রকাশ) অথচ আভাস-চৈতন্য যাহা তাঁহার প্রতিবিম্ব-মাত্র তাহা প্রকাশ-ধর্ম্মী! আকাশে চন্দ্র একেবারেই অপ্রকাশ—অথচ জলে তাহার প্রতিবিম্ব প্রকাশ পাইতেছে—পৃথিবীতে তাহার জ্যোৎস্না প্রকাশ পাইতেছে—এ কথা কিরূপ কথা! এই সকল অলীক কথার সহিত, শঙ্করাচার্য্যের নিজের মন্তব্য কথার আকাশ-পাতাল প্রভেদ ইহা বলা বাহুল্য।

এই সকল অপরিপক্ক বৈদান্তিকদিগের অনেকে (বেদান্তবাগীশ মহাশয় এ শ্রেণীভুক্ত নহেন ইহা বলা বাহুল্য) সমাধি বলিয়া একটা জুজু খাড়া করেন—এবং তাহার দোহাই দিয়া অনেক অযৌক্তিক কথা অবাধে পার পাওয়াইয়া দে'ন। ইঁহাদের সমাধি—কালিদাস বর্ণিত মহাদেবের সমাধির ন্যায় জ্ঞানোজ্জ্বল সমাধি নহে, উহা গহ্বর-স্থিত অজাগরের সমাধির ন্যায় জড়তা এবং অন্ধতার অন্ধকূপ। মহাদেবের সমাধি উপ-

লক্ষে কালিদাস বলিয়াছেন "আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তং"—ইহা শুনিবামাত্রই মনে হয়—যেন মহাদেবের অন্তরে জ্ঞান-জ্যোতি ধরিতেছে না—তাহা তাঁহার মুখ-মণ্ডলে ফুটিয়া বাহির হইতেছে; তাই আমরা বলিতেছি যে, এ সমাধি জ্ঞানোজ্জ্বল সমাধি। এ সমাধিতে জ্ঞান আপনার নিকট আপনি সপ্রকাশ। কিন্তু অজাগরের সমাধি ঘোরতর তামসিক সমাধি! ইহাতে অমৃতের সংস্পর্শমাত্র নাই শুদ্ধ কেবল গরলেরই প্রাদুর্ভাব। যিনি অন্ধতা এবং জড়তাকে মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ মনে করেন—শেষোক্ত সমাধি তাঁহাকেই পোষায়! সুতরাং কালিদাস-বর্ণিত পূর্ব্বোক্ত সমাধিই যে, প্রকৃত বেদান্তের অভিপ্রেত ইহা বলা বাহুল্য। বেদান্ত শাস্ত্রে সমাধি-অবস্থা তুরীয় (অর্থাৎ চতুর্থ) অবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা, (১) জাগ্রৎ অবস্থা, (২) স্বপ্নাবস্থা, (৩) সুষুপ্তি অবস্থা, (৪) সমাধি অবস্থা। অতএব যাঁহারা সমাধিকে সুষুপ্তির ন্যায় তমসাচ্ছন্ন অবস্থা মনে করেন--তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। সমাধিতে সুষুপ্তি কালের আনন্দ আছে—কিন্তু তৎকালের অন্ধতা এবং জড়তা উহাতে নাই, স্বপ্ন-কালের মুক্ত ভাব আছে—কিন্তু তৎকালের অব্যবস্থিত এবং বিশৃঙ্খল ভাব উহাতে নাই, জাগ্রৎ কালের সুব্যবস্থিত সুশৃঙ্খল ভাব আছে—কিন্তু জাগ্রৎ কালের বদ্ধ ভাব উহাতে নাই; এক কথায়, সমাধিতে তিন কালের গুণ-গুলি আছে—দোষগুলি নাই। আর এক কথা এই যে, জাগ্রৎ অবস্থা সৎ প্রধান—স্বপ্নাবস্থা চিৎ প্রধান—সুষুপ্তি অবস্থা আনন্দ প্রধান—সমাধি অবস্থা সচ্চিদানন্দ প্রধান। এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ কালে সর্ব্ব জগতেই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের—অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের—আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়;—অপরিবর্ত্তনীয় সত্য সৎশব্দের বাচ্য—তাই বলিতেছি যে, জাগ্রৎ অবস্থা সৎ প্রধান। স্বপ্ন-কালে নিয়মের তেমন বাধাবাধি নাই—শক্যাশক্যি নাই; তখন মনের ভাব অনুসারে বস্তু-সকলের আবির্ভাব হয়; মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসে—বিনা পক্ষে উড্ডয়ন হয়—যাহা হইবার নহে তাহা হয়। স্বপ্নকালে মনোরাজ্যেরই একাধিপত্য—এখানে বহির্ব্বস্তুর বড় একটা জোর খাটে না,—তাই বলিতেছি যে, স্বপ্নাবস্থা চিৎ প্রধান। সুষুপ্তি যে, আনন্দ প্রধান, ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সমাধি অবস্থায় সুষুপ্তির আনন্দ, জাগ্রৎ কালের অটল সত্য-স্ফূর্ত্তি, এবং স্বপ্নকালের মুক্তভাব, তিনই একাধারে বর্ত্তমান। এই জন্য—রাত্রি এবং দিনের—জাগরণ এবং সুষুপ্তির—সন্ধিস্থল-বর্ত্তী ব্রহ্ম মুহূর্ত্তই সমাধি-সাধনের উপযুক্ত কাল। প্রত্যূষ সময়ে যেমন রজনীর অন্ধকার নাই ও দিবসের প্রাখর্য্য নাই—সমাধি-কালে সেইরূপ সুষুপ্তি কালের অন্ধভাব নাই ও জাগ্রৎ কালের বদ্ধভাব নাই; পুনশ্চ প্রত্যূষ কালে যেমন রজনীর প্রশান্তি এবং দিবসের উজ্জ্বলতা দুইই একাধারে বর্ত্তমান, সমাধি-কালে সেইরূপ সুষুপ্তি কালের প্রশান্তি এবং আনন্দ ও জাগ্রৎ কালের জ্ঞানোজ্জ্বল ভাব দুইই একাধারে বর্ত্তমান। এইরূপ সমাধিই শাস্ত্র-সঙ্গত, এইরূপ সমাধিই যুক্তিসঙ্গত।

আর একটি গোলোযোগের কথা এই যে, সমাধিকালে সাধকের বৃত্তি-বিলোপ হয়। এমন অনেক কথা আছে যাহার শব্দার্থ সম্পূর্ণ অসত্য অথচ তাহার ভাবার্থ খুবই সত্য,—সমাধি কালে সাধকের বৃত্তি-বিলোপ সেই রকমের একটি কথা। কেহ যদি বলেন যে, চন্দ্র-বদনের রূপ-মাধুর্য্য দেখিয়া আমি আপনাতে আপনি নাই, এবং একজন শ্রোতা যদি তাঁহার অর্থ এইরূপ বোঝেন যে, চন্দ্র-বদন সত্য সত্যই চন্দ্র-বদন—অর্থাৎ সত্য-সত্যই তাহা চন্দ্রের ন্যায় চক্রাকৃতি ও তাহার বিরাজমানে সত্যসত্যই অন্ধকার ঘরে প্রদীপ অনাবশ্যক; অথবা যদি এইরূপ বোঝেন যে, রূপের সত্যসত্যই মাধুর্য্য (অর্থাৎ চিনির ন্যায় মিষ্টতা) আছে; অথবা যদি এইরূপ বোঝেন যে, কোন সচেতন মনুষ্যের পক্ষে আপনাতে আপনি না থাকা সত্যসত্যই সম্ভবে; তবে সেরূপ বোদ্ধা উপলক্ষে আমরা বলিব যে, তিনি নিতান্তই অরসিক; তেমনি, কেহ যদিএইরূপ বোঝেন যে, সমাধিকালের বৃত্তি-বিলোপ সত্যসত্যই বৃত্তি-বিলোপ, তবে আমরা বলিব যে, তিনি দর্শন শাস্ত্রে নিতান্তই অনভিজ্ঞ; এমন কি, তিনি যদি প্রলয় গুরুত্ব ফলাইয়া আমাদিগকে বলেন যে, ঐরূপ বৃত্তি-শূন্য সমাধি রস আমি স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছি, তবুও আমরা তাঁহাকে বলিব যে, কখনই না—তুমি সে রসে একেবারেই বঞ্চিত; কেন না তুমি বলিতে পার না যে, এখনকার এই-যে-তুমি—এই তুমি তখন সমাধিস্থ হইয়াছিলে, কারণ, তুমি ইতি পূর্ব্বেই বলিয়াছ যে, সমাধি-অবস্থায় তোমার অহংবৃত্তি ছিল না—সুতরাং তুমি তখন তুমি ছিলে না; তুমিই যখন ছিলে না তখন তুমি সমাধিস্থ ছিলে—ইহা শিরোনাস্তি শিরঃপীড়ার ন্যায় নিতান্তই মিথ্যা কথা; অতএব তুমি কোন জন্মেই সমাধিস্থ ছিলে না, তুমি সমাধি রসে নিতান্তই বঞ্চিত। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সমাধি-কালীন বৃত্তি-বিলোপ সত্যসত্যই কিছু আর বৃত্তিবিলোপ নহে,—তাহার অর্থ স্বতন্ত্র। বৃত্তি-বিলোপের অর্থ আর কিছু নহে যে-বৃত্তি আমাদের অযত্ন-সুলভ তাহার প্রতি আমাদের উপেক্ষা (অর্থাৎ আপেক্ষিক অমনোযোগ) জন্মে, ইহারই নাম বৃত্তি-বিলোপ। পাঠশালার শিশু পুস্তক পড়িবার সময় প্রতি অক্ষর যত্নের সহিত বানান করিয়া পড়ে,—বানান-কার্য্যে তাহার এখনো রীতিমত ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই; কিন্তু আমরা যখন কোন বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করি তখন আমরা যে, বানান করিয়া পড়িতেছি, ইহা আমাদের মনেই থাকে না; বানান-কার্য্য আমাদের নিতান্ত অযত্ন সুলভ বলিয়া তাহার প্রতি আমাদের এতাদৃশ উপেক্ষা। বাস্তবিকই যে, আমরা আদবেই অক্ষর বানান্ না করিয়া পাঠ করি, তাহা নহে; আমাদের বানান-রূপী বৃত্তি এরূপ সড়গড় হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যে ধরি না,—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা স্বকার্য্যে ক্ষান্ত থাকে না। সাধনাবস্থায় সাধকের প্রণিধান-বৃত্তি প্রযত্ন সাপেক্ষ, তাই তাহার প্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি পড়ে; কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় তাহা অযত্ন-সুলভ, তাই তাহার প্রতি তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ থাকে না—অর্থাৎ এত অল্প মনোযোগ

থাকে যে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে; ইহারই নাম বৃত্তি বিলোপ; এতদ্ভিন্ন, বৃত্তি বিলোপ বাস্তবিকই যে, বৃত্তি বিলোপ, তাহা নহে। আমাদের মনোবৃত্তি যখন লক্ষ্য-বস্তুতে সবিশেষ সমাহিত হয়, তখন সেই লক্ষ্য বস্তুটিই আমাদের সর্ব্বস্ব হয়—বৃত্তিটিকে আমরা ভুলিয়া যাই; কিন্তু তাহা বলিয়া বৃত্তিটিকে এত ভুলি না যে, তাহাকে চালনা করিতে ক্ষান্ত থাকি; তবে কি না—তখনকার সে বৃত্তি-চালনা এরূপ অযত্ন-সুলভ যে, তাহা আমরা আদবেই ধর্ত্তব্যের মধ্যে ধরি না; ইহারই নাম সম্যক্ বৃত্তি-বিস্মরণ—ইহারই নাম বৃত্তিবিলোপ; এরূপ বৃত্তি-বিলোপের অবস্থা অচেতন অবস্থা হওয়া দূরে থাকুক্—উহা সচেতন অবস্থার পরাকাষ্ঠা। শিশুরা যেমন অনেক বানান করিয়া অল্প পাঠ করে, আমরা তেমনি অনেক বৃত্তি খরচ করিয়া অল্প জ্ঞান লাভ করি,—সমাধিস্থ ব্যক্তি অতীব অল্প বৃত্তি ব্যয়ে (অর্থাৎ অতীব অল্প প্রযত্নে) অতীব মহৎ জ্ঞান লাভ করেন; সুতরাং সমাধির অবস্থা অতীব সজ্ঞান অবস্থা। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে সমাধিকে তাই জ্ঞান-সংজ্ঞিক বলিয়াছেন, অজ্ঞান-সংজ্ঞিক বলেন নাই; যথা,—

"বৃত্তি-বিস্মরণং সম্যক্ সমাধি র্জ্ঞান-সংজ্ঞিকঃ।"

বৃত্তি বিস্মরণ শব্দের অর্থ যে বৃত্তি-বিলোপ নহে—অজ্ঞানাবস্থা নহে—ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছি—এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। শঙ্করাচার্য্য উপরি উক্ত ঐ কথাটি বলিয়া তাহার কিয়ৎ পরেই বলিয়াছেন—

"ভাববৃত্ত্যাহি ভাবত্বং শূন্য বৃত্ত্যাহি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যাহি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্ব মভ্যসেৎ॥
যে হি বৃত্তিং বিজানন্তি জ্ঞাত্বাঽপি বর্দ্ধয়ন্তি যে।
তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবন-ত্রয়ং॥
যেষাং বৃত্তি সমাবৃদ্ধা পরিপক্কা চ সা পুনঃ।
তে বৈ সদ্‌ব্রহ্মতাং প্রাপ্তা নেতরে ব্রহ্মবাদিনঃ॥
কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিনঃ।
তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ॥"

বৃত্তি-মান্ সাধকের প্রশংসাবাদ এবং বৃত্তি-হীন ব্রহ্মবাদীর নিন্দাবাদ ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না; ইহাতে জলের ন্যায় স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, সমাধিস্থ ব্যক্তির বৃত্তি-বিলোপ শঙ্করাচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ। বিপ্রতিপত্তি অথবা বদতোব্যাঘাত অথবা স্ববিরোধ (Contradiction) কাহাকে বলে তাহা যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা সত্যসত্যই মনে করেন যে, সমাধি কালের জ্ঞান = অজ্ঞান; অথচ, আমাদের এই যে একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত যে, আত্মা আপনি আপনার বিষয়, ইহা তাঁহাদের মতে স্ববিরোধী! ন্যায়শাস্ত্রে যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যুৎপত্তি আছে তাঁহারা ইহা অস্বীকার করিতে

পারিবেন না যে, "এক = অনেক (অর্থাৎ ২ বা ৩ বা ৪),জ্ঞান = অজ্ঞান, আত্মা = অনাত্মা" ইহাই স্ববিরোধী ; আর, এক—আপনি আপনার বর্গফল (square) এবং আপনিই আপনার বর্গমূল (square root), আত্মা আপনিই আপনার জ্ঞান-ফল (বিষয়) এবং আপনিই আপনার জ্ঞান-মূল (বিষয়ী), ইহা স্ববিরোধী হওয়া দূরে থাকক্—ইহা একটি অখণ্ডনীয় মূলতত্ত্ব।

বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাতে গুণের ভাগ এত অধিক যে, আমরা উপরে যে দোষের কথা উল্লেখ করিলাম তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে ; শুদ্ধ কেবল সত্যের অনুরোধে আমরা এরূপ করিলাম ; কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ না মনে করেন যে, আমরা তাঁহার গুণ সমূহের মর্য্যাদা অবগত নহি, অথবা আমরা সমগ্র বেদান্তদর্শন তাঁহা অপেক্ষা ভাল বুঝি। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ব্যাখ্যা দৃষ্টে আমরা কালিদাসের এই সুন্দর উপমাটির সার্থক্য সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি ; যথা,—

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ। *

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিন্দু বিবাহ।

(সায়ান্স্ অ্যাসোসিয়েশন্ হলে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত)

অধ্যাপক সীলি তাঁহার Natural Religion নামক গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন— Among the crowd of Voltairian Abbes we can fancy some in whom the conflict between inherited and imbibed ways of thinking may have destroyed belief and energy alike. Those who live in the decay of Churches and systems of life are exposed to such a paralysis. They have been made all that they are by the system; their mode of thought and feeling, their very morality has grown out of it. But at a given moment the system is struck with decay. It falls out of the current of life and thought. Then the faith which had long been genuine, even if mistaken, which had actually inspired vigorous action and eloquent speech, begins to ebb. The vigour begins to be spasmodic, the eloquence to ring hollow, the loyalty to have an air of hopeless self-sacrifice. Faith gradually passes into conventionalism. A later stage comes when the depression, the uneasiness, the misgivings, have augmented tenfold. It is then that

* কলিকাতা ২ নং নরসিংস্ লেনে বর্ত্তমান বেদান্তদর্শন প্রাপ্তব্য।

in an individual here and there the moral paralysis sets in. In the ardour of conflict they have pushed in to the foreground all the weakest parts of their creed, and have learnt the habit of asserting most vehemently just what they doubt most, because it is what is most denied. As their own belief ebbs away from them they are precluded from learning a new one, because they are too deeply pledged, have promised too much, asseverated too much, and involved too many others with themselves. Happy those in such a situation who either are not too clear-sighted or cling to a system not entirely corrupt! There is an extreme case when what is upheld as divine has really become a source of moral evil, while the champion is one who cannot help seeing clearly. As he becomes reluctantly enlightened as his advocacy grows first a little forced, then by degrees consciously hypocritical, until in the end he secretly confesses himself to be on the wrong side,—what a moral dissolution! ইহার মর্ম্মার্থ—

যাঁহারা কোন পুরাতন ধর্ম্মপ্রণালী অথবা সমাজতন্ত্রের জীর্ণদশায় জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন সংস্কারের সহিত নূতন শিক্ষার বিরোধ বশতঃ বিশ্বাস ও বল হারাইয়া নৈতিক পঙ্গু অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সেই সমাজ-তন্ত্রের মধ্যেই গঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাপ্রণালী এমন কি ধর্ম্মনীতি সেই সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু কখন্ এক সময়ে সেই সমাজে জরা প্রবেশ করিয়াছে। সে সমাজ মানবের বৃদ্ধি ও জীবনস্রোতের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। যে অকপট বিশ্বাস পূর্ব্বে সকলকে উদ্যমশীল কার্য্যে ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় প্রবৃত্ত করিয়াছে এখন সে বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। তাহার জীবন্ত উদ্যম ক্বচিৎ ক্ষণস্থায়ী চকিত চেষ্টায় পর্য্যবসান হয়, তাহার বক্তৃতাবেগ শূন্যগর্ভ বলিয়া বোধ হয়, এবং তাহার নিষ্ঠা নিতান্ত আশাহীন আত্মবলিদানের ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে। আন্তরিক বিশ্বাস ক্রমে বাহ্য প্রথায় পরিণত হয়। ক্রমে অবসাদ, অশান্তি ও সংশয় বাড়িতে থাকে। এই মতবিরোধের সময় কতকগুলি লোক উঠেন তাঁহারা বিবাদে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের মতের জীর্ণতম অংশ গুলিই সম্মুখে সাজাইয়া আস্ফালন করিতে থাকেন; যে গুলি মনে মনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহ করেন সেই গুলিই তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন কারণ বিরোধী পক্ষ সেই গুলিকেই অধিকতর অবিশ্বাস করিয়া থাকে। ক্রমে এতদূর পর্য্যন্তও হইতে পারে যে, যাহা নৈতিক দুর্দ্দশার কারণ তাহাকেই তাঁহারা স্বর্গীয় বলিয়া প্রচার করেন, অথচ ইহার অসঙ্গতি নিজেই মনে মনে না বুঝিয়া থাকিতে পারেন না। প্রথমে অল্পে অল্পে চক্ষু ফুটিতে থাকে এবং জোর করিয়া নিজমত সমর্থন করেন, পরে ক্রমে আপন মত অন্যায় জানিয়াও স্পষ্ট কাপট্য অবলম্বন করেন।

অধ্যাপক সীলির এই বর্ণনার সহিত আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার কি আশ্চর্য্য ঐক্য! নূতন-শিক্ষাপ্রাপ্ত বঙ্গভূমির নূতন চিন্তাস্রোত ও জীবনস্রোতের সহিত প্রাচীন সমাজতন্ত্র মিশিতে পারিতেছে না। সুতরাং প্রাচীন সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসবলে যে সকল বৃহৎকার্য্য যেরূপ প্রবল বেগে সম্পন্ন হইতে পারিত এখন আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখনকার জীবন্ত বিশ্বাস এখন জীবনহীন প্রথায় পরিণত হইয়াছে। অবসাদ, অশান্তি ও সংশয়ে আমাদের সমাজ ভারাক্রান্ত। এবং আমাদের মধ্যে একদল লোক উঠিয়াছেন, তাঁহারা পরম সূক্ষ্ম কূটযুক্তি দ্বারা প্রাচীন মতের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং বোধ করি এক-দল রূঢ়স্বভাব সংবাদপত্রব্যবসায়ীর মধ্যে এ সম্বন্ধে কাপট্যের লক্ষণও দেখা দিয়াছে।

সম্প্রতি আমাদের দেশে এক দলের মধ্যে এই যে প্রাচীনতার একান্ত পক্ষপাত দেখা যায় তাহার কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ—নূতন শিক্ষার প্রভাবে আমরা অনেকগুলি নূতন কর্ত্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের অনভ্যাস, পূর্ব্বরাগ, স্বাভাবিক জড়ত্ব ও ভীরুতা বশতঃ আমরা তাহা সমস্ত পালন করিয়া উঠিতে পারি না। আলস্যের দায়ে ও সমাজের ভয়ে অনেক সময়ে আমরা তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু অসম্পন্ন কর্ত্তব্যের লাঞ্ছনা মানুষ চিরদিন সহিয়া থাকিতে পারে না। কেন বিশ্বাস করিতেছি একরূপ এবং কাজ করিতেছি অন্যরূপ তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কিছুদিন পরে নূতন বিশ্বাসের খুঁৎ ধরিতে আরম্ভ করা যায়। নূতন শিক্ষালব্ধ কর্ত্তব্য যে অকর্ত্তব্য, এবং আমরা যাহা করিয়া আসিতেছি ঠিক তাহাই করা যে উচিত, প্রাণপণ সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু এরূপ স্থলে সাধারণতঃ যুক্তিগুলি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে; এত সূক্ষ্ম হয় যে সেই যুক্তিভেদ করিয়া যুক্তিকর্ত্তার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস কখন কখন কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ—পুরাতনের উপর যখন একবার আমাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া যায় তখন আমরা অনেক সময় অবিচারে নূতনকে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিই। নূতনের উপর প্রকৃত বিশ্বাসবশতই যে তাহাকে সকল সময়ে আমরা হৃদয়ে স্থান দিই তাহা নহে, অনেক সময়ে পুরাতনের প্রতি আড়ি করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনি। আমরা গৃহশত্রুর প্রতি আড়ি করিয়া কখন কখন বহিঃশত্রুকে গৃহে আহ্বান করিয়া থাকি। অবশেষে উপদ্রব সহ্য করিয়া যখন চৈতন্য হয়, তখন আগা-গোড়া নূতনের উপরে বিরাগ জন্মে। যখন এদেশে নূতন কালেজ হয় তখন শিক্ষিত যুবকেরা যে, অনেকগুলি উৎপাৎ আপন গৃহচালের উপরে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন সে কেবল পুরাতনের উপরে আড়ি করিয়া বৈত নয়। এখনকার একদল লোক

সেই সকল উৎপাৎমিশ্রিত নূতন মতকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

তৃতীয়তঃ। আমরা পরাধীন জাতি। আমরা পরের কাছে অপমানিত, সুতরাং ঘরে সম্মানের প্রত্যাশী। এই জন্য আমরা ইংরাজকে বলিতে চাহি "ইংরাজ তোমাদের শস্ত্র বড় কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বড়। তোমরা রাজা আমরা আর্য্য!" এককালে আমাদের যাহা ছিল এখনো যেন তাহাই আছে এইরূপ ভাণ করিয়া অপমানদুঃখ ভুলিয়া থাকিতে চাই! দেহে বল ও হৃদয়ে সাহস নাই যে, অপমান হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারি, সুতরাং পুরাণ ও সংহিতা, চটুল রসনা ও কূটযুক্তির দ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে বড় বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয়। যে সকল আচারের অস্তিত্ব হয়ত আমাদের অপমানের অন্যতম কারণ সে গুলি দূর করিতে সাহস হয় না, এইজন্য তাহাদের প্রতি আর্য্য, আধ্যাত্মিক, পবিত্র প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া আপনাদিগকে পরম সম্মানিত জ্ঞান করি। এইরূপে অনেক সময়ে অপমানজ্বালা বিস্মৃত হইবার অভিপ্রায়েই আমরা অপমানের কারণ স্বহস্তে স্বদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিই।

চতুর্থতঃ। ভাবেগতিকে বোধ হয়, কেহ কেহ মনে করেন প্রাচীনতাকে অবলম্বন করা আমাদের Political উন্নতির পক্ষে আবশ্যক। তাহাকে বিশ্বাস করি বা না করি তাহা সত্যই হৌক্ আর মিথ্যাই হৌক্ তাহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে করিলে আমাদের কতকগুলি বিষয়ে কতকগুলি লাভ আছে। কিন্তু সত্য মিথ্যার প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া এরূপ লাভক্ষতি গণনা করিয়া যে দেশের কোন স্থায়ী ও বৃহৎ কাজ করা যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইল হিন্দুবিবাহ লইয়া আলোচনা পড়িয়াছে। যাঁহারা এই আলোচনা তুলিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র এবং আমাদের বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাঁহারা কেহই হিন্দু বিবাহের শাস্ত্রসম্মত ঐতিহাসিকতা বা বিজ্ঞানসম্মত উপযোগিতার বিষয় বড়-একটা কিছু বলেন নাই, কেবল সূক্ষ্মযুক্তি ও কবিত্বময় ভাষা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুবিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে হিন্দুবিবাহের বিস্তর রূপান্তর ঘটিয়াছে—ইহার মধ্যে কোন্ সময়ের বিবাহকে যে তাঁহারা হিন্দুবিবাহ বলেন তাহা ভালরূপ নির্দ্দেশ করেন নাই। যদি বঙ্গদেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত বর্ত্তমান বিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলেন তবে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে তাহার পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা কেন? প্রাচীন কালে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল এখন সেরূপ আছে কি না সে বিষয়ে কিছুই বলা হয় না। অতএব সেকালের শাস্ত্রোক্তি এখন প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে চোখে ধূলা দেওয়া হয়। হিন্দু বিবাহের পবিত্রতা সম্বন্ধে যদি কেহ বৈদিক বচন উদ্ধৃত করেন তাঁহার জানা উচিত যে, বৈদিক কালে স্ত্রী পুরুষের

সামাজিক ও গার্হস্থ্য অবস্থা আমাদের বর্ত্তমান কালের ন্যায় ছিল না। যিনি হিন্দু-বিবাহের পক্ষে পুরাণ ইতিহাস উদ্ধৃত করেন তিনি এক মহাভারত সমস্ত পড়িয়া দেখিলে অকূল সমুদ্রে পড়িবেন—মহাভারতের নানা কাহিনীতে বিবাহ সম্বন্ধীয় নানা বিশৃঙ্খলা বর্ণিত হইয়াছে—ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে তাহার ভালরূপ সমালোচনা ও কালাকাল নির্ণয় না করিয়া কোন কথা বলা উচিত হয় না। যিনি মনুসংহিতার দোহাই দেন তাঁহার প্রতি আমার গুটিকতক বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, মনুসংহিতা যে সমাজের সংহিতা সে সমাজের সহিত আমাদের বর্ত্তমান সমাজের মূলগত প্রভেদ। শিক্ষার ঐক্য নাই অথচ সমাজের ঐক্য আছে ইহা প্রমাণ করিতে বসা বিড়ম্বনা। মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা যে বঙ্গদেশে কোন্‌কালে প্রচলিত ছিল নির্ণয় করা কঠিন। তিন দিনের মধ্যে নিতান্ত যো-সো করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অভিনয় সমাপন পূর্ব্বক আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ বহুকাল হইতে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। কোথায় বা গুরুগৃহে বাস, কোথায় বা বেদাধ্যয়ন, কোথায় বা কঠিন ব্রতচারণ! অতএব প্রথমেই দেখা যাইতেছে মনুসংহিতার মতে যে মানুষ গঠিত হইত এখনকার মতে সে মানুষই গঠিত হয় না। দ্বিতীয়ত—মনু পুরুষের পক্ষে বিবাহের যে বয়স নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাই বা কোথায় পালিত হইয়া থাকে! তৃতীয়ত—বিবাহের পরে মনু স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সংসর্গের যে সকল নিয়ম স্থির করিয়াছেন তাহাই বা কয়জন লোক জানে ও পালন করে! তবে, আপন সুবিধামত মনু হইতে দুই একটা শ্লোক নির্ব্বাচন করিয়া বর্ত্তমান দেশাচারপ্রচলিত বিবাহ প্রথার পক্ষে প্রয়োগ করা সকল সময়ে সঙ্গত বোধ হয় না। তবে যদি কেহ বলেন আমাদের বর্ত্তমান প্রথা সকল হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধতা হারাইয়াছে, অতএব আমরা মনুকে আদর্শ করিয়াই আমাদের বিবাহাদি প্রথার সংস্কার করিব কারণ সে কালের বিবাহাদি পবিত্র ও আধ্যাত্মিক ছিল; তবে আমার জিজ্ঞাস্য এই—বিবাহাদি সম্বন্ধে মনুর সমস্ত নিয়ম নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবে, না আপনাপন মতানুসারে স্থানে স্থানে বর্জ্জন করিয়া সংহিতাকে আপন সুবিধা ও নূতন শিক্ষার অনুবর্ত্তী করিয়া লইবে? মনুসংহিতা স্ত্রীপুরুষের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন তাহার সমস্তটাই পবিত্র ও আধ্যাত্মিক, না তুমি তাহার মধ্য হইতে যে টুকু বাদ-সাধ দিয়া লইয়াছ সেইটুকু পবিত্র ও আধ্যাত্মিক?

আমরা যে, শাস্ত্র হইতে বাদসাধ দিয়া, কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, দেশানুরাগে কথঞ্চিৎ অন্ধ হইয়া আপন ঘরগড়া মতকে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করি এখানে তাহার দুই একটি উদাহরণ দিতে চাহি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু পরম ভাবুক, জ্ঞানবান ও সহৃদয়। তাঁহার শকুন্তলা-সমালোচন তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। আমি যতদূর জানি বাঙ্গলায় এরূপ গ্রন্থ আর নাই। বাঙ্গলার পাঠকসাধারণে চন্দ্রনাথ বাবুকে বিশেষ

শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এই জন্য, কিছুকাল হইল তিনি হিন্দুপত্নী এবং হিন্দুবিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য নামে যে দুই প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহা সাধারণ্যে অতিশয় আদৃত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি হিন্দুবিবাহের আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুদম্পতির একীকরণতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আজকাল গুটিকতক কাগজে অবিশ্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইনি উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে হিন্দুবিবাহ এবং তাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যতটা বলিয়াছেন তাঁহার পরবর্ত্তী আর কেহ ততটা বলেন নাই। খ্যাতনামা গুণী ও গুণজ্ঞ লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় চন্দ্রনাথ বাবুর বিবাহ প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বলেন "হিন্দু বিবাহের ওরূপ পরিষ্কার ব্যাখ্যা আর কোথাও নাই।" অতএব উক্ত সর্ব্বজনমান্য প্রবন্ধদ্বয়কে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিয়া আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি--এবং এই উপলক্ষে আমার মতামত যথাসাধ্য ব্যক্ত করিয়াছি। *

চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার "হিন্দু পত্নী" প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে ভারতে হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে অতি উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর দেশে খৃষ্টধর্ম্ম স্ত্রীজাতিকে যত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতের হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করিয়াছিল; হিন্দুধর্ম্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে নাই পুরুষের দেবতা করিয়াছিল। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" যেখানে নারী পূজিতা হন সেখানে দেবতারা সন্তুষ্ট হন।"

* এইখানে বলা আবশ্যক চন্দ্রনাথ বাবু যখন বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তখন এ বিষয়ে আন্দোলন কিছুই ছিল না। সুতরাং বিবাহের সমস্ত দিক আলোচনার তেমন আবশ্যক ছিল না। তখন, সহৃদয় কল্পনার দ্বারা নীত হইয়া হিন্দু বিবাহের কোন একরূপ বিশেষ ব্যাখ্যা করা আশ্চর্য্য নহে, ইহাতে সাহিত্যের অধিকার আছে। কিন্তু আজকাল বিষয়টি যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহাকে কেবল সাহিত্যের হিসাবে দেখিলে আর চলে না। এই জন্য সাহিত্যের কল্পনা-পূর্ণ ভাষাও ভাবকে অনুসন্ধান ও যুক্তির দ্বারা নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া দেখিতে হইতেছে। বর্ত্তমান আন্দোলন যদি চন্দ্রনাথ বাবু পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিতেন তবে তাঁহার প্রবন্ধ আর-একরূপ হইত। তাহা হইলে তাঁহার প্রবন্ধে সাহিত্যরস অপেক্ষাকৃত অল্প থাকিত এবং তিনি তাঁহার বিষয়টিকে একমাত্র যুক্তির সাহায্যে দুর্গম পথের মধ্য দিয়া অতি সাবধানে লইয়া যাইতেন। তিনি যে বিবাহের কথা বলিয়াছেন তাহা সমাজের কোন কাল্পনিক অবস্থায় ঘটিলেও ঘটিতে পারিত, কিন্তু আজকাল যে আন্দোলন উঠিয়াছে তাহা ভালমন্দপরিপূর্ণ সমাজের প্রাত্যহিক বিবাহ লইয়া। কিন্তু তাঁহার উক্ত সাহিত্যপ্রবন্ধের ভাষা লইয়া আজকাল সকলেই কার্য্যস্থলে ব্যবহার করিতেছেন, সুতরাং কঠিন যুক্তির দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধ সমালোচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে চন্দ্রনাথবাবুর দোষ নাই এবং আমারও দোষ নাই—ঘটনাক্রমেই এইরূপ হইয়া পড়িল।

প্রাচীন কালে স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহি, এবং আমার শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে নাই। কিন্তু আজকাল মুখে ও লেখায় ও অনুবাদে শাস্ত্রচর্চ্চা দেশে এতটুকু ব্যাপ্ত হইয়াছে যে শাস্ত্র-সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অধিকার অনেকেরই জন্মিয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবুর মত সত্য কি মিথ্যা তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু এটুকু বলিতে পারি যে চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার মত ভালরূপ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তিনি যেমন দুই একটি শ্লোক আপন মতের স্বাপক্ষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন আমিও তেমনি অনেকগুলি শ্লোক তাঁহার মতের বিপক্ষে উদ্ধৃত করিতে পারি। কিন্তু মনুসংহিতায় স্ত্রীনিন্দাবাচক যে সকল শ্লোক আছে তাহা উদ্ধৃত করিতে লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়। যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোক পাঠ করিবেন। আমি কেবল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোক এইখানে পাঠ করি।

শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবং
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ।

শয্যা, আসন, অলঙ্কার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা ও কুৎসিৎ আচার স্ত্রীলোক হইতে হয় ইহা মনু কল্পনা করিয়াছেন।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ
নিরিন্দ্রিয়াহ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ।

যেহেতুক স্ত্রীলোকের মন্ত্র দ্বারা কোন ক্রিয়া নাই ধর্ম্মের এইরূপ ব্যবস্থা, অতএব ধর্ম্মজ্ঞানহীন মন্ত্রহীন স্ত্রীগণ অনৃত—মিথ্যা পদার্থ।

এ সকল শ্লোকের দ্বারা স্ত্রীলোকের সম্মান কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে হিন্দুবিবাহের সহিত কোম্‌তের মতের তুলনা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যতদূর কোম্‌ৎশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষাও অনেক অল্প, কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুই এক কথায় স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কোম্‌তের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই স্থানটি উদ্ধৃত করি—“বিবাহের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের মত যে কতদূর পাকা তাহা এতদিনের পর ইউরোপে কেবল কোম্‌তের শিষ্যেরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং হৃদয়ের গুণসম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্য স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।” বলা বাহুল্য কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন মনু মুক্তকণ্ঠে ঠিক তাহা বলেন নাই। মহাভারতে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরও মুক্তকণ্ঠে কোম্‌তের মত সমর্থন করেন নাই। অনুশাসন পর্ব্বে অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়ে স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরে যে কথোপকথন হইয়াছে বর্ত্তমান সমাজে তাহার সমগ্র ব্যক্ত করিবার

যোগ্য নহে। অতএব তাহার স্থানে স্থানে পাঠ করি। কালীসিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারত আমার অবলম্বন।—"কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর।" "উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই।" "তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প, ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিরে সংস্থাপন করিলে স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে সময় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত সমুদয় ও স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করেন সেই সময়েই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন "পুরুষে রোদন করিলে উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে।" কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যারে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে যাহাদের এরূপ বিশ্বাস তাহারা স্ত্রীলোককে যথার্থ সম্মান করিতে অক্ষম, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে কোম্‌ৎশিষ্যগণের মতের সহিত তাহাদের মতের ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের ও পুরুষের অবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। চন্দ্রনাথ বাবু শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—প্রাচীন সমাজে স্ত্রীলোকের সবিশেষ সম্মান ছিল, কিন্তু আমি দেখিতেছি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অসম্মানেরও প্রমাণ আছে অতএব এ বিষয়ে এখনো নিঃসংশয়ে কিছু বলিবার সময় হয় নাই।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অবস্থা সেকালে কিরূপ ছিল। চন্দ্রনাথ বাবু রঘুনন্দনের এক বচন উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, "হিন্দু ভার্য্যা পুণ্য বল, পবিত্রতা বল, অলৌকিকতা বল, দেবতা বল, মুক্তি বল, সবই।" সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন আমাদের দেশে সর্ব্বসাধারণের সংস্কার এই যে স্বামীই স্ত্রীর দেবতা, কিন্তু স্ত্রী যে স্বামীর দেবতা ইহা ইতিপূর্ব্বে শুনা যায় নাই।—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পণ স্বরূপে দান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিবেন তৎপূর্ব্বে তিনি আপনাকে দান করিয়াছিলেন। তাহার উত্তর এই যে, আপনাকে সম্মান করিতে কেহ বাধ্য নহে, কিন্তু মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে সকলে বাধ্য। দ্রৌপদী যদি সত্যই যুধিষ্ঠিরের মান্যা হইতেন, দেবতা হইতেন, তবে যুধিষ্ঠির কখনই তাঁহাকে দ্যূতের পণ্যস্বরূপ দান করিতে পারিতেন না। প্রকাশ্য সভায় যখন দ্রৌপদী যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়াছিলেন তখন ভীষ্মদ্রোণ-ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ সভাস্থগণ কে স্ত্রীসম্মান রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন! ঐ দ্রৌপদীই যখন প্রকাশ্যভাবে বিরাট সভায় কীচকের পদাঘাত সহ্য করেন তখন সমস্ত সভাস্থলে কেহই স্ত্রীসম্মান রক্ষা করে নাই। মনুসংহিতায় দণ্ডবিধির মধ্যে এক স্থলে আছে—

ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যোভ্রাতা চ সোদরঃ।
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যুরজ্জা বেণুদলেন বা॥

স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য ও সোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি অপরাধ করে, সূক্ষ্ম রজ্জু অথবা বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাড়ন করিবে।—দেবতার প্রতি এরূপ রজ্জু ও বেণুদলের তাড়ন ব্যবস্থা হইতে পারে না। স্বামীও স্ত্রীর দেবতা কিন্তু স্বামীদেবতা স্ত্রীর হস্ত হইতে এরূপ অর্ঘ্য শাস্ত্রবিধিঅনুসারে কখন গ্রহণ করেন নাই, তবে শাস্ত্রের অনভিমতে সম্মার্জ্জনী প্রয়োগ প্রভৃতির উল্লেখ এখানে আমি করিতে চাহি না। যাহাই হউক আমার এবং বোধ করি সাধারণের বিশ্বাস এই যে হিন্দু স্ত্রী কোন কালে হিন্দু স্বামীর দেবতা ছিলেন না। অতএব এস্থলে হিন্দুশাস্ত্রের সহিত কিঞ্চিৎ বলপূর্ব্বক কোম্‌ৎশাস্ত্রের অসবর্ণ মিলন সংঘটন করা হইয়াছে।

বিবাহ বিশেষ আলোচনায় তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্যবন্ধন কিরূপ ঘনিষ্ঠ। চন্দ্রনাথ বাবু বলেন হিন্দুবিবাহে যেরূপ একীকরণ দেখা যায় এরূপ অন্য কোন জাতির বিবাহে দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এক স্বামী ও এক স্ত্রীর একীকরণ বিবাহের উচ্চতম আদর্শ। সে আদর্শ আমাদের দেশে যদি জাজ্জল্যমান থাকিত তবে এদেশে বহুবিবাহ কিরূপে সম্ভব হইত! মহাভারত পাঠে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী ছিল। তখনকার অন্যান্য রাজপরিবারেও বহুবিবাহ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ ঋষিদিগেরও একাধিক পত্নী দেখা যাইত। অন্য ঋষির কথা দূরে যাউক্ বশিষ্ঠের দৃষ্টান্ত দেখ। অরুন্ধতীই যে তাঁহার একমাত্র স্ত্রী তাহা নহে অক্ষমালা নামে এক অধম জাতীয়া নারী তাঁহার অপর স্ত্রী ছিলেন। এরূপ ব্যবস্থাকে ন্যায্যমতে একীকরণ বলা উচিত হয় না, ইহাকে পঞ্চীকরণ, ষড়ীকরণ, সহস্রীকরণ বলিলেও দোষ নাই। কেহ কেহ বলিবেন স্ত্রী যতগুলিই থাক্ না কেন সকল গুলিই স্বামীর সহিত মিশিয়া একেবারে এক হইয়া যাইবে ইহাই হিন্দু বিবাহের গৌরব! স্ত্রী যত অধিক হয় বিবাহের গৌরবও বোধ করি তত অধিক, কারণ একীকরণ ততই গুরুতর। কিন্তু একীকরণ বলিতে বোধ করি এই বুঝায় যে প্রেমবিনিময়বশতঃ স্বামীস্ত্রীর হৃদয় মনের সর্ব্বাঙ্গীন্ ঐক্য। এবং এরূপ ঐক্য যে দাম্পত্যবন্ধনের পবিত্র আদর্শ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু প্রেমপ্রভাবে হৃদয়ের ঐক্য যেখানে মুখ্য আদর্শ সেখানে বহুদারপরিগ্রহ সম্ভব হইতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের পরিপূর্ণ মিলন যদি হিন্দু বিবাহের যথার্থ প্রাণ হইত তবে এদেশে কৌলিন্য বিবাহ কোন মতেই স্থান পাইত না। বিবাহের যত কিছু আদর্শের উচ্চতা সে কেবল মাত্র পত্নীর বেলায়, পতিকে সে আদর্শ স্পর্শ করিতেছে না। কিন্তু ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, বিবাহ পতি পত্নী উভয়ে মিলিয়া হয়! কিন্তু এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার আশ্চর্য্য উত্তর দিয়াছেন। হিন্দু বিধবার ন্যায় বিপত্নীক পুরুষও যে কেন নিষ্কাম

ধর্ম্ম অবলম্বন করেন না তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন "হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না; হিন্দু মানেন অনুপাতবাদ। ক খ যখন সমান নহে, তখন তাহারা সমান পাইবেও না; ক যেমন, তেমনিই ক পাইবে; খ যেমন, তেমনিই খ পাইবে। ক খ মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ; কর ও খর স্বত্বাধিকার মধ্যেও সেইরূপ অনুপাত হইবে। হিন্দু এই অনুপাত-বাদী। হিন্দু, স্ত্রী পুরুষের সাম্য স্বীকার করেন না; কাজেই হিন্দু স্ত্রী পুরুষ মধ্যে অবস্থার সাম্য ব্যবস্থা করেন না।" এ কথা যদি বল তবে কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে হয় বলা যায় না! তুমি বলিতেছ নিষ্কাম ধর্ম্মের পবিত্র মহত্ব আছে অতএব স্বামীর মৃত্যুর পর কামনা বিসর্জ্জন দিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিবার যে অবসর পাওয়া যায় তাহা অতি পবিত্র অবসর, সে অবসর অবহেলা করা উচিত নহে।—এখন তোমার সাম্য বৈষম্যের দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি, নিষ্কামধর্ম্মও কি হিন্দুদের ন্যায় অনুপাতবাদ মানিয়া চলেন? পুরুষের পক্ষেও নিষ্কামধর্ম্ম কি পবিত্র নহে—অতএব কষ্টসাধ্য হইলেও হিন্দু-বিবাহের পরম একীকরণ এবং আধ্যাত্মিক মিলনের দ্বারা অনিবার্য্যবেগে চালিত হইয়া স্ত্রীবিয়োগে পুরুষেরও নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করা কেন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয় নাই? তাহার বেলায় ক খ ও অনুপাতবাদের হেঁয়ালিধূম বিস্তার করিবার তাৎপর্য্য কি? পবিত্র একনিষ্ঠ অচল দাম্পত্য প্রেম পুরুষেরও মহত্বের লক্ষণ ও হৃদয়ের উন্নতির অন্যতম কারণ তাহা কোন্ অনুপাতবাদী অস্বীকার করিতে পারেন?

তবে এমন যদি বল যে, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার কথা ছাড়িয়া দাও—হিন্দুবিবাহ সাংসারিক সুবিধার জন্য, তবে সে এক স্বতন্ত্র কথা। তাহা হইলে অনুপাতবাদের হিসাব কাজে লাগিতে পারে। অক্ষয় বাবু বলেন—"অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন এ সিদ্ধান্ত—বিবাহের অতি নিকৃষ্টভাগ, অতি সামান্য ভাগ, দেখিয়াই হইয়াছে। হিন্দুবিবাহের অতি উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে; সকল ব্যাপারেই হিন্দুর আধ্যাত্মিক দিকে দৃষ্টি প্রখরা। হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।" অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজনীয়তা যে বিবাহের অতি নিকৃষ্টভাগ অতি সামান্যভাগ এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। এবং প্রাচীন হিন্দুরা যে ইহাকে নিকৃষ্ট ও সামান্য জ্ঞান করিতেন আমার তাহা বোধ হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য "ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-প্রণালী" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন "মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা যাহা কিছু উপদেশ করিয়াছেন সমাজই সে সকলের কেন্দ্রস্থান, সমাজের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়াই সেই সকল ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে।" অতএব সমাজের কল্যাণের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তবে অপত্যোৎপাদন বিবাহের নিতান্ত সামান্য ও নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য কেহই বলিবেন না। সুস্থকায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ প্রফুল্লচিত্ত সুচরিত্র সন্তান উৎপাদন অপেক্ষা সমাজের মঙ্গল আর কিসে সাধিত হইতে পারে! পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা একথা আমাদের

সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। মনু কহিতেছেন "প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হাগৃহদীপ্তয়ঃ।" "সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রীগণ বহুকল্যাণভাগিনী, পূজনীয়া ও গৃহের শোভাজনক হয়েন।" "উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং। প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনং" স্ত্রীগণ অপত্যের উৎপাদন অপত্যের পালন ও প্রত্যহ লোকযাত্রার প্রত্যক্ষ নিদান হয়েন।—যেখানে মনু বলিয়াছেন—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" সেইখানেই বলিয়াছেন "যদিহি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ। অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ত্ততে।" নারী যদি দীপ্তি প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে তিনি স্বামীর হর্ষোৎপাদন করিতে পারেন না। স্বামীর হর্ষোৎপাদন করিতে না পারিলে সন্তানোৎপাদন সম্পন্ন হয় না।

এই সমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহই হিন্দুবিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং কেবল সেই উদ্দেশ্যেই যতটা একীকরণ সাংসারিক হিসাবে আবশ্যক তাহার প্রতি হিন্দু-ধর্ম্মের বিশেষ মনোযোগ। অনেক সময়ে সংসার যাত্রানির্ব্বাহের সহায়তা জন্যই পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে বাধ্য। কারণ অপত্য উৎপাদন যখন বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য তখন বন্ধ্যা স্ত্রীসত্বে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ শাস্ত্রমতে অন্যায় হইতে পারে না। এমন কি, প্রাচীনকালে অশক্ত স্বামীর নিয়োগানুসারে অথবা নিরপত্য স্বামীর মৃত্যুতে দেবরের দ্বারা সন্তানোৎপাদন স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম্মহানিজনক ছিল না। মহাভারতে ইহার অনেক উদাহরণ আছে।

অতএব সন্তান উৎপাদন, সন্তান পালন ও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ যদি হিন্দুবিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে দেখা যাইতেছে উক্ত কর্ত্তব্য সাধনের পক্ষে স্ত্রীলোকের এক-পতিনিষ্ঠ হওয়ার যত আবশ্যক পুরুষের পক্ষে একপত্নীনিষ্ঠ হইবার তেমন আবশ্যক নাই। কারণ বহুপতি থাকিলে সন্তান পালন ও লোকযাত্রার বিশেষ ব্যাঘাৎ ঘটে, কিন্তু বহুপত্নীতে সে ব্যাঘাত না ঘটিতেও পারে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার বিবাহ সংসার-যাত্রার সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ অধিকাংশস্থলে সংসারে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। কারণ, বিধবার যদি সন্তানাদি থাকে তবে সেই সন্তানদিগকে হয় এক কুল হইতে কুলান্তরে লইয়া যাইতে হয়, নচেৎ তাহাদিগকে মাতৃহীন হইয়া থাকিতে হয়। সন্তানাদি না থাকিলেও বিধবারমণীকে পুরাতন ভর্ত্তৃকুল হইতে নুতন ভর্ত্তৃকুলে লইয়া যাওয়া নানাকারণে সমাজের অসুখ ও অসুবিধাজনক। অতএব যখন সাংসারিক সুবিধার কথা হইতেছে কোন প্রকার আধ্যাত্মিকতার কথা হইতেছে না তখন এস্থলে অনুপাতবাদ গ্রাহ্য। এই জন্য মনু পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহের স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন—

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি
পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেবচ।

পূর্ব্বমৃতা ভার্য্যার দাহকর্ম্ম সমাধা করিয়া পুরুষ পুনর্ব্বার স্ত্রী ও শ্রৌত অগ্নিগ্রহণ করিবেন।—এখানে সংসারধর্ম্মের প্রতিই মনুর লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। আধ্যাত্মিক মিলনের প্রতি অনুরাগ ততটা প্রকাশ পাইতেছে না। বিবাহের আধ্যাত্মিকতা কাহাকে বলে? সমস্ত বিরহ বিচ্ছেদ অবস্থান্তর সমস্ত অভাব দুঃখ ক্লেশ এমন কি কদর্য্যতা ও অবমাননা অতিক্রম করিয়াও ব্যক্তিবিশেষ বা ভাববিশেষের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার যে একটি পবিত্র উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য আছে তাহাকেই যদি আধ্যাত্মিকতা বল, এবং যদি বল সেই আধ্যাত্মিকতাই হিন্দুবিবাহের মুখ্য অবলম্বন এবং সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি সামাজিক কর্ত্তব্য তাহার গৌণ উদ্দেশ্য তাহার সামান্য ও নিকৃষ্ট অংশ তবে কোন যুক্তি অনুসারেই বহুবিবাহ ও স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয় বিবাহ আমাদের সমাজে স্থান পাইতে পারিত না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিবাহ বলিতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই পরস্পরের সম্মিলন বুঝায়—বিবাহ লইয়া সম্প্রতি এত আন্দোলন পড়িয়াছে এবং বুদ্ধির প্রভাবে অনেকে অনেক নূতন কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কাহারো মতভেদ শুনা যায় নাই।

অনেকে হিন্দুবিবাহের পবিত্র একীকরণ প্রসঙ্গে ইংরাজী ডাইভোর্স্ প্রথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। ডাইভোর্স্ প্রথার ভালমন্দ বিচার করিতে চাহিনা, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে ডাইভোর্স্ প্রথা নাই বলিয়া যে আমাদের বিবাহের একীকরণতা বিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। যে দেশে শাস্ত্র ও রাজ নিয়মে একাধিক বিবাহ হইতেই পারে না সেখানে ডাইভোর্স্ প্রথা দূষনীয় বলা যায় না। স্ত্রী অসতী হইলে আমরা ইচ্ছামত তাহাকে ত্যাগ করিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি। স্বামী ব্যভিচারপরায়ণ হইলেও স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। স্বামী যখন প্রকাশ্যভাবে অন্যস্ত্রী অথবা বারস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পবিত্র একীকরণের মস্তকের উপর পঙ্কিল পাদুকা-সমেত দুই চরণ উত্থাপন করেন তখন অরণ্যে রোদন ছাড়া স্ত্রীর আর কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। যদি জানা যাইত অন্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে বিবাহিত পুরুষের অধিকাংশই বারস্ত্রীসক্ত নহে তবে হিন্দুবিবাহের পবিত্র প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহ মোচন হইত। কিন্তু যখন পুরুষ যথেচ্ছা বিবাহ ও ব্যভিচার করিতে পারে এবং স্ত্রীলোকের স্বামীত্যাগের পথ কঠিন নিয়মের দ্বারা রুদ্ধ তখন এ প্রসঙ্গে কোন তুলনাই উঠিতে পারে না।

আমাদের দেশে বিবাহিত পুরুষদের মধ্যে দাম্পত্যনীতিসম্বন্ধে যথেচ্ছাচার যে যথেষ্ট প্রচলিত তাহা বোধ করি কাহাকেও বলিতে হইবে না। বৃদ্ধ লোকেরা অবগত আছেন, কিছুকাল পূর্ব্বে অন্যান্য নানা আয়োজনের মধ্যে বেশ্যা রাখাও বড়মানুষীর এক অঙ্গ ছিল। এখনো দেখা যায় দেশের অনেক খ্যাতনামা লোক প্রকাশ্যে রাজপথে গাড়ি করিয়া বেশ্যা লইয়া যাইতে এবং ধূমধাম করিয়া বেশ্যা প্রতিপালন করিতে

কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না এবং সমাজও সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছনা করে না। সমাজের অনেক তুচ্ছ নিয়মটুকু লঙ্ঘন করিলে যে দায়ে পড়িতে হয় ইহাতে তত-টুকু দায়ও নাই। অতএব ডাইভোর্স্ প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়াই ইহা বলা যায় না যে আমাদের দেশে বিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক একীকরণতা-রক্ষার প্রতি সমাজের বিশেষ মনোযোগ আছে।

যাহা হউক্, আমার বক্তব্য এই যে হিন্দুবিবাহের যথার্থ যাহা মর্ম্ম, ইতিহাস হইতে তাহা প্রমাণ না করিয়া যদি ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আপন মনের মত এক নূতন আদর্শ গড়িয়া তাহাকে পুরাতন বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করি তবে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। আমরা ইংরাজী শিক্ষা হইতে অনেক Sentiment প্রাপ্ত হইয়াছি (Sentiment শব্দের বাঙ্গলা আমার মনে আসিতেছে না) অনেক দেশানুরাগী ব্যক্তি সেই গুলিকে দেশীয় ও প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন, এবং তাঁহারা বিরোধী পক্ষকে বিজাতীয় শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া উপহাস করেন। কেবল Sentiment নহে অনেকে Evolution, Natural Selection, Magnetism প্রভৃতি নব্য বিজ্ঞানতত্ত্বসকলও প্রাচীন ঋষিদের জটাজালের মধ্য হইতে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বাছিয়া বাহির করিতেছেন। কিন্তু সাপুড়ে অনেক সময়ে নিরীহ দর্শকের ক্ষুদ্র নাসাবিবর হইতে একটা বৃহৎ সাপ বাহির করে বলিয়াই যে উক্ত নাসাবিবর যথার্থ সেই সাপের আশ্রয় স্থল বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এমন নহে। সাপ তাহার বৃহৎ ঝুলিটার মধ্যেই ছিল। Sentimentসকলও আমাদের ঝুলিটার মধ্যেই আছে, আমরা নানা কৌশলে ও অনেক বাঁশি বাজাইয়া সে গুলি প্রাচীন পুঁথির মধ্য হইতেই যেন বাহির করিলাম এইরূপ অন্যকে এবং আপনাকেও বুঝাইতেছি। হিন্দুবিবাহের মধ্যে আমরা যতটা Sentiment পূরিয়াছি তাহার কতটা Comteর, কতটা ইংরাজি কাব্যসাহি-ত্যের, কতটা খৃষ্টধর্ম্মের "স্বর্গীয় পবিত্রতা" নামক শব্দ ও ভাববিশেষের এবং কতটা প্রাচীন হিন্দুর এবং কতটা আধুনিক আচারের তাহা বলা দুঃসাধ্য। সাংসারিকতাকে প্রাচীন হিন্দুরা হেয়জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু খৃষ্টানেরা করেন। অতএব পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা একথা স্বীকার করা হিন্দুর পক্ষে লজ্জার কারণ নহে, খৃষ্টানের পক্ষে বটে। হিন্দু স্ত্রীকে যে পতিপ্রাণা হইতে হইবে সেও সাংসারিক সুবিধার জন্য। পুত্রার্থেই বিবাহ কর বা যে কারণেই কর না কেন, স্ত্রী যদি পতিপ্রাণা না হয় তবে অশেষ সাংসা-রিক অসুখের কারণ হয়, এবং অনেক সময়ে বিবাহের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়, অতএব সাংসারিক শৃঙ্খলার জন্যই স্ত্রীর পতিপ্রাণা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে স্বামীর পত্নীগতপ্রাণ হইবার এত আবশ্যক নাই যে তাহার জন্য ধরাবাঁধা করিতে হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে "সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা," সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী" সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, কিন্তু ইহা বলিয়াই শেষ হয় নাই—তাহার উপরে বলা

হইয়াছে সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী। আধ্যাত্মিক পবিত্রতা যতই থাক্ সন্তান না হইলেই হিন্দুবিবাহ ব্যর্থ।

এইখানে আমার মনে একটি আশঙ্কা জন্মিতেছে। যে শব্দের পরিষ্কার অর্থ নাই অথবা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই তাহা ইচ্ছামত নানাস্থানে নানা অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাতে সে শব্দের উপযোগিতা বাড়ে কি কমে তাহা বিচারের যোগ্য। সকলেই জানেন আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় "ইয়ে" নামক সর্ব্বভুক্ সর্ব্বনাম শব্দ আছে, শব্দ বা ভাবের অভাব হইলেই তৎক্ষণাৎ "ইয়ে" আসিয়া ভাষার শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দেয়। এই সুবিধা থাকাতে আমাদের মানসিক আলস্য ও ভাব-প্রকাশের অক্ষমতা সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। Magnetismএর স্বরূপ সম্পূর্ণ অবগত না থাকাতে উক্ত শব্দকে আশ্রয় করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক উপকথা সমাজে প্রচলিত হয়। Magnetism-এর কুহেলিকাময় ছদ্মবেশে আবৃত হইয়া আমাদের আর্য্য-শাস্ত্রের অনেক প্রমাণহীন উক্তি ও অর্থহীন আচার বিজ্ঞানের সহিত এক পংক্তিতে আসন পাইবার মন্ত্রনা করে। সম্প্রতি Psychic Force নামক আরেকটি অজ্ঞাত-কুল-শীল শব্দ Magnetism-এর পদ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। যত দিন না স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া তাহার মুক্তিলাভ হয় ততদিন সে প্রদোষের অন্ধকারে জীর্ণমতের ভগ্ন ভিত্তির মধ্যে ও দেবতাহীন প্রাচীন দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষে প্রেতের ন্যায় সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইবে। অতএব মুক্তির উদ্দেশেই কথার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিবাহ "আধ্যাত্মিক" বলিতে কি বুঝায়? যদি কেহ বলেন যে সাংসারিক কার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাহ করার নামই আধ্যাত্মিক বিবাহ, কেবল মাত্র নিজের সুখ নহে সংসারের সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিবাহ করাই আধ্যাত্মিকতা, তবে বোধ হয় আধ্যাত্মিক শব্দের প্রতি অত্যাচার করা হয়। পার্ল্যামেণ্ট সভায় সমস্ত ইংলণ্ড এবং তাহার অধীনস্থ দেশের সুখ সম্পদ সৌভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু পার্ল্যামেণ্ট সভা কি আধ্যাত্মিকতার আদর্শস্বরূপ গণ্য হইতে পারে? যদি বল পার্ল্যামেণ্ট সভার সহিত ধর্ম্মের কোন যোগ নাই তাহা ঠিক নহে। দেশের "Church" যাহাতে যথানিয়মে অব্যাহত রূপে বজায় থাকে পার্ল্যামেণ্টকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। উক্ত সভার প্রত্যেক সভ্যকে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্বীকার করিতে হয়, এবং ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করিতে হয়। যদি বল পার্ল্যামেণ্টের কার্য্যকে ইংরাজেরা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করেন না—কিন্তু বিবাহকে আমরা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করি, অতএব আমাদের বিবাহ আধ্যাত্মিক, তবে তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমাদের কোন্ কাজটা ধর্ম্মের সহিত জড়িত নহে? সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ও পুণ্যের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—এমন কি ক্রূরকর্ম্মা দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির স্বর্গস্থ দেখিয়া যখন বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন তখন দেবগণ তাঁহাকে

এই বলিয়া সান্তনা করেন যে ক্ষত্রিয় সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হইয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন তাহারই প্রভাবে স্বর্গ প্রাপ্ত হন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই ক্ষত্রিয় দুর্য্যোধন যে যুদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহাকে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ বলিবে কি না? শরীর রক্ষার্থে আহার ব্যবহার-সম্বন্ধে ধর্ম্মের নামে শাস্ত্রে সহস্র অনুশাসন প্রচলিত আছে তাহার সকল গুলিকে আধ্যাত্মিক বলা যায় কি না? শূদ্রকে শাস্ত্রজ্ঞান দেওয়া আমাদের ধর্ম্মে নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি অন্য এক জন ব্রাহ্মণ মাঝখানে থাকেন ও তাঁহাকে উপলক্ষ্য রাখিয়া শূদ্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে তাহাতে অধর্ম্ম নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, শূদ্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলে তাহার আধ্যাত্মিকতার ব্যাঘাত হয় কি না এবং ব্রাহ্মণ মধ্যবর্ত্তী থাকিলেই সে ব্যাঘাত দূর হয় কি না? ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইলেও এ সকল লৌকিক নিয়ম না আধ্যাত্মিক নিয়ম? যখন আমাদের সকল কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রকে যদি আধ্যাত্মিকতা বল, তবে আধ্যাত্মিক বিবাহের বিশেষ উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, তবে আমরা যাহাই করি না কেন আধ্যাত্মিকতার হাত এড়াইবার যো নাই।

যদি বল হিন্দু স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ অনন্ত সম্বন্ধ, দেহের অবসানে স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ নাই এই জন্য তাহা আধ্যাত্মিক, তবে সে কথাও বিচার্য্য। কারণ হিন্দুশাস্ত্রে কর্ম্মফলানুসারে জন্মান্তর পরিগ্রহ কল্পিত হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত কর্ম্মফলের প্রভেদ আছেই অতএব পরজন্মে পুনরায় উভয়ের দাম্পত্যবন্ধন দৈবক্রমে হইতেও পারে কিন্তু তাহা অবশ্যম্ভাবী নহে। আমাদের শাস্ত্রে জন্মান্তরের ন্যায় স্বর্গ নরক কল্পনাও আছে—কিন্তু সকল সময়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই যে একত্রে স্বর্গ বা নরকে গতি হইবে তাহা নহে। যদি পুণ্যবলে উভয়েই স্বর্গে যায় তবে পুণ্যের তারতম্য অনুসারে লোকভেদ আছে, এবং পাপভেদে নরকেও সেইরূপ ব্যবস্থা। আমাদের শাস্ত্রে পাপপুণ্যের নিরতিশয় সূক্ষ্ম বিচারের কল্পনা আছে, এস্থলে বিবাহের অনন্তকালস্থায়িত্ব সম্ভব হয় কি রূপে? অতএব হিন্দুশাস্ত্রমতে সাধারণতঃ ইহজীবনেই দাম্পত্য বন্ধনেরসীমা অতএব তাহাকে ইহলৌকিক অর্থাৎ সাংসারিক বলিতে আপত্তি কিসের? দাম্পত্যবন্ধনের ঐহিক সীমাসম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস বদ্ধমূল। কুমারী যখন স্বামী প্রার্থনা করে তখন সে বলে যেন রামের মত বা মহাদেবের মত স্বামী পাই। পূর্ব্বজন্মের স্বামী এ জন্মেও আধ্যাত্মিক মিলনে বদ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করিবে এ বিশ্বাস যদি কুমারীর থাকিত তবে এ প্রার্থনা সে করিত না। বাল্মীকির রামায়ণে কি আছে স্মরণ নাই কিন্তু সাধারণে প্রচলিত গান এবং উপাখ্যানে শুনা যায় সীতা রামকে বলিতেছেন পরজন্মে যেন তোমার মত স্বামী পাই—কিন্তু তোমাকেই পাই এ কথা কেন বলা হয় নাই?—

অনেকে বলেন অন্য দেশের বিবাহ চুক্তিমূলক, আমাদের দেশে ধর্ম্মমূলক অতএব তাহা আধ্যাত্মিক। কিন্তু তাঁহাদের এ কথাটাই অমূলক। ইউরোপের ক্যাথলিক ধর্ম্মশাস্ত্রে

বলে "Our divine Redeemer sanctified this holy state of matrimony, and from a natural and civil contract raised it to the dignity of a Sacrament. And St. Paul declared it to be a representative of that sacred union which Jesus Christ had formed with his spouse the Church. ইহার মর্ম্ম এই—বিবাহ পূর্ব্বে প্রাকৃতিক ও সামাজিক চুক্তিমাত্র ছিল কিন্তু যিশুখৃষ্ট ইহাকে উদ্ধার করিয়া মন্ত্রপূত পবিত্র সংস্কার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ধর্ম্মমণ্ডলীর সহিত দেবতার যে পুণ্য মিলন সংঘটিত হইয়াছে বিবাহ সেই পুণ্য মিলনের সামাজিক প্রতিনিধি স্বরূপ! বিবাহ সময়ে ক্যাথলিক স্ত্রী ঈশ্বরের নিকট যে প্রার্থনা করেন তাহাও পাঠ করিলে য়ুরোপীয় দাম্পত্য একীকরণতা সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইবে। অতএব অন্য দেশের বিবাহের তুলনায় হিন্দু বিবাহকে বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক আখ্যা দেওয়া হয় কেন? আধ্যাত্মিক শব্দের শাস্ত্রসঙ্গত ঠিক অর্থটি কি তাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক শব্দের আভিধানিক অর্থ "আত্মা সম্বন্ধীয়"। কোন খণ্ড-কালে বা খণ্ডদেশে যাহার অবসান নাই, এমন যে এক অজর অমর সূক্ষ্ম সত্তা আমাদের দেহে বর্ত্তমান, তাহা সহজবোধ্যই হৌক্ বা দুর্ব্বোধ্যই হৌক্—তৎসম্বন্ধীয় যে ভাব তাহাকে আধ্যাত্মিক ভাব বলে। এ আত্মা সমাজ নহে, এবং এ সমাজে এ সংসারে ও এ দেহে আত্মার নিত্য অবস্থিতি নহে—অতএব বিবাহ যদি শ্বশুর শ্বশ্রূ পরিবার প্রতিবেশী অতিথি ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সমষ্টীভূত সমাজ রক্ষার জন্য হয় অথবা ক্ষণিক আত্মসুখের জন্য হয় তাহাকে কোন্ অর্থ অনুসারে আধ্যাত্মিক আখ্যা দেওয়া যায়? যে উদ্দেশ্য জন্মমৃত্যু-সংসারকে অতিক্রম করিয়া নিত্য বিরাজ করে তাহাকেই আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য কহে। কিন্তু হিন্দুমতে বিবাহ নিত্য নহে, আত্মার নিত্য আশ্রয় নহে। হিন্দুদের বানপ্রস্থকে আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে। কারণ তাহা প্রকৃত পক্ষে আত্মার মুক্তি-সাধন উপলক্ষেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তাহা সংসারের হিতসাধনের জন্য নহে।

যাহা হউক্ আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখিতেছি আমাদের বিবাহ সামাজিক বলিয়াই সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এমন কি এখন মনুর নিয়মও সমস্ত রক্ষিত হয় না। অতএব বর্ত্তমান সমাজের সুবিধা ও আবশ্যক অনুসারে হিন্দু বিবাহ সমালোচন করিবার অধিকার আছে। যদি দেখা যায় হিন্দু-বিবাহে আমাদের বর্ত্তমান সমাজে রোগ শোক দারিদ্র্য বাড়িতেছে, তবে বলা যাইতে পারে, মনু সমাজের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া বিবাহের নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন অতএব সেই সমাজের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহের নিয়ম পরিবর্ত্তন করা অন্যায় নহে। ইহাতে মনুর অবমাননা করা হয় না প্রত্যুত তাঁহার সম্মাননা করাই হয়। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রাজবিধির সহায়তা লইয়া সমাজসংস্কার আমার মত নহে। জীবনের সকল কাজই যে লাল পাগ্‌ড়ির ভয়ে করিতে হইবে, আমাদের জন্য

সর্ব্বদাই যে একটা বড় দেখিয়া বিজাতীয় জুজু পুষিয়া রাখিতে হইবে, আপন মঙ্গল অমঙ্গল কোন কালেই আপনারা বুঝিয়া স্থির করিতে পারিব না ইহা হইতেই পারে না। জুজুর হস্তে সমাজ সমর্পণ করিলে সমাজের আর উদ্ধার হইবে কবে?

বিবাহের বয়স নির্ণয় লইয়া কিছু দিন হইতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যদি এমন বিবেচনা করা যায় যে সন্তানোৎপাদন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সুস্থ সবল সন্তান উৎপাদন সমাজের কল্যাণের প্রধান হেতু তবে সুস্থ সন্তানোৎপাদন পক্ষে স্ত্রী পুরুষের কোন্ বয়স উপযোগী বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহা স্থির করা আবশ্যক। কিন্তু কিছুদিন হইতে আমাদের শিক্ষিত সমাজ এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোন কথাই শুনিবেন না বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা শারীরতত্ত্ববিৎ কোন পণ্ডিতেরই মত শুনিতে চাহেন না, আপনারাই মত দিতেছেন। তাঁহারা বলেন বাল্যবিবাহে সন্তান দুর্ব্বল হয় এ কথা শ্রবণযোগ্য নহে। তাঁহাদের মতে আমাদের দেশের মনুষ্যেরাই যে কেবল দুর্ব্বল তাহা নহে পশুরাও দুর্ব্বল অথচ পশুরা বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে মনুর বিধান মানিয়া চলে না—অতএব বাল্যবিবাহের দোষ দেওয়া যায় না, দেশের জল বায়ুরই দোষ। এ বিষয়ে গুটিদুয়েক বক্তব্য আছে—সত্যই যে আমাদের দেশের সকল জন্তুই অন্য দেশের তজ্জাতীয় জন্তুদের অপেক্ষা দুর্ব্বল তাহা রীতিমত কোন বক্তা বা লেখক প্রমাণ করেন নাই। আমাদের বঙ্গদেশের ব্যাঘ্র ভুবনবিখ্যাত জন্তু। বাঙ্গলার হাতী বড় কম নহে, অন্য দেশের হাতির সহিত ভালরূপ তুলনা না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোন মত ব্যক্ত করা অন্যায়। আমাদের দেশের বন্যপশুদের সহিত অন্য দেশের বন্য পশুর তুলনা কেহই করেন নাই। গৃহপালিত পশু অনেক সময়ে পালকের অজ্ঞতাবশতঃ হীনদশা প্রাপ্ত হয়, অতএব তাহাদের বিষয়েও ভালরূপ না জানিয়া কেবল চোখে দেখিয়া কিছুই বলা যায় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, মনুষ্যের উপরে যে জলবায়ুর প্রভাব আছে এ কথা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলিয়া বাল্যবিবাহের কথা চাপা দেওয়া যায় না। শ্যালককে মন্দ বলিলেই যে ভগ্নাপতিকে ভাল বলা হয় ন্যায়শাস্ত্রে এরূপ কোন পদ্ধতি নাই। দেশের জল বায়ুর অনেক দোষ থাকিতে পারে কিন্তু বাল্যবিবাহের দোষ তাহাতে কাটে না, বরং বাড়ে। বাল্যবিবাহে দুর্ব্বল সন্তান জন্মিয়া থাকে একথা শুনিলেই অমনি আমাদের দেশের অনেক লোক বলিয়া উঠেন—এবং লিখিয়াও থাকেন—যে—"ম্যালেরিয়াতে দেশ উচ্ছন্ন গেল তাহার বিষয় কিছুই বলিতেছ না কেবল বাল্যবিবাহের কথাই চলিতেছে!" যখন একটা কথা বলিতেছি তখন কেন যে সে কথাটা ছাড়িয়া দিয়া আরেকটা কথা বলিব তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। যাহারা কোন কর্ত্তব্য সমাধা করিতে চাহে না তাহারা এক কর্ত্তব্যের কথা উঠিলেই দ্বিতীয় কর্ত্তব্যের কথা তুলিয়া মুখচাপা দিতে চায়। আমরা অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং অতিশয় দূরদৃষ্টি ও সম্পূর্ণ সাবধানতা সহকারে দেশের সমস্ত

অভাব এবং বিঘ্ন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে সমালোচনা করিয়া এমন একটা প্রচণ্ড পাকা চাল চালিতে চাহি, যাহাতে একই সময়ে সকল দিকে সকল প্রকার সুবিধা করিতে পারি—এবং সজোরে "কীস্তিমাৎ" উচ্চারণ করিয়া তাহার পর হইতে যাবজ্জীবন নির্ব্বিঘ্নে তামাক এবং তাকিয়া সেবন করিবার অখণ্ড অবসর প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমরা বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালা হইলেও ঠিক এমন সুযোগটি সংঘটন করিতে পারিব না। এমন কি, আমাদিগকেও ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। অতএব দেশে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য দুর্ব্বলতার কারণ থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে বাল্য-বিবাহের কুফল সমালোচন ও তৎপ্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। একেবারে অনেক অধিক ভাবিতে পারিব না, কারণ অত্যন্ত অধিক চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিতে গেলে অনেক সময়ে চিন্তনীয় বিষয় সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া চিন্তার অতীত স্থানে গিয়া পৌঁছিতে হয়। মহাবীর হনুমান যদি অতিরিক্ত মাত্রায় লম্ফন শক্তি প্রয়োগ করিতেন তবে তিনি সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া লঙ্কায় না পড়িয়া লঙ্কা ডিঙ্গাইয়া সমুদ্রে পড়িতেও পারিতেন। ইহা হইতে এই প্রমাণ হইতেছে অন্যান্য সকল শক্তির ন্যায় চিন্তাশক্তিরও সংযম আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের কথায় যদি কর্ণপাত না করি, তবে সত্য সম্বন্ধে কিছু কিনারা করা দুর্ঘট। আমরা নিজে সকল বিষয়েই সকলের চেয়ে ভাল জানিতে পারি না, অতএব অগত্যা বিনীতভাবে পারদর্শীদের মত লইতেই হয়। কিছু দিন হইল আমাদের মান্য সভাপতি * এবং অন্যান্য ডাক্তারেরা বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে বিধান দিয়াছেন তাহা কালক্রমে পুরাতন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া মিথ্যা হইয়া যায় নাই। কিন্তু সে সকল কথা পাড়িতে সাহস হয় না—সকলেই পরম অশ্রদ্ধার সহিত বলিয়া উঠিবেন "সেই এক পুরাতন কথা!" কিন্তু আমরা পুরাতন কথা যতই ছাড়িতে চাই সে আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না! পুরাতন কথা বারবার তুলিতেই হইবে—নাচার।

ডাক্তার কার্পেণ্টরকে সকলেই মান্য করিয়া থাকেন, শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে মস্ত পণ্ডিত এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না—অতএব এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা শুনিতে সকলেই বাধ্য। তিনি বলেন—"১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকদের যৌবন লক্ষণ প্রকাশ হইতে আরম্ভ করে।" অনেকে বলেন উষ্ণদেশে স্ত্রীলোকদের যৌবনারম্ভের বয়স শীতদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। কিন্তু কার্পেণ্টার তাহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যৌবন লক্ষণ প্রকাশ শারীরিক উত্তাপের উপর নির্ভর করে—বাহ্য উত্তাপের উপরে নহে। বাহ্য উত্তাপ সামান্য পরিমাণে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি করে মাত্র। অতএব যৌবনবিকাশ সম্বন্ধে বাহ্য উত্তাপের প্রভাব অতি সামান্য।

---

* শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

আমাদের মান্য সভাপতি মহাশয়ের মতের সহিতও এই মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়। তবে আমাদের দেশে ১০।১১ বৎসর বয়সেও যে অনেক স্ত্রীলোকের যৌবন সঞ্চার হইবার উপক্রম দেখা যায়—তাহা বাল্যবিবাহের অস্বাভাবিক ফল বলিতে হইবে। বাল্যকালে স্বামী সহবাস অথবা বিবাহিতা রমণী, প্রগল্‌ভা দাসী ও পরিহাসকুশলা বৃদ্ধাদের সংসর্গে বালিকারা যথাসময়ের পূর্ব্বেই যৌবন দশায় উপনীত হয় ইহা সহজেই মনে করা যায়। যৌবন লক্ষণ প্রকাশ হইবামাত্রই যে স্ত্রীপুরুষ সন্তানোৎপাদনের যোগ্য হয় তাহাও নহে। কার্পেণ্টার বলেন "যৌবনারম্ভে স্ত্রীপুরুষের জননেন্দ্রিয়সকলের বিকাশলক্ষণ দেখা-দিবামাত্র যে বুঝিতে হইবে যে উক্ত ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, তাহা কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী আয়োজন মাত্র। নরনারী যখন সর্ব্বাঙ্গীন পরিস্ফুটতা লাভ করে, হিসাবমতে তখনই তাহারা জাতিরক্ষার জন্য জননশক্তি প্রয়োগ করিবার অধিকারী হয়।" আমাদের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—যেমন, দাঁত উঠিলেই অম্‌নি ছেলেদের খুব শক্ত জিনিষ খাইতে দেওয়া উচিত হয় না, তেমনি যৌবন সঞ্চার হইবামাত্র স্ত্রীপুরুষ সন্তান উৎপাদনের যোগ্য হয় না। এ বিষয়ে বড় বড় ডাক্তারদের মত এতবার সাধারণের সমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে, যে এস্থলে অন্য পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। সুশ্রুত সংহিতার সহিত এ বিষয়ে পাশ্চাত্য শাস্ত্রের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে তাহাও সকলে অবগত আছেন—অতএব শাস্ত্র আস্ফালন করিয়া প্রবন্ধবাহুল্যের প্রয়োজন দেখিতেছি না।

যাহা হউক কাহারো কাহারো মতের সহিত না মিলিলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মান্য ব্যক্তিগণ বৈজ্ঞানিক কারণ দর্শাইয়া বলিয়া থাকেন যে যৌবনারম্ভ হইবামাত্রই অপত্যোৎপাদন স্ত্রীপুরুষ এবং সন্তানের শরীরের পক্ষে ক্ষতিজনক। অতএব বিজ্ঞানের পরামর্শ লইতে গেলে বাল্যবিবাহ টেঁকেনা।

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যাঁহারা বাল্যবিবাহের পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে দুই দল আছেন। একদল মনুর ব্যবস্থানুসারে পুরুষের ২৪ হইতে ৩০শের মধ্যে এবং স্ত্রীলোকের ৮ হইতে ১২র মধ্যে বিবাহ দিতে চান, আর একদল, স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বাল্যাবস্থায় বিবাহে কোন দোষ দেখেন না। 'পারিবারিক প্রবন্ধ" নামক একখানি পরমোৎকৃষ্ট গ্রন্থে মান্যবর লেখক বাল্যবিবাহ নামক প্রবন্ধে প্রথমে মনুর নিয়মের প্রশংসা করিয়া তাহার পরেই লিখিতেছেন ' ছেলেবেলা হইতে মা বাপ যে দুটিকে মিলাইয়া দেন, তাহারা একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটি নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়া এক হইয়া উঠে। তাহাদিগের মধ্যে যে প্রকার চিরস্থায়ী প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা, বয়োধিকদিগের বিবাহে সেরূপ চিরস্থায়ী প্রণয় কিরূপে জন্মিবে?" অতএব পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ লেখকের অভিমত কি না তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু বলেন যখন স্ত্রীকে স্বামীর সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যাইতে হইবে, তখন স্বামীর

পরিণতবয়স্ক হওয়া আবশ্যক। কারণ "যাহাকে এই কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার জ্ঞানবান, বিদ্যাবান এবং পরিণতবয়স্ক হওয়া চাই, এবং যাহাকে এই রকম হাড়ে হাড়ে মিশিতে হইবে তাহার শিশু হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে পুরুষের বিবাহের বয়স বেশি. স্ত্রীর বিবাহের বয়স কম।" ২৪শে এবং আটে বিবাহ হইলে হাড়ে হাড়ে কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ হইতেও পারে কিন্তু সে মিশ্রণ সত্বর বিশ্লিষ্ট হইতে আটক নাই। দম্পতীর বয়সের এত ব্যবধান থাকিলে আমাদের দেশে বিধবাসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িবে সন্দেহ নাই। যদিও বৈধব্য-ব্রতের মহত্ত্ব সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর সন্দেহ নাই কিন্তু পুরুষ ও রমণী উভয়েরই কল্যাণ-কামনায় ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে তাই বলিয়া বিবাহিতা রমণীর বৈধব্য প্রার্থনীয় নহে। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় বাবু এই মনে করিয়াই হিন্দু বিধবা প্রবন্ধে "কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার বিবাহ" অন্যায় বলিয়াছিলেন। বাল্যবিবাহই বৈধব্যের মূল কারণ ইহাই স্থির করিয়া তিনি বলিয়াছেন "আসুন না, সকলে মিলিয়া আমরা বালক বিবাহের কার্য্যত প্রতিবাদ করি। করিলে, বালবৈধব্যের প্রতিরোধ করা হইবে। যাহার বিবাহ হয় নাই সে বিধবা হইয়াছে এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না।" যদি ২৪ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ বয়সে পুরুষের বিবাহ স্থির হয় তবে যিনি যে রূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা করুন কন্যার বয়সও বাড়াইতেই হইবে।

এইখানে চন্দ্রনাথ বাবুর কথা ভাল করিয়া সমালোচনা করা যাক্। কেন কন্যার বয়স অল্প হওয়া আবশ্যক তাহার কারণ দেখাইয়া চন্দ্রনাথ বাবু বলেন "ইংরাজ আত্ম-প্রিয় বলিয়া তাহার বিবাহের প্রকৃত পক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য নাই। মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলি-য়াই তাহার বিবাহ, বিবাহই নয়। মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেই মানুষের সহিত প্রকৃত বিবাহ হয়। যেমন হারমোডিয়াসের সহিত এরিষ্টাজিটনের বিবাহ; যিশুখৃষ্টের সহিত সেণ্টপলের বিবাহ; চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ; রামের সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ।" একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দু বিবাহ মহৎউদ্দেশ্যমূলক বলিয়া হিন্দু দম্পতির সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়া আবশ্যক নতুবা উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। এবং এক হইতে গেলে স্ত্রীর বয়স নিতান্ত অল্প হওয়া চাই। মহৎ উদ্দেশ্য বলিতে এখানে স্ত্রীর পক্ষে এই বুঝাইতেছে যে, শ্বশুর শ্বশ্রূ ননন্দা দেবর প্রভৃতির সহিত মিলিয়া গৃহকার্য্যের সহায়তা, অতিথির জন্য রন্ধন ও সেবা, পরিবারে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় তাহার আয়োজনে সহায়তা করা এবং স্বামীর সেবা করা। স্বামীর পক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য এই যে সাংসারিক নিত্য কার্য্যে স্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা। সাংসারিক নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যে স্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা রূপ মহৎ উদ্দেশ্য সকল দেশের সকল স্বামীরই আছে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তবে প্রভেদ এই, সকল দেশে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান সমান নহে। দেশভেদে এরূপ অনুষ্ঠানের প্রভেদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে কিন্তু উদ্দেশ্য-

ভেদ দেখিতেছি না। মুসলমান সংসারের নিত্য অনুষ্ঠান কি কি তাহা জানি না, কিন্তু ইহা জানি মুসলমান পত্নী সে সকল অনুষ্ঠানের প্রধান সহায়। ইংরাজ পরিবারের নিত্য কার্য্য কি তাহা জানি না কিন্তু ইহা জানি ইংরাজ পত্নীর সহায়তায় তাহা সম্পন্ন হয়। কেবল তাহাই নহে, শুনিয়াছি, সাংসারিক কার্য্য ছাড়া অন্যান্য মহৎ বা ক্ষুদ্র কার্য্যেও ইংরাজ স্ত্রী স্বামীর সহায়তা করিয়া থাকেন। লেখকের স্ত্রী স্বামীর কেরাণী-গিরি করেন, প্রুফ সংশোধন করেন, এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষা গুরুতর সাহায্য করিয়া থাকেন। পাদ্রীর স্ত্রী পল্লীর দরিদ্র, রুগ্ন, শোকাতুর, ও দুষ্কর্ম্মকারীদের সাহায্য, সেবা, সান্ত্বনা ও উপদেশ দান করিয়া স্বামীর পৌরোহিত্য কার্য্যের অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন। যিনি দরিদ্রের দুঃখ মোচন বা অসুস্থের স্বাস্থ্য বিধান প্রভৃতি কোন লোকহিতকর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার স্ত্রীও তাঁহাকে কায়মনে সাহায্য করে। চন্দ্রনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিবেন "যদি না করে?" আমার উত্তর "হিন্দু স্ত্রী যদি সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম না পালন করে? সে যদি দুষ্টস্বভাব বা আলস্যবশত শ্বাশুড়ির সহিত ঝগড়া করে ও সঘনে হাতনাড়া দিয়া কঠিন পণ করিয়া বসে আমি অমুক গৃহকাজটা করিতে পারিব না. তবে কি হয়? তবে হয় তাহাকে বলপূর্ব্বক সে কাজে প্রবৃত্ত করান হয়, নয় বধূর এই বিদ্রোহ পরিবারকে নীরবে সহ্য করিতে হয়। ইংলণ্ডেও সম্ভবতঃ তাহাই ঘটে। যদি ইংরাজ স্ত্রী তাহার অসহায় স্বামীকে বলিয়া বসে তোমার নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য পাকাদির ব্যবস্থা আমি করিতে পারিব না, তবে হয় স্বামী বল প্রকাশ বা ভয়প্রদর্শন করে, নয় ভাল মানুষটির মত আর কোন বন্দোবস্ত করে। চন্দ্রনাথ বাবু বলিবেন হিন্দু স্ত্রী এমন ভাবে শিক্ষিত ও পালিত হয় যে বিদ্রোহী হইবার সম্ভাবনা তাহার পক্ষে অল্প— অপর পক্ষে তেমনি বলা যায়, ইংরাজ স্ত্রী যেরূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতায় পালিত, তাহাতে সাংসারিক কার্য্য ছাড়া মহৎ স্বামীর অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্যে সহায়তা করিতে সে অধিকতর সক্ষম। কতকগুলি কাজ যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়, এবং কতকগুলি কাজ স্বাধীন ইচ্ছার বল ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। রন্ধন ও সুশ্রূষাদি, শ্বাশুড়ি ননদের নিত্য সেবা, এবং গৃহ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাহায্য করা, আশৈশব অভ্যাসে প্রায় সকলেরই দ্বারা সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু জন্‌ষ্টুয়ার্ট্ মিল যেরূপ স্ত্রীর সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন সেরূপ স্ত্রী জাঁতায় পিষিয়া প্রস্তুত হইতে পারে না। হার্ম্মোদিয়াস এবং এরিষ্টজিটন, যিশুখৃষ্ট এবং সেণ্ট্ পল্, চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ, রাম এবং লক্ষ্মণের যে মহৎ উদ্দেশ্য-জাত বিবাহ তাহা জাঁতায়-পেষা বিবাহ নহে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বিবাহ। কেহ না মনে করেন আমি জাঁতায় পেষা বিবাহের নিন্দা করিতেছি, অনেকের পক্ষে তাহার আবশ্যক আছে, তাই বলিয়া যিনি একমাত্র সেই বিবাহের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অন্য সমস্ত বিবাহের নিন্দা করেন তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি না। সর্ব্বত্রই পুরুষ বলিষ্ঠ, অনেক কারণেই স্ত্রীলোকের প্রভু—এই জন্য সাধারণতঃ প্রায় সর্ব্বত্রই

সংসারে স্ত্রী স্বামীর অধীন হইয়া কাজ করে। ইংরাজের অপেক্ষা আমাদের পরিবার বৃহৎ, এই জন্য পরিবার-ভারে অভিভূত হইয়া আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের অধীন-অবস্থা অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়া উঠে। ইংরাজ স্ত্রী স্বামীর অধীন বটে কিন্তু বৃহৎ সংসার ভারে এত ভারাক্রান্ত নহে, যে, কেবল পারিবারিক্ কর্ত্তব্য ছাড়া আর কোন কর্ত্তব্য সাধন করিতে সে অক্ষম হইয়া পড়ে। এই জন্য পরিবারের অবশ্য-কর্ত্তব্য-কার্য্য তাহাকে সাধন করিতেই হয়, এবং তাহা ছাড়া জগতের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্ত্তব্যগুলি পালন করিতেও তাহার অবসর হয়। যদি বল অনেক ইংরাজ স্ত্রী সে অবসর বৃথা নষ্ট করেন তবে এ পক্ষে বলা যায় যে অনেক হিন্দুস্ত্রী জগতের অনেক স্থায়ী উপকার করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা কুট্‌না কুটিয়া বাট্‌না বাঁটিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

অতএব দাম্পত্যবলে বলীয়ান্ হইয়া কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বিবাহ করিতে হইলেই যে, শিশু স্ত্রীকে বিবাহ করাই আবশ্যক তাহা আমার বিশ্বাস নহে। শিক্ষা পাইলেই যে লোকে মহৎ উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তাহা নহে—স্বাভাবিক বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও ক্ষমতার উপরে অনেকটা নির্ভর করে। অতএব শিশুস্ত্রী বড় হইয়া মহৎ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনে স্বামীর সহযোগিনী হইতে পারিবে কিনা কিছুই বলা যায় না। কতকগুলি নিত্য অভ্যস্ত কার্য্য নির্ব্বিচারে ও নিপুনতাসহকারে সম্পন্ন করা এক, আর শিক্ষামার্জ্জিত স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বিবেচনা সহকারে জগতের উন্নতি-সাধনকার্য্যে স্বামীর সহযোগিতা করা আর এক। ইহার জন্য নির্ব্বাচন এবং দুই হৃদয়ের এক মহৎ উদ্দেশ্যগত স্বাভাবিক আকর্ষণ আবশ্যক। তবে নির্ব্বাচন করিতে গেলে বিবাহের মহৎউদ্দেশ্য ভুলিয়া পাছে রূপ যৌবন দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয় এই ভয়। কিন্তু যদি গোড়াতেই পুরুষকে পরিণতবয়স্ক, বিদ্যাবান, ধর্ম্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ও মহৎউদ্দেশ্যসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তবে ইহা কেন মনে করা হয় উক্ত পুরুষ কেবলমাত্র কন্যার রূপ দেখিয়াই কন্যা নির্ব্বাচন করিবেন? চন্দ্রনাথ বাবু গোড়ায় তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—তিনি বলেন মহৎ উদ্দেশ্য বিশেষের জন্য স্ত্রীকে প্রস্তুত করিয়া লইবার ভার স্বামীর উপরে অতএব হিন্দুবিবাহে স্বামীর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক। এমন স্বামী যদি অধিক থাকে, সমাজের এত উন্নতির অবস্থা যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তবে অনেক গোলযোগ গোড়ায় মিটিয়া যায়। তবে সে সমাজে মহৎ পিতামাতার মহৎ আদর্শ ও মহৎ শিক্ষায় কন্যারাও সহজে মহত্ত্ব লাভ করে এবং মহৎ পুরুষের পক্ষে মহৎ-উদ্দেশ্যসম্পন্ন স্ত্রীলাভ করাও দুরূহ হয় না। কিন্তু সর্ব্বত্রই ভাল মন্দ দুই আছে—এবং মহৎউদ্দেশ্য সকলের দেখা যায় না। শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেবর প্রভৃতির যথাবিহিত সেবা, এবং পুরপ্রচলিত দেবকার্য্যের যথাবিধি সহায়তা করিয়া স্ত্রী মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিলেই যে সকল স্বামীর সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে তাহা নহে। স্বামী চায় মনের মত। তাহারই বিশেষ প্রীতিকর রূপগুণসম্পন্ন স্ত্রী নহিলে কেবল অভ্যস্ত গৃহকার্য্যনিষ্ঠা স্ত্রী

লইয়া তাহার সম্পূর্ণ বাসনা তৃপ্ত হয় না। মনুষ্যের যে কেবল একমাত্র গার্হস্থ্য শৃঙ্খলার প্রতিই দৃষ্টি আছে তাহা নহে। তাহার সৌন্দর্য্যের প্রতি স্পৃহা, কলা বিদ্যার প্রতি অনুরাগ, এবং লোকবিশেষে কতকগুলি বিশেষ মানসিক ও নৈতিকগুণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে। এই জন্য রুচিঅনুসারে স্বভাবতই মানুষ সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা এবং আপন মনের গতি অনুযায়ী বিশেষ কতকগুলি মানসিক ও নৈতিকগুণ স্ত্রীর নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া থাকে। স্ত্রীতে তাহার অভাব দেখিলে হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকিয়া যায়। সেরূপ স্থলে অনেক পুরুষ হতাশ হইয়া বারাঙ্গনা-সক্ত হয় এবং অনেক পুরুষ দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হইয়া মনের অসুখে স্ত্রীর প্রতি ঠিক ন্যায্য ব্যবহার করিতে পারে না। ইহা ত অনেক স্থলেই দেখা যায় স্ত্রী অভ্যাসমত গৃহকোণে আপন মনে নিত্য গৃহকার্য্য ম্লানমুখে সম্পন্ন করিতেছে, স্বামীর তাহার প্রতি লক্ষ্যই নাই, আদর নাই, যত্ন নাই।

কেহ কেহ বলিবেন আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই এরূপ ঘটিতেছে, পূর্ব্বে এতটা ছিল না। এ কথা অসঙ্গত নহে। পূর্ব্বে আমাদের মনে সকল বিষয়েই যে একটি সন্তোষ ছিল ইংরাজি শিক্ষায় তাহা দূর করিয়া দিয়াছে। ইংরাজের দৃষ্টান্তে ও শিক্ষায় বাঙ্গালীর মনে কিয়ৎপরিমাণে উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে। এখন আমরা সকল বিষয়েই অদৃষ্টের হাত দেখিয়া আপন হাত গুটাইয়া লইতে পারি না। এই জন্য কোন অভাব বোধ করিলে সকল সময়ে অদৃষ্টকে ধিক্কার না দিয়া আপনাকেই ধিক্কার দিই। ইহাই অসন্তোষ। আমাদের আকাঙ্ক্ষাবেগ পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে— এবং আগে অনেকগুলি যাহা অনুভব করিতাম না এখন তাহা অনুভব করিয়া থাকি। অতএব আকাঙ্ক্ষাও বাড়িয়াছে এবং আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশে উদ্যমও বাড়িয়াছে। অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে আধুনিক কালে অনেক পুরুষ তাঁহার বাল্য-বিবাহিতা পত্নীর প্রতি অনুরাগবিহীন হইয়া থাকেন তবে তাহাতে স্বভাববিরুদ্ধ কিছু ঘটিয়াছে এমন বলিতে পারি না। অনেকে বলিবেন এরূপ যাহাতে না হয়, প্রাচীন সন্তোষ যাহাতে ফিরিয়া আসে এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিয়া প্রাচীন কালে পুরুষের প্রতি যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, এখন সে শিক্ষা-প্রণালী আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। আমরা যে শিক্ষার দায়ে পড়িয়াছি তাহা লইয়াই বিব্রত, কারণ তাহার সহিত পেটের দায় জড়িত। চারিদিকের অবস্থা আলোচনা করিয়া মনে করিয়া লইতে হইবে এ শিক্ষা এখন অনেক কাল চলিবেই। অতএব এ শিক্ষার প্রত্যক্ষ এবং অলক্ষ্য প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়িবে বই কমিবে না। সুতরাং সামাজিক কোন অনুষ্ঠান সমালোচন করিবার সময় এ শিক্ষাকে একেবারেই আমল না দিলে চলিবে কেন? সমাজে যে শিক্ষা প্রচলিত নাই তাহারই ফলাফল বিচার করিয়া, এবং যে শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহাকে দূরে রাখিয়া কোন সমাজ নিয়ম স্থাপন করা যায় না।

বিবাহ সম্বন্ধে ইংরাজি শিক্ষার কি প্রভাব তাহা আলোচনা আবশ্যক। পুরুষ শাস্ত্রচর্চ্চাবান এবং স্ত্রী শাস্ত্রচর্চ্চাহীন মন্ত্রহীন হয় ইংরাজিমতে ইহা প্রার্থনীয় নহে। বিবাহে স্ত্রী পুরুষের একীকরণ ইংরাজি বিবাহের উচ্চ আদর্শ। কিন্তু সে একীকরণ সর্ব্বাঙ্গীন একীকরণ। কেবল সাংসারিক একীকরণ নহে, মানসিক একীকরণ। স্বামী যদি বিদ্বান হয় এবং স্ত্রী যদি মূর্খ হয় তবে উভয়ের মধ্যে মানসিক একীকরণ সম্ভবে না, পরস্পরের মধ্যে সম্যক ভাবগ্রহ চলিতে পারে না। একটি প্রধান বিষয়ে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকে।

জীবনের সমুদয় কর্ত্তব্য-সাধনে স্ত্রীর সহযোগিতা ইহাও ইংরাজি বিবাহের আদর্শ। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এবং ইহাও বলিয়াছি এরূপ মহৎউদ্দেশ্যে মিলন ঘরে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায় না। চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের, যিশুখৃষ্টের সহিত সেণ্ট্-পলের, রামের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ অনিবার্য্য স্বাভাবিক মিলন ঘটিয়াছিল ইহাতেও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। ইংরাজী সকল বিবাহে যে এরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু এইরূপ বিবাহই তাহাদের আদর্শ।

যাঁহারা বলেন হিন্দুবিবাহেরও এইরূপ আদর্শ, তাঁহাদের কথা প্রমাণাভাবে এখনো মানিতে পারি না। হিন্দুবিবাহে মনে মনে প্রাণে প্রাণে আত্মায় আত্মায় মিলন ঘটিয়া থাকে কি না বিচার্য্য। আমরা স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী নাম দিয়া থাকি বটে, কিন্তু মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই, কেবল স্বামীকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহারা স্বর্গে মহিমান্বিতা হন। ইহাকে উচিত মতে স্বামীর সহিত সহধর্ম্ম বলা যায় না। ইহাকে যদি সহধর্ম্ম বল তবে প্রাচীন কালের শূদ্রদিগকেও ব্রাহ্মণের সহ-ধর্ম্মী বলা যাইতে পারে। স্ত্রীপুরুষে শিক্ষার ঐক্য নাই, ধর্ম্মব্রতপালনের ঐক্য নাই কেবল মাত্র জাতিকুলের ঐক্য আছে।

অনেক শিক্ষিত লোকে ইংরাজি শিক্ষার গুণে এই ইংরাজি একীকরণের পক্ষপাতী হইয়াছেন। হৃদয় মনের স্বাভাবিক নিগূঢ় ঐক্য থাকা প্রযুক্ত দুই স্বাধীন ব্যক্তির স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক হইয়া যাওয়াই ইংরাজি একীকরণ। আঠা দিয়া এবং চাপ দিয়া জোড়া সে অন্য প্রকার একীকরণ। উক্ত ইংরাজি আদর্শের প্রতি যদি কোন কোন শিক্ষিত লোকের পক্ষপাত দেখা যায়, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। উহা অবশ্য-ম্ভাবী! ইংরাজি শিখিয়া যে কেবলমাত্র অন্নটুকু উপার্জ্জন করিব তাহা হইতেই পারে না, ইংরাজি ভাব উপার্জন না করিয়া থাকিবার যো নাই। জলে প্রবেশ করিয়া মাছ ধরিতে গেলে ভিজিতেও হইবে।

অতএব আধুনিক শিক্ষিত দলের মধ্যে অনেকেই যখন স্ত্রী গ্রহণ করেন তখন সে স্ত্রী যে কেবল মাত্র গৃহকার্য্য নিপুণরূপে সম্পন্ন করিবে ও তাঁহাকেই দেবতা জ্ঞান করিবে ইহাই মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না। সে স্ত্রীর স্বাভাবিক গুণ ও শিক্ষা তাঁহারা দেখিতে

চান, এবং যাঁহারা ভাবী সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা ভাবেন তাঁহারা স্ত্রীর কোন স্থায়ী রোগপ্রবণতা বা অঙ্গহীনতা না থাকে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে চান। কিন্তু সকলেই যে এইরূপ বিচার করিয়া বিবাহ করিবেন তাহা বলি না। অনেকেই ধন, রূপ বা যৌবন মোহে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিবেন। বর্ত্তমান হিন্দু বিবাহেও সেরূপ হইয়া থাকে। অক্ষয় বাবু তাঁহার বক্তৃতায় কায়স্থ বিবাহে দরদামের প্রাবল্য এবং কুলশীলের প্রতি উপেক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। প্রচলিত বিবাহে কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়াও যে কন্যা নির্ব্বাচন হয় না তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। ইহার যা ফল তাহা এখনও হয় পরেও হইবে। পিতার ধনমদে মত্ত বধু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া অনেক সময়ে দরিদ্র পতিকুলের অশান্তির কারণ হইয়া থাকে। এবং অক্ষমতা বশতঃ দরিদ্র পিতা কন্যার বিবাহের পণ সম্বন্ধে কোন ত্রুটি করিলে অভাগিনী কন্যাকে তজ্জন্য বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। অতএব কেবল মাত্র ধন যৌবনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করিলে তাহার যা ফল তাহা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা গুণ দেখিয়া কন্যা বিবাহ করিতে চান, বাল্যবিবাহে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অসুবিধা। চরিত্র বিকাশ না হইলে কন্যার গুণাগুণ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কন্যা বড় হইয়াই যে সত্যনিষ্ঠ, সদ্বিবেচক, প্রিয়বাদিনী ও হিতানুষ্ঠাননিরতা হইবে তাহা বলা যায় না। অনেক শিশু স্ত্রী বড় হইয়া নানাবিধ বৃথা অভিমানে ও উত্তরোত্তর বিকশমান হীনস্বভাব বশত ঝগড়া বিবাদ ও ঘর ভাঙ্গাভাঙ্গি করিয়া থাকে। এবং অনেকে অগত্যা বধূদশা নিরুপদ্রবে যাপন করিয়া যথাসময়ে প্রচণ্ড শাশুড়ি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অকারণে নিজ বধূর প্রতি যৎপরোনাস্তি নিপীড়ন, অধীনাগণকে তাড়ন ও গৃহের শান্তিভঙ্গ করিয়া থাকেন। তর্কস্থলে কি করিবেন জানিনা কিন্তু আমাদের সমাজে এরূপ শাশুড়ির বহুল অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। অতএব বাল্য-বিবাহেই যে সুগৃহিণী উৎপন্ন হইয়া থাকে যৌবন বিবাহে হয় না তাহা কেমন করিয়া বলিব!

উপহাসরসিক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যদি এমন করিয়া বাছিয়া বিবাহই প্রচলিত হয় তবে সমাজে অন্ধ খঞ্জ কুৎসিৎ অঙ্গহীনদের দশা কি হইবে?—মনুর আমলে অঙ্গহীনতা প্রভৃতি দোষজন্য যে সকল কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল তাহাদের দশা কি হইত? পিতা মাতার উপরে নির্ব্বাচনের ভার রহিয়াছে বলিয়াই যদি সমাজে অন্ধ খঞ্জ অঙ্গহীনরা পার পাইয়া যায় তবে এমন হৃদয়হীন বিবেচনাশূন্য নির্ব্বাচন প্রণালী অতি ভয়ানক বলিতে হইবে। ছেলে মেয়ের বিবাহ দিবার সময় পিতামাতা তাহাদের মঙ্গল আগে খুঁজিবেন, না সমাজের যত অন্ধখঞ্জদের সুখ আগে দেখিবেন?

কিন্তু পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলেই সকল সময়ে মনের মত হইবে এমন কি কথা আছে—ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু মনের মত বিবাহ করাই যদি মত হয়

তবে পছন্দ করিয়া লইতেই হইবে। আসল কথা, মনের মত পাওয়া শক্ত অতএব ঠকিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কয়জন লোক বলিতে পারেন তবে আমি মনের মত চাই না—মনের অমত হইলেও ক্ষতি নাই। যদি আমার সম্পূর্ণতা লাভের জন্য, আমার সমগ্র মানবপ্রকৃতির চরিতার্থতা সাধনের জন্য আমি স্ত্রী চাই, তবে তাঁহাকে সন্ধান করিতে হইবে। সন্ধান করিলেই যে সকল সময়েই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে এমন কোন কথাই নাই। কিন্তু সন্ধান পূর্ব্বক বিবেচনা পূর্ব্বক সংযতচিত্তে স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া ছাড়া ইহার অন্য পন্থা নাই। Catholic শাস্ত্র দাম্পত্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কি বলেন-এইখানে উদ্ধৃত করিব। They ought to implore the divine assistance by fervent and devout prayer, to guide them in their choice of a proper person ; for on the prudent choice which they make will very much depend their happiness, both in this life and in the next. They should be guided by the good character and virtuous dispositions of person of their choice rather than by riches, beauty or any other worldly considerations, which ought to be but secondary motives.

এখনকার অনেক ছেলে যথাসম্ভব স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লয়। এখন অনেক স্থলে শুভদৃষ্টিই যে প্রথম দৃষ্টি তাহা নয়। অতএব দেখিতেছি নির্ব্বাচনপ্রথা অল্পে অল্পে সুরু হইয়াছে। পিতা মাতারাও ইহাতে ক্ষুব্ধ নহেন।

তবে একান্নবর্ত্তী পরিবারের দশা কি হইবে? বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে এই এক প্রধান যুক্তি। স্ত্রীকে যে অনেকের সহিত এক হইতে হইবে। স্বামীর সহিত সম্পূর্ণ একীকরণ সকল সময় হৌক বা না হৌক বৃহৎ পরিবারের সহিত বধূর একীকরণ সাধন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলেন তাহা যথার্থ। "ইংরাজ পত্নীর যেমন একটি মাত্র সম্বন্ধ, হিন্দুপত্নীর তেমন নয়। হিন্দুপত্নীর বহুবিধ সম্বন্ধ। দেখা গেল যে, হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুপত্নীকে সেই বহুবিধ সম্বন্ধের উপযোগী করিতে উৎসুক। অতএব একরকম নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পতিকুলের জটিল এবং বহুবিধ সম্বন্ধ ভাবিয়া হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুস্ত্রীর শৈশব বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন যদি তাহাই হয় তবে কেমন করিয়া শৈশব বিবাহের নিন্দা করি?" শৈশব বিবাহের যে নিন্দাই করিতে হইবে এমন ত কোন কথা নাই। অবস্থাবিশেষে তাহার উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যদি স্ত্রীশিক্ষা না থাকে, এবং একান্নবর্ত্তী পরিবার থাকে তবে শিশু স্ত্রী বিবাহ সমাজ রক্ষার জন্য আবশ্যক। কিন্তু তাহার সঙ্গে আরো গুটিকত আবশ্যক আছে তাহার প্রতি কেহ মনোযোগ করেন না। পুরাকালে যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল সেইরূপ শিক্ষা আবশ্যক এবং তখন সাংসারিক অবস্থা যেরূপ ছিল সেইরূপ অবস্থা আবশ্যক। কারণ, কেবলমাত্র শিশুস্ত্রী বিবাহের উপর একান্নবর্ত্তী পরিবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে না।

পূর্ব্বকালে সমাজের যে অবস্থা ছিল ও যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, সেই সমস্ত অবস্থা ও শিক্ষা একত্র মিলিয়া একান্নবর্ত্তি পরিবারপ্রথার স্থায়িত্ব বিধান করিত। ইহার মধ্যে কোন একটিকে বাছিয়া লইলে চলিবে না। সন্তোষ একান্নবর্ত্তী প্রথার মূলভিত্তি। বর্ত্তমান সমাজে সন্তোষ কোথায়! আমাদের কত কি চাই তাহার ঠিক নাই। প্রথমতঃ ছাতা জুতা টুপি অশন বসন ভূষণ এবং ভদ্রসমাজের বাহ্য উপকরণ বিস্তর বাড়িয়াছে, এবং তাহাদের দামও বাড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় শিক্ষার আবশ্যকতা ও মহার্ঘ্যতা বাড়িয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশে লেখাপড়া অল্প ছিল এবং তাহার খরচও অল্প ছিল। সংস্কৃত সকলে শিখিতেন না, যাঁহারা শিখিতেন তাঁহাদের জন্য টোল ছিল। রাজভাষা পার্সী কেহ কেহ শিখিতেন কিন্তু তাহা আমাদের বর্ত্তমান রাজভাষা শিক্ষার ন্যায় এমন গুরুতর ব্যাপার ছিল না। শুভঙ্কর ও বাঙ্গলা বর্ণমালা শিখিতে অধিক সময়ও চাই না অর্থও চাই না।—কিন্তু এখন ছেলেকে ইংরাজি শিখাইতে হইবে পিতা-মাতার মনে এ আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে। কেহ কেহ বা ছেলেকে বিলাতে পাঠাইবেন এমন বাসনাও মনে মনে পোষণ করিয়া থাকেন। ইংরাজি বিদ্যাকে যে, সকলে শুদ্ধমাত্র অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা নহে—অনেকেই মনে করেন ইংরাজি শিক্ষা না হইলে মানসিক, এমন কি, নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এই জন্য ছেলেকে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া তাঁহারা পরম কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন। অতএব সন্তানের স্থায়ী উন্নতি সাধন পিতামাতার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা পুত্রের সামান্য শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সবসুদ্ধ ধরিয়া অভাব, আকাঙ্ক্ষা এবং তদনুসারে খরচপত্র বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমাজের স্বচ্ছল ও সন্তোষের অবস্থাতেই একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্ভব। যখন সকলেরই অভাব অল্প এবং সামান্য পরিশ্রমেই সে অভাব মোচন হইতে পারে—তখন অনেকে একত্র থাকিয়া পরস্পরের অভাব মোচন চেষ্টা স্বাভাবিক এবং তাহা দুরূহ নহে। বললাভের জন্য বৃহৎ জ্ঞাতিবন্ধন বা গোত্রবন্ধন (ইংরাজিতে যাহাকে clan system বলে) সাধারণের অল্প অভাব, এবং এক উদ্দেশ্য থাকিলে সহজেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেরই যদি বিপুল অভাব ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য জন্মে তবে ঐক্যবন্ধন বলবৎ থাকিতে পারে না। অভাব আমাদের বাড়িয়াছে এবং বাড়িতেছে, একান্নবর্ত্তী পরিবারও টলমল করিতেছে—অনেক পরিবার ভাঙ্গিয়াছে এবং অনেক পরিবার ভাঙ্গিতেছে।

ইংরাজি শাস্ত্রে স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা দেয়। স্বাধীন চিন্তা যেখানে আছে সেখানে বুদ্ধির ভিন্নতা অনুসারে উদ্দেশ্যের ভিন্নতা জন্মিয়াই থাকে। এখন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত। ভিন্ন মত না থাকিলে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লইয়া আজ আমাকে সভা-স্থলে উপস্থিত হইতে হইত না। যখন শাস্ত্রের প্রবল অনুশাসনে সকলে গুটিকতক কর্ত্তব্য শিরোধার্য্য করিয়া লইত—তখন ভিন্ন লোকের মধ্যে জীবনযাত্রার ঐক্য ছিল,

এবং এক শাস্ত্রের অধীনে অনেকে মিলিয়া বাস করা দুঃসাধ্য ছিল না। কিন্তু এখন যখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে বলিতেছে বলিয়াই কিছু মানিনা ; এমন কি,যাঁহারা শাস্ত্রকে সম্মান করেন তাঁহারাও অনেকে আপন মতানুসারে শাস্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা করেন, অথবা নিজের বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রের কোন কোন অংশ বর্জন করিয়া কোন কোন অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লন—তখন নির্ব্বিরোধে একত্র অবস্থান কিরূপে সম্ভব হয়। অতএব একত্র থাকিতে গেলে সকলের অভাব অল্প থাকা চাই, এবং যুক্তিবিচার-নিরপেক্ষ কতকগুলি সরল কর্ত্তব্য থাকা চাই, এবং তাহার কর্ত্তব্যতার প্রতি সকলের সমান বিশ্বাস থাকা চাই।

ইহা ছাড়া পরিবারের একটি কর্ত্তা থাকা চাই। কিন্তু এখন পূর্ব্বের মত কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব তেমন নাই বলিলেও হয়। বঙ্গদেশে পিতা ইচ্ছা করিলে সন্তানকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন এইজন্য সচরাচর গুরুতর পিতৃদ্রোহ ততটা দেখা যায় না—কিন্তু বড় ভায়ের প্রতি ছোট ভায়ের অসম্মান, এবং ভায়ে ভায়ে বিরোধ ইহা অনেক দেখা যায়। বড় ভাই যাহা বলিবেন তাহাই বেদবাক্য, এবং যাহা করিবেন তাহাই সহিয়া থাকিতে হইবে ইহা এখন সকলে মানে না। যে কারণে শাস্ত্রের অনুশাসন শিথিল হইয়া আসিতেছে, গুরুর প্রতি কনিষ্ঠের নির্ব্বিচার ভক্তিবন্ধন সেই কারণেই শিথিল হইয়া আসিতেছে।

এস্থলে আরেকটি বিষয় বিচার্য্য। তাহা—শিক্ষার বৈষম্য। যে ভালরূপ ইংরাজি শিখিয়াছে এবং যে শেখে নাই, তাহাদের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান পড়িয়াছে। তাহাদের চিন্তাপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বিদ্বান মূর্খের মধ্যে এরূপ প্রভেদ ছিল না। তখন একজন বেশ জানিত আরেক জন কম জানিত এইমাত্র প্রভেদ ছিল। এখন একজন একরূপ জানে আরেক জন অন্যরূপ জানে। এইজন্য অনেক সময়ে দেখা যায় উভয়ে উভয়কে জানে না। সামান্য বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝে এই জন্য উভয়ের তেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে একত্র থাকা প্রায় অসম্ভব।

অতএব দেখা যাইতেছে এক সময় একান্নবর্ত্তী প্রথা থাকাতে অনেক সুবিধা ছিল, এবং তাহাতে মানবপ্রকৃতির অনেক উন্নতি সাধন করিত। কিন্তু এখন অবস্থাভেদে তাহার সুবিধাগুলি চলিয়া যাইতেছে, এবং তাহার মধ্যে যে উন্নতির কারণ ছিল তাহাও নষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে জটিলতাবিহীন সমাজে যে সকল সুখ সম্পদ ও শিক্ষা লভ্য ছিল তাহা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকিয়াই সকলে পাইত। এখন একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকে বলিয়াই অনেকে সে সকল হইতে বঞ্চিত হই-তেছে। আমি প্রাণপণে উপার্জ্জন করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিতেছি, তাহাতে কোন মতে আমার পুত্রের শিক্ষা দিয়া তাহার যাবজ্জীবন উন্নতির মূল পত্তন করিয়া দিতে পারি, কিন্তু আমি আমার পুত্রের অহিত সাধন করিয়া আমার শ্যালকপুত্রের কথ-

ঞ্চিৎ উদরপূর্ত্তি করিব ইহাকে সকলের মহৎ উদ্দেশ্য মনে না হইতেও পারে! যদি ইচ্ছা কর ত সন্তানোৎপাদন বন্ধ করিয়া অপরের সন্তানের উন্নতি সাধনে প্রাণপণ করিতে পার তাহাতে তোমার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে,—কিন্তু যদি তোমার নিজের সন্তান জন্মে তবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল স্নেহ ও কর্ত্তব্যসূত্রে তোমার সহিত বদ্ধ যে আত্মজ, তাহার সম্যক্ উন্নতি বিধানের জন্য তুমিই প্রধানতঃ দায়ী। পূর্ব্বে শ্যালকপুত্রের সহিত নিজ পুত্রের প্রভেদ করিবার কোন আবশ্যক ছিল না, কারণ তখন আমাদের অন্নপূর্ণা বঙ্গভূমি তাঁহার সকল সন্তানকে একত্রে কোলে লইয়া সকলের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন তাঁহার ভাণ্ডার এমন পরিপূর্ণ ছিল, এখন চারিদিকে অন্ন নাই অন্ন নাই রব উঠিয়াছে, এখন পিতা স্বয়ং আপন ক্ষুধিত সন্তানের মুখ না চাহিলে উপায় কি? দ্বিতীয় কথা, পূর্ব্বকালে একান্নবর্ত্তী পরিবারে প্রীতিভাবের অত্যন্ত চর্চ্চা হইত। এজন্য তাহা দেশের একটি মহৎ আশ্রম বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এখন সাধারণের অবস্থা-ভেদে শিক্ষাভেদে শাস্ত্রভেদে মতভেদে ও রুচিভেদে নিতান্ত একত্র অবস্থানে সর্ব্বত্র সেরূপ সদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই—বরঞ্চ বিরোধ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও নিন্দাগ্লানির সম্ভাবনা; এবং ইহাতে মনুষ্যপ্রকৃতির উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবারই কথা। তৃতীয় কথা—যখন পরিবারের মধ্যে শাসন শিথিল হইয়া আসিয়াছে ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন তখন পরিবারের মধ্যে যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব অবশ্যম্ভাবী, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বহুবিস্তৃত পরিবারে এরূপ যথেচ্ছাচারের অপেক্ষা ক্ষতিজনক আর কি আছে! একজন এক ঘরে মদ্য পান করিতেছেন, আরেক জন অন্য ঘরে বন্ধুবান্ধবসমেত অট্টহাস্য ও উর্দ্ধকণ্ঠে কুৎসিত আলাপে নিরত, এস্থলে আমার ছেলেপিলের শিক্ষা কি রূপ হয়? আমি আমার সন্তানকে এক ভাবে শিক্ষা দিতে চাই, আমার গুরুজন তাহাকে অন্য ভাবে শিক্ষা দেন সে স্থলে ছেলেটার উপায় কি হয়? পিতার শিক্ষা-গুণে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বিগড়িয়া গেছে তাহাদের সহিত আমি আমার ছেলেকে একত্র রাখি কি করিয়া? তাহা ছাড়া বৃহৎ পরিবারে সকলের প্রেমের বন্ধন সমান হইতেই পারে না—সুতরাং পরস্পরের প্রতি কুৎসা, দ্বেষ, মিথ্যাচরণ অনেক সময় দূষিত রক্ত-স্রোতের ন্যায় পরিবারের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে। অতএব দেখিতেছি কালক্রমে একান্নবর্ত্তী প্রথার সদ্গুণ সকল বিনষ্ট এবং তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি জীর্ণ হইয়া আসি-তেছে। কেবল মাত্র কন্যার বাল্যবিবাহপ্রবর্ত্তন রূপ ক্ষীণ দণ্ড আশ্রয় করিয়াই যে এই ঐতিহাসিক প্রকাণ্ড পতনোন্মুখ মন্দিরকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে তাহা মনে হয় না। প্রথমে শিখিতে হইবে শাস্ত্র অভ্রান্ত, গুরু বাক্য অলঙ্ঘনীয়—তার পর দেখিতে হইবে জীবনের অভাব সকল উত্তরোত্তর স্বল্প ও সরল হইয়া আসিতেছে তবে জানিব একান্নবর্ত্তী প্রথা টিঁকিবে। কিন্তু দেখিতেছি, বর্ত্তমান সমাজে দুটার মধ্যে কোনটাই ঘটিতেছে না—এবং ভবিষ্যতে যতটা দেখা যায় শীঘ্র এ অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখি না বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

এই সকল ভাবিয়া যাঁহারা বলেন বর্ত্তমান সমাজে একান্নবর্ত্তী প্রথার অনেক দোষ ঘটিয়াছে অতএব উহা উঠিয়া গেলে কোন হানি নাই, বরং উঠিয়া যাওয়াই উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া বাল্যবিবাহ উঠাইবার কোন আবশ্যক দেখি না—তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, একান্নবর্ত্তী প্রথা না থাকিলে বাল্যবিবাহ থাকিতেই পারে না। যেখানে স্বতন্ত্র গৃহ করিতে হইবে সেখানে স্বামী স্ত্রীর বয়স অল্প হইলে চলিবে না। তখন শিশু স্ত্রী যদি অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বামীর নিরুদ্যম ভার স্বরূপ হইয়া থাকে তবে স্বামীর পক্ষে সঙ্কট। একক স্বামীগৃহে কেই বা তাহাকে গৃহকার্য্য শিক্ষা দিবে? অতএব এরূপ অবস্থায় পিতৃভবন হইতে গৃহকার্য্য শিক্ষা করিয়া স্বামীগৃহে আসা আবশ্যক। অথবা পরিণত বয়সে বিবাহ হওয়াতে স্বল্প পরিবারের ভার গ্রহণে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক হয় না।

অতএব, একান্নবর্ত্তী প্রথা ভাল সুতরাং তাহা রক্ষার জন্যই বাল্যবিবাহ ভাল, একথা বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা উঠে—সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা গেল। এখন আর একটি কথা দেখিতে হইবে। যে অস্বচ্ছল অবস্থার পীড়নে একান্নবর্ত্তী প্রথা প্রতিদিন অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে সেই অবস্থার দায়েই বাল্যবিবাহ প্রথাও তুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। দায়ে পড়িয়া শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক কন্যাকে অনেক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখা হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে হিন্দুসমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মান্য কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা প্রচলিত ছিল এবং অনেক স্থলে এখনো আছে। অতএব তেমন দায়ে পড়িলে অল্পে অল্পে কুমারী কন্যার বয়োবৃদ্ধি এখনো অসম্ভব নহে। সমাজ দায়েও পড়িয়াছে এবং অল্পে অল্পে বয়োবৃদ্ধিও আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা আচার মানিয়া চলেন তাঁহাদের মধ্যেও ১৩ বৎসর বয়সে কন্যাদান অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু কাল পূর্ব্বে আট দশ বৎসর পার হইলেই কন্যাকে পিতৃগৃহে দেখা যাইত না। পূর্ব্বে কন্যার ৩।৪।৫ বৎসর বয়সে যত বিবাহ দেখা যাইত এখন তত দেখা যায় না। পুরুষের বিবাহ-বয়স পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। শিক্ষিত হিন্দুসমাজে পুরুষের শিশুবিবাহ নাই বলিলেও হয়। এইরূপ অলক্ষিত ভাবে বিবাহের বয়োবৃদ্ধি যে ইংরাজি শিক্ষার অব্যবহিত ফল আমার তাহা বিশ্বাস নহে। অবস্থার অস্বচ্ছলতাই ইহার প্রধান কারণ। আমার বোধ হয় বড় মানুষের ঘরে বাল্যবিবাহ যতটা আছে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ততটা নাই। অর্থক্লেশের সময় ছেলে মেয়ের বিবাহ দেওয়া বিষম ব্যাপার। সুবিধা করিয়া বিবাহ দিতে অনেক সময় যায়। বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য সাংসারিক খরচ বাদে অল্প অল্প করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়। গৃহস্থ লোকের পক্ষে তাহাতে অনেক সময় চাই। সমাজের স্বচ্ছল অবস্থায় কন্যাদায়গ্রস্তকে লোকে সাহায্য করিত। কিন্তু এখন এক পক্ষে খরচ বাড়িয়াছে, অপর পক্ষে সাহায্যও কমিয়াছে।

এ ছাড়া, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে অনেক অবিবাহিত যুবক নানা বিবেচনায় চট্‌পট্‌ বিবাহ-কার্য্য সারিয়া ফেলিতে চান না। ইঁহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক যুবক আছেন যাঁহারা যৌবনের স্বাভাবিক উৎসাহে সংকল্প করেন যে, বিবাহ না করিয়া জীবন দেশের কোন মহৎ কার্য্যে উৎসর্গ করিব অবশেষে বয়োবৃদ্ধি সহকারে মহৎকার্য্যের প্রতি ঔদাসীন্য জন্মিলে হয়ত বিবাহের প্রতি মনোযোগ করেন। অনেকে বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া পঠদ্দশায় বিবাহ করিতে অসম্মত। এবং অনেকে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া তাড়াতাড়ি পরিবারবৃদ্ধি করিলে ইহজীবন দারিদ্র্যের হাত এড়ান দুষ্কর হইবে। তাঁহারা জানেন যে, অল্প বয়সে স্ত্রী পুত্রের ভারে অভিভূত হইয়া তেজ বল সাহস সমস্তই হারাইতে হয়। সহস্র অপমান নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হয় তাহার সমুচিত প্রতিশোধ দিতে ভরসা হয় না। যখন বিদেশীয় প্রভুর নিকট হইতে নিতান্ত হীন-জনের ন্যায় অন্যায় লাঞ্ছনা সহ্য করা যায় তখন গৃহের ক্ষুধিত রুগ্ন সন্তানের ম্লান মুখই মনে পড়ে এবং নীরবে নতাশরে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। কাগজে পত্রে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে অনেক লেখনী আস্ফালন করি কিন্তু গৃহে ক্রন্দনধ্বনি শুনিলে আর থাকা যায় না, সেই শ্বেতপুরুষের দ্বারস্থ হইয়া যোড়হস্তে ছলছল-নয়নে দুই বেলা উমেদারী করিয়া মরিতে হয়। সংসার ভারবহন করিয়া বাঙ্গালাদের স্বাভাবিক সাবধানতাবৃত্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠে, এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া কোন কাজে অগ্রসর হইতে পা উঠে না। এইরূপ ভারাক্রান্ত, ভীত এবং ব্যাকুল ভাব জাতির উন্নতির প্রতিকূল তাহার আর সন্দেহ নাই। একথা স্মরণ করিয়া অনেক দেশানুরাগী, অপমান-অসহিষ্ণু, উন্নত স্বভাব যুবক অসমর্থ অবস্থায় বিবাহ করিতে বিরত হইবেন। ইহা নিশ্চয়ই, যে, দারিদ্র্যের প্রভাব যতই অনুভব করা যাইবে, লোকে বিবাহ বন্ধনে ধরা দিতে ততই সঙ্কুচিত হইবে। যখন চারিদিকে দেখা যাইবে উদ্বাহবন্ধন উদ্বন্ধনের ন্যায় বিবাহিতের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখন মনু অথবা অন্য কোন ঋষির বিধান সত্ত্বেও যুবক যখন তখন উক্ত ফাঁসের মধ্যে গলা গলাইয়া দিতে সম্মত হইবে না। স্ত্রীর সহিত পবিত্র একত্ব সাধন করিতে গিয়া যদি পঞ্চত্ব নিকটবর্ত্তী হয় তবে অনেক বিবেচক লোক উক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে বিরত হইবেন সন্দেহ নাই। বাপ মায়ে ঠেকিয়া শিখিয়াছেন তাঁহারাও যে তাড়াতাড়ি অবিবেচক বালকের গলদেশে বিষম গুরুভার বধূ বাঁধিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন ইহা সম্ভব নহে। ছেলে যখন আপনি উপার্জ্জন করিবে তখন বিবাহ করিবে আজকাল অনেক পিতার মুখেই এ কথা শুনা যায়। এমন কি, হিন্দুগৃহে প্রাচীন নিয়মে পালিতা সেকালের একটি প্রাচীনার মুখে এই মত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। অথবা আশ্চর্য্যের কারণ কিছুই নাই—"জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি" সমাজের অবস্থাগতিকে এ বিশ্বাস আর টিঁকে না।

অতএব ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অভাবের জটিলতা যতই বাড়িতে থাকিবে ততই

যে পুরুষেরা শীঘ্র বিবাহ করিতে চাহিবে না ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আগে অনেক ছেলে "বিয়েপাগ্‌লা" ছিল এখন অনেকে বিয়েকে ডরায়। ক্রমে এ ভাব আরো অনেকের মধ্যে সংক্রমিত হইতে থাকিবে। কিন্তু পুরুষ যদি উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বড় বয়সে বিবাহ করে তবে মেয়ের বয়সও বাড়াইতে হইবে সন্দেহ নাই। মস্ত পুরুষের সঙ্গে কচি মেয়ের বিবাহ নিতান্ত অসঙ্গত। দেখা যায় বরকন্যার মধ্যে বয়সের নিতান্ত বৈসাদৃশ্য দেখিলে কন্যাপক্ষীয় মেয়েরা অত্যন্ত কাতর হন। বোধ করি মনের অমিল ও বৈধব্যের সম্ভাবনাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয়। অতএব স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিবাহ-যোগ্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ-যোগ্য মেয়ের বয়সও বাড়িতে থাকিবে।

অতএব যিনি যতই বক্তৃতা দিন্ দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে এবং আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইতেছি তাহাতে অবিবাহিত ছেলে মেয়ের বয়সের সীমা বাড়িবেই, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। কিছুদিন প্রাচীন নিয়ম ও নূতন অবস্থার বিরোধে সমাজে অনেক অসুখ অশান্তি বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। এবং ক্রমশঃ এই মথিত সমাজের আলোড়নে নূতন জীবন নূতন নিয়ম জাগ্রত হইয়া উঠিবে। তাহার সমস্ত ফলাফল আমরা আগে হইতে সম্পূর্ণ বিচার করিয়া স্থির করিতে পারি না। এখন আমাদের সমাজে অনেক মন্দ আছে কিন্তু অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সেগুলিকে তত গুরুতর মন্দ বলিয়া মনে হয় না—তখনো হয়ত কতকগুলি অনিবার্য্য মন্দ উঠিবে যাহা আমরা আগে হইতে কল্পনা করিয়া যত ভীত হইতেছি তখনকার লোকের পক্ষে তত ভীতিজনক হইবে না। দূর হইতে ইংরাজেরা আমাদের কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠানের নামমাত্র শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে যতখানি চমক খাইয়া উঠেন, ভিতরে প্রবেশ করিলে ততখানি চমক খাইবার বিষয় কিছুই নাই—সমাজের মধ্যে সন্ধান করিলে দেখা যায় অনেক অনুষ্ঠানের ভালমন্দ ভাগ হইয়া একপ্রকার সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছে। তেমনি আমরাও দূর হইতে ইংরাজ সমাজের অনেক আচারের নাম শুনিয়া যতটা ভয় পাই ভিতরে গিয়া দেখিলে হয়ত জানিতে পারি ততটা আশঙ্কার কারণ নাই। তাহা ছাড়া অভ্যাসে অনেক ভাল মন্দ সৃজিত হয়। এখন যে মেয়ে ঘোমটা দিয়া সূক্ষ্ম বসন পরে তাহাকে আমরা বেহায়া বলি না, কিছু কাল পরে যাঁহারা ঘোমটা না দিয়া মোটা কাপড় পরিবে তাহাদিগকে বেহায়া বলিব না। মনে কর শ্যালির সহিত ভগিনীপতির অনেক স্থলে যেরূপ উপহাস চলে তাহাতে একজন বিদেশের লোক কত কি অনুমান করিয়া লইতে পারে, এবং অনুমান করিলেও তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু সত্য সত্যই ততটা ঘটে না। সমাজের এক নিয়ম অপর নিয়মের দোষ-সম্ভাবনা কথঞ্চিৎ সংশোধন করে। অতএব কোন সমাজের একটি মাত্র নিয়ম স্বতন্ত্র তুলিয়া লইয়া তাহার ভাল মন্দ বিচার করিলে প্রতারিত হইতে হয়। এই জন্য আমাদের সমাজের পরিবর্ত্তনে যে সকল নূতন নিয়ম অল্পে অল্পে স্বভাবতই উদ্ভাবিত হইবে আগে হইতেই তাহার সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম বিচার অসম্ভব। তাহারা

অকাট্য নিয়মে পরস্পর পরস্পরকে জন্ম দিবে ও রক্ষা করিবে। সমাজে আগে ভাগে বুদ্ধি খাটাইয়া গায়ে পড়িয়া একটা নিয়ম স্থাপন করিতে যাওয়া অনেক সময় মূঢ়তা। সে নিয়ম নিজে ভাল হইতে পারে কিন্তু অন্য নিয়মের সংসর্গে সে হয়ত মন্দ। অতএব বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে আজ তাহার ফল যতটা ভয়ানক বলিয়া মনে হইবে, তাহা হইতে যত বিপদ ও অমঙ্গল আশঙ্কা করিব—তাহার অনেকটা আমাদের কাল্পনিক। কেবল, কতকটা দেখিতেছি এবং অনেকটা দেখিতেছি না বলিয়া এত ভয়।

বলা বাহুল্য, আমি সমাজের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি তাহা প্রধানতঃ শিক্ষিত সমাজের পক্ষে খাটে। অতএব শীঘ্র বাল্যবিবাহ দূর হওয়া শিক্ষিত সমাজেই সম্ভব। কিন্তু তাহা আপনি সহজ নিয়মে হইবে। যাঁহারা আইন করিয়া জবরদস্তি করিয়া এ প্রথা উঠাইতে চান, তাঁহারা এ প্রথাকে নিতান্ত স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া ইহার দুই একটি ফলাফলমাত্র বিচার করিয়াছেন, হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রথা তাঁহারা দেখেন নাই। সামাজিক অন্যান্য সহকারী নিয়মের মধ্য হইতে বাল্যবিবাহকে বলপূর্ব্বক উৎপাটন করিলে সমাজে সমূহ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইবে। অল্পে অল্পে নূতন অবস্থার প্রভাবে সমাজের সমস্ত নিয়ম নূতন আকার ধারণ করিয়া সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত আপন উপযোগিতাসূত্রে বন্ধন করিতেছে। অতএব যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী তাঁহাদিগকে অকারণ ব্যস্ত হইতে হইবে না।

তেমনি, যাঁহারা একান্নবর্ত্তী পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া নূতন অবস্থা ও নূতন শিক্ষার আবর্ত্তে পড়িয়া আচার ও উপদেশ হইতে বাল্যবিবাহ দূর করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম অথবা বিদেশগমনদ্বারা জাতিচ্যুত হইলেও বিবেচক হিন্দুমণ্ডলী তাঁহাদিগকে দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা মহাপাতকী জ্ঞান না করেন। তাঁহারা কিছুই অন্যায় করেন নাই। তাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষা ও বর্ত্তমান অবস্থার অনুগত হইয়া আপন কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় যুক্তিসঙ্গত কাজই করিয়াছেন। কারণ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি অবস্থাবিশেষে বাল্যবিবাহ উপযোগী হইলেও অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাহা অনিষ্টজনক।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে কি কি বলিয়াছি, এইখানে তাহার একটি সংক্ষেপ পুনরাবৃত্তি আবশ্যক।

প্রথম—হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচন না করাতে তাঁহাদের কথার সত্যমিথ্যা কিছুই স্থির করিয়া বলা যায় না। শাস্ত্রের ইতস্তত হইতে শ্লোকখণ্ড উদ্ধৃত করিয়া একই বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে মত দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়। যাঁহারা বলেন, হিন্দুবিবাহের প্রধান লক্ষ্য দম্পতির একীকরণতার

প্রতি—তাঁহাদিগকে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে তাহা হইলে পুরুষের বহুবিবাহ এ দেশে কোনক্রমে প্রচলিত হইতে পারিত না।

তৃতীয়। আজকাল অনেকেই বলেন হিন্দুবিবাহ আধ্যাত্মিক। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ কি? উক্ত শব্দের প্রচলিত অর্থ হিন্দুবিবাহে নানা কারণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, উক্ত কারণ সকল একে একে দেখান হইয়াছে।

চতুর্থ। তাহাই যদি হয় তবে দেখা যাইতেছে হিন্দুবিবাহ সামাজিক মঙ্গল ও সাংসারিক সুবিধার জন্য। সংহিতা সম্বন্ধে পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের উক্তি এবং মনুর কতকগুলি বিধান উক্ত মতের পক্ষ সমর্থন করিতেছে।

পঞ্চম। সমাজের মঙ্গল যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, পারত্রিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য যদি তাহার না থাকে বা গৌণভাবে থাকে তবে বিবাহ সমালোচনা করিবার সময় সমাজের মঙ্গলের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং যেহেতু সমাজের পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং নানা বিষয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে অতএব সমাজের মঙ্গলসাধক উপায়েরও তদনুসারে পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতেছে। পুরাতন সমাজের নিয়ম সকল সময় নূতন সমাজের মঙ্গলজনক হয় না। অতএব আমাদের বর্ত্তমান সমাজে বিবাহের সকল প্রাচীন নিয়ম হিতজনক হয় কি না তাহা সমালোচ্য।

ষষ্ঠ। তাহা হইলে দেখিতে হইবে বাল্যবিবাহের ফল কি? প্রথম, বাল্যবিবাহে সুস্থকায় সন্তান উৎপাদনের ব্যাঘাত হয় কি না। বিজ্ঞানের মতে ব্যাঘাত হয়।

সপ্তম। কেহ কেহ বলেন, পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ দিলেই আর কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু পুরুষের বিবাহ বয়স বাড়াইলে স্বাভাবিক নিয়মেই হয় মেয়েদের বয়সও বাড়াইতে হইবে নয় পুরুষের বয়স আপনি অল্পে অল্পে কমিয়া আসিবে, যেমন মনুর সময় হইতে কমিয়া আসিয়াছে।

অষ্টম। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সুস্থ সন্তান উৎপাদনই সমাজের একমাত্র মঙ্গলের কারণ নহে অতএব একমাত্র তৎপ্রতিই বিবাহের লক্ষ্য থাকিতে পারে না। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনেই বিবাহের মহত্ত্ব। অতএব মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে বাল্যকাল হইতে স্ত্রীকে শিক্ষিত করিয়া লওয়া স্বামীর কর্ত্তব্য। এইজন্য স্ত্রীর অল্প বয়স হওয়া চাই। আমি প্রথমে দেখাইয়াছি, যথার্থ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অধিক বয়সে বিবাহ উপযোগী। তাহার পরে দেখাইয়াছি মহৎ উদ্দেশ্য সকল স্বামীরই থাকিতে পারে না—কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই স্বভাবভেদে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে—উক্ত গুণ সকল তাহারা স্ত্রীর নিকট হইতে প্রত্যাশা করে, নিরাশ হইলে অনেক সময়ে সমাজে অশান্তি ও অমঙ্গল সৃষ্ট হয়। অতএব গুণ দেখিয়া স্ত্রী নির্ব্বাচন করিতে হইলে বড় বয়সে বিবাহ আবশ্যক।

নবম। কিন্তু পরিণতবয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলে একান্নবর্ত্তী পরিবারে অসুখ ঘটিতে

পারে। আমি দেখাইয়াছি কালক্রমে নানা কারণে একান্নবর্ত্তী প্রথা শিথিল হইয়া আসিয়াছে এবং সমাজের অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে—অতএব একমাত্র বাল্যবিবাহ দ্বারা উহাকে রক্ষা করা যাইবে না এবং রক্ষা করা উচিত কি না তদ্বিষয়েও সন্দেহ।

দশম। সমাজে এ সকল ছাড়া দারিদ্র্য প্রভৃতি এমন কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে যাহাতে স্বতই বাল্যবিবাহ অধিক কাল টিঁকিতে পারে না। সমাজে অল্পে অল্পে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

অতএব যাঁহারা বাল্যবিবাহ দূষণীয় জ্ঞান করেন অথবা সুবিধার অনুরোধে ত্যাগ করেন তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া বলপূর্ব্বক বাল্যবিবাহ উঠান যায় না। কারণ ভালরূপ শিক্ষা ব্যতিরেকে বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে সমাজের সমূহ অনিষ্ট হইবে। যেথানে শিক্ষার প্রভাব হইতেছে সেখানে বাল্যবিবাহ আপনিই উঠিতেছে, যেথানে হয় নাই সেখানে এখনো বাল্যবিবাহ উপযোগী। আমাদের অন্তঃপুরের—আমাদের সমাজের অনেক অনুষ্ঠান ও অভ্যাসে, এবং আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভিতরকার শিক্ষায় বাল্যবিবাহ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে—অতএব অগ্রে শিক্ষার প্রভাবে সে সকলের পরিবর্ত্তন না হইলে কেবল আইনের জোরে ও বক্তৃতার তোড়ে সর্ব্বত্রই বাল্যবিবাহ দূর করা যাইতে পারে না।

শান্তামারিয়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বার্ণাডের গল্প শেষ হইল। অসমাপ্ত কাহিনী যেন সমাপ্ত হইয়া গেল। আমি আর কিছু না শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম কাউন্টেশের—জীবনের পরিণাম কি হইল। যিনি যাহাই বলুন না কেন সঙ্গীদিগের উপর আমাদের জীবন অনেকটা নির্ভর করে। যাহার মনে বল আছে, যাহার সৎকামনা আছে তাহার জীবনেও অন্যের আচরণের ছায়া পড়ে। যাহারা আমার সাথী, যাহাদিগের হৃদয়ের কামনা, প্রাত্যহিক ব্যবহার, আমার না হইয়াও অনেকটা আমার; তোমাদিগের কলঙ্ক-পঙ্কিল চিন্তাবলে আমার চিন্তাকে কি মধ্যে মধ্যে আচ্ছন্ন করে না। নীচ প্রবৃত্তির আসক্তি সবই নীচ। যতই উচ্চে তোমার স্থান হউক না কেন, সুদৃঢ় পর্ব্বতের উপর তুমি আসীন হও না কেন—নীচের আকর্ষণ তোমার উপর সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। মাথার উপর বিস্তৃত, নির্ম্মল, কোটি তারকা খচিত আকাশ বটে, কিন্তু আকাশের আকর্ষণ বড়ই দূর, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকে এক তিল

উঠাইয়া লইতে পারে না—আমরা ত কীটানুকীট, যেমন বাহ্য জগতে, পদার্থের উপর নীচের আকর্ষণ প্রবল তেমনি আমাদিগের হৃদয়ের উপর তাহার সমান ক্ষমতা।

কাউণ্ট যেমন দিন দিন মহৎ কামনা, মহৎ প্রয়াস, মহৎ চেষ্টা সবই নীচ লোকের মত ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রায় যাহা কিছু ধর্ম্মবল, শিক্ষাবল সবই হারাইতে লাগিলেন, তখন একজন অসহায়া, পতিলাঞ্ছিতা, দীন স্ত্রীলোকের অবস্থা কি হইবে না শুনিয়া ঠিক করিতে পারি না। কাউণ্ট যেমন পদস্খলিত হইয়া উপর হইতে নীচে পড়িয়াছেন, কাউণ্টেশও তেমনি পড়িলেন। তবে আমার মনে হয় স্ত্রীলোকের কেমন খানিকটা দেববল আছে। তুমি তাহা বোধ হয় স্বীকার করিবে না। তুমি বোধ হয় বলিবে, স্ত্রীলোকের প্রাণে যে স্নেহ, মায়া, মমতা আছে তাহাই—তাহার বল। তর্ক না করিয়া তোমার কথাই মানিয়া লইব। স্ত্রীলোকের যেমন স্নেহের বল আছে পুরুষের তেমন নাই। আমরণ একজনের সহিত লিপ্ত থাকার ইচ্ছা যেমন স্ত্রীহৃদয়ে বলবতী—পুরুষের সেরূপ ইচ্ছা তত দীর্ঘব্যাপী না। সহস্র চিন্তা, সহস্র ভাবে সেই ইচ্ছা পুরুষ হৃদয়ে কম প্রকাশ পায়, কিন্তু ভগ্নহৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া রাখিলেও স্ত্রীলোকের দেব চক্ষুতে, দেব মুখ প্রকাশ পায়।—"আর কিছুই চাই না—একজন স্ত্রীলোকের চক্ষুতে প্রতিফলিত যে ভালবাসা তাহাই যেন চিরদিন পাই। তাহাকে চাহি না,—তাহাকে ছুইতে পর্য্যন্ত চাহি না, শুধু তাহার চ'খের সেই প্রেমালোক দেখিতে চাই। আমার প্রেমে সে আলোক জ্বলিতেছে না, জানিলেও আমার আনন্দ বই দুঃখ হয় না।" ইহা কবির ভাষা,—কবির মনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কতকটা সত্য নহে কি? কাউণ্টেশের দৈনিক যাতনা, শঙ্কট যাহা কিছু তাহা সহ্য করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া উঠিতে পরিলেন কি না তাহা জানিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায় যে কি হইবে তাহা সহজেই ভাবিয়া লওয়া যায়—বার্ণার্ড আর বিশেষ কিছু আমাকে বলিলেন না। ক্রমে আমরা দুইজনে লণ্ডনের পূর্ব্বভাগে পঁহুছিলাম। পুস্তকে অনেকে পাড়য়া থাকিবেন পূর্ব্বভাগে দরিদ্রের বাসস্থান। কিন্তু তাহা না দেখিলে সহজে অনুভব করা যায় না সে দারিদ্র্য কি ভয়ানক। রাস্তার দুই ধারে বড় বড় একটানা বাড়ী, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যের আলোক আঁধার করিয়া, আকাশের বায়ু বিষাক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিন তালা চারি তালা বাড়ী শুনিলে এদেশে থাকিয়া মনে হইতে পারে তাহা সমৃদ্ধির পরিচয়, কিন্তু লণ্ডনের প্রায় সর্ব্বত্র বড় বড় বাড়ী। প্রভেদ এই মাত্র যে ধনবানের বাড়ীতে বড় বড় ঘর, বড় বড় সিঁড়ি, বড় বড় দুয়ার, কিন্তু দরিদ্রের গৃহে যেখানে একটি কুঠরী হওয়া উচিত সেখানে দশটি, যেখানে ছোট একটি সিঁড়ি হইতে পারে সেখানে দুই দিকে দুইটি; কোনরূপে দুইজন লোকে বাড়ীর ভিন্ন ভাগে যাইতে পারে। ছোট ছোট দুয়ার আর দুই একটি গেলাস দেওয়া জানালা। নিতান্তই পিপীলিকার উপযোগী। এই পূর্ব্বভাগে লণ্ডনের যত মুটে, মজুর, যাহারা দিন যাহা

আয় দিন তাহা খাইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া থাকে, তাহারাই বাস করে। বড় বড় জাহাজের ডক্ থাকায়, সত্যই অনেক মুটের আবশ্যক হয়। যাহাদিগের অন্য কোন রূপ কার্য্য যোটে না তাহারা জাহাজের মোট তুলিবার কিম্বা নামাইবার আশায় বর্ষায়, শীতে, রাত্রি দুইটা, তিনটা পর্য্যন্ত জাহাজের সম্মুখে সহস্র সহস্র একত্রে দাঁড়াইয়া থাকে। বিলাতে যাহারা ছুতর কিংবা মিস্ত্রি তাহারা ত সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। দিন পাঁচ ছয় টাকা লাভ করে। কিন্তু যাহারা ওরূপ কোন কাজ জানে না তাহাদিগের দিন কাটান দুষ্কর। হঠাৎ মোটতোলা প্রভৃতি কার্য্যে কিছু না পাইলে সারাদিন কিছু পাইবার আশা নাই। রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত শীতের যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যে দাঁড়াইয়া থাকে তাহার কারণ এই যে প্রত্যেক জাহাজের সরদার মুটে ভোরে নিয়মিত দুই শত, তিন শত লোক যাহা আবশ্যক তাহা চাইয়া লয়। এইরূপ লোক চাহিয়া লইয়া যাহাদিগের আর আবশ্যক হয় না তাহাদিগের সংখ্যা পাঁচ ছয় হাজার হইবে। এই পাঁচ ছয় হাজার লোক দিন কাটায় কি করিয়া? আগের দিন যদি কিছু টাকা পাইয়া থাকে তাহারই দুই এক পয়সা যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহাতে মদ খাইয়া কোন রূপে ক্ষুধার যন্ত্রণা বারণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যাহাদিগের হাতে কিছু নাই, যাহাদিগের গৃহে, স্ত্রী, পুত্র কন্যা তাহাদিগের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ। দুরন্ত শীতে নির্ম্মম লণ্ডনে বস্ত্র শূন্য, আহার শূন্য চিন্তা পাপ পূর্ণ।

আমরা দুইজনে লণ্ডনের সেই প্রদেশে একটি জীর্ণ, নিতান্ত পুরাতন গৃহের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। বার্ণার্ড দ্বারে আঘাত করিলেন। বাড়ীতে যেন একটা গোল পড়িয়া গেল। চারিদিকে কেহ দ্বার বন্ধ করিতেছে, কেহ খুলিতেছে, যেন সকলেই ভীত, কাহাকে দারোগা যে ধরিতে আসিয়াছে তাহার ঠিক নাই, এই ভয়ে বাড়ী শুদ্ধ সকলে ত্রাস্ত হইয়া উঠিল। আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি বুঝিতে পারিয়া বার্ণার্ড বলিলেন "ইহারা যে যেখানে পাইতেছে লুকাইতেছে। এখনও জানে না যে আমি পুলিষের লোক তাহা হইলে চারিদিক হইতে গালি বর্ষণ হইত। ভাবিতেছে আমরা গোয়েন্দা। তাহাতেই এত ভয়। কাউন্টের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চলুন।" আরও দুই একবার আঘাত করিবার পর নিতান্ত সশঙ্কিত ভাবে একটি বৃদ্ধা দুয়ার খুলিয়া দিল। আমরা প্রবেশ করিলাম। তল্লাস করিতে করিতে চারিতলার উপর একটি সঙ্কীর্ণ কামরাতে একজন বিদেশীয় বসিয়া আছে দেখিতে পাইলাম। বার্ণার্ড একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন মাত্র। সে গৃহের অভ্যন্তর বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই। তাহাতে কিছুই নাই। একখানা খাটের উপর মলিন একটি বিছানা যত্নে কে যেন করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই এক পার্শ্বে একটি ছোট ছেলের শোয়াইবারও আয়োজন করা আছে। কাউন্ট কাতর চক্ষে সেই শূন্য বিছানার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। আমাদিগের প্রবেশ তিনি যেন জানিতে পারিলেন না।

বার্ণার্ড অতি ভদ্রভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার স্ত্রী ও কন্যা কোথায় ?" হঠাৎ কাউণ্টের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। "আমার স্ত্রী, আমার কন্যা" বলিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। "কে তাহাদিগকে আমার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়াছে"। আর কিছু বলিতে পারিলেন না কেবল "আমার স্ত্রী, আমার কন্যা" কাতর স্বরে কতবার বলিলেন। সেই মর্ম্মাহতের ক্রন্দন শুনিলে এমন পাষাণ কে আছে যাহার হৃদয় না গলিয়া যায়। কিন্তু আমার যেন বোধ হইল যে কাউণ্ট ভয়ানক মদ খাইয়াছেন। মুখের কথা জড়াইয়া আসিতেছিল, চোখ যেন খুলিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না, ঠিক হইয়া যেন বসিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু মূর্চ্ছিত জ্ঞান শোকের যন্ত্রণায় উত্তেজিত হইলে তাহা ভয়ানক হয়। অনেকক্ষণ আমরা সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলাম—অন্ততঃ আমার সময় দীর্ঘ মনে হইয়াছিল। পরে বার্ণার্ড যখন দেখিলেন যে কাউণ্টের সহিত আর কোন আলাপ সম্ভব নহে তখন আমরা দুই জনেই ঘর হইতে বাহিরে আসিলাম।

বার্ণার্ড বাহিরে আসিয়াই বলিলেন "আপনার বোধ হয় শান্তা কে ?" আমি তাহার কোনই উত্তর করিলাম না। ধীরপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। বার্ণার্ড আবার একবার আসিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। আমি রোসনের ঘরে প্রবেশ করিতেছি, হঠাৎ কেমন বোধ হইল যে আমি মৃতের সম্মুখে উপস্থিত। গিয়া দেখিলাম শান্তার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মরণের ছায়া ঘনীভূত হইয়াছে, তাহার বিশাল চক্ষু নিমীলিত, তাহাতে যে আকাশের আলোক একবার দেখিতে পাইয়াছিলাম, সে আলোক কোথায় চলিয়া গিয়াছে, শান্তা যে নিদ্রা কাতর কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্ন শূন্য, স্নিগ্ধ, জ্বালা শূন্য, শান্তির মূর্ত্তি। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, মাথা নোয়াইয়া একবার ঈশ্বরের নাম করিলাম। ফিরিয়া দেখিলাম সে ঘরে রোসন নাই।

শান্তা অনেক দিন হইল নাই। আমি রোসনলালের কোন সংবাদ অনেক দিন পাই নাই, পরে একদিন ইটালী হইতে এক পত্র পাইলাম তাহাতে আমি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতেছি সংবাদ পত্র (!) হইতে রোসন জানিতে পারিয়া আমার সঙ্গে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর দিলাম। পরে দুজনে এ দেশে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের মধ্যে কখন শান্তার বিষয় আলাপ হয় না। রোসনের হাফেজ পড়া গিয়াছে, রোসনের ঘর সাধারণ ভাবে সাজান, সে সংবাদ পত্র পড়ে, এমন কি সংবাদ পত্রে লেখা তাহার কতকটা বাতিকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপর রোসন আইন ব্যবসায়ী, বক্তৃতাকারী, দেশ হিতৈষী। কিন্তু অন্য লোকে যে যাহা বলুন না কেন, আমার বিশ্বাস রোসন লোক ভাল এবং আমার মতে তাহার অবস্থা এখনও খারাপ।

সমাপ্ত।

শ্রাবণে পত্র।

বন্ধু হে,

পরিপূর্ণ বরষায়
আছি তব ভরসায়,
কাজ কর্ম্ম কর সায়
এস চট্‌পট্‌;
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য
তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা পড়ে মোর চিত্ত
করে ছটফট্‌!
যখন যা সাজে ভাই,
তখন করিবে তাই,
কালাকাল মানা নাই
কলির বিচার!
শ্রাবণে ডেপুটি-পনা,
এ ত কভু নয় সনা=
=তন প্রথা, এ যে অনা=
=সৃষ্টি অনাচার!
রাজ ছত্র ফেল শ্যাম,
এস এই ব্রজধাম,
কলিকাতা যার নাম,
কিম্বা ক্যালকাটা,
ঘুরেছিলে এই খেনে
কত রোডে, কত লেনে,
এই খেনে ফেল এনে
জুতোসুদ্ধ পা-টা!
ছুটি লয়ে কোন মতে,
পোট্‌মাণ্টো তুলি রথে,
সেজেগুজে রেলপথে
কর অভিসার,
লয়ে দাড়ি, লয়ে হাসি,
অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা শাসি
বসি একবার!
বজ্ররবে সচকিৎ
কাঁপিবে গৃহের ভিৎ,
পথে শুনি কদাচিৎ
চক্র খড়খড়;—
হারে রে ইংরাজ রাজ,
এ সাধে হানিলি বাজ,
শুধু কাজ—শুধু কাজ—
শুধু ধড়ফড়!
আম্‌লা শাম্‌লা-স্রোতে
ভাসাইলি এ ভারতে,
যেন নেই ত্রিজগতে
হাসি গল্প গান!
নেই বাঁশি নেই বঁধু,
নেই রে যৌবন মধু,
মুচেছে পথিক বধু
সজল নয়ান!
যেন রে সরম টুটে
কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে
করে না আকুল!
কেবল জগৎটাকে
জড়ায়ে সহস্রপাকে
গবর্মেণ্ট পড়ে থাকে
বিরাট বিপুল!

বিষম রাক্ষস ওটা,
মেলিয়ে আপিষ-কোটা
গ্রাস করে গোটা-গোটা
বন্ধু বান্ধবেরে,
বৃহৎ বিদেশে দেশে
কে কোথা তলায় শেষে,
কোথাকার সর্ব্বনেশে
সর্ব্বিসের ফেরে!
এ দিকে বাদর ভরা,
নবীন শ্যামল ধরা,
নিশিদিন জলঝরা
সঘন গগন,—
এদিকে ঘরের কোণে
বিরহিণী বাতায়নে,
দিগন্তে তমাল বনে
নয়ন মগন।
হেঁটমুণ্ড করি হেঁট
মিছে কর agitate,
খালি রেখে খালি পেট,
লিখিছ কাগজ,
এ দিকে যে গোরা মিলে
কালাবন্ধু লুটে নিলে,
তার বেলা কি করিলে,
নাই কোন খোঁজ!
দেখিছ না আঁখি খুলে
ম্যাঞ্চেষ্টর লিভারপুলে
দিশি শিল্প জলে গুলে
করিল Finish,
"আষাঢ়ে গল্প" সে কই!
সেও বুঝি গেল ওই,
আমাদের নিতান্তই
দেশের জিনিষ!

আষাঢ় কাহার আশে
বর্ষে বর্ষে ফিরে আসে,
নয়নের নীরে ভাসে
দিবস রজনী!
আছে ভাব নাই ভাষা,
আছে শস্য নাই চাষা,
আছে নস্য নাই নাসা
এও যে তেমনি!
তুমি আছ কোথা গিয়া,
আমি আছি শূন্য হিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া
শোকতাপহরা!
সে তাকিয়া—গল্প-গীতি
সাহিত্য চর্চ্চার স্মৃতি
কত হাসি কত প্রীতি
কত তুলোভরা!
কোথায় সে যদুপতি,
কোথা মথুরার গতি,
অথ, চিন্তা করি ইতি
কুরু মনস্থির?
মায়াময় এ জগৎ
নহে সৎ—নহে সৎ—
যেন পদ্মপত্রবৎ,
তদুপরি নীর!
অতএব ত্বরা করে
উত্তর লিখিবে মোরে,
সর্ব্বদা নিকটে ঘোরে
কাল সে করাল!—
(সুধী তুমি ত্যজি নীর
গ্রহণ করিও ক্ষীর)
এই তত্ত্ব এ চিঠির
জানিও moral!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

বাঙ্গালীর ছবি—শ্রীযুক্ত 'আমার' অঙ্কিত।

এখানি আর কিছুই নহে, সুন্দর ভাষায়, সুন্দর ছন্দে দুর্গা পূজার একটি কবিতা।

বর্ষা গেলো আকাশ ধু'য়ে ফর্সা হ'লো দিক্।
কেঁদে কেটে, হেসে ধরা উঠ্‌লো যেন ঠিক্॥
দুখ্‌টি ঘুচে গেলো দেখে বুক্‌টি সুখে ভরা।
সুনীল-গগন-আর্সি নিয়ে মুখ্‌টি দেখে ধরা॥
ভোরের বেলা, কিরণ-মালা হাস্‌লে আকাশ গায়।
ফুলের সনে ফুটিয়ে ওঠে, পাখীর সনে গায়॥
সন্ধ্যা এলে, নীল চিকুরে হীরার মালা ত্বরা—
হর্ষে প'রে বর্ষার দুখ ঘুচায় বসুন্ধরা॥
জোছ্‌না রাতে, চাঁদেরসাথে, মৌনে কতই ভাষে।
শরৎ-চাঁদের চাঁদ্‌নী মেখেফিক্‌ফিকিয়েহাসে॥
এমন সময় অতুল সুখে ক'ত্তে সুখী সবে।
আস্‌চেন আনন্দময়ী বঙ্গে মহোৎসবে॥
কার্ত্তিক, গণেশ, ময়ুর, ইঁদুর,লক্ষ্মী, সরস্বতী।
মা আস্‌চে—আস্‌চে সবাই,হৃষ্ট হ'য়ে অতি॥
সিংহ'পরে, অসুর-বরে পীড়ন ক'রে মা।
আস্‌চে কেমন! নয়ন-ভ'রেআয়রেদেখেযা॥
দশদিক্ মা রক্ষা করে দশটি বাহু দিয়ে।
ভুবনজুড়েনাইরেকোথাওমায়েরমতন মেয়ে॥
আয়রে তোরা,কোন্ থানেকে আছিস্ মায়ের ছেলে।
মাদেখ্‌বি,প্রাণজুড়াবি,ডাক্‌বি"মামা" ব'লে॥
"মাআস্‌চে""মাআস্‌চে"প'ড়েগেলো সাড়া।
বঙ্গ-জুড়ে, উঠ্‌লো বেজে, ঢোল ঢক্কা, কাড়া॥
ছেলে মেয়ে,ছুট্‌লো সবাই,উঠ্‌লোবুড়োবুড়ী।
কচি ছেলে হর্ষে চলে দিয়ে হামাগুড়ি॥
যুব-যুবতী হৃষ্টমতি চ'ল্লো সবাই ধেয়ে।
ভুবন জুড়েনাইরে কোথাও মায়ের মতন মেয়ে॥
চির-রুগ্ন শয্যা ছেড়ে, উঠ্‌লো ঝেড়ে গা।
আস্‌চে বঙ্গে আজি রঙ্গে শক্তিরূপা মা॥
"মা আস্‌চে""মাআস্‌চে"প'ড়েগেলোসাড়া।
বঙ্গ জুড়ে উঠ্‌লো বেজে ঢোল, ঢক্কা, কাড়া॥
"পূজো এলো" "পূজো এলো"
রব এক্‌টা প'ড়ে গেলো,
লোকজন সব ব্যস্ত হ'য়ে চাদ্দিকেতে ধায়।
যে দিক্ পানে দেখ্‌বে চেয়ে,
দোকান পসার, রাস্তা ছেয়ে,
দলে দলে, চলে লোক পিপীলিকার প্রায়॥
নগর, সহর, আশে পাশে,
বুক্ বেঁধে সব লাভের আশে,
ছোট, বড়, নানারকম ব্যব্‌সাদারের দল।
বেচ্‌বে ব'লে পূজোর দিনে,
মনের মতন জিনিস্ কিনে,
দোকান সাজায়,শরৎ যেমনসাজায়ধরাতল॥
হেথায়আবার,গ্রামেরমাঝেযেদিক্‌পানেচাই।
পূজোর কথাই সবার মুখেশুন্তে কেবলপাই॥
বাপআস্‌বে,ভাইআস্‌বে,আস্‌বেছেলেঘরে।
ছেলেপিলে,মা,বোন্‌সবকতই আমোদ করে॥
নব-যুবতী হর্ষমতি, অনেক দিনের পর।
পূজোর সময় ছুটি পেয়ে, আস্‌বে নটবর॥
অল্প দিনই পূজোর বাকি'হিসেব ক'রেদেখে।
সারাহোলোঘোষেদেরবউ'সাবানমেখেমেখে

কাজের দায়ে সম্বৎসর বিদেশ বাসী যা'রা।
ফির্‌বে, বাড়ী সেই জন্যে এম্নি খুসি তারা॥
সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে, বাড়ী যা'বার দিনে।
এরমধ্যেই, কতজিনিসরাখ্‌চেতা'তেইকিনে॥
ওর মধ্যেই, যে সব যুবার নতুন নতুন বিয়ে।
ব্যস্তকিছু,ল্যাভেণ্ডারআরসাবানফিতেনিয়ে॥
এখন আছেআশারমেঘেধ'রে"চাতক-ব্রত"।
ছুটিরহুকুমপেলেই তা'রাছুট্‌বেঘোড়ারমত॥
এদিকেতে বিদেশ বাসী ছাত্র-মহল-ময়।
পূজোর ছুটি নিকট হওয়ায় হর্ষ-তুফান বয়॥
ছোটোছোটো,ভাইবোনটিআছেকারোঘরে।
এটি-ওটি, দেখে শুনে, কিন্‌চে তাদের তরে॥
চীনেরপুতুল,টিনেরঘোড়া রঙিনকাচেরবাটী।
উলের টুপি, ঘাঘ্‌রা ফুলের,নিচ্চে পরিপাটি॥
জরিরজুতোকেউবাকেনেছোটোভেয়েরতরে।
পায় হ'বেকিসন্দেহেতো মাপে আঙুল ধ'রে॥
"মোজাহু'টিবড্ড ছোটো—মাপেখাটোএ কি!
অমন রঙিনবড়হু'টি,বা'রক'রেদাও দেখি॥"
এই রকমে, দোকানদার দিয়ে ধর্ম্ম-ভার।
নিচ্চে তুলে মনের মতন জিনসগুলি তা'র॥
দোকানদারোচালিয়েনিজের"বউনিবেলা'র বুলি।
পাঁচগুণ দাম আদায়ক'রেদিচ্চে চোকেধূলি॥
এদিকেফেরপূজোরব্যাপারআছেযা'দেরবাড়ী
ভাঙাচুরো তালিদিয়ে সাচ্চে তাড়াতাড়ি॥
উঠোন-জাঙাল-ঘর-বাড়ী-দোর,হ'চ্চেপরিষ্কার।
শক্তি বুঝে শক্ত জনে হ'চ্চে দেওয়া ভার॥
বায়না হাতায় শ্যাম গয়লা বাড়ী বাড়ী ঘুরে।
গ্রামছাপিয়ে, বায়না ছোটে কোশ পাঁচসাত দুরে॥
দুধের তরে তিলমাত্রে চিন্তা শ্যামের নাই।
সাম্‌নে আছে এঁদোপুকুর মাটিফোঁড়া গাই॥

গত বছর পূজোয় যখন দৈ দিছ্‌লো পাতে।
এঁদোডোবারপুঁটিমাছটি অবধিছিল তা'তে॥
পূজোরখরচ,মোণ্ডাচিনি,বায়না নেবারতরে।
রাম ময়রা হেথা সেথা ঘু'চ্চে ক'দিন ধ'রে॥
সন্দেশতকেমনদেবেন! আগেই আছেজানা।
দুর্গা পূজোরআবারতা'তে আধা-ছানা,মানা॥
ওঁচা, পচা যাত্রাদলের দালাল যেথা যত।
বায়না-তরে কেবলঘোরেশ্যাল-কুকুরের মত॥
শ'ম্ভোঢুলীরঢোল্‌টা ছিঁড়েগেছ্‌লোকালামেরে
বদ্‌লে তালা আচ্ছাক'রেআজ্‌নিলেতায়সেরে॥
ছাতা-পড়া, ভাব্‌না-ধরাচপ্‌চ'পে সেই ঢোল।
শম্ভোঢুলীরহাতেবলে"তাক্‌তাক্‌সিন"বোল॥
পা'বারআশা,খা'বারআশা,বাড়চেমনেযত॥
"তাক্‌ত্রেকেটে'"ধিনিতাক্‌তাক্‌" রংবেরুচ্চে তত॥
আওয়াজ্‌ শুনে শম্ভূ-তনয় কাঁসি বাজায়রুখে।
"কাঁই কাঁই-কাঁই"কাঁসিবলে,"খাই-খাইখাই" মুখে॥
তাই না,শুনেইঢুলিপাড়ামাত্‌লা কাঁসি ঢোলে
গাঁতোল্‌পাড়"ছ্যানা-ন্যাং-ন্যাং""গিজ্‌দাগিজ্‌-ম" বোলে॥
পেটুকগুলোর আস্থা বড় দিন কেটেচে শুয়ে।
দিন আন্‌চেন জগদম্বা, পেট রাখ্‌চে ধুয়ে॥
সাত জায়গায়ফলারলুচিপট্‌বেহিসেব ধ'রে।
কোন্‌তিথিতেকোথায়যা'বে, রাখ্‌চেখোতেন ক'রে॥
কা'রেও একা,তিনসাত্তেএকুশদিনের কাজ—
তিনটি দিনে সাত্তে হ'বে,তাইভাব্‌চে আজ॥
পোয়াতিদেরহাড়জুড়ুলো,নিশেসফেলেবাঁচে।
ন্যালা,ফ্যালা,সিধে,বিধেঠাকুরনিয়েইআছে॥
রাতপোহালে,যেসবছেলে,খেতোএকুশবার।
ভাতেরকাছে,আজ্‌কেতা'দেরটেনেরাখাভার॥

প'টোর কাছেব'সেব'সেই,পাচ্চেঅপার সুখ।
চোরাররাগীমুখটোদেখে,কেউবারাগায় মুখ॥
কার্ত্তিক-দা'রময়ূরদেখে,লোভকারোহয়মনে।
ফোঁস-ফোঁস-ফোঁস্‌সাপ্‌টাদেখে, লুকোয় কেহ কোণে॥
সিঙ্গি-মামার দন্ত দেখে পালিয়ে কেহ ভয়ে।
"চালচিত্তির"হচ্চেযেথা,বোস্‌চেসেথায়গিয়ে॥
রংতুলীদেআঁক্‌লেপ'টোএকটা"তেজী"ঘোড়া
মুখ্‌টোহোলোব্যাংএরমত,ঠ্যাংটাহোলোখোঁড়া
সিঙ্গি আঁকে, মূলেরসাথেমিলনাইতা'রতত।
মুখ্‌টোবরংকতকপ'টোরমেজোছেলের মত॥
রামবসেছেনরাজাসনে,আঁক্‌চেকোথাওতাই।
ছাতা ধরে, বাতাস করে, ভরতাদি ভাই॥
পায়ের কাছে হনু আছে, ভক্তি-ভরা প্রাণে।
স্থানাভাবে ন্যাজ্‌টি গেচে শত্রুঘনের কানে॥
তাতেইযেন,হনুরআক্কেল,রামেরব্যভারদেখে।
ঘৃণায়,রাগে,ভরতখুড়োরমুখ্‌টোগেছেবেঁকে॥
এইসকলিসোণারচোকেদেখ্‌চেঅবাক্ হ'য়ে।
কতই মনে ভাব্‌চে প'টোর নিপুণতা ল'য়ে॥
চুড়ি কেনা,আল্‌তা পরা,বেশ-বিন্যাস নিয়ে।
মেয়ে-মহলে বেশ একটি গোল পড়েছে গিয়ে॥
হচ্চে হুকুম,ছয়টা কা'রো মাক্‌ড়ি নতুন চাই।
হারবাকারোছিঁড়েগেছেজুড়্‌তেপাঠায় তাই॥
রাঙাদিদিরবালা-গাছটির-গেছ্‌লোভেঙেকোঁড়া।
সেক্‌রা-বাড়ীপাঠিয়েদিলেনকোত্তেনতুনযোড়া
আন্‌করা সব গয়না নতুন ছিল মতির মা'র।
কাজ্ না পেয়ে,কাজেইহলোভাব্‌নাবড়তা'র॥
পানেরডিবে,বাঁধাহুঁকো,কাঁসাররেকাব্‌গুলো।
তোলা ছিলো, বা'র কোরেতাইমাজ্‌তেব'সে গেলো॥
খোস্‌পোসাকি কাপড়-চোপড় ঘাম-গন্ধ ব'য়ে।
মলিন বেশে পচ্‌তেছিলো তোরঙ্-ঠাসা হ'য়ে॥
ধোপারবাড়ী যাবে ব'লে বা'র হচ্চে তারা।
আস্‌লাতে কোথাওকাটা,কোথাও পোকায় জারা॥
দিন্‌টেপূজোরক্রমেআরোএলোনিকট হ'য়ে।
আনন্দ-স্রোত চাদ্দিকেতে চোল্লে বেগে ব'য়ে॥
পূজোবাড়ীতে ৎপো আমোদ,ব্যস্তসবাই বড়।
ঝি বউ সব একেক করে হচ্ছে এসে জড়॥
গোলাপ এলো চাঁপা এলো, শ্যাম-দা এলো, বাড়ী।
খবর দিতে ছেলেমেয়ে সব্ ছুট্‌চে তাড়াতাড়ি॥
বড় কর্ত্তার বৌ আস্‌চে অনেক দিনের পরে।
ছেলেপিলে বোসে আছে"হা পিত্যেশ"করে॥
দৌড়ে গিয়ে খবর দেবে,মোণ্ডা পাবে খেতে।
আস্‌চে বিপিন, তারসঙ্গেখেল্‌বেদিনেরেতে॥
হেথায়,এদেরঝিআস্তেতিনদিনলোক্ গেছে।
আজএখনোআস্‌চেনা,তাইপথ-চেয়ে-সবআছে॥
সেথায় ওকি! শ্বশুরবাড়ী হ'তে,বিয়েরপরে।
ইন্দুএলোআজ্‌কেপ্রথমতাই দেখ্‌বার তরে—
সাতটা গাঁয়ের মেয়েহোলোএকটাঘরে জড়।
গোলউঠ্‌লো"বাউটীবেশ""চিক্‌টেকিছুবড়।"
সুয্যিমুখী ভোজন-কাজে ব্যস্ত ছিলো ঘরে।
এঁটোমুখেইহাজিরহোলোহাতটাউঁচুক'রে॥
রামধন দাস এই আস্‌চে—পা ধুচ্চে ঘাটে।
মায়-ছাতি-ব্যাগরামধনদাসপাড়ায়গেছের'টে॥
ঘোষজাএলো,দৌড়েগেলোছেলেপিলেরদল।
ফ'লেগেলোবোস্‌জারঝি'রসাবানমাথারফল॥

"বাবা এলো" "বাবা এলো"
বাবার ছেলে দৌড়ে গেলো,
উঠ্‌লো গিয়ে কোলে।
"ছিলি অ্যাৎদিন কা'দের ঘরে,
কি আন্‌লি আমার তরে"
সুধায় মধুর বোলে॥

ছোটোছোটোছেলেমেয়েরসঙ্গে নেচে হেসে।
চিকণ বসন ভূষণ প'রে ষষ্ঠী হাজির এসে॥
আমোদ প্রমোদ রঙ্‌ তামাসায় দেশটা গেলো ছেয়ে।
নেচে নেচে পূজো যেন সাম্‌নে এলো ধেয়ে॥
শাঁখ,ঘণ্টা,কাঁসর,ঘড়ী,পূজোর বাসনগুলো।
আস্‌র্‌লাআরমাকড়সাদেরবাসা হ'য়েছিলো॥
বড় বড় বারকোস্‌রা স্নানটা সেরে নিয়ে।
দু'হাতন-পোব্যাসেবসেনদেয়ালঠেসানদিয়ে॥
এইরূপ সব্‌ব্যাপারনিয়েদিন্‌টে গেলোকেটে।
বস্‌লো পাটে সূয্যি-ঠাকুর সব দিনটে খেটে॥
বোধনেরকালএগিয়েএলো,উঠ্‌লোবাজনবেজে
ছেলেমেয়েবেরিয়েএলোপোসাকপ'রেসেজে॥
ছোটোছোটোছেলেপিলেরবাহার্দ্দিকেরকাজ—
সেরেসুরে কোলে ক'রে পরিয়ে মোহন সাজ—
মুখভর্ত্তি হুলুধ্বনি, শাঁখ বা কারো হাতে—
পুর-নারীগণ হর্ষ-বদন গিন্নিদিগের সাথে—
দালানজুড়েদাঁড়িয়েগেলো"ফুলেরমেলা"প্রায়,
নতুন বসন অঙ্গে ঢাকা, নতুন ভূষণ গায়॥
বোধন-ব্যাপার শেষ কোত্তে, মনে বড় ত্বরা।
আসনচেপেবোস্‌লোপুরুতপাটেরকাপড়পরা॥
পাশে বসেন তন্ত্রধারক স্মার্ত্ত-শিরোমণি।
অনুস্বার আর বিসর্গান্ত শব্দাবলীর খনি॥
কং খং গং, ঘং চং ছং, মন্ত্র পুরুত ভাঁজে।
ঠঠং ঢঢং, ঢং টং ঠং, ঘণ্টা কাঁসর বাজে॥
দালান থেকেই উত্তর তা'র দেয় শঙ্খ-রোল।
"গিজ্‌দাগিজুম্‌" "ছ্যানা-ন্যাং-ন্যাং" বাজ্‌লো কাঁসি ঢোল॥
যার পেটেতে হুলুধ্বনি জমা ছিলো যত।
একে একে, শেষহ'য়েতাএলোআজের মত॥
বোধন-ব্যাপার চুক্‌লো,—গেলো "দেখি-য়ের" দল স'রে।
রৈল যা'রা,রৈল তা'রা ব্যস্ত কাজের তরে॥

ষষ্ঠী-নিশি পুইয়ে আসে,
পূর্ব্বদিকে ঊষা হাসে,
কাক পক্ষী দুই একটি ডাক্‌লো গাছে গাছে।
ললিত, বিভাস, ভয়রোঁ ভেঁজে,
সানাইগুলো উঠ্‌লো বেজে,
ধীর-গম্ভীরনাগরা,কাড়া,তালদিলেতা'রপাছে॥
চাদ্দিকেতে সজাগ হ'য়ে,
সবাই নাকি ছিল শুয়ে,
বাজ্‌নাশুনেই'দুর্গা'বোলেউঠ্‌লোশয়নছেড়ে।
ক্রমে ক্রমে বাড়্‌লো বেলা,
উঠ্‌লো বেড়ে লোকের মেলা,
তা'রসঙ্গেইপূজোবাড়ীতেগোলউঠ্‌লোবেড়ে॥
বাজ্‌লো কাঁসর, ঘণ্টা, ঘড়ী,
সপ্তমে প্রাণপণে চড়ি,
বাজ্‌লোসানাই,কাঁসি, কাড়া,বাজ্‌লোতারিসনে
তার মাঝেতে আড়ম্বরে
যায় 'কলাবউ' স্নানের তরে,
পুরুত ঠাকুর চুবিয়ে জলে, তুল্লে পরক্ষণে॥
বাজ্‌লো কাঁসর ঘণ্টা, ঘড়ী,
সপ্তমে প্রাণপণে চড়ি'
বাজ্‌লোসানাই,কাঁসিকাড়া,উঠ্‌লোবেজেতথা।
হাতেক দুহাত ঘোম্‌টা দিয়ে,
তার পরেতে দাঁড়ান গিয়ে
বারকোসেতে, কলাবউটি লজ্জাবতী লতা॥
পরক্ষণেই বাজ্‌নাগুলো
ক্ষণেকতরে থেমে গেলো,
সটীক দু'টি মহাশয়ের পড়্‌লো পালা এবে।
বুঝ্‌লে সবাই চারিভিতে,
তন্ত্রধারক, পুরোহিতে,
মুখোমুখি,হাতাহাতি একটা যা'হোক্‌ হবে॥
যা'হোক্‌,শেষেবিঘ্নবাধা সকল কেটে গেলো।
পূজোর ব্যাপার, আজেরমতশেষপ্রায়এলো॥

পুষ্পাঞ্জলি বস্‌লো দিতে যা'রা ছিলো বাকি।
ছেলেরাদেছেসকালসকালকেউবাদেছেফাঁকি॥
ক্রমেক্রমেশেষহলোসবচুক্‌লোভোগেরলেঠা।
এইবারেতেভোজনব্যাপারবা'রহোলো তাই ঝাঁটা॥
ঝাঁট্‌পড়্‌লো,পাতপড়্‌লো,ভাতপড়্‌লোশেষ।
সবার আগে বামুনগুলো লাগ্‌লোখেতেবেশ॥
শাক সব্‌জি তরকারি যা আস্ত আউয়ল বন।
কাটি ঘায়ের শঙ্কাও তা'য় আছে বিলক্ষণ॥
দেখ্‌লে পরেই মনের মাঝে উপ্‌চেআসেভয়।
"গরুড়""গরুড়"বোলেতবেহাতবাড়া'তেহয়॥
ঝোলে কচু, টকে কচু, কচুর মূলোর সুক্ত।
কচু ঘণ্ট, বিউলির ডাল—তাও কচুযুক্ত॥
বল্‌বার নাই এমন,যা'তে কচু দেছেনফাঁকি।
সব রকমি কচুর, কেবল কচুপোড়া বাকি॥
ক্ষুধার জ্ব'লেছিলোসবাইযা পেলেতাই খেলে।
কচুতো কচু চল্‌তো তখন কচুরনীচু পেলে॥
তৃপ্ত হ'য়েআরসকলেও,তাইখেলেত ারপরে।
তৃপ্ত যে নয় ঘরে গিয়ে খা'ক্‌গে বেশিক'রে॥
কাঙাল-বিদেয়চুকেগেলো,ঘুচ্‌লোকাড়াকাড়ি।
চণ্ডীর গান দণ্ডখানেক হ'লো কোনোবাড়ী॥
মদন বাবুর বাড়ী পূজো হ'চ্চে নতুন মতে।
কীর্ত্তনী এক হাজির আছে ষষ্ঠীরদিন হ'তে॥
আরাম ঘরে যদিও তারে গাইতে সদাইহয়।
তবু একবার আসর রেখে গেলেন এ সময়॥
সন্ধ্যা হলো, পূজোবাড়ীতে ফুট্‌লো আলোক ভাতি।
দুর্গামাতারদুইপাশে দুইজল্‌লো মমেরবাতি॥
নানা রকম জাঁক্ জমকে"শেতল"চুকেগেলে।
সপ্তমীটেপড়্‌লোশুয়ে,বাঁচ্‌লোনিশেস্ ফেলে॥

সকাল বেলা শুনি উঠে,
পালিয়ে গেছে সপ্তমীটে,
যমজ বহিন্ অষ্টমীটে হাস্‌চে তারই পারা।

দেখ্‌তে শুন্‌তে আকার-গত
এও ঠিক্ সপ্তমীর মত,
একটি দিনের ছোট বড় বই ত নহে তারা॥
তেম্নি আমোদ এও ক'ল্লে,
রাত থাক্‌তে উঠে ব'ল্লে
গিয়ে নবমী ফুল্লমুখী ছোটো বনের কাছে।
"ওঠ্ নবমি, ঘুমুস্‌নি বোন,
মায়ের কাছে থাক্ একজন,
এখনআমিবিদেয়হলেম,যাস্ তুইমোরপাছে॥
এমন সময়ধূপধূনারধোঁয়আঁধারহোলো ঘর।
সুবাস তারি অঙ্গে মেখে পবন হোলো তর॥
শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর,ঘড়ী উঠ্‌লো সবাইবেজে।
সপ্তমেতেবাজ্‌লোসানাইঢোল,কাড়াসবতেজে॥
'সন্ধিপূজো' চুকে গেলো, 'অষ্টমী দি'গেলো।
বাজ্‌নাগুলোখানিক তা'কে এগিয়েদিয়েএলো॥
নবমীর দিন এলো; ঘটা উঠ্‌লো বড় বেড়ে।
ঢুলীগুলো মাৎ ক'ত্তে লাগ্‌লো মথো নেড়ে॥
"হৈ-হৈ-হৈ"পূজোবাড়ীতেলোকযাচ্চেছেয়ে।
মদন বাবুরবাড়ী,বিশেষজাঁক্‌লোসবারচেয়ে।
ঢুক্‌তে, বাড়ী আধেক্ পো তাহাড়্‌কাষ্টহুটো।
মোষের যেটা বড়সেটা,পাঁঠার সেটাছোটো॥
ছোট-বড়,সাদা,কালো,শাদায়-কালোয়পাঁঠা।
উচ্ছুগ্‌গু কোচ্চে পুরুত পড়বে ব'লে কাটা॥
হাড়ে হাড়ে নিষ্ঠুরতা বিঁধে দেবে বো'লে।
পোসাক-পরাছোটোছোটোছেলেমেয়েকোলে
লোকজম্‌চে; কেউবাআবারহচ্চেগোণদেখে—
আথ্‌ড়াটা দেয় ছেলেপিলেয় "জয়মা" ব'লে ডেকে॥
চিকেরভিতর,ছাদেরউপর,থামেরপাশের'য়ে।
গোণ দেখে,মেয়েগুলোওপড়্‌চেঅধীরহ'য়ে॥
শিঙে সিঁদুর, গলায় মালা,ধ'রে শেষেরবেশ।
এমন সময় হলো পাঁঠা উচ্ছুগ্‌গু শেষ"॥

তেলেপিছল্‌গা-টা,ভাসেতেল্‌ সিঁদুরেরফোঁটা।
রোঁ-ভরাবুক্‌,"জয়মা"হেঁকেবেরিয়েএলোক-টা
বাজ্‌লোজোরেবাজ্‌নাগুলোসানাইটাকীসুরে।
প্রাণপণেতেউঠ্‌লোহেঁকে"তারা""তারা"ক'রে
খড়্গ-ধারে কতকগুলো জীবের গেলো প্রাণ।
বধ্য-ভূমি কোল্লে যেন রুধির মেখে স্নান॥
মদ-মত্ত মদন বাবুর বড়ই ছিলো ভয়।
কালো পাঁঠা থেকে পাছে রক্ত না বার হয়॥
মায়ের কৃপায় সন্দেহটা ঘুচ্‌লো হাতে হাতে।
রাঙাশোণিতপড়্‌লোবেয়েকালোছাগলহ'তে॥
ভাবে গদ্গদ্‌ তখন বাবু,—এই রক্ত যার।
একটু বাদেই চাট্‌নিহ'বে খোদ্‌ মাংসতা'র॥
মাংসাশীকেউ,চেয়েথানিক্‌কাটামোষেরপানে
ফেল্লে নিশেস্‌ একটি,ভেবে কি এক্‌টা মনে॥
টাট্‌কা খেঁউড় গেয়ে, শেষে, মুখশুদ্ধি ক'রে।
সবাই মিলে চল্লো ঘাটে স্নানকর্‌বার তরে॥
এদিকেক্ষেরদেশ-বিদেশেরউৎককুকুরগুলো।
কা'রো সাথে,পূজোবাড়ীতেএসেপড়েছিলো॥
পাঁঠার ভুঁড়িপেয়েএখনউঠ্‌লোতা'রা মেতে।
বাড়ীরকুকুরপাচ্চেনাকোতা'দেরকাছেযেতে॥
কাক্‌গুলোসবপাঁচীল,ছাদে,বাড়ীরকাছেগাছে।
পাঁঠার ভুঁড়িসোয়াদনিতেমজুত হ'য়েআছে॥

শিরোমণিরসেজোছেলে—সেটিওএদেরমত।
খা'বার তরে হাঁ হাঁ কোরে ঘুচ্চে অবিরত॥
অন্য খাবার দ্রব্যে তাহারবেজারধ'রে গেছে।
নাড়ু, কলা, গাছমোণ্ডা মুখে লেগেই আছে॥
এই রকমে চাদ্দিকেতে অভিনয়ের ঘটা।
এক বদনে এক কলমে বল্‌বো আমি ক'টা॥
আজ দশমী; বিসর্জ্জনের সময় এলো সেজে।
চাদ্দিকেতে দিচ্চে খবর বাজ্‌নাগুলো বেজে॥
ছোটো বড় ক'রে ছিলো যে যেথানে ঘরে।
ব্যস্তহ'য়েবেরিয়েএলোসবাই পোষাক প'রে॥
ছোটোছোটোছেলেগুলিচাকরদাসীরকোলে।
সেজেগুজেএলো,ভাসানদেখ্‌তেযা'বেবোলে॥
বাঁড়ুয্যেদের হাব্‌লা নিজে ব্যস্ত বড় হ'য়ে।
কালুঘোষেরজিম্মেহ'লো;হারিয়েযাবারভয়ে॥
যাহোক্‌, শেষে নানারঙে, মঙ্গলাচার ক'রে।
ভাসান দিয়ে মূর্ত্তি মায়ের ফিল্লো সবাইঘরে॥
তার পরেতে সবাই মিলে,ক'রে কোলাহল।
পা ঢাকা দে,মাথা পেতে নেয়"শান্তি জল"॥
গুরুজনে গড় ক'ল্লে; আশীর্ব্বাদের জনে—
ক'ল্লে আশীষ; সখা সখায় তুষলে আলিঙ্গনে॥
ওর মধ্যেই,টেড়ীরউপরকদরযা'দের আছে।
তয়ে তয়ে গড় ক'ল্লে, চুল ঘেঁটেযায় পাছে॥
এই রকমে এক বছরের আমোদহ'লো শেষ।
আশার খেলা ঘুচে গেলো,স্তব্ধ হ'লো দেশ॥

শক্তি কানন—শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত।

আজ কাল দুই চারি জন খ্যাতনামা লেখকে মিলিয়া উপন্যাস লেখাটা তাঁহাদের একরূপ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন, তাই বলিতে আহলাদ হইতেছে, অনেক দিন পরে আজ আমরা নূতন লেখকের একখানি ভাল উপন্যাস পাইয়াছি।

দেড় শত বৎসর আগেকার বাঙ্গলা লইয়া শক্তি কানন রচিত। শক্তি কাননের সমস্তই গ্রাম্য দৃশ্য, গ্রাম্য লোকের জীবনকাহিনী। সহরের সঙ্গে বইখানির বড় সংস্রব নাই। লেখক এই গ্রাম্য দৃশ্যে বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন যে বইখানি পড়িতে পড়িতে তরুলতা-হিল্লোলিত বিহগ-বিহগী-কূজিত বাঙ্গলার শ্যাম সুন্দর চিত্র খানি আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, এবং তাহার মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সহরের মধ্যে বসিয়া সহর ভুলিয়া যাই।

শক্তি কাননের নায়ক জগন্নাথ যেমন গাড়োয়ান ও তাহার শিষ্য হরিদাসের গণ্ড-গোলের মধ্যে থাকিয়াও 'সেসব কিছু শুনিতেছিলেন না—"তিনি চক্ষু ভরিয়া কৌমুদী প্রফুল্ল প্রকৃতির শোভা দেখিতেচিলেন—অনতি দূরে গভীর বন দেখা যাইতেছিল চন্দ্রা-লোকে সে বন ঈষৎ শ্যাম, ঈষৎ নীল শৈল শ্রেণীবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। মাথার উপরে কোকিল গাহিতেছিল, পার্শ্বস্থ বৃক্ষে বউ কথাকও নিজের মর্ম্ম কথা বলিতেছিল, তখন দূরে পাপিয়ার গগণভেদী স্বর লহরী থাকিয়া থাকিয়া অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, এই মাত্র মৃদু মন্দ সমীরণ বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল, পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ তখন সে আম্র বৃক্ষকে কদম্ব বৃক্ষ ভাবিয়া আত্ম বিস্মৃত হইতেছিলেন"।

শক্তি কাননের এই পবন হিল্লোল এই পাপিয়া কোকিলের স্বর লহরীর মধ্যে থাকিতে থাকিতে আমাদের ও এই কোলাহলময় ইটকাটের সহরকে নীর্জ্জন নিকুঞ্জ বলিয়া আত্ম বিস্মৃতি জন্মে।

বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ন্যায় বাঙ্গলার মনের দৃশ্যও সাধারণতঃ লেখক বেশ আঁকিয়াছেন, গৃহবধূ হৈমবতীর সলজ্জ প্রেমময় ভাব, বিধবা ননদের কর্ত্তৃত্বের অথচ মমতাময়ী ভাব, জগন্নাথের হরি ভক্তি, হরির প্রভু ভক্তি, বালক লোকনাথের সরল দুষ্টামি, বালিকা প্রভার বালিকার মতই সরলতা—এ সকলি সুন্দর হইয়াছে; কেবল নাপিতবৌএর স্বভাবটি লেখক ভাল ফুটাইতে পারেন নাই। সে আগে নিতান্ত মন্দ লোক ছিল—সহসা একেবারে ভাল হইয়া গেল।

সংসারে যে ভাল হইতে মন্দ, মন্দ হইতে ভাল না হয়—তাহা নহে। সকল মানুষেরই মনে ভাল মন্দ নানা রূপ প্রবৃত্তির বীজ আছে, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রবৃত্তি বলবতী হইলে এবং বংশ শিক্ষা ঘটনাদি অবস্থা তাহার অনুকূল হইলে তাহার বিপরীত অন্যটি হৃদয়ে সুষুপ্ত হইয়া থাকে, অনুকূল অবস্থায় উপযুক্ত জলসিঞ্চনে সেই মৃতপ্রায় বীজও ক্রমে সতেজ হইয়া অঙ্কুর হইতে ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। নিপুন চরিত্র চিত্রকর মনুষ্য স্বভাবের এই একসীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বর্ণের আভা ফলাইয়া এই পরিবর্ত্তনটি এত স্বাভাবিক করিয়া আনেন যে দর্শক যে সে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হয় কিন্তু আশ্চর্য্য হয় না। নাপিতবৌ এর স্বভাবের পরিবর্ত্তনটিতে এই স্বাভাবিক ভাবের অভাব। আর একটি কথা লেখক যেরূপ ভাবে বাঙ্গলা ও বাঙ্গলীর ছবি আঁকিয়াছেন উপন্যাসের সব ঘটনাগুলির তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। উপন্যাসের প্রথমদিকের গুরুশিষ্যের বনদর্শন ননদ ভাজের কথা বার্ত্তা, নাপিতবৌএর ঝগড়া, ভাই বোনের আবির খেলা ইত্যাদি গ্রাম্য ভাবের গ্রাম্য ঘটনার সহিত শেষাশেষির খুনাখুনি রক্ত স্রোত ব্যাপার আদপেই মিশ খায় না। বাঙ্গলার যে এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটে না তাহা বলিতেছি না—তবে লেখক যেরূপ শান্তিময় সাধারণ বঙ্গের ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছেন—শেষের

ঐরূপ অসাধারণ ঘটনাতে তাহার যে সরল শ্রী যেন কতকটা নষ্ট করিয়াছে, বাঙ্গালী মেয়ের উপর যেন গাউন চাপিয়াছে। লেখক শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে যে একতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছেন তাহাও বেশ স্বাভাবিক ভাবে আনিয়া ফেলিতে পারেন নাই। নদীর মত সরল ভাবে উপন্যাসের ঘটনা আপনা আপনি স্বাভাবিক পথে যাইবে, জোর করিয়া এরূপ কোন উদ্দেশ্য বা মতের দিকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার সম্মুখে যদি ঘটনা বা তর্কের বাঁধ দেওয়া হয় তবে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য হানি হয়। ইহা সত্ত্বেও শক্তি কানন একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস—ইহার ভাষা চমৎকার, বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী চরিত্রও সাধারণত প্রস্ফুট।

অশ্রুকণা। শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। গিরীন্দ্রমোহিনী বঙ্গসাহিত্য সমাজে অপরিচিত নহেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ তাঁহার বিষাদ-বিগল অশ্রুকণা তাঁহার কবিত্বসৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া তাঁহাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। নিম্ন-লিখিত কবিতাটি তাঁহার আশ্রুকণার প্রকৃত সমালোচনা।

কে তুমি বিধবা বালা, খুলিয়ে উদাস প্রাণ
আধ চাপা চাপা স্বরে গাহিছ খেদের গান!
দীর্ঘশ্বাসে কথা গুলি যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়
সরমে হৃদয় যেন সব না ফুটিতে চায়!
উচ্ছ্বসিত অশ্রুনদী—প্রবাহিতে যেন মানা,
অপাঙ্গে কাঁপিছে তাই শুধু এক অশ্রুকণা!
প্রাণে যার মর্ম্ম-বিদ্ধ জীবন্ত জ্বলন্ত আশা
মিশিব পতির সনে যদি থাকে ভালবাসা,
দেহে মাত্র ছাড়াছাড়ি—দেহ হ'লে ছারখার
দুটি দীপশিখা মিশে উভে হব একাকার,—
এমন বিশ্বাসবজ্রে বাঁধান হৃদয় যার
তাঁর সমা সধবা গো ভূমণ্ডলে কোথা আর!
আপনি প্রকৃতি সতী গাঁথি মালা নব ফুলে—
নব পরিণয় তরে অনন্তের উপকূলে
দাঁড়ায়ে আছেন দেবি ধরিয়ে বরণ ডালা,
চির-মিলনের সুখ জাগিবে জাগিবে বালা।
বাসর আসর হবে মহাশূন্যে মহালোকে,
সখার তরুণ-কান্তি নেহারিবে দিব্য চোখে,
পৃথিবীর দুষ্ট বায়ু সেখানে পশিতে নারে,
দেহের কালিমা ছায়া সেথা না পড়িতে পারে,

প্রাণে প্রাণে সম্মিলন—যমুনা জাহ্নবী পারা—
অনন্ত বিহার ক্ষেত্র—অনন্ত অমৃত ধারা—
অনন্ত তৃপ্তির মাঝে অনন্ত বাসনা নব,
এই ত বিবাহ শুভ—এ বিবাহ হবে তব॥

পরলোকে দেখা হবে এ বিশ্বাস নহে ভুল,
নহে এ স্বপ্নের ছায়া, কল্পনালতিকাফুল!
যাও বিজ্ঞ দার্শনিক, শুনিনা তোমার কথা
ন্যায়ের হেঁয়ালিরঙ্গ শুষ্ক তর্ক কুটিলতা!
আন এক পরমাণু—পুনঃ পুনঃ কর ভাগ
সূক্ষ্ম হোতে সূক্ষ্মতর—সূক্ষ্মতম হোয়ে যাগ,
সেই সূক্ষ্মতমটুকু কার সাধ্য করে লয়,
প্রকৃতি জননী যে গো, প্রকৃতি রাক্ষসী নয়।
যা ছিল তা রহিয়াছে যা আছে তাহাও রবে,
একেবারে নির্ব্বাপিত নিঃশেষিত নাহি হবে—
ওই যে গাহিল পাখি, আবার থামিল গান,
থামিল মর্ত্তের কর্ণে কিন্তু নহে অবসান।
ও গানের প্রতি সুর—প্রত্যেক কম্পন তার
বায়ুস্তর ছাড়ি আছে সূক্ষ্ম ব্যোম পারাবার।
সেখানে হিল্লোলে উহা অবাধে চৌদিকে ধায়,
পৃথিবীর টানাটানি সেথা না পৌছিতে পায়।
ওই যে ফুলের গন্ধ, ওই যে বাঁশীর রব,
ফুল যাক্, বাঁশী যাক, শূন্যেতে মিলিছে সব।
শিশুটীর কচি হাসি, যৌবনের প্রেমোচ্ছাস,
যুগান্ত বিরহ পরে মিলনের দীর্ঘশ্বাস,
সুপ্ত রুগ্ন শিশুকোলে জননীর আশীর্ব্বাদ,
প্রেমের প্রথম অঙ্কে আধোফুটো যত সাধ—
সেই শূন্যে তোলা আছে—কিছুই পায়নি লয়,
প্রকৃতি গুছান' মেয়ে, প্রকৃতি উন্মাদ নয়।

শিশুকালে ক'রেছি যে জননীর স্তন পান,
শিশুকালে জননী যে ক'রেছেন চুমু দান

সেই দুগ্ধ সেই চুমু এখন গিয়েছে কোথা ?
জীবনের গাঁটে গাঁটে বিজড়িত আছে গাঁথা।
এই যে ফুটন্ত ফুল কাল ছিল কলিপ্রায়,
কালিকার রবিকর লেগেছিল ওর গায়,
আজ ত নূতন রবি নবকর করে দান
কাল্‌কার রবি তবু ফুলটীতে বিদ্যমান।
যা ছিল তা উবে যাবে—এ কভু সম্ভব হয় !
প্রকৃতি জননী যে গো, প্রকৃতি রাক্ষসী নয়।
আকর্ষণশক্তি বলে কেন্দ্রস্থিত চারিধার
গ্রহ উপগ্রহ ল'য়ে ঘোরে সৌর পরিবার ;
প্রত্যেক অণুটী টানে অণুরে আপন কাছে,
সুদূর হোলেও আঁটা সুমেরু কুমেরু আছে,
চন্দ্রের আভাস মাত্রে সমুদ্র উথলে উঠে,
কেন্দ্র ভ্রষ্ট ধূমকেতু সেও সূর্য্য পানে ছুটে,
হৃদয়ে হৃদয় টানে থাকুক না ব্যবধান
মশানে শ্রীমন্তে বাঁধে
শ্রীমন্ত ফুকারে কাঁদে
কৈলাসে কৈলাসেশ্বরী আকুল ব্যাকুল প্রাণ !
দুর্ব্বাসার চক্রে পড়ি দ্রৌপদি আপনহারা,
হেথায় দ্বারকাপুরে যদুপতি ভেবে সারা
এ নহে প্রলাপবাক্য, প্রকৃতির পরিচয়,
ভালবাসা মোহ-মন্ত্র, সুধু আকর্ষন নয়।
থাকুক না প্রিয়জন সপ্তর্ষি মণ্ডল পার—
থাকে যদি ভালবাসা
অবশ্য পূরিবে আশা
শত বিঘ্ন অতিক্রমি মিশিব পরাণে তার !
থাকুক না প্রিয়জন সপ্তর্ষি মণ্ডল পার
লক্ষ রাখ পতি-প্রতি কায়মনোবাক্যপ্রাণে,
স্থিরদৃষ্টি অরুন্ধতী যেমন ধ্রুবের পানে,
আবার মিলন হবে যমুনা-জাহ্নবী পারা,
অনন্ত বিহার ক্ষেত্র—অনন্ত অমৃত ধারা—
অনন্ত তৃপ্তির মাঝে অনন্ত বাসনা নব,
এই ত বিবাহ শুভ—এ বিবাহ হবে তব।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

বৈষয়িক তত্ত্ব।

নূতন প্রণালীতে বৃহদাকারে ত্রৈমাসিক বৈষয়িক তত্ত্বের প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে। আকার ডিমাই পনের ফরমা। ইহার আকার বাঙ্গালার সমস্ত সাময়িক পত্র হইতে যেমন অতি বৃহৎ, কাগজ এবং ছাপও তেমনি উৎকৃষ্ট—লিখন প্রণালীর ও তেমনি একটু বৈচিত্র আছে। অর্থোপার্জ্জন এবং বিষয়কার্য্যের প্রসঙ্গ হইতে বৈজ্ঞানিক গবেসণা সমাজতত্ত্ব এবং রাজনৈতিক আলোচনা ইত্যাদি নানা হীতকর এবং প্রয়োজণীয় প্রস্তাবে ইহার কলেবর পুর্ণ। বৈষয়িক তত্ত্বের অন্যান্য নুতনত্বের মধ্যে প্রেরিত পত্রের জন্য এক ১০০ টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা একটি প্রধান। দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য এই সকল প্রশ্ন নিদৃষ্ট হইয়াছে—

(১) ভারতবাসিগণের এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টের বিষয় কি এবং কি উপায়েই বা তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে? (২) বাঙ্গালি চরিত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয় কি? অধিক গ্লানির বিষয়ই বা কি? (৩) পাঁচ লক্ষ টাকা যদি কোন ব্যক্তি কোন একটি সৎকার্য্যের উদ্দেশ্যে রাখিয়া মরেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে কোন্ কার্য্যে তাহা ব্যয় করিলে দাতার অর্থের সর্ব্বাপেক্ষা সৎব্যবহার হয়? (৪) হিন্দুসমাজের কুপ্রথাগুলির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে কোন্টী দূর করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য? (৫) দেশের অর্থ বৃদ্ধির প্রশস্ত উপায় কি?

ইহার যে কোন একটির উত্তর অথবা সাধারণ হীতকর নূতন কোন প্রস্তাব যিনিই ইচ্ছা করেন প্রেরণ করিতে পারেন। যাঁহার প্রস্তাবে চিন্তা ও উদ্ভাবণী শক্তির অধিক পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া যাঁহার প্রস্তাব বিবেচিত হইবে তিনিই পুরস্কার পাইবেন। পুরস্কার একটি ৪০ টাকা অবশিষ্টে আর চারিটি সাকল্যে এক শত টাকা। পুরস্কারের নিয়মাদি ১ম সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। ত্রৈমাসিক বৈষয়িক তত্ত্বের মূল্য মাত্র ॥০ ডাক মাস্থল /০ শিল্প কৃষি পত্রিকার কেবল ডাক মাস্থল বৎসরে তিন আনা মাত্র। এতদ সংক্রান্ত পত্রাদি তাহেরপুর রাজসাহী "কৃষি কার্য্যালয়ের" সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত ডাক্তর কেদারনাথ পাল এল, এম, এছ, নিকট পাঠাইতে হয়।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ রায়। প্রকাশক।

বৈষয়িক তত্ত্ব সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

"স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কীর্ত্তন করাই এই মাসিক পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতবাং এক বিষয়ে এই পত্র বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন জিনিষ। বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কীয় প্রবন্ধ কয়েকটী সুপাঠ্য, প্রবন্ধগুলি, পাঠ করিলে অনেক শিখা যায়।"

(বঙ্গবাসী)

"বৈষয়িক তত্ত্বের নমুনা দেখিয়া প্রতীতি হয় ইহা দ্বারা বঙ্গদেশ লাভবান হইবে। কল্পনা প্রিয় বাঙ্গালীর সম্মুখে বিশাল কার্য্যক্ষেত্র উদ্‌ঘাটিত হইবে। বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রদর্শন এ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।' (সঞ্জীবনী)

"আমরা প্রথম ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বৈষয়িক তত্ত্বের নূতন পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। এরূপ প্রয়োজণীয় সাময়িক পত্র বাঙ্গালায় নাই একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।" হিন্দুরঞ্জিকা।

"বৈষয়িকতত্ত্ব—এই মাসিক পত্রখানির ছয়খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কৃষি শিল্পাদি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকটন করিয়া দেশীয়গণকে বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্তিবান ও দক্ষ করা এতৎ প্রচারের মুখ্যোদ্দেশ্য। এপর্য্যন্ত ইহাতে সুখপাঠ পাঞ্জল ভাষায় যে সকল সারগর্ভ প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির ভুয়সী সম্ভাবনাই আছে। পত্রখানিকে সমুৎসাহিত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। (ঢাকা প্রকাশ)

জয় জগদীশ হে

কোটি অবনি তব রূপ প্রকাশে,
কোটি তারকরাজি নীল আকাশে,
অগণিত পর্ব্বত সিন্ধু প্রবাহে ;
অসৈম্য রূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

কিবা জগশৃঙ্খল পদ্ধতি ক্রমে,
কেশাগ্র পরিমিত চ্যুত নহে ভ্রমে,
রেণু সমাবেশ কিবা রবিগ্রাহে ;
নিয়ম রূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

কিবা বৈভবময় তব ভবরাজ্য,
বিস্ময়ে অহরহঃ হৃদয় অধৈর্য্য,
ইন্দ্র বৈভব সব লাঞ্ছিত যাহে ;
ঐশ্বর্য্যরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

জ্ঞানে অজ্ঞান—কি গূঢ় রহস্য,
আদি অনিশ্চিত অন্ধ ভবিষ্য,
অতীত জ্ঞান মনঃ কে বুঝে তোমা হে;
রহস্যরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

মূর্ত্তি কতইবিধ কে করে গণনা,
পবন পাবন জীবন মৃৎকণা,
আত্মা হৃদয় মনঃ সচেত দেহে ;
বহুত্ব রূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

চন্দ্রকিরণকর রজনি বিধাতা,
প্রসূন পরিমল মলয়জ দাতা,
লাবণ্য মধুরিমা কমনীয় দেহে ;
সৌন্দর্য্যরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

শূন্যে জগৎপাতা শক্তি অপার,
চলোর্ম্মি বহ্নি তড়িত তেজাধার,
ক্ষণে প্রলয় কর স্ফুলিঙ্গ দাহে ;
শক্তিস্বরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

বসন্ত ঋতু সুখ সন্ধ্যা সুউষা,
প্রমোদ পরিহাস সরস সুভাষা,
প্রীতি প্রণয় মোহ পরিজন স্নেহে ;
আনন্দরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

ভক্ত হৃদয় সুখ অনিদ্রা স্বপনে,
জগত শীতলকারি পাতকি নয়নে,
জীব কাণ্ডারি ইহ সংসার প্রবাহে ;
জগত প্রণম্য দেব জয় জগদীশ হে ॥

জয় জয় দেব মাহাত্ম্য প্রতিমা,
মানব-জড়-জীব-গৌরব সীমা,
ধ্যেয় ধ্রুব রূপ জীব নিগ্রহে ;
জয় জয় দেব জয় জগদীশ হে ॥

পঞ্জাব ভ্রমণ।

দিল্লী পথে।

এবার আমি দিল্লীর পথে। লাহোর ছাড়িলেই অমৃতসর—লাহোর হইতে দু ঘণ্টার পথ। কলিকাতা হইতে লাহোরে আসিবার সময় আমি অমৃতসরে নামিয়াছিলাম, আর তখনই আমি অমৃতসরের বর্ণন করিয়াছি। এখানে আর তার পুনর্ব্বর্ণন করা অনাবশ্যক। অমৃতসরের আশে পাশে যে সব দেখিবার স্থান আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। অমৃতসরের ১৪ মাইল দক্ষিণে তারণতারণ নামে একটি ক্ষুদ্র সহর। তারণতারণ শিখদিগের একটা মহাতীর্থ। গুরু অর্জ্জুন আড়াই শ বৎসর হইল এখানে একটি সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহ ইহার অনেক শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পুষ্করিণী সুবিস্তৃত—প্রায় ৬০০ হাত দীর্ঘ ও ৫০০ হাত প্রশস্ত। চারিদিকে প্রশস্ত বাঁধান পথ, চারিদিকেই জলে নামিবার শিঁড়ি। রণজিৎ সিংহের পৌত্র—খরক সিংহের পুত্র—নৌনিহাল সিংহ পুষ্করিণীর উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্ব তীরে শিখদিগের দরবার, গ্রন্থ সাহেব রাখিবার ও পূজা করিবার ঘর। পুষ্করিণীর তীরে তীরে যে বাঁধান পথ, তাহার ধারে ধারে বুর্জি বা দোতলা বাড়ী, তাহারা শিখ সর্দ্দারদের তৈয়েরি, তাঁহারা তারণতারণে আসিলে আপন আপন বুর্জিতে থাকেন। তারণতারণে আরও কতগুলি পবিত্র পুকুর আছে। এই পুকুরের নিকটে বহুসংখ্যক কুষ্ঠরোগী বাস করে; ইহাদের জলে স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ সারিয়া যায়—এই লোক বিশ্বাস। বাসিন্দা মহারোগীরা গুরু অর্জ্জুনের বংশধর বলিয়া দাওয়া করে—বলে গুরু অর্জ্জুনেরও এই মহাব্যাধি ছিল। প্রতি মাসে তারণতারণে অমাবস্যা দিনে অমাবস্ নামে একটা মস্ত মেলা হয়। সহস্র সহস্র লোক সে দিন গুরু অর্জ্জুনের পুকুরে স্নান করিতে আসে। এই যাত্রীদের মধ্যে চাসীর সংখ্যাই অধিক। পুকুরের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান তাহারা একটা পুণ্য কাজ মনে করে। তাহাদিগের পীড়িত গো মহিষাদিকেও তাহারা আরোগ্য লাভের আশায় পুকুর প্রদক্ষিণ করায়। তারণতারণ নাম বোধ হয় তারণ বা পরিত্রাণ হইতে হইয়াছে।

অমৃতসরের ২৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বাটালা নামে সহর। তারণতারণে যাইতেও যেমন রেল নাই, এখানে যাইতেও রেল নাই—এ সব রেলের বাইরের জায়গা—এক্কা বা বৈলীতে যাইতে হয়। ভট্টী রাজপুত রায় রাম দেব (দেউ) পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই নগর স্থাপন করেন। আকবর তাঁহার ধাইভাই (foster brother) সম্‌সের খাঁকে বাটালা প্রদান করেন। তিনি সহরের অনেক উন্নতি করেন। বাটালার প্রসিদ্ধ সরোবর তাঁহারই

নির্ম্মিত। পরে বাটালা শিখদিগের হস্তগত হয়। সমসের খাঁর সমাধি মন্দির অতি সুন্দর।

বাটালার তের মাইল উত্তর পশ্চিমে ডেরা নানক। বাবা নানকের নামে উৎসর্জ্জিত একটি শিখ মন্দির এখানে আছে। ইরাবতীর পরপারে পাকবোটী গ্রাম। এখানে বাবা নানক বাসস্থান করিয়াছিলেন এবং এখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বেদী বা তাঁহার বংশধরেরা (নানকের বংশধরগণকে বেদী বলে) পাকবোটীতেই বাস করিতেন। রাভী পাকবোটীকে গ্রাস করিলে তাঁহারা পরপারে যাইয়া নগর স্থাপন করিয়া তাহাকে ডেরা নানক নাম দেন।

বাটালার ১৮ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে রাভীর তীরে শিখ সহর শ্রীগোবিন্দপুর। গুরু অর্জ্জুন ইহার সংস্থাপনা করেন। তিনি আপন পুত্র গুরুগোবিন্দের নামে ইহার নাম রাখেন। তাঁহার বংশধর করতারপুরের জওয়াহীর সিংহের আজও এখানে জমিদারি স্বত্ব রহিয়াছে। শ্রীগোবিন্দপুর অতি পবিত্র স্থান।

অমৃতসর হইতে নীচে যাইতে করতারপুরের আগে আর কোন লোক-শ্রুত স্থান নাই। পথে বিপাসাতীরে বিয়াস ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতেই করতারপুরে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে গুরু অর্জ্জুন যে বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার উচ্চ বুরুজ বা স্তম্ভ (tower) দেখিতে পাওয়া যায়। বাস গৃহের ভূমি গুরু অর্জ্জুনের পিতা গুরু রামদাস জিহাঙ্গীরের নিকট হইতে দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

করতারপুর ছাড়াইলে জলন্দর নগর। জলন্দর কাটোচ নামক রাজপুত রাজ্যের সর্ব্ব প্রথম রাজধানী ছিল। কাটোচ রাজ্যের উৎপত্তি শেকেন্দর সাহের আক্রমণের পূর্ব্বকালীন। মহাভারতে নাকি কাটোচ রাজ্যের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েন শঙ্গ সপ্তম শতাব্দীতে জলন্দরের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন জলন্দর নগরীর দুটি অতি প্রাচীন সরোবর ভিন্ন অন্য চিহ্ন নাই। গজনীর ইব্রাহীম শা জলন্দর মুসলমান হস্তগত করেন। মোগলদের সময়ে জলন্দর ভেষ্ট বা বিপাসা ও শতদ্রু মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের প্রধান নগরী ছিল। আধুনিক জলন্দর বারটা মহল্লায় বিভক্ত। আগে মহল্লাগুলি প্রত্যেকেই প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। দু একটা মহল্লা এখনোও প্রাচীর বেষ্টিত আছে। জলন্দরের প্রাচীন রাজাদিগের বংশধরেরা চাম্বা কাঙ্গ্রা (Kangra) প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে আজও রাজত্ব করিতেছেন। রাজপুতানার রাজাদিগের অপেক্ষাও ইহাদিগের কুলতরু লম্বা। ইঁহারা বলেন ইঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধ সময়ে ইহাঁরা মূলতানের অধিপতি ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া সুশর্ম্মা চন্দের নায়কত্বে ইহাঁরা জলন্দর দোয়াবে আসিয়া কাটোচ বা ত্রৈগর্ত্ত রাজ্য সংস্থাপন করেন। এই রাজ্য খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়, অনুমান করা যায়। পদ্মপুরাণে নাকি লিখিত আছে দৈত্য রাজ জলন্দর যিনি যোগ-

বলে অপরাজিত হইয়াছিলেন, জলন্দর রাজ্য স্থাপন করেন। মহাদেব নিরুপায় হইয়া অবশেষে একটা অতি হেয় চাতুরি করিয়া ভক্ত বিনাশ করেন। যোগিনীগণ জলন্দরের বিপুল দেহের উপরে ডিনার করিয়া মহা পরিতোষ লাভ করেন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে মহাদেব কতকগুলি পর্ব্বত চাপাইয়া দৈত্যরাজকে বধ করেন। পর্ব্বত চাপাইতে দৈত্যমুখ হইতে অগ্নি নির্গত হয়। এখন যেখানে জ্বালামুখী, সেখানে দৈত্য রাজার মুখ ছিল, তাই জ্বালামুখীতে আজও আগুণ বাহির হইতেছে। আর মুলতান পর্য্যন্ত পা ছড়াইয়াছিলেন, তাই মূলতানে সূর্য্য অগ্নি বর্ষণ করেন। আড়াই হাজার বৎসর পরে গজনীর মামুদের হস্তে ইহার নাশ হয়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের হস্তগত হয়। জলন্দর ষ্টেশনের আগে ২ মাইল দূরে জলন্দর কাণ্টুনমেণ্ট বা সেনানিবেশ ষ্টেশন। প্রথম শিখ যুদ্ধের ফল স্বরূপ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জলন্দর দোয়াব স্বরাজ্য-ভুক্ত করেন।

জলন্দর হইতে হুশীয়ারপুর যাইতে হয়। ওখানকার লোকগুলি খুব হুশীয়ার হওয়া উচিত। হুশীয়ারপুর সিবালীক পর্ব্বত শ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত। একটি পার্ব্বত্য স্রোত হুশীয়ারপুরের পাদদেশ চুম্বন করিয়া ছুটিতেছে। হুশীয়ারপুর পোড়া দেশ নয়—সুন্দর তরু তৃণ শষ্পাবৃত স্থান। হুশীয়ারপুর উল্লিখিত কাটোচ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান আক্রমণ পরে কাটোচ রাজবংশীয় যশোবান ও দীতারপুরের রাজারা ভাগ করিয়া লন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে হুশীয়ারপুর যশোবান ও দীতারপুরের রাজাদিগের হাত হইতে শিখদিগের হাতে যায়। হুশীয়ারপুর হইতে ২৫ক্রোশ দূরে শিখদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান আনন্দপুর। গুরু গোবিন্দ ১৬৭৮ এই নগর স্থাপন করেন। গুরু রামদাসের বংশধর সোবীদিগের প্রধান শাখার আনন্দপুর বাসস্থান, আর আনন্দপুরই শিখ সন্ন্যাসী নিহঙ্গদের প্রধান বাসস্থান। প্রতিবৎসর এখানে মস্ত মেলা হয়।

আমরা আনন্দপুর হইতে জলন্দরে ফিরে এসে আবার রেলে উঠি। জলন্দরের পরে কিলোরই বড় ষ্টেশন। কিলোর শতদ্রুর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। সহরটি যেন শতদ্রু বক্ষ হইতে উঠিয়াছে। রেলের গাড়ী যখন শতদ্রু বক্ষের উপর দিয়া যায়, তখন কিলো-রের বড় সুন্দর দৃশ্য। কিলোরে অনেক মীনার বা স্তম্ভ আছে। তাহারাই কিলোরের শোভা বাড়াইয়াছে। কিলোরনগর শাজিহান বাদশাহের স্থাপিত। দিল্লী হইতে লাহোর যাইবার পথে তিনি এখানে একটি সরাই নির্ম্মাণ করেন। তাহারই চতু-র্দ্দিকে কিলোর নগর খাড়া হইয়া উঠে। এখানকার অধিবাসী বেশীর ভাগ মুসল-মান।

কিলোরে শতদ্রু পার হইলে লুধীয়ানা বেশী দূর নয়। লুধীয়ানায় একটি দুর্গ আছে। দিল্লীর লোধীবংশীয় য়ুসুফ ও নিহঙ্গ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে লুধীয়ানা স্থাপন করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রায়কোটের রয়িস বা জমিদারের হস্তগত হয়। রণজিৎ সিংহের হস্তগত হওয়া

পর্য্যন্ত লুধীয়ানা তাঁহারই বংশের অধিকারে ছিল। রণজিৎসিংহ ঝিন্দের রাজা ভাগ সিংহকে লুধীয়ানা প্রদান করেন। লুধীয়ানার নিকটে সুনেট নামক স্থানে একটি সুবিস্তৃত ইষ্টক নির্ম্মিত নগরীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদিগের ভারতাধিকারের পূর্ব্বেই এই নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। লুধীয়ানা জিলায় প্রাচীন হিন্দু-নগরী মাচ্ছীবারা আরও পুরাতন। লুধীয়ানায় শেখ আবদুল কদিরই জলনী নামে পীরের মন্দির আছে। এখানে বৎসর বৎসর মেলা হয়। হিন্দু মুসলমান এই মন্দিরে পূজা দেয়। কাবুলের নির্ব্বাসিত রাজবংশের অনেক অনুচরেরা লুধীয়ানাকে বাসস্থান করিয়াছে। শাহ সুজার পুত্র শাহজাদা শাপুর, যিনি পিতার মৃত্যুর পরে দিন কতক নামে রাজা হইয়াছিলেন, এই পাঠানদিগের শীর্ষস্থানীয়। শাহজাদা শাপুর ও তাঁহার পরিবারস্থ অনেকে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পেন্‌সন্ প্যান। লুধীয়ানা শাল ও রামপুরী চাদরের জন্য বিখ্যাত। এখানে অনেক কাশ্মীরী শালওয়ালা বাস করে—তাহারাই এই শাল নির্ম্মাণ করে। রামপুরা উল দিয়া ইহারা রামপুরী চাদর নির্ম্মাণ করে। রামপুরী চাদর যাহারা দেখেন নাই তাঁহারা জানেন না সে কি সুন্দর জিনিষ—হাতে করিলে ননীর মত কোমল মনে হয়। বৈলাতিক বিবিরা ইহাকে শালের রুমালের মত করিয়া ব্যবহার করেন। লুধীয়ানা লুধীয়ানা কাপড় নামে এক রকম ছিটের কাপড়ের জন্যে পঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিমে অতি প্রসিদ্ধ। কাপড় খুব পুরু ও স্থায়ী, ছিট্ নানা রকমের ও সুন্দর ও পাকা—বিলাতী ছিটে কাপড় করিলেই অনুতাপ করিতে হয়—রঙ্গ উঠিয়া যায়—লুধীয়ানা ছিট্ কখনো উঠে না। ইংরেজি স্যুট লুধীয়ানার ছিটে খুব ভাল হয়। বাঙ্গালীরা যদি লুধিয়ানা ছিট দিয়া প্যাণ্টালুন কোট ও চাপকান করেন, তাঁহারা অতি সুন্দর বস্ত্র পরি-ধান করিবেন, আর লুধীয়ানার বস্ত্রনির্ম্মাণ ব্যবসায়কে শতগুণ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

লুধীয়ানা ও ফিরোজপুরের মধ্যে প্রথম শিখ যুদ্ধের যত যুদ্ধ স্থান—মুদ্‌কি ফিরোজশা, আলীওয়াল ও সোব্রাঁও। আলীওয়াল লুধীয়ানার খুব নিকটে—৯ মাইল পশ্চিমে, শতদ্রুর বাম তীরে।

লুধীয়ানা ছাড়িয়া চলিলে সনাওয়াল নামে ষ্টেশন। এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে ভাইন্‌ওয়ালা গ্রাম। কুকাদিগের এই গ্রাম কেন্দ্রস্থান ছিল। তাহাদিগের নেতা ও গুরু রামসিংহ এখানেই বাস করিতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কুকারা অমৃতসর ও লুধীয়ানার মুসলমান কসাইদিগকে আক্রমণ করে ও অনেকগুলি লোককে হত ও আহত করে। কুকাদিগের উৎপত্তি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে। ইহারা শিখদিগের মধ্যে এক সংস্কারক সম্প্রদায়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই সম্প্রদায় প্রথমে গভর্ণমেণ্টের নজরে পড়ে—এই ১৬ বৎসরের মধ্যে কুকা সম্প্রদায় অতি বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছিল। রামসিংহকে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট নজরবন্দী করেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সে কোন ষড়যন্ত্র করিতেছে এমন প্রমাণ না পাওয়ায় চারি বৎসর পরে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর

ও লুধীয়ানার মুসলমান কসাইদিগকে আক্রমণ করে। পর বৎসর জানুয়ারি মাসে লুধীয়ানা জিলায় মালোধ নামক সহর অক্রমণ করে; সেখান হইতে অস্ত্র শস্ত্র লুটিয়া লইয়া মালের কোট্‌লা আক্রমণ করে। মালের কোট্‌লা লুধীয়ানা হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে একটি ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য। কুকারা পরাভূত হয়। ডেপুটি কমিশনার কুকাদিগকে তোপে উড়াইয়া দেন। গভর্ণমেণ্ট ডেপুটি কমিশনরকে তাঁহার নিষ্ঠুরতার জন্যে ভর্ৎসনা ও কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করেন।

সনাওয়ালের পরে নাভা ষ্টেশন। এখান হইতে নাভা রাজ্যে যাইতে হয়। নাভা রাজ্যের বিবরণ স্থানান্তরে দিব। নাভা ষ্টেশন ছাড়াইলে সরহিন্দ্‌ ষ্টেশন। এই ষ্টেশন ও এই নামের নগর পাটিয়ালা রাজ্যভুক্ত। মোগল সম্রাটদিগের সময়ে সরহিন্দ অতি সমৃদ্ধিশালী ও সুবিস্তৃত নগর ছিল। গুরু গোবিন্দের দুই পুত্রকে মুসলমানেরা এখানে জীয়ন্তে ইট দিয়া বাঁধিয়া মারিয়া ফেলে। যখন শিখেরা পঞ্জাবের কর্ত্তা হয়, তখন সরহিন্দরে একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করে। গুরু পুত্র বধস্থান বলিয়া সরহিন্দের উপর শিখদিগের এমনি আক্রোশ যে শিখেরা সরহিন্দের ভগ্নাবশেষ হইতে দু একখানি ইট উঠাইয়া নদীতে বিসর্জ্জন করা পুণ্য কাজ মনে করে। ভবিষ্যদ্বানী ছিল যে সরহিন্দের ভগ্নাবশেষ ইটাদি যমুনা হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইবে। যমুনা হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে, তাহার নির্ম্মাণে এই ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। নির্ম্মাণ সময়ে সরহিন্দের ভগ্ন হর্ম্ম্যাদির ইট দ্বারা রেলওয়ের বালাষ্ট (Ballast) হয়।

সরহিন্দ ছাড়াইলে রাজপুরা ষ্টেশন—এখান হইতে পাটিয়ালা যাইতে হয়—নাভাতে এখান হইতেও যাওয়া যায়। পাটিয়ালার বিবরণও স্থানান্তরে দিব। রাজপুর ছাড়াইলে অনতি দূরে ঘগ্‌গর নদী। ঘগ্‌গর প্রাচীন ভারতের দৃষদ্বতী। দৃষদ্বতী এক সময়ে এক মহানদী ছিলেন—সিন্ধু নদকে করদান করিতেন—মিথান্‌ কোটের নিকটে পঞ্জাবের পঞ্চ মহানদী যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে ঘগ্‌গর বা দৃষদ্বতী যাইয়া সিন্ধু হৃদয়ে হৃদয় মিলাইতেন। এখন দৃষদ্বতী বিকানীরের মরুভূমিতে চলিতে চলিতে শুকাইয়া গিয়াছেন। ঘগ্‌গরতীরে কর্ণাল ও থানেশ্বরের মধ্য স্থলে দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা মহাবীর রায় পিথোরা ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন ঘোরীর সঙ্গে মহাযুদ্ধ করিয়া অবশেষে বন্দী হন। চিতোরের রাজা সমর সিংহও এই যুদ্ধে মহা বীরত্ব প্রকাশ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। রায় পিথোরাকে মুসলমান হত্যা করে। সমর সিংহের পুত্র কল্যাণ রায় এবং বহু সংখ্যক রাজ রাজরা এই সমরক্ষেত্রে প্রাণ হারাণ। উত্তর ভারতে এখানে হিন্দুরাজ্যের বিনাশ হইল।

ঘগ্‌গর নদী পার হইয়া গেলে ৫ মাইল পরে আম্বালা। আম্বালা ১৪শ খৃষ্টাব্দে এক জন অম্বা জাতীয় রাজপুত কর্ত্তৃক স্থাপিত এরূপ অনুমান হয়। ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে

আম্বালা সহর অতি ক্ষুদ্র সহর ছিল। ইংরেজদিগের অধিকারে আসিবার সময় আম্বালা সর্দ্দার গুরুবক্স সিংহের বিধবা পত্নী দয়াকোঁরের হাতে ছিল। আম্বালা একটা প্রধান সৈনিক ষ্টেশন—আম্বালা সিটি আর আম্বালা কাণ্টনমেণ্ট ছুটা রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো এখানে সের আলীর অভ্যর্থনা দরবার করেন। আম্বালা সহর আধুনিক হইলেও আম্বালা জেলা ঐতিহাসিক প্রাচীনত্বে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান। আম্বালার পশ্চিমে পবিত্রা নদী দৃষদ্বতীর কথা আমরা বলিয়াছি। আম্বালার পূর্ব্বে পবিত্রা নদী সরস্বতী—সরস্বতীকে মার্কন্দা নদী কহে। এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই পবিত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত—আর্য্যদিগের প্রথম স্থায়ী বাসস্থান—আর্য্য ধর্ম্মের গঠন প্রাপ্তির স্থান। সরস্বতী মহা পবিত্র নদী—ইহার তীরে অসংখ্য দেব মন্দির। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রান্ত হইতে এখানে সহস্র লোক পুণ্য সঞ্চয়ার্থে আসে। সরস্বতীতীরবর্ত্তী থানেশ্বর ও পীহোয়া নামক সহরদ্বয়ই বিশেষ বিখ্যাত পুণ্য ক্ষেত্র। সরস্বতী সলিলপূর্ণ থানেশ্বরাবস্থিত একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিবার জন্য ৩।৪ লক্ষ লোক বৎসরে থানেশ্বরে আগমন করে। পাণ্ডব ও কৌরবগণের যুদ্ধক্ষেত্র এই মহাস্থান। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সঙ্গ এই প্রদেশকে একটি সমৃদ্ধিশালী ও সুসভ্য রাজ্য বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। স্রুগণা বলিয়া নগরীকে এ প্রদেশের রাজধানীরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। জগাদ্রির নিকটস্থ স্গ নামক গ্রামকে প্রাচীন স্রুগণা বলিয়া জেনেরেল কনিঙ্গহ্যম্ স্থির করিয়াছেন। থানেশ্বর সম্বন্ধে আমি আর দু চারিটা কথা বলিব। থানেশ্বর যে স্থানেশ্বর কথার অপভ্রংশ, তাহা সহজেই বোঝা যায়—আর স্থানেশ্বর মানে বোধ হয় তীর্থ স্থান সমূহের ঈশ্বর বা শ্রেষ্ঠ—থানেশ্বর পবিত্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান। স্থানেশ্বরে অসংখ্য পবিত্র সরোবর আছে। যে সরোবরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ত্রিভুবন পাপ প্রক্ষালিনী স্বয়ং সুরধুনী নাকি পাপী নর কুল পাপ প্রক্ষালন পাপপঙ্ক (অনুপ্রাসটা বড় ভবভৌতিক হয়ে উঠলে—তবে লেখক কাহাতক লোভ সম্বরণ করতে পারে।) ধুইয়া পবিত্র হইবার জন্য এই সরোবরে আসিয়া স্নান করিয়া গিয়াছিলেন। এই পুকুরটি প্রায় পোনে মাইল দীর্ঘ, এক তৃতীয় মাইল প্রশস্ত। লোকে মনে করে থানেশ্বরের সকল পবিত্র সরোবরগুলি চন্দ্র গ্রহণের সময় ইহার সহিত সংযুক্ত হয়। মোগলদিগের সময়ে মুসলমানেরা থানেশ্বরে ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটায়। শিখেরা অনেক নূতন মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও পুরাতন মন্দিরাদি সংস্করণ করে। আকবর হিন্দুদিগের জন্যে নাকি এখানে অনেক মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা ঔরাঙ্গজীব তাহাদিগকে ধূলিসাৎ করিয়া তাহাদের স্থানে মোগলপাড়া নামে একটা দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। হিন্দু যাত্রী যাহারা পবিত্র সরোবরে স্নান করিতে আসিত, দুর্গোপর হইতে মুসলমান সৈন্য তাহাদিগের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করিত। থানেশ্বর এখন একেবারে ভগ্ন দশায়। থানেশ্বরের নিকটে পিহোয়াও অতি পবিত্র তীর্থ। এখানে শেখ চিল্লীর সমাধিমন্দির

আছে। এ মন্দির অতি সুন্দর। তাজের পরে নির্ম্মল মার্ব্বলপ্রস্তর নির্ম্মিত সমাধিমন্দিরের মধ্যে এই মন্দিরটি অতি চারু নির্ম্মিত। গুম্বেজ চতুর্দ্দিকে অনুচ্চ মীনার বা স্তম্ভে বেষ্টিত। শিখেরা এই সমাধিমন্দির হইতে কতক মার্ব্বল কায়থলে লইয়া গিয়াছিল। শেখ চিল্লীর খবর দিতে হয়। শেখ চিল্লী উত্তর ভারতে অতি সুপরিচিত কবি ও উপন্যাস লেখক। থানেশ্বরের নিকটে তিলৌরী নামক স্থানে সে মহা যুদ্ধ হয় যাহাতে রায় পিথোরা. পরাজিত হন। গজনীর মামুদ ১০১১ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বর অবরোধ করেন, থানেশ্বরবাসীদিগকে প্রাণে হত করেন, আর বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। চক্রতীর্থ মন্দির হইতে মামুদ বিষ্ণুর যে স্বুবর্ণ নির্ম্মিত মহামূর্ত্তি ছিল, তাহা গজনীতে পাঠাইয়া মুসলমান দ্বারা পাদদলিত করান। একটা মুসলমান মসজিদের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাতে কুতবমীনারের মত ছোট ছোট সুন্দর মীনার আছে। থানেশ্বরের নিকটে আমীন নামে একটি গ্রাম আছে। অদিতি নাকি এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন আর সূর্য্যদেবকে প্রসব করিয়াছিলেন। সূর্য্যের জন্ম দিন রবিবারে, পুত্র সন্তান কামনাকারিণী রমণীরা অদিতির মন্দিরে নাকি পূজা দেয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নে যে প্রবন্ধটী মুদ্রিত হইল, ইহা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তর রামদাস সেনের বিরচিত। আমরা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতেছি বলিয়া অবশিষ্টাংশ আমাদের হস্তে ছিল। রামদাস বাবু ভারতীর প্রথম হইতেই চিন্তাপূর্ণ, অনুসন্ধানপূর্ণ নানারূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। আজ তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা যার পর নাই দুঃখিত। ভারতী এই সদ্বিদ্বান সুলেখকের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। দুঃখের সহিত বলিতেছি অতঃপর তাঁহার প্রবন্ধ আর ভারতীকে উজ্জ্বল করিবে না। ইহাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তাহা সাহিত্য ভাণ্ডারের এক এক খানি অমূল্য রত্ন। রামদাস বাবু যদিও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আশা করি ঐ সমস্ত গ্রন্থ ভবিষ্যৎ পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের উপজীব্য হইয়া তাঁহাকে ইহলোকে অমর করিয়া রাখিবে।

শাক্য সিংহের মগধ বিহার।

শাক্য সিংহের রাম পুত্র রুদ্রকের নিকট গমন—শিষ্যলাভ—রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া গয়ায় গমন—কর্ত্তব্য চিন্তা—জ্ঞান সোপান—উরুবিল্ল গমন—তাৎকালিক ধর্ম্মভাব চিন্তা।

শাক্য সিংহ যখন মগধস্থ পাণ্ডবশৈল গুহায় বাস করেন, সেই সময়ে রামপুত্র রুদ্রক নামা জনৈক সংঘপতি পরিব্রাজক রাজ গৃহ নগরে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাঁর সঙ্গে

সাত শত শিষ্য ছিল; রুদ্রক সেই সাতশত শিষ্যের নেতা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। শাক্য সিংহ শুনিলেন, রুদ্রক নামা জনৈক বহুমান্য ও পণ্ডিতপূজিত আচার্য্য রাজ গৃহ নগরে আসিয়া বাস করিতেছেন; ইনি সপ্তশত শিষ্যের জ্ঞান গুরু। একদা, রুদ্রকের সহিত শাক্যমুনির সাক্ষাৎ ঘটনা হইলে শাক্যমুনি মনে মনে করিলেন, "অহ মস্যান্তিকমুপসংক্রমব্রততপমারভেয়ম্।" "আমি ইহাঁর নিকটে থাকিয়া ব্রত,তপ ও সমাধি প্রভৃতি অভ্যাস করিব। বিবেচনা হয়, ইনি আমা অপেক্ষা বিশিষ্টজ্ঞানী নহেন; তথাপি আমি ইহাঁর শিষ্য হইয়া ইহাঁর জ্ঞান ও সমাধি প্রত্যক্ষ করিব, এতদ্বিজ্ঞাত অসংস্কৃত সমাধির অসারতা প্রদর্শন করিব এবং নিজ সমাধির গুণ বিশেষ উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিব।"* এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ শাক্যসিংহ পরিব্রাজকাচার্য্য রামপুত্র রুদ্রকের শিষ্য হইলেন।

একদা শাক্যসিংহ রুদ্রককে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার উপদেষ্টা কে? এবং আপনি কিরূপ ধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন?

রুদ্রক বলিলেন, আমি স্বয়ং শিক্ষিত ও স্বয়ং জ্ঞাত। শাক্যমুনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কিরূপ ধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন?

রুদ্রক বলিলেন, "নৈব সংজ্ঞান" ও "অসংজ্ঞায়তন" নামক সমাধির উপায় জ্ঞাত আছি। †

শাক্য মুনি বলিলেন, আমি তাহা আপনার নিকট লাভ করিতে ইচ্ছুক।

রুদ্রক বলিলেন, তাহাই হউক—তাহাই লাভ কর।

অনন্তর শাক্যমুনি রুদ্রকের নিকট উপদেশ গ্রহণ না করিয়াই কোন এক নির্জন প্রদেশে গমন পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইলেন। পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্য বিশেষের বলে, তপশ্বরণের প্রভাবে, ব্রহ্মচর্য্য সহকৃত প্রণিধান সহস্রের ফলে, শতশত প্রকার সমাধি তাঁহার জ্ঞানগোচর ছিল, এক্ষণে ধ্যানস্থ হইয়া রুদ্রকের জ্ঞাত সমাধি বিনা উপদেশে আপনা আপনিই জ্ঞাত হইতে পারিলেন। অনন্তর রুদ্রকের অভিমুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! ঐ দুই সমাধির উত্তরে অর্থাৎ পরে আর কোন জ্ঞাতব্য আছে কি না। শুনিয়া রুদ্রক বলিলেন, নাই। যদি থাকে, আমি তাহা জ্ঞাত নহি।

---

* "রুদ্রকস্য রামপুত্রস্য সকামামুপ সংক্রম্য স্বসমাধিগুণ বিশেষোদ্ভাবনার্থং শিষ্যত্ব মভ্যুদগম্য সংস্কৃত সমাধীনাং মসারতামুপদর্শয়েয়ম্।" ইত্যাদি ললিত বিস্তর ১৭ অধ্যায় দেখ।

† "নৈব সংজ্ঞান" অর্থাৎ বিদেহ লয়। "অসংজ্ঞায়তন" অর্থাৎ প্রকৃতিলয়। এই দ্বিবিধ সমাধির ভূতবশিত্ব ভিন্ন অন্য কোন সুফল নাই এবং ইহা সংসারের বা পুনরুদ্ভবের হেতু।

বোধিসত্ত্ব মনে মনে চিন্তা করিলেন, "রুদ্রকের শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা নাই সুতরাং রুদ্রকের সমাধি বা সমাপত্তি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। রুদ্রকের জ্ঞেয় এ সমাধিতে নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, সম্বোধ ও নির্ব্বাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব "অলং, মমানেন" ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞান প্রবীর শাক্য সিংহ সেই সশিষ্য রুদ্রক রামপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমন করিলেন।

শাক্য সিংহ রুদ্রকের নিকট অধিক দিন থাকিলেন না, শিষ্যও হইলেন না, অথচ স্বল্লায়াসে রুদ্রকের বিদ্যা অধিগত করিয়া চলিয়া গেলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রুদ্রকের পাঁচজন প্রধান শিষ্য পরস্পর বিচার করিল, চিন্তা করিল, "আমরা যাহার জন্য বহুকাল ব্রততপ করিতেছি, যত্ন করিতেছি, অথচ লাভ করিতে পারিতেছি না, গৌতম তাহা অতি স্বল্পদিনে ও সামান্য কষ্টে লাভ করিল, অথচ তাহা তাহার রুচিকর ও তৃপ্তিকর হইল না। গৌতম ইহা অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান অন্বেষণ করে। গৌতমের যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে বোধ হয় গৌতম শীঘ্রই লোকাতীত সর্ব্বোত্তর পথ দেখিতে পাইবে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেষ্টা হইবে। যদি এখন হইতে গৌতমের শিষ্য হই,—তাহা হইলে গৌতম অবশ্যই আমাদিগকে স্বীয় সাক্ষাৎকৃত ধর্ম্ম উপদেশ করিবে।" অনন্তর সেই শিষ্য পঞ্চক পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া অবশেষে রুদ্রকের শিষ্যতা ত্যাগ করিয়া গৌতম শাক্যসিংহের শিষ্যতা গ্রহণ করিল। * ভগবান্ শাক্যসিংহ এতদিন একাকী ভ্রমণ করিতেন, এক্ষণে তিনি শিষ্য পঞ্চক পরিবৃত হইলেন। শিষ্য পঞ্চক লাভের পর তাঁহার রাজগৃহ বাস ভাল লাগিল না সুতরাং তিনি মগধের নানা স্থান ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

রাজগৃহ নগরের পশ্চিম দক্ষিণ ৬ ক্রোশ দূরে সুপ্রসিদ্ধ গয়া † নামক স্থানে অন্য একদল সন্ন্যাসী বাস করিত। তাহারা তাহাদের এক পর্ব্বোৎসব উপলক্ষে বোধিসত্ত্বকে নিমন্ত্রণ করিলে, বুদ্ধদেব সেই সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শিষ্য সহ গয়ায় আগমন করিলেন। তৎকালে গয়া অতি সুরম্য স্থান ছিল, সুতরাং তিনি রমণীয় গয়াবাস মনোনীত করিলেন।

মুক্তিপ্রার্থী শাক্যসিংহ সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন, কি উপায়ে তাঁহার মুক্তি লাভ

---

* এই পাঁচ জন শাক্য সিংহের প্রথম শিষ্য—বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বের শিষ্য।

† গয়া অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। বুদ্ধের সময়েও এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্ম পূর্ব্বে তত প্রসিদ্ধ ছিল না। মহাভারতে দেখা যায়, যুধিষ্ঠির তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে গয়ায় আসিয়া গয় পর্ব্বতে বাস ও ফল্গুতীর্থে স্নান দানাদি করিয়াছিলেন। এখন যে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করা হয়, যুধিষ্ঠিরকে সে বিষ্ণুপদে শ্রাদ্ধ করিতে শুনা যায় না। মহাভারতে বিষ্ণুপদের প্রসঙ্গও নাই। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বিষ্ণুপদ বুদ্ধের পরে প্রখ্যাত হইয়াছিল।

হইবে। পাঁচ জন শিষ্য ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত। তিনি শিষ্য সহ ধ্যান পরায়ণ ও ভিক্ষা ব্রতী হইয়া রমণীয় গয় পর্ব্বতে অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন। গয়া বাসকালে একদিন সহসা তাঁহার মনোমধ্যে এই জ্ঞান উদিত হইল যে, "যে সকল ব্রহ্মণ ও শ্রমণ (সন্ন্যাসী) শরীরে ও মনে কামনার বিষয় হইতে দূর গমন করিতে পারেন নাই, অথচ কামনার বিষয় সমূহের আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, হইয়া আত্মা ও শরীর সম্পর্কীয় বিবিধ দুঃখ অনুভব করিতেছে, তাহারা কখনই মনুষ্য ধর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর্য্য বিজ্ঞান বিশেষ লাভ করিতে বা সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইবে না। যেমন অগ্নি প্রার্থী পুরুষ আর্দ্র কাষ্ঠ লইয়া আর্দ্র কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি পায় না, সেইরূপ যাহারা কামনার বিষয় হইতে দূরে গমন করে নাই, অথবা গমন করিয়াছে কিন্তু কামনার আনন্দাদি অতিক্রম করিতে পারিতেছে না, তাহারা মনুষ্যধর্ম্মাতীত আর্য্যজ্ঞান দর্শন বিশেষ লাভ করিতে পারে না। যে অগ্নি চাহিবে, তাহাকে শুষ্ককাষ্ঠ লইয়া শুষ্ককাষ্ঠে ঘর্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু আমি এখন কামনার বিষয় হইতে—অধিকার হইতে—শরীরে ও মনে দূরে অবস্থিত হইয়াছি এবং তাহার আনন্দাদি হইতেও নিবৃত্ত হইয়াছি সুতরাং এক্ষণে আমি যদ্দ্বারা আত্মার পুনরাগমন হয়—পুনরুৎপত্তি হয়—শরীর হয়—শরীরে কুশলাদি হয়—সেই বেদনা (জ্ঞান ও জ্ঞান সংস্কার) আমি নিরুদ্ধ করিতে ও বিনাশ করিতে সমর্থ হইব। নিশ্চিত আমি এই মনুষ্য ধর্ম্ম হইতে আর্য্যজ্ঞান বিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে পারগ হইব।"

গয়াবিহারী তপস্বী বুদ্ধদেবের মনে বর্ণিত প্রকার প্রতীতি দৃঢ়তর অঙ্কিত হইল। তখন তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যেমন ইন্দ্রিয়দিগকে ও চিত্তকে বিষয় হইতে ও আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে, তেমনি, তদনুরূপ কঠোর নির্যাতন দ্বারা আত্মাকে, চিত্তকে ও শরীরকে কৃশাদুর্ব্বল করিতেও হইবে। তাঁহার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা মনুষ্য মনে অলৌকিক শক্তি জন্মে, তদ্বলে তাহার চিত্তে সম্পূর্ণ রূপ আত্মদৃষ্টি আবির্ভূত হয়।

একদা তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে উরুবিল্ল গ্রামের নিকটে এক সুরম্য স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, স্বচ্ছ সলিলা নৈরঞ্জনা অনল্পবেগে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার অবতরণ স্থান (স্নানের ঘাট) অতি পরিপাটী এবং তাহার তীরদ্রুম সকল নিবিড় ও লতাকুঞ্জে সুশোভিত; ইহার অনতিদূরে অনেকগুলি গোচর গ্রাম আছে এবং এই স্থান সকল যতদূর চক্ষু যায়, ততদূরই শ্যামলবর্ণ শষ্পক্ষেত্র দেখা যায়। এই স্থান দেখিবামাত্র বুদ্ধের শরীর মন শীতল হইল এবং ভাবিলেন এই সুরম্য স্থানই আমার উপযুক্ত। *

---

* উরুবিল্ল—এক্ষণে ইহা উরাইল নামে পরিচিত। এই উরাইল বর্ত্তমান বুধগয়া।

তাদৃশ সুরম্য স্থান দেখিয়া ভগবান বোধিসত্বের মন বড়ই প্রফুল্ল হইল এবং তিনি স্থির করিলেন, এই স্থানে থাকিয়াই ধগন ধারণা সমাধিরূপ তপস্যাদি করিব। আরও ভাবিলেন, এই ভূপ্রদেশ অত্যন্ত রমণীয়, এই স্থানে থাকিলেই আমার মনের ও মনোবৃত্তির অভীষ্ট সাধিত হইতে পারিবে। আর আমার অন্য কিছুতে প্রয়োজন নাই, সুতরাং এক্ষণে ইহাই আমার অনুরূপ ও যথেষ্ট। এইরূপ চিন্তার পর তিনি শিষ্যসহ তপস্যার্থ এই মনোরম্য স্থান বাসোপযোগী করিয়া লইলেন।

তপস্যারম্ভের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম দিনে তিনি আপনার উদ্দেশ্য, আপনার প্রথম কর্ত্তব্য, জগতের অবস্থা, তাৎকালিক লোকের জ্ঞান ধর্ম্মাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি পূর্ণ পাপকালে † জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই কালের লোকেরা মোহবশতঃ মিথ্যা দৃষ্টিবশতঃ, অনুপযুক্ত কৃচ্ছ্র সাধনাদির দ্বারা বৃথা কায়শুদ্ধি অন্বেষণ করিতেছে। যথার্থ শুদ্ধি কি? যথার্থ তপস্যা কি? প্রকৃত পথ কি? তাহা জানিতেছে না। তদ্‌যথা—কেহ মন্ত্র বিচার, কেহ মন্ত্র বর্জন, কেহ মৎস্য মাংস পরিত্যাগ, কেহ বার্ষিক ব্রত, কেহ মাসিক ব্রত, কেহ সুরাপান ত্যাগ, কেহ ফল পত্র ভক্ষণ, কেহ অযাচিত ভক্ষণ,কেহ ভিক্ষান্ন ভোজন, কেহ মূল ফল পত্র শাক ভোজন, কেহ কুশপত্র শায়ী, কেহ পঞ্চগব্য পায়ী, কেহ গার্হস্থ্য, কেহ বাণপ্রস্থ, কেহ গোব্রত, কেহ মৌন, কেহ বীরাসনাদি, কেহ একাহার, কেহ নিরাহার, কেহ ২।৩।৪।৫ দিন অন্তরে ভোজন, কেহ দ্বাদশাহ ব্রত, কেহ পঞ্চদশাহ ব্রত, কেহ চান্দ্রায়ণ, কেহ পক্ষিপক্ষ ধারণ, কেহ মুজ্ নামক তৃণের আসন, কেহ কুশাসন, কেহ বল্কলাসন, কেহ কম্বলাসন,কেহ মৃগচর্ম্মাসন,কেহ আর্দ্র-বস্ত্র, কেহ কৌপীন বস্ত্র, কেহ ভস্মশয়ন, কেহ স্থণ্ডিল শয়ন, কেহ প্রস্তর শয়ন, কেহ চর্ম্ম শয্যায় শয়ন, কেহ এক বস্ত্র, কেহ দ্বিবস্ত্র, কেহ নগ্ন, কেহ তীর্থস্থান, কেহ পুণ্য স্থান, কেহ কেশ ধারণ, কেহ জটাধারণ, কেহ ধূলিম্রক্ষণ, কেহ ভস্ম ম্রক্ষণ, কেহ মৃত্তিকালেপন,

পূর্ব্বদিকে এক ক্রোশ পরিমিত দূরে অবস্থিত আছে। পূর্ব্বে ইহাকে উরুবিল্ল বলিত। উরুবিল্ল নামক জনৈক সেনাপতি এই স্থানে বাস করিত বলিয়া প্রথমে উরুবিল্ল সেনাপতি গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল, তৎপরে কেবল মাত্র উরুবিল্ল নামে পরিচিত ছিল। এখন ইহা উরাইল। "যেনোরুবিল্ল সেনাপতি গ্রামক শুদমুস্থত শুদমু প্রাপ্তোঽভূৎ" ইত্যাদি ললিত বিস্তর গ্রন্থ দেখ। নৈরঞ্জনা—ইহা ফাল্গু নদীর অন্যতম নাম। এ নাম যেমন বৌদ্ধ গ্রন্থেই দেখা যায়, অন্যত্র নাই। গোচর গ্রাম—গোপপল্লী। পূর্ব্বে গোয়ালেরা প্রভৃত তৃণ পত্রাদিযুক্ত স্থানেই বাস করিত।

† পূর্ণপাপ কাল—কলিকাল। "পঞ্চ কষায় কালেহ মিহ জম্বুদ্বীপেঽবতীর্ণঃ।" এই ললিতবিস্তরের লিখিত বুদ্ধ বাক্যটীর অর্থ "আমি কলিকালে জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি। বুদ্ধদেব জানিতেন "আমি কলিকালে জন্মিয়াছি এবং এই কাল পাপকাল।" বুদ্ধদেবের এই জ্ঞানে বিশেষ রহস্য আছে।

কেহ কেশ রোম ধারণ, কেহ মুজ্ নামক তৃণের মেখলা ধারণ, কেহ হস্তে করঙ্কধারণ, ত্রিদণ্ডধারণ, কপাল পত্র ধারণ, খট্টাঙ্গ ধারণ প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধি হয়, পাপক্ষয় মনে করিতেছে। কেহ ধূমপান অগ্নি সেবা সূর্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছে। কেহ পঞ্চতপা, কেহ একপদ, কেহ উর্দ্ধ পদ, কেহ উর্দ্ধবাহু হইয়া তপঃসঞ্চয় করিতেছে। তুষাগ্নি মরণ, কুম্ভকদ্বারা মরণ, ভৃগুপতন, অগ্নি প্রবেশ, জল প্রবেশ, অনশন মরণ ও তীর্থ মরণের দ্বারা অভীষ্ট লাভ অন্বেষণ করিতেছে। কেহ প্রণব জপের দ্বারা, কেহ বষট্‌কারের অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা, কেহ স্বধার অর্থাৎ শ্রাদ্ধের দ্বারা, কেহ বা স্বাহাকারের অর্থাৎ হোমের দ্বারা নিষ্পাপ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ প্রার্থনা, স্তুতি, নমস্কার, দেবার্চ্চন, মন্ত্র জপ, অধ্যয়ন, নির্ম্মাল্যাদিধারণের দ্বারা পবিত্র হইবার ইচ্ছা করিতেছে। অনেক লোকেই অহং পবিত্র ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, দেবী, কুমার কার্ত্তিকেয় মাতৃগণ, কাত্যায়নী, চন্দ্র, কুবের, বরুণ, বাসব, অশ্বিনীকুমার, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, গরুড়, কিন্নর, মহাসর্প রাক্ষস, প্রেত, ভূত, পিশাচ প্রভৃতিকে নমস্কার করিতেছে এবং ঐ সকলকে সার বিবেচনা করিতেছে। *

পুণ্যলাভ প্রত্যাশায় অনেক লোকেই গিরি, নদী উৎস্য, সরোবর, হ্রদ, তড়াগ, সাগর, পল্লল, পুষ্করিণী, কূপ, চত্বর, প্রভৃতি স্থানের আশ্রয় লইতেছে এবং ত্রিশূল প্রভৃতিকে নমস্কার করিতেছে। অপিচ দধি, ঘৃত, সর্ষপ, যব, দূর্ব্বা, মণি, কনক রজত প্রভৃতির দ্বারা মঙ্গল হয় বিবেচনা করিতেছে। এই উৎকট সময়ের প্রত্যেক অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব সংসারভয়ে ভীত হইয়া তৎপরিত্রাণার্থে ঐরূপ ঐরূপ ক্রিয়া কলাপের আশ্রয় লইতেছে। কিন্তু হায়! ঐ সকল হইতে যে সংসারভয় নিবারিত হয় না, তাহা তাহারা একবারও মনে করিতেছে না।†

কেহ মনে করিতেছে, পুত্রের দ্বারাই আমাদের স্বর্গ ও অপবর্গ হইবে। এই জীবলোকে এবম্প্রকারে মিথ্যাপথে গমন, অশয়নে শয়ন জ্ঞান, অমঙ্গলে মঙ্গল জ্ঞান ও অশুদ্ধে শুদ্ধ জ্ঞান করিয়া নষ্ট হইতেছে। এই সময়ে ইহাদিগকে প্রকৃত পথ কি? প্রকৃত মঙ্গল কি? প্রকৃত শুদ্ধতা কি? তাহা জানাইব। যথার্থ ব্রত তপস্যা কিরূপ? তাহা আমি শিখাইব, ধগন কি তাহা শিখাইব। কর্ম্ম বিনাশ পূর্ব্বক ভববন্ধন নাশক যথার্থ যোগ দেখাইব। ‡

---

* বুদ্ধের সময়ের লোকেরা যে সকল দেবদেবীর পূজা ও উপাসনা করিত, তাহা প্রায়ই এই বুদ্ধবাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। এ সকল দেবদেবী প্রায়ই বৈদিক ও পৌরাণিক।

† বুদ্ধ এমন কথা বলেন নাই যে, এই সকল ক্রিয়া কলাপ একেবারে নিষ্ফল বা মিথ্যা। তিনি বলিয়াছিলেন, ঐ সকলের দ্বারা সংসার নাশ হয় না, অর্থাৎ নির্ব্বাণ পদ পাওয়া যায় না। অতএব বুদ্ধের সঙ্গে ঋষিদিগেরও এ সম্বন্ধ ঐক্যতা আছে।

‡ পাঠকগণ এই অনুবাদিত বুদ্ধবাক্যটী পাঠ করিয়া দেখুন, বুদ্ধদেবের সময়ে এদেশে

এইরূপ চিন্তার পর লোকহিত প্রার্থী ভগবান্ শাক্যসিংহ সেই নির্ম্মল সলিলা নৈরঞ্জনা নদীর তীর বনে সুদুশ্বর ষাণ্‌বার্ষিক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাঁহার সেই পাঁচজন শিষ্য তাঁহার দেহ রক্ষার্থ যত্ন তৎপর থাকিল।

শ্রীরামদাস সেন।

পাষ্টের আবিষ্কৃত হাইড্রোফোবিয়ার চিকিৎসা।

হাইড্রোফোবিয়া রোগ কি ভয়ানক, তাহা যিনি স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারেন না! উন্মত্ত শৃগাল কুকুরাদি কর্ত্তৃক দংশিত হইলে এই রোগ জন্মে; ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে রোগী জল দেখিলে ভয় পায়, এবং এই লক্ষণ হইতে রোগের নাম হাইড্রোফোবিয়া (জল হইতে ভয় পাওয়া) রাখা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত হাইড্রোফোবিয়ার কোন ভাল ঔষধ জানা ছিল না, কিন্তু বৎসর দুই হইল পাষ্টের ইহার এক চিকিৎসা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে এই রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার পথ হইয়াছে। যিনি বিজ্ঞানের কিছু জানেন, তিনিই পাষ্টেরের নাম শুনিয়াছেন; ইনি এক জন ফরাসি দেশীয় পণ্ডিত; ইহাঁর প্রধান গুণ এই যে, যে সকল বিষয় আবিষ্কার করিলে মানুষের আশু উপকার হইতে পারে, সে সকল বিষয়ে তাঁহার বেশ বুদ্ধি খেলে। এক সময়ে রেশমের পোকার রোগ হওয়াতে ফরাসি দেশে রেশমের ব্যবসায় লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়; পাষ্টের গিয়া তাহার কিংকর্ত্তব্য স্থির করিয়া উক্ত ব্যবসায়ের পুনর্জ্জীবন দান করেন। ইহাতে তিনি ফরাসি দেশে শত শত ব্যবসায়ীদিগের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন এবং ফরাসি জাতির আর্থিক উন্নতির একটী পথ বন্ধ হইয়া যাওয়া যাওয়ার সময় তাহা পুনরায় খুলিয়া দিয়াছেন। এস্থলে তাঁহার যে আবিষ্কারের কথা বলা হইবে, তাহা দ্বারা তিনি সমগ্র মানব জাতির ভক্তির পাত্র হইয়াছেন, এবং তিনি উহা দ্বারা সমাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার ফল স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত

কিরূপ ধর্ম্মভাব ও কিরূপ ধার্ম্মিক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। এই বুদ্ধ বাক্য পাঠে জানা যায়, তৎকালে এদেশে সমুদায় বৈদিকধর্ম্ম, স্মার্ত্তধর্ম্ম ও পৌরাণিক ধর্ম্ম বিদ্যমান ও প্রচলিত ছিল, কেবলমাত্র তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান ছিল না। তৎকালে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার থাকিলে অবশ্যই তাহার কোন না কোন অংশ ঐ সকল বাক্যের সহিত সংকলিত হইত। এই বুদ্ধবাক্য দেখিয়া অনুমিত হয় যে, তন্ত্রশাস্ত্র বুদ্ধের পরে এবং স্মৃতি ও পুরাণ বুদ্ধের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

স্থূল অর্থ দ্বারা পরিমেয় নহে, তাহার ফল চক্ষুর অগোচর পরমার্থ দ্বারা পরিমেয়। কেহ কেহ বটে পাষ্টেরের এই আবিষ্কার বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন, অর্থাৎ পাষ্টের হাইড্রোফোবিয়ার যে চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বাস্তবিক কোন উপকার হয় কি না তাহা তাঁহারা সন্দেহ করেন। ১৮৮৬ অব্দে ১২ই এপ্রিল তারিখে ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন গবর্ণমেণ্টের সভ্য যোসেফ চেম্বারলেন এক পত্র দ্বারা ঐ দেশের কয়েক জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে পাষ্টের আবিষ্কৃত উক্ত চিকিৎসা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটী কমিটী নিযুক্ত করেন। এই কমিটীতে প্যাজেট, লিষ্টার, রস্কো, সাণ্ডারসন, কোয়েন, ফ্লেমিং, ব্রণ্টন এই কয়েক জনের নাম আছে—সেক্রেটরি ভিক্‌টর হর্স্লি। গত জুনমাসে ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট পাঠান, তাহা হইতে আমরা এস্থলে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উদ্ধৃত করিতেছি। কমিটীর কয়েক জন লোক প্যারিসে যাইয়া স্বয়ং পাষ্টেরের নিকট হইতে তাঁহার চিকিৎসা প্রণালীর তথ্য অবগত হয়েন, তিনি কি প্রণালীতে চিকিৎসা করেন তাহা দেখা হয় এবং তিনি যে সকল রোগীকে চিকিৎসা করেন, তাহার মধ্য হইতে কয়েক জনের বৃত্তান্ত সবিশেষ অনুসন্ধান করা হয়। ইহা ব্যতীত হর্স্লি পাষ্টেরের প্রণালী কতকগুলি ইতর জন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখেন, এবং তিনি যে সব ফল প্রাপ্ত হয়েন, তদ্দ্বারা পাষ্টেরের আবিষ্কারের সত্যতা প্রমাণিত হয়। যদি কোন কুকুর কিম্বা খরগোষ কিম্বা অন্য কোন জন্তু উন্মত্ত কুকুর দ্বারা দংশিত হইয়া পাগল হয় এবং মরিয়া যায়, তবে উহার পৃষ্ঠদণ্ডের স্নায়ুরজ্জু হইতে এমন এক বীজ পাওয়া যাইতে পারে যাহা কোন সুস্থ কুকুর কিম্বা অন্য জন্তুর দেহে প্রবিষ্ট করাইলে এই জন্তু শীঘ্রই হউক কিম্বা বিলম্বেই হউক খেপিয়া উঠিবে এবং এইরূপ বীজ দ্বারা যে রোগ জন্মে, তাহা দংশন জনিত রোগ হইতে প্রায় কোনরূপেই বিভিন্ন নহে। একটী খরগোষে এইরূপে বীজ দ্বারা রোগ জন্মাইয়া পরে তাহা হইতে অন্য একটীতে এবং তাহা হইতে তৃতীয় একটীতে ইত্যাদি ক্রমে কয়েকটী খরগোষে বীজ দ্বারা রোগ উৎপাদন করিলে দেখা যায় যে রোগের প্রখরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু বীজ বাহির করিয়া লইবার পূর্ব্বে যদি উল্লিখিত স্নায়ুরজ্জু কয়েক দিন ধরিয়া শুষ্ক করা যায়, তবে আর উহার তেজ পূর্ব্ববৎ থাকিবে না—ফলতঃ ঐ বীজ তখন কোন সুস্থকায় জীবের দেহে প্রবিষ্ট করাইলেও তদ্দ্বারা উহার উন্মত্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। স্নায়ুরজ্জু যত শুষ্ক করা যাইবে, উহার বীজের শক্তি তত কমিয়া আসিবে; উহা যত কম শুষ্ক হইবে, উহার বীজের শক্তি তত অধিক থাকিবে। কোন সুস্থকায় জীবের দেহে শুষ্ক স্নায়ুরজ্জুর বীজ একদিন প্রবেশ করাইলে তাহার পর দিন উহা অপেক্ষা কম শুষ্ক রজ্জুর বীজ নিরাপদে প্রবেশ করান যাইতে পারে; তাহার পরদিন আবার উহা অপেক্ষা কম শুষ্ক—এইরূপ ক্রমে কয়েক দিন পর্য্যন্ত বীজ প্রবিষ্ট করিলে পরে আর

ঐ জীবের কোন জন্তুর দংর্শনে হাইড্রোফোবিয়ার আশঙ্কা থাকে না। হাইড্রোফোবিয়া হইতে রক্ষা পাওয়ার ইহা যে একটী বাস্তবিক উপায়, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয়। একই পাগ্‌লা কুকুর কতকগুলি উল্লিখিত প্রকারে বীজ দেওয়া জন্তুকে কাম্‌ড়াক এবং আর কতকগুলিকে কামড়াক যাহাদিগকে ওরূপ করা হয় নাই—দেখা যাইবে যে প্রথম জন্তুগুলি হাইড্রোফোবিয়ায় মরিবে না, আর দ্বিতীয়গুলি মরিবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে টীকা দিলে যেরূপ বসন্ত রোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, পাষ্টেরের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতেও সেইরূপ হাইড্রোফোবিয়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই আবিষ্কার দ্বারা লোকের যে কত উপকার হইবে, তাহা ইয়ত্তা করা যায় না; ফলতঃ পাষ্টেরের এই প্রণালী ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বিষাক্ত বীজ জনিত রোগের পক্ষে প্রয়োগ হইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে আমাদিগের শরীরে যত রোগ হয়, তাহা কোন না কোন বীজ হইতে জন্মে; বৃক্ষে যেমন পরগাছা লাগিয়া তাহাকে অসুস্থ করে, মনুষ্য শরীরেও সেইরূপ এই সকল বীজে অসুস্থতা উৎপাদন করে। এক্ষণে যদি কোন উপায়ে মানুষের শরীর ইহাদিগের বাসের অনুপযোগী করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর তাহারা উৎপাত করিতে পারে না। অবশ্য এই উপায় এরূপ হওয়া আবশ্যক যে তাহাতে স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ কোন ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ রোগ নিবারণ করিতে গিয়া ঔষধ হইতে আবার অন্য রোগ না জন্মে। এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে পাষ্টেরের প্রণালীতে কোন জীবকে হাইড্রেফোবিয়ার টীকা দেওয়া হইলে কতদিন পর্য্যন্ত আর উহার উক্ত রোগ হইতে আশঙ্কা থাকিবে না—এবিষয়ে এখনও কিছু নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না; কিন্তু দুই বৎসর হইল ঐ টীকার উপকারিতা প্রথম সপ্রমাণ হয়, এবং এ পর্য্যন্ত যে জন্তুকে একবার টীকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার আর হাইড্রোফোবিয়া হয় নাই। টীকা দেওয়ার পর পাগলা কুকুরে কামড়াইলে হাইড্রোফোবিয়া হয় না; পাগলা কুকুরে কামড়াইলে পর টীকা দিলেও ঐরূপ উপকার হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া পাষ্টের কুকুরাদি জন্তু দ্বারা দংশিত কতকগুলি ব্যক্তিকে টীকা দেন; ইহাতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা উল্লিখিত কমিটী নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে কোন নিঃসন্দেহ মত দিতে হইলে বাস্তবিক উন্মত্ত জন্তুতে দংশিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে উক্ত টীকা দিলেই বা কি পরিমাণে হাইড্রোফোবিয়া হয়, আর না দিলেই বা কি পরিমাণে হয়—ইহা জানা আবশ্যক; কিন্তু এই পরিমাণ নিরূপণ করা একরূপ অসম্ভব। ইহার প্রথম কারণ এই যে, যে সকল জন্তুতে দংশন করে এবং পাগলা বলিয়া অনুমান করা হয়, তাহারা বাস্তবিক পাগলা হইয়াছিল কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; দ্বিতীয় কারণ এই যে বাস্তবিক পাগ্‌লা কুকুর প্রভৃতিতে কামড়াইলেও হাইড্রোফোবিয়া হইবে কি না, তাহা দংশনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আল্‌গা স্থলে কামড়াইয়াছে কি কাপড় দিয়া ঢাকা স্থলে কামড়াইয়াছে এবং দ্বিতীয় প্রকারের দংশন

হইলে কাপড় পুরু ছিল কি পাতলা ছিল এবং উহা কতখানি ছিঁড়িয়া যায়, এ সব কথা জানা চাই—ইহা ছাড়া রক্তই বা কতটা বাহির হয়, তাহাও জানা দরকার; কারণ রক্ত যত অধিক বাহির হইবে, বিষও রক্তে মিশিয়া শরীরে প্রবেশ করিবার সুবিধা তত অধিক পাইবে। তৃতীয়তঃ দংশনের পর দষ্টস্থল পোড়াইয়া কাটিয়া কিম্বা ধুইয়া দেওয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে চিকিৎসা করা হইয়াছিল কি না, ইহাও জানা আবশ্যক। চতুর্থতঃ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তুর, এমন কি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কুকুরের কামড় ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বিপদজনক সুতরাং কিরূপ জন্তুতে কামড়াইয়াছে—তাহা জানা দরকার। উন্মত্ত নেকড়ে বাঘের কামড়ে এবং সম্ভবতঃ উন্মত্ত বিড়ালের কামড়ে যত ক্ষতি হয়, উন্মত্ত কুকুরের কামড়ে তত হয় না। উন্মত্ত জন্তুর দংশনে কি পরিমাণে (হাইড্রোফোবিয়ায়) মৃত্যু হয়, তাহা উল্লিখিত কারণগুলিতে নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত দেখা যায় যে কোনরূপ চিকিৎসা না করিলে শতকরা কি পরিমাণে কুকুর দংশনে মৃত্যু হয়, এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন গণনায় ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া গিয়াছে—এক দিকে কেহ বা শতকরা পাঁচ, আবার অপর দিকে কেহ বা শতকরা ষাইট এই সংখ্যায় উপনীত হইয়াছেন। উল্লিখিত নানা কারণে যে ভ্রম হইতে পারে, তাহা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত উক্ত কমিটীর যে সভ্যগণ প্যারিসে যান, তাঁহারা পাষ্টেরের নিকট তিনি যে সকল ব্যক্তিকে চিকিৎসা করেন, তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলির বৃত্তান্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; পাষ্টের উহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে নব্বুই জন ব্যক্তির নাম দেন। এই নাম দেওয়ার সময় তিনি যে বিশেষ কয়েক জনকে বাছিয়া দেন, তাহা নহে। বাছিবার মধ্যে কেবল এই হয় যে তিনি যে সকল ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রথমে চিকিৎসা করেন, (সুতরাং যাহাদিগের মধ্যে তাঁহার টীকার ফলাফল দেখিবার অধিক সুবিধা) এবং যাহারা নিকটবর্ত্তী (প্যারিস, লিয়ঁ ও স্যাঁটেটিয়েন্ এই তিন) স্থানে বাস করে, তাহাদিগের মধ্য হইতে নাম দেওয়া হয়। এই নব্বুই জনের মধ্যে চব্বিশ জনকে গায়ের আলগা জায়গায় পাগলা কুকুরে কামড়ায়, একুত্রিশ জনকে বাস্তবিক পাগলা কুকুরে কামড়াইয়াছিল কি না বলা যায় না, আর বাকী কয়জনকে যদিচ পাগলা জন্তুতে কামড়ায়, তথাপি কামড় কাপড়ের উপর হওয়ায় তাহাদিগের হাইড্রোফোবিয়া না হইলেও পারিত। উল্লিখিত কমিটীর মতে টীকা দেওয়া না হইলে ঐ নব্বুই জনের মধ্যে অন্ততঃ আট জনের মৃত্যু হইত; অথচ ১৮৮৬ অব্দের এপ্রিল ও মে পর্য্যন্ত ইহাদিগের কাহারও হাইড্রোফোবিয়া হয় নাই এবং কমিটীর রিপোর্ট লেখার সময় (গত জুন মাস) পর্য্যন্ত কেহ ঐ রোগে মরে নাই। এইরূপে স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া কমিটীর মেম্বরগণ পাষ্টের কর্ত্তৃক লিখিত রোগীদিগের অবস্থা চিকিৎসাদির বৃত্তান্তের সত্যতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েন।

পাষ্টের তাঁহার এই নূতন প্রণালীতে চিকিৎসা আরম্ভ করিবার কয়েক মাস পরে সময় সময় কেবল মাত্র শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত কাহাকে কাহাকে টীকা দেন; এই লোক

গুলিকে কোন উন্মত্ত জন্তুতে কামড়াইয়াছিল কি না, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না; কিন্তু তাহাদিগের বিশ্বাস যে কামড়াইয়াছিল। এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন যে পাষ্টেরের প্রণালীর উপকারিতা নির্দ্ধারণ করিবার সময় এই সকল লোককে গণনার মধ্যে ধরিলে গণনা ন্যায্য হইবে না। কিন্তু এইরূপ অনিশ্চিত স্থলগুলি ধরিলেও দেখা যায় যে টীকা না দিলে শতকরা অন্ততঃ পাঁচ জন করিয়া মরে; ১৮৮৫ অব্দের অক্টোবর হইতে ১৮৮৬ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাষ্টের সমুদয়ে ২৬৮২ জনকে টীকা দেন; শতকরা পাঁচ জন ধরিয়া ইহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ ১৩০ জনের মরিবার কথা, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মোট ৩৩ জন মরিয়াছে, আর ইহাদিগের মধ্যে আবার তিন জনের চিকিৎসা শেষ হইতে না হইতেই রোগ দেখা দেয়, অতএব ইহাদিগকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যাহা হউক পাষ্টের যাহাদিগকে চিকিৎসা করেন, তাহাদিগের মধ্যে নেকড়ে বাঘে কামড়ান লোকগুলি বাদ দিলে অন্যান্য জন্তুতে দংশিত যে ২৬৩৪ জনকে চিকিৎসা করেন, তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ১ ও ১·২ এই দুই রাশির মধ্যে। এই পরিমাণ শতকরা ৫ জনের তুলনায় অতি অল্প, অর্থাৎ পাষ্টের তাঁহার চিকিৎসা দ্বারা ঐ ২৬৩৪ জনের মধ্যে ১০০ জনের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসায় যাহারা মরিয়াছে, তাহারা ছাড়াও আর ১০০ জন মরিত, কিন্তু চিকিৎসার গুণে এই একশতটী লোক এখনও বাঁচিয়া আছে। পাষ্টেরের রোগীদিগের মধ্যে ২৩৩ জনকে যে সকল জন্তুতে কামড়ায়, সে সকল যে পাগল হইয়াছিল তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; টীকা না দিলে ইহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ চল্লিশ জন মরিত; কিন্তু টীকা দিয়া কেবল চারিজন মাত্র মরিয়াছে। আবার দেখা যায় যে তাঁহার রোগীদিগের মধ্যে ৪৮ জনকে পাগলা নেকড়েবাঘে কামড়াইয়াছিল, খুব সম্ভব ইহাদিগের মধ্যে ৩০ জন মরিত কিন্তু পাষ্টেরের চিকিৎসায় কেবল ৯ জন মরিয়াছে। যে জন্তুতে কামড়াইয়াছে, তাহা পাগল হইয়াছিল কি না—ইহার নিশ্চয় পরীক্ষা দুই রকম। (১) যে সকল জন্তুকে কামড়াইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কোনটীর হাইড্রোফোবিয়া হইয়াছে কি না, (২) প্রথমোক্ত জন্তুদিগের স্নায়ু রজ্জু হইতে বীজ বাহির করিয়া কোন সুস্থ জন্তুর শরীরে প্রবেশ করিলে তাহাতে এই জন্তুর হাইড্রোফোবিয়া হয় কি না। উপরে যে ২৩৩ জনকে নিশ্চয় পাগল জন্তুতে কামড়াইয়াছিল বলা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই দুই প্রকারে পাওয়া হয়। কোন জন্তু বাস্তবিক পাগল হইয়াছিল কি না, তাহা এক্ষণে দ্বিতীয় প্রণালীতে সহজেই নিরূপিত হইতে পারে—এই প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া পাষ্টের চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক উপকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার হাইড্রোফোবিয়ার চিকিৎসা প্রণালীতে যে কি মানুষ, কি ইতর জন্তু সকলেরই উপকার সাধন হইবে—তাহা বলার দরকার নাই। কোন বিষাক্ত বীজ হইতে রোগ দেখা দিতে না দিতে সেই বীজেরই কম বিষাক্ত কতকগুলি দ্বারা উহার নিরাকরণ পাষ্টের এই প্রথম করিলেন; তিনি হাইড্রোফোবিয়ার পক্ষে এই যে নিয়ম অবলম্বন

করিয়াছেন, ইহা এক্ষণে অন্যান্য রোগের পক্ষে প্রয়োগ হইতে পারে। পূর্ব্বে কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই নিয়মে বসন্তরোগের চিকিৎসা হইতে পারে কিন্তু তাঁহারা উহা কার্য্যে কতটা প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না; পাষ্টের শুদ্ধ অনুমান করেন নাই, তিনি হাতে হাতে প্রমাণ দেখাইয়াছেন।

কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে পাষ্টেরের চিকিৎসা প্রণালীতে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় কি না। পাষ্টের দুই রকমে টীকা দেন—(১) সাধারণ প্রণালী অর্থাৎ উন্মত্ত কুকুরের দ্বারা দংশিত খরগোষের হাইড্রোফোবিয়া হইলে পর তাহার পৃষ্ঠ বংশের স্নায়ুরজ্জু হইতে প্রবন্ধের আদিভাগে উক্ত প্রণালীতে বিষ সংগ্রহ করিয়া চর্ম্মের নীচে প্রত্যহ একবার করিয়া দশ দিন শরীরে উহা প্রবিষ্ট করা এবং দিন দিন প্রখরতর বিষ ব্যবহার করা—অর্থাৎ প্রথম দিনে যত প্রখর, দ্বিতীয় দিনে তাহার অধিক প্রখর, তৃতীয় দিনে আবার তাহার অধিক ইত্যাদি ক্রমে দশ দিন; (২) বিশেষ প্রণালী অর্থাৎ যাহাদিগের হাইড্রোফোবিয়া হওয়ার খুব সম্ভব মনে হইয়াছিল, তাহাদিগের পক্ষে প্রত্যহ তিনবার করিয়া তিন দিন, তাহার পর একবার করিয়া সাত দিন, এবং তাহার পরে কয়েক দিন বাদ বাদ কিছু দিন ক্রমান্বয়ে প্রখরতর বিষ ব্যবহার করা হয়। প্রথম প্রণালীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর বিষের অপেক্ষাও প্রখরতর বিষ দ্বিতীয় প্রণালীতে ব্যবহার করা হয়; ইহার তেজ এত অধিক যে ক্রমে ক্রমে সহাইয়া না আনিলে উহাতে নিশ্চয় হাইড্রোফোবিয়া হইত।

সাধারণ প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া কতকগুলি স্থলে যে উপকার পাওয়া গিয়াছে, বিশেষ প্রণালীতে তাহার অপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া গিয়াছে। যেমন ১৯ জন রসিয়া দেশের লোককে পাগল নেকড়ে বাঘে কামড়ায়, আর তাহাদিগের তিন জনকে সাধারণ প্রণালীতে চিকিৎসা করা হয়, তিন জনই মরিয়া যায়; বাকী ষোল জনকে বিশেষ প্রণালীতে চিকিৎসা করা হয়, উহারা সকলেই বাঁচিয়াছিল। ছয় জন শিশুকে পাগল জন্তুতে মুখে ভয়ানক কামড়াইয়া দেয়, তাহাদিগের মধ্যে সাধারণ প্রণালীতে চিকিৎসার পর কেহই বাঁচিল না, আর সেই রকম অন্য দশ জন শিশুকে বিশেষ প্রণালীতে চিকিৎসা করার পর কেহই মরে নাই। এইরূপে স্থলবিশেষে (যেখানে রোগের সম্ভাবনা অধিক) বিশেষ প্রণালী অধিকতর উপকারী; আর বিশেষ প্রণালীতে চিকিৎসার পর রোগীদিগের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা যে অধিকতর হয়, তাহাও নহে। ৬২৪ জনকে বিশেষ প্রণালীতে চিকিৎসা করা হয়, তাহাদিগের মধ্যে কেবল ৬।৭ জন মরিয়াছে। যাহা হউক এই বিশেষ প্রণালী মতে চিকিৎসা হইয়া পরে কয়েক জন লোক মরিয়া গিয়াছে; ইহাদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ ইংলণ্ড হইতে উন্মত্ত বিড়ালে দংশিত গফি নামে একজন লোকের পক্ষে কেহ কেহ এই সন্দেহ করিয়াছেন যে তাহাদিগের মৃত্যু হয়ত পাষ্টেরের চিকিৎসাতে যে বিষ প্রবেশ করান হয়, তাহাতেই হইয়াছে—দংশনে নহে। এইরূপ

বলিবার এক কারণ এই যে এই সকল লোক সাধারণ হইড্রোফোবিয়ায় মরে নাই, কিন্তু হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে মরিয়া যায়। গফির পক্ষে দেখা যায় যে গত অক্টোবরের ১০ই তারিখে প্রথমে তলপেটে ও পিঠে বেদনা আরম্ভ হয়—আট দিন পরে তাহার পা দুখানি নড়াইবার শক্তি কমিয়া গেল এবং পর দিন পা ও ধড়ে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হয় অর্থাৎ এই দুই স্থল নড়াইবার শক্তি রহিত হইয়া যায়, আর হাত ও মুখেও ঐ রোগ কিছু কিছু দেখা দেয়—তাহাকে তখন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে ২০শে অক্টোবরে তাহার মৃত্যু হয়। এই রোগ হাইড্রোফোবিয়ার উন্মত্ততার মত নহে; কিন্তু খরগোষের মধ্যে একপ্রকার রোগ হয় তাহাতে ঐরূপ পক্ষাঘাত হয় এবং এই রোগ হাইড্রোফোবিয়ার বিষ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে গফিকে হাইড্রোফোবিয়া বিশিষ্ট খরগোষের স্নায়ুরজ্জু হইতে বিষ লইয়া চিকিৎসা করা হয় এবং এই বিষে উহার পক্ষাঘাত হয়। কিন্তু ইহার কোন নিশ্চয় প্রমাণ নাই; এমনও হইতে পারে যে এই বিষ না ব্যবহার করিলেও দংশনের বিষে তাহার হাইড্রোফোবিয়া-জনিত পক্ষাঘাতে মৃত্যু হইত। যাহা হউক, পাষ্টের এক্ষণে তাঁহার বিশেষ প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং এই পরিবর্ত্তিত আকারেও উহা নিতান্ত দরকার বোধ না হইলে ব্যবহার করেন না। সাধারণ প্রণালীতে চিকিৎসা করিলে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি দেখা যায় নাই।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বিবাহের জন্য পূর্ব্বরাগ আবশ্যক কি না?

বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষের অন্তঃকরণে পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ বা ভালবাসা জন্মে, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে পূর্ব্বরাগ এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। কবিতার সংসারে পূর্ব্বরাগ ব্যতীত বিবাহ এক প্রকার মহাপাতক বলিয়া ধর্ত্তব্য করে। ইয়োরোপের লোকাচার মধ্যেও তাদৃশ এক সংস্কার বদ্ধমুল হইয়া আছে। কিন্তু ইয়োরোপীয়দিগের এই এক গুণ আছে যে, তাহাদিগের অন্তঃকরণ অতি বিশাল আয়তনবিশিষ্ট, সেই অন্তঃকরণে সর্ব্বপ্রকার ভাব স্থান পাইয়া থাকে। মনুষ্যের মনের এমন কোন ভাব বা চিন্তা বা প্রবৃত্তি নাই, যাহার তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে ইয়োরোপীয়েরা অক্ষম। তাহাদিগের এই গুণের বিশেষ পরিচয় আমি অদ্য জেয়াঁ জাক্ রুসো পাঠ করিতে করিতে পাইতেছি। রুসোর নাম পাঠকেরা অনেকে অবগত আছেন। ইনি ফরাশি ভাষার এক জন অত্যুৎকৃষ্ট রচয়িতা। তদ্ব্যতীত, ফরাশি-বিপ্লব নামক যে তুমুল কাণ্ড

অদ্য এক শত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়া এখনও ইয়োরোপ মণ্ডলকে সম্পূর্ণ সুস্থিরতা লাভ করিতে দেয় নাই, রূসোর রচনা অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির রচনার সহিত সেই তুমুল কাণ্ডের সংঘটন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। রূসোর রচনা পাঠ করিলে তাহার কিছু কিছু তত্ত্বও পাওয়া যায়। এমন পরিষ্কার প্রাঞ্জল শব্দবিন্যাস অভাবনীয়; অথচ এরূপ মধুমাখা ভাবের পরিপাটী আর কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ। রূসোর রচনার গুণে উত্তম অধমবৎ প্রতীয়মান হয়, ধর্ম্মের মূর্ত্তি অধর্ম্মের ন্যায় হইয়া যায়, অন্ধকার আলোকের রূপ ধারণ করে। আর রূসো এই ক্ষমতা কেবল তর্কের দ্বারা বা প্রৌঢ়িবাদের প্রভাবে প্রকাশ করেন না; শুদ্ধ বর্ণনার চাতুরীতে। তিনি এরূপ বর্ণনা করিয়া তুলিতে পারেন, যাহাতে আমাদিগের বোধ হইবেক, যে সভ্যতা কেবল ভ্রম মাত্র, অসভ্য জাতিরাই যথার্থ মানুষ, বিদ্যাসাগর হওয়ার চেয়ে সাঁওতাল হওয়া ভাল, কালিদাস অধ্যয়নের অপেক্ষা বন মধ্যে 'হাও হাও' করিয়া চীৎকার করা প্রশংসনীয়। সেই রূসো একস্থলে পূর্ব্বরাগের বিষয়ে গুটিকতক কথা বলিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এরূপ আছেন, যাঁহারা ইংরেজদিগের উপর এতদূর পর্য্যন্ত হাড়ে চটিয়া গিয়াছেন, যে উহাদিগের কোন আচার বা ব্যবহার তাঁহাদিগের ভাল লাগে না। ইংরেজদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে অনুরাগ পরীক্ষার নিয়ম আছে, এই নিমিত্ত উল্লিখিত কৃতবিদ্যগণ আমাদিগের চিরাগত ব্যবহারই শ্রেয়স্কর বলিয়া সমর্থন করিতে উদ্যত। তাঁহারা রূসোকে সহকারী দেখিলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন, এই নিমিত্ত রূসোর অভিমত আমি প্রকাশ করিতেছি। রূসো এই বিষয়ে বিশেষ খেলা এই খেলিয়াছেন যে, চিরকাল 'ভালবাসা ভালবাসা' করিয়া উন্মত্ত এরূপ একটী স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া ঐ সকল কথা বাহির করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটী বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম না হইতে হইতেই একজন নবীনবয়স্ক স্বীয় শিক্ষকের প্রতি প্রেমে 'হাবুডুবু' খাইয়া পরিশেষে পিতার নিতান্ত জেদে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের এক স্বামীকে পাণি দান করিয়া, তার পর আপনার পূর্ব্ব প্রণয়ীকে কি লিখিতেছেন, পাঠক তাহা শুনুন। "আমার বরাবর একটী ভ্রম ছিল, আর বোধ হয়, তোমারো অদ্যাপি সে ভ্রম আছে যে পূর্ব্বরাগ না হইলে দাম্পত্য সুখ পাওয়া যায় না, কিংবা স্ত্রী ও স্বামীতে ভালবাসা না থাকিলে সুখে জীবন যাপন হয় না। কিন্তু এ সংস্কার ভ্রান্তিমূলক। যদি স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই শুদ্ধসত্ত্ব ও ভদ্র হয়, ধর্ম্মপরায়ণ হয়, যদি তাহাদের কতকটা মিল থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। 'মিল' বলিতে অবস্থাগত সৌসাদৃশ্য বলিতেছি না, অর্থাৎ দুজনেই যে বড়মানুষ অথবা দুজনেই যে গরীব হওয়া চাই, তাহা বলিতেছি না; অথবা দুজনেই যে সমবয়স্ক হওয়া চাই, তাহা বলি না। কিন্তু যদি উভয়ের স্বভাব ও মেজাজ কতকটা মেলে, তাহা হইলেই চলে। তাহা হইলেই উভয়ের মধ্যে কালসহকারে এরূপ একটী টান জন্মিয়া যায়, যাহা অতি উপাদেয়। পর-

স্পরের প্রতি সেই টানটী বিবাহ হইতেই উৎপন্ন হয় ; সেটী ঠিক্ 'ভালবাসা' বা 'প্রণয়' বা 'অনুরাগ' পদবাচ্য না হউক, কিন্তু সেটী ভালবাসার মত চমৎকারিতা ধারণ করে, ভালবাসা অপেক্ষা উহার মিষ্টতা খাট নহে ; অথচ উহা ভালবাসা অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী। ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে নানান্ উদ্বেগ, নানান্ জঞ্জাল ; প্রথমত পাছে হাতছাড়া হয় এই আশঙ্কা, পাছে আর এক জনকে ভালবাসে এই ভাবনা ; দ্বিতীয়তঃ না দেখিলে বুক জ্বলে, প্রাণ কেমন করে, মনে সুখ থাকে না। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপার দাম্পত্য সম্বন্ধের পক্ষে উপযুক্ত নহে। পরিণয়ের প্রকৃতি এই যে, পরিণীত দুটী ব্যক্তি স্থির ধীর ও অব্যগ্রভাবে গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিবে, সংসারসুখ অনুভব করিবে, শান্তিরস আস্বাদন করিবে, তাহার মধ্যে বুক্ফাটাফাটি বা মানভঙ্গ বা বিচ্ছেদ বিরহের জ্বালা, এই সকল লইয়া কি হইবে ? বিবাহের ত এইমাত্র উদ্দেশ্য নহে যে দুই জনে ক্রমাগত পরস্পরের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে মগ্ন থাকিবে, অহর্নিশি সেই রূপ হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে, তাহারে ভিন্ন আর কাহারেও ভাল লাগে না ইত্যাদি। এই সকল অবস্থা ভালবাসার পক্ষে সাজে বটে, কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের সাজে কি ? তাঁহাদিগকে কি লোকলোকতা আহার ব্যবহার দেখিতে হইবে না, কুটুম্ব সাক্ষাৎ আত্মীয় স্বজনের কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে ? আর আর সামাজিক কার্য্যে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, গৃহস্থালী বিসর্জ্জন দিতে হইবে, সন্তান সন্ততির লালন পালন অপরের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে ? দুজনের যদি পরস্পরের প্রতি ভালবাসা থাকে, ত ঘটে কি ? যেন পৃথিবীতে তাহারা ছাড়া আর কেহ নাই ; সংসার উচ্ছন্ন যাউক না, তাহারা দুজন থাকিলেই কিছুরই অভাব হইবে না ; পরস্পর পরস্পরের জন্য ব্যতিব্যস্ত ; কথা যেন ফুরায় না ; একজন যেন অপরের মাধুরী শেষ করিতে পারে না ; যেন সেই মাধুরীর ভাণ্ডার অক্ষয় অপরিসীম ও অনন্ত ; যেন পরস্পরকে ভালবাসা ছাড়া আর কোন কাজই নাই ; আর কোন কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের এরূপ হইলে চলে না ; তাহাদের আরো ঢের ধান্দা আছে ; কেবল মুখ চাহাচাহি করিয়া দুজনে বসিয়া থাকিলেই তাহাদের চলে না ; অন্য অশেষ কর্ত্তব্য তাহাদিগকে সমাধা করিতে হয় ; অশেষ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হয়। বোধ হয়, মানুষের মনোমন্দিরে যতগুলি প্রবল প্রবৃত্তি সময়ে সময়ে উদয় হইয়া আধিপত্য করিয়া থাকে, ভালবাসার বাড়া ছলনাপরায়ণ মায়াবী প্রবৃত্তি আর কেহ নাই। ভেল্কীই ইহার প্রাণ, ইন্দ্রজালই ইহার স্বরূপ ; প্রতারণাই ইহার আধার, বিড়ম্বনাই ইহার পরিণাম। এই যে ভালবাসা, ইহার ভাবভঙ্গি অতি প্রচণ্ড ; তর্জ্জন গর্জ্জন লইয়াই আছেন ; শান্ত মূর্ত্তি কাহাকে বলে, আদবে জানেন না ; তাই জন্যে লোকে ইহাকে সারাল জিনিস মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার যেরূপ হাঁক্ডাক্ বা আড়ম্বর, ইহা তদ্রূপ টেঁকসই নহে। ইহার কিঞ্চিৎ মধুরতা আছে বটে, অন্তঃকরণ সেই মধুরতাতে আচ্ছন্ন হইয়া ভবিষ্যৎকে অতিরমণীয়

বলিয়া বোধ করে ; কিন্তু ভালবাসার আখেরের কিছুই ঠিকানা নাই। যতক্ষণ ভালবাসা-টুকু থাকে, ততক্ষণ সেটুকু মিষ্টি বলিয়া এরূপ মনে করিও না যে, তেমনি বরাবর থাকিবে, যে ইহার সমাপ্তি বা অবসান হইবে না। উটী ভ্রম। কারণ প্রেম এক প্রকার অগ্নি, উহা পুড়িয়া পুড়িয়াই নিবিয়া যাইবে। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই উহার খাঁই মিটিয়া যায়, রূপ লাবণ্যের সঙ্গে সঙ্গেই উহা মুছিয়া যায় ; চুল পাকা দেখিলেই উহা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। যত দিন পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে, বোধ হয় কেহ কখন দেখে নাই, যে দাঁত পড়িয়া যাইবার পর উভয়ে উভয়ের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ; অথবা তফাত হইলে হা হুতাশ করিতেছে। সুতরাং প্রেম যতই তীব্র হউক না কেন, ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, 'প্রাণেশ্বরি' 'জীবিতেশ্বর' এ সকল সম্বোধন চিরকালের তরে নহে। ফুল বিল্বপত্র দেওয়া, কি মাতায় করিয়া রাখা, কি হাতের তেলোর উপর রাখা, ইহা আজীবন ঘটে না। তখন প্রেমের পুতলী ভাঙিয়া যায়, তখন আর ভালবাসার পাত্রকে দেবপ্রতিমা বলিয়া বোধ হয় না ; তখন সে আসলে যাহা, তাহাই চক্ষে পড়ে। তখন চক্ষু যেন এদিক ওদিক করিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহার সাবেক ভালবাসার সামগ্রী গেল কোথা ? অর্থাৎ সে আর ঠিক পায় না যে কি দেখিয়া অত মজিয়াছিল, অত মত্ত হইয়াছিল। সাবেক সামগ্রী পায় না, কিন্তু যাহা পায়, তাহাতে আর মন উঠে না, মেজাজ বিগড়িয়া গিয়াছে ; তখন চিত্তির চটিয়া গিয়াছে, আর ভাল লাগে না। আশ্চর্য্য এই যে, যেমন প্রথমে মাটীর পুতলীকে দেবতা বোধ করিয়াছিল, তেমনি এখন আর মনুষ্যকেও ইতর প্রাণী জ্ঞান করে। তখন ভালবাসার পাত্রকে কি এক চক্ষে দেখিয়াছিল, কত অলীক অবাস্তবিক কাল্পনিক আরোপিত গুণ সংযোগ করিয়াছিল, কাককে কোকিল জ্ঞান করিয়াছিল। এখন আবার আসলে যা, তাহার চেয়েও নিকৃষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। আগে মুখ ছিল চাঁদ, চক্ষু ছিল নীলপদ্ম, অঙ্গ ছিল কনকলতা ; এখন গ্রন্থে শুদ্ধিপত্র যোজনা করা হয় ; চন্দ্রের পরিবর্ত্তে পড় 'পেচক' ; নীলপদ্মের বদলে 'কোটর'; 'কনকলতা'র স্থানে 'ঝাটার কাটি'; এখন শালিকও ছাতারিয়া হইয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ রুশ্‌ফুকো নামক 'ঠোঁট্‌কাটা' 'হক্ কথা বক্তা' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, যখন আমার নিজের প্রতি ভালবাসা নাই, তখন অন্যের ভালবাসা পাইতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু ইহার চেয়ে কত অধিক লজ্জার কথা এইটী দেখ দেখি যে, পূর্ব্বে অত্যন্ত প্রীতি ছিল, এক্ষণে তাহার কিছুই নাই। যদি ভালবাসা প্রথমে অত্যন্ত প্রখর হয়, তবে সেই প্রখরতা নষ্ট হইয়া কাল সহকারে যে কেবল নিরুৎসুকতা (indifference) আসিবে, তাহা নহে ; কিন্তু বিতৃষ্ণাও জন্মিবে। ইহার চেয়ে ত প্রথমাবধিই প্রখর ভালবাসা না হওয়া ভাল। ভালবাসা ক্ষয় হয় হউক, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি 'দেক্-বোধ' আসিয়া জুটে ; যদি পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে শেষে উত্ত্যক্ত হইতে হয় ; যদি অতি আসক্ত প্রণয়ীর অবস্থা হইতে দেখিলে গা জ্বলিয়া যায়, এই দশায় উপনীত হইতে হয় ; তাহা হইলে গোড়া-

তেই সাদাসিদে ভাল; কাজ কি তীব্র প্রেমে? কারণ এক দিকে তীব্র হইলে বিপরীত দিকেও তীব্র হইবে।” * * *

“আমার যে স্বামী, তাঁহার ও আমার মধ্যে কোন ভেল্কীর পর্দা বিদ্যমান নাই। আমি প্রকৃত পক্ষে যাহা, তিনি আমাকে তাহাই দেখেন; আমিও তাঁহার আসল মুর্ত্তি অবলোকন করি। আমরা দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য প্রেমপ্রবৃত্তি দ্বারা পরস্পর গ্রথিত নহি; আমাদিগের পরস্পর বন্ধন-গ্রন্থি এই যে, তাঁহার আমার উপর একটা টান আছে, আমার তাঁহার উপর একটা টান আছে; শিষ্ট শান্ত দুটী লোক একত্রে থাকিলেই এরূপ টান উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা উভয়ে বুঝিয়াছি যে, যখন বিবাহ করা হইয়াছে, তখন যাবজ্জীবন এক সঙ্গে থাকিতে হইবে; ইহা আমাদিগের অদৃষ্টের লিপি; ভবিতব্যতা দেবীর এই আজ্ঞা আমাদিগের শিরোধার্য্য করা উচিত এবং যতদূর সাধ্য, পরস্পরের সাচ্ছন্দ বর্দ্ধন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। আমি ত দেখিতেছি যে, যদি বিধাতা আমাদিগের উভয়কে পরস্পরের জন্য সংকল্পিত করিয়া সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে ইহার চেয়ে বেশী আর কি হইত। আমার মন যেরূপ প্রণয়প্রবণ, যদি স্বামীর মন তদ্রূপ হইত, তা হলে হয়ত সময়ে সময়ে ঝগড়া হইত; তিনি আমার নিকট প্রণয়ের উপহার প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু আমার তাঁহার প্রতি ভালবাসা নাই, আমি সে উপহার কোথা হইতে দিতাম? তাহা হইলেই তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন, তাহা হইলেই উভয়ে অমিল অনৈক্য অশান্তি উপস্থিত হইত। কিন্তু তিনি আমার ভালবাসার তোয়াক্কা রাখেন না, সুতরাং অনৈক্যের একটী কারণ অনুপস্থিত। আমি যদি আবার তাঁহারি ন্যায় সুস্থির প্রকৃতির মানুষ হইতাম, তাহা হইলে হয়ত একত্রে সংসার ধর্ম্ম করা কষ্টকর হইত। পূর্ব্বে আমার মন তোমার প্রতি প্রেমোন্মত্ত ছিল, এক্ষণে মনের এই অবস্থায় উপনীত হওয়া ভালই হইয়াছে। তিনি যদি আমাকে আরো বেশী ভালবাসিতেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত আমার নিকট হইতে অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন না, প্রণয়ের প্রতিদান প্রার্থনা করিতেন, তাহা আমার উত্ত্যক্তিকর হইত। তাঁহার যে বয়স কিঞ্চিৎ বেশী, ইহা বরং ভালই হইয়াছে; কারণ আমি নিজে অন্যের প্রেমে উন্মত্ত, যাহার প্রেমে আমি উন্মত্ত, তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবার নহে; এরূপ স্থলে আমার পক্ষে অন্য এক যুবা পুরুষের সহিত পরিণয় অধিকতর ক্লেশকর হইত। অতএব বৃদ্ধ স্বামীকে বিবাহ করা আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর হইয়াছে।”

পূর্ব্বরাগ ব্যতিরেকে দাম্পত্য সুখের কি চিত্র, তাহা রুসো উত্তমরূপে আঁকিয়াছেন। সেই প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়া রচয়িতা ঐ রূপ দেশাচারকে লোকের চক্ষে আরো জঘন্য ও হেয় করিবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন কি না, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা ভার। কিন্তু যাহাই হউক, যে সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি পূর্ব্বরাগকে নিতান্ত অনাবশ্যক জ্ঞান করেন এবং দাম্পত্য-সুখের দৃঢ়ীকরণ পক্ষে উহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,

তাঁহারা প্রত্যুদাহরণ (exception) হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ করিয়াছেন। যেমন মনে কর, যদি কেহ বলে যে ছাগল জাতি গরু অপেক্ষা ছোট, হয়ত কোন এক তার্কিক পুরুষ কোথাও হইতে বৃহৎ এক রামছাগল হাজির করিয়া এবং এক মড়ুঞ্চে গাই বাহির করিয়া দেখাইয়া দিবেন যে, ছাগলের চেয়ে গরু ছোট। যদি কেহ বলে যে, ইংরেজের চেয়ে বাঙ্গালি কাল; সেই তার্কিক হয়ত কোন স্বভাবপিঙ্গল (albino) বাঙ্গালি ও কোন জাহাজের রসিটানা গোরা, দুজনকে পাশাপাশি খাড়া করিয়া দিয়া প্রমাণ করিবেন যে, বাঙ্গালি ইংরেজের চেয়ে ফর্শা। পূর্ব্বরাগ-বিরোধী কৃত্তবিদ্যগণ ঠিক্ সেইরূপে বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে দেখেন যে, ইংরেজদিগের মধ্যে দম্পতী-বিচ্ছেদ সময়ে সময়ে অতি কৌতুকাবহ মূর্ত্তি ধারণ করে, তদ্দৃষ্টে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উক্তি করিতে থাকেন যে, আর কি? এই ত পূর্ব্বরাগবিবাহের পরিণাম? ইহার চেয়ে আমাদের মা বাপের দেওয়া বিবাহ ঢের ভাল। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, ইংলণ্ডের চারি কোটি ইংরাজজাতির দাম্পত্য সুখের অবস্থা কি প্রকার, তাহা কি ঐ দুটী দশটী দৃষ্টান্ত দ্বারা সাব্যস্ত হয়? মা বাপের দেওয়া বিবাহেতে যে দাম্পত্য সুখ আদৌ অঘটনীয়, তাহা কেহই বলিতে চাহে না; কিন্তু যে স্থলে দাম্পত্য সুখ হয়, যাদৃচ্ছিক নিয়মে হয়; হওয়া না হওয়ার সম্ভাবনার উপর মানুষের কিছুই বিবেচনা চলে না। এই 'মানুষের বিবেচনা' চলার কথা মুখে উচ্চারণ করিয়াই আমি শত শত তার্কিকের বাক্যস্রোত স্মরণ করিতেছি; সেই স্রোত প্রতিরোধ করা আমার সাধ্য নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হওয়া কর্ত্তব্য যে, ইহাও একটী রুচির কথা; রুচি সকলের সমান নহে; কেহ কেহ এরূপ উদারপ্রকৃতি যে, যে ব্যক্তির সঙ্গে বল, সে দিব্যি আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতে পারে। বঙ্কিম বাবুই কে জানে, আর দশ টাকা বেতনের রিবিট্ম্যানই কে জানে; আলাপ কুশলের জন্য তাহার লোক বাছিবার দরকার নাই। তেমনি কেহ কেহ এরূপ সরলস্বভাব, যে যাহার সহিত আজীবন ঘরকন্না, তাহাকে দেখিতে শুনিতে চাহে না, সচ্ছন্দে ঘরকন্না করিবে। ফলতঃ এদেশে ঐ উদারতাই বিশ্বজনীন, তদ্বিপরীত প্রকৃতি বিরল।

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

আকবর সাহের খোস্‌রোজ।

আজ কত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে—আক্‌বরের পবিত্র অস্থি সেকন্দ্রার শীতল, অন্ধতমসাবৃত গহ্বরে নির্জ্জনতা পরিবেষ্টিত হইয়া চির বিশ্রাম করিতেছে—সে দিল্লীর মনোহর উৎসবের দিন স্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় চলিয়া গিয়াছে—সম্রাটের সাধের আগরায় কালের কঠোর হস্ত পড়িয়াছে, তথাপি খোস্‌রোজের নাম মনে হইলেই মোগল-কুল-রবি বাদসাহ শ্রেষ্ঠ মহাত্মা জালাল উদ্দীন আকবরের পবিত্র নাম আমাদের স্মৃতি পথে উদিত হয়। আকবর যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ততদিন "খোস্‌রোজে" "নওরোজে" রাজধানীর আনন্দ কোলাহল কখনও মৃদু ভাবধারণ করে নাই। বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সময়েও ইহার উৎসময়ী ভাব সমান ভাবে বর্ত্তমান ছিল। সাহজাহান ও আরঙ্গীব এ সম্বন্ধে ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। কিন্তু আকবর যাহা করিয়াছিলেন, আর কেহই সেরূপ করিতে পারেন নাই। একদিনের খোস্‌রোজে কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছিল, আজ আমরা তাহারই বর্ণনা করিব।

নূতন মোগল সম্রাট আকবর সাহা কয়েক বৎসর হইল নিজ হাতে সমস্ত শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। যে পবিত্র প্রজারঞ্জন ব্রতে তাঁহাকে চিরকালের জন্য অমরত্ব প্রদান করিয়াছে, ভারতের বাদসাহ কুলের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছেন, "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলিয়া কথিত হইয়াছেন, সেই ব্রত শিরে ধরিয়া—সেই কঠোর কর্ত্তব্য-চালিত হইয়া বাদসাহ রাজ্যের চারি দিকেই ক্রমশঃ শান্তি স্থাপন করিয়া তাহার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিতেছিলেন। রাজ্যের চারিদিকেই সেই সময়ে শান্তির প্রভাব লক্ষিত হইতেছিল। সুতরাং বাদসাহ একদিন প্রফুল্লচিত্তে খোস্‌রোজের হুকুম দিলেন।

খোস্‌রোজ রমণীর বাজার—রূপের বাজার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উচ্চপদস্থা সম্ভ্রান্ত রমণী মণ্ডলীই এই বাজারের পণ্য বিক্রয়কারিণী। স্বয়ং বাদসাহ ও তাঁহার বেগমগণ ইহাতে ক্রেতা। একজন ক্রেতাকে এই শত সহস্র উচ্চপদস্থ রমণীর দ্রব্য-জাতের অধিকাংশই কিনিতে হইত। যাঁহার কপাল-জোর বেশী, তাঁহার পণ্য দ্রব্যের তিলমাত্র অবশিষ্ট থাকিত না। স্বর্ণ মুদ্রা এই বাজারের প্রচলিত মুদ্রা—অন্য ধাতু ইহার সীমান্তবর্ত্তী হইবার আদেশ ছিল না।

চারিদিক হইতে বাদসাহের আদেশ ও ইচ্ছানুসারে আমীর ওমরাহদিগের রমণী মণ্ডলী, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ রাজপুত ও মারওয়ারীদিগের অন্তঃপুরিকাগণ এই রূপের বাজারে দলে দলে আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রধান প্রধান রাজপুত সামন্ত নরপতি ও উচ্চপদস্থ হিন্দু সেনানীদের স্ত্রী কন্যারাও বাদসাহের অন্তঃপুর আলোকিত করিতে আসিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি খোস্‌রোজ রূপের বাজার—রাজ্যের প্রধান প্রধান

অসূর্য্যম্পশ্যা সুন্দরীরা দ্রব্যজাত লইয়া মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর উপর সাজাইয়া চারিদিকে সৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে লাগিলেন। প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ মহিলাগণের অস্ফুট কথোপকথনের মৃদু কোলাহল, ভূষণ-সিঞ্জন, মৃদু হাস্যোচ্ছাস্‌ ও মধুর বাদ্য ঝঙ্কারে আমোদিত হইল।

কোথাও বা সুদৃশ্য কারুকার্য্যময় মর্ম্মর প্রস্তর বেষ্টিত বৃক্ষ মূলে বিটপি-শাখা সংলগ্ন দোদুল্যমান মণিখচিত চন্দ্রাতপ তলে বসিয়া কোন সম্ভ্রান্তা রমণী পণ্য-বীথিকার দ্রব্য সমূহ ঝাড়িয়া পুঁছিয়া সাজাইয়া রাখিতেছেন ও সেই সকল সজ্জা কিরূপ হইল, তাহা দেখিবার জন্য সঙ্গিনীকে ইঙ্গিত করিতেছেন—কোথাও বা ফোয়ারা-সংলগ্ন লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত মনোহর ক্ষুদ্র বারদ্বারীর ভিতরে কোন ওমরাহের কন্যা স্বীয় বিপণি-সজ্জায় মুগ্ধপ্রায় হইয়া সেই ফুল্ল অধর প্রান্তদ্বয় টিপিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিতেছেন—নিকটে উচ্ছসিত ফোয়ারার শীতল শীকরপুঞ্জ মৃদুবায়ু ধীর ভাবে বহিয়া আনিয়া তাঁহার চারিদিকে ছড়াইতেছিল, তথাপিও সুন্দরী সাতিশয় নিদাঘ সন্তপ্তা বোধ করিতেছিলেন, কখনও বা সেই চম্পক কলি বিনিন্দিত ক্ষুদ্র অঙ্গুলিযুক্ত হাতখানি দিয়া পেশোয়াজের অঞ্চল ধরিয়া আপনাপনি ব্যজন করিতেছিলেন—আবার কখনও বা দ্রুত ব্যজনের জন্য সহচরীকে তাড়না করিতেছিলেন। কোথাও বা বংশ-গৌরবোন্মত্তা কোন রাজপুত মহিলা হংসীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া কোকিল-কাকলী বিনিন্দিত স্বরে কোন বেগ-মের সহিত বিক্রয়োপযুক্ত পণ্যের দরের জন্য মৃদু ভাবে বচসা করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা অদূরে বাদসাহকে আসিতে দেখিয়া লজ্জারক্তিম প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন।

একটী প্রস্ফুটিত বৃক্ষতলে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর উপর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া একটী ষোড়শী মৃদুহাস্য করিতে করিতে নিকটস্থ কোন পণ্য-বীথিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। পশ্চাৎ দিক হইতে বৃক্ষান্তরালে একটী পুরুষমূর্ত্তি আসিয়া পার্শ্ব হইতে সেই আনন্দিত রূপরাশি অনিমেষ নয়নে দেখিতেছিলেন। পুরুষমূর্ত্তি ফকিরের বেশ পরিধান করিয়াছেন। অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় হরিতবর্ণ উষ্ণীষ তাঁহার মস্তক শোভা করিয়া রহিয়াছে, গলদেশে তবলকীর অনুকরণে বহুমূল্য মণিময় মালা দুলিতেছে, সূক্ষ্মবসন মধ্য দিয়া সেই তেজস্বী পুরুষের রূপ-জ্যোতিঃ ফাটিয়া বাহির হইতেছে, তিনি বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ ভাবে নির্নিমেষ লোচনে মুগ্ধবৎ সেই সৌদামিনী মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন।

বৃক্ষ তলস্থা সুন্দরী এই ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি সহসা পশ্চাদ্‌দৃষ্টি করিলেন, তাঁহার প্রফুল্ল কমলবৎ মুখমণ্ডল ঘোরতর লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। মৃণাল নিন্দিত ভুজে অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিলেন। ফকিরকে বৃক্ষতলস্থা সুন্দরী দর্শনমাত্রেই চিনিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বিক্রয় কার্য্য এক প্রকার শেষ হইয়া

আসিয়াছিল সুতরাং সলজ্জে, ত্রাস্তে বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিলেন—মুহূর্ত্ত মধ্যে শিবিকা আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন ফকির কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

ফকির বেশধারী সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে প্রাণ হারাইয়া দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দিন পরিভ্রমণে তিনি এক্ষণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঞ্জামও এ ক্লান্তির অবস্থায় আর ভাল লাগে না—সুতরাং প্রাঙ্গণ সংলগ্ন একটী সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত কক্ষে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে কতকগুলি রূপবতী যুবতী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; ফকির তাহাদের একজনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"দৌলত উন্নিসা! ফোয়ারার পূর্ব্বধারে বৃক্ষতলে যে রাজপুত সুন্দরী বসিয়াছিল, সে যোধপুরের মালদেবের কন্যা—উদয়সিংহের ভগিনী। আমাকে দেখিয়া শিবিকারোহণে চলিয়া গেল, বোধ হয় এতক্ষণে প্রথম প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে নাই—তুমি শীঘ্র গিয়া দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের দ্বার বন্ধ করিবার জন্য হুকুম দিয়া আসিবে। দ্বিতীয়টী ছাড়াইয়া গিয়া থাকে, তবে তৃতীয় প্রাঙ্গণের ক্ষুদ্র দ্বার বন্ধ করিতে বলিও।" স্বয়ং দৌলত বেগম, "যে আজ্ঞা জাঁহাপনা" বলিয়া ফকিরের হুকুম তামিল করিতে প্রস্থান করিল। ফকির নিকটস্থ এক সুসজ্জিত শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সেই ফকির বেশ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল—তবলকীর মালার পরিবর্ত্তে বহুমূল্য মণিময় আভরণে সেইকান্তি পুষ্টিময় বাহু যুগল আবৃত হইল, কোষে বহুমূল্য তরবারি ঝুলিল, মস্তকের উপর সূক্ষ্মবস্ত্রময় হরিতাভ উষ্ণীষের পরিবর্ত্তে মণিখচিত শিরস্ত্রাণ শোভা পাইল—আকবর সাহ ফকিরের বেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে তাঞ্জামে চড়িলেন; যুবতী বাহিকারা পূর্ণতেজে তাঞ্জাম লইয়া দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের উদ্দেশে ছুটিল। আকবর সাহ দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—তখনও যোধপুরের মাল দেবের কন্যা তথায় আসিয়া উপস্থিত হন নাই। বাদসাহ প্রফুল্লিত চিত্তে সেইস্থলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কুমারী যোধবাই বাদসাহের হুকুম কিছুই শোনেন নাই—সুতরাং শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে নিশ্চিন্ত মনে চারিদিক দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছেন। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের প্রথম দ্বারে প্রবেশ করিলেন—এই দ্বার দিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে আসা যায়—চারিদিকে ফোয়ারার মধুর জলোচ্ছাস শব্দ অদূরস্থ সারঙ্গের প্রাণস্পর্শী তানের সহিত মিশিয়া আসিয়া রাজকন্যার শ্রবণ সুখ সম্পাদন করিতেছিল। উপরে অনন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ, নিম্নে সুগন্ধি মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুবিস্তৃত কারুকার্য্যময় সুগন্ধি জল পরিপূর্ণ চৌবাচ্ছা—চারিপাশে গগনস্পর্শী অমরাবতী বিনিন্দিত প্রাসাদরাজি—যোধপুর বালা এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্কভাবে আসিতেছিলেন।

প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় দ্বার দিয়া বাহির হইবার পথ। রাজকুমারী দ্বিতীয়

দ্বারের সন্নিকটস্থা হইলেন, দেখিলেন সে দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়,তৃতীয় ও চতুর্থ-দ্বার অতিবাহিত করিলেন, সকলই পূর্ব্ববৎ দৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ। ব্যাকুল হইয়া পঞ্চম দ্বারে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন—স্বয়ং বাদসাহ তাঞ্জাম ছাড়িয়া নীচে দাঁড়াইয়া সেই দ্বার মুখে অপেক্ষা করিয়া—মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

মারবার সুন্দরী বাদসাহের এই ভাব দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, সেই আরক্তিম মুখমণ্ডলে একটু অপ্রসন্নতা ও বিরক্তির আবির্ভাব হইল—ক্ষীণ কণ্ঠে, লজ্জা বিজড়িতস্বরে বলিলেন—"জাঁহাপনা! পথ ছাড়িয়া দিন, বাহিরে যাই—আপনার এস্থলে এপ্রকার ভাবে দাঁড়ান ভাল দেখায় না। হিন্দুস্থানের রাজদণ্ড যে অমিত বলশালী হস্ত চালনা করিতেছে, তাহার অপরিমেয় বল এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রমণীর প্রতি প্রয়োগ করিলে কোন পৌরুষত্ব নাই—পথ ছাড়িয়া দিন।"

বাদসাহ এই মৃদু ভর্ৎসনায় ঈষৎ লজ্জিত হইলেন ও সেই লজ্জা বিমুগ্ধা ঈষৎ রোষ পরায়ণার লোহিত রাগ-রাঞ্জিত মুখমণ্ডলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। স্বীয় অস্তিত্ব ও গুরুত্ব বিস্মৃত হইয়া সেই মণি খচিত উষ্ণীষ খুলিয়া রমণীর পদতলে অর্পণ করিলেন; প্রকাশ্যে বলিলেন—"সাহস করিয়া বলিতেও শঙ্কা হইতেছে, মারবারের রাজ কন্যার সম্রাটের অঙ্কলক্ষী হইবার কি কোন আপত্তি আছে? আমার পদতলে সমস্ত হিন্দুস্থান, আমার উষ্ণীষ যাহার পদতলে বিলুণ্ঠিত—না জানি তাহার ক্ষমতা কত?"

যোধপুরের রাজ কন্যা বাদসাহের এই প্রকার অসম্ভব বিনয়পূর্ণ ভাব দেখিয়া ক্রোধ ভুলিয়া লজ্জা বিকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"জাঁহাপনা! জানেন ত—হিন্দু-রমণীর এসব বিষয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার কোনই ক্ষমতা নাই। 'পিতা মাতা ও তাঁহাদের অবর্ত্তমানে ভ্রাতাই এ সম্বন্ধে যথাযথ উত্তর দিতে পারেন। আমায় পথ ছাড়িয়া দিন, আমি চলিয়া যাই।"

"আচ্ছা কাল প্রভাতেই মারবারের উদয় সিংহের নিকট দূত প্রেরিত হইবে। যোধ-পুর সুন্দরি! দাসের এ অশিষ্টতা মার্জ্জনা করিলে বল—নচেৎ এ দ্বার পরিত্যাগ করিব না।"

সুন্দরী সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি-ব্যঞ্জক উত্তর দিয়া শিবিকারোহণে প্রস্থান করিলেন। আকবরসাহ মনে মনে ভাবিলেন উদ্ধৃত রত্ন দুর্ব্বুদ্ধি প্রভাবে ইচ্ছা করিয়া অতল জলধিজলে বিসর্জ্জন করিলাম। যাহা হউক তৎপর দিন প্রত্যূষে উদয়সিংহের নিকট দূত প্রেরিত হইল, বাদসাহের দূত বিবাহের প্রস্তাব লইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই যোধপুরে উপস্থিত হইল। উদয় সিংহ তখন যোধপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা মালদেব জীবিত থাকিলে এ বিবাহ কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিতেন কি না, তাহা সন্দেহ স্থল; কিন্তু উদয় সিংহ বিনা আপত্তিতে সম্রাটের প্রসাদভাজন হইবার আকাঙ্ক্ষায় উল্লিখিত প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়া "উদয়" নামের দুর্ব্বলতা দেখাই-

লেন। উপযুক্ত সময়ে ভ্রাতার সম্মতিক্রমে উদয় সিংহের ভগিনী যোধবাই ভারতেশ্বর জালাল উদ্দীন আকবরের অঙ্কলক্ষ্মী হইলেন। সমস্ত গর্ব্বিত রাঠোরকুল এই ব্যাপারে অবনত মস্তক হইলেন। এই যোধবাইই ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট জাহাঙ্গীরের গর্ভধারিণী। *

জাহাঙ্গীরের জন্ম প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যভুক্ত না হইলেও তদ্বিষয়ে একটী আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে বলিয়া আমরা তাহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি।

যোধবাই ভবিতব্যবশে যবন সম্রাটের অঙ্কলক্ষ্মী হইলেও তিনি হিন্দু রমণী—হিন্দুর তেজস্বী রক্তের সহিত তাঁহার মধ্যে হিন্দু রমণীর কোমলতা, পরোপকারিতা, দেশ-হিতৈষিতা, পর দুঃখ কাতরতা প্রভৃতি সমস্ত গুণই বর্ত্তমান ছিল। নিজ কার্য্য গুণে তিনি আক্‌বর সাহের সর্ব্ব প্রধানা মহিষী হইয়া উঠিলেন। রমণী হইয়াও তিনি আক্‌বরের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বাদসাহকে রাজকার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে যাহাতে হিন্দু প্রজার মান সম্ভ্রম ও ধর্ম্মরক্ষা হয়—তাহারা স্বাধীন ভাবে স্বস্ব ধর্ম্ম প্রণালী অনুমোদিত কার্য্য কলাপ অনুষ্ঠান করিতে পারে—যোধবাইএর ইহাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। আকবরের বিশাল সাম্রাজ্যে হিন্দু ও মুসলমানের স্বাভাবিক পার্থক্যভাব দূরীকৃত করিবার মূল কারণই সাম্রাজ্ঞী যোধবাই। ইহা তিলমাত্র অমূলক নহে—বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে যোধবাইয়ের অলক্ষ্য হস্ত সদা সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত করিত।

রূপগুণ শালিনী যোধবাইকে পাইয়া আক্‌বর সাহ সকল বিষয়ে সুখী হইলেন বটে কিন্তু অনপত্যতা ক্লেশ তাঁহাদের সেই দাম্পত্য সুখ নষ্ট করিল। প্রধানা মহিষী যোধবাইয়ের বন্ধ্যা দোষ অপনয়নের জন্য বাদসাহ দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানে মনোযোগ প্রদান করিলেন। এই সময়ে আজমীরে মৈনউদ্দীন নামে একজন সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেন। এই বিখ্যাত যোগীর আশীর্ব্বাদ লইতে আকবরসাহ আজমীরে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলেন। পুত্রাভিলাষী কোন ব্যক্তি এই সিদ্ধ পুরুষের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে সমস্ত পথ সস্ত্রীক পদব্রজে অতিবাহিত করিয়া তাঁহার

* মারবারেশ্বর উদয় সিংহ এই ব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ করিলেন। আকবর সাহ এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইয়া একমাত্র আজমীর ভিন্ন মারবারের মোগলাধিকৃত আর সমস্ত জনপদ, নগর ও পল্লী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত মালবের কতকগুলি সমৃদ্ধি সম্পন্ন জনপদ তাঁহার হস্তগত হইল। মোগল ভগিনীপতির সেনাবল প্রাপ্ত হইয়া উদয় গর্ব্বিত সামন্ত বর্গের ক্ষমতা খর্ব্ব করিলেন ও প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের পক্ষচ্ছেদ করিলেন। প্রাচীন ভূম্যাধিকারী ও উপসামন্তবর্গের ভূমি সম্পত্তিগুলি কাড়িয়া লইলেন। তাঁহার রাজকোষ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্ফীত হইয়া উঠিল।

নিকট উপস্থিত হইতে হইত। পুত্রাভিলাষ কার্য্যে যানারোহণে বা অন্য কোন বাহনে গমন করা মৈনউদ্দীনের আজ্ঞার বিরুদ্ধ। এই সমস্ত অসুবিধা ও অসম্ভাবিতা সত্ত্বেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বাদসাহ রাজ্ঞীকে লইয়া পুত্রকামনায় এই সার্দ্ধ তিন শত ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিয়া দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন।

প্রতিদিবস সুবৃহৎ কানাতের মধ্য দিয়া রাজ্ঞা ও বাদসাহ তিনক্রোশ করিয়া চলিতে লাগিলেন। অগ্র পশ্চাৎ শত সহস্র অশ্ব পদাতি কুচ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। রাজ্ঞীর পদদেশে পথ ভ্রমণ জন্য ক্ষত হওয়া সম্ভাবনায় ভূমিতলে কার্পেট বিছাইয়া দেওয়া হইল। বাদসাহ ও যোধবাই যে যে স্থলে আড্ডা করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, সেই সমস্ত স্থলেই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ এক একটী ইষ্টকময় স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বাদসাহ পুত্রকামনায় সেই অসূর্য্যম্পশ্যারূপিণী যোধবাইকে সঙ্গে লইয়া আজমীরে পৌছিলেন। আজমীরের পাহাড়ে পৌছিয়া বাদসাহ মৈনউদ্দীনের সন্ধানে চারিদিকে অনুচর পাঠাইলেন। এইস্থলে তাঁহার বিশ্রামের জন্য আয়োজন করা হইল। নিদ্রাভিভূত বাদসাহ রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখিলেন শ্বেতশ্মশ্রু মৈনউদ্দীন তাঁহাকে বলিতেছেন "বৎস! আজমীরে আসায় তোমার পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে। ফতেপুর শিক্‌রীতে সেখ্ সলিম নামে এক বৃদ্ধ ফাকর আছেন, তিনিই তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ করিবেন।" সেই দিন অতি প্রত্যুষেই কুচ ভাঙ্গিবার আদেশ হইল।

কয়েকদিন পরে বাদসাহ ফতেপুর শিক্‌রীতে উপস্থিত হইলেন। নবতি বর্ষীয় শ্বেতশ্মশ্রু ভারাক্রান্ত সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ ফকির সেখ সলিমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকির বলিলেন, "জাঁহাপনা আপনার মনোভিষ্ট অচিরাৎ পূর্ণ হইবে, রাজ্ঞী গর্ব্ভবতী হইয়াছেন, এই গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে দীর্ঘজীবি ও ভুবন বিজয়ী হইবে।" বাদসাহ রাজ্ঞীর গর্ব্ভলক্ষণ দেখিয়া এই ভবিষ্যৎ বাণীর সার্থকতা বিবেচনা করিয়া প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত সেই বন্য জঙ্গল সমাবৃত ফতেপুর শিক্‌রীর পার্ব্বত্য প্রদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভারতের প্রধান সম্রাট আকবরসাহ প্রচণ্ড বালুকায় মরুভূমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভাবীবাদসাহ জাহাঙ্গীরও ফতেপুর শিক্‌রীর বন প্রদেশে সন্ন্যাসীর গুহার পার্শ্বে শিবির নিম্নে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ফকিরের নাম অনুসারে সদ্যোজাত বালকের নাম মির্জা সলিম রাখা হইল। এই বালকই ভবিষ্যতে "জাহাঙ্গীর" বা "জগৎ-বিজয়ী" বলিয়া ভারত ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ফতেপুর শিক্‌রী ইহাঁর পর দুর্ভেদ্য পর্ব্বতময় জঙ্গলপূর্ণ স্থান হইতে মনোহর পর্ব্বতনিবাসে পরিণত হয়। আজ-কাল ইহা ভগ্নপ্রায় হইয়াছে তথাপি দূর হইতে দেখিলে ফতেপুর শিক্‌রী আকাশের গায় অলংকার মত বিশাল অথচ সুন্দর দেখায়। এস্থান দেখিতে গেলে আজও রক্ষকেরা সলিম্ সাহেবের আস্তানা ও যেখানে জাহাঙ্গীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া দেয়।

কর্ণেল টড্ সাহেবের মতে আহাম্মদ নগর পতনের পরেই (১৬০০ খৃঃ) মহারাজ্ঞী যোধ বাইএর মৃত্যু হয়। প্রিয়তমা রাজ্ঞীর বিরহে দৃঢ়মতি আক্‌বর অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—সমস্ত রাজকার্য্য বন্ধ হইয়া পড়িল। যোধ বাইএর জন্য শোক প্রকাশ করিবার কারণ বাদসাহ সমস্ত প্রধান প্রধান হিন্দু ও মুসলমান আমীর ওমরাহগণকে গোঁফ দাড়ি কামাইতে আদেশ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সরকার হইতে ক্ষৌরকারও নিযুক্ত হইল।

যোধ বাইএর স্মরণ চিহ্ন সংস্থাপনার্থ তাঁহার সমাধির উপর বাদসাহ এক অত্যুচ্চ কারুকার্য্যময় স্মরণ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, সময় পাইলেই নির্জ্জনে আসিয়া সেই পবিত্র সমাধির উপর অশ্রু বর্ষণ করিতেন। যোধ বাইএর মৃত্যুর বৎসর আকবর সাহ "খোস্‌রোজের" উৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন। সমাধি মন্দিরের চারিদিক অত্যুচ্চ প্রাচীর ও রক্ষীদ্বারা সুবেষ্টিত করা হইল। যতদিন আকবর ছিলেন—যতদিন জাহাঙ্গীর ছিলেন, ততদিন ইহার পবিত্রতা প্রহরীরক্ষিত হইয়া চিরকাল সমান ভাবে ছিল। অভিমানী জাহাঙ্গীর নিজ জীবন বৃত্তান্তে বৃথা অভিমানে মাতৃ নামের উল্লেখ না করিলেও মাতার পবিত্র অস্থির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সমাধি মন্দির দেখা যাইত বটে কিন্তু ইংরাজের আমলে স্থানীয় ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ইহার চতুপার্শ্বস্থ উন্নত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহা নিয়মিত দরে বিক্রয় করিয়া অর্থ পিপাসা শান্তি করিয়াছেন। প্রকৃত সমাধি মন্দিরটী গোলন্দাজদের Mining শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। হায়! কালের কি কঠোর পরিবর্ত্তন! যে সমাধি মন্দির দিল্লীশ্বরের জীবনের প্রিয় বস্তু ছিল, যেস্থলে তিনি নীরবে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন—যেখানে কাক পক্ষীরও যাইবার যো ছিল না—সেই স্থলে ইংরাজরাজ কাল পরিবর্ত্তনে গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

ভুল।

সবাই সবারে বোঝে ভুল!
এ কি রে রহস্য অভিনয়?
পলকে পলকে হুলস্থুল,
ধরাখানি ইন্দ্রজালময়।
পাইয়াও পাইনি বলিয়া,
ভুলে যাই কাছে হতে দূরে!
ফেলিয়া সরল পথ খানি—
আঁকাবাঁকা টিবি মরি ঘুরে।

এ কাহার অভিশাপ নাকি?
—নহে কেন এমনিই হয়,
বিশ্বাস ত কেহ নাহি করে!
বিশ্বাসিতে চাহে না হৃদয়!
তবু মরি কাছে কাছে টেনে!
জাগাইয়ে বিশ্বাসের আঁখি,
কি বলিব কৃত প্রাণপণে
পলাতক মন বেঁধে রাখি!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

মানবীকরণ ANTHROPOMORPHISM

ঈশ্বরেতে মানুষিকতা অর্থাৎ মনুষ্যের গুণ আরোপ করা সংক্ষেপে মানবীকরণ বলিয়া সংজ্ঞিত হইল। অনেকের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরেতে চেতন-ধর্ম্ম আরোপ করা মানবী করণ, যেহেতু চেতন-ধর্ম্ম মনুষ্য প্রথমতঃ আপনাতেই উপলব্ধি করে। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরেতে অচেতন-ধর্ম্ম আরোপ করা ভিন্ন—ঈশ্বরকে অন্ধ জড়-সত্তা-রূপে প্রতিপাদন করা ভিন্ন—আর আমাদের গত্যন্তর থাকে না। এইরূপ করিয়া আমরা মানবীকরণের হস্ত হইতে রক্ষা পাই বটে, কিন্তু কিসের জন্য ? জড়ীকরণের অন্ধকূপে নিপতিত হইবার জন্য ! মনুষ্য অপেক্ষা প্রস্তর পাষাণ উৎকৃষ্ট না অপকৃষ্ট—মানবীকরণ অপেক্ষা জড়ীকরণ ভাল না মন্দ ? পাছে সৃষ্ট বস্তুর কোন গুণ ঈশ্বরেতে আরোপ করা হয়, এই ভয়ে তুমি তাঁহাকে সচেতন পুরুষ বলিতে অনিচ্ছুক ; কিন্তু শুধু কি কেবল মনুষ্যই একা সৃষ্ট বস্তু—জড় বস্তু কি সৃষ্ট বস্তু নহে ? ঈশ্বরেতে মনুষ্য-ধর্ম্ম আরোপ করিতে তুমি বড়ই কুণ্ঠিত, অথচ তাঁহাতে জড়ধর্ম্ম আরোপ করিতে তুমি একটুও কুণ্ঠিত নহ, ইহার অর্থ কি ? মানুষিকতা অপেক্ষা জড়তা কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী—মনুষ্য অপেক্ষা প্রস্তর-পাষাণ কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী—চেতন অপেক্ষা অচেতন কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী ? প্রস্তর-পাষাণ অপেক্ষা মনুষ্য যদি উৎকৃষ্ট হয়—অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান যদি উৎকৃষ্ট হয়—তবে অবশ্য জ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়াই মনুষ্যের ঊর্দ্ধ-গতি, এবং অজ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়াই মনুষ্যের অধোগতি ; এখন জিজ্ঞাসা এই যে, ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়—ঊর্দ্ধগতির পথ না অধোগতির পথ—জ্ঞানের পথ না অজ্ঞানের পথ ? ঈশ্বর স্বয়ং যদি অজ্ঞান হ'ন—তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকটস্থ হইতে হইলে কাজেই অধোগতির পথ—অজ্ঞানের পথ—অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ অধোগতির পথই যদি শ্রেয়ের পথ হইত, তাহা হইলে পৃথিবী উল্টিয়া যাইত ; তাহা হইলে মনুষ্য পৃথিবীর মস্তকের উপর হইতে পদপ্রান্তে নিপতিত হইত এবং প্রস্তর পাষাণ পৃথিবীর পদপ্রান্ত হইতে মস্তকের উপরে আরোহণ করিত কেননা ঈশ্বর স্বয়ং প্রস্তর পাষাণের সমধর্ম্মী।

প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বরকে সচেতন পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি করা মানবীকরণ নহে—মানবীকরণের অর্থ স্বতন্ত্র। জড়-বস্তুর সত্তা আছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু তাহা বলিয়া কি ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিলেই ঈশ্বরেতে জড়-ধর্ম্ম আরোপ করা হয়—না মনুষ্যের সত্তা স্বীকার করিলেই মনুষ্যেতে জড়-ধর্ম্ম আরোপ করা হয় ? জড়-বস্তুর যেমন সত্তা আছে তেমনি তাহার অচেতনতা আছে। সত্তা কিছু আর জড়-বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম নহে—অচেতনতাই জড়বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম ; সত্তা নহে কিন্তু অন্ধ সত্তা—জড়বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম। মনুষ্যেতে যদি অন্ধ সত্তা আরোপ করা যায়, তবেই মনুষ্যেতে

জড়-ধর্ম্ম আরোপ করা হয়; ঈশ্বরেতে যদি অন্ধ সত্তা আরোপ করা যায়, তবেই তাঁহাতে জড়ধর্ম্ম আরোপ করা হয়। জড়বস্তুর সত্তা আছে কিন্তু চেতন নাই; এখন দেখিতে হইবে যে, জড়বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম কোন্‌টি—সত্তা না অচেতনতা? যেখানে জীব এবং জড়ের প্রভেদের কথা হইতেছে সেখানে সত্তা কিছু আর জড়বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম নহে—সেখানে অচেতনতাই জড়বস্তুর বিশেষ ধর্ম্ম; তাই জড়-ধর্ম্মের আরোপ—জড়ীকরণ—বলিতে শুদ্ধ কেবল অচেতনতারই আরোপ বুঝায়, সত্তার আরোপ বুঝায় না। মনুষ্যের সত্তা আছে এবং চেতন আছে, কিন্তু পূর্ণতা নাই; এখন দেখিতে হইবে যে, মনুষ্যের বিশেষ ধর্ম্ম কোন্‌টি—সচেতন সত্তা না অপূর্ণতা? যেখানে জীবেশ্বরের প্রভেদের কথা হইতেছে সেখানে সচেতন সত্তা কিছু আর মনুষ্যের বিশেষ ধর্ম্ম নহে, সেখানে অপূর্ণতাই মনুষ্যের বিশেষ ধর্ম্ম; তাই সেখানে মানুষিকতার আরোপ—মানবীকরণ—বলিতে অপূর্ণতারই আরোপ বুঝায়, সত্তা অথবা চেতনের আরোপ বুঝায় না। জড় জীব এবং ঈশ্বর তিনের মধ্যে মূলগত প্রভেদ এই যে, জড়বস্তুর সত্তা অন্ধ সত্তা, মনুষ্যের সত্তা অপূর্ণ সচেতন সত্তা, ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সচেতন সত্তা। ঈশ্বরেতে অন্ধ সত্তার আরোপই জড়ীকরণ, অপূর্ণ সচেতন সত্তার আরোপই মানবীকরণ, পরিপূর্ণ সচেতন সত্তার আরোপই যথার্থ ঈশ্বর-জ্ঞান। সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম; তাহার মধ্যে জড়জগৎ শুদ্ধ কেবল সত্যং মাত্র; মনুষ্য সত্যং জ্ঞানং এই পর্য্যন্ত; ঈশ্বরই কেবল সত্যং জ্ঞান মনন্তং, মনুষ্য কদাপি তাহা নহে; অতএব ঈশ্বরকে সত্যং জ্ঞান মনন্তং বলা মানবীকরণ নহে। পুনশ্চ যদি এইরূপ মনে করা যায় যে, যে সুখের অন্ত আছে—যে সুখ জরামরণ দ্বারা আক্রান্ত—সে সুখ সুখই নহে, অনন্তই সুখ—যেমন "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" যিনি অনন্ত তিনিই সুখ, অল্প কিছুতে সুখ নাই; তবে দাঁড়ায় যে, অনন্তের ভাব—আনন্দ—ঈশ্বরের বিশেষ ধর্ম্ম; আর, পরিমিত ভাব, অপূর্ণতা, নিরানন্দ, জীবের বিশেষ ধর্ম্ম। ঈশ্বরের প্রসাদেই—ঈশ্বরের সহিত যোগেই—জীবের অপূর্ণতা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়, ও জীবের নিরানন্দ ক্রমে ক্রমে স্থায়ী আনন্দে পরিণত হয়। অতএব ঈশ্বরকে সত্যং জ্ঞান মনন্তং বলা যেমন মানবীকরণ নহে, তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলাও তেমনি মানবীকরণ নহে; মানবীকরণ বলি কাহাকে? না ঈশ্বরেতে অপূর্ণতা—নিরানন্দ ভাব—এই-সকল ধর্ম্ম আরোপ করা; ইহাই মানবীকরণ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা নিজে অপূর্ণ হইয়া ঈশ্বরের পূর্ণতা কিরূপে উপলব্ধি করি? ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের সচেতন সত্তা যেমন অনুযোগিতা-সম্বন্ধ অনুসারে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাঁহার পূর্ণতা সেইরূপ প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধ অনুসারে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। আমাদের সচেতন সত্তা ঈশ্বরের সচেতন সত্তারই অনুপ্রকাশ—দুয়ের মধ্যে এইরূপ অনুযোগিতা-সম্বন্ধ; আমাদের অপূর্ণতা ঈশ্বরের পূর্ণতার প্রতি-প্রকাশ—দুয়ের মধ্যে এইরূপ প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধ। আমরা চক্ষে যখন অন্ধকার

দেখি—আমাদের মন তখন যেমন আলোকের দিকে প্রধাবিত হয়; আমরা উদরে যখন ক্ষুধা অনুভব করি—আমাদের মন তখন যেমন অন্নের দিকে প্রধাবিত হয়; সেইরূপ আমরা যখন আমাদের আপনাদের অপূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করি, তখন আমাদের আত্মা ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে প্রধাবিত হয়। ঈশ্বর যেমন আমাদের চক্ষুর আকিঞ্চন সূর্য্যালোক দিয়া পূর্ণ করেন, উদরের আকিঞ্চন অন্ন দিয়া পূর্ণ করেন, শিশুর আকিঞ্চন মাতাকে দিয়া পূর্ণ করেন, সেইরূপ আত্মার আকিঞ্চন আপনাকে দিয়া পূর্ণ করেন। কঠোর বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে, এ কেবল আমাদের হৃদয়ের আকিঞ্চন-মাত্র—কবিতা মাত্র; প্রকৃত সত্য যে কি তাহা ঠিক্ করা সুকঠিন। কোন চিন্তা নাই! সুকোমল হৃদয় একাকী অসহায় পড়িয়া নাই—কঠোর জ্ঞান তাহার হস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানের কথায় বিশ্বাস করা চাই; সহস্র বৈজ্ঞানিক হউন্ না কেন—তিনি যদি তাঁহার আপনার জ্ঞানের কথায় আপনি বিশ্বাস না করেন—তবে তাঁহার সহিত কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি-রই কথাবার্ত্তা চলিতে পারে না। দুই বিন্দুর মধ্যে একের অধিক সরল রেখা সম্ভবে না—এ কথাটিতে যিনি অবিশ্বাস করেন, কোন শিক্ষকই তাঁহাকে জ্যামিতি শিখাইতে পারে না; তেমনি, সসীম আকাশ-মাত্রই অসীম আকাশকে অপেক্ষা করে, সাবলম্ব-মাত্রই নিরবলম্বকে অপেক্ষা করে—অপূর্ণ মাত্রই পূর্ণকে অপেক্ষা করে—পরতন্ত্র-মাত্রই স্বতন্ত্রকে অপেক্ষা করে—এ কথাটি শুদ্ধ কেবল কোমল হৃদয়ের কথা নহে কিন্তু কঠোর জ্ঞানের কথা; এ কথায় যিনি বিশ্বাস না যা'ন, তাঁহার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের কর্ম্ম নহে; তিনি তাঁহার আপনার জ্ঞানকেই আপনি মানেন না, আমরা কোথাকার কে যে আমাদের কথায় তিনি কর্ণপাত করিবেন!

বৈজ্ঞানিক বলিবেন সন্দেহ নাই যে, "ও তোমার তত্ত্বজ্ঞান রাখিয়া দেও—বিজ্ঞানের চর্চা কর যে তাহাতে পৃথিবীর কাজ দেখিবে! যাহা ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না তাহা লইয়া সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? বিজ্ঞান ধূম-যন্ত্র ও তাড়িত বার্ত্তাবহ আবি-ষ্কার করিয়া পৃথিবীর কত লোকের কত উপকার সাধন করিয়াছে; তত্ত্বজ্ঞান কাহার কি উপকার করিয়াছে—কই কিছুই তো দেখিতে পাই না—তত্ত্বজ্ঞানের শুধু কেবল বকাবকি ঝকাঝকিই সার!" ইহার উত্তর এই যে, সকল জ্ঞান যে—সকল রকমে—পৃথিবীর উপকার সাধন করিবে, এরূপ প্রত্যাশা করাই অন্যায়। গণিত বিদ্যা কিছু আর মনুষ্যের জ্বর-রোগ শান্তি করিতে পারে না; জ্যোতিষ বিদ্যা কিছু আর মনুষ্যের পুত্র শোক নিবারণ করিতে পারে না। যেরূপে মনুষ্যের দুঃখ নিবারণ করা তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারায়ত্ত, সেইরূপেই সে মনুষ্যের দুঃখ নিবারণ করিতে পারে এবং করেও। "অস্থায়ী সাংসারিক সুখ এক সময়ে যেমন সুখ—সময়ান্তরে তেমনি দুঃখ, অতএব শরীরাদি হইতে যত নির্লিপ্ত থাকিতে পার চেষ্টা করিবে ও পরমাত্মাতেই চিরস্থায়ী সুখের মূল পত্তন করিবে" এ কথা কে বলে? অবশ্য তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু এ কথায়

আমরা যদি বিশ্বাস না করি, তবে সে দোষ তত্ত্বজ্ঞানের নহে। শুষ্ক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন সাংসারিক কার্য্য-নির্ব্বাহের পক্ষে ব্যাঘাতজনক। কিন্তু তাঁহার সে কথার কোন অর্থ নাই। অনেক লোক এমন আছেন যাঁহারা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনায় অষ্ট প্রহর মাথা বকাইয়া কাজের বা'র হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু সে দোষ কি বিজ্ঞানের দোষ? তত্ত্বজ্ঞান কিছু আর মনুষ্যকে কর্ত্তব্য-সাধনে অবহেলা করিতে পরামর্শ দেয় না—তত্ত্বজ্ঞান উল্টা আরো এই কথা বলে যে, যত পারো অবিচলিত চিত্তে—অনাসক্ত মানসে—কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিবে, মনকে আত্মার বশে রাখিয়া—আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত রাখিয়া—সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ কবিবে।" ইহা সত্ত্বেও যদি কোন তত্ত্বজ্ঞানী কর্ত্তব্যানুযায়ী সংসার-নির্ব্বাহে অবহেলা করেন তবে তাহার জন্য তত্ত্বজ্ঞান কোন অংশেই দায়ী নহে। সুখ সাধন এবং দুঃখ মোচনের জন্য যাহা যাহা চাই তাহার আয়োজন করাই বিজ্ঞানের কার্য্য; কিন্তু প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে তাহা স্থির করা শুদ্ধ কেবল তত্ত্বজ্ঞানেরই কার্য্য। তত্ত্বজ্ঞানের কথা এই যে, সর্ব্বদিক্‌দর্শী জ্ঞান যাহাকে সুখ বলে তাহাই প্রকৃত সুখ—অজ্ঞান যাহাকে সুখ বলে তাহার চারিদিক্ দুঃখে পরিবেষ্টিত সুতরাং তাহা দুঃখেরই নামান্তর। সহস্র সুখে সুখী হইলেও শরীরাদিতে তুমি যে পরিমাণে লিপ্ত থাকিবে সেই পরিমাণে তোমার দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য, আর, যে পরিমাণে তুমি দেহাদি হইতে নির্লিপ্ত থাকিবে ও পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকিবে, সেই পরিমাণে তোমার প্রকৃত সুখ-ভোগ অনিবার্য্য। যে ব্যক্তি প্রকৃত সুখে সুখী তাহাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না।

শুষ্ক বৈজ্ঞানিকের প্রধান যুক্তি এই যে, ঈশ্বর মনুষ্যের আদর্শেই পরিগঠিত, ঈশ্বর মনুষ্যের স্বকপোল-কল্পিত মনের একটা ভাব-মাত্র, মানবীকরণ মাত্র। আর, বৈজ্ঞানিক সত্য-সকল প্রথমে যদিচ আবিষ্কর্ত্তার মন হইতেই উদ্ভাবিত হয়, কিন্তু শেষে তাহা পরীক্ষা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়; ঈশ্বর-বিষয়ক কোন তত্ত্বই পরীক্ষার গোচর নহে—সমস্তই শুদ্ধ কেবল মনের ভাব মাত্র—মানবীকরণ-মাত্র। ইহার উত্তর এই যে, বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার বিশেষ বিশেষ প্রণালী আছে; জলকে বিভাগ করিয়া তাহা হইতে অম্লজন এবং উদজন বায়ু * বাহির করা, একজন আনাড়ির কর্ম্ম নহে। আমি যদি সহস্র চেষ্টা করিয়াও জল হইতে ঐ দুই বায়ু বাহির করিতে না পারি, তাহা হইলেই কিছু আর প্রমাণ হইবে না যে, ঐ দুই বায়ুর জল-সাধকতা-গুণ পরীক্ষায় টেকিল না—উহা রাসায়নিকদিগের একটা স্বকপোল-কল্পিত সিদ্ধান্ত। যে পথে ঐশ্বরিক তত্ত্ব-সকলের পরীক্ষা প্রাপ্তি-সুলভ—বৈজ্ঞানিক সে পথই

* Gas কে বাষ্প বলা ভুল—Steamই বাষ্প, তাহা অপেক্ষা Gas কে বায়ু বলা ভাল।

মাড়া'ন না, অথচ তিনি বলিতে ছাড়েন না যে, ঐশ্বরিক তত্ত্ব-সকল পরীক্ষা-সিদ্ধ নহে। তিনি যদি বৈধ-প্রণালী অনুসারে ঈশ্বরেতে মনঃসমাধান করিয়া দেখিতেন—ও দেখিয়া বলিতেন যে, তাহাতে অন্তঃকরণে আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চার হয় না—সৎপথে মতি হয় না—আত্মার তাপশান্তি এবং বিমল আনন্দ হয় না—তবেই যা হৌক্, তাহা নয়—তিনি না দেখিয়া না শুনিয়া আগেভাগেই বলিয়া বসেন যে, ঈশ্বর মনুষ্যের স্বকপোল-কল্পিত মনের একটা ভাব মাত্র। যাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা বলেন—মনুষ্যের আদর্শে ঈশ্বর পরিগঠিত নহেন, ঈশ্বরের আদর্শেই মনুষ্য পরিগঠিত। কিন্তু ঈশ্বরের আদর্শে পরিগঠিত বলিয়া সর্ব্বাংশেই যে, মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত সমধর্ম্মী, তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চেতন এবং সত্তা এই দুই বিষয়েই কেবল ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু পূর্ণতা বিষয়ে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই। আর, অনুযোগিতা সম্বন্ধ অনুসারে আমরা ঈশ্বরের সচেতন সত্তা উপলব্ধি করি—প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ অনুসারে আমরা তাঁহার পূর্ণতা উপলব্ধি করি। অপূর্ণ সচেতন সত্তা পরিপূর্ণ সচেতন সত্তার আদর্শে পরিগঠিত—ইহাই জ্ঞান-সঙ্গত এবং পরীক্ষা সিদ্ধ কথা। জ্ঞান সঙ্গত বলি কেন—না যেহেতু "পরিপূর্ণ সচেতন সত্তা অপূর্ণ সচেতন সত্তার আশ্রয়-স্থান" এই কথাতেই জ্ঞানের সায় পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার বিপরীত এই যে একটি কথা যে, অপূর্ণ সচেতন সত্তা পরিপূর্ণ সচেতন সত্তাকে আপনার আদর্শে গড়িয়া খাড়া করে, সুতরাং অপূর্ণ সচেতন সত্তা পরিপূর্ণ সচেতন সত্তার আশ্রয় স্থান—ক্ষুদ্র একটি কূপ সাগর পরিমাণ জলের আশ্রয় স্থান—এ কথায় জ্ঞান কোন ক্রমেই সায় দিতে পারে না। পরীক্ষা-সিদ্ধ বলি কেন—না "ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ" ইহা বাস্তবিকই ঋষিদিগের পরীক্ষার কথা; পরমাত্মাতে যাঁহারা আত্ম-সমাধান করিয়া দেখিয়াছেন—তাঁহারা বাস্তবিকই দেখিয়াছেন যে, পরমাত্মা হইতে আমাদের আত্মাতে ধী-শক্তি এবং আত্ম-শক্তির সঞ্চার হয়—পরমাত্মা যদি তাঁহাদের মনঃকল্পিত হইতেন তবে এটি হইতে পারিত না। তাহা শুধু নয়—ঈশ্বরের সত্তাকে মনঃকল্পিত বলিবার উপায়ও নাই; কেন না এই যে একটি কথা যে, অপূর্ণ সত্তা মাত্রই পূর্ণ সত্তার আশ্রয়-সাপেক্ষ, ইহা কঠোর জ্ঞানের কথা—কল্পনার কথা নহে; কল্পনার ঝাপ্সা ঝাপ্সা কুহেলিকায় নহে কিন্তু সুস্পষ্ট জ্ঞানের আলোকে আমরা ঐ তত্ত্বটিকে উপলব্ধি করি। অসীম পূর্ণ নিরালম্ব সত্তা আমাদের কল্পনার অগোচর—সহস্র কল্পনা করিলেও আমরা অসীম পূর্ণ নিরালম্ব ভাব মনশ্চক্ষুর সমক্ষে গড়িয়া তুলিতে পারি না,—শুদ্ধ কেবল তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই গোচর। আকাশ এই ঘরের ভিতরে ইহা যেমন ধ্রুব সত্য—আকাশ কোটি যোজন দূরে ইহা তেমনিই ধ্রুব সত্য—আকাশ অসীম ইহাও তেমনিই ধ্রুব সত্য; অথচ অসীম আকাশ আমাদের কল্পনার অগোচর। সাবলম্ব ঘটি-বাটি যেমন ধ্রুব সত্য, নিরবলম্ব ঈশ্বর তেমনিই ধ্রুব সত্য—অথচ তিনি কল্পনার অগোচর। এইরূপ, সকল দিক হইতেই

পাওয়া যাইতেছে যে, প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান মানবীকরণ হইতে উৎপন্ন হয় না; যেহেতু তাহা যথার্থ সত্য জ্ঞান—কৃত্রিম কল্পনা নহে।

কিন্তু মনুষ্য-জাতির ইতিবৃত্তে যে সকল মানবীকরণের বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহার দোষ তত্বজ্ঞানের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। হাতুড়িয়া চিকিৎসকদিগের দোষ চিকিৎসা শাস্ত্রের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্রই মনুষ্য কিছু আর তত্বজ্ঞানী হয় না,—জ্ঞানোপার্জ্জন মনুষ্যের প্রযত্ন-সাপেক্ষ। পথে নানা প্রকার বিভীষিকা—নানা প্রকার জঞ্জাল—নানা প্রকার দুস্তর প্রতিবন্ধক—ইহা সত্বেও মনুষ্য গম্যস্থানের দিকে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে। কোন কালেই মনুষ্যের সমক্ষে সত্যের সমস্ত দ্বার একেবারেই খুলিয়া যায় না—মনুষ্যের সমক্ষে কালে কালে এক একটি করিয়া সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। সত্যের যে দ্বার এখনো ভাল করিয়া উদ্ঘাটিত হয় নাই, তাহার ভিতরে কি আছে—না আছে—তাহা এখনো তর্কস্থল। কিন্তু তাহা বলিয়া সত্যের যে-সকল দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহার অভ্যন্তরস্থিত সামগ্রী-গুলিও কিছু আর তর্কস্থল নহে। কি তত্বজ্ঞান—কি বিজ্ঞান—জ্ঞানের যে পথেই আমরা পদার্পণ করি না কেন, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, পথ দিব্য সহজ ও সুগম; সম্মুখ দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাই যে, পথ অতীব দুর্গম এবং জটিল। কিন্তু তত্বজ্ঞানের বা বিজ্ঞানের একাংশ জটিল বলিয়া যে তাহার সর্ব্বাংশই জটিল, তাহা নহে; আর, ঈশ্বর-বিষয়ক কোন একটি তত্ব এক সময়ে জটিল ছিল বলিয়া আজও যে তাঁহাকে জটিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে—তাহারও কোন অর্থ নাই। সূক্ষ্ম অঙ্কের গণিত খুবই জটিল—তাঁহা বলিয়া সহজ তেরিজ জমাখরচও কি জটিল? কৃষকেরা গণিত শাস্ত্র কাহাকে বলে তাহা জানে না—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহারা কি বেচা-কেনায় ক্ষান্ত থাকে? কৃষকেরা গণিত না পড়িয়া যতটুকু গণিত জানে, তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। এমন অসভ্য লোক আছে যে, কেনা-বেচার জন্য যতটুকু গণিত আবশ্যক তাহাও তাহারা জানে না; সহজ গণিতও তাহাদের নিকটে জটিল; গণিতকে আদ্যোপান্ত জটিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ইহাদের মুখে যেমন শোভা পায়—আমাদের দেশের কৃষকেরও মুখে তেমন নহে। তেমনি তত্বজ্ঞানের আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশকে জটিল বলা নিতান্ত বর্ব্বর জাতির মুখেই শোভা পায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন জাতির মুখে নহে—ভারতবাসীর মুখে তো নহেই, কেননা ভারতবর্ষ যেমন বিজ্ঞানের আদি গুরু—সেইরূপ তত্বজ্ঞানেরও আদি গুরু। কি তত্বজ্ঞান কি বিজ্ঞান, উভয়েরই মধ্যে এমন অনেক দুরূহ স্থান আছে যাহা আজ পর্য্যন্ত তর্কস্থল, কিন্তু তাহা বলিয়া সকলই কিছু আর তর্কস্থল নহে—এটা তর্কস্থল নহে যে, দুই বিন্দুর মধ্যে একের অধিক সরলরেখা স্থান পাইতে পারে না—এটাও তর্কস্থল নহে যে, সাবলম্ব-মাত্রই নিরবলম্বের আশ্রয়-সাপেক্ষ। অতএব ঈশ্বরের ভাব ঈশ্বর হইতে মনুষ্যেতে অবতীর্ণ হয় বলিয়াই মনুষ্য ঈশ্বরকে জ্ঞানে উপলব্ধি করে; এবং যে ব্যক্তি

যে পরিমাণে আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সচেতন-সত্তাকে আশ্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়; এইরূপ ব্যগ্রতা হইতে প্রার্থনা উদ্ভূত হয়; ব্যগ্রতা স্বয়ংই প্রার্থনা—প্রার্থনা-বাক্য তাহার আনুষঙ্গিক উচ্ছ্বাস মাত্র। এইরূপ ব্যগ্রতার ভিত্তিমূল কোথায়? ঈশ্বর স্বয়ংই তাহার ভিত্তিমূল; কেন না, ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সত্ত্বা মূলে বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাহার প্রতিযোগেই আমরা আমাদের অপূর্ণতা উপলব্ধি করি—তাই তাঁহাকে আশ্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হই। শিশু ক্রন্দন করিলে মাতা যেমন তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে করেন, ঈশ্বর সেইরূপ ব্যাকুল সাধকের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। ইহার কোন্ স্থানটিতে মানবী করণ? কই কোথাও তো তাহার চিহ্ন মাত্রও দেখিতে পাওয়া গেল না।

বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে নির্ঘাত যুক্তি বলিয়া—একেবারেই ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া—স্থিরস্থার করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা এই;—জগতে অশেষ-বিধ অমঙ্গল দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও ঈশ্বরবাদী জগৎকর্ত্তাকে মঙ্গল-স্বরূপ বলিতে ছাড়েন না; ঈশ্বর বাদী, লোকহিতৈষী সাধু মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে, ঈশ্বরকে মনোমধ্যে গড়িয়া তোলেন,—ইহা মানবীকরণ নহে তো আর কি? ইহার উত্তর এই যে, আমরা তত্ত্বজ্ঞানের উপদিষ্ট বৈধ প্রণালী অবলম্বন করিলে তবেই জগতের মঙ্গল উদ্দেশ্য—জগতের সামঞ্জস্য এবং সুশৃঙ্খলা—আমাদের জ্ঞান নেত্রে আবির্ভূত হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, মঙ্গলই প্রকৃত সত্য যেহেতু তাহাই স্থায়ী—অমঙ্গল প্রকৃত সত্য নহে যেহেতু তাহা অস্থায়ী; অমঙ্গল অষ্টপ্রহর কেবল আত্মঘাতকতা-কার্য্যেই নিযুক্ত রহিয়াছে; অমঙ্গল আর কিছু নয়—মঙ্গল প্রসূত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ-জ্ঞাপক প্রসব-বেদনা। এখন কথা হইতেছে এই যে, মঙ্গলে পৌঁছিবার উপায় কি? তাহার উপায় বিলক্ষণই আছে; তবে কি না—যাঁহারা তাহার সাধনে নূতন ব্রতী তাঁহাদের পক্ষে তাহা কঠিন। কঠিন বিষয় অনেক আছে—জাহাজ চালানো কঠিন, বীণা বাজোনা কঠিন, মনকে বশীভূত করা কঠিন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা মনুষ্যের অসাধ্য নহে। রীতিমত ঘোড়ায় চড়া শিখিতে হইলে বারম্বার আছাড় খাইতে হয়, তাহা বলিয়া কেহ কি ঘোড়ায় চড়া শেখে না? প্রজ্ঞা-চক্ষু লাভ করিতে হইলে—অর্থাৎ যে চক্ষুতে জগতের অভ্যন্তরস্থিত নিগূঢ় সত্য এবং মঙ্গল উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় সেই চক্ষু লাভ করিতে হইলে—তাহার উপায় যে কি তাহা অতীব সংক্ষেপে উক্ত হইতে পারে, যথা; যিনি যে পরিমাণে জগতে আসক্ত, তিনি সেই পরিমাণে জগতে বিশৃঙ্খলা ও অমঙ্গল দৃষ্টি করেন; আর, যিনি যে পরিমাণে জগতে অনাসক্ত তিনি সেই পরিমাণে জগতে সুশৃঙ্খলা ও মঙ্গল দৃষ্টি করেন। আমরা যদি সমুদ্রে নিমগ্ন হই, তবে সমুদ্রের শোভা আমাদের চক্ষু হইতে ঢাকা পড়িবে না তো আর কি? সংসারে নিমগ্ন হইলে সংসারের প্রকৃত উদ্দেশ্য—মঙ্গল উদ্দেশ্য—কাজেই আমাদের চক্ষু হইতে ঢাকা পড়িয়া যায়। বিষয়ে অনাসক্ত হইলে এই মনুষ্যই দেবতা-

দিগের ন্যায় অজর অমর এবং অশোক হইয়া আনন্দামৃত উপভোগ করে। আত্মার অমরত্ব কাহাকে বলে তাহা স্থিরস্থার বুঝিতে হইলে, সত্য সত্যই আমাদের একবার মরিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা মরিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, কিছুতেই আমাদের মরণ নাই। মরিয়া দেখা—অর্থাৎ বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া বিষয়ে অনাসক্ত হওয়া। এইরূপে জীবদ্দশায় মৃত হইলে—লোকের কথায় নহে কিন্তু আমাদের নিজের পরীক্ষায়—আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে, মৃত্যু যাহার হইতে পারে তাহারই হয়—বিষয়াসক্তি, ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহ, অশান্তি, মরিতে কেবল ইহারাই মরে—মৃত্যুরই মৃত্যু হয়। ইহাদের মৃত্যুতে আত্মাতে নবজীবনের সঞ্চার হয়—তাহার হাড়ে বাতাস লাগে। জরা-মরণ-শীল দেহাদির দলে মিশিয়াই আমরা আপনাদিগকে মর্ত্ত্য মনে করি; কিন্তু যখনই আমরা দেহাদির সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম নিকেতনে প্রবেশ করি, তখনই দেখিতে পাই যে, কিছুতেই আমাদের মৃত্যু নাই; তখনই দেখিতে পাই যে, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিও ভস্মের ন্যায় নিস্তেজ নহে, দেহ-গ্রস্ত আত্মাও দেহের ন্যায় মরণ-শীল নহে। অতএব আত্মার অমরত্ব নিজের পরীক্ষায় উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার একমাত্র উপায়—বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা বিষয়ে অনাসক্ত হওয়া। বিষয়ে অনাসক্ত হওয়ার অর্থ জগৎকে পরিত্যাগ করা নহে,—জ্ঞান যেমন আমাদের পরিত্যাজ্য নহে—তেমনি আমাদের জ্ঞানের বিষয় এই যে বিচিত্র জগৎ ইহাও আমাদের পরিত্যাজ্য নহে; আমাদের আত্মা নিস্তেজ নীরস হত শ্রী হতভাগ্য নহে—আত্মা তেজস্বী রস-পূর্ণ উজ্জ্বল-কান্তি এবং শক্তিমান্; আত্মার নিকটে পরমাত্মা তাঁহার অক্ষয় ঐশ্বর্য্য-জগৎ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; অশ্ব যেরূপ সারথীর পরিত্যাজ্য নহে কিন্তু বশীকার্য্য—জগৎ সেইরূপ আত্মার বশীকার্য্য। যে পরিমাণে আমরা জড়-জগৎকে জ্ঞান দ্বারা—বিদ্বেষকে প্রেম দ্বারা—অমঙ্গলকে মঙ্গল দ্বারা—পরাজয় করিব, সেই পরিমাণে আমরা জগতে অনাসক্ত হইব; আর, সেই পরিমাণে, একদিকে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং আর একদিকে আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য উভয়ই ব্যাপ্তি এবং গভীরতা লাভ করিবে; সেই পরিমাণে আমাদের দৃষ্টিতে বহির্জগৎ অন্তর্জগতে পরিণত হইবে, জড়জগৎ আধ্যাত্মিক জগতে পরিণত হইবে, অমঙ্গল রাজ্য মঙ্গল রাজ্যে পরিণত হইবে; সেই পরিমাণে জগতের এক দিক্ নহে কিন্তু সর্ব্বদিক্ আমাদের নয়ন-গোচর হইবে; জগতের শুদ্ধ কেবল পরিধি মাত্র নহে—জগতের কেন্দ্র পর্য্যন্ত আমাদের নয়ন গোচর হইবে। সর্ব্বদিক্‌দর্শী এবং গভীর-দর্শী প্রজ্ঞা-চক্ষুই কেবল দেখিতে পায় যে "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" যিনি মহান্ তিনিই সুখ স্বরূপ, অল্প কিছুতে সুখ নাই। অতএব জগৎকে মঙ্গলে পরিণত করা আমাদের প্রতি-জনের সাধন-সাপেক্ষ; সাধন-দ্বারা ঈশ্বরের সহিত যোগ-যুক্ত হইলে আমরা করিও মঙ্গল—দেখিও মঙ্গল; কাজেই তখন সমস্ত মঙ্গলের মূলাধার-রূপে ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান-নেত্রে প্রকাশিত হ'ন। ইহাতে মানবীকরণের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্রোহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রায় এক বেলার পথ হাঁটিয়া একজন পথিক মন্দিরপুর হইতে শিখরপাড়-গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল।

এখন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর,—পরিষ্কার দিন, দূরে পাহাড় স্তরের উপর শুভ্র শ্বেত মেঘগুলি রৌদ্রসিক্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছে; নিকটে পথিকের বামদিকে পশ্চিমের একটি পাহাড়শিখরের উপর সুবিস্তৃত শুভ্র উজ্জ্বল আকাশ খণ্ড, তাহার একদিকে স্বর্ণ মেঘ-একখানি স্নিগ্ধ বিদ্যুতের চাঙ্গড়ার মত পাশের ঘন ঘোর নীলাকাশের উপর জ্বল জ্বল করিতেছে, আর এক দিকে সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিষ্মাণ গোলাকার অনল মূর্ত্তি শত সহস্র অনল কিরণ-তীর নিক্ষেপ করিয়া চারিদিক সুদৃশ্য, উজ্জ্বল, স্বর্ণাভ করিয়া রাখিয়াছে।

চির নবীন তৃণ গুল্মময়, শৈবাল-জড়িত তরুলতাময় পাহাড়ের হরিৎবর্ণ ঢালু গাত্র দিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে; সে পথে খানিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে পশ্চাতের অতিক্রান্ত নিম্ন-পথ গুলি দুই ধারের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া পড়ে—আর তাহার চিহ্নও থাকে না। পথের আশেপাশে বড় বড় গাছের মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে প্রশস্ত তৃণ ক্ষেত্র, সেখানে গরু চরিতেছে, ঘোড়া চরিতেছে, ভীল রাখাল বালকেরা নিকটে বড় বড় লাল ফুলে ফুলে ভরা এক একটি ঝাঁকড়া পারিজাত মন্দারের তলে কেহ শুইয়া আছে কেহ বসিয়া গান করিতেছে। চারিদিকের জঙ্গল হইতে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ আসিতেছে—তাহাদের মাথার উপর মন্দার গাছে—ঘুঘু ডাকিতেছে—দোয়েল ডাকিতেছে—মাঝে মাঝে কোথা হইতে এক একবার পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া উঠিতেছে। শীতের শেষে হঠাৎ বসন্তের বাতাস বহিয়াছে তাই পাখীগুলি গীতক্লান্ত। সহসা তাহাদের সঙ্গীতের মাঝখানে কাক দু একটা বিকৃত কণ্ঠে কাকা করিয়া উঠিতেছে। তাহারা গাহিতে পারে না—তাই তাহাদের কর্কশ সমালোচনায় সুকণ্ঠদিগকে থামাইতে চাহে। পাহাড়ের উপরে গ্রাম, গ্রামের নীচেই সুবিস্তৃত ঢালু শষ্য ক্ষেত্র, ভীল কৃষকেরা এখনো ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, কতক শষ্য পাকিয়াছে, সেই পরিপক্ক শষ্য বড় বড় কাস্তে হাতে স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া কাটিতে কাটিতে হাসি গল্প কলহ গণ্ডগোল এক সঙ্গে বাধাইতেছে। অনেকক্ষণ হইতে ভীল-বালিকাগণ শালপাতে মোড়া এক এক খানি রুটি ও দু এক টুকরা শুষ্ক মাংস হাতে করিয়া শিশু-কোলে দাঁড়াইয়া আছে—কাহারো পিতা মাতা কাস্তেখানি কোমরে গুঁজিয়া কন্যার

হাত হইতে শালপাতখানি হাতে লইতেছেন, কাহারো সে অবকাশটুকও নাই, মেয়েটি লক্ষণের ফল হাতে ধরিয়া নীরব নেত্রে তাহাদের হস্ত চালিত কাস্তের দিকে চাহিয়া আছে। ক্ষেত্রের এক দিকে নবকর্ষিত মৃত্তিকায় নূতন শষ্যের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, নিকটের একটি হ্রদেরতীরে দুই চারিজন ভীলনি—তাহাদের কোমর হইতে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত মোটা কাপড়ের ঘাঘরা,—গাত্রে আঙ্গিয়া কোর্ত্তা—গলায় এক রাশ পুঁতির মালা,—তাহারা উঁচু খোপায় পালক গুঁজিয়া, পায়ে কাঁসার বাঁকি, নাকে কাণে মোটা মোটা কাঁসা পিতলের চাকতি পরিয়া ডোঙ্গা কলে জল তুলিয়া মাঠে ফেলিতেছে। সে জল আল বাহিয়া সমস্ত অঙ্কুর সিক্ত করিতেছে।

হাজার বৎসর আগে যে উপায়ে ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইত—এখনো তাহাই হইয়া আসিতেছে—তাহার উন্নতি নাই,—ইহা অন্য জাতির পক্ষে আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের পক্ষে নহে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এমন অনেক ছিল—তাহার উন্নতি না করিতে পারি—কেবল মাত্র যদি তাহা সমানভাবে রাখিতে পারিতাম তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত।

হ্রদে কতকগুলি ভীল বালক সাঁতার দিতেছে, পাশের ডোবায় কতকজনে পোলো করিয়া মাছ ধরিতেছে, মাছ যত না ধরুক কাদায় ভূত সাজিয়া তাহাদের তদোধিক আনন্দ হইতেছে। ক্ষেত্রের এক প্রান্তে নিবিড় অরণ্য, অরণ্য হইতে স্ত্রীলোকেরা বোঝা পৃষ্ঠে, পুরুষেরা বালকেরা ধনুর্ব্বাণ স্কন্ধে, শীকার-পৃষ্ঠে ঈষৎ অবনত হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের নিকট দিয়া হঠাৎ এক একটা নীলগাই চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। ক্ষেত্রের অপর প্রান্তে পাহাড়ের খদ, খদের ধারে পোষা বরাহের দল বন্য ছাগলের সহিত একসঙ্গে চরিতেছে। একজন রাখাল বালকের একটি গরু হারাইয়াছে সে খদের ধারে গরু খুঁজিতে আসিয়া অপর পারের পাহাড় স্তরের দিকে চাহিয়া বাঁশি বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পাহাড়ের অঙ্গ হইতে নির্ঝর ছুটিতেছে, তুষার-শত ধারার নীচে পড়িয়া সফেন রজত কণায় উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া বুঝি সে আর সব ভুলিয়া গেছে, বুঝি একটা অজানা আনন্দে তাহার হৃদয় উদাস হইয়া পড়িয়াছে, তাই কোমরে গোঁজা বাঁশের বাঁশিটি খুলিয়া সে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঠের পশ্চাতে গ্রামের একখানি কুটীর হইতে এতক্ষণ ঢেঁকির শব্দ উঠিতেছিল, বাঁশি বাজিতে বাজিতে তাহা বন্ধ হইয়া গেল, কুটীর দ্বার হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোকের সতৃষ্ণ নয়ন রাখাল বালকের দিকে পড়িল। সহসা বাঁশি বন্ধ হইয়া গেল, কোমরে বাঁশি গুঁজিয়া রাখাল বালক সহসা ক্ষেত্রাভিমুখে ছুটিল—স্ত্রীলোকেরা গৃহের বাহিরে আসিয়া উন্মুখ হইয়া সেই দিকে চাহিল, কাঠুরিয়া স্ত্রীলোকেরা শীকার-পৃষ্ঠ পুরুষেরা চলিতে চলিতে বদ্ধ পদ হইয়া দাঁড়াইল, কৃষকেরা কাস্তে-হাতে, গম্ভীর মুখে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, সহসা চারিদিকে একটা গোল পড়িয়া গেল, আর কিছুই নহে,

একজন অপরিচিত পথিককে দেখিয়া তাহারা সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতে জিজ্ঞাসা পড়িল "তুই কোনডারে? কেন আউছুরে? রাজাডা আসিছে নাকিরে। ইত্যাদি"—আসল কথা, এখানে কদাচিৎ নূতন লোক আসে। রাজা কিম্বা তাঁহার ওমরাওগণ কালে ভদ্রে দলবল সঙ্গে এখানে মৃগয়া করিতে আসেন। এক দিনে গ্রামবাসীদের বহু পরিশ্রমের শষ্যক্ষেত্র দলিত করিয়া, তাহাদের বহুদিনের আহার্য্য নষ্ট করিয়া চলিয়া যান। তাঁহাদের এইরূপ শুভাগমনের পূর্ব্বেই এই বিজন গ্রামে অপরিচিত লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রভুদিগের আসিবার পূর্ব্বে ভীল বা রাজপুত সৈনিক ভৃত্যেরা এইখানে শিবিরাদি স্থাপন করিতে আসে, সুতরাং নূতন লোক দেখিলেই গ্রামবাসীদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

গ্রামবাসীদের প্রশ্নে ভীল পথিক উত্তর করিল "রাজাডার মুই ধার ধারিনে, মুই আউছি কুল্লু ভীলের কাছে, মুইডা তার কুটুম্ব"।

এই কথায় গ্রামবাসীগণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, এক জন সরু গলার কুল্লু কুল্লু করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। পৃষ্ঠ ভারে অবনত একজন শীকারী কু করিয়া সাড়া দিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—পথিক কথা কহিবার আগেই অনেকে এক সঙ্গে বলিল, "আরে তোর কুটুম আসিছে, মুরা ভাবিনু রাজার লোকটা,—ভয়ে সারা হউছিনু।"

কুল্লু কুটুম্বের প্রতি বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পথিক তাহার হাত ধরিল, বলিল "তুইডা কুল্লু" কুল্লু ঘাড় নাড়িয়া বলিল "তুইডা কোন রে?" পথিক বলিল "মুইটা তোর কটুম—চলরে তোর ঘরকে চল।"

বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটা আনন্দের ঝাঁকানি দিয়া সেই জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল, কুল্লু কথা কহিবার অবসর না পাইয়া বিস্মিত চিত্তে তাহার সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল, লোকেরা তখন নিশ্চিন্ত চিত্তে যে যাহার স্থানে গমন করিল। পথিক কুল্লুর কুটুম্ব তাহাদের আর কৌতুহল বা ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু কুল্লুর কৌতূহল যেমন তেমনি রহিয়া গেল, কিছুদূর আসিয়া যখন প্রথম বিস্ময় ভাবটা লাঘব হইল তখন বলিল" মুইডাত কুল্লু—তুইডারে ত চিনিতে নারিল?

পথিক বলিল—"আরে সেই দশ বরিষের কুল্লুডা বুড্ডা, মুইডাই চিনিতে নারিল, তুইডা কি চিনিবি! মুইডা জঙ্গু যে।"

'তুইডা জঙ্গু। আরে বার বরিষের তোর চেহারাটা মনে পড়িছে মোর! বুড্ডারে মুই চিনিব কেমনে রে"।

দুই বুড্ডায় তখন আহ্লাদে গদগদ কণ্ঠে আলিঙ্গন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুল্লুর কুটীরের দ্বার দেশে তিনটি ছেলে মেয়ে খেলিয়া বেড়াইতেছিল, দূর হইতে কুল্লুকে আসিতে দেখিয়া তাহারা হাততালি দিয়া 'দাদু দাদু' করিয়া সেই দিকে ছুটিল, কিন্তু কাছাকাছি আসিয়া তাহার সঙ্গে আর একজন অপরিচিতকে দেখিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। কুল্লু বলিল "আরে ভাইয়া সবরে, আয়রে আয়রে—আর একটা দাদু দেখিবি আয়,—এই তোদের জঙ্গুদাদা—" জঙ্গু দাদার গল্প তাহারা অনেক শুনিয়াছিল, এত শুনিয়াছিল যে না দেখিয়াও জঙ্গু দাদার সহিত তাহাদের বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় চেনা শুনা হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যাহার চ'খের সম্মুখে জঙ্গু দাদার একখানি জীবন্ত ছবি অঙ্কিত হইয়া যায় নাই, এবং সে ছবির প্রতি একটা আন্তরিক ভালবাসা জন্মায় নাই। এমন কি, তাহাদের মনের এই ছবি তাহাদের নিকট এতদুর আসল হইয়া পড়িয়াছিল—যে আর কেহ আসিয়া কখনো যে ইহাকে নকল করিয়া দিতে পারে এমন সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কখনো তা'হাদের মনের ত্রিসীমায় আসে নাই। সুতরাং জঙ্গু দাদার নাম শুনিয়া তাহাদের মুখ গুলি সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল, অত্যন্ত অবাক হইয়া তাহারা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিস্ময়ের প্রভাবে ছয় বৎসরের ছোট মেয়েটির ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুল গুলি সমূল মুখের মধ্যে উঠিয়া গাল দুটাকে নৌকার পালের মত ফুলাইয়া তুলিল। এমন আশ্চর্য্য যেন তাহারা জীবনে হয় নাই। তাহাদের জঙ্গু দাদা—সেত বীর মুর্ত্তি যুবাপুরুষ উগ্রভাবে ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া রাজাকে বধ করিতে উদ্যত,—এই প্রশান্ত হাস্যময় বৃদ্ধ কি করিয়া সে জঙ্গুদাদা হইবে? তাহাদের অবাক দীপ্ত-মুখে নৈরাশ্যের ছায়া পড়িল। বালিকা আস্তে আস্তে কুল্লুদাদার পায়ের কাছে সরিয়া আ'সয়া দুই হাতে তাহার একটা পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদকাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিল—'না জঙ্গুদাদা না—'

কুল্লু বলিলেন—"হাঁরে বুড়ি এই ডা জঙ্গুদাদা"

সে কাঁদিয়া আবার ইহাতে তাহার আপত্তি প্রকাশ করিল, ইঁহার উপর জঙ্গুদাদার অস্তিত্ব রহিবার আর যেন কোন সম্ভাবনাই রহিল না। এত সহজে অস্তিত্ব হীন হইয়া জঙ্গুদাদা হাসিয়া উঠিলেন, হাসিয়া বুড্ডী বুড্ডী করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া যখন বামহাতের উপর বসাইলেন—এবং আর এক হাতে দুই বালকের এক এক খানি হাত ধরিয়া আপনার চারিদিকে ঘানির বলদের মত ঘুরপাক দিতে লাগিলেন, তখন সহসা সেই বুড্ডা জঙ্গু দাদার সহিত যুবা জঙ্গু দাদার মতই তাহাদের ভাব হইয়া গেল। বালিকা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "তুমি জঙ্গুদাদা"? বালকেরা ঘুরপাক খাইতে খাইতে জঙ্গুদাদা জঙ্গুদাদা করিয়া মহা আমোদে চীৎকার করিতে

লাগিল, অবশেষে ঘুরপাক শেষ হইলে তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে মহা-কলরবে তাঁহাকে গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল।

তাঁহারা রোয়াকে আসিয়া বসিলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ দ্বাদশবর্ষীয় বালক তুগুলি তামাকের নল আনিতে ছুটিল, তাহার কনিষ্ঠ বুড্ডাদাদার ধনুর্ব্বাণ খুলিয়া ঘরের কোণে রাখিতে গেল, কিন্তু উঠানে নামিয়া হঠাৎ মতলবটা বদলিয়া ফেলিয়া ঘরের কোণের পরিবর্ত্তে নিজের স্কন্ধে তাঁহার দ্বিগুণ দীর্ঘ ধনুকের ভার চাপাইয়া, গম্ভীর মেজাজে—মস্ত লোকের চালে পা ফেলিয়া কোন রকমে ধনুকটাকে টানিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মাঝে মাঝে বক্র নয়নে কুল্লুদাদা ও জঙ্গু দাদার দিকে দৃষ্টি দিতে লাগিলেন। অর্থখানা—তাঁহারা তাহার কারখানাটা দেখিতেছেন ত?

দাদার এ আস্ফালন বোনটির বড়ই অসহ্য হইল—তিনি বুড্ডাদাদার কোলে বসিয়া তাহাকে ক্রমাগত শাসাইতে লাগিলেন, ধনুক খুলিয়া না রাখিলে এখনি জঙ্গু দাদাকে একথা বলিয়া দিয়া তাহাকে জব্দ করিয়া দিবেন—এ কথা পর্য্যন্ত বলিলেন, আর সত্য সত্য কথাটা কার্য্যেও পরিণত করিলেন। কিন্তু তাহাতে ও যখন কোন ফল হইল না, জঙ্গুদাদা যখন তাহাতে একটি কথাও কহিলেন না,—তখন অগত্যা ভৎর্সনাটা বন্ধ করিয়া জঙ্গু দাদার ঝুঁটির উপর আক্রমণ করিলেন। ইত্যবসরে বড় ভাই তামাকু আনিয়া উপস্থিত করিল—তখন তিনি ঝুঁটি খোলা রাখিয়া বলিলেন "আমি খাবার আনিব"—বলিয়া তিনি মায়ের কাছে রান্নাঘরে ছুটিলেন। বড় ভাই বলিল—"আমিও যাইব" মেজও তাড়াতাড়ি ধনুকটা খুলিয়া তাহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন।

তাহারা তিন জনে চলিয়া গেল, দুই বন্ধুতে মিলিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পরে এই তাঁহাদের দেখা, তখন দুজনে ছেলেমানুষ ছিলেন, এখন প্রায় বৃদ্ধ, জঙ্গুর বয়স এখন ৫৪, কুল্লুর ৫২। এত দিন পরে আবার সেই বাল্যবন্ধু জঙ্গুর সহিত যে দেখা হইবে—কুল্লুর এরূপ আশা ছিল না, জঙ্গু যে কোথায়, বাঁচিয়া কি মরিয়া তাহা পর্য্যন্ত কুল্লু জানিতেন না।

আজিকার এই আশাতীত আনন্দে পুরাতন বিষাদ কাহিনী, পুরাতন বিদায় তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। যা ছিল তা আর নাই, যারা ছিল তারা এখন কোথায়? জঙ্গু আসিয়াছে, কিন্তু জঙ্গুর মাতা—কুল্লুর ভগিনী সে কোথায়? তাহাকে জঙ্গু নির্ব্বাসিত স্থানে চিতায় শুয়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। বিদায়ের দিনের চারি দিকের সেই ক্রন্দন কোলাহল তাহার মনে পড়িতে লাগিল, যাহারা সে দিন এক সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল তাহারা আজ কেহই প্রায় নাই। পুরাতন স্মৃতির ভারে দুজনে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে কুল্লু বলিল—(ইহাদের কথাবার্ত্তা আমরা এখানে সহজ বাঙ্গলাতেই বলিয়া যাই)

"আজ কত দিনের পর দেখা—আরে তারা কোথায় সব"!

দুজনের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল—জঙ্গু বলিল, "যারা গিয়াছে তারা যাক্, তাদের জন্য

দুঃখ নাই। তারা সুখে আছে। কিন্তু দেখিতেছি যাদের তাদের সঙ্গেই এ যেন মরণের শেষ দেখা। তাদের জন্যই প্রাণে মরণের কষ্ট জাগিতেছে। সে দেশ নাই, সে গ্রাম নাই, সে লোকজন নাই, যাহারা আছে তাহারাও মানুষ নাই। তাহারা অকর্ম্মণ্য, বৃদ্ধ, বলহীন সাহসহীন। তখন যাহাদের তেজীয়ান বালক দেখিয়াছি, যাহাদের যৌবনের উপর হৃদয়ের আশা বাঁধিয়াছি—আজ তাহারা নির্জীব, নিস্তেজ, জীবন্তে মৃত। তাহাদের যুবক সন্তানদিগের অবস্থা তাহা অপেক্ষাও শোচনীয়, তাহারা যৌবনে বৃদ্ধ, বল থাকিতে ভীরু, যে পদে তাহারা দলিত সেই পদই তাহাদের আরাধ্য।"

কুল্লু নীরব হইয়া রহিল, জঙ্গুর অধর প্রান্তে ঘৃণার ভ্রুকুটি প্রকটিত হইল, জঙ্গুও আর খানিকক্ষণ কিছু কহিল না। কিছু পরে যখন কথা কহিল, সে কথা আর উঠাইল না— বলিল—"তোমরা ভীল গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিলে কেন?

কুল্লু বলিল "তোমরা চলিয়া গেলে—তার উপর রাজার অত্যাচার বাড়িল। দিন দিন আমাদের অপমান বাড়িতে লাগিল, রাজার সেনাদলে যে সকল ভীল নায়ক ছিল— তাহারা পদচ্যুত হইল, সামান্য সৈনিক হওয়া ছাড়া বড় পদ লাভে আমাদের আর অধিকার রহিল না, গাঁয়ে গাঁয়ে ক্ষত্রিয়েরা কর্ত্তা হইয়া রহিল। আমাদের প্রতি কাজে তাহাদের নজর, খাজনা পত্র তাহাদের হাত দিয়া দিতে হয়,তাহাদের একটা কথার উপর আমাদের মরণ বাঁচন। আবার কর্ত্তাদের যথাসাধ্য প্রসন্ন করিয়া চলিলেই হয় না, তাঁহাদের দলবলকে পর্য্যন্ত প্রসন্ন করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত, অথচ, কাহারো এমন ক্ষমতা নাই এমন সাহস নাই—যে তাহাদের বিরুদ্ধ কেহ কথা কহি, কহিলেও রাজা আমাদের কথা বিশ্বাস করিবেন না। তুমি তাঁহাকে বিনাশ করিতে গিয়াছিলে, সুতরাং ভীল মাত্রেই এখন তাঁহার অবিশ্বাসের পাত্র। ইহাতে কদিন আর গ্রামে থাকা যায়, অল্প দিনের মধ্যেই আমরা অনেকেই সে স্থান ছাড়িয়া এখানে চলিয়া আসিলাম।" জঙ্গু নিঃস্তব্ধ হইয়া রহিল,—কিছু পরে বলিল—"এখানে শান্তিতে আছ?"

কুল্লু। "অনেকটা। তবে মাঝে মাঝে যখন মহারাজ মৃগয়া করিতে আসেন, তখন আর ধড়ে প্রাণ থাকে না। দলবলকে খুসী করিতে ঘরের ধানচাল বিক্রয় হইয়া যায়"—

জঙ্গু। "এ অত্যাচার এড়াইবার উপায় কি করিতেছ?

কুল্লু। মরিতে প্রস্তুত হইতেছি?

জঙ্গু। "তুমি আমি বৃদ্ধ, মরিয়া যেন রেহাই পাইলাম, কিন্তু সহস্র সহস্র বালক বালিকা, যুবক যুবতী যাহারা প্রতিদিন এই অত্যাচার সহিতেছে, সহিবে, তাহাদের উপায় কি?

কুল্লু। "উপায়, নিরুপায়।

জঙ্গু। এ কথা তোর মুখে! আমার মা চিরদিন আমাকে উত্তেজিত করিয়াছেন তাহার ভাই হইয়া তুই এই বলিস্?

কুন্নু একটু অপ্রতিভ হইল, বলিল—আমি একলা করিব কি?"

জন্সু। "একলা হইতেই দোকলা, দোকলা হইতেই ক্রমে শত সহস্র মেলে, চেষ্টার অসাধ্য কি?"

কুন্নু। "তুই ত এত চেষ্টা করিলি, হইল কি? লাভ হইতে তোর নির্ব্বাসন আর আমাদের কসা-হাতকড়ি।

জন্সু। "মনে করিয়া দেখ তখন আমি কত ছেলেমানুষ, তখন আমার বয়স ১২ বৎসর মাত্র।

এ কথার অর্থ—দ্বাদশবর্ষীয় বালকের চেষ্টা একজন অদূরদর্শীর উদ্যম মাত্র। সে উদ্যম অকৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া চিরকাল কি তাহারা চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে।

কুন্নু বলিল—"কে বারণ করিতেছে? এত দিন চুপ করিয়া আছিস কেন?

জন্সু। "চুপ করিয়া ছিলাম কেন তাকি জানিস না তুই? আমার হাত পা বাঁধা, আমি চিরকালের জন্য বন্দী, এই অনন্ত বন্ধনের পরিবর্ত্তে বাবা আমার জীবন ভিক্ষা লইয়াছে, ইহার পরিবর্ত্তে আমি যে সহস্রবার মরিতে পারিতাম! প্রাণ থাকিবে—ইচ্ছা থাকিবে—তবু আমি আর কখনো ইদর রাজবংশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে পারিব না! ভয়ানক ভয়ানক শপথ!

তীব্র কষ্টে জন্সুর দেহ বন্ধন যেন শিথিল হইয়া পড়িল।

কুন্নু বলিল "তুই অস্ত্র ধরিবিনে—তবে চেষ্টা করিবে কে?

জন্সু—"অস্ত্র না ধরিয়াও চেষ্টা করিব,—আমি অস্ত্র না ধরি আমার পুত্রেরা ধরিবে—তোরা ধরিবি—ইদরের সমস্ত ভীলেরা ধরিবে। এত দিন এই উদ্দেশ্য ধরিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি—এতদিন এই এক মন্ত্র জুমিয়ার কাণে জপিয়াছি—এই দিনের জন্য এতদিন তৃষিতের মত অপেক্ষা করিয়া আছি। এখন দিন আসিয়াছে বাবা থাকিতে এ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইত, তিনি বাধা দিতেন। তিনি মরিয়াছেন,—এখন এই সময়,—জুমিয়া যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে এখন এই সময়, এখন তোমরা অগ্রসর হও—"

কুন্নু দেখিল—জন্সু কৃতসঙ্কল্প, সে আবার বিদ্রোহী হইবেই হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে না বিদ্রোহী হইলেও যেন আর উপায় নাই।

সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৃণ ঝড়ের মুখে না উড়িয়া থাকিতে পারে না, সবল হৃদয় প্রখর-বুদ্ধি, দৃঢ় সঙ্কল্প—গুরু মতের নিকট দুর্ব্বল অল্প বুদ্ধিগণ মাথা তুলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে দাঁড়াইতে পারে না—সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র-কণা তাহার প্রখর তেজোরাশিতে মিলাইয়া পড়ে।

সংসার ইহা বুঝে না, সংসার অপরাধী দুর্ব্বলকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। সংসার বলে, এখানে কে সবল কে দুর্ব্বল তাহা জানি না—এখানে কে কেমন কাজ করিতেছে তাহাই জানি। যে সবল সেও নিজের ইচ্ছায় কাজ করে—যে দুর্ব্বল সেও নিজের ইচ্ছায় কাজ

করে—ইচ্ছা না থাকিলে কেহ কাজ করাইতে পারে না। সুতরাং নিজে যে যাহা করিয়াছে সে তাহার ফলভোগ করুক। দুর্ব্বল বলিয়া আমি তাহাকে মমতা করিব কেন?

সংসার তুই ভ্রান্ত! ইচ্ছা না করিয়াও অনেকে কাজ করে—ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেকে কাজ করিতে বাধ্য হয়! তুই হৃদয়হীন মমতাহীন কঠোর সংসার, তোর কাছে দুর্ব্বলতার ক্ষমা নাই, তুই আবার স্বর্গের নিকট ক্ষমা প্রত্যাশা করিস! ! !

কুল্লু বলিল "তবে এখন কি করিব?"

জঙ্গু। "আর কিছু নহে, ভীলগ্রামে চল কাছাকাছি থাক। যত পার বসতি সেইখানে উঠাইয়া লইয়া চল"—

এই সময় কুল্লুর বিধবা পুত্রবধূ ছেলেদের গোলমালের মধ্যে একখান কাঁসার থালায় বাজরির মোটা মোটা রুটী, আর বড় বড় আস্ত লঙ্কা ফেলা লোনা শূকর মাংসের ব্যঞ্জন আনিয়া উপস্থিত করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শিখরপাড় গ্রামের অনতিদূরে পাহাড়ের একটি নির্জ্জন স্থানে ঝন্নু গণৎকারের বসতি। ঝন্নুকে ভীলগণ দেব-প্রসাদিত জ্ঞান করে। সুতরাং ঝন্নুর বাক্য দেব বাক্যের ন্যায় তাহাদের শিরোধার্য্য। ঝন্নুর মুখ হইতে একবার যাহা উচ্চারিত হয় তাহা নিতান্ত অসম্ভব হইলেও তাহারা অসম্ভব মনে করে না। এমন কি ঝন্নু যদি বলে এই মুহূর্ত্তে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহারা তাহার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়। আকাশের চন্দ্র ভূতলে পড়িতে পারে—কিন্তু ঝন্নুর কথা ব্যর্থ হইবার নহে। ঝন্নু কোন্ অসম্ভব সম্ভব না করিয়াছেন?

একবার একজন গরু হারাইযা ঝন্নুর কাছে গণনার জন্য গিয়াছিল—ঝন্নু একটা পতনোন্মুখ প্রস্তর মধ্যস্থিত বৃক্ষ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—ঐ যে পাথরের উপর গাছ দেখিতেছ যদি পাথর খসিয়া যায় ত কি হইবে? গাছটিও পড়িয়া যাইবে। গরু হারাইয়াছে—বনের মধ্যে,—বন খুঁজিলে গরুও পাইবে।"

আশ্চর্য্য এই, চিরকাল তাহারা সেই পাথর খণ্ড দেখিয়া আসিতেছে—ঝন্নুর মুখ হইতে যেমন ঐ কথা বার হইল তেমনি দেখিতে দেখিতে মাস কতকের মধ্যে সম্মুখের বর্ষায় সেই পাথর খণ্ড অকস্মাৎ খসিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে গাছটা শুদ্ধ পড়িয়া গেল! গরুটা যদিও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সে খুঁজিবার দোষে।—গণকের বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে, অনেক দিন পরে ঠিক সেই বনের মধ্যে একটা গরুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল।

আর একবার একজন ভীল একটি ভীল-বালিকার বিবাহাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঝন্নুর কাছে আসিয়াছিল সে দিন প্রভাতটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল—ঝন্নু বলিল "এই মেঘ ছাড়িয়া

যাইবে—আর সূর্য্য উঠিবে—তোমার অদৃষ্ট মেঘ কাটিয়া যাইবে আর তোমার ঐ বালিকার সহিত বিবাহ হইবে"। সত্যই কি—সেই দিন দুই প্রহরে যেমন মেঘ কাটিয়া গেল—অমনি সূর্য্য প্রকাশ হইল! কেবল তাহাই নহে পরে বালিকার সহিত তাহার বিবাহও হইয়াছিল। ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর কি আছে?

এইরূপে ঝন্নু যাহা বলিত কোন না কোন প্রকারে তাহা সফল হইয়া যাইত, ভীলগণের আর আশ্চর্য্যের সীমা থাকিত না।

আজ প্রাতঃকালে দুইজন ভীল তাহার নিকট গণাইতে আসিয়াছে। ঝন্নু তাহাদের লইয়া তাহার কুটীর সম্মুখে বৃক্ষতলে বসিয়া আছে। তাহার মাথায় লতাপাতা জড়ান, তাহার গাত্রের মলিন-অঙ্গাবরণের উপরে এক রাশ পুঁতির ও ফুলের মালা ঝুলিতেছে, সে হাতে এক মন্ত্র যষ্টি লইয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে তদ্দ্বারা মাঝে মাঝে ভূমিতে আঘাত করিতেছে। সাতবার এইরূপ আঘাতের পর ঝন্নু বলিল—জিনিস পত্র—জিনিস পত্র,—কি জিনিস? ঘটি, বাটী, কাস্তে, উঁহুঁ—হাত দেও—"

"তাহারা দুইজন যষ্টি স্পর্শ করিল, তখন ঝুন্নু আবার মাটীতে যষ্টি আঘাত করিয়া নানা জিনিসের নাম করিতে লাগিল—কিন্তু ইহার মধ্যে বরাবর তাহাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে সে ভুলিল না। ক্রমে জিনিসের নাম ফুরাইলে পশুর নাম আরম্ভ করিল, বলিল—"গরু? ঘোড়া? ছাগল? মহিষ? ভেড়া? শুকর? গাধা? উঁহুঁ মানুষ—"

ভীলদিগের মুখ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ঝন্নু বলিল—"মানুষ, কি মানুষ? ছেলে মানুষ—না, মেয়ে মানুষ—না, যুবা মানুষ—হাঁ। সে কে? সে কে? চোর?"

জম্বু আর থাকিতে পারিল না—বলিয়া উঠিল,—"চোর? না চোর না, ডাকাত না, ডাকাত হইতে ও—

ঝুন্নু বলিল—"চুপ কর, গণিতে দে"।

ঝন্নু বলিল—"চোর? না। ডাকাত? না। শত্রু—"

জম্বু বলিল—"ঠিক ঠিক—শত্রু,"

গণক। শত্রু শত্রু। তাহার মন্দ অভিপ্রায়ে আসিয়াছ।"

জম্বু বলিল—"তাহার বিনাশ অভিপ্রায়ে আসিয়াছি—সিদ্ধ হইবে কি?

গণক গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"হুঁ বিনাশ অভিপ্রায়ে আসিয়াছ, সিদ্ধ হইবে কিনা? দেবতাকে প্রসন্ন কর, উত্তর পাইবে!

জম্বু বলিল "একটা ছাগল দিব দুইটা শূকর দিব"

ঝন্নু বলিল "তবে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি" ঝন্নুর কুটীরের পশ্চাতে পাহাড়ের কিছু নিম্নাংশে এক বাঁধান পুরাতন শালগাছ, ঝুন্নু সেইখানে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "এক ছাগল দুই শূকর এক ছাগল দুই শূকর"। বার কতক এইরূপে চীৎকার

করিয়া আবার সে পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিল, বট দেবের উত্তর শুনিবার জন্য ভীলগণ উৎসুক হইয়াছিল, ঝুন্নু বলিল "উঁহুঁ তাহাতে হইবে না, আর একটা গরু চাই।"*

জম্বু বলিল "তাহাই দিব। আর সিদ্ধ হইলে সোণা দিয়া গাছ মড়াইব" ইহা শুনিয়া ঝুন্নু আবার বৃক্ষের নিকটে গিয়া তাহাকে সেই কথা নিবেদন করিল। বলা হইলে মাটী হইতে একগাছি কূটা উঠাইয়া লইয়া বৃক্ষের গাত্র লক্ষ্য করিয়া তাহাতে ফুঁ দিল, কিন্তু তাহার ফুঁয়ে কূটা গাছটি শাল বৃক্ষের গাত্র পর্য্যন্ত না আসিয়া নীচে মাটিতে পড়িল, ঝুন্নু কুটা উঠাইয়া আবার তাহাতে ফুঁদিলে দ্বিতীয়বারে তাহা তাহার গায়ে আসিয়া পড়িল। ঝুন্নু মনে মনে বলিল "প্রথমে ভূমে পড়িল তাহার অর্থ—সিদ্ধ হইবে না, দ্বিতীয় অর্থ, সিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু ইহার কোনটি ঠিক?" আর একবার সে কূটাতে ফুঁদিল, কূটা গাছের কাছাকাছি আসিয়া নীচে পড়িল—কিন্তু একেবারে গাছ স্পর্শ করিল না। ঝুন্নুর একটু গোল বাধিল। কিন্তু তিন বারের পর আর এরূপ করিতে নাই—সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"চেষ্টা কর সিদ্ধ হইবে—সিদ্ধ না হইলে হতাশ হইও না"—

জম্বু বুঝিল, শালদেব প্রসন্ন, তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহারা দুই বন্ধুতে মিলিয়া ঝুন্নুকে প্রণাম করিল, তাহার পর শালবৃক্ষকে প্রণাম করিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। শাল প্রণাম করিতে করিতে জম্বু মনে মনে বলিল "শালদেব প্রসন্ন হও তোমাকে সোণায় মড়াইয়া দিব।"

হেঁয়ালি নাট্য।

(একটি ইংরাজি গল্পের ছায়া)

জেলখানা, গ্রাম্য জমীদার খুন

অপরাধে বন্দী।

উকীলের প্রবেশ।

জমীদার। (ব্যাকুল ভাবে) কি হোল কি?

উকীল। কিছুই হোলনা—জজসাহেব—

---

* গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "কেমন"।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ পাল, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ভড় ও শ্রীমতী মৃণালিনী দাসী ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

জমী। (আহ্লাদে) কিছুই হোল না? বেকসুর খালাস? দশ দশ হাজার টাকা! কিছু কি হয়!

উকীল। (বিব্রত হইয়া) হোলনা না—সব ঠিক হয়ে গেছে—জজ—

জমী। (উকীলকে আলিঙ্গন করিয়া) সব ঠিক হয়ে গেছে? বলব কি তোমরাই আমার মা বাপ, তোমাদের হতেই এ যাত্রা উদ্ধার পেলুম"—

উকীল। (মনে মনে) হাঁ্যা একরকম উদ্ধার বই কি?

(জমীদারের একজন আত্মীয়ের গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে প্রবেশ।)

জমী। আরে শুনেছ ত? সব ঠিক।

(আত্মীয়ের ক্রন্দন।)

জমী। আর কান্না কেন? যা অদৃষ্টে ছিল হয়েছে তার জন্য আর এখন দুঃখ করে কি হবে। এখনি ত সব কষ্টের শেষ হবে।

আত্মীয়। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কি ধৈর্য্য! শেষ মুহূর্ত্তে এমন প্রসন্নভাব কে কোথায় দেখেছে! এই ভয়ানক মৃত্যুর সম্মুখে——

জমী। মৃত্যুর সম্মুখে!

উকীল। এতক্ষণ আমি ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলুম—জজসাহেব ফাঁশির হুকুম দিয়েছেন!

জমীদার। (সক্রোধে) ফাঁশি! দশ দশ হাজার টাকা—তার উপর ফাঁশি? কক্ষনোই না—

উকীল। কি করব আমাদের ত হাত নেই।

জমী। তোমাদের হাত নেই? নেমকহারাম! তোদের কি বেথা হয়নি? স্ত্রী পুত্র নেই? যে এমন অধর্ম্মের কথা বলিস! আমার টাকা খেয়ে এখন সব বেহাত!

উকীল। কিন্তু জজ সাহেব—

জমী। আচ্ছা আর দশ হাজার দেব—

উকীল। কিন্তু—

জমী। আর কৌন্সিলি সাহেবকে আর কুড়ি হাজার দেব—আর কথাটি না।

উকীল। কিন্তু আর যে কোন উপায় নাই।

জমী। ও কথা বলোনা বাবা! আচ্ছা তুমি একবার কৌন্সিলি সাহেবকে ডাক, আমি বুঝিয়ে বলি।

উকীল। আচ্ছা ডাকছি—তিনিই তোমাকে বুঝিয়ে বলবেন এখন।

উকীলের প্রস্থান।

জমীদার (আত্মীয়ের প্রতি) হরি তুমিও যাও একবার কৌন্সিলিকে ডাক, উকীল বেটা যদি নাই ডাকে?

হরির প্রস্থান।

কিছু পরে ব্যারিষ্টার লইয়া সকলের পুনঃপ্রবেশ।

জমী। কৌন্সিলি সাহেব আমি কুড়ি হাজার দেব, আমি ফাঁশি যেতে পারব না দোহাই সাহেব একটা উপায় কর—

কৌন্সিলি। কিছু ভেবোনা। একটা আদটা না—উপায় ঢের ঠিক করেছি। এটা যে Murder নয়, accidental death তার কোন সন্দেহই নেই। এতে ত ফাঁশি হতে পারে না।

জমী। কৌন্সিলি সাহেব আর জন্মে তুমি আমার বাবা ছিলে—

কৌন্সিলি। Accidental death যদি নাও মানতে চাও—তবে না হয় homicide বল—তাও যদি নিতান্ত না বল culpable homicide পর্য্যন্ত স্বীকার করতে আমি রাজি আছি। তার উদিকে আর আমি কোন মতেই উঠতে পারিনে। তুমি খুব নিশ্চিন্ত থাক, এ জন্য আমি জজ সাহেবকে আচ্ছা ঘোল খাওয়াব।

জমী। "এমন তেমন নিশ্চিন্ত! ঘুমিয়ে বাঁচব বাবা! আর ত ফাঁশি যেতে হবে না?"

কৌন্সিল। তা যদি বল্লে—ত দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। কাল তোমার ফাঁশি,—কিন্তু এ সব legal technicality নিয়ে লড়াই করা—তার জন্য একটু ত সময় চাই। তা পরশুর মধ্যে আমি একেবারে প্রস্তুত হয়ে নেব।"

জমী। "কি বল্লে সাহেব!"

কৌন্সিলি। হ্যাঁ ঠিক বলছি—তার চেয়ে আর একটুও দেরী হবে না। কিছু ভাবনা ক'র'না, তোমার ফাঁশিটা হয়ে যাক না, তাপর দেখবে আমি জজকে চোখের জলে নাকের জলে করব্। বেআইনী ফাঁশি দিয়ে আমার কাছ থেকে এড়ান বড় সহজ কি না!!!

হৃদয়াঞ্জলি।

আশপাশের কোলাহল হইতে বিশ্রাম করিবার জন্য দূরে সরিয়া বসিয়াছ—এ কোলাহল-স্রোত তোমার হৃদয়ের মধ্য দিয়া পথ করিতে পারিল না। রুদ্ধ উচ্ছাসের মত সে আপনার প্রবাহের মধ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে—শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া কল্লোল-কাহিনীর স্মৃতিতে মাত্র অবসিত হইতেছে। তুমি দূরে সরিয়া বসিয়াছ—সেখানকার নূতন জ্যোৎস্না, নূতন আলোক, নূতন সুখ দুঃখে ইহাদের ছায়া পড়ে না; এখানকার হাসি কান্না তুমি শুনিতে পাও না।

এখানে অশোক-শাখা আলস্যভরে হেলিয়া পড়ে—তোমার জ্যোৎস্নালোকে তাহার ক্ষীণ কম্পন মাত্র প্রতিভাত হয়; তুমি মনে কর সুরপুরের উপবন হইতে দেবতারা ছায়াপথে আসিয়া বীণা বাজাইতেছেন, বীণার তারে নাচিয়া নাচিয়া দেবলোকের অমর-সঙ্গীতের মৃদু কম্পন পৃথিবীতে আসিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। তোমার যেন মনে হয় পৃথিবীতে নন্দনের সৌরভ আসিতেছে—তোমার আশার প্রতিফলে আমাদের আশা জাগিয়া উঠে। আশা-পূর্ণ-হৃদয়ে মর্ত্ত্য নিকেতনে তুমি যে সঙ্গীত রচনা কর অমরালয়ের উপছায়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। নরলোকে দেবলোকের আদর্শ গঠিত হয়।

যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া কে একজন একদিন বাঁশী বাজাইয়াছিল—সে বাঁশীর স্বর হারাইয়া গিয়াছে, বাঁশী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যে বাঁশী বাজাইয়াছিল সেও আর নাই; তোমার মরমে সেই ভাঙ্গা বাঁশীর ভাঙ্গা সুর এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তুমি সেই ভাঙ্গা সুরে যে রাগিণী ফুটাও তাহাতে জগৎ উদাস হইয়া পড়ে—সেই আশা-পূর্ণ শান্তি-রাজ্যের ছায়ায় মর্ত্ত্য-কোলাহল ধীরে ধীরে নিভিয়া আসে।

পশ্চিমে সূর্য্যালোক অবসিত হয়; পূরবে সন্ধ্যা জাগিয়া উঠে। ধূসরবসনা সন্ধ্যার স্নেহ-মধুর অধরে তোমার পূরবী রাগিণী প্রতিফলিত হয়। জগৎ নিদ্রায় ঢলিয়া পড়ে। ফুলে ফুলে অনন্তের মহিমা-সৌরভ বিকশিত হইয়া উঠে। নীলাম্বরে ধরণীর প্রীতি-চুম্বন ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। সসীমে অসীমে মধুর মিলন প্রতিভাত হয়।

সেই চিরস্থির চিরসুন্দর ধ্রুব-আঁখির পানে চাহিয়া জগৎ চলিয়াছে। মৃত্যু তাহার চারিদিকে যে নীড় রচনা করিয়াছে তিনি তাহার মধ্যে নূতন জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মৃত্যুর আবর্ত্তে জগতের প্রাণ প্রতিদিন নূতন হইয়া বিকশিত হইতেছে। তাই জগতে সন্ধ্যা উদয় হয়, উষা অস্ত যায়। তাই আকাশে তারকা ফুটে, চন্দ্রমার ম্লান হাসিতে নব নব সৌন্দর্য্য চিত্রিত হয়।

এই অতৃপ্তি-মরুর মোহময়-বালুকারাশির ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের দীন আত্মা সেই অসীমাত্মার পানে চাহে না ত। চারিদিকের আধকাঠা জমির বাহিরে সে সাধ করিয়া পদনিক্ষেপ করে না ত। তোমার সঙ্গীতে আমাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হয়। সেই শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ে। আমাদের ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিতে পারি। সেই ধ্রুব অসীমের চরণে এই কলঙ্কিত আত্মাকে সমাধান করিয়া সুখী হই।

সেখানে মোহ নাই, অশান্তি নাই, মিথ্যা নাই, পাপ নাই, শোক নাই, ভয় নাই। সেই ধ্রুবপদে চিরশান্তি। সেই ধ্রুবপদ আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। দ্বেষ, হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা, কানাকানি সেখানে পঁহুছায় না। সেখানে প্রেম, আনন্দ, অমরতা। সেই পরম পদে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। সেই পরম ইচ্ছায় নিমেষ মুহূর্ত্ত সকলই ধ্বংস হইয়া যায়—কাল কোথায় হারাইয়া যায়।

সংসার ক্লিষ্ট আত্মাকে তুমি সেই দয়াময়ের মহিমা বুঝাইয়া দাও—অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস দিয়া তাহার মৃত-প্রাণে জীবন সঞ্চার কর। তোমার সঙ্গীতে জগতের সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়।

তুমি দূরে সরিয়া বসিয়াছ; এখানকার হাসি কান্না তুমি শুনিতে পাও না। কিন্তু এখানকার প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে। তাই সে অপার্থিব জ্যোতির্ম্ময় গৃহ ছাড়িয়া তুমি এখানকার দুরবস্থা দেখিয়া ভ্রমণ করিয়া থাক—এখানকার হাসির উল্লাস দেখিয়া নীরবে অশ্রুমোচন কর—যাহাতে এ অশান্তি ঘুচে তাহার জন্য জগতের হইয়া প্রার্থনা কর।

কোন্ দিন ম্লানমুখে দুঃখিনী শুকতারা শরতের ম্লানচন্দ্রের পানে অনিমেষনেত্রে চাহিয়াছিল, নিস্পন্দ জগতের সুগভীর নীরবতায় মুগ্ধ হইয়া নয়নের কোণে একফোঁটা অশ্রুজল মর্ত্ত্যভূমির অশান্তি কালিমার মধ্যে নিজের সমাধি রচনা করিতেছিল, তুমি বুক পাতিয়া দিলে—নীরবে সেই অশ্রুজল স্বর্গের কাহিনী লইয়া তোমার হৃদয়ে আসন স্থাপন করিল। মর্ত্ত্যের পাপী তাপীরা ঐ নক্ষত্র খচিত নীলিমার কাহিনী শুনিতে পাইল। সঙ্গীতের জাল রচনা করিয়া তাহারই উপরে তুমি তাহার জন্য যে বন ফুলের শ্যামল শয্যা প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাই সে মর্ত্ত্যের অশান্তির মধ্যেও শান্তি লইয়া জাগিয়া আছে। তোমার সঙ্গীতে সঙ্গীতে, বনফুলের মধু সৌরভে, স্নেহ প্রেমের কাহি-নীতে, ভগ্ন হৃদয়ের নৈরাশ্যে সেই অশ্রুজল প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

কোন্ দিন হৃদয় দিয়া হৃদয়ের কষ্ট চাপিয়া স্বর্গের দুই জন আত্মহারা নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে অন্তরীক্ষে একবার শিহরিয়া উঠিয়াছিল মাত্র, তুমি তাহাদের সঙ্গে নদীতে ডুবিলে—জ্যোৎস্নায় ডুবিলে—আনন্দে ডুবিলে—প্রেমে ডুবিলে—সেই আত্মহারাদের আত্মায় ডুবিলে। ডুবিয়া কি করিলে? স্বর্গের অনাদৃতদের জন্য তোমার হৃদয়ে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিলে। সেই আত্মহারা জ্যোতি-র্ম্মুখী আত্মা দুইটী তোমার হৃদয়ে বাসস্থান করিল। বুঝিল, মঙ্গলময়ের রাজ্যে আশ্রয়-হীন কেহ নাই।

কবে একদিন কৈলাসশিখরে বিবাহের হুলুধ্বনি উঠিয়াছিল, পার্ব্বতীর দীর্ঘকেশ-গুচ্ছের সহিত শিবের মস্তকস্থ ফণাজালের প্রেমালিঙ্গন সংঘটিত হইয়াছিল, তুষার-ধবল কৈলাসগিরির সমুচ্চ শিখরে চন্দ্র সূর্য্যের মিলন দেখা গিয়াছিল, জ্যোৎস্না ফুটিয়া পড়িয়াছিল, রবিকরের তেজ চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সুরবালারা ছায়াপথ দিয়া মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছিল, দেবর্ষিরা বীণা বাজাইয়াছিলেন, সেই দিন—সেই শান্তিময় পুণ্যদিনের কথা তোমার স্বপ্নময়ী, উচ্ছ্বাসময়ী, প্রাণময়ী রাগিনীতে এ মর্ত্ত্য অধি-বাসীদিগের নিরানন্দের মধ্যেও কেমন আনন্দ-বারতা প্রচার করিতেছে।

তোমার সঙ্গীতে এত আনন্দ, এত সহানুভূতি, এত প্রেম। কিন্তু তাহার জন্য

মানবসমাজের নিকট হইতে কখনও কি তুইটা সহানুভূতি শুনিয়াছ? বিজ্ঞতা চষমা অাঁটিয়া তোমাকে উপেক্ষা করিতে চায়। কিন্তু সে তোমাকে উপেক্ষা করিবে কি রূপে? তুমি যে উপেক্ষার অনেক উর্দ্ধে। অনুগ্রহলিপ্সা ত তোমার হৃদয়ের সম্মুখে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। তুমি যে অপার্থিব,—কিন্তু তুমি পৃথিবীর জন্য সহানুভুতি অনুভব কর।

পাপিয়া গান গাহিয়া যায়; তুমি সেই ভাঙ্গা গানে ভগ্নহৃদয়ের স্মৃতি ফুটাইয়া দাও। তুমি তাহার গানের উত্তর না দিলে সে কি এমন গান গাহিত? তুমি তাহার গানের মাধুরী প্রচার না করিলে সে কি এমন পঞ্চমে তান ধরিত? সে কি তাহা হইলে আকাশ মাতাইয়া তুলিত? পৃথিবীতে বসিয়া বীণা বাজাইয়া দেবতাদিগকে তুমি মুগ্ধ করিয়াছ; দেবতারা তোমার বীণাঝঙ্কার শুনিতে আসেন, পাপিয়া তোমার হৃদয় হইতে ডাকে—'চোক গেল'। দেবতারা নরলোকের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ছায়াপথে দেব সঙ্গীত ধ্বনিত হয়; পৃথিবীতে তাহার প্রতিধ্বনি গীত হয়। দেব-সভার জ্যোতিতে ছায়াপথ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। চন্দ্রালোকের অধিবাসীরা স্বর্গের তুয়ার খুলিয়া মর্ত্ত্যের পানে চাহিয়া থাকে; তাহাদের রূপের আলোকে চারিদিক আলোকিত হয়।

চন্দ্রলোকে বুঝি এত অশান্তি নাই—এত দ্বন্দ-কোলাহল নাই। কিন্তু সেখানে কি এমন বাঁশী বাজে, এমন সঙ্গীত শুনা যায়, এমন উচ্ছ্বাস, এমন প্রেম, এত আনন্দ জাগে? ভয়চকিত নৈরাশ্যের মধ্যে সেখানে কি কেহ এমন উদাস গান গাহে? ঐ সুদূর কলঙ্ক-কালিমার মধ্যে কি কাহারও নিভৃত অশ্রুজলসিক্ত নয়নাঞ্জনের রেখা নাই? চন্দ্রলোকের জ্যোৎস্না- বালারা বুঝি ঐখানে বসিয়া চক্ষে অঞ্জন দেয়—ঐখানে বসিয়া তাহারাও বুঝি মর্ত্ত্যবালাগণের ন্যায় কেশ-বিন্যাস করে, তুঃখের কাহিনী গায়, ভবিষ্যৎ গর্ভে সুখের শয্যা রচনা করে। অন্যান্য গ্রহ-বালারা গবাক্ষ হইতে উঁকি মারিয়া দেখে।

বামণাবতারের পদ চিহ্ন ধরিয়া ঐখান হইতে যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসে,—তাহার ছায়াময় কেশগুচ্ছের মধ্যে, তু একটী স্নিগ্ধ সৌরভে চারিদিক সৌরভান্বিত হইয়া উঠে—তখন অস্তমাণ রবি কিরণের শেষ ছায়ায় নরলোকে কি মহোৎসবের ভগ্নাবশেষ ফুটিয়া উঠে! পশ্চাতে দ্বন্দ প্রতিদ্বন্দিত-স্মৃতি—সম্মুখে শান্তির ছায়া; পশ্চাতে জগতের অস্ত-মাণ জ্যোতি—সম্মুখে সন্ধ্যার শ্যামল স্নেহ। এই সৌরভান্বিত সন্ধ্যার ছায়ায় তুমি এক-দিন একটী ম্লান মুখের 'বিদায়-চাওয়া-চোখ' ফুটাইয়াছিলে, আর একদিন আর এক বেশে সেই বিদায়-চাওয়া মাধুরীতে তোমার ছায়া-স্বপ্ন বিকশিত করিয়াছিল।

তুমি জীবনের আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া মৃত্যুর মোহন মূর্ত্তি বাহির করিয়াছ। তাপ হরণ বিরামসদন মৃত্যুর অসীম-প্রসারিত ক্রোড়ের উপর ত্রিভুবন নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছে। তুমি এই আশ্চর্য্য গম্ভীর মনোহর দৃশ্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছ। এই অনন্ত

শিখা বিপুল চিতানল হইতে অবিশ্রাম জীবন স্ফুলিঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছে। সুগভীর রহস্য-নিশীথ ভেদ করিয়া এই সর্ব্বগ্রাসী দীপ্ত চিতার পবিত্র আভা তোমার উদাস মুখে, উদার ললাটে, প্রশান্ত নেত্রে, তোমার বীণার কনক তন্ত্রীর উপরে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই রহস্যময় জীবন অন্ধকারে এই মৃত্যুর স্তিমিত আলোকে দাঁড়াইয়া তোমার জন্য হৃদয় উৎসর্গ—হৃদয় অঞ্জলি— ; এইখানে এই ভাবে তুমি চির দিন এই গান গাহিও—এই অনন্ত-জীবন-প্রবাহময়-মৃত্যুর স্নেহ আকর্ষণে নিখিল জগতের অবিরাম অভিসার-গীতি।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্রোত।

স্রোত হাসে খেলে
মধুর বহে যায়,
আপনা ভাবে ভোর—
কারে না ফিরে চায়।
কে দেখে মুগ্ধ আঁখে—
কে কাঁদে বসে তীরে,—
কে তারে ভালবেসে
পরাণ সঁপে নীরে—
সে কি তা দেখে চেয়ে
জানিতে সে কি পায় ?
সে শুধু হেসে খেলে
আপনি বহে যায়!
সে জানে সংসারে
সে শুধু নিজে আছে,
সাধের ঢেউগুলি—
রয়েছে হিয়া কাছে,—

উছলে যৌবন—
সমীরে দিবানিশি,—
ঢালিছে সুখছটা
তারকা রবি শশী,—
প্রমোদে উলসিত—
স্বপনে ঢল ঢল—
সে কি গো দেখে চেয়ে—
দুখের আঁখি জল!
কে তার পায়ে ঝাঁপে
কে মরে উপেখায়—
জানিতে পারে সে কি— ?
শুধু ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
পাষাণ উপকূলে—
আছাড়ি ফেলে শেষে,
যে যায় সে যায় শুধু
স্রোত সে বহে হেসে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মানস প্রবাহ। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি, এ, প্রণীত। ইহার ভাষা মন্দ নহে, মাঝে মাঝে কবিত্বও আছে।

গীতি কবিতা। শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত। ইহাতে যে কয়েকটি কবিতা আছে, সকল গুলিই পড়া যায়। আকাঙ্ক্ষা নামক কবিতায় মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা বেশ বর্ণিত হইয়াছে।

মায়াবিনী। শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু বিরচিত। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিতেছেন— "বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রকৃত হৃদয়ের কবিতার বড় অভাব, হৃদয়বান পাঠকের অভাব তদোধিক। আমার হৃদয়ে যে কবিতা আছে, এই গ্রন্থে তাহারি কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিফলিত করিতে যত্ন করিয়াছি-"

গ্রন্থকারের এই সাধু উদ্দেশ্যের জন্য আমরা তাঁহাকে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে—বঙ্গ সাহিত্যে যদি প্রকৃত হৃদয়ের কবিতার অভাব থাকে এই পুস্তক খানি তাহা মোচন করিতে পারে নাই। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। বইখানি যে মন্দ হইয়াছে এমন আমরা বলি না, ইহার স্থানে স্থানে ছাড়া বইখানি পড়িতে ভালই লাগিল— তবে লেখকের আশানুরূপ উচ্চ কাব্য গ্রন্থ ইহা নহে।

জাগো মা আমার। গীতি কাব্য। শ্রীবিজয়লাল দত্ত প্রণীত।

এই কাব্যখানি গত কনগ্রেস উপলক্ষে রচিত। ইহার ভাব নূতন না হইলেও ইহার ভাষা সুন্দর, বর্ণনা সুন্দর, এবং ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্য এই, ইহাতে লেখকের হৃদয় পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে। বইখানি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

বিসর্জ্জন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে লেখকের 'উপহার' নামক কবিতা গ্রন্থের সমালোচনায় যাহা বলিয়াছি—এই পুস্তকখানি সম্বন্ধেও আবার তাহাই বলিতে হইল। লেখকের যে কবিত্বভাব আছে তাহা তাঁহার পুস্তক হইতে বেশ বুঝা যায়; কিন্তু তাঁহার কবিত্ব ভাব বিকশিত করিতে এখনো তিনি অক্ষম। এই পুস্তকের এক একটি কবিতা সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত বইখানি পড়িলে প্রীত হওয়া যায় না। পুস্তকখানির মধ্যে উপহার কবিতা এবং বিসর্জ্জন নামে শেষ কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিল।

ভুল। শ্রীঅক্ষয় বড়াল প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর একটি গানে আছে,

"এ ভুল প্রাণের ভুল, মর্ম্মে বিজড়িত মূল
জীবনের সঞ্জীবনী বল্লরিণী লতা"—

'ভুল' পড়িতে পড়িতে আমাদের এই ছত্র দুইটি মনে পড়ে। ভুলের অধিকাংশ কবিতাই এক একটি সুধার উচ্ছ্বাস।

মাঝে মাঝে দু একটি কেবল আমাদের ভাল লাগিল না। যেমন—'চোখ ফুটাফুটি' 'কেমনে' ইত্যাদি। 'চোখ ফুটাফুটি'র ভাষাও সকল জায়গায় ভাল নহে—ভাবও ভাল নহে। আর 'কেমনে' নামক কবিতাটি আমরা এই খানে তুলিয়াই দিতেছি—

পারিব না মুহূর্ত্ত বাঁচিতে
ভেবেছিনু, তাহার বিহনে।
বেঁচে আছি তবু বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি বুঝি বা কেমনে!

মোট এই কয় লাইনে কবিতাটি সম্পূর্ণ। ইহার ভিতর কবিত্ব কোথা! ইহা কেবল একটা আক্ষেপ উক্তি মাত্র।

ভুলের ভাল কবিতাগুলি যে আবার কিরূপ ভাল তাহার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে দু একটি উদ্ধৃত করিলাম।

মথুরায়।

আমারি হোল না গান, আমারি বাঁশরী নাই,
বসন্ত যে এল গেল, ব'সে আছি শূন্যে চাই!
গুঞ্জরিয়া গেল অলি,
প্রজাপতি গেল চলি,
শুকান বকুল গাছে ফুলে ফুলে গেল ছাই।
আমারি হোলনা গান, আমারি বাঁশরী নাই!
মলয় বহিল ধীরে
জোছনা ঘুমাল নীরে,
শিখিনী নাচিল তালে, পাখী উড়ে গেল গাই।
আমারি হোলনা গান, আমারি বাঁশরী নাই!
হরিণী নয়ন মেলে
তরুতলে গেল খেলে
তটিনী কূলেতে দুলে ব'লে গেল যাই যাই।
আমারি হোল না গান আমারি বাঁশরী নাই!
কৃষক বাজায়ে বাঁশি
চলে গেল হাসি হাসি,
বালিকারা ঘরে গেল মালার মতন ফুল পাই।
আমারি হোল না গান, আমারি বাঁশরী নাই!
সবি ভেসে গেল চোখে
সবি কেঁপে গেল বুকে
প্রাণে রয়ে গেল সুর ভাবের পেনু না থাই!
বসন্ত যে এল গেল, বসে আছি শূন্যে চাই।

পথে।

যেন কি চমকে ত্রাসে চেয়ে গেলরে!
যেন, মধুর সেফালি বাসে ছেয়ে গেলরে!
যেন, একটি গ্রামের কথা,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে
সমীর, গ্রামের ধারে গেয়ে গেলরে!
যেন, গভীর বরষা রাতে
মেঘেদের ফাঁক দিয়ে
জগতের পানে চাঁদ চেয়ে গেলরে!
ঘুম-ঘোরে, প্রায় ভোরে,
বাঁশির গানটি যেন,
ধরি ধরি না ধরিতে ধেয়ে গেলরে!
একটি অবশ সুখ
একটি অলস দুখ
একটি স্বপন, প্রাণ পেয়ে গেলরে!

বিদ্রোহ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

লোকে অনেক সময় নিতান্ত কেবল একটা গায়ের জ্বালায় একজনের সম্বন্ধে এমন তর সব বাজে কথা বলিয়া বসে, যাহার মূল আর কোথাও খুঁজিয়া মেলে না, মেলে কেবল বক্তার মনের মধ্যে। বক্তার ইচ্ছা—'এইরূপ হউক'—এই ইচ্ছা হইতেই আগা গোড়া কথাগুলার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এমনকি, স্রষ্টা যিনি তিনি যদিও কথাগুলা বলিবার সময় খাঁটি সত্যের মত করিয়াই বলেন, কিন্তু তিনিও ঠিক তাহা সত্য হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া বলেন না। তথাপি পরে কখনো কখনো তাহাও সত্য হইয়া দাঁড়ায়। তখন আর কি বক্তার ভবিষৎ-দৃষ্টির ক্ষমতার প্রতি তাহার বন্ধু বান্ধব পারিষদদিগের ভক্তির সীমা থাকে না—আর সর্ব্বাপেক্ষা বক্তাই নিজে, নিজের এই দূরদর্শীতায় অবাক হইয়া যান। এই একটি ঘটনা হইতে নিজের অদ্বিতীয় অনুমান শক্তির উপর তাঁহার এতদূর অকাট্য বিশ্বাস জন্মে যে ভবিষ্যতে আর দশসহস্র অনুমান মিথ্যা হইলেও সে বিশ্বাস তাঁহার টলে না। টলিবে কি, তখন বক্তার মুখ নিঃসৃত বাক্য আর ত অনুমান নহে, তাহা এক একটি সিদ্ধান্ত সত্য।

সভাসদগণ যদি জানিতেন, কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া জুমিয়া সম্বন্ধে সে দিন তাঁহারা যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা হইলে তাঁহারা প্রত্যেকেই আপনাকে উক্ত রূপ ভবিষ্যৎ বক্তার পদে যে অধিষ্ঠিত করিয়া ফেলিতেন তাহার আর সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় সভাসদগণ এখনো তাহা জানিতে পারেন নাই। জুমিয়া যে সত্যই নির্ব্বাসিত রাজদ্রোহী জঙ্গুর আত্মীয় ব্যক্তি, এমন তেমন আত্মীয় নহে, তাহার আপনার পুত্র, আর জঙ্গুর এখানে আগমনের অভিপ্রায়ও যে রাজার পক্ষে কিরূপ হানিজনক তাহা পাঠক জানিয়াছেন—কিন্তু সভাসদগণ তাহা না জানায় তাঁহারা একটি বিশেষ আনন্দ বিশেষ সুবিধা হারাইয়াছেন।

এইখানে আমরা জঙ্গুর আর একটু পরিচয় দিয়া লই।

জঙ্গু ভীলরাজ মন্দালিকের বংশ। জঙ্গুর পিতামহ চিন্তন মন্দালিকের প্রপৌত্র। গুহার বংশের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। তাহাদের ন্যায্য সিংহাসন হইতে যে গুহা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন ইহা তিনি কোন মতেই ভুলিতে পারেন নাই।

জঙ্গুর পিতা, চিন্তনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত। পুত্র জন্মিবার অল্প দিন পরেই এই স্ত্রীর মৃত্যু হয়, চিন্তন আবার বিবাহ করেন এবং পুত্র মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হয়। জঙ্গুর পিতামহীর পিত্রালয় ভীল গ্রাম হইতে একে অনেক দূরে, তাহার পর চিন্তন দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া ব্যস্ত থাকায় জঙ্গুর পিতার খোঁজ খবর লওয়া তাঁহার

বড় ঘটিয়া উঠিত না। পুত্রের বয়স যখন পঞ্চদশ তখন হঠাৎ একদিন তিনি শুনিলেন সে আশাদিত্যের একজন সেনা হইয়াছে। অপমানে কষ্টে তিনি জ্বলিয়া উঠিয়া আশাপুর গমন করিয়া পুত্রকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেখিলেন পুত্রের মনের এতদিনের সঞ্চিত দৃঢ়বদ্ধ রাজানুরাগ উৎপাটন করা তাঁহার সাধ্যাতীত। গুহার কৃতঘ্নতা কহিয়া পুত্রের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা প্রজ্জ্বলিত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্র বলিল "রাজা আমাকে পুত্রের মত ভালবাসেন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস ঘাতক হইয়া তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইতে পারি না"।

পুত্রের কথায়, তাহার রাজানুরাগে পিতার ক্রোধ সহস্র গুণে বাড়িল। শৈশবাবধি পুত্রকে দূরে রাখিয়াছেন বলিয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় কি, তাহার পুত্রাদি যাহাতে পিতার ভাব না পায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। ভীলগ্রাম হইতে নিজের মনের মত একটি কন্যা বাছিয়া পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন, এবং জঙ্গু পাঁচ বৎসরের হইতে না হইতে পুত্রবধূকে ও তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়া সেই বয়স হইতে তাহাকে রাজ বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গুহার কৃতঘ্নতা, মন্থালিকের রক্তাক্ত দেহ প্রতিদিন সে সম্মুখে দেখিতে লাগিল। এই অবস্থায় জঙ্গুর দ্বাদশ বৎসর বয়সে মহারাজ আশাদিত্য সসৈন্যে ইদর আগমন করিলেন, পুত্রকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া জঙ্গুর পিতা তাহাকে রাজ সেনানী করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পিতার এই প্রস্তাবে জঙ্গু রাজার প্রতি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইল, তাহার পিতাকেও ভৃত্য করিয়া ক্ষান্ত নহেন, আবার তাহাকে পর্য্যন্ত ভৃত্য করিতে চাহেন। এই সময় আবার একটি ঘটনা হইল, জঙ্গুর এক আত্মীয় কন্যা একজন ক্ষত্রিয় সেনার গৃহে চলিয়া গেল, তাহাদের মনে ছিল—ক্ষত্রিয় সেনা তাহাকে বিবাহ করিবে, কিন্তু সে বিবাহ করিল না, তাহার গৃহে সে দাসীরূপে রহিল। জঙ্গুর ক্রোধের সীমা রহিল না, মৃগয়া ক্ষেত্রে স্বয়ং মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া সে ইহার বিচার প্রার্থনা করিল। মহারাজ বলিলেন "ইহা বিচারের স্থল নহে, বিচারালয়ে বাদী অভিযোগ উপস্থিত করিলে তিনি বিচার করিবেন।" জঙ্গুর উত্তপ্ত যৌবন-রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, অদূরদর্শী বালক হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া সেইখানে তাঁহার প্রতি বর্ষা নিক্ষেপ করিল, কিন্তু দৈবক্রমে রাজা বাঁচিয়া গেলেন—জঙ্গুর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল।

জঙ্গুর পিতা আশাদিত্যের একজন প্রিয় সেনা ছিলেন, তিনি কাতর চিত্তে পুত্রের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন—শপথ করিয়া বলিলেন, মহারাজ এবার যদি তাহাকে মার্জ্জনা করেন ত সে আর কখনো তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবে না। পিতার কাতর-প্রার্থনায় মহারাজ জঙ্গুকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেন। জঙ্গুর পিতা পিতামহ সকলেই তাহার অনুগমন করিলেন।

৪০ বৎসর পরে জঙ্গু দেশে ফিরিয়াছে, এই ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে আগুণ হৃদয়ে জ্বলিয়াছিল এখনো তাহা নিভে নাই, যে ব্রত ধারণ করিয়াছিল এখনো তাহা ছাড়ে নাই, সেই আগুণে আহুতি দিতে, সেই ব্রত উদযাপন করিতেই এতদিন পরে আবার সে দেশে ফিরিয়াছে। চিরদিনের সেই আশা এখন তাহার পূরিবে কি?

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে জঙ্গু শিখরপাড় হইতে মন্দিরপুর অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। প্রাতঃকাল, শ্যামসৌন্দর্য্যময় শষ্য ক্ষেত্রে, বসন্তপক্ষীর স্বরলহরী-তরঙ্গিত নবপল্লবিত বনানী শিখরে, নীলাভ পাহাড় স্তর-আলিঙ্গিত সুন্দর সুনীল মেঘে, চৌদিকের দুর দুরান্তব্যাপী অনন্ত দৃশ্যে সূর্য্যের প্রাতঃকিরণ বিভাসিত-মধুর আনন্দ বিরাজমান। সেই জ্যোতির্ম্ময় আনন্দময় জগতের দিকে চাহিয়া—জঙ্গু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পীড়িত হৃদয়ে কেবলি ঐ কথা ভাবিতে লাগিলেন—কেবলি মনে হইতে লাগিল, "এই শোভা সৌন্দর্য্য বিকশিত বনপ্রদেশ একদিন তাঁহাদের ছিল আবার কি তাঁহাদের হইবে না? এই প্রভাত সূর্য্য—এই মধুর বসন্ত একদিন তাঁহাদের আনন্দ দিবার জন্যই বিকাশিত হইত, এই অধীন জাতির সুখের জন্য এখন আর তাহারা উদয় হয় না, কিন্তু কখনো কি আর দিন ফিরিবে না? হায় হায়! তাহাদের সব ছিল রে সব ছিল, সে দিনও সব ছিল। সে দিন মাত্র—সে দিনও, তাহার পূর্ব্ব পুরুষ মন্দালিক এই পশুপক্ষী-বন-অরণ্যশালী শৈল প্রদেশের রাজা ছিলেন, কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক গুহাকে ভালবাসিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইলেন! পিতামহের প্রতি কথা, প্রতি উত্তেজনা জঙ্গুর যতই মনে পড়িতে লাগিল সমস্ত ব্যাপার ততই সেদিনের বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মন্দালিকের মৃত দেহ পর্য্যন্ত যেন জঙ্গু চোখের উপর দেখিতে লাগিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে তিনি দ্রুত চরণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসিবার সময় যে পথে আসিয়াছিলেন অন্য মনে সে পথ ছাড়িয়া যে ভিন্ন পথ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জানিতেও পারিলেন না। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত গ্রামের মাঠে আসিয়া তাঁহার যেন সব নূতন মনে হইতে লাগিল। এগ্রাম এমাঠ যেন তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই। একটু ভাবিয়া মনে পড়িল এ সমস্তই আগে বন ছিল। দেখিলেন মাঠে ভীলেরা চাষ করিতেছে। সাধারণ ভীল হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র বেশ। তাহাদের অঙ্গে ধনুর্ব্বাণ কিম্বা কটির বস্ত্রে কোন প্রকার ছোরা আবদ্ধ নাই। কর্ণে রৌপ্য বলয়, পরিধেয় অবিকল ক্ষত্রিয় পরিচ্ছদ, মাথায় ক্ষত্র উষ্ণীষ, দেহ অপেক্ষাকৃত সুকুমার। জঙ্গু তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ, চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। জঙ্গুর সময়ে ক্ষত্রিয় সংসর্গে ভীলদের যে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই—এমন নহে। দেড় শত বৎসরেরও অধিক হইল—ক্ষত্রিয়গণ ইদর অধিকার করিয়াছেন—জঙ্গু নির্ব্বাসিত হইয়াছেন ৪০ বৎসর মাত্র। অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতে ভীলদিগের—বিশেষতঃ রাজভৃত্য ভীলদিগের—নিতান্ত সামান্য কোপীন পরিধান এবং শীতকালে একমাত্র পশুচর্ম্ম ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে, শীকার মাংসই তাহাদিগের একমাত্র খাদ্য না

হইয়া চাষবাস কতক কতক আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু একেবারে এতটা পরিবর্ত্তন জঙ্গু দেখিয়া যান নাই, তাঁহার চক্ষে ইহা আজ নিতান্তই নূতন—নিতান্তই বিস্ময়জনক। তিনি নিকটে আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হেথাকার বন কি হইলুরে।

একজন ক্ষেতি তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল—"অরে তুইডা কোন জঙ্গলথেকে আওলুরে?"

আর একজন বলিল—"সে রাজা কাটি লইছে।"

জঙ্গু। "কতদিন?"

উত্তর। বছর ৩০ শেক হইল।"

জঙ্গু বলিলেন—"এ ক্ষেত্রে কত শষ্য হয়?"

উত্তর। "তা ঢের?"

জঙ্গু। "তোদের কয়জনের ক্ষেত।"

উত্তর। "জনটার না?"

জঙ্গু বিস্মিত হইলেন—"বলিলেন জনটার নয়—তবে কোনডার?"

উত্তর। "জায়গীরদারের।"

জঙ্গু। "তোরা কে তার?

উত্তর। "মুরা শুধু দাস।"

ভীলেরা দাস! এই কয়েক বৎসরে এতদূর হইয়াছে! জঙ্গু হৃদয়ে বিষম আঘাত অনুভব করিলেন—বলিলেন—"দাস কোনড়া করিল"?

উত্তর। দশ বরিষের কথাডা। উপরি উপরি দুই বছর আকাল পড়িল, মুরা না খাইয়া মরিবার নাকাল হইনু, জায়গীরদার বলিল 'তোরা দাসখৎ লিখিয়া দে তোদের খাওয়াইবু।' মোরা তাই করিল।"

ঘৃণায়, ক্রোধে জঙ্গুর ওষ্ঠাধর ভ্রূকুটি বদ্ধ হইল—তিনি বলিলেন—"ধিক তোদের পেটে! ইদুরের জঙ্গলডা থাকিতে খাইবার লাগিন দাস হইলু তোরা! জানোয়ারে তোদের পেট ভরিল না?

উত্তর। "আরে ভাই, মুইরা কি ধনুক ধরিতে জানি? ৪০ বরিষ আগে মুদের বাবারা—রাজার সিপই ছিল—কইব কি—চাঁদিলা বলি একটা জন রাজারে মারিতে গেল, রাজা রাগ করিয়া বাবাদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া বলিল—যা তোরা চাষ করিয়া খা। মুদের বাবারা চাঁদিলার কুটুম হইত—তাই রাজাডা রাগ করিল। তাই মোরা ২০ ঘর ধনুক ধরিতে জানিনা, নইলে মোদের এই দশা। সর্ব্বনেশে চাঁদিলা!"

জঙ্গুর আসল নাম চাঁদিলা। জঙ্গু উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুগঠন সুশ্রী ছিলেন, তাই পিতামহ তাহার নাম চাঁদিলা রাখিয়াছিলেন। অসভ্য আদিম জাতি বলিয়া পাঠক যেন ভীল জাতিকে কাফ্রির দলেনা ফেলেন। ভীলেরা দেখিতে সাধারণতঃ শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ সুগঠিত

দেহ, সুশ্রী মুখ। সাধারণ বাঙ্গালীর সহিত সাঁওতালদিগের চেহারার যেমন সাদৃশ্য,—সাধারণ হিন্দুস্থানীর সহিত ভীলদিগের চেহারারও সেইরূপ সাদৃশ্য।

চাঁদিলা নামেই জঙ্গুকে বাহিরের সকলে জানিত।

কুল্লুর মা জঙ্গুর মাতামহী কেবল তাহাকে আদর করিয়া জঙ্গু জঙ্গু করিতেন,—সেই জন্য কুল্লু ও তাহাকে জঙ্গু বলিয়া ডাকিত।

জঙ্গুর ঘৃণা মমতায় পরিণত হইল। একটী হৃদয়ভেদী কষ্ট তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাহার পূর্ব্বপুরুষ মন্দালিক ক্ষত্রিয়কে রাজ্য দিয়া দেশের সুখশান্তি যে জলাঞ্জলি দিয়া গিয়াছেন সে অপরাধের বোঝা মাথায় লইয়া তিনিই এখনো দণ্ডায়মান! দেশের এই অধীনতা এই হীনতার তিনিই যেন এখনো মূর্ত্তিমান কারণ! প্রতিশোধের স্পৃহা তাঁহার মন হইতে চলিয়া গেল, যথার্থ মহানভাবে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, দেশের দীনহীন অবস্থা ঘুচাইবার জন্য, প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

এক এক এমন মুহূর্ত্ত আছে যে মুহূর্ত্তে অচেতনকে চেতনা দেয়—অন্ধকারকে আলোক প্রদান করে, পাপকে পুণ্যে পরিণত করে—সেই মুহূর্ত্ত সহসা জঙ্গুর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিল

কার্য্য আরম্ভ আমাদের হাতে, কিন্তু পরিণাম অনেক সময় আরম্ভের হাতে। ভাল উদ্দেশ্যেও যদি মন্দ কার্য্য আরম্ভ কর ত—অনেক সময় ক্রমে উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত মন্দে আসিয়া দাঁড়ায়, আবার মন্দ উদ্দেশ্যে ভাল কার্য্য আরম্ভ করিয়াও অনেক সময় পরিণামে উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত ভাল হইয়া পড়ে। কেহ শাসনের অনুরোধে ক্রোধ দেখাইতে গিয়া স্বভাবতই ক্রোধী হইয়া পড়েন। কেহ লোক দেখাইয়া ভাল কাজ করিতে করিতে স্বভাবতই ভালকাজের অনুরাগী হইয়া পড়েন। জঙ্গু প্রথমে প্রতিশোধ স্পৃহায় কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অগ্রসর হইয়া যতই দেশের হীনতা দেখিতে পাইতেছেন ততই সে স্পৃহার স্থলে দেশের দুঃখ দূর করিবার বাসনা জন্মাইতেছে—একের স্থান অন্যে অধিকার করিতেছে। আজ সহসা তিনি প্রতিশোধ স্পৃহার অতীত হইয়া উঠিলেন।

এই সময় একজন ভীলগ্রামবাসী পরিচিত ভীল এইখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হউছে রে?" সে কথা জঙ্গু শুনিলেন না, জঙ্গু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"ভীল এখন ক্ষত্রিয়ের দাস!" আগন্তুক তাহার রাগ দেখিয়া হাসিল, বলিল—"তুইডার তাতে কি? জুমিয়াকে যে রাজা বড় ভালবেসেছে"। জঙ্গু বিস্ফারিত নয়নে চাহিলেন।' সে তখন জঙ্গুর এ কয়দিন কার অনুপস্থিতিকালে জুমিয়া রাজার কিরূপ প্রসাদ লাভ করিয়াছে তাহা গল্প করিল। জঙ্গু আর দাঁড়াইলেন না, বিদ্যুৎবেগে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

জঙ্গু যখন বাড়ী পৌছিলেন—তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। তিনি গৃহে পা দিতে না দিতে আবার সেই কথা! বধূরা তাঁহাকে দাঁড়াইবার সময় পর্য্যন্ত না দিয়া মহা আহ্লাদে মুখভরা হাসি হাসিয়া আগে ভাগে রাজার সেই অনুগ্রহের কথাই পাড়িল। কিন্তু বেশী কথা তাহাদের বলিতে হইল না, মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখের কথা মুখে, ঠোঁঠের হাসি ঠোঁঠেই তাহাদের মিলাইয়া গেল। শ্বশুরের ভ্রূকুটি অঙ্কিত অন্ধকার মুখ দেখিয়া তাহারা সহসা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল,—জঙ্গু তখন গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"জুমিয়া কোথা"? জুমিয়ার স্ত্রী বলিল—"নিমন্ত্রণে গিয়াছেন?"

"কখন আসিবে?"

"ভোরের আগে না"

জঙ্গু আর কথাটি না কহিয়া গম্ভীর ভাবে উঠান হইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্বশুরের ভাব দেখিয়া বধূরা বিস্মিত ঈষৎ ভীত হইল।

সে রাত্রে জঙ্গু শয্যায় শয়ন করিলেন না, গৃহদ্বারের পার্শ্বে রোয়াকে শয়ন করিয়া রহিলেন,—অভিপ্রায় এই,—জুমিয়া গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি দেখিতে পাইবেন। প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে জুমিয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া, দ্রুত পদনিক্ষেপে অতি ব্যস্তভাবে তাঁহার সম্মুখের উঠান দিয়া একটি গৃহ মধ্যে ঢুকিল, জঙ্গুও উঠিয়া কিছু পরে সেই গৃহে গমন করিলেন—দ্বারস্থ হইয়া দেখিলেন, জুমিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া আবার গৃহের বাহিরে আসিতেছে। পিতাকে দেখিয়া জুমিয়া দাঁড়াইল। জঙ্গু বলিলেন—"কোথায় যাইবি?

তাহার স্বরে কি অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য—জুমিয়া চমকিয়া গেল, বলিল—"শীকারে যাউছিনু—" জঙ্গু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"টুকুন সবুর করিয়া যা, কথাটা আছে"।

বলিয়া বজ্র মুষ্টিতে পুত্রের হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যস্থলে আনিয়া তাহাকে বসাইলেন। জুমিয়ার কথা ফুটিল না, একটা অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় কেমন যেন ভীত হইয়া পড়িল। জঙ্গু আবার বলিলেন—"বাছাডা মনে আছে কতদিন বলিয়াছি—'অগুণ' আমাদের বাসস্থান নহে, নির্ব্বাসন স্থান?"

জুমিয়া ঔৎসুক্য পূর্ণনেত্রে নীরবে মাথা নাড়িল। জঙ্গু বলিলেন "কতদিন বলিয়াছি মনে আছে কি? তোমার বংশ সামান্য বংশ নহে, রাজ বংশে তোমার জন্ম?" জুমিয়ার মুখ জলিয়া উঠিল, অধীর স্বরে বলিল "তাহা মনে নাই! কতদিন—"

জঙ্গু তাহাকে কথা কহিতে না দিয়া বলিলেন—"মনে আছে কতদিন বলিয়াছি—অন্যায় করিয়া তোমার অধিকার একজন হরণ করিয়াছে—অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া আমরা নির্ব্বাসিত"।

জুমিয়া আর থাকিতে পারিল না—দীপ্ত স্বরে বলিল—"কিন্তু সে অত্যাচারক কে? সে চোর কে? তোর মনে আছে কতদিন এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি? এখনো কি বলিবার সময় হয় নাই?

জঙ্গু। "মনে আছে। শুনিতে শুনিতে প্রতিশোধের জন্য কিরূপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিস তাহা পর্য্যন্ত মনে আছে—"

জুমিয়া। "জ্বলিয়া উঠিতাম,—এখনো জ্বলিতেছি না কি? কিন্তু সেই অত্যাচারী কে? প্রতিশোধ নিব কাহার উপর? কোথায় সেই বাসস্থান, কোথায় সেই রাজ্য, আপনার রাজ্য আপনার করিব কখন? এখনো কি তাহা বলিবার সময় হয় নাই?"

জুমিয়ার সেই আগ্রহভাবে জঙ্গুর হৃদয় আশ্বস্ত হইল। বলিলেন—"হইয়াছে। এই ইদরই তোর স্বদেশ, নাগাদিত্যই সেই খুনীর বংশধর, ইহারি পূর্ব্ব পুরুষ আমাদের রাজ্য প্রাণ হরণ করিয়াছে, ইহারি পিতামহ কর্তৃক আমরা নির্ব্বাসিত।"

জুমিয়ার হৃদয় সহসা কাঁপিয়া উঠিল—মুখ সহসা বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল—মহারাজ নাগাদিত্য যিনি জুমিয়াকে এত ভালবাসেন,—যাহাকে বন্ধু বলিয়া জুমিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে—তিনিই তাহার প্রতিশোধের পাত্র! খানিকক্ষণ জুমিয়ার কথা ফুটিল না কিছু পরে জুমিয়া কথা কহিল, বলিল "বাবা এত দিন কেন এ কথা আমাকে বলিলি না?"

জঙ্গু এতদিন বলেন নাই তাহার কারণ ছিল, এতদিন তাঁহার পিতা বাঁচিয়াছিলেন। তিনি থাকিতে এ কার্য্যে হাত দিলে সফলতা লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই কার্য্যের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত হইবার অগ্রে জুমিয়াকে এ সকল কথা বলিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। অনুপযুক্ত সময়ে হঠাৎ উৎসাহে নীত হইয়া একটা কাজ করিয়া বসিলে তাহা কিরূপ বিফল হইবার সম্ভাবনা তাহা আপনার শৈশব কার্য্য হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর আগে—ইদরে আসিবার জঙ্গুর উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি জানিতেন—জুমিয়ার নিকট ঐ কথা বলিলে সে তৎক্ষণাৎ ইদরে আসিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে। অথচ সে ছেলে মানুষ, শুধু উৎসাহেই কাজ হয় না, তাহাকে চালাইবার জন্য জঙ্গুর সঙ্গে থাকা চাই, নহিলে সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

তাহার পর ইদরে আসিয়াই বা এ কথা এতদিন জুমিয়াকে বলেন নাই কেন? ইদরে আসিয়াই জঙ্গু গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া চারিদিক এই কার্য্যের উপযোগী করিতে গিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া একেবারে জুমিয়াকে সমস্ত বলিবেন, সমস্ত বলিয়া তাহাকে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন, এই তাঁহার সংকল্প। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির যখন সময় আসিয়াছে তখন হঠাৎ পুত্রের মুখে এই কথা? জঙ্গু জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন "কেন এই দুদিনে সময় চলিয়া গেছে কি? এ বুঝি রাজার অনুগ্রহ"! অনুগ্রহ! এ তীব্র

উপহাস জুমিয়ার হৃদয় বিঁধিল, জুমিয়া বলিল "অনুগ্রহ? না অনুগ্রহ নহে, বিশ্বাস। যে আমাকে ভাইএর মত বিশ্বাস করে, বন্ধুর মত ভাল বাসে, তাহাকে কি করিয়া আমি হত্যা করিব? বাবাডা, আমি পারিব না, রাজা অনেক দিন গিয়াছে যাক, প্রতিশোধের সময় গিয়াছে এখন নির্দ্দোষ যে—" জঙ্গু তীব্রস্বরে বলিলেন "বিশ্বাস! গুহা কেমন বিশ্বাস রাখিয়াছিল? তাহাকে যে মন্দালিক প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন সে ভালবাসার তিনি কিরূপ প্রতিদান পাইয়াছিলেন? কাপুরুষ! আজ রাজার একটা মিষ্ট কথায় পিতৃ পিতামহের অপমান সমস্ত তুই ভুলিয়া গেলি?" জুমিয়া বলিল "না পিতা ভুলি নাই, কিন্তু যে অপমান করিয়াছে, সে কোথায় আজ? তাহার অপরাধে নির্দ্দোষীকে শাস্তি দেওয়া কি প্রতিশোধ"!

ভালবাসার মত শিক্ষক কেহ নাই, অসভ্য ভীলের নিকট আজ খাঁটি যুক্তি দ্বার খুলিয়া গেল। জঙ্গু আরো জ্বলিয়া উঠিলেন, এতদিন ধরিয়া যে অনবরত জুমিয়াকে উত্তেজিত করিয়া আসিয়াছেন সেই উত্তেজনার আজ এই ফল! বলিলেন—"নির্দ্দোষী! আমাদের সর্ব্বনাশে যাহার রাজত্ব সে নির্দ্দোষী! তোর অপমান তাহার পূর্ব্ব পুরুষ করিয়াছে কিন্তু সমস্ত জাতির অপমান এখনো কে করিতেছে? তোর বিশ্বাস তাহার পূর্ব্ব পুরুষ ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু সমস্ত জাতি যে বিশ্বাস করিয়া তাহার হস্তে আপনাদের সুখ সম্মান রাখিয়াছে রাজা সে বিশ্বাস কতদূর রাখিতেছেন? দেশের এই ম্লান শুষ্ক মুখ এই পরাধীনতা একজনের মিষ্ট কথায় তোকে সব ভুলাইয়াছে?"

জঙ্গুর দুই নেত্র হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল, জঙ্গুর উত্তপ্ত ক্রোধ তীব্রনিরাশার অশ্রুতে পরিণত হইল, জুমিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সে অশ্রুবারিতে তাহার হৃদয় দ্রব হইতে লাগিল, জুমিয়া বলিয়া উঠিল "বাবাডা কি করিতে হবে বল"? জঙ্গু বজ্র গম্ভীর স্বরে দেয়ালের একটি তীর দেখাইয়া বলিলেন "ঐ তীরে গুহা আমাদের পিতা মন্দালিককে বধ করিয়াছিল, ঐ তীর তুলিয়া নে, ঐ তীরে নাগাদিত্যকে বধ করিয়া দেশ উদ্ধার কর" তাঁহার শেষ কথা শেষ না হইতে হইতে হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল, বালিকা হর্ষের আতিশয্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "বাবাডা আয় আয়, বর এসেছে"।

তাহার সেই হাসিতে সেই মৃত্যু গম্ভীর রুদ্ধ গৃহও যেন হাসিয়া উঠিল, নির্জ্জীব স্তম্ভিত জুমিয়ার প্রাণে যেন সহসা প্রাণের আবির্ভাব হইল। বালিকা আবার 'আয় আয়' করিয়া বিষাদ স্তব্ধ গম্ভীর পিতার হাত ধরিয়া টানিল, জুমিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তাঁহার চোখে দুই ফোটা জল দেখা দিল। জঙ্গু বলিলেন—"মা টুকুন বাইরে যা তোর বাবা এখনি যাইতেছে" বালিকা তাহা শুনিবার পাত্র নহে, কোল হইতে উঠিয়া বাবার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আবার বলিল— "না আয়, বর এসেছে—" জুমিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "বর

কে" ? সে বলিল "রাজা। আয় বাবা"। জুমিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইল। জঙ্গ্ বিস্মিত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

জুমিয়া আসিয়া মহারাজকে অভিবাদন করিয়া যখন গম্ভীর নতমুখে দাঁড়াইল তখন তাঁহার সেই অবনত মুখের অন্ধকার দেখিয়া মহারাজ বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে জুমিয়া ? আজ যে এত দেরী হইল ?"

জুমিয়া মুহূর্ত্তকাল তেমনি অবনত দৃষ্টিতে থাকিয়া বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকা খননে প্রবৃত্ত হইল, তাহার পর হঠাৎ পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া বলিল--"তাইত সূর্য্যিটা উঠিয়া গিয়াছে ?"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—"তাইত! সে খবরটা এতক্ষণ পাও নাই ?"

সভাসদগণ হাসিল, জুমিয়াও হাসিতে চেষ্টা করিয়া আবার মুখ নত করিল। মহারাজ বলিলেন "আর বিলম্ব কেন ? অশ্বে চড়িয়া লও—"

জুমিয়ার জন্য একটি সজ্জিত অশ্ব লইয়া একজন অশ্বপাল দাঁড়াইয়াছিল, জুমিয়া সেই অশ্বে উঠিলে মহারাজ তাঁহার অশ্ব চালনা করিয়া দিলেন, নিমেষে শত শত অশ্ব-পদ গ্রাম প্রান্তর কাঁপাইয়া তাঁহার অনুগমন করিল. জুমিয়াও একটি কলের সিপাহীর ন্যায় তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল।

বন বেশী দূর নহে, বৃহৎ অরণ্য বড় বড় গাছে পূর্ণ। বনে শাল আছে, সেগুণ আছে, দেবদারু আছে, ঝাউ আছে, বাবলা আছে, মন্দার আছে, ইহা ছাড়া অপরিচিত বন্য গাছ কত রকমের আছে তাহার সীমা নাই। বহু শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, আগা গোড়া পাতায় ঢাকা সরল—সুদীর্ঘ, স্বল্প-পত্র স্বল্প-শাখা প্রকাণ্ড গুঁড়ি—এইরূপ নানা জাতীয় বন্য বৃক্ষে বন ঢাকিয়া আছে। গাছে গাছে—শৈবাল ঝুলিতেছে, কোন কোন গাছ ফুটন্ত পরগাছায় আগাগোড়া ঢাকা, কোথায় একটি হলদে ফুলের লতা দুই তিনটি গাছকে একত্র বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহাদের গায়ে ফুলের তারকা ফুটাইয়াছে। ফুলে ফুলে মক্ষিকা গুণ গুণ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। দুই গাছের মাঝে মাঝে প্রায়ই বড় বড় এক একটি গোলাকার চালের মত মাকড়শার জাল—তাহা শিশির বিন্দুতে পূর্ণ। গাছের ফাঁক দিয়া তাহাতে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, প্রভাতপবনে ঈষৎ কাঁপিতে কাঁপিতে রৌদ্রকিরণে তাহা ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। কোন কোন ঝাঁকড়া গাছ শাদা মুকুলে ভরা.—কোন কোন গাছ ঘন ঘোর লাল পাতায় মুকুট পরিয়া আছে—দূর হইতে তাহা ফুল বলিয়া মনে হয় কিন্তু কাছে আসিলে সে ভ্রম দূর হয়। আকাশে মেঘের বৈচিত্র্যের ন্যায় ফুল পত্রের এই বর্ণ

বৈচিত্র্যে শ্যাম অরণ্যে অপরূপ শোভা বিকশিত হইয়াছে; আর এই নানাশোভার নানা রকমের, নানা আকৃতির গাছে গাছে মিলিয়া মিশিয়া আকাশ যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই এক ছত্র একাকার অসংখ্য বৃক্ষের মাঝে মাঝে এক একটা পত্র হীন—নিতান্ত অদ্ভুত আকৃতির বৃক্ষ আগা গোড়া শৈবালাবৃত হইয়া, গুড়ির মত দুই চারিটী মাত্র মোটা মোটা শাখা বাহির করিয়া—উচ্চ অরণ্যের মাথার উপর আরো দুই চার হাত উচ্চ হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। অসংখ্য বৃক্ষের মধ্যে দূর হইতে তাহার দিকেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই শৈবালাবৃত শুষ্কপ্রায় প্রকাণ্ড দৈত্যতরু দেখিলে মনে হয়, সে যেন তাহার শৈবাল-লোমশালী শাখা হস্ত বাড়াইয়া অরণ্যের প্রহরীতায় নিযুক্ত।

অরণ্যের বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়—যেন এই ঘনবদ্ধ বৃক্ষাবলীর মধ্যে মক্ষিকা প্রবেশ করিতে পারে না—কিন্তু যতই নিকটবর্ত্তী হও ততই নিবিড়তা যেন দুই পার্শ্বে সরিয়া গিয়া পথিককে পথ দেখাইতে থাকে, অরণ্যে প্রবেশ করিলে গাছের ফাঁকে ফাঁকে কেমন প্রশস্ত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি এক এক স্থান এত প্রশস্ত যে আট দশ জন অশ্বারোহী নির্ব্বিঘ্নে অশ্ব চালনা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে। অরণ্য ও জঙ্গলের মধ্যে এই একটি বিশেষ প্রভেদ—জঙ্গলে পথ মেলেনা অরণ্যের ভিতর প্রশস্ত স্থান। এইরূপ প্রশস্ত স্থানে তৃণক্ষেত্র, তৃণক্ষেত্রের মাঝে মাঝে শ্বেত পীত নীল কত রকম সুগন্ধ তৃণ ফুল, কত রকম সুগন্ধ গাছড়া। বন্য ছাগলেরা তৃণ খাইতে খাইতে কত ফুল কত গুল্ম দলিত করিয়া রাখিতেছে। এক একটি বৃক্ষতল ফলে ফলে বিছান, খরগোষেরা এক একটা ফল সমুখের দুই পায়ে ধরিয়া টুক টুক করিয়া খাইতে বসিয়াছে, মাঝে মাঝে কাল কাল এক একটি কাঠবিড়ালী আসিয়া এক একটা ফল মুখে লইয়া তাড়াতাড়ি গাছের উপর উঠিতেছে। পাহাড়ের গাত্রে কোন কোন স্থানে গাছ পালার মাঝে মাঝে এক একটি সঙ্কীর্ণ প্রণালী। একটা প্রণালী দিয়া নীচে জল পড়িতে পড়িতে পাহাড় প্রাচীরের নীচে একটা গুহার মত হইয়াছে। একটা হরিণ সেইখানে শান্তিতে জল পান করিতেছে। গাছের মধ্যে পাখীরা বসিয়া গান করিতেছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকা অবিশ্রান্ত ঝিঁ ঝিঁ করিতেছে, স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্যের শিরায় শিরায় যেন তাহার প্রশান্ত প্রাণ সঞ্চালিত হইতেছে, সেই প্রাণের মধ্যে নির্ভয়ে শত সহস্র জীব আশ্রয় লইয়াছে।

সহসা এই প্রশান্ত গম্ভীর অরণ্য ভূমির অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিল, শীকারীদের পদদাপে অরণ্য কাঁপিয়া উঠিল। জীব জন্তু কে কোথায় পলাইবে ঠিক নাই, পাখীরা কোলাহল করিয়া গাছ হইতে গাছান্তরে উড়িয়া বসিতেছে; ছাগগণ লাফে লাফে ছুটিয়া অরণ্য ছাড়াইয়া পাহাড়ের উঁচু উঁচু ধারে আসিয়া উঠিতেছে, ক্ষুদ্র খরগোষেরা রাঙ্গা চক্ষু বাহির করিয়া কম্পিত কলেবরে গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়িতেছে,

মহিষ এক একটা পথ হারাইয়া বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহার প্রকাণ্ড গর্জ্জন করিয়া শিং বাঁকাইয়া উর্দ্ধ শ্বাসে চলিয়াছে। ঐ হরিণ সমুখ দিয়া চলিয়া গেল, ঐ একটা নেকড়ে বাঘ পার্শ্বের বন মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। কিন্তু এ সকল জীবের প্রতি আজ শীকারীদের বড় দৃষ্টি নাই, ইহাদের মধ্যে সহসা কোন একটিমাত্র কোন শীকারীর অযত্ন নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হইয়া ভূমি শায়িত হইতেছে, আর সকলে পলায়নের অবসর পাইয়া বাঁচিয়া যাইতেছে। বরাহই আজিকার প্রধান শীকার, এক একটি বরাহের পশ্চাতে শীকারীগণ চৌদিক হইতে ছুটিতেছে, ছুটিতে ছুটিতে বৃক্ষগাত্রে কাহারো অশ্বের গাত্র ঘর্ষিত হইয়া যাইতেছে, শাখায় বাধিয়া কাহারো উষ্ণীষ খুলিয়া পড়িতেছে। একজনের অশ্ব গুড়িতে ঠোক্কর খাইয়া আরোহীকে ফেলিয়া দিল—সেই ভূপতিত শীকারীর চোখের উপর দিয়া অন্য অশ্বারোহীগণ বিস্তৃত একটা গহ্বর প্রণালী উল্লম্ফনে পার হইয়া গেল।

একজন শীকারী বর্ষাঘাতে একটি বরাহ শিশু বিদ্ধ করিয়া বর্ষা তুলিতেছিল, হঠাৎ আর এক জনের বর্ষা তাহার বাহুর মাংস বিদ্ধ করিয়া আবার সেই বরাহের গাত্র বিদ্ধ করিল। এই সময় আর একটা বরাহ পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়, শীকারী বাহুর শোণিত প্রবাহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি ধাবিত হইল। মহারাজ সর্ব্বাগ্রেই একটা বরাহের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন।

এই শ্রান্তিহীন উৎসাহ কোলাহলের এক প্রান্তে জুমিয়া একাকী কেবল তাহার নিরুৎসাহ, বিষাদভার লইয়া একটা পাষাণ দর্শকের ন্যায় অশ্ব পৃষ্ঠে স্তব্ধ বসিয়াছিল। তাহার চারিদিকে উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি, উন্মত্ততা। শীকারের ছুটা ছুটি, শীকারীর চীৎকার-অনুসরণ। এই উন্মত্তকারী শীকার-দৃশ্য অধীর স্বরে ক্রমাগত তাহাকে নিজের দিকে ডাকিতেছে। অশ্ব অধীর হইয়া হ্রেষারব করিয়া উঠিতেছে, অশ্বারোহী তাহাকে বাগাইয়া ধরিয়া মনে মনে বলিতেছে—

"আর না, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে এখন আর তোমরা কেহ জুমিয়াকে আমোদের জন্য ডাকিও না, তোমরা তাহাকে এখন তোমাদের অন্ধকার ভ্রূকুটি দেখাও, সে যে ভয়ানক ব্রতে ব্রতী হইয়াছে তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হউক।"

নিকট দিয়া একটা হরিণ চলিয়া গেল হঠাৎ জুমিয়ার হাতের রাশ শিথিল হইয়া পড়িল, অশ্ব চারি পা তুলিয়া ছুটিবার উদ্যোগ করিল আবার তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় মহারাজ একবার ছুটিয়া জুমিয়ার কাছ দিয়া চলিয়া গেলেন। হঠাৎ যেন মহারাজের কণ্ঠ নিঃসৃত 'জুমিয়া জুমিয়া' আহ্বানে বন তল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার কঠিন প্রাণও যেন বিগলিত হইয়া উঠিল, দুদিন আগের মত মহারাজকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা হইল —কিন্তু দুদিন কি আর এখন

আছে? সে ত বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। এখন ত আর নাগাদিত্য রাজা নহেন, পিতা কহিয়াছেন—এখন যে নাগাদিত্য তাহার শত্রু, সে যে আজ তাঁহাকে মারিতে আসিয়াছে। সে ডাকে আজ আর তাহার পা সরিল না—কে যেন তাহাকে ধরিয়া পাষাণের মত সেইখানে অচল করিয়া রাখিল, মহারাজ চলিয়া গেলেন, সে কেবল সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

মহারাজ বরাহ বিদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন—চারিদিকে একটা আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, মহারাজ জুমিয়ার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"জুমিয়া, তুমি আজ এত শ্রান্ত! কত শীকার করিলে"?

জুমিয়ার দৃষ্টি আবার নত হইয়া পড়িল, তাঁহার দিকে চাহিতে আর যেন তাহার সাহস নাই, সে বলিল—"শীকার কই আজ হইল, পারিল না আজ?"

জুমিয়া আজ শীকার করে নাই, মহারাজ বিস্মিত নিরানন্দ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সভাসদেরা যে আজ জুমিয়ার সম্বন্ধে যাহার যাহা ইচ্ছা বলিয়া লইবে তাহা মহারাজের অসহ্য। এই সময় একটা হরিণকে নিকট দিয়া ছুটিতে দেখা গেল—রাজা বলিলেন—"জুমিয়া, হরিণ হরিণ, মার মার, ছুট, ছুট"

জুমিয়া অস্বাভাবিক স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"হ্যা মারিব মারিব"

কিন্তু অশ্ব ছুটাইল না কেবল হাতের ধনুক তুলিয়া হঠাৎ উঁচু করিয়া ধরিল। ধনুকে যে বাণ অর্পণ করিতে হইবে তাহাও ভুলিয়া গেল। ধনুক মহারাজের প্রতিই যেন লক্ষ্য-নিবদ্ধ হইল—কিন্তু রাজা নির্ভয়ে হাসিয়া বলিলেন—"জুমিয়া বাণ কই? শীঘ্র শীঘ্র।" ইতিমধ্যে আর একজন হরিণকে বাণাহত করিল, রাজার মুখ মলিন হইয়া গেল, চারিদিকের জয়ধ্বনি উঠিয়া থামিয়া গেলে—রাজা অধীর হইয়া বলিলেন—"জুমিয়া ইচ্ছা করিয়া মারিল না—জুমিয়ার আজ কি হইয়াছে!"

জুমিয়া যে তাঁহাকে মারিতে যাইতেছিল—এখনো এই ভালবাসা! এই বিশ্বাস! জুমিয়া আর পারিল না, তাহার অশ্রু উথলিয়া উঠিল, সে ধনুক আবার স্কন্ধে ফেলিয়া বলিল "সত্যই আমি পারিলাম না, মহারাজ আজ্ঞা করুন চলিয়া যাই।"

মহারাজ তাহার অশ্রুজলে, তাহার সেই বিষাদার্দ্র স্বরে আরো ব্যথিত হইলেন, বুঝিলেন আজ শীকারে অকৃত কার্য্য হইয়া জুমিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছে। পাইবারই ত কথা! মহারাজ বলিলেন—"জুমিয়া আজ তোমার কি হইয়াছে?"

জুমিয়া বলিল "মহারাজ আমার অসুখ করিয়াছে; আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না" জুমিয়া অশ্ব ছুটাইয়া গেল। মহারাজের সেদিন শীকারের অর্দ্ধেক আমোদ নষ্ট হইল। সভাসদদিগের আর সে দিন আহ্লাদে ধরিল না।

সন্ধ্যার স্মৃতি।

১

প্রতিদিন দূর হতে তোমাপানে চাই—
আঁখির কিরণ ছুটি
আঁখি পরে পড়ে লুটি
গভীর হরষ মাঝে মগ্ন হয়ে যাই!

২

আমি সন্ধ্যা পৃথিবীর, অতি দীন হীন—
নাহি গুণ রূপ রাশি,
ভুলিয়ে যদি বা হাসি—
বিষাদ অশ্রুর জলে তাহাও মলিন।

৩

তুমি বালা সন্ধ্যা তারা, স্বরগের আলো!
এত কথা এত হাসি
এত ভাল বাসাবাসি!
ক্ষুদ্র আমা পরে কেন এত মায়া ঢালো?

৪

পাতা না ফেলিতে চায় অবাক নয়ন!
কি জানি পলকে যদি
হারাই একটি হাসি
এই ভয় হিয়া মাঝে জাগে অনুক্ষণ।

৫

ও হাসি অমৃতময় স্বরগের ভাষা,
ও হাসির জ্যোতি ছুটে
অসীম শূন্যেতে লুটে
পূরাইছে জগতের সৌন্দর্য্য পিয়াসা।

৬

সুরের লহরী আধো সেই ভাষা গায়।
শিখে আধো আধো খানি
মলয় বায়ু সে বাণী
শিখাইছে বনে বনে কুসুম লতায়।

৭

প্রেমের যৌবন স্বপ্ন সে হাসির ছায়া।
শিশুর অফুট বাণী
সেথাকার স্মৃতিখানি
সেথাকার মধুময় শেষ মোহমায়া।

৮

সে ভাষা বুঝিতে গিয়ে হৃদয় আকুল,
যতই বুঝিতে যাই
কিনারা নাহিক পাই—
ভাবের তরঙ্গ মাঝে হয়ে যায় ভুল।

৯

আপনার ভাষা যেন গিয়াছি ভুলিয়া,
মনে পড়ে পড়ে এই—
ধরি ধরি আর নেই!
প্রাণের অন্তর প্রাণ উঠে আকুলিয়া!

১০

পড়ে না—পড়ে না—তবু পড়ে যেন মনে,
যেন দূরে অতি দূরে,
কোন এক সুরপুরে
এক সাথে আছিলাম মোরা দুই জনে।

১১

সেথায় বসন্ত চির স্বপনে আকুল।
সেথাকার স্নেহ প্রীতি
কেবল নহে গো স্মৃতি,
ঝরিতে ফুটে না যেন সেথাকার ফুল।

১২

সেথায় কাহার যেন আনন্দের তরে,
সখীগণে মিলিমিশি
সাজিয়াছি দিবানিশি
কুসুমের পরিমল সযতনে ধ'রে।
সেথায় কুসুম নাহি ঝরে।

১৩

যেন কত ফুলবাস চয়ন করেছি।
তুলিয়ে শান্তির বাস
মিলায়ে আশার হাস
গাঁথিয়ে মালার রাশ গলায় পরেছি।

১৪

যেন গীত-স্বরে স্বরে—রচেছি শয়ন।
হাসির সুবাস তুলে
মুকুট করেছি চুলে—
বসন রচেছি করি সুষমা চয়ন।

১৫

ভুলে ভুলে যেন যাই—যেন জাগে প্রাণে,
না হইতে মালা গাঁথা
না হইতে হাসি কথা
স্বপন বালক দুষ্ট তার মাঝখানে—

১৬

চুপি চুপি লুকোলুকি উপবনে আসি,
ফুঁদিয়ে উড়াত ফুল,
টেনে খুলে দিত চুল,
ছিঁড়ে দিয়ে বাস-মালা সারা হোত হাসি।

১৭

ধরিতে যেতেম মোরা যদি তারে রাগে,
দূরে থেকে হেসে হেসে
ছুটে ছুটে পালাত সে
কনক মেঘের দ্বার খুলি আগে ভাগে।

১৮

সহসা প্রমোদ হাসি হোত অবসান।
একটি নূতন লোক
সেথাকার দুঃখ শোক
মনে পড়ে আঁখি পথে হোত ভাসমান।

১৯

কত শত লোক সেথা দুঃখ শোকাতুর—
করিতেছে হাহাকার
উথলিত অশ্রুধার
তখনি সুখের সাধ হয়ে যেত দূর।

২০

আকুল নিশ্বাস ফেলি বলিতাম মনে,
উহাদের দুঃখ লয়ে
এ সুখের বিনিময়ে
জনম দেও গো দেব উহাদের সনে।

২১

বুঝি বা এসেছি হেথা লয়ে সে বাসনা!
কই তা পূরিল কোথা—
একটি হৃদয় ব্যথা
একটি ত অশ্রু ফোটা মোছান হোল না!

২২

করুণ নয়নে বুঝি তাই চেয়ে আছ?
হৃদি বড় দুরবল
তাহাতে সঁপিছ বল
হৃদয়ের অবসাদ বুঝি মুছিতেছ?

২৩

এখন সে সখীত্বের এই বুঝি শেষ!
কে আমরা কোন পুরে
চাওয়া চাওয়ি দূরে দূরে,
পুরাতন সে স্মৃতির এইটুকু রেশ!

২৪

এটুকুও যায় যদি ভয়ে ভয়ে থাকি
আকুল নয়ন তুলে
একদিন যদি মূলে
দেখিতে না পাই তোর ও কিরণ আঁখি!

২৫

সারা দিবসের পরে বিশ্রাম কোথায়!
নিরাশায় শ্রান্ত অতি
সে হৃদে দিবে কে জ্যোতি!
ফুটাইবে নিরমল উষা কে সন্ধ্যায়?

২৬

যদি সখি—বুঝি সখি আসিবে সে দিন!
উষাময়ী নিজ দেশে
যাবি তুই ভেসে ভেসে!
উদিবে জীবন সন্ধ্যা—সন্ধ্যা তারা হীন
কে জানে বুঝি বা সখি আসিবে সে দিন!

সমাধি বস্তুটা কি ?

অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশ-শুদ্ধ লোক সভ্যতা সভ্যতা করিয়া ক্ষেপিয় উঠিয়াছিল; কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য আর্য্য করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; এখন আবার, আমাদের দেশের ললাটে—সমাধি সমাধি করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কেহ মনে করিবেন না যে আমরা বলিতেছি—সভ্যতা কিছুই নহে, অথবা আর্য্য ধর্ম্ম কিছুই নহে, অথবা সমাধি কিছুই নহে; উল্টা আরো আমরা এই বলি যে, উহাদের সকলের মধ্যেই নানা প্রকার অমূল্য রত্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—কিন্তু আবার এটাও বলি যে, সেই রত্নগুলির প্রকৃত মর্য্যাদার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া—শুদ্ধ কেবল ঐ শব্দগুলি লইয়া বাহু আস্ফালন এবং অনর্থক প্রলাপোক্তি কর অপেক্ষা চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয়; কেননা, শুদ্ধ কেবল ঐ শব্দ-গুলি লইয়া তুমুল কাণ্ড করিলে তাহাতে লাভের মধ্যে হয় কেবল—সভ্যতার নাম করিয়া স্বেচ্ছাচার প্রচার করা--আর্য্যধর্ম্মের নাম করিয়া কুসংস্কার প্রচার করা—সমাধির নাম করিয়া অন্ধ-শক্তি-বাদ ও নিষ্কর্ম্মতা প্রচার করা--এই মাত্র।

সমাধি আমাদের দেশের একটি পৈতৃক সম্পত্তি বটে, কিন্তু আমাদের দেশের এখন যেরূপ ভাবগতি—তাহাতে শাস্ত্রোক্ত কোন একটি সুনিশ্চিত সত্যেরও নামোল্লেখ করিতে ভয় হয়; মনে হয় যে, সভ্যতা মহল হইতে প্রত্যুত্তর আসিবে—"ঐগুলা—ঐ ছেলে-ভুলানো উপন্যাস-গুলা—আমাদের দেশ হইতে যতদিন না উঠিয়া যাইতেছে, ততদিন আমাদের দেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই;" আর্য্য-মহল হইতে প্রত্যুত্তর আসিবে "এত যুক্তিই বা কেন—এত তর্কই বা কেন—উহা ঋষি-বাক্য তো? না আর কিছু? ক্ষুদ্র একটি ঋষি-বাক্য একদিকে আর সমস্ত ইংরাজি পুঁথি একদিকে—কিসে আর কিসে! দুইকে তুলাদণ্ড ধরিয়া তুলনা কর—দেখিবে যে, ঋষি-বাক্যের গুরুভার ভূতল স্পর্শ করিয়াছে ও গিল্টি করা ইংরাজি ছাইভস্ম-গুলা কড়িকাটে ঠেকিয়াছে; অতএব উহা যদি ঋষি বাক্য হয়, তবে উহার উপর দ্বিরুক্তি করিও না—উহার ভিতর যাহা কিছু আছে তাহার ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সমস্তই নির্ব্বিচারে মানিয়া যাও;" সমাধি-মহল-হইতে প্রত্যুত্তর আসিবে—"বলিতেছ বটে কিন্তু ঋষি-বাক্যের মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করা কি তোমার আমার কর্ম্ম—না কোন ম্লেচ্ছ ইংরাজের কর্ম্ম? কোন একজন অলৌকিক মহাপুরুষের উপদেশ ব্যতিরেকে কাহার সাধ্য যে, উহার ভিতর দন্তস্ফুট করে!" এই তো ব্যাপার! প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের অভক্তি এবং শেষোক্ত সম্প্রদায়-দ্বয়ের অতি-ভক্তি, দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যতই থাকুক্ না কেন—একটি বিষয়ে দুয়ের মধ্যে খুবই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়,—কি? না অন্ধতা। সভ্য-সম্প্রদায় ঋষি-বাক্যের নাম শুনিয়াছেন কি—আর-অমনি জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে একেবারেই হুট করিয়া উড়াইয়া

দে'ন ; ইহারই নাম অন্ধ অভক্তি। তেমনি আবার আর্য্যাদি সম্প্রদায় ঋষি-বাক্যের নাম শুনিয়াছেন কি—আর-অমনি গলিয়া গিয়া তাহাকে মাথায় করিয়া পূজা করেন ; ইহারই নাম অন্ধ অতিভক্তি। একদিকে অন্ধ অভক্তি এবং হুটপাট, আর একদিকে অন্ধ অতিভক্তি এবং গোঁড়ামি, এইরূপ উভয় সঙ্কটের দায় হইতে মুক্তি পাইবার অভিলাষে আমরা একটি সহজ উপায় মনঃস্থ করিয়াছি—তাহা এই ;—আমাদের দেশের শাস্ত্রোক্ত কোন-একটি কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই ঐরূপ উভয়-সংকট অনিবার্য্য হইয়া উঠে ; কিন্তু কোন একটি সুবিখ্যাত ইউরোপীয় গ্রন্থে যদি ঐ কথাটিই নূতন মূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে নিঃশঙ্ক-চিত্তে তাহার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে ; কেননা, প্রথমতঃ তাহাকে হুট করিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় একটা সহজ ব্যাপার নহে, যেহেতু তাহা করিলে আপনারই মূর্খতা আপনি ঘোষণা করিয়া লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহা যুক্তিগর্ভ বিজ্ঞান-বচন ; তাহা বল-গর্ভ শাস্ত্র-বচন নহে যে, কেহ তাহাকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইয়া পার পাইবেন। বলগর্ভ শাস্ত্র-বচনই লোকের গোঁড়ামি আকর্ষণ করে—যুক্তি-গর্ভ বিজ্ঞান-বচন উল্টা আরো লোকের স্বাধীন চিন্তা আকর্ষণ করে। অতএব, এখানে অভক্তি এবং অতিভক্তি দুয়েরই পথ অবরুদ্ধ। এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া প্রথমেই আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়টির বৈজ্ঞানিক ইউরোপীয় মূর্ত্তি পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার পরে তাহার দেশী শাস্ত্রীয় মূর্ত্তি পর্য্যালোচনা করিব। আমাদের গম্য-স্থান একই—প্রভেদ কেবল এই যে, প্রথম-বারে আমরা ইউরোপ হইতে যাত্রারম্ভ করিব ; দ্বিতীয়-বারে ভারতবর্ষ হইতে যাত্রারম্ভ করিব। এইরূপে একই সত্যে দুইদিক্ দিয়া পৌঁছিতে পারা—সত্যের সার্ব্বভৌমিক মাহাত্ম্যের বিশেষ একটি পরিচয়-চিহ্ন। সত্য এ দেশে একরূপ—আর এক দেশে আর একরূপ—নহে ; সত্য সর্ব্বদেশেই সমান ; ইহাই সত্যের সার্ব্বভৌমিক মাহাত্ম্য।

জর্ম্মান-দেশীয় তত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে হেগেল্ সর্ব্বাগ্রগণ্য। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার লেখা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়া তাহার ভিতর তলাইতে গিয়া অনেকেই ভগ্নোদ্যম হইয়া ফিরিয়া আসেন ; কিন্তু সকলেই কিছু আর শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসেন না ; যিনি যেমন ডুবুরী তিনি সেইরূপ কতকগুলি রত্ন তথা হইতে সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনেন। নিম্নলিখিত জ্ঞানের ক্রম-পদ্ধতি সেইরূপ একটি কুড়াইয়া পাওয়া রত্ন ;—

জ্ঞান ক্রিয়ার তিনটি সোপান-পংক্তি ;—(১) Immediate knowledge—Apprehension অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান—ধারণা ;—(২) Mediate knowledge—Reflection, অর্থাৎ ভাবনাত্মক জ্ঞান– ধ্যান ; (৩) Comprehension অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান—সমাধি।

প্রথম; ধারণা। পরীক্ষা-লব্ধ অসম্বদ্ধ (অর্থাৎ খাপছাড়া) এক-একটি বৃত্তান্ত ধারণার গ্রাহ্য বিষয়। বস্তু-সকল প্রথমেই যে-মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, ধারণা তাহাই সত্য বলিয়া

শিরোধার্য্য করে। ধারণা সম্মুখে যাহা উপলব্ধি করে, তাহাই তাহার নিকটে যৎপরোনাস্তি সত্য।

দ্বিতীয়, ধ্যান। ধ্যান সম্মুখস্থিত বস্তুকে চিন্তারূঢ় অন্যান্য নানা বস্তুর সহিত মিলাইয়া দেখে; এইরূপ করিয়া দেখিতে পায় যে, প্রত্যেক বস্তুই অন্যান্য নানা বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত—কোন বস্তুই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে। ধারণার নিকটে সকল বস্তুই স্ব স্ব প্রধান; অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত—প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবিক—প্রত্যেক বস্তুই সর্ব্বতোভাবে সৎ শব্দের বাচ্য। কিন্তু ধ্যান বস্তু-সকলের মধ্যে, ভেদাভেদ, আশ্রয়-আশ্রিত, ইত্যাদি নানা প্রকার সম্বন্ধ-সূত্র অনুসরণ করিয়া দেখিতে পায় যে, প্রত্যেক বস্তুই সমস্তের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত। ধ্যানের কথা এই যে, একটি বালুকণাও যদি সমূলে বিলুপ্ত হয়—তবে নিখিল জগৎ বিকলীভূত হইয়া সেই সঙ্গে লোপ পাইয়া যায়. কেননা সমস্ত জগৎ সেই বালুকণাটির সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত। মনুষ্য যখন বাল্যক্রীড়ার অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারে উপনীত হয়, তখন সে আর নূতন নূতন বস্তুর নূতন নূতন চাকচিক্যে মোহিত হয় না—অকস্মাৎ কোন একটি নূতন সামগ্রী দেখিলে তাহাতেই সে স্বর্গ হাতে পায় না; তখন সে বস্তু-সকলের তত্ত্ব-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিশেষ বিশেষ গুণের সন্ধান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে-কোন বস্তুর যত কিছু গুণ—সমস্তই অন্যান্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞাপক। বস্তুর গুণ কোথায় বস্তুর নিজত্ব প্রতিপাদন করিবে—তাহা না করিয়া উল্টা আরো বস্তুর গুণ বস্তুর নিজত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে; কেননা আপনাতে বদ্ধ না থাকিয়া পরের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত হওয়ার নামই গুণবত্তা। আপনার গুণ প্রকাশ করিবার জন্য সকলেই পর-কে চায়; উদজন বায়ু আপনার জলোৎপাদকতা গুণ প্রকাশ করিবার জন্য অম্লজান বায়ুকে চায়; নবাভ্র আপনার শস্যোৎপাদকতা গুণ প্রকাশ করিবার জন্য পৃথিবীকে চায়; আলোক আপনার ঔজ্জ্বল্য গুণ প্রকাশ করিবার জন্য চক্ষুকে চায়; ইত্যাদি। ধারণার নিকটে যাহা পাকা পোক্ত সুদৃঢ় এবং সুস্থির বলিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, ধ্যান দেখিতে পায় যে, তাহার যত কিছু গুণ—সমস্তই পরের উপরে নির্ভর করিতেছে; সূর্য্য-মণ্ডলে কোথায় কি পরিবর্ত্তন ঘটিল—হয় তো তাহার প্রভাবে পৃথিবীর জল-বায়ুর গুণ একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; প্রত্যেক বস্তুরই নিজ-সত্তা পরসত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেক বস্তু পরের সত্তা লইয়াই সৎ—কাহারো সত্তা সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজের নহে; অতএব জগতে যাহা কিছু সৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা সতের ছদ্মবেশ-ধারী অসৎ বই আর কিছুই নহে। ধারণা সকলকেই সৎ দেখে—ধারণার নিকট অসতের দ্বার একেবারেই অবরুদ্ধ। ধ্যানের চাবিতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অসতের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। অসৎ বলিয়া যে একটা সামগ্রী, ধারণার নিকট তাহা শূন্য বই আর কিছুই নহে; কিন্তু ধ্যানের নিকট

অসৎ প্রলয় একটা গুরুতর ব্যাপার, তাহা সৎ অপেক্ষা কোন অংশেই নূ্যন নহে; কেননা প্রত্যেক বস্তুর নিজ-সত্তা, পর-সত্তার সহিত জড়িত; আর, যে-অংশে তাহাতে পরসত্তার প্রাদুর্ভাব, সেই অংশে তাহাতে নিজ সত্তার অভাব,—সেই অংশে তাহা অসৎ। ধ্যান সকল-বস্তুতেই শুদ্ধ কেবল আপেক্ষিক সত্য অবলোকন করে, কোন-বস্তুতেই সমগ্র সত্য—সর্ব্বাঙ্গীন সত্য—মোট সত্য—প্রকৃত সত্য—খুঁজিয়া পায় না। ধ্যানের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, বস্তু-সকল প্রথমে যে-মূর্ত্তিতে দেখা দেয় তাহা পারমার্থিক সত্য (Noumenon) নহে, তাহা শুদ্ধ কেবল প্রাতিভাসিক সত্য (Phenomenon); প্রাতিভাসিক সত্যের ভিত্তি মূল যাহা—তাহা তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে, তাহাই প্রকৃত সত্য—তাহাই পারমার্থিক সত্য। কিন্তু সে পারমার্থিক সত্য যে, বস্তুটা কি, ধ্যান তাহার কিছুই স্থির করিতে পারে না। এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে কাণ্টের প্রণীত দর্শন-শাস্ত্রের সার মর্ম্মটি হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক; তাহা এই;—

বস্তু-সকলের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যত কিছু গুণ—সমস্তই আকাশ এবং কালে প্রতিভাত হয়। কিন্তু আকাশ এবং কাল এ দুয়ের কোনটিকেই আমরা কোন ইন্দ্রিয়েরই আয়ত্তাভ্যন্তরে ধরিয়া পাই না—না আমরা হস্ত দ্বারা তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে পারি, না চক্ষু দ্বারা তাহার রূপ দর্শন করিতে পারি, না রসনা-দ্বারা তাহার রসাস্বাদন করিতে পারি,—একান্ত-পক্ষেই তাহা ইন্দ্রিয়ের অগম্য। আকাশ এবং কাল শুদ্ধ কেবল আমাদের জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিতেছে, বাহিরের কোন বস্তুকে নহে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সমূহ যখন আকাশ এবং কাল ভিন্ন আর কোথাও প্রতিভাত হইতে পারে না, আর, আকাশ এবং কাল উভয়ই যখন আমাদের জ্ঞানকে ছাড়িয়া স্বতঃ কিছুই নহে, তখন কাজেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ সকল আমাদের জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া স্বতঃ কিছুই নহে। উত্তম; ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকল আমাদের জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া স্বতঃ কিছুই নহে—সমস্তই প্রাতিভাসিক (Phenomenal) এ কথা স্বীকার করিলাম; কিন্তু সেই সকল গুণের অভ্যন্তরে তাহাদের আধার-ভূত বস্তু যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা তো আর প্রাতিভাসিক নহে; সেই আধার-বস্তুর গুণ-গুলি বটে—যতক্ষণ আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে ততক্ষণই আছে, কিন্তু তাহা নিজে তো আর সেরূপ নহে; তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইলেও তাহা আছে—আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ না পাইলেও তাহা আছে, তাহা চিরকালই আছে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকল বটে এই আছে এই নাই; শব্দ যতক্ষণ আমার বা আর কাহারো কর্ণে প্রবেশ করিতেছে ততক্ষণই তাহা আছে; কিন্তু যতগুলা ব্যক্তি শব্দ শুনিতেছে, সকলেই যদি স্ব স্ব কর্ণ আচ্ছাদন করে, তবে আর শব্দের চিহ্ন-মাত্রও থাকে না; কিন্তু শব্দের মূলস্থিত বস্তু যাহা—তাহা পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে—তাহা চিরকালই সমান; শব্দের বিলোপেও তাহার বিলোপ হয় না—শব্দের উৎপত্তিতেও তাহার উৎপত্তি হয়

না—তাহা যাহা ছিল তাহাই আছে ও যাহা আছে তাহাই থাকিবে। অনিত্য গুণ-সত্তা ঐরূপই বটে—আমরা যতক্ষণ তাহা জানিতেছি ততক্ষণই তাহা আছে, আমরা না জানিলেই নাই ; কিন্তু বস্তু সত্তা আমরা জানিলেও আছে, আমরা না জানিলেও আছে ; বস্তু-সত্তা নিত্য এবং নির্ব্বিকার। ইহার উত্তরে কাণ্ট্ বলেন যে, শব্দ যেমন তোমার বা আমার বা আর কাহারো শ্রবণকে আশ্রয় করিয়াই আছে, তেমনি, তুমি যাহাকে আধার-বস্তু বলিতেছ তাহা তোমার বা আমার বা আর কাহারো ভাবনাকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তিতেছে ; প্রভেদ কেবল এই যে, ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য নাকি কালের অভ্যন্তর প্রদেশেই আবদ্ধ থাকে, তাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সকল অনিত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় ; আর, বিশুদ্ধ ভাবনার লক্ষ্য নাকি কালের মূল প্রদেশে—কালের অতীত প্রদেশে—অভিনিবিষ্ট হয়, তাই বিশুদ্ধ ভাবনার বিষয়-সকল নিত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। যখন তুমি একটা আম্র-ফল দেখিতেছ, তখন তুমি তাহার বর্ণ, গন্ধ, আস্বাদ, প্রভৃতি নানা প্রকার গুণ একত্র উপলব্ধি করিতেছ, এই পর্য্যন্ত ; কিন্তু যাহা তুমি চক্ষে দেখিতেছ না, নাশিকায় আঘ্রাণ করিতেছ না—রসনায় আস্বাদ করিতেছ না—এইরূপ একটা নির্গুণ বস্তুকে আনিয়া তুমি যে, তোমার সেই সব দেখা-শুনা গুণ-গুলির স্কন্ধে ছাপাইতেছ—তাহা তুমি কোথা হইতে পাইতেছ? চক্ষু হইতেও নহে নাশিকা হইতেও নহে—রসনা হইতেও নহে, বাহিরের কোন স্থান হইতেই নহে, তবে কি ? না তোমার আপনার মন হইতেই তুমি তাহা উদ্ভাবন করিতেছ। যদি বল যে, "ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকলকে যেমন আমি বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতেছি—তাহাদের বন্ধন-সূত্রকেও তেমনি আমি বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং সেই প্রত্যক্ষ গোচর বন্ধন-সূত্রকেই আমি আধার-বস্তু বলিতেছি—সুতরাং তাহা আমার মনের ভাব-মাত্র নহে" তবে সে কেবল একটা কথার কথা ; কেননা সে তোমার বন্ধন-সূত্র সূতাও নহে, দড়িও নহে, আটাও নহে যে, তুমি তাহাকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিবে ; সুতা, দড়ি, আটা, সমস্তই সগুণ ; কিন্তু তুমি যে-বন্ধন-সূত্রের কথা বলিতেছ তাহা একেবারেই নির্গুণ ; সুতা, দড়ি, আটা, সমস্তই বহির্জগতে পাওয়া যায়, কিন্তু নির্গুণ বস্তু বহির্জগতের কুত্রাপি পাওয়া যায় না—তাহা শুদ্ধ কেবল মনকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তিয়া থাকে। কাণ্ট্ এই যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহার দৌড় অনেকদূর পর্য্যন্ত—ইহাতে দাঁড়ায় এই যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ সকল যেমন আমাদের জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই নহে—তাহাদের আধার-ভূত বস্তুও সেইরূপ আমাদের জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই নহে ; জ্ঞান দুয়েরই মূলাধার ; সুতরাং জ্ঞানই পারমার্থিক সত্য। কিন্তু কাণ্ট্ নিজে এতদূর পর্য্যন্ত যাইতে সাহসী হ'ন নাই। সকলেই জানে যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনিত্য গুণ-সকল জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই নহে ; কাণ্টের নূতন আবিষ্কার এই যে, তাহাদের নিত্য আধার-বস্তুও জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই নহে ; কিন্তু হইলে হয় কি—

কাণ্ট্ দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; একদিকে তিনি বলিতেছেন যে, বস্তু-সত্তা একটি অপরিহার্য্য জ্ঞানগত ব্যাপার, আর-এক-দিকে তিনি বলিতেছেন যে, তাহা একটি জ্ঞান-বহির্ভূত অনির্দ্দেশ্য ব্যাপার। তাহাই যদি হয়—বস্তু-সত্তা যদি একেবারেই অনির্দ্দেশ্য হয়, তবে সেই অনির্দ্দেশ্য সত্তাকে তুমি যে পারমার্থিক ও নিত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ, তাহা কিসের বলে করিতেছ ? অনির্দ্দেশ্য বিষয়ের নির্দ্দেশই বা কিরূপ ? পেড়াপিড়ি করিয়া ধরিলে কাণ্ট্ এখানে বিষম এক ভূজকটে পড়িয়া হাবুডুবু খা'ন। ধ্যানের নিকটে পারমার্থিক সত্য এইরূপ একটা অনির্দ্দেশ্য ব্যাপার। ধ্যান কেবল এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত যে, জগতে সকলই পরতন্ত্র, সকলই সীমাবদ্ধ, সকলই অপূর্ণ; কিন্তু স্বতন্ত্র যে কি, অপরিসীম যে কি, পূর্ণ যে কি,—সে বিষয়ে স্থির কিছুই বলিতে না পারিয়া জগতের মূল প্রদেশ নিতান্তই শূন্য রাখিয়া দেয়। সমাধিই কেবল সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করিতে পারে—তদ্ভিন্ন আর কেহ তাহা পারে না।

তৃতীয়, সমাধি। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সকলেই জানে—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকল জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-সাপেক্ষ; "শব্দ আছে" বলিলেই বুঝায় যে, তাহা কাহারো না কাহারো জ্ঞানে প্রকাশিত আছে; কিন্তু তাহাদের আধার-ভূত নিত্য বস্তুও যে, জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-সাপেক্ষ ইহা কাণ্টের নূতন একটি আবিষ্কার। সমাধির কথা এই যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকলের তাৎকালিক সত্তা (অর্থাৎ তাহারা যে যে সময়ে উপস্থিত হয় তাহাদের সেই সেই সময়ের সত্তা) যেমন তাৎকালিক কোন-না-কোন জ্ঞানের আশ্রয়-সাপেক্ষ, সেইরূপ তাহাদের আধার-বস্তুর নিত্য সত্তা নিত্য-জ্ঞানের—পরমাত্মার—আশ্রয়-সাপেক্ষ; কেননা শব্দাদির সত্তা সময়ে সময়ে আছে অথচ তাহা সেই সেই সময়ে কোন জ্ঞানেই প্রকাশিত নাই—ইহা যেমন অসঙ্গত, চিরন্তন বস্তু-সত্তা চিরকালই আছে অথচ তাহা চিরকাল কোন জ্ঞানেই প্রকাশিত নাই—ইহাও তেমনি অসঙ্গত। কাণ্ট্ বলিয়াছেন যে, নিত্য বস্তু-সত্তা আমাদের ভাবনাকে ছাড়িয়া কিছুই নহে; কিন্তু তাঁহার বলা উচিত ছিল যে, নিত্য বস্তু-সত্তা নিত্য জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই নহে; কেননা, নিত্য বস্তু-সত্তা যদি এরূপ হয় যে, আমরা ভাবিলেই তাহা আছে ও আমরা না ভাবিলেই তাহা নাই—তবে আর তাহার নিত্যতা কোথায় ? তবে তো তাহা শব্দ-স্পর্শাদির ন্যায়—এই আছে এই নাই—অনিত্য। কিন্তু বস্তু-সত্তার নিত্যতা না মানিলেই নয়। আমরা ক্রমাগতই দেখিতেছি যে, পূর্ব্বে যাহা বরফ ছিল—এখন তাহা জল হইয়াছে, ও পূর্ব্বে যাহা জল ছিল এখন তাহা বাষ্প হইয়াছে; কিন্তু এরূপ যত কিছু পরিবর্ত্তন সমস্তই গুণ-গত—একটিও বস্তু-গত নহে। জল কাঠিন্য গুণ পরিত্যাগ করিয়া তারল্য গুণ প্রাপ্ত হইতেছে, তারল্য গুণ পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পত্ব গুণ প্রাপ্ত হইতেছে; বর্ত্তমান গুণ পরিত্যাগ করিয়া গুণান্তর প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু তাহার আধার-বস্তু পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে এবং চিরকালই তাহাই

থাকিবে ; কোন কালেই জল তাহার আধার-বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্বন্তর প্রাপ্ত হইতে পারে না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বস্তু-সত্তা নিত্য এবং নির্বিকার—ইহা না মানিলেই নয়। কিন্তু অনিত্য গুণ-সত্তাই হউক্, আর, নিত্য বস্তু-সত্তাই হউক্—দুইই—সত্তামাত্রই—জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-সাপেক্ষ ; জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া কোন সত্তাই কিছুই নহে ; কেননা, জ্ঞানে যাহা সত্তা-রূপে প্রকাশ পায় অথবা প্রকাশ পাইতে পারে, তাহাই সত্তা ; যাহা কোন জ্ঞানেই প্রকাশ পায়ও না—প্রকাশ পাইতে পারেও না—তাহা কিছুই নহে। অতএব, যদি বলা যায় যে, শব্দাদি গুণ-সকলের আধার-বস্তু পূর্ব্বে কোন জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান ছিল না—এখন কেবল আমার ভাবনাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিতেছে, তবে তাহাতে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, সে আধার-বস্তু পূর্ব্বে ছিল না—এখন তাহা নূতন দেখা দিয়াছে। তোপের ধ্বনি যেমন সূর্য্যাস্ত কালে কাহারো জ্ঞানে প্রকাশিত ছিল না – তাই ছিল না ; রাত্রি নয়টার সময় জ্ঞানে প্রকাশিত হইল, তাই তখন তাহা বর্ত্তমান ; ক্ষণ-পরেই তাহা জ্ঞান হইতে তিরোহিত হইল, তাই তখন আর তাহা নাই; বস্তু-সত্তাও কি সেইরূপ ? বস্তু-সত্তাও কি এইরূপ যে, তাহা পূর্ব্বে কোন জ্ঞানে প্রকাশিত ছিল না,তাই ছিল না; এখন আমার ভাবনাতে প্রকাশ পাইতেছে, তাই আছে; ক্ষণ পরে তাহা যখন আমার ভাবনা হইতে চলিয়া যাইবে তখন আর তাহা থাকিবে না ? তাহা যদি হয়, তবে আর তুমি বস্তু-সত্তাকে নিত্য বলিতে পার না ; তবে তোমার বলা উচিত যে, শব্দও যেমন এই আছে এই নাই, তাহার মূল-স্থিত বস্তু-সত্তাও তেমনি এই আছে এই নাই, দুইই অনিত্য। কিন্তু বস্তু-সত্তা অনিত্য, এ কথা একেবারেই জ্ঞান-বিরুদ্ধ ; মূল বস্তু-সত্তা নিত্য—ইহা না মানিলেই নয়। অতএব, এ কথা কোন কাজের কথা নহে যে, বস্তু-সত্তা আমাদের ভাবনাতে প্রকাশ পাইতেছে, তাই আছে ; কেননা তাহা হইলে তাহার নিত্যতা কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না; তবে কি ? না বস্তু সত্তা নিত্য জ্ঞানে প্রকাশিত—তাই তাহা নিত্য বিদ্যমান। যদি বল যে, বস্তু-সত্তা নিত্য জ্ঞানে প্রকাশিত নাই—অথচ তাহা নিত্য বিদ্যমান, তবে সে কথা বলাও যা—আর এ কথা বলাও তা যে, শব্দ কাহারো কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না—কাহারো জ্ঞানে বিদ্যমান নাই—অথচ তাহা আছে; দুই কথাই অর্থ-শূন্য প্রলাপোক্তি। "আছে" শব্দের অর্থই এই যে, জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে ;—আমার জ্ঞানে না হউক্ আর কাহারো জ্ঞানে—প্রত্যক্ষে না হউক্ স্মরণে—স্মরণে না হউক্ যুক্তিতে—প্রকাশ পাইতেছে ; অতলস্পর্শ সমুদ্রের তল, চন্দ্রের ও-পৃষ্ঠ, আমাদের প্রত্যক্ষে প্রকাশ না পাইলেও তাহা আমাদের যুক্তিতে প্রকাশ পায়, তাই আমরা বলি "তাহা আছে"। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণসকলের আধার-বস্তু—আমাদের ইন্দ্রিয় সমক্ষে নহে—শুদ্ধ কেবল বিশুদ্ধ যুক্তিতে—অতীন্দ্রিয় ভাবনাতে—নিত্য বলিয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বে তাহা যদি আর কোন জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া না থাকে—তবে আমাদের পূর্ব্বে তাহা ছিল এ কথার

আদবেই কোন অর্থ থাকে না। কেননা ছিল যদি—তবে কোথায় ছিল ? আকাশে ? না; ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ-সকলই কেবল আকাশে বিস্তৃত-রূপে প্রকাশ পাইতে পারে ? কালে ? না; শব্দাদির ন্যায়—ক্ষুধাতৃষ্ণার ন্যায়—যাহার উৎপত্তি-বিনাশ আছে, তাহাই কালে প্রকাশ পাইতে পারে। তবে কি তাহা ইতিপূর্ব্বে আদবেই ছিল না ? না, তাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনো আছে, পরেও থাকিবে,—যেহেতু তাহা নিত্য। তাহা ঘটি-বাটীর ন্যায় দেশাভ্যন্তরে ছিল না, ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় কালাভ্যন্তরে ছিল না, দেশ কালের ন্যায় কাহারো জ্ঞানাভ্যন্তরে ছিল না,——তবে "তাহা আদবেই ছিল না" এ কথা না বলিয়া "তাহা ছিল" এ কথা বলিবার অর্থ কি ? তবেই হইতেছে যে, "তাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, এবং চিরকালই থাকিবে" এ কথার অর্থ এই যে, দেশ-কালের অতীত অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য জ্ঞানে—পূর্ব্বেও তাহা বিদ্যমান ছিল, এখনো তাহা বিদ্যমান আছে, এবং চিরকালই তাহা বিদ্যমান থাকিবে। ধ্যান কেবল এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত যে, জগতে সকলই পরতন্ত্র—সকলই সীমাবদ্ধ, সকলই সাবলম্ব, সুতরাং তাহার মূলে স্বতন্ত্র, অপরিসীম, নিরবলম্ব, একটা-না-একটা কিছু আছেই আছে; কিন্তু তাহা যে, কি, ধ্যান সে-বিষয়ে স্থির কিছুই বলিতে না পারিয়া জগতের মূল প্রদেশ নিতান্তই শূন্য রাখিয়া দেয়। ধ্যান যেস্থানটিতে এইরূপ অন্ধকার দেখে, সমাধি সেই স্থানটি জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ দেখিতে পায়;—ধ্যান যেখানে জগতের অপূর্ণ সত্তা—জগতের নেতি নেতি অবলোকন করে, সমাধি সেইখানে পরমাত্মার পরিপূর্ণ সচেতন সত্তা অবলোকন করে। ধ্যানের প্রবাহ একমুখা—তাহা শুদ্ধ কেবল জগতের অপূর্ণতা প্রতিপাদন করিয়াই ক্ষান্ত। সমাধির আকর্ষণ দুইমুখা—তাহা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় নিরন্তর দোলায়িত হইতেছে। এক দিকে তাহা জীবাত্মার অপূর্ণ সত্তার মধ্য দিয়া পরমাত্মার পরিপূর্ণ সত্তায় উপনীত হইতেছে—আর এক দিকে তাহা পরমাত্মার পরিপূর্ণ সত্তার মধ্য দিয়া জীবাত্মার চিরস্থায়ী অস্তিত্ব সমর্থন করিতেছে।

ঈশোপনিষদে একটি শ্লোক আছে; সহসা দেখিলে বোধ হয় যে তাহার গোড়ার সঙ্গে আগার মিল নাই—তাহা বাতুলের প্রলাপোক্তি; কিন্তু কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য সহকারে তাহার মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এমন সারগর্ভ অমূল্য বচন এত সহজে—শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম সরল ভাবে—উদ্গীরিত হওয়া এক যা-কেবল বেদের অভ্যন্তরেই দেখিতে পাওয়া যায়—অন্য কুত্রাপি নহে। শ্লোকটি এই;—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে॥"

অন্ধ তিমিরে তাঁহারা প্রবেশ করেন—যাঁহারা অবিদ্যার উপাসনা করেন; তাহা

অপেক্ষা আরো ঘন অন্ধকারে প্রবেশ করেন—যাঁহারা বিদ্যাতে রত; যাঁহারা বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে এক সঙ্গে জানেন, তাঁহারা অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত উপভোগ করেন।

এই যদৃচ্ছা-বিনির্গত সরল ঋষি-বাক্যটির সঙ্গে এখানকার কষ্ট-কল্পিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইতেছি ; -ধারণা সম্মুখস্থিত আপেক্ষিক সত্যকেই সম্পূর্ণ সত্য মনে করে—পারমার্থিক সত্যের আবশ্যকতাই হৃদয়ঙ্গম করে না, সুতরাং তাহা অবিদ্যাতেই রত; ধ্যান আপনার বিদ্যার মধ্যদিয়া দম্ভ সহকারে পারমার্থিক সত্যে উপনীত হইতে যায়—তাই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসে। ধ্যান মনে করে যে, পারমার্থিক সত্য আমার ভাবনার উপরেই নির্ভর করিতেছে ; কাজেই ধ্যানের খদ্যোত জ্যোতিতে অন্ধকার দূরীভূত না হইয়া উল্টা আরো ঘনীভূত হয়। সমাধি আপনার অবিদ্যার মধ্য দিয়া—অজ্ঞতার মধ্য দিয়া -শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে পূর্ণ জ্ঞানের আশ্রয়ে উপনীত হয়—তাই প্রকৃত সত্যে, পারমার্থিক সত্যে উপনীত হয় ; অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে, অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত উপভোগ করে ; কেননা, পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র এবং নিরবলম্ব সত্তার আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন অপূর্ণ পরতন্ত্র এবং আপেক্ষিক সত্তা এক মুহূর্ত্তও আপনাতে আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না ; কাজেই, আপনার অপূর্ণ জ্ঞানকে—অবিদ্যাকে—যদি আমরা পরম জ্ঞান মনে করি, তাহা হইলে আমরা সত্যে বঞ্চিত হই। কিন্তু যখন আমরা আপনার জ্ঞানে আপনার অবিদ্যা—অজ্ঞতা—উপলব্ধি করি, তখন সেই সঙ্গে পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞানের আশ্রয় উপলব্ধি করি ; এইরূপে অবিদ্যার মধ্যদিয়া বিদ্যাতে উপনীত হই, এবং সেই পরিশোধিত বিদ্যা দ্বারা অমৃত-রস উপভোগ করি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ধারণার নিকটে সম্মুখস্থিত বিষয়ই পরম সত্য; ধ্যানের নিকটে অব্যক্ত বস্তু সত্তাই পরম সত্য, এবং আপনার ভাবনাই পরম জ্ঞান,—সুতরাং ধ্যানের নিকটে সত্য এবং জ্ঞান উভয়ে ছায়াতপের ন্যায় পরস্পর হইতে বিভিন্ন; সমাধির নিকট পরমাত্মাই পরম সত্য, পরমাত্মাই পরম জ্ঞান—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, সুতরাং সমাধির নিকটে সত্য এবং জ্ঞান দুয়ের মধ্যে ব্যবধান নাই ; সমাধির গভীর দৃষ্টিতে জগতের সমস্ত জড়তা এবং অন্ধকার জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া উঠে। সমাধি দেখিতে পায় যে,পূর্ণতার অসীম সমুদ্র আপনার শক্তি দ্বারা আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছেন, আর, সমস্ত তরঙ্গের সহিত আপনার অভেদ ও প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত অন্যান্য তরঙ্গের এবং আপনার প্রভেদ—দুইই একসঙ্গে সমর্থন করিতেছেন। এইরূপ ভেদাভেদ এবং দ্বৈতাদ্বৈত স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মহাকাল এবং খণ্ডকালের ভেদাভেদের প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক। কালের আদ্যোপান্ত সমস্ত মুহূর্ত্ত গুলিকে যদি সমষ্টিরূপে ধরা যায়, তবে সেই মুহূর্ত্ত-সমষ্টির সহিত মহাকালের অভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ

কালের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সহিত আর আর মুহূর্ত্তের এবং মহাকালের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; এ যেমন, তেমনি—সমস্ত জগতের মূলীভূত শক্তির সহিত পরমাত্মার অভেদ এবং প্রত্যেক বিশ্ব-ব্যাপারের সহিত আর আর বিশ্বব্যাপারের এবং পরমাত্মার প্রভেদ,—সমাধির নিকটে দুইই যুগপৎ প্রকাশিত হয়। উপরে যাহা বলা হইল তাহা সংক্ষেপে এই;—ধারণার চক্ষে সকল বস্তুই স্ব স্ব প্রধান, ধ্যানের চক্ষে সকল বস্তুই পরাপেক্ষী, সমাধির চক্ষে সকল বস্তুই পরমাত্মার আবির্ভাব। সমাধি প্রত্যেক বস্তুতেই সর্ব্বতঃ প্রসারিত সম্বন্ধ-সূত্র দেখিতে পায়, এবং সেই সূত্রে প্রত্যেক বস্তুতে সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত জগতের কেন্দ্রস্থিত পরমাত্মাকে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পায়; কালের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এবং অকাশের প্রত্যেক খণ্ডাংশে মহাকাশ এবং মহাকালের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে। ব্রহ্মাণ্ড মনে কর যেন একটি চক্র; ধারণা সেই চক্রের পরিধির এক-একটি খণ্ডাংশেই সন্তুষ্ট থাকে; ধ্যান সেই খণ্ডাংশ-গুলির একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ অনুসরণ করিয়া সমস্ত পরিধি ময় ঘুরিয়া বেড়ায়; সমাধি পরিধি-হইতে কেন্দ্রে অভিনিবিষ্ট হইয়া চক্রের সমগ্র ভাবটি জ্ঞানায়ত্ত করে। এই গেল—ইউরোপীয় দর্শনের সার সংগ্রহ; এখন আমাদের স্বদেশের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করা যা'ক্।

সম্প্রতি আমাদের দেশে সমাধি সমাধি বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, সমাধি এক প্রকার জ্ঞান-শূন্য অবস্থা। জর্ম্মান দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মার্মট্ বলিয়া একরূপ জন্তু আছে—তাহারা সারা শীতকাল কুঁকড়িয়া সুঁকড়িয়া অচেতন প্রায় পড়িয়া থাকে; ইংরাজিতে ইহাকে বলে Hybernation অর্থাৎ হিমপোহানো বা হিমোদ্‌যাপন; কেহ কেহ বলেন যে, এইরূপ হিমোদ্‌যাপনের অবস্থাই সমাধির অবস্থা। কেহ বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সামাধিতে জ্ঞান জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক হইয়া যায় সুতরাং তিনের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সবই তো ইনি বুঝাইলেন—আর সবই তো আমরা বুঝিলাম! জ্ঞান জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় যেখানে জমাট্ বাধিয়া একাভূত হইয়া যায়, সেখানে তো জ্ঞানের উজ্জ্বলতা আরো বেশী হইবার কথা—জ্ঞান নিভিয়া যাইবে কেন? দীপ প্রকাশক—গৃহ প্রকাশ্য; গৃহ শুদ্ধ কেবল প্রকাশ্য—গৃহ প্রকাশক নহে; দীপ আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতেছে—সুতরাং দীপ আপনিই আপনার প্রকাশক এবং আপনিই আপনার প্রকাশ্য; দীপে, প্রকাশক প্রকাশ্য এবং প্রকাশ তিনই জমাট বাঁধিয়া একীভূত হইয়া রহিয়াছে; তাহা বলিয়া দীপের উজ্জ্বলতা কি দীপালোকিত গৃহের অপেক্ষা কোন অংশে কম? না উল্টা আরো বেশী? দীপ যেমন আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, আত্মা সেইরূপ আপনি আপনাকে জানিতেছে—আত্মাতে জ্ঞান জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় তিনই জমাট বাঁধিয়া একীভূত হইয়া রহিয়াছে; ইহাতে জ্ঞানের উজ্জ্বলতা আরো বৃদ্ধি পাইবারই কথা,—জ্ঞানের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির তো কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। দীপ—প্রকাশ প্রকাশক, এবং প্রকাশ্য এ তিনের অভেদ-স্থান বলিয়াই অধিক

পরিমাণে উজ্জ্বল; আত্মা—জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার অভেদ-স্থান বলিয়াই অধিক পরিমাণে জ্ঞানোজ্জ্বল; কিন্তু তুমি তাহার উল্টা কথা বলিতেছ! ফলে, আপনি না বুঝিয়া অন্যকে বুঝাইতে যাওয়াই ঝক্‌মারি। যে-কোন ব্যক্তি যাহা কিছু বোঝে—সমস্তই জ্ঞান দিয়া বোঝে; অজ্ঞান দিয়া কেহ কোন বিষয়ই বুঝিতে পারে না; তুমি বলিতেছ যে, সমাধি-কালে তোমার জ্ঞান ছিল না—সুতরাং তোমার সেই সমাধির অবস্থা তুমি জ্ঞানে উপলব্ধি কর নাই, সুতরাং সমাধি যে, কি, তাহা তুমি জান না—তুমি নিজে জানো না অথচ আমাকে তাহা বুঝাইতে আসিতেছ,—এ বৃথা পণ্ডশ্রম না করিলেই কি নয়! এ কথার প্রত্যুত্তরে ইঁহারা এইরূপ বলেন যে, প্রগাঢ় নিদ্রার অচেতন অবস্থা হইতে যখন আমি জাগিয়া উঠি, তখন এটা আমি বিলক্ষণই বুঝিতে পারি যে, আমি অনতিপূর্ব্বে নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম; সেইরূপ, সমাধি-কালে আমার চেতন না থাকা সত্ত্বেও সমাধি-ভঙ্গের সময় আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, অনতিপূর্ব্বে আমি সমাধিস্থ ছিলাম। এ কথার মধ্যে যদি কোন অর্থ থাকে তবে তাহা এই যে, জাগরণ হইতে ক্রমে ক্রমে নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িবার সময় টুকু, এবং নিদ্রা হইতে ক্রমে ক্রমে জাগরণে ভাসিয়া উঠিবার সময়টুকু, এই দুই সময়ের বৃত্তান্ত যাহা আমরা অস্ফুটরূপে জ্ঞানে উপলব্ধি করি, নিদ্রাভঙ্গে তাহারই প্রতি লক্ষ করিয়া আমরা বলি যে, আমি নিদ্রা হইতে উঠিলাম অথবা কাল রাত্রে নিদ্রা গিয়াছিলাম; কিন্তু মাঝের সময় টুকুর কোন বৃত্তান্তই নিদ্রাভঙ্গের সময় আমাদের জ্ঞানে উদিত হয় না;—সেই মাঝের সময়টিতে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবলবেগে বহিয়াছে কিন্তু আমরা তাহার কিছুই জানি না; হয় তো আমাদের নাশাধ্বনিতে আশ-পাশের লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার কিছুই জানিনা; হয় তো আমরা ঘুমের ঘোরে কত কি প্রলাপোক্তি করিয়াছি, কিন্তু আমরা তাহার কিছুই জানি না। আমরা রাত্রিকালের কোন সংবাদই জানি না, তবে আমরা কি সূত্রে বলি যে, আমরা সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম? আমরা যে, ওরূপ কথা বলি তাহার তাৎপর্য্য শুদ্ধ কেবল এই যে, কল্য যখন আমি শয্যায় শয়ন করিয়াছি, তখন আমি রাত্রির সবে মাত্র প্রারম্ভ দেখিয়াছিলাম, এখন জাগিয়া উঠিয়া প্রভাত দেখিতেছি; ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, মাঝের সময়টি—অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি—আমি নিদ্রায় অতিবাহন করিয়াছি। কিন্তু যদি ঘড়ি না থাকিত, সূর্য্য না থাকিত, ক্ষুধার জ্বালা না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কুম্ভকর্ণের ন্যায় ছয়মাস ধরিয়া গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন থাকিলেও—আমরা ছয়মাস, কি ছয় মুহূর্ত্ত, কি ছয় বৎসর নিদ্রা গিয়াছি—তাহা বলিতে পারিতাম না। সমাধি যদি প্রগাঢ় নিদ্রার ন্যায় অচেতন অবস্থা হয়, তবে দাঁড়ায় এই যে, প্রগাঢ় নিদ্রা যেমন আমাদের জ্ঞানের অতীত—সমাধিও সেই-রূপ আমাদের জ্ঞানের অতীত, সুতরাং দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যে, কি, তাহাও আমাদের জ্ঞানের অতীত; তাহা হইলে দাঁড়ায় যে প্রগাঢ় নিদ্রার অবস্থা এবং মূর্চ্ছার অবস্থা, এ দুয়ের মধ্যে যেমন কোন প্রভেদ নাই; সমাধির অবস্থা এবং সুষুপ্তির অবস্থা এ দুয়ের

মধ্যেও সেইরূপ কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করেন, এমন কি বেদান্ত দর্শন ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতির ন্যায় নিদ্রাকর্ষণকে সমাধির বিঘ্নের মধ্যে ধরিয়াছেন; যথা শঙ্করাচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে;

সমাধৌ ক্রিয়মাণেতু বিঘ্নান্যায়ান্তিবৈ বলাৎ।
অনুসন্ধান-রাহিত্যং আলস্যং ভোগলালসং॥
লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপো রসাস্বাদশ্চ শূন্যতা।
এবং যদ্বিঘ্ন বাহুল্যং ত্যজ্যং ব্রহ্মবিদা শনৈঃ॥

এই শ্লোকটিতে সমাধির আট প্রকার বিঘ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা; অনুসন্ধান রাহিত্য, আলস্য, ভোগ-লালস, লয়, তম, বিক্ষেপ, রসাস্বাদ. শূন্যতা; ইহার মধ্যে লয় শব্দের অর্থ নিদ্রাকর্ষণ। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শাস্ত্রানুসারে সমাধি সুষুপ্তির ন্যায় অচেতন অবস্থা নহে। যুক্তিতে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই;—আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি তিন অবস্থারই সাধারণ কেন্দ্র-স্থল; সুতরাং আত্মার নিজাভ্যস্তরে তিন অবস্থাই ঘনীভূত হইয়া একাকারে পরিণত হইয়াছে; আর সেই যে, তিনের একাকার ভাব, তাহা ঐ তিন অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র চতুর্থ আর একটি অবস্থা; এই জন্য সমাধির অবস্থা বেদান্ত-শাস্ত্রে তুরীয় (অর্থাৎ চতুর্থ) অবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার একটি উপমা; একখানি বেলোয়ারির কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্য কিরণ সঞ্চারিত হইলে, সেই কিরণ প্রধানতঃ তিন বর্ণের তিনটি ছটায় বিভক্ত হয়, পীত, লোহিত, এবং নীল। সূর্য্য মনে কর যেন আত্মা; তাহার কাচ-প্রভিন্ন পীতবর্ণ ছটা মনে কর যেন জাগ্রৎ অবস্থা; লোহিত বর্ণ ছটা স্বপ্নাবস্থা; নীল বর্ণ ছটা সুষুপ্তি অবস্থা; আর মূলস্থিত সূর্য্য-কিরণে ঐ তিন বর্ণ ঘনীভূত হইয়া যে-এক শ্বেতবর্ণে পরিণত হইয়াছে সেই শ্বেতবর্ণ মনে কর যেন সমাধির অবস্থা। সেই শ্বেতবর্ণের মধ্যে, নীলবর্ণ কি না সুষুপ্তির আরাম, লোহিত বর্ণ কিনা স্বপ্নের মনোরাজ্য. এবং পীতবর্ণ কি না জাগ্রৎকালের জ্ঞানরাজ্য, তিনই একত্র ঘনীভূত; অথচ সেই শ্বেতবর্ণ নীলবর্ণও নহে, লোহিত বর্ণও নহে, পাত বর্ণও নহে, কিন্তু তিন হইতেই স্বতন্ত্র চতুর্থ আর একটি বর্ণ। সমাধি কি নহে, এতক্ষণ ধরিয়া কেবল তাহারই ব্যাখ্যা করা হইল; শাস্ত্র এবং যুক্তি দুইকে মিলাইয়া এইরূপ পাওয়া গেল যে, সমাধি সুষুপ্তির ন্যায় অচেতন অবস্থা নহে। এখন শাস্ত্র অনুসারে সমাধি বস্তুটা কি—তাহা দেখা যা'ক।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা॥ ১॥
—পাতঞ্জল যোগ-সূত্র।

কোন একটি লক্ষ্য প্রদেশে চিত্ত-বন্ধনের নাম ধারণা। পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে যে,

সম্মুখস্থিত লক্ষ্য বিষয়কে অন্যান্য বিষয় হইতে স্বতন্ত্র-রূপে অবধারণ করাই ধারণা। এখানে পূর্ব্বাপর স্পষ্টই মিল রহিয়াছে।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং ॥ ২ ॥

সেই লক্ষ্য বিষয়টির প্রতি একটানা চিন্তার স্রোতই ধ্যান। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, লক্ষ্য বিষয়ের সহিত আর আর নানা বিষয়ের সম্বন্ধ অবধারণ করাই ধ্যান। আপাততঃ মনে হয় যে, এ দুই কথার মধ্যে বিশেষ কোন ঐক্য নাই; কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ও দুই কথা একই কথার এ-পিট ও-পিট। আমাদের মন যখন বিশেষ কোন একটি লক্ষ্য বিষয়েতে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহার প্রতি আমাদের চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তখন অনেকানেক বিচিত্র বিষয় সেই চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে; সেই সকল আগন্তুক বিষয়ের সহিত লক্ষ্য-বিষয়ের সম্বন্ধ যতক্ষণ না অবধারিত হয়, ততক্ষণ সেই অসম্বদ্ধ বিষয়-গুলা লক্ষ্য বিষয় হইতে মনকে বিচলিত করিয়া ধ্যানের ব্যাঘাত উৎপাদন করে। কিন্তু ধ্যাতার ধ্যান-সমক্ষে আগন্তুক বিষয়-সকলের সহিত লক্ষ্য বিষয়ের নানা প্রকার সম্বন্ধ-সূত্র যতই ঘনীভূত হয়, ততই সেই সকল সম্বন্ধ-সূত্রের মধ্য দিয়া লক্ষ্য বিষয় ভাবনাতে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। মনে কর যেন একটা গরুর প্রতি ধ্যাতার লক্ষ্য নিবিষ্ট রহিয়াছে; সহসা তাঁহার মনোমধ্যে রাখালের ভাব এবং কৃষকের ভাব উদিত হইল; এখন এ-দুয়ের সঙ্গে গরুর যে, কি সম্বন্ধ, তাহা যদি তাঁহার মনে প্রতিভাত না হয়, তবে তাঁহার মন গরু হইতে বিচলিত হইয়া রাখালে এবং কৃষকে আটকিয়া পড়ে; কিন্তু গরু এবং কৃষকাদি উভয়ের মধ্যগত সম্বন্ধটি যদি তাঁহার মনে জাগরূক হয়, তবে সেই সম্বন্ধের মধ্য দিয়া গরুরই নানা প্রকার গুণ তাঁহার মানসক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়; যেমন রাখালের-সম্বন্ধ-সূত্রে গরুর দুগ্ধ-দাতৃতা—কৃষকের সম্বন্ধ সূত্রে গরুর হলকর্ষণ-ক্ষমতা, ইত্যাদি; ইহাতে করিয়া গরুরই ভাব তাঁহার মনোমধ্যে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়—রাখালের ভাবও নহে, কৃষকের ভাবও নহে। এইরূপ, চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া-আসা নানা-ভাবের সহিত লক্ষ্য বিষয়ের সম্বন্ধ অবধারণ করা এবং সেই সম্বন্ধের মধ্যদিয়া লক্ষ্য বিষয়ের নানা-প্রকার গুণে উপনীত হওয়া—ইহারই নাম ধ্যান। এখানে এইটি দেখা উচিত যে, কোন লক্ষ্য বিষয়েরই সত্তা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে, প্রত্যেক লক্ষ্য বিষয়েরই সত্তা সমস্ত জগতের সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ধ্যাতার নিকটে যদি সমস্ত জগতের সত্তা প্রকাশিত হয়, তবে সেই সম্বন্ধেই তিনি লক্ষ্য বিষয়ের সত্তা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ করিতে সমর্থ হ'ন—নচেৎ তিনি তাহা পারেন না; কেননা লক্ষ্য বিষয়ের সত্তা সমস্ত জগতের সত্তার সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত। কিন্তু সমস্ত জগতের সত্তা ধ্যাতার মনে কিরূপে প্রতিভাত হইবে? ইহার উত্তর এই যে, ধ্যাতার নিকটে—যাহা তাঁহার ধ্যানে প্রকাশিত হইয়াছে, প্রকাশিত হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইতে পারে,

তাহাই জগৎ; ধ্যাতার নিকটে তাঁহার ধীশক্তিই সমস্ত জগতের প্রতিনিধি-স্বরূপ। সমস্ত জগদ্ব্যাপী সত্তার ভাব যাহা ধ্যাতার ধীশক্তিতে নিহিত আছে, ধ্যাতা তাহার মধ্য দিয়াই লক্ষ্য বিষয়ের বাস্তবিক সত্তাতে উপনীত হ'ন। লক্ষ্য বস্তুটির পরিচ্ছিন্ন সত্তার অভ্যন্তরে তিনি তাঁহার সেই চিন্তা-বিনিঃসৃত জগদ্ব্যাপী অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা উপলব্ধি করেন, এবং শেষোক্ত সত্তাকেই তিনি লক্ষ্য বিষয়ের বস্তু সত্তা—বা বাস্তবিক সত্তা—বা পারমার্থিক সত্তা—বলিয়া অবধারণ করেন। এই জন্য ধ্যান-সন্নিধানে এইরূপ একটি সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, বাস্তবিক সত্তা যাহা আমি লক্ষ্য বিষয়েতে অবলোকন করিতেছি, তাহা তো আমারই চিন্তা-বিনিঃসৃত তবে আর তাহা বাস্তবিক কিরূপে? জগদ্ব্যাপী অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা প্রকৃত পক্ষে শুদ্ধ কেবল আমার আপনারই মনের ভাব—পক্ষান্তরে তাহাই লক্ষ্য বস্তুর অন্তর্নিহিত বলিয়া প্রতিভাত হয়; তবে তাহাকে মানসিক সত্তা না বলিয়া বাস্তবিক সত্তা বলি কেন? সমাধি আসিয়া ধ্যানকে এইরূপ একটা বিষম দ্বৈধ এবং সংশয়ের চক্র হইতে উদ্ধার করে।

তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপ-শূন্য মিব সমাধি ॥ ৩ ॥

ধ্যান যখন আপনাকে ভুলিয়া শুদ্ধ কেবল সেই লক্ষ্য বিষয়েতেই তন্ময়ীভূত হয়, তখন তাহা সমাধি বলিয়া উক্ত হয়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, সমাধি পরমাত্মাকেই পারমার্থিক সত্য বলিয়া অবধারণ করে। এ দুই কথার মধ্যে ঐক্য কিরূপ দেখা যাউক,—

সমস্ত জগদ্ব্যাপী একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তার ভাব আমাদের ধীশক্তিতে প্রকাশিত আছে—তাই আমরা বলিতেছি যে, আমাদের ধীশক্তি জগতের নখ-দর্পণ স্বরূপ। কিন্তু ছবির পৃষ্ঠভূমি (Back ground) যেমন ছবি নহে—সেইরূপ জগদ্ব্যাপী সত্তার ভাব জগৎ নহে। জগদ্ব্যাপী সত্তার ভাব শুধু নহে কিন্তু জগৎ স্বয়ং যে জ্ঞানে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত—সে জ্ঞান বাস্তবিকই জগতের নখদর্পণ-স্বরূপ। প্রত্যেক বস্তুর বাস্তবিক সত্তা সেই-জ্ঞানেরই অন্তর্ভূত, এবং সেই-জ্ঞানই আমাদের অপূর্ণ ধী-শক্তির মূলাধার। সে জ্ঞান আমরা কোথা হইতে পাই? এইরূপে পাই;—জ্ঞানে ইহা আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করি যে, বহির্বস্তু-সকলের আপেক্ষিক এবং অপূর্ণ সত্তা আপনাতে আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, আমাদের অপূর্ণ ধীশক্তিও আপনাতে আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। অপূর্ণ সত্তা যেমন পূর্ণ সত্তার আশ্রয়-সাপেক্ষ, অপূর্ণ জ্ঞানও সেইরূপ পূর্ণ জ্ঞানের আশ্রয়-সাপেক্ষ। এইরূপ পূর্ণ জ্ঞানের সহিত অপূর্ণ জ্ঞানের সম্বন্ধসূত্র অনুসরণ করিয়াই সমাধি প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণ সত্তা অবলোকন করে এবং আপনার ধী-শক্তিকে তাঁহারই আশ্রয়ে সঁপিয়া দিয়া উন্নতি হইতে উন্নতিতে পদার্পণ করে। ইহাঁতেই "স্বরূপ-শূন্য মিব" যেন আমি আপনি কিছুই নহি—"অর্থমাত্র নির্ভাসং" ধ্যেয় বস্তুই সর্ব্বস্ব, এইরূপ ভাব সমাধি কালে সাধকের মনোমধ্যে উদিত হয়। এখানে

'ইব' অর্থাৎ "যেন"—এই শব্দটির প্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে আমরা বলি যে, "আমি আপনাতে আপনি নাই;" ইহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ঐ কথাটির সঙ্গে "যেন" এই শব্দটি যুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক—যেন আমি আপনাতে আপনি নাই। কেননা, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে সত্য সত্যই কিছু আর আমি আপনা হইতে একেবারেই অবসৃত হই না—বিলোপ প্রাপ্ত হই না। এ বিষয়ে স্থানান্তরে যাহা বলিয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"সমাধি-কালীন বৃত্তি-বিলোপ সত্যসত্যই কিছু আর বৃত্তিবিলোপ নহে,—তাহার অর্থ স্বতন্ত্র। বৃত্তি বিলোপের অর্থ আর কিছু নহে—যে-বৃত্তি আমাদের অযত্ন-সুলভ তাহার প্রতি আমাদের উপেক্ষা (অর্থাৎ আপেক্ষিক অমনোযোগ) জন্মে, ইহারই নাম বৃত্তি-বিলোপ। পাঠশালার শিশু পুস্তক পড়িবার সময় প্রতি-অক্ষর যত্নের সহিত বানান করিয়া পড়ে,—বানান-কার্য্যে তাহার এখনো রীতিমত ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই; কিন্তু আমরা যখন কোন বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করি তখন আমরা যে বানান করিয়া পড়িতেছি, ইহা আমাদের মনেই থাকে না; বানান-কার্য্য আমাদের নিত্যান্ত অযত্ন-সুলভ বলিয়া তাহার প্রতি আমাদের এতাদৃশ উপেক্ষা। বাস্তবিকই যে আমরা আদবেই অক্ষর বানান্ না করিয়া পাঠ করি, তাহা নহে; আমাদের বানান-রূপী বৃত্তি এরূপ সড়গড় হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যে ধরি না,—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা স্বকার্য্যে ক্ষান্ত থাকে না। সাধনাবস্থায় সাধকের প্রণিধান-বৃত্তি প্রযত্ন-সাপেক্ষ, তাই তাহার প্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি পড়ে; কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় তাহা অযত্ন-সুলভ, তাই তাহার প্রতি তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ থাকে না—অর্থাৎ এত অল্প মনোযোগ থাকে যে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে; ইহারই নাম বৃত্তি-বিলোপ; এতদ্ভিন্ন, বৃত্তি বিলোপ বাস্তবিকই যে, বৃত্তি বিলোপ, তাহা নহে। আমাদের মনোবৃত্তি যখন লক্ষ্য-বস্তুতে সবিশেষ সমাহিত হয়, তখন সেই লক্ষ্য বস্তুটিই আমাদের সর্ব্বস্ব হয়—বৃত্তিটিকে আমরা ভুলিয়া যাই; কিন্তু তাহা বলিয়া বৃত্তিটিকে এত ভুলি না যে, তাহাকে চালনা করিতে ক্ষান্ত থাকি; তবে কি না—তখনকার সে বৃত্তি-চালনা এরূপ অযত্ন-সুলভ যে, তাহা আমরা আদবেই ধর্ত্তব্যের মধ্যে ধরি না; ইহারই নাম সম্যক্ বৃত্তি-বিস্মরণ—ইহারই নাম বৃত্তিবিলোপ; এরূপ বৃত্তি-বিলোপের অবস্থা অচেতন অবস্থা হওয়া দূরে থাকুক—উহা সচেতন অবস্থার পরাকাষ্ঠা। শিশুরা যেমন অনেক বানান করিয়া অল্প পাঠ করে, আমরা তেমনি অনেক বৃত্তি খরচ করিয়া অল্প জ্ঞান লাভ করি,—সমাধিস্থ ব্যক্তি অতীব অল্প বৃত্তি ব্যয়ে (অর্থাৎ অতীব অল্প প্রয়ত্নে) অতীব মহৎ জ্ঞান লাভ করেন; সুতরাং সমাধির অবস্থা অতীব সজ্ঞান অবস্থা। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে সমাধিকে তাই জ্ঞান-সংজ্ঞিক বলিয়াছেন, অজ্ঞান-সংজ্ঞিক বলেন নাই; যথা,—

"বৃত্তি-বিস্মরণং সম্যক্ সমাধি র্জ্ঞান-সংজ্ঞিকঃ।"

বৃত্তি বিস্মরণ-শব্দের অর্থ যে বৃত্তি-বিলোপ নহে—অজ্ঞানাবস্থা নহে—ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছি—এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। শঙ্করাচার্য্য উপরি উক্ত ঐ কথাটি বলিয়া তাহার কিয়ৎ পরেই বলিয়াছেন—

"ভাববৃত্ত্যাহি ভাবত্বং শূন্য বৃত্ত্যাহি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যাহি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্ব মভ্যসেৎ॥
যে হি বৃত্তিং বিজানন্তি জ্ঞাত্বাঽপি বর্দ্ধয়ন্তি যে।
তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবন ত্রয়ং॥
যেষাং বৃত্তিঃ সমাবৃদ্ধা পরিপক্কা চ সা পুনঃ।
তে বৈ সদ্‌ব্রহ্মতাং প্রাপ্তা নেতরে ব্রহ্মবাদিনঃ॥
কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিনঃ।
তেঽপ্যজ্ঞানতমা নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ॥"

বৃত্তি-মান্ সাধকের প্রশংসাবাদ এবং বৃত্তি-হীন ব্রহ্মবাদীর নিন্দাবাদ ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না; ইহাতে জলের ন্যায় স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, সমাধিস্থ ব্যক্তির বৃত্তি-বিলোপ শঙ্করাচার্য্যের মত-বিরুদ্ধ।"

চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ অবশ্য সমাধির পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়—কিন্তু বৃত্তি-নিরোধকে বৃত্তি-বিলোপ বলা কোন-মতেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ কাহাকে বলে এবং তাহা কেন আবশ্যক --তাহা নিম্নের দৃষ্টান্ত দেখিলে সহজেই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। মনে কর, আত্মা কি—তুমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছ; আত্মা যে. কি, তাহা আত্মাই জানে এবং আত্মাই বলিতে পারে,—কিন্তু তোমার কল্পনা-বৃত্তিটি চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহে; আত্মা কোন কথা বলিতে না বলিতেই, কল্পনা শত শত মনগড়া বিষয় আনিয়া তোমার সম্মুখে ধরিতেছে ও বলিতেছে "এই দেখ আত্মা"। অতএব আত্মার নিজের মুখ হইতে তাহার নিজের বৃত্তান্ত শুনিতে হইলে ঐ দুর্দ্দান্ত বালকটিকে ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। কল্পনা-বৃত্তিটিকে যেন আমি নিরোধ করিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমি আমার বিশুদ্ধ জ্ঞান-বৃত্তিকে বিদায় দিয়া—সত্যের অনুসন্ধানে একেবারেই ক্ষান্ত হইয়া—দিব্য আরামে নিদ্রা যাই, তাহা হইলে কি আমি আত্মার নিকট হইতে আমার প্রশ্নের কোন উত্তর পাই? কখনই না। কল্পনাকে নিরোধ করিলে হয় এই—যে-পথ দিয়া সত্য আগমন করিবে সেই পথ পরিষ্কার করা; কিন্তু শুধু পথটি পরিষ্কার করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—কখন্ সত্য আগমন করে তাহার প্রতীক্ষায় সেই পথে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমস্ত বৃত্তিকে উন্মুখ করিয়া রাখিতে হইবে। অতএব চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ বলিতে অসম্বদ্ধ কল্পনা-বৃত্তিরই নিরোধ বুঝায়—বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তির নহে। কঠোপনিষদে স্পষ্টই রহিয়াছে যে, "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু

গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্ম দর্শিভিঃ ॥” সর্ব্ব ভূতে নিগূঢ় এই যে আত্মা ইনি সহজে প্রকাশ পা'ন না; কেবল সূক্ষ্ম-দর্শী ব্যক্তিরা একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধি-দ্বারা ইঁহার দর্শন লাভ করেন।” সমস্ত অসম্বদ্ধ কল্পনা নিরোধ করিয়া আমরা যখন আমাদের কল্পনা-শূন্য প্রশান্ত বুদ্ধিকে আত্মার আবির্ভাব পথে সংযত করি,তখনই আমরা আত্মার নিজের মুখ হইতে তাঁহার নিজের বৃত্তান্ত শুনিয়া—প্রকৃত সত্য অবগত হইয়া—কৃতকৃতার্থ হই। অতএব বৃত্তিনিরোধের অর্থ শুদ্ধ কেবল কল্পনা-নিরোধ—বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি-নিরোধ নহে। যোগ-শাস্ত্রে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাস্ত্র-জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান, অর্থ-শূন্য শাব্দিক জ্ঞান, নিদ্রা এবং স্মৃতি এই সাতটি বৃত্তিই বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আমরা যাহাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তি বলিতেছি তাহা এ সাতটির কোনটিই নহে, সুতরাং তাহার নিরোধ যোগ-শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তি ইন্দ্রিয়-নির-পেক্ষ সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ নহে ; অনুমান, শাস্ত্র-জ্ঞান, মিথ্যা-জ্ঞান, শাব্দিক জ্ঞান এবং স্মৃতি, সমস্তই প্রত্যক্ষ-মূলক—সুতরাং তাহাদের কোনটিই বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তি নহে ; নিদ্রার কথা ছাড়িয়া দেও—কেহই বলিবে না যে, নিদ্রা বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি ; তবে যাঁহারা সমাধিকে পরম সুষুপ্তি বলিয়া জানেন—তাঁহারা একদিন এ কথা বলিলেও বলিতে পারেন যে, নিদ্রাই বিশুদ্ধ জ্ঞান। কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি না, কল্পনা করি-তেছি না, স্মরণ করিতেছি না, অনুমান করিতেছি না—জ্ঞানের এইরূপ অপক্ষপাতী অবস্থাতেই তাহাতে যথার্থ আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশিত হয় ; এইরূপ অবস্থাপন্ন স্বতঃ-সিদ্ধ মৌলিক জ্ঞানকেই আমরা বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি বলিতেছি। এইরূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধি বৃত্তি ব্যতীত আর কোন জ্ঞানেই আত্মার ভাব উপলব্ধি-গম্য নহে। আর একদিক্ দিয়া পাওয়া যায় যে, ধারণা—প্রত্যক্ষ বৃত্তি দ্বারা লক্ষ্য বিষয়েতে আবদ্ধ হয় ; ধ্যান—অনুমান বৃত্তি দ্বারা সেই লক্ষ্য বিষয়ের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে অব্যক্ত শক্তি উপলব্ধি করে ; সমাধি—বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সেই অব্যক্ত শক্তি ভেদ করিয়া পরমাত্মার জ্ঞানময় সত্তা উপলব্ধি করে। সমাধিতে এইরূপ যখন বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তি—অন্তর্মুখী বুদ্ধিবৃত্তি —স্ফূর্ত্তি পাইয়া উঠে, তখন ধারণার প্রত্যক্ষ এবং ধ্যানের অনুমান এ দুই বহির্মুখী বৃত্তি কাজেই অবরুদ্ধ হইয়া যায় ; ইহারই নাম বৃত্তি-নিরোধ। কিন্তু বহির্মুখী বৃত্তির নিরোধে অন্তর্মুখী বৃত্তি নির্ব্বিঘ্নে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। যে সাধক সমাধিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনি সেই অন্তর্মুখী বৃত্তি দ্বারা পরমাত্মার মধ্য দিয়া আপনাকে এবং আপনার মধ্য দিয়া পরমাত্মাকে অবলোকন করেন—তাঁহার জ্ঞান-স্ফূর্ত্তির সীমা পরিসীমা নাই ; তিনি দেখেন—“ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং। নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥” না সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায়, না চন্দ্র তারা ; না এই বিদ্যুৎ সকল প্রকাশ পায়, কোথায় এই অগ্নি ; তিনি প্রকাশ পাইতেছেন, আর, তাঁহাকে আশ্রয়

করিয়া সমস্ত প্রকাশ পাইতেছে—সমস্তই তাঁহার প্রকাশেরই অনুপ্রকাশ। ইহাই সমাধি। কে বলে যে, সমাধি সম্যক্ জ্ঞানের অবস্থা নহে কিন্তু অচেতন অবস্থা! সর্ব্বশেষে এই একটি কথা বক্তব্য যে, জাগরণ হইতে যেমন আমরা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া সুনিদ্রায় নিলীন হই, নিদ্রা হইতে তেমনি স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে জাগ্রত হই। জাগরণের শুভ ফল নিদ্রাতে সংক্রামিত হয়, এবং নিদ্রার শুভ ফল জাগরণে সংক্রামিত হয়। তেমনি সমাধির শুভ ফল ব্যুত্থান অবস্থায় সংক্রামিত হয়, ব্যুত্থানের শুভ ফল সমাধি-অবস্থায় সংক্রামিত হয়। সমাধির শুভ ফল কি? না ব্রহ্মরসামৃত পান; ব্যুত্থানের শুভ ফল কি? না জগতের মঙ্গল-সাধন; দুইই পরস্পরের উপকারী। জগতের হিতসাধন করিলে মনোমধ্যে যেরূপ আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হয়, তাহা সমাধি-সাধনের পক্ষে পরম উপকারী; আবার সমাধি সাধন করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ আধ্যাত্মিক রস এবং আধ্যাত্মিক বলের সঞ্চার হয়, তাহা জগতের হিত সাধনের পক্ষে পরম উপকারী। অতএব এই দুই বিষয়ে যুগপৎ সিদ্ধি লাভ করাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ।*

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ।

বিলাসিতার প্রশস্ত ভিত্তির উপর লক্ষ্ণৌএর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সহরটী ষ্টেসনের অতি সান্নিধ্যেই সংস্থাপিত। আজকাল যেথানে রেলওয়ে ষ্টেসন হইয়াছে—পূর্ব্বে তাহা নবাবের প্রমোদ কানন ছিল। কাল পরিবর্ত্তনে সেই সাধের প্রমোদ কানন এক্ষণে মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। যে স্থান পূর্ব্বে অগণ্য দীপমালায়—মনোহারিণী পুষ্প সজ্জায় শোভিত হইয়া নবাবের মনোরঞ্জন করিত—সেই সুখের

* বর্ত্তমান প্রস্তাবে কাণ্টের মত-সম্বন্ধে যতটুকু বলা নিতান্ত আবশ্যক ততটুকু-মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত থাকা হইয়াছে; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে তৎসম্বন্ধে আর একটু খুলিয়া না বলিলে অনেকের অনেক রূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা; কেহ বা মনে করিতে পারেন যে কাণ্টের ঠিক্ মতটি এখানে ব্যক্ত করা হয় নাই; কেহ বা মনে করিতে পারেন যে, কাণ্ট্ দর্শন-শাস্ত্রের চূড়ান্ত বিচার-নিষ্পত্তি করিয়া চুকিয়াছেন—তাহার উপরে আর কাহারো কোন কথা চলিতে পারে না, ইত্যাদি। আগামী সংখ্যক তত্ত্বোধিনী পত্রিকাতে এই প্রস্তাবটি পুনঃপ্রকাশিত হইবে—তাহাতে কাণ্টের মত আরও বিবৃত করিয়া ব্যাখ্যাত হইবে। অত্র-প্রদর্শিত কাণ্টের মত উপলক্ষে পাঠকের মনে যদি কোন প্রকার ধোঁকা উপস্থিত হয়, তবে তাঁহাকে আমরা আগামী সংখ্যক (পৌষ মাসের) তত্ত্বোধিনীতে প্রকাশিত বর্ত্তমান-বিষয়ক প্রস্তাবটি পাঠ করিতে সবিশেষ অনুরোধ করি।

চারবাগ এক্ষণে অন্ধ তমসাবৃত হইয়া চারিদিকে বনফুল বনলতা ও তৃণ শষ্পাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। যে স্থল পূর্ব্বে উৎসব কোলাহলে, নৃত্যকারী রমণীমণ্ডলীর ভূষণ সিঞ্জনে—মনোহর বেনুনিনাদে, সারঙ্গের প্রাণস্পর্শী মধুরালাপে পরিপূর্ণ থাকিত,—আজ তাহা সদাসর্ব্বদাই রেলওয়ে এঞ্জিনের অপ্রীতিকর কর্ণবিদারী শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে স্থানে প্রতি যামার্দ্ধে সারঙ্গের মধুরালাপ, শ্রবণ-প্রীতিকর নহবৎ ধ্বনির সহিত একপ্রাণে মিশিয়া গিয়া প্রকৃতির সুখ সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিত, কৌমুদী প্লাবিত, ক্ষীণ জ্যোতি-জ্যোতিষ্ক পরিপূরিত নৈশ গগণের শান্তিময় অঙ্কতল কাঁপাইয়া প্রাণের ভিতর ইমন বেহাগের অমৃতময় উৎস-ধারা ছুটাইত, যে মধুর নিক্কনের অনুকরণে পাখীরা ঘুমের ঘোরে ডাকিয়া উঠিত—কোকিল আত্ম বিস্মৃত হইয়া কোকিল-বধূর সহিত প্রাণ ভরিয়া সুধাবর্ষী কুহুরবে দিঙ্মণ্ডল প্লাবিত করিত—আজকাল সেই সাধের নন্দনকানন কেবল ইঞ্জিনের হুস্ হুস্, বড় বড় ঘণ্টার ঠংঠং শব্দে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে স্থানে প্রবেশ করিবা মাত্রই গন্ধবহ আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সুগন্ধি পুষ্প-ঘ্রাণ আনিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিত—আজকাল সেই স্থানে কেবল দগ্ধ মৃদঙ্গারের বিপ্লবকারী গন্ধ অপ্রতিহত প্রভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করিতেছে, নবাবের সাধের কুঞ্জবন এক্ষণে রেলওয়ে ষ্টেশনে পরিণত হইয়াছে।

প্রভাতের ক্ষীণ আলোকচ্ছটা—ক্রমশঃ অত্যুচ্চ সৌধাবলীর ও তরুশিখরগুলির সর্ব্বোচ্চভাগ আলোকিত করিয়া পৃথিবীর অন্ধকার দূর করিয়া দিল। সুশীতল প্রভাত বায়ু মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র বলে আমাদের ক্লিষ্টান্তঃকরণের ও অবসন্ন শরীরের মধ্যে জীবনী-শক্তি ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কষ্টকর ভ্রমণক্লান্তিতে আমাদের যতদূর অবসাদ জন্মিয়াছিল—মধুর প্রভাত বায়ু স্পর্শে তদপেক্ষা শতগুণ চিত্তপ্রসাদ জন্মিল। আমরা বালার্কের নয়ন প্রীতিকর মধুর কিরণে স্নাত ও পরিসিক্ত হইয়া আমাদের আমিনাবাদের বাসায় উপস্থিত হইলাম। আমরা অযোধ্যার বর্ত্তমান রাজধানী লক্ষ্ণৌ প্রবেশ করিয়া যতদূর না প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম—আমাদের পরমাত্মীয় পূজনীয় শ্রীযুক্ত পূ—বাবু আমাদের দেখিয়া ততোধিক প্রীতিলাভ করিলেন।

লক্ষ্ণৌএ আসিয়া সর্ব্ব প্রথমেই আমরা আজব ঘর দেখিতে যাই।

আজব ঘর—লক্ষ্ণৌএর মধ্যে একটী দেখিবার জিনিস বটে। কলিকাতা মিউ-জিয়ামের মত সুবৃহৎ ও নানাবিধ দর্শনীয় বস্তু পরিপূর্ণ না হইলেও ইহাতে দেখিবার জিনিস অনেক আছে। ইহা এক প্রকার লক্ষ্ণৌ প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে বাটীকে এক্ষণে আজব ঘর বলে তাহা পূর্ব্বে নবাবের ছত্র-মঞ্জিল প্রাসাদ-ভুক্ত ছিল। বাটীটী আপাদ মস্তক লোহিত বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া ইহা "লাল বার দোয়ারী" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। "লাল বার দোয়ারি" নবাবী নাম—ইংরাজেরা ইহাকে Coronation hall বলিয়া থাকেন। এই স্থানে পূর্ব্বে অযোধ্যার নূতন

নবাবদিগের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। নবাব যখন ছত্রমঞ্জিল প্রাসাদে থাকিতেন সেই সময়ে 'লাল বার দোয়ারিতে' দরবারাদি বসিত। এই সময়ে ইহা "আম খাস" "দেওয়ান খাসের" কার্য্য করিত।

ছত্রমঞ্জিলের "লাল বার দোয়ারি" ও "কৈসর বাগের" চাঁদনী বার দোয়ারি" এই দুইটীর মধ্যে 'লাল বার দোয়ারিই' অধিকতর প্রশস্তায়তন বলিয়া বোধ হইল। প্রথমোক্তটী অযোধ্যার পঞ্চম নবাব সাদত আলি খাঁর আমলে নির্ম্মিত হয়। দ্বিতীয়টী নবাব ওয়াজিদ আলি সাহার কীর্ত্তি। এইরূপ জনশ্রুতি লাল বার দ্বারীর প্রশস্ত হলটীর আদ্যোপান্ত লোহিত বর্ণ মখ্‌মলে মণ্ডিত ছিল। চাঁদনী বার-দ্বারীর অধিকাংশই রূপার পাতে মোড়া ছিল বলিয়া ইহা চাঁদনী-বারদোয়ারি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। লাল বার-দোয়ারি দ্বিতল—ইহার উত্তর দক্ষিণে সুবিস্তৃত সোপানমালা, এই সোপানরাজির সহায়ে অভিষেক মন্দিরের মধ্যস্থ সুপ্রশস্ত দালানে উপস্থিত হওয়া যায়। দালানটীকে দেখিলেই একটী দরবার গৃহ বলিয়াই বোধ হয়। গৃহটীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ সৌন্দর্য্য যাহা কিছু সমস্তই গিয়াছে এখন কেবল অতীতের স্মৃতির ন্যায় তাহার কঙ্কালরাজি বর্ত্তমান। ইংরাজ তাহার উপর একটু কারিকুরী করিয়া সেই জীর্ণ কঙ্কাল ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু সম্যক্ রূপে কৃতকার্য্য হন নাই।

হতভাগ্য ওয়াজিদ্ আলির রাজ্যচ্যুতির পর ইংরাজেরা লক্ষ্মৌএর একাধিপত্য লাভ করিয়া নবাবী আমলের সমস্ত প্রাসাদ ও অট্টালিকাগুলিই আপনাদের দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। দিল্লীতে ও আগরাতে ইংরাজ বাদসাহী-কীর্ত্তিগুলির যে প্রকার দুর্দ্দশা করিয়াছেন, লক্ষ্মৌ সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। লাল বার-দোয়ারীতে আজবঘর স্থাপন করিয়াছেন—ছত্রমঞ্জিলে গবর্ণমেণ্টের একাউণ্ট অফিস, সিবিলিয়ানী ক্লব ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কৈসর বাগের লোক-বিখ্যাত প্রাসাদের অধিকাংশই উত্তর পশ্চিমস্থ কয়েকটী বিখ্যাত দেশীয় রাজার বৈঠকখানা বা বাগানবাড়ী করিয়া দিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ চাঁদনী-বার-দোয়ারী যদিও এক্ষণে খালি পড়িয়া আছে—তথাপি উত্তর পশ্চিমের গবর্ণর বড়লাট সাহেব কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি লক্ষ্মৌ দেখিতে আসিলে এইস্থানে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করা হয়। কৈসর বাগের বেগম মহলের কিয়দংশ এক্ষণে Octroy office ও অপরাংশ Express খবরের কাগজের ছাপাখানা দ্বারা অধিকৃত। সুতরাং নবাবের অভিষেক গৃহে আজব ঘর দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই। লাল বার-দোয়ারীর উপর-তালায় প্রশস্ত দালানে প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, লক্ষ্মৌএর সুন্দর মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুত্তলিকা ও খেলানা গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্তিকার পুত্তলী নির্ম্মাণ দক্ষতা বিষয়ে, লক্ষ্মৌ আমাদের কৃষ্ণনগরের নিম্নেই আসন পাইবার উপযুক্ত। এখানকার গোলাব দাস একজন শ্রেষ্ঠদরের কারিগর, (clay modeller)। গোলাব দাসের পুত্তলিকাগুলি, লক্ষ্মৌ-

এর নানাশ্রেণীর লোকের মৃত্তিকাময় প্রতিকৃতি। আমীর হইতে আরম্ভ করিয়া মেথর পর্য্যন্ত সকলেরই, বেশভূষার সহিত সুরঞ্জিত মৃন্ময় প্রতিকৃতি গড়া হইয়াছে। প্রতিকৃতি গুলির সহিত জীবিত মনুষ্যদিগের এতদূর সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যে বোধ হয়; জীবন দান করিবার অপেক্ষায় তাহাদিগকে সেই স্থলে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। বস্তুতঃ গোলাব দাসের শিল্প নৈপুন্যের প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না। এই ব্যক্তিই আমাদের কলিকাতার জাতীয় প্রদর্শনীতে মেডাল পাইয়াছিল।

মিউজিয়মে দেখিবার অন্যান্য জিনিসের মধ্যে মুরাদাবাদের, আগরার, সাহারনপুরের ও লক্ষ্ণৌএর শিল্পকার্য্যগুলিই প্রধান। আগরার কারুকার্য্যময় দ্রব্যগুলির মধ্যে উত্তমরূপে পালিশ করা প্রস্তর নির্ম্মিত বোতাম, ছুরীর বাঁট, পিরামিডের ন্যায় গঠন বিশিষ্ট কাগজ চাপা, প্রস্তরময় ফল পুষ্প শোভিত কলমদান,—কোমল পাথরের (soap stone) উপর খোদিত দ্রাক্ষাপত্র ও ফল, সাহেবদের কার্ড রাখিবার পাত্র—মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্স ও soap stone নির্ম্মিত-এক অতি সুন্দর শিল্পকার্য্যময় খোদিত সর্পমূর্ত্তি। ইহা ছাড়া আগরা হইতে আনীত এক বৃহৎ চন্দন কাষ্ঠের দ্বার দেখিলাম। এই কপাট জোড়াটী দেখিয়া সোমনাথ পত্তনের মন্দিরের কথা মনে হইল। এতদ্ভিন্ন মোরাদপুর বুলান্দ সহর প্রভৃতি স্থানের পিত্তল নির্ম্মিত কারুকার্য্যময় দ্রব্যাদি, নানাবিধ সতরঞ্চ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত সাহেবী খানার উপকরণ সমস্ত দেখিলাম। আগরা মিউনিসিপাল বোর্ডের মুন্সী শিবনারায়ণ এই আজব ঘরে তাজমহলের হস্তি দন্ত নির্ম্মিত এক জীবন্ত প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন। চক্ষে না দেখিলে ইহার শিল্প কৌশল বুঝাইবার উপায় নাই। মাঝের দালানে লক্ষ্ণৌ সহরের একটী মৃত্তিকাময় প্রতিকৃতি গ্লাস্‌কেশের মধ্যে স্থাপিত রহিয়াছে। মিউটিনীর পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌএর যে প্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন-অবস্থা ছিল, এই মৃত্তিকাময় প্রতিকৃতির দ্বারা তাহাই বিশদ রূপে দেখান হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষ Bailey Guardএর একটী অবিকল প্রতিকৃতি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইহার কোন স্থানে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার লিখিত বিবরণ সংনিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা পরে উপযুক্ত স্থলে বেলিগার্ডের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিব। মিউজিয়মের বাহিরে আসিয়াই দ্বারের সন্নিকটে আমরা মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার প্রস্তরময় প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। খৃঃ ২২৭ অব্দ হইতে, ২৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত সমুদ্র গুপ্তের রাজত্ব কাল। এই প্রস্তরময় অশ্ব প্রতিকৃতি নেপালে পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আজবঘরে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ও রাজাগণের কয়েক খানি চিত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি, আগরা দুর্গ, তাজমহল, কুতব মিনার গোয়ালিয়র দুর্গ, জুমা মস্‌জিদ, মতি মস্‌জিদ্‌ প্রভৃতি বাদসাহী কীর্ত্তি সমূহের এক একখানি ফটোগ্রাফ্

আছে। এই মিউজিয়মটী একজন জার্ম্মান ডাক্তারের তত্ত্বাবধারণে রক্ষিত। তিনি ইহার Curator বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

লক্ষ্ণৌএর অন্যান্য বিবরণ প্রদান করিবার পূর্ব্বে, আমরা অতি সংক্ষেপে ইহার একটু ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করিব।

লক্ষ্ণৌ একটী প্রকাণ্ড সহর। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, ও বোম্বাই এর নিম্নেই লক্ষ্ণৌএর স্থান নির্দ্দেশ হইতে পারে। সুবিখ্যাত ডাক্তার হণ্টার সাহেবেরও এই মত। লক্ষ্ণৌ একটী "বার কোশী" সহর—অর্থাৎ দ্বাদশ ক্রোশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। লক্ষ্ণৌ ষ্টেসন পার হইয়াই ঠিক্ সম্মুখে একটী রাস্তা পড়ে। এই রাস্তাকে আমিনাবাদের রাস্তা বলে। লক্ষ্ণৌএর মধ্যে আমিনাবাদ সর্ব্বাপেক্ষা জন পূর্ণ। কিয়দ্দূর আসিয়াই একটী বৃহৎ খালের উপর পৌঁছান যায়। খালটী এক্ষণে ধ্বংসাবস্থায় পরিণত। খালের পোল পার হইলেই আমিনাবাদ সহরের মধ্যে প্রবেশ করা হইল। রাস্তাটীর উভয় পার্শ্বেই বড় বড় বাড়ী। কলিকাতার কোন জনতা পূর্ণ পল্লী অনুমান করিয়া লইয়া, তাহা হইতে, গ্যাস্ ও জলের কল বাদ দিয়া ভাবিলেই আমিনাবাদের কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে।

লক্ষ্ণৌ সহরটী গোমতীতীরে স্থাপিত। কলিকাতা হইতে লক্ষ্ণৌএর দূরত্ব ৬১০ মাইল। লক্ষ্ণৌ ডিষ্ট্রীক্টের মোট জন সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। ইহার বর্ত্তমান উন্নতি, নবাবদিগের আমলেই হইয়াছে। ইংরাজের দ্বারা কেবল কতকগুলি রাস্তাঘাট ও বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বহুকাল হইতেই, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী, ওস্তাদী গীত বাদ্যের আকরস্থল বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। * অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে লক্ষ্ণৌ ডিস্ট্রিক্ট একটী সমৃদ্ধি-

---

* যাঁহারা সঙ্গীতের একটুও ধার ধারেন—তাঁহারা সকলেই বোধ হয় ভারত বিখ্যাত "শোরীর টপ্পা" শুনিয়াছেন। অনেকে ভ্রম ক্রমে "শোরীমিয়া" নামক এক সুদক্ষ গায়ককে এই নূতন-বিধ, সঙ্গীত-প্রণালীর উদ্ভাবনকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে—অযোধ্যা নিবাসী—গোলামনবী নামক একজন সুদক্ষ সঙ্গীত শাস্ত্রবিৎ—গান রচনা করিয়া তাঁহার প্রিয়তমা প্রণয়িনী "শোরীর" নামে ভণিতা দিয়া গাইতেন। এই জন্যই অনেকে শোরীকেই গায়ক ও সঙ্গীত রচয়িতা বিবেচনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রায় ৭৬ বৎসর অতীত হইল গোলামনবী পঞ্চাশ বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌ নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

শোরীর টপ্পা কি প্রকার মনপ্রাণহারী সুরলয়ে গঠিত—যাঁহারা প্রকৃত ওস্তাদের মুখে ইহা না শুনিয়াছেন তাঁহারা তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না। টপ্পা-রাতির গান পূর্ব্বে সভ্য সমাজের সীমা বহির্ভূত ছিল। পঞ্জাবী উষ্ট্র চালকেরা ক্লান্ত হইলে এই প্রকার ধরণের গান গাইয়া শ্রান্তি দূর করিত। গোলামনবী মূল সুর-ধরিয়া তাহাকে নানা প্রকারে অলঙ্কৃত, পরিবর্ত্তিত ও উন্নত করিয়া বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর টপ্পার জন্মদান করেন। একটা গল্প শুনিয়াছি—গোলামনবী শৃঙ্খলাবদ্ধ বিহঙ্গিনীকে সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়া—এসরাজের সুরে পূর্ণতানে সুর ভাঁজিতেন সে সুরের

শালী বিভাগ। এই বিভাগের শাসন সম্বন্ধে প্রধান কেন্দ্রস্থল লক্ষ্ণৌ সহর। পূর্ব্বে বারাবাঁকি, দক্ষিণে রায়বেরেলি, পশ্চিমে উনাও ও উত্তরে সীতাপুর ইহার মধ্যবর্ত্তী বিভাগই লক্ষ্ণৌ ডিস্‌ট্রিক্ট নামে কথিত। এই বিভাগে গোমতী ও সহী নাম্নী দুইটী প্রধান প্রধান নদী আছে। গোমতী উত্তর দিক হইতে লক্ষ্ণৌ প্রবেশ করিয়া বরাবর দক্ষিণ বাহিনী হইয়া লক্ষ্ণৌ অতিক্রম করিয়া তৎপরে পূর্ব্বে বারাবাঁকি অভিমুখে ফিরিয়াছে। গোমতীর বৈতা ও লোনী নামে দুইটী প্রশাখা † আছে। সহী নদী লক্ষ্ণৌ ডিস্‌ট্রিক্টের দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্ণৌএর প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করা অতিশয় দুর্ঘট। জনশ্রুতি মুখে যতদূর শোনা যায়, তাহা হইতেই যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। জনশ্রুতি এই যে ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া লক্ষ্মণকে গোমতী তীরস্থ ভূভাগগুলির শাসন ভার প্রদান করেন। অনন্তাবতার লক্ষ্মণদেব, গোমতী তীরস্থ বাসুকীর প্রিয় এক খণ্ড উচ্চ ভূমিতে, স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই রাজধানী

এমনি মধুরতা যে সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ পাখী পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াও উড়িয়া যাইতে চেষ্টা করিত না গোলামনবীর কয়েকজন প্রতিযোগী ওস্তাদ্ দুর্ব্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তাহার সঙ্গীতের মাধুর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য এবং প্রকারান্তরে তাহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য সদ্যোধৃত বনপক্ষী আনিয়া একদিন গানের সময় তাঁহার সম্মুখে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা মনে করিয়াছিলেন বন্য-পক্ষী যন্ত্রের শব্দেই উড়িয়া যাইবে, কিন্তু যখন দেখিলেন চিড়িয়া কোন ক্রমেই স্থান ত্যাগ করিতে চাহে না—তখন তাঁহারা স্বকৃত কার্য্যের জন্য নিজে অপ্রতিভ হইলেন। গোলামনবী সমস্ত বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"ভাই, ক্ষুদ্র বন্য চিড়িয়া যাহা বুঝিল তোমরা বড় বড় ওস্তাদ্ হইয়া তাহা বুঝিতে পারিলে না ইহাই আক্ষেপের বিষয়!"

† গোমতী, সহী ও বৈতা অতি প্রাচীনকাল হইতেই অযোধ্যাপ্রদেশে প্রবাহিতা হইতেছে। ভগবান্ রামচন্দ্রের সময়েও আমরা এই তিনটী নদীর নাম শুনিতে পাই। পিতৃসত্য পালনার্থে রামের বনগমন প্রসঙ্গে অযোধ্যা হইতে চিত্রকূট পর্য্যন্ত বাল্মীকি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদনুসারে ধরিতে গেলে রামচন্দ্র অযোধ্যা হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ মুখে আসিয়া তমসা নদী (সরযু ও গোমতীর মধ্যবর্ত্তী) পার হইয়া কোশল দেশের সীমা সন্নিকট হইয়া বেদশ্রুতি নদী (বৈতী) পার হওনান্তর দক্ষিণমুখে গিয়া গোমতী পার হইলেন। তথা হইতে স্যন্দিকা নদী (বর্ত্তমান সহী) পার হইয়া কোশলদেশ অতিক্রম করিলেন। তথা হইতে গমন করিয়া নিষাদ রাজগুহ কর্ত্তৃক শাসিত শৃঙ্গবেরপুর প্রাপ্ত হইলেন। তথায় গঙ্গা পার হইয়া বৎস দেশ—বৎসদেশ হইতে প্রয়াগাভিমুখে গমন করিলেন। অযোধ্যার মধ্যে গোমতী অতিশয় প্রাচীনা নদী বলিয়া বোধ হয়। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে 'এষো অপশ্রিতো বলো গোমতী মবতিষ্ঠতি" স্থলে যে গোমতীর কথা বলা হইয়াছে—তাহা সম্ভবতঃ এই গোমতী হইতে পারে। গোমতীর বর্ত্তমান অবস্থা অনেকাংশে তাহার প্রাচীনতার পরিচয় দিয়া থাকে।

লক্ষ্মণপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। গোমতী তীর হইতে, ঘর্ঘরার প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগই লক্ষ্মণের শাসনাধীনে ছিল। যে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর সুমিত্রাতনয় স্বীয় রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা অধিকার করিয়া বর্ত্তমান "মচ্ছিভবন" সদর্পে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আজও এখানকার হিন্দুরা এই স্থলকে পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করে। এখনও অনেকের নিকট এই স্থান লক্ষ্মণপুর বলিয়া পরিচিত। এই-স্থান বাসুকীর প্রিয়ভূমি বলিয়া হিন্দুর চক্ষে অতিশয় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত— কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম দ্বেষী প্রধান গোঁড়া মুসলমান বাদসাহ আরঙ্গীব হিন্দুদিগকে মর্ম্মপীড়া দিবার জন্য এই পবিত্রস্থলের উপর এক মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া স্বীয় কীর্ত্তি প্রচার করিয়াছেন ! ! !

লক্ষণের পর হইতে, লক্ষ্ণৌএর আর কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা আকবর বাদসাহের সময়ে আমরা আবার ইতিহাসে, (আইন আক্‌বারী) লক্ষ্ণৌএর নামোল্লেখ দেখিতে পাই—এই সময়ে বা ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই বোধ হয় লক্ষণপুর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "লক্ষ্ণৌ" হইয়া গিয়াছে। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। তখন ইহাতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাসই অধিক ছিল। কিন্তু পারশেষে যখন—সেখ উপাধীধারী মুসলমান সম্প্রদায় এইস্থান দখল করিয়া বাস করিতে লাগিলেন—তখন হইতেই মুসলমান ও অন্যান্য জাতীয় লোক এইস্থানে বসবাস করিতে লাগিল। ইহাদিগের পরে রামনগরের পাঠা-নেরা লক্ষ্ণৌএর কিয়দংশ অধিকার করিয়া লয়েন। তাঁহারা বর্ত্তমান "গোঁলদরজা" পর্য্যন্ত আপনাদের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন,—সেখজাদারা আত্মরক্ষা, ও পাঠানদের অন্যায় আক্রমণ হইতে আপনাদের অধিকৃত সম্পত্তি রক্ষা কারবার জন্য বর্ত্তমান "মচ্ছি ভবনের" নিকট একটী দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে, লক্ষ্ণৌ একটী ক্ষুদ্র গোছের সহর হইয়া পড়ে।

ইহার পর বাদসাহ আকবর লক্ষ্ণৌএর উন্নতি কল্পে দুই চারিটি কার্য্য করিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ লক্ষ্ণৌ ইহার বর্ত্তমান উন্নতির জন্য—ক্রমান্বয়ে, আকবর আসফ-দ্দৌলা ও সাদত আলির নিকট সম্পূর্ণঋণী। মহাত্মা আক্‌বর লক্ষ্ণৌসহর অত্যন্ত পছন্দ করিতেন—বিখ্যাত হিন্দু রাজস্ব-সচিব রাজা টোডরমল্ল, বাদ্‌সাহের অধিকারস্থ সমস্ত ভূভাগের যে এক জরীপ করিয়াছিলেন তাহার মন্তব্যের মধ্যে লক্ষ্ণৌ একটী "জনপূর্ণ," "সুন্দরী নগরী" বলিয়া উল্লেখিত আছে। লক্ষ্ণৌএর যেস্থান আজকাল হিন্দু অধিবাসীগণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। চকের দক্ষিণাংশ সমস্তই প্রায় মহাত্মা আকবর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু-অধিবাসীরঁ সংখ্যা অধিক ছিল ও তিনি স্বীয় জগদ্বিখ্যাত উদারতা গুণে তাহা-দিগকে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। আক্‌বরের পুত্র মির্জাসলিম সাহের

(জাহাঙ্গীর) নামানুসারে, লক্ষ্ণৌএর এক অংশ আজও "মির্জামণ্ডী" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

. মোগল রাজ্যের শেষ দশায়, যখন বাদসাহগণের বলবীর্য্য ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য হইতেছিল সেই সময়ে কয়েকজন বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, বাদসাহদিগের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন ভাবে, ভারতের নানাস্থানে, ইচ্ছামত রাজ্যস্থাপন করেন। ইহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে নিজাম উল্‌মুলুক ও আর্য্যবর্ত্তে সাদত খাঁই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সাদত খাঁ স্বীয় বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে বাদসাহের সরকার হইতে অযোধ্যাসরকারের উজীর নিযুক্ত হন। উজীরি হইতে ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিয়া সাদত খাঁ পরিশেষে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া অযোধ্যায় নূতন রাজবংশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শেষ বংশধর ওয়াজিদ আলিশা সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। সাদত খাঁর বংশধরদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পরে প্রদান করিব।

অযোধ্যা প্রদেশের বর্ত্তমান রাজধানী লক্ষ্ণৌএর কথা বলিতে গিয়া মহারাজ রামচন্দ্রের লীলাভূমি, মহা-কোশলের প্রাচীনা রাজধানী সর্ব্বপুজ্যা বর্ষীয়সী অযোধ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ না লিখিলে প্রবন্ধটী অঙ্গহীন করা হয়। সুতরাং প্রাচীনা অযোধ্যার যথা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

বাল্মীকির সময়ে ভারতের তপোবনময়ী অবস্থা। অনেক স্থলে আর্য্য বংশধরেরা নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। রামায়ণে আর্য্যাবর্ত্তে যে সমস্ত সমসাময়িক সমৃদ্ধি সম্পন্ন ভূভাগের নাম পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কোশল রাজ্য, উত্তর কুরুবর্ষ, বাহিলক, বনায়ু, কাম্বোজ, পহলব, দরদ, কেকয়, বাহিক সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দশার্ণ, অবন্তী, পুষ্কর, পঞ্চাল, কাম্পিল, সুরসেন, সাঙ্কাস্যা, প্রলম্ব, কুরুজাঙ্গল অপরতাল, শৃঙ্গবপুর, বৎস্যদেশ, মহোদয়, গিবিব্রজ, কাশী, মলদ ও করুষ, অঙ্গদেশ, মগধ—(পলাশদেশ) বিশালা, মিথিলা, পুণ্ড্র, বঙ্গ ইত্যাদি। বাল্মীকির বর্ণানুসারে ধরিতে গেলে এই সকল-সমৃদ্ধি সম্পন্ন, সমসাময়িক জনপদের অপেক্ষা উত্তর কোশলের-রাজধানী অযোধ্যার বিস্তৃতি ও ঐশ্বর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল।

কাশীর উত্তর হইতে, বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশ সহ সমস্ত ভূভাগকে কোশল বলিত। ইহা উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর কোশলের রাজধানী অযোধ্যা সরযুতীরে সন্নিবিষ্ট ছিল। ইক্ষাকুবংশীয়েরা সেই স্থলে রাজত্ব করিতেন।—বাল্মীকি অযোধ্যা নগরীর যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে বিশেষ উপলব্ধি হয়—এই ত্রিলোক বিশ্রুত নগরী সেই সময়ে একটী মহা সমৃদ্ধি সম্পন্ন জনপদ ছিল—আমরা অযোধ্যার প্রাচীন সমৃদ্ধি দেখাইবার জন্য বাল্মীকির বর্ণনার অনুসরণ করিলাম।

"স্রোতস্বতী সরযুতীরে প্রচুর ধন ধান্য সম্পন্ন—আনন্দ কোলাহল পূর্ণ, অতি সমৃদ্ধ, কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক বিখ্যাত অযোধ্যা উহার রাজধানী।

মানবেন্দ্রমনু স্বয়ং এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। এই অযোধ্যা নগরী—দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ ও অতিশয় সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত, স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহির্পথ সকল, বিকশিত কুসুম-সমলঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্তা হইয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কবাট, তোরণ এবং প্রণালী বদ্ধ আপণ রহিয়াছে। কোন স্থানে শিল্পীগণ বাস করিতেছে-এবং কোথাও বা অত্যুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজ-পট সকল বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে এবং প্রাকার রক্ষণার্থ লৌহ নির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্র বিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্যশালা সকল ইতস্তত প্রস্তুত আছে—পুষ্প বাটিকা ও আম্রবন সকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে—এবং নানা দেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। উন্নত প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জল দুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—এবং উহা শত্রু ও মিত্র উভয়েরই দুর্গম্য। উহার কোন স্থান, হস্তী, অশ্ব, খর, উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে, এবং কোথাও বা রত্ন নির্ম্মিত প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে এবং কোথাও বা গুপ্তালয় ও সপ্ততল গৃহ নির্ম্মিত আছে ও বারনারীগণ ঐ নগরীতে নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। নগরীর সুবর্ণ খচিত প্রাসাদ সকল অবিরল। এই ভূমি সমতল-নগরী ধান্য তণ্ডুল ও অন্যান্য বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবল লব্ধ বিমানের ন্যায় ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুরুষগণে নিরন্তর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষুরসের মত সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে মৃদঙ্গ, দুন্দভি বীণা ও পণব সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া কর প্রদান করিতেছে।” * * *

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে সূর্য্যবংশীয়দিগের শাসনাধীনে অযোধ্যার উন্নত অবস্থার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাল্মীকির বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত ভাবিলেও ইহা হইতে যে সার সংগ্রহ করা যায় তাহাতেও অন্যান্য জনপদ অপেক্ষা অযোধ্যার সমৃদ্ধি সম্পন্ন অবস্থা বিষয়ে বিশেষ প্রতীতি জন্মে। কিন্তু হায়! কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন। মানবেন্দ্র মনু যে পুরীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—অমিততেজা রঘু ও দশরথ যাহার শাসনদণ্ড চালনা করিয়াছিলেন যেস্থান দেবাবতার রামচন্দ্রের লীলাভূমি—আজ তাহা কালপরিবর্ত্তনে বনজঙ্গল ভগ্নাবশেষ অট্টালিকাস্তূপে সমাবৃত। সেই আর্য্য প্রধান কালের আদর্শ রাজপুরী আজ মহাশ্মশানে পরিণত!! তাই মহাদার্শনিক বড়ই খেদে বলিয়াছেন—

“যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমন স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্য বধারয়।”

ক্রমশঃ।

দু'জনায়।

নীলিমার স্বপন-উপকূলে দুইখানি সান্ধ্য-হৃদয়ের গভীর নিরাশা শেষ চুম্বনের দুইটী কনক রেখায় পরস্পরের গভীর বিস্মৃতি রাখিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল। দু'জনার মিলন-আশার বিকাশে যে দুইটী সুন্দর চম্পক-মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছিল ম্লান-মুখে ছলছলনয়নে তাহা অবসিত হইল। সন্ধ্যার আলুথালু কেশজালের মধ্য দিয়া সেই নিরাশাচ্ছিন্ন বিরহ-আকুলদের চিরবিদায়ের স্মৃতির আকুলতা ফুটিয়া উঠিল। সান্ধ্য নীলিমার একটী গবাক্ষ-দ্বার খুলিয়া একজন গ্রহবালা সেই নিরাশ আকুলতার জন্য একফোঁটা অশ্রুমোচন করিল।

মন্দাকিনীর তীরে দাঁড়াইয়া তাহারা বুঝি একদিন পরস্পরকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল—দুইফোঁটা মরমের অশ্রুজলে পরস্পরের সমস্ত সুখ দুঃখ আশা নিরাশা হর্ষশোকের বন্ধন দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছিল। সেদিনকার কত স্নিগ্ধ নয়নমুছন, কত অব্যক্ত আধ-বিকশিত অধরমিলন, দু'জনার ম্লান হাসিতে আজ বিদায়পরশে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই কল্পতরুমূলে বসিয়া দু'জনে কত কাহিনী গাহিয়াছিল, কত লুকান কথা, মরম-বেদনা, ধীরে ধীরে সেই সুরতরুর চিরবিকশিত পল্লবরাশির শ্যামল যৌবনে ছায়া রাখিয়া দু'জনার হৃদয়কুটীরে সুখের সংসার পাতিয়া বসিয়াছিল, আজ এই নিরাশাচ্ছিন্ন শেষ-মিলনে সেই সকল নিবাতনিষ্কম্প স্মৃতি একবার জ্বলিয়া উঠিল—দূর অন্ধকার ভবিষ্যৎ ধূ ধূ মাত্র জাগিয়া রহিল। সেই মন্দাকিনী তীরে, সেই বীচি-বিক্ষোভশীতল মৃদুস্পর্শ সমীরণে, সেই সুরতরুর শ্যামল যৌবনাচ্ছন্ন হৃদয় মিলনে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে যে আশা বন্ধন সংঘটিত হইয়াছিল, আজ এই জ্বালাময় মুহূর্ত্তে, সম্মুখস্থ ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মহা নৈরাশ্যে, নির্ব্বাপিত চিতানলের মত সেই মহা-আশার অবশিষ্ট ভস্মস্তূপ মাত্র পড়িয়া আছে। সেই ভস্মস্তূপের অন্ধকারে সম্মুখস্থ মরুভূমি ভীষণতর প্রতীয়মান হইতেছে।

তুষারধবল হিমালয়ের তুষারাবৃত উপত্যকায় তাহারা একদিন আত্মীয়স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল—গন্ধর্ব্বেরা সঙ্গীত আলোচনা করিতেছিল, গন্ধর্ব্বদিগের মধুর সঙ্গীতের তালে তালে কিন্নরেরা নাচিয়া বেড়াইতেছিল, দূর কৈলাসগিরির জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ-নীরবতায় প্রতিধ্বনিত হইয়া পর্ব্বতপতির মৃদঙ্গের সাগরগম্ভীর ধ্বনি আসিতেছিল—সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাহারা বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার সময় গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে ধ্যানমগ্ন মহর্ষির পাদবন্দনা করিয়া গঙ্গা যমুনাকে সাক্ষী করিয়া কি কথা বলিয়াছিল। নিরাশ-হৃদয়ের বিচ্ছেদ মুহূর্ত্তে আজ সেই সকল সুখের স্বপ্ন এই শিথিল বন্ধনে ফুটিয়া উঠিল। নীলিমার

স্বপন-উপকূলে দুইখানি সান্ধ্য হৃদয়ের গভীর নিরাশা ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল। ধরণীর নীল চন্দ্রাতপে একটী নীলাভ জ্যোতি চমকিয়া উঠিল।

সেই একদিন। আর এই দিন। স্তিমিত নীলিমার বিমল মুখশ্রীতে নিরাশ-হৃদয়ের কত স্মৃতি-জ্বালা ফুটিয়া উঠিয়া নীরবে অবসিত হইয়াছে। সেই নীরব অবসানের অপরিস্ফুট স্নেহ-চিহ্নে আজ যেন কেমন একটু ম্লান সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে—স্থিরাননা সন্ধ্যার বিকচ অধরের রক্তিম আভায় সেই ম্লান সৌন্দর্য্যের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে দিন চন্দ্রলোকের নীল শৈলমালার শিখরদেশে স্বপনশিশুরা খেলা করিতেছিল—পর্ব্বতের পাদস্থিত শুভ্রহ্রদের প্রসন্ন সলিলে ছায়া দেখিয়া হাসিতেছিল, পরস্পরের মুখের পানে চাহিতেছিল, ছায়ার সঙ্গে ছুটাছুটী খেলিতেছিল। আজ সকলই নীরব। সেই উত্তুঙ্গ মস্তক শৈলমালা দাঁড়াইয়া আছে, হ্রদের প্রসন্ন সলিলে ছায়া পড়িয়াছে কিন্তু সে উচ্ছ্বাসময়ী খেলাধূলা আজ নীরব। ধরণীর নীল চন্দ্রাতপের উষাবরণা-জ্যোতি ফুটিয়া পড়িতেছে। অন্তরীক্ষের একজন পাগলিনী সেই জ্যোতিতে আত্মহারা হইয়া ধরণীতে আপনাকে খুঁজিতে ছুটিয়াছে।

ঐ—দূরে একখানি নিরাশা-দগ্ধ মেঘ জীবনের সমস্ত সুখে বিসর্জ্জন দিয়া ধীরে ধীরে সন্ধ্যার নিকট মরণাশীর্ব্বাদের জন্য আসিতেছে। সে শুষ্ক অধরপ্রান্তে চুম্বনের চপলা আর চমকে না, জটাচ্ছন্ন কেশ জালে ঐরাবতের রজত জল ধারা আর বর্ষিত হয় না। গভীর মর্ম্মযাতনায় তাহার নয়নের অশ্রু শুকাইয়া গেছে। এই অসীম জগৎ তাহাকে ঘিরিয়া বিভীষিকার মত নৃত্য করিতেছে। সুখ দুঃখের শুভ সম্মিলন দেখিয়া সে আজ দিনান্তে মরণ আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছে।

ম্লানমুখে সন্ধ্যাকে সে প্রণাম করিল। সুরলোকের কাহিনীগুলি একে একে প্রকাশ করিল। কত দিনের লুপ্তপ্রায় বিস্মৃতি সেই সুর-কাহিনীতে জাগিয়া উঠিল। মন্দাকিনীর অবিরাম কল-স্রোতে কতদিন কত মরাল যুগল পশ্চাতে অর্দ্ধবিকশিত শুভ্র লাবণ্য-ছায়া মাত্র রাখিয়া নিঃশব্দে ভাসিয়া যাইত; সুর-কাননের অসংখ্য পারিজাতের বিন্দু বিন্দু ঝিকিমিকে মৃদু রেণুগুলি তাহাদের কোমল তুষারধবল গ্রীবাদেশে কত না কুঞ্চিত বঙ্কিম রেখা ফুটাইত—কত না জগতের অসীম রহস্য সেই শুভ্র কোমলতার মধ্যে সমাধি নির্ম্মাণ করিত, অবশেষে একদিন সহসা মরালদম্পতীর প্রাণের উচ্ছ্বাসে এক একটা রহস্য প্রকাশিত হইয়া লক্ষ রহস্যশ্রেণী বাহির হইয়া পড়িত। সুরনদীর তীরে সন্ধ্যার হাত ধরিয়া তখন সে কেমন অজ্ঞাতসারে জীবনের প্রথম কলরব অনুভব করিত। দেবকন্যারা তাহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া কত আগ্রহের সহিত তাহাকে কোলে লইতেন। সে সন্ধ্যার পানে সকরুণ নেত্রে চাহিয়া থাকিত।

জীবনের সেই প্রথম বিকাশে কি সুনির্ম্মলা শান্তি ছিল। কত ঝরা ফুল তাহার চারিদিকে পদদলিত হইয়া শুষ্ক পত্রের নীরব মর্ম্মরে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত সে জানিতেও

পারিত না। এখন ঝরা ফুল দেখিলেই নিজের জীবনের কথা মনে হয়। মনে হয়, ইহাও একটি ঝরা ফুল; সংসারের সহস্র কঠোরতায় দলিত হইয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার স্নেহ মস্তকাঘ্রাণ পাইয়া সে বিদায় লইল। জীবনের অবসানে শৈশবের বারতাগুলি যেমন একে একে ফুটিয়া উঠে, সেই নিরাশাদগ্ধ হৃদয়ের মধ্যেও সেইরূপ পুরাতন কাহিনী গুলি জাগিয়া উঠিল।

যামিনীর সুগভীর নীরবতায় মুগ্ধ হইয়া জগৎ ঘুমাইতেছে। অসীম আকাশে অসীম অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া দু'একটী ক্ষীণ দীপালোকের ঔজ্জ্বল্য মাত্র প্রকাশ করিতেছে। নীলিমার কনক-উপকূলে মহাসাগরের উচ্ছ্বসিত জলরাশি সেই তিমির-বসনা যামিনীর অন্ধকার কেশগুচ্ছের মধ্যে মহোল্লাসে তরঙ্গোৎসব করিতেছে—জলরাশি উঠিতেছে, পড়িতেছে, ভীত বেলাভূমি সঙ্কুচিত ভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

দলে দলে মেঘেরা জলপান করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। কেবল একখানি নিরাশা-দগ্ধ মেঘ সেই নীলিমা উপকূলে দাঁড়াইয়া অতীত-জীবনের প্যানে চাহিয়া দেখিতেছে। শত অতীত কাহিনী তাহার চারিদিকে ধোঁয়ার মত জড় হইতেছে। এই সমস্ত অতীত-স্মৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া সেই নিরাশাদগ্ধ ধীরে ধীরে সাগরে ডুবিয়া গেল। পশ্চাৎ হইতে আর একটী মেঘ ছুটিয়া আসিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সে দিন সেই বিচ্ছেদ-সময়ে যেখানে পরস্পরের বিদায়চাওয়া ম্লানমুখে দুইটী স্নেহের চুম্বন-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল -যেখানে জীবনের সমস্ত ঘটনার উপর বিস্মৃতি চাপা দিয়া তাহারা ধীরে ধীরে ডুবিয়াছিল, ধীরে ধীরে পরস্পরের অজানা আলিঙ্গন খুলিয়া গিয়াছিল— নীলিমার সেই স্বপন উপকূলে, সেই মোহময় কনক-রেখায়, সেই উচ্ছ্বসিত সাগর-কল্লোলে, আজ দু'জনার সমাধি মাত্র অবশেষ রহিল। সে দিনও ত তাহারা এমনি ডুবিয়াছিল, সে দিনও ত এমনি বিস্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে যে আলিঙ্গনে, সে যে চুম্বনে, সে যে দু'জনার নীরব আকুলতায়। আজ সে নিরাশা-জড়িত মৃদু আশা নাই, সে মদির-বিহ্বলতা নাই। জীবনের অবসানে এইখানে দু'জনার সমাধি রচিত হইল। কে জানে, সেখানে তাহাদের অজানা নিশ্বাস কাঁদিয়া বেড়ায় কি না।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্লেটো—কার্ম্মিডিজ্ বা পরিমিত স্বভাব।

কার্ম্মিডিজ্ নামক গ্রন্থে প্লেটো কথোপকথন চ্ছলে পরিমিত স্বভাব কাহাকে বলে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কথকদিগের মধ্যে সক্রেটিস্ নায়ক আর ক্রিটিয়াস্ ও কার্ম্মিডিজ্ অপর দুই মুখ্য ব্যক্তি। কার্ম্মিডিজ্ তরুণ বয়স্ক, সাতিশয় সৌন্দর্য্যশালী এবং পরিমিত স্বভাব বিশিষ্ট; তাঁহার আত্মীয় ক্রিটিয়াস্ প্রৌঢ় ও বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন। সক্রেটিস্ প্রথমতঃ কার্ম্মিডিজ্ এবং পরে ক্রিটিয়াসের সহিত পরিমিত স্বভাব কাহাকে বলে এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিলেন কিন্তু কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। প্লেটোর লিখিত কথোপকথন গুলি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—কতকগুলিতে তিনি আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতি অনুসন্ধান মাত্র করিয়াছেন কিন্তু কোন শেষ ফলে পৌঁছাইতে পারেন নাই, আর কতকগুলিতে শুদ্ধ অনুসন্ধান করিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই কিন্তু অনুসন্ধেয় বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মতামত স্পষ্ট করিয়া, বলিয়া গিয়াছেন। কার্ম্মিডিজ্ প্রথম প্রকারের কথোপকথন।

সক্রেটিস্ বলিতেছেন—গত কল্য সন্ধ্যাকালে আমি পটিডেয়া (নামক স্থানের) সৈন্য দল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং অনেকদিন সহরের বাহিরে ছিলাম বলিয়া আমার পুরাতন আড্ডাগুলি একবার যাইয়া দেখিয়া আসি ভাবিলাম। অতঃপর আমি টরিয়াসের ব্যায়ামশালায় যাইলাম—ইহা নৃপতি আর্কনের* প্রাসাদদ্বারের সম্মুখে অবস্থিত,—

---

* নৃপতি আর্কন শব্দের কথা বঙ্গীয় পাঠককে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। গ্রীস দেশে প্রথমতঃ নৃপতির রাজত্ব ছিল—তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী তাঁহার পরে রাজত্ব লাভ করিতেন। এইরূপ কিছুকাল যাইলে পর একরাজার পর কে আবার রাজা হইবে তাহা গ্রীকগণ নিজে পসন্দ করিয়া লইত, অর্থাৎ পূর্ব্বে রাজার অধিকার প্রজাগণের অনুমোদনের উপর নির্ভর করিত না, এক্ষণে আর তাহা রহিল না; যতক্ষণ প্রজাগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত নূতন রাজা রাজ-অধিকার প্রাপ্ত হইতেন না। এরূপ নিয়ম হইলেও প্রজাগণ কিছুকাল ধরিয়া পূর্ব্ব রাজবংশ হইতেই নূতন রাজা বাছিয়া লইতে থাকিল। এই সময় একটী পরিবর্ত্তন এই ঘটিল যে নৃপতিকে ব্যাসিলেয়স্ (রাজা) নামে না ডাকিয়া লোকে আর্কন (শাসন কর্ত্তা) এই নাম দিল। বারজন আর্কন ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিলে পর আর একটী পরিবর্ত্তন ঘটিল; আর্কনের রাজত্ব সমস্ত জীবন না থাকিয়া কেবল দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল; প্রত্যেক দশ বৎসর পরে পুনরায় একজন আর্কন পসন্দ করিয়া লওয়া হইতে লাগিল। অবশেষে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৮৪ অব্দে এই নূতন নিয়ম হইল যে প্রত্যেক বৎসর নয়জন করিয়া আর্কন নিরূপিত হইবেক; উল্লিখিত রাজ বংশ হইতেই যে কেবল আর্কন মনোনীত হইবে এরূপ নহে, যে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ঐ পদ পাইবে। এক্ষণে গ্রীকদিগের শাসনপ্রণালী রাজতন্ত্র হইতে সম্ভ্রান্ততন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল, অবশেষে উহা

এবং তথায় আমি অনেকগুলি লোক দেখিতে পাইলাম; তাহাদিগের মধ্যে অনেক-কেই আমি জানিতাম কিন্তু সকলকে নহে। আমি তখন সেখানে উপস্থিত হইব ইহা কেহই মনে করে নাই, সুতরাং আমাকে দেখিবা-মাত্রই চারিদিক হইতে সকলে আমাকে অভিবাদন করিল, এবং অর্দ্ধপাগল কেরিফন ছুটিয়া আসিয়া, আমার হাত ধরিল আর বলিল 'সক্রেটিস্, তুমি কি করিয়া ফিরিয়া আসিলে? (আমার এস্থলে বলা আবশ্যক যে আমাদিগের ফিরিয়া আসিবার অনতিপূর্ব্বে পটিডেয়ায় একটী যুদ্ধ হয় এবং ইহার সংবাদ সবেমাত্র আথেন্সে পৌঁছাইয়াছিল।)

আমি বলিলাম "তুমি দেখিতেই পাইতেছ যে আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি"।

সে বলিল যে "এইরূপ জনরব যে যুদ্ধটী ভয়ানক রকমের হয় এবং আমাদিগের পরি-চিত ব্যক্তিদিগের অনেকে সেখানে মারা যায়"।

'সে কথা বড় মিথ্যা নয়' আমি এই উত্তর করিলাম।

সে বলিল 'তুমি হয়ত উপস্থিত ছিলে'?

"হ্যাঁ।"

"তবে বসো, এবং সব কথা বিস্তারিত বল—আমরা এখনও ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিতে পাই নাই।"

'কেরিফন আমাকে যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল আমি সেখানে কালেস্কৃসের পুত্র

সাধারণতন্ত্র হয়; অর্থাৎ প্রথমে কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশের (রাজবংশ), পরে যে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের, অবশেষে যে কোন বংশের (সম্ভ্রান্তই হউক আর সাধারণই হউক) হস্তে শাসনভার ছিল। ঐ নয় জন আর্কনের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানের হস্তে বিচারভার অর্পিত হইত, আর যিনি দ্বিতীয় তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় সমূহের তদারক ও কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। পুরাকালে গ্রীকদিগের রাজাগণ ধর্ম্মের কর্ত্তা ছিলেন, এই নিমিত্ত রাজাকে ব্যাসিলেয়স্ বলিত; এক্ষণে এই দ্বিতীয় আর্কনকেও লোকে আর্কন ব্যাসিলেয়স্ বা নৃপতি আর্কন বলিত। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত ইঁহার হস্তে আরও একটী ভার ছিল; কেহ খুন করিলে কিম্বা অধার্ম্মিকতা দোষে দোষী হইলে তাহাকে বিচারালয়ে আনিয়া শাস্তি দেওয়ানর ভার এই আর্কনের ছিল।

যাহাকে উপরে আমরা ব্যায়ামশালা বলিয়াছি, গ্রীক ভাষায় তাহার নাম প্যালেষ্ট্রা; গ্রীকদিগের দুইপ্রকারের ব্যায়ামশালা ছিল। যেখানে মল্লযুদ্ধ অভ্যাস করা হইত তাহাকে প্যালেষ্ট্রা আর যেখানে অন্যপ্রকারের ব্যায়াম করা হইত তাহাকে জিম্নে-সিয়ম্ বলিত; গ্রন্থে টরিয়াসের প্যালেষ্ট্রা এই কথা আছে। গ্রীকগণ ব্যায়ামের উপ-কারিতা বিলক্ষণ বুঝিত; অল্প বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাহারা সকলেই ব্যায়াম করিত। ব্যায়ামশালায় একপ্রকারের লোক থাকিত, তাহারা যুবক-দিগের স্বভাবে কোন দোষ দেখিলে তাহা শুধরাইয়া দিত; যুবকদিগকে মিতস্বভাব শিক্ষা দেওয়া তাহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

কার্মিডিজ্ শব্দটী যিনি ইংরেজী মতে শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে চাহেন তিনি 'জ'টী বর্গ্য না করিয়া দন্ত্য করিয়া উচ্চারণ করিবেন।

ক্রিটিয়াসের পার্শ্বে বসিলাম এবং তাঁহাকে ও অন্যান্য সকলকে অভিবাদন করার পর আমি সৈন্যদল সম্বন্ধীয় সংবাদ বলিলাম এবং যে যাহা জিজ্ঞাসা করিল তাহার উত্তর দিলাম।"

এইরূপে বন্ধুদিগের প্রশ্নের উত্তর দিয়া সক্রেটিস আবার তাঁহাদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আথেন্সের যুবকদিগের মধ্যে কেহ সৌন্দর্য্য কিম্বা বুদ্ধি কিম্বা উভয়ের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ আছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ক্রিটিয়াস্ তাঁহাকে বলিলেন যে, যুবকদিগের মধ্যে কে কিরূপ সৌন্দর্য্যবান্ তাহা তিনি অবিলম্বেই দেখিতে পাইবেন, কারণ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে অধিক সুন্দর সে তখনই আসিতেছিল। এই যুবকের নাম কার্ম্মিডিজ্—পিতার নাম গ্লকন; গ্লকন ক্রিটিয়াসের খুল্লতাত। সক্রেটিস্ কার্ম্মিডিজকে শৈশবকালে দেখিয়াছিলেন; এবং তখনই তিনি দেখিতে সবিশেষ সৌন্দর্য্য-শালী ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে দেখিবামাত্রই তিনি চমৎকৃত হইলেন। পরে যখন ক্রিটিয়াসের আদেশমতে কার্ম্মিডিজ্ আসিয়া তাঁহার ও সক্রেটিসের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন এবং সক্রেটিস্ তাঁহার অঙ্গশোভা দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে বর্ত্তমানকালে জনসমাজে সৌন্দর্য্য-বতী নারীদিগের যেরূপ আদর দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাতনকালে গ্রীকদিগের মধ্যে সুন্দর যুবকদিগেরও সেইরূপ আদর ছিল; এক্ষণেও অবশ্য একজন সুন্দর যুবক দেখিলে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু গ্রীকজাতিদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের যত আদর ছিল, তত আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না; গ্রীকদিগের সৌন্দর্য্য দেখিবার ও তাহার সমাদর করিবার চক্ষু ছিল বলিয়াই তাহারা স্থপতি বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিয়াছিল। প্লেটো কার্ম্মিডিজের সভামধ্যে আগমনের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—যুবক যেদিকে যাইতেছেন সেদিকে আবালবৃদ্ধ সকলেই তাঁহার অনুধাবন করিতেছে; তিনি যেন একটী প্রস্তর নির্ম্মিত পুতুল লোকে এইরূপ ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। যখন তিনি আসন গ্রহণ করিতে আসিলেন, তখন লোকে ঠেলাঠেলি করিয়া আপনাদিগের পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইতে চেষ্টা পাইল; যখন তিনি সক্রেটিসের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ব্যায়ামশালার সমুদয় লোক আসিয়া তথায় জড় হইল। প্লেটোর রচনায় এইরূপ অনেক বর্ণনা ও কাব্যবিষয়ক চাতুর্য্য আছে বলিয়াই অদ্যাবধিও লোকের নিকট তাঁহার গ্রন্থগুলি পুরাতন হয় নাই। পূর্ব্বকালে আকাডেমিতে তাঁহার ছাত্রগণ যেরূপ আগ্রহ ও যেরূপ সমাদরের সহিত তাঁহার প্রস্তাবাবলী পাঠ করিত, এক্ষণেও অক্স্ফোর্ড ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকগণ সেইরূপ আগ্রহ ও সেইরূপ সমাদরের সহিত তাহা পাঠ করে। বিভেদ এই যে পূর্ব্বে কেবল ক্ষুদ্র গ্রীক দেশে গ্রীক উপনিবেশে ও কেবল গ্রীক ভাষাতেই প্লেটোর রচনা অধীত হইত, এক্ষণে সমগ্র

সভ্যজগতে নানাজাতি নানা ভাষায় উহা পাঠ করিয়া থাকে! জড়জগতের সাম্রাজ্য অপেক্ষা মানসিক জগতের সাম্রাজ্য যে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহার আর ইহা অপেক্ষা কি মহত্তর দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

কার্ম্মিডিজের শিরঃপীড়ার চিকিৎসা করা হইবে এই ভাণ করিয়া ক্রিটিয়াস্ তাঁহাকে সক্রেটিসের সমীপে আনয়ন করেন। সক্রেটিস কার্ম্মিডিজ্‌কে বলিলেন যে তিনি যাহার নিকট ঐ রোগের ঔষধ প্রাপ্ত হয়েন, সে ব্যক্তি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেয় যে শরীরের চিকিৎসা করার পূর্ব্বে প্রথমতঃ মন্ত্র দ্বারা মনের চিকিৎসা করিতে হইবে। কারণ শরীরের কোন বিশেষ অঙ্গের চিকিৎসা করিতে যেমন সমুদয় শরীরের চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয় সেইরূপ শরীরের চিকিৎসা করিতে হইলে আবার শরীর ও মন উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সক্রেটিস্ আরও বলিলেন যে উক্ত মন্ত্র দ্বারা মনে পরিমিত স্বভাব উৎপাদন করিতে হয় আর তাহা হইলেই শীঘ্র শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হইতে পারে। ইহা শুনিয়া ক্রিটিয়াস বলিলেন যে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র শুদ্ধ যে সৌন্দর্য্যের নিমিত্তই বিখ্যাত এরূপ নহে; পরিমিত স্বভাবের নিমিত্তও তিনি বিখ্যাত।

ইহা শুনিয়া সক্রেটিস কার্ম্মিডিজকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার পিতৃ ও মাতৃ কুলের গুণ কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন "তুমি যে দুই মহৎবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তাহাতে তোমার অন্যান্য সকলকে সর্ব্বগুণে অতিক্রম করারই কথা। তোমার মাতুল পিরিলাম্পিস পারস্য দেশের মহারাজার সভায় রাজদূত ছিলেন, সেখানে আকৃতি ও সৌন্দর্য্যে কেহ তাঁহার সমতুল্য ছিল না; তিনি (আসিয়ার) মহাভূমিতে অন্যান্য যে যে স্থানে অবস্থিতি করেন, সেখানেও ঐরূপ ঘটে। তুমি দেখিতে যেরূপ সুপুরুষ, তোমার স্বভাবও যদি সেইরূপ সুন্দর হয় তাহা হইলে আর তোমাতে পূর্ব্ব কথিত মন্ত্র দেওয়ার কোন প্রয়োজন হইবে না। এক্ষণে বল ক্রিটিয়াস তোমার স্বভাব সম্বন্ধ যাহা কহিয়াছেন তাহা সত্য কি না।" কার্ম্মিডিজ ইহাতে উভয় সঙ্কটে পড়িলেন এদিকে তাঁহার স্বভাব পরিমিত নহে একথাও বলিতে পারেন না, অপরদিকে আবার যদি বলেন 'হ্যাঁ' তাহা হইলেও আবার আত্ম প্রশংসা কথন দোষে দূষিত হইতে হয়। সক্রেটিস তখন এক সহজ উপায় স্থির করিলেন; তিনি কার্ম্মিডিজের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহার স্বভাব পরিমিত কি না ইহা তাঁহারা দুইজনে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কার্ম্মিডিজও ঐ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। সক্রেটিস তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"পরিমিত স্বভাব কাহাকে বলে? তোমাতে বাস্তবিকই যদি এই সদ্‌গুণ বর্ত্তমান থাকে তবে উহা কিরূপ পদার্থ তাহাও তুমি জানিবে।"

"হ্যাঁ, যাহা বলিতেছ তাহা আমার ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে।"

"এবং তুমি যেখানে গ্রীক কহিতে পার, সেখানে উক্তগুণ তোমার নিকট কিরূপ বলিয়া বোধ হয় অবশ্য কথায় প্রকাশ করিতে পার।"

"অবশ্য।"

"তবে এক্ষণে বল তোমার মতে পরিমিত স্বভাব কাহাকে বলা যাইতে পারে; তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব তোমার উহা আছে কি না।"

কার্ম্মিডিজ প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিলেন যে ধীরতাই পরিমিত স্বভাব; যে ব্যক্তি আস্তে আস্তে দস্তুরমাফিক সব কাজ করে, সেই ব্যক্তি পরিমিত স্বভাব বিশিষ্ট"। সক্রেটিস তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "পরিমিত স্বভাব উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বস্তু বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না"। যুবকের উত্তর করিতে হইল "হ্যাঁ।"

সক্রেটিস তখন তাঁহার জগদ্বিখ্যাত তর্কজাল বিস্তার করিলেন, যুবকও তাহাতে আবদ্ধ হইলেন। "যখন তুমি গুরুমহাশয়ের নিকট লিখিতে শেখ অক্ষরগুলি তাড়াতাড়ি লিখিতে পারা ভাল, না আস্তে আস্তে পারা ভাল?"

"তাড়াতাড়ি।"

"এবং পড়িতে পারা তাড়াতাড়ি, না আস্তে আস্তে ভাল।"

"পুনরায় বলিতেছি তাড়াতাড়ি।"

"বীণা বাজাইতে কিম্বা মল্ল যুদ্ধে চট্‌পট্ কাজ করিতে পারা নিড়বিড়ে কাজের চেয়ে ঢের ভাল কি না?" "হ্যাঁ।" এইরূপে তার্কিকবর এক দৃষ্টান্তের পর আর এক দৃষ্টান্ত দেখাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে এই ফল দাঁড়াইল যে কি শারীরিক কি মানসিক সকল প্রকার কর্ম্মেই শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিতে পারা ভাল; আর ইহাও যদি স্বীকার করা যায় যে ধীরে ধীরে যে সব কাজ করা যায়, তাহাদিগের মধ্যেও কতকগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তথাপি যেখানে দেখা যাইতেছে যে শীঘ্র শীঘ্র যে সব কাজ করা যায় তাহাদিগের মধ্যেও কতকগুলি উৎকৃষ্ট আছে সেখানে পরিমিত স্বভাব—যাহাকে আমরা উৎকৃষ্ট বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছি তাহা—কেবল ধীরতা মাত্র হইতে পারে না। যুবকের এ সব কথায় সায় দিতে হইল। সক্রেটিস তখন তাঁহাকে বলিলেন "তুমি মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখ পরিমিত স্বভাবে তোমার কি ফল হইয়াছে এবং ঐ গুণের প্রকৃতি কি।" কার্ম্মিডিজ্ তখন বাস্তবিকই বিবেচনা করিয়া এই উত্তর দিলেন "যে উহাতে মানুষ সলজ্জ হয়, লজ্জাশীলতাই পরিমিত স্বভাব।" সক্রেটিস তখন বলিলেন যে স্বয়ং হোমরই বলিয়াছেন যে দরিদ্রের পক্ষে লজ্জা করা ভাল নহে; অতএব লজ্জাশীলতা সকল সময় ভাল বস্তু নহে, সুতরাং পরিমিত স্বভাব লজ্জাশীলতার সহিত এক হইতে পারে না, কারণ উহা সকল সময়েই ভাল"। কার্ম্মিডিজ্ যেন আর একটী সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলেন, তিনি বলিলেন যে "একজনের মুখে শুনিয়াছেন যে আমাদিগের নিজের নিজের কাজ করাই পরিমিত স্বভাব।" সক্রেটিস্ অমনি বলিয়া উঠিলেন "অরে ক্ষুদ্র রাক্ষস! এ কথাটী তবে তোমায় স্বয়ং ক্রিটিয়াস কিম্বা অন্য কোন পণ্ডিত বলিয়া দিয়াছে।" ক্রিটিয়াস উত্তর করিলেন "তবে অন্য কেহই হইবে, কারণ আমি নিশ্চয় নই।" অথচ যখন আবার সক্রেটিস্

দেখাইলেন যে যদি এরূপ কোন আইন হইত যে সকলেরই নিজ নিজ কাজ করিতে হইবে তাহা হইলে সমাজের অমঙ্গল ঘটিত আর চিকিৎসা করা, ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া, কাপড় বুনিয়া দেওয়া এ সকল নিজের নিজের কাজ করা নহে (অন্যের প্রয়োজনের জন্যই চিকিৎসক ও ব্যবসায়ীগণ এ সকল কাজ করিয়া থাকে) অথচ এ সকল কাজ করা অপরিমিত স্বভাবের চিহ্ন নহে—অতএব উক্ত সংজ্ঞা সত্য নহে ; তখন ক্রিটিয়াস উহার সমর্থন করিতে উদ্যত হইলেন। ফলতঃ কার্মিডিজ্ ঐ সংজ্ঞা ক্রিটিয়াসের নিকটেই শুনিয়াছিলেন ; ক্রিটিয়াস কেবল প্রথমতঃ উহা বলেন নাই বলিয়া ভান করিতেছিলেন মাত্র। কার্মিডিজ্ তাঁহাকে যখন বলিলেন যে সক্রেটিস তাঁহার সংজ্ঞা খণ্ডন করিয়াছেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তুমি উহার অর্থ বুঝিতে পার নাই বলিয়া কি আর উহার প্রণেতা উহা বুঝিয়া বলে নাই।" সক্রেটিস গতিক মন্দ দেখিয়া বলিলেন "কার্মিডিজের বয়স আর কত যে উহার অর্থ বুঝিতে পারিবে ; তুমি উহার অপেক্ষা বিদ্যায় ও বয়সে বড়, অতএব তোমারই বুঝিবার কথা। সুতরাং তুমি যদি উক্ত সংজ্ঞা সমর্থন করিতে প্রস্তুত থাক, তবে এখন তোমার সঙ্গেই তর্ক করিব।"

ক্রিটিয়াস—"তথাস্তু।" সক্রেটিস তখন আবার বলিলেন "যে ব্যবসায়ীগণ অন্য লোকের কার্য্য করিয়া দেয় অথচ কেহ তাহাদিগকে সে জন্য অপরিমিত স্বভাব বলে না।" ক্রিটিয়াস বলিলেন, "কার্য্য করা আর কার্য্য করিয়া দেওয়া এক কথা নহে। যে ব্যক্তি অন্যের কাজ করিয়া দেয় সে অপরিমিত স্বভাব না হইতে পারে ; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের কাজ করিতে যায় অর্থাৎ অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে সে অপরিমিত স্বভাব ; ফলতঃ সৎকার্য্য করাই পরিমিত স্বভাব"। সক্রেটিস বলিলেন "যাহারা এই গুণের অধিকারী তাহারা অবশ্য তাহাদিগের অধিকারের বিষয় অবগত আছে, অতএব যদি সৎকার্য্য করাই পরিমিত স্বভাব হয় ঐ গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যখন সৎকার্য্য করিতে যায় তখন তাহা বুঝিতে পারা উচিত। অথচ দেখ চিকিৎসকে বুঝিতে পারে না কখন চিকিৎসায় ভাল হইবে, কখন মন্দ হইবে"। ক্রিটিয়াস বলিলেন যে "তাহা হইলে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে ; কারণ তাঁহার মতে আত্ম-জ্ঞান আর পরিমিত স্বভাব একই বস্তু। যদি পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা হইতে এই দ্বিতীয় সংজ্ঞার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে আর তিনি সেটীর সমর্থন করিলেন না। যাহা হউক, এক্ষণে তিনি এই নূতন সংজ্ঞার—আত্ম-জ্ঞানই পরিমিত স্বভাব—ইহার সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছেন।

সক্রেটিস। পরিমিত স্বভাব বা জ্ঞান কোন একটি বিষয়ের বিজ্ঞান হইবেক।

ক্রিটিয়াস। উহা নিজেরই বিজ্ঞান।

সঃ। সকল বিজ্ঞানেরই কোন না কোন ফল দেখা যায়,যেমন চিকিৎসার ফল স্বাস্থ্য, পরিমিত স্বভাবের কি ফল বল ?

ক্রিঃ। জ্যামিতির কি ফল বল ?

সঃ। জ্যামিতির ও অন্যান্য বিজ্ঞানের অন্ততঃ এক একটী বিষয় আছে আর এই বিষয়গুলি বিজ্ঞানগুলি হইতে ভিন্ন বস্তু। এক্ষণে বল পরিমিত স্বভাবের বিষয়টী কি ?

ক্রিঃ। যাহাকে জ্ঞান বা পরিমিত স্বভাব বলে তাহা অন্যান্য সমুদয় বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন ; উহা নিজের ও অন্যান্য বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। অর্থাৎ বাস্তবিক জ্ঞান দ্বারা সাধারণ জ্ঞানের ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানের প্রকৃতি অবগত হওয়া যায়।

সঃ। যাহা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান তাহা আবার অ-বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞান হইবে. অর্থাৎ যে সকল বিষয়ের কোন বিজ্ঞান নাই সে সকল বিষয়ে কি কি জানা নাই তাহাও উহাতে অবগত হওয়া যাইবে ?

ক্রিঃ। ঠিক বলিয়াছ।

সঃ। তাহা হইলে জ্ঞানী অর্থাৎ মিতভাবাপন্ন ব্যক্তি—এবং কেবল উক্তগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিই—অন্য কেহ নহে—আপনার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবে এবং স্বয়ং কি অবগত আছে ও কি অবগত নাই আর অন্য ব্যক্তিরাই কি অবগত আছে ও কি কি বিষয় বাস্তবিক জানে বলিয়া মনে করে এবং তাহারা কি অনবগত আছে ও কি কি বিষয় বাস্তবিক না জানিয়াও জানে বলিয়া (মিথ্যা) মনে করে, এই সমুদয় ব্যাপার জানিবে। আর বাস্তবিক জ্ঞান কিম্বা মিতস্বভাব ইহাকেই বলে ; উহা আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু নহে, আত্মজ্ঞান অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কি জানে ও কি না জানে ইহা তাহার অবগত থাকা। কেমন, তোমার ত এই মত ?

ক্রিটিয়াস উত্তর করিলেন 'হ্যাঁ।' তখন সক্রেটিস বলিলেন—আচ্ছা, দেখা যাউক উক্ত প্রকার জ্ঞান সম্ভবপর কি না আর সম্ভবপর হইলেও উহা কোন উপকারে আসিতে পারে কি না।

প্রতিপক্ষ তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন সক্রেটিস পুনরায় বলিলেন—দেখ, ক্রিটিয়াস, এখানে প্রথমে আমার একটী বিষয় কঠিন মনে হইতেছে ; আশা করি তুমি তাহার সদুত্তর স্থির করিতে পারিবে।

[এস্থলে বলা আবশ্যক যে প্রকৃত সক্রেটিসের এইরূপে তর্ক করার অভ্যাস ছিল ; তিনি লোকের অজ্ঞতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে বাহিরে খুব সম্মান দেখাইতেন—যেন তাহারা সকল-বিষয়ই অবগত আছে। নিজে বুঝিতে পারেন নাই এই বলিয়া অল্পে অল্পে তাহাদিগকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন ; অবশেষে তাহারা তাঁহার তর্কজালে এমন জড়াইয়া পড়িত যে আর কোন মতে উদ্ধার পাইত না। তখন তাহাদিগের অবশ্য বলিতে হইত যে তাহারা যাহা বুঝিয়াছে মনে করিত তাহা বাস্তবিক বুঝে নাই। এই প্রকার তর্কে সক্রেটিস অনেক জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিদিগকে চটাইয়া

দেন, এবং অবশেষে তাঁহার বিষপান দ্বারা যে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার মূল কারণ এইরূপে লোকের বিরাগ ভাজন হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে।]

সক্রেটিস ক্রিটিয়সকে বলিলেন—তুমি বলিতেছ যে এরূপ একটী বিজ্ঞান হইতে পারে যাহা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান; কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। 'দর্শন বলিলে কোন বস্তুর দর্শন বুঝায়, দর্শনের দর্শন নাই; সেইরূপ শ্রবণের শ্রবণ, বাসনার বাসনা, অনুরাগের অনুরাগ, ভীতির ভীতি, মতের মত এ সকল অসম্ভব অথচ আমরা অনুমান করিতেছি যে এমন একটী বিজ্ঞান হইতে পারে বিজ্ঞানই যাহার আলোচ্য, যাহার বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন আলোচ্য বস্তু নাই। ইহা অসম্ভব আমি এরূপ বলি না। তবে কি না, আমরা দেখিতে পাই যে, কোন রাশি অন্য কোন রাশি অপেক্ষা গুরুতর হইতে পারে কিন্তু নিজের অপেক্ষা গুরুতর হইতে পারে না, কারণ গুরুতর হইলে আবার লঘুতরও হইবে। যেমন কোন বস্তু নিজের দ্বিগুণ হইলে আবার উহাকে অন্যদিক হইতে নিজের অৰ্দ্ধেক বলিতে হইবে—কিন্তু একই সম্বন্ধে একই সময়ে দ্বিগুণ ও অৰ্দ্ধেক হওয়া অসম্ভব। সেইরূপ আবার দর্শনের দর্শন, শ্রবণের শ্রবণ তত সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এটাও তত সম্ভাবনীয় বোধ হয় না। যাহা হউক সম্ভাবনীয় হইলেও উহা যতক্ষণ উপকারী বস্তু বলিয়া সপ্রমাণ না হয় ততক্ষণ উহাকে মিতভাব বা জ্ঞান বলা যাইতে পারে না, কারণ মিত ভাব যে উপকারী সামগ্রী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে হে ক্রিটিয়াস তুমি এই দুই সমস্যার খণ্ডন কর।

যাঁহাকে এই কথা বলা হইল তিনি মহাবিপদে পড়িলেন; এদিকে কোন উত্তর দিতে না পারিলে কার্মিডিজ ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা হয় না, অপর দিকে আবার কোন উত্তরও খুঁজিয়া পান না। তখন তিনি সর্ব্ববিপদের ঔষধ 'আবোল তাবোল' বকিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার প্রতিপক্ষ এই সময়ে স্বকীয় মাহাত্ম্য দেখাইয়া বলিলেন—

আচ্ছা, ক্রিটিয়াস, সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, মনে কর বিজ্ঞানের বিজ্ঞান সম্ভবপর; তাহার পর বুঝাইয়া দেও কিরূপে উহা দ্বারা আত্ম-জ্ঞান জন্মিতে পারে।

সক্রেটিস যদি এই সময়ে অপরপক্ষকে এই প্রকারে সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে তর্কে ক্রিটিয়াসের তখনই পরাজয় হইত; কিন্তু সক্রেটিস তখনও তর্ক বন্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন আর সেই নিমিত্তই প্রথম সমস্যাটী—বিজ্ঞানের বিজ্ঞান সম্ভাবনীয় কি না—আপনা হইতেই ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর তিনি দেখাইলেন যে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান দ্বারা আমরা কি কি বিষয় জানি আর কি কি বিষয় জানি না এই জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারেনা; বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এই পর্য্যন্ত বলিতে পারে যে আমাদিগের মনোগত বিষয়ের মধ্যে কোনটী বাস্তবিক জ্ঞান আর কোনটী তাহা নহে, অর্থাৎ জ্ঞানই বা কি

জিনিষ আর উহার অভাবই বা কি জিনিষ। উহা দ্বারা জ্ঞান সম্বন্ধে উক্ত সাধারণ জ্ঞান মাত্র জন্মিতে পারে; কিন্তু স্বাস্থ্য, সঙ্গীত, গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি সকল বিষয়ের জ্ঞান উক্ত বিজ্ঞান হইতে পাওয়া যাইতে পারে না, ইহার নিমিত্ত ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান জানা আবশ্যক সুতরাং এই সকল বিষয়ে কে কি জানে আর কি না জানে তাহা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলিয়া দিতে পারিবে না। যদি এমন কোন বিজ্ঞান থাকিত যদ্দারা কোন ব্যক্তি নিজেই বা কি জানে ও কি না জানে আর অন্য লোকেই বা কি জানে ও না জানে ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিত, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত। তাহা হইলে যে ব্যক্তি যে কাজ জানে তাহাকে তাহাই দেওয়া যাইতে পারিত আর যে তাহা না জানে তাহাকে তাহা দেওয়া হইত না; এরূপ হইলে অবশ্য সংসার সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। কিন্তু এরূপ কোন বিজ্ঞান নাই; যাহাকে মিতভাব বা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা ওরূপ কার্য্য হইতে পারে না। বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হইতে কোন বিশেষ বস্তুর জ্ঞান পাওয়া যায় না; উহা হইতে কেবল জ্ঞানের ও উহার বিপরীতের প্রকৃতি অবগত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানের বিজ্ঞান জানে সে অবশ্য বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান গুলি শিখিবার সময় সেগুলি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে আর যে ব্যক্তি উহা না জানে সে ওগুলি তত স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে না। যাহা হউক, যদি এমনও মনে করা যায় যে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান দ্বারা আমরা কি কি বিষয় জানি আর কি কি জানি না ইহা জানিতে পারা যাইত, আর যে যাহা জানে তাহাকে কেবল তাহাই করিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলেও যে আমরা উত্তমরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম আর সুখ লাভ করিতে পারিতাম তাহারই বা প্রমাণ কি। যেব্যক্তি পাদুকা করে এবং ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঐ কার্য্য সমাধা করে সে যে তদ্দারা সুখী হয় এমত নহে; সেইরূপ আবার যে ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাষ্ঠ কিম্বা পিত্তল কিম্বা পশম হইতে ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করে সে ব্যক্তি যে তদ্দারা সুখী হয় তাহাও নহে। অথচ এই সকল ব্যক্তি উক্ত উক্ত বিষয়ের বিজ্ঞান মতে কার্য্য করে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। সুতরাং কেবল যে বিজ্ঞান পাইলেই আর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্য্য করিতে পারিলেই লোকে সুখী হয় এমন নয়। সুতরাং যাহাকে মিতভাব বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা যদি সকল বিষয়েই কে কি জানে, না জানে অবগত হওয়া যাইত তাহা হইলেও উহা কোন উপকারে আসিত না অর্থাৎ লোককে সুখী করিতে পারিত না। ফলতঃ হিতাহিতের বিজ্ঞান হইতেই লোকে সুখী হইয়া থাকে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হইতে নহে।

ক্রিটিয়াস যখন বলিলেন যে হিতাহিতের বিজ্ঞান এই বিজ্ঞানের বিজ্ঞান-মধ্যে গণনীয় তখন আবার সক্রেটিস তাঁহার পূর্ব্ব পথে ফিরিয়া আসিলেন—তখন আর তিনি ইহা স্বীকার করিলেন না যে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হইতে সকল প্রকার জ্ঞানই পাওয়া যাইতে পারে; উহা হইতে কেবল জ্ঞানের ও তাহার বিপরীতের প্রকৃতি অবগত হওয়া যায় মাত্র।

এইরূপে অনেক তর্কের পরও যখন কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হইল না—মিতভাব বা জ্ঞান উপকারী বস্তু ইহা সকলেই জানে অথচ তর্কে এই দাঁড়াইল যে উহা কোন উপকারেই আইসে না—তখন সক্রেটিস বলিলেন যে তাঁহার ভাল করিয়া তর্ক করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই এই ফল ঘটিয়াছে। মিতভাব শব্দে কি বুঝিতে হইবে তাহা তিনি ঠিক করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, কার্মিডিজ যদি বাস্তবিকই মিতভাবাপন্ন হয়েন তবে সুখেরই বিষয় ; এবং তাহা হইলে আর তাঁহার সক্রেটিসের মন্ত্রের প্রয়োজন হইবে না। কার্মিডিজ তখন বলিলেন যেখানে মিতভাব কাহাকে বলে তাহাই স্থির হইল না তখন তিনি কি প্রকারে জানিবেন যে তাঁহার সে গুণ আছে কি না ; আর অর্দ্ধব্যঙ্গোক্তি করিয়া কহিলেন 'আমার উক্ত মন্ত্রের প্রয়োজন আছে আর আমার পক্ষে আমি এই বলিতে পারি যে আমি রোজ রোজ তোমার নিকট এইরূপ মন্ত্র লইতে ইচ্ছা করি।' ক্রিঃ বলিলেন 'তুমি যদি তাহাই কর তাহা হইলে বুঝিব যে তুমি বাস্তবিক মিতভাব বিশিষ্ট ; আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি যে তুমি কখনও সক্রেটিসের পার্শ্ব ছাড়িবে না।'

কাঃ। তুমি যেরূপ বলিতেছ আমি অদ্য হইতেই সে রূপ করিব।

সঃ। কি হে ! তোমরা কি চক্রান্ত করিতেছ ?

কাঃ। চক্রান্ত করিতেছি নহে, করিয়াছি।

সঃ। তবে কি তুমি কোন রূপ বিচার না করিয়াই বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছ ?

কাঃ। হ্যাঁ, তাহাই করিব ; বিশেষ যেখানে ক্রিটিয়াসের হুকুম। তবে তুমি এই বেলা বিবেচনা করিয়া দেখ।

সঃ। কিন্তু যখন কেহ বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হয়, তখন আর বিবেচনা করার সময় নয়। আর স্বয়ং তুমি ঐরূপ করিতে উদ্যত হইলে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকই সফল হইবার নহে।

কাঃ। তাহা হইলে আমাকে কোন প্রতিবন্ধক দিও না।

সঃ। আমি তোমাকে কোন প্রতিবন্ধক দিব না।

এইরূপে প্লেটো কার্মিডিজ নামক কথোপকথন শেষ করিয়াছেন ; এই অংশের অর্থ এই যে সক্রেটিসের সহিত আলাপ করিয়া কার্মিডিজ এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে তিনি সেই দিন হইতে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত সক্রেটিসের এইরূপ অনেক গুলি যুবক শিষ্য ও সহচর ছিল ; তাহারা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পদানুসরণ করে। সক্রেটিস নিজে কিছু শিখাইতে তত ব্যগ্র ছিলেন না ; ইহার কারণ হয়ত যে সকল বিষয়ে তিনি তর্ক করিতেন সে সকলের অন্ততঃ কতকগুলিতে তিনি নিজেই কোন বিশেষ মতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আর তাঁহার নিজের কোন

মত থাকিলেও তাহা একেবারে বলিয়া ফেলিতেন না ; তিনি তর্কজাল দ্বারা লোকের অজ্ঞতা সপ্রমাণ করিয়া তাহারা যে সকল বিষয় বেশ জানে মনে করিয়া কখনও তদ্বিষয়ে চিন্তা করে নাই সেই সকল বিষয়ে তাহাদিগকে চিন্তা করাইতে শিখাইতেন। তাঁহার মহৎ পরিশ্রমের প্রধান ফল প্লেটো ; প্লেটো ব্যতীত তাঁহার আরও তিনটী শিষ্য তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং ইহাঁরা প্রত্যেকে এক একটী নূতন দার্শনিক সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন।

এই প্রবন্ধ এইবারে আর অধিক হইলে পাঠকের নিকট দুষ্পাঠ্য হইতে পারে ভাবিয়া আমরা কার্মিডিজ নামক গ্রন্থের উপর আমাদিগের মতামত এখন প্রকাশ করিলাম না। এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমরা বর্ত্তমান রচনায় জাউয়েট ও গ্রোট এই দুই লেখককে অনুসরণ করিতেছি। অন্যান্য যে যে লেখকের সাহায্য লওয়া হইবে, পাঠক তাহার যথাস্থানে উল্লেখ পাইবেন। উপরে আমরা কথোপকথনের যে বৃত্তান্ত দিয়াছি, তাহা সকল স্থলে অবিকল অনুবাদ নহে। আর একটী বিষয় বলিয়া প্রবন্ধটী আপাততঃ শেষ করা যাইতেছে। টরিয়াসের ব্যায়ামশালা এই কথাটী দেখিয়া টরিয়াস শব্দে ব্যক্তি কিম্বা স্থান বুঝাইতেছে ইহা লেখকের সন্দেহ হওয়ায় তিনি তাঁহার কলেজের অন্যতম অধ্যাপক রেবরেণ্ড লালবেহারী দে-কে ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করেন ; দে মহাশয়ের মতে ঐ শব্দে ব্যক্তি বুঝিতে হইবে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

টোডর মল্ল।*

(প্রথম প্রস্তাব)

মহাত্মা আকবরের রাজ্য শাসনের মূলে সাম্যনীতি না থাকিলে, বোধ হয় তিনি মোগল রাজত্বের এতদুর বিস্তৃতিসম্পাদন ও "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা" আখ্যা লাভ করিতে পারিতেন না। [illegible] গেলে, তাঁহার সময়েই মোগল রাজত্বের প্রকৃত পক্ষে পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাবর, হুমায়ুন ও পরবর্ত্তী জাহাঙ্গীর, সাজিহান এই চারিজন বাদসাহ যাহা না করিয়া গিয়াছেন—আকবর সাহ একাকী

* কতকগুলি দেশীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থের সহায়ে এই প্রবন্ধের অধিকাংশ সংকলিত হইয়াছে।

তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি মোগল রাজত্বের টলটলায়মান ভিত্তি মূল ভবিষ্যতের জন্য সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন—সুবন্দোবস্তে ও সুশৃঙ্খলায় সরকারের আয়বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন, হিন্দু মুসলমানের, পার্থক্য দূর করিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ-ভাব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—এবং হিন্দুকে সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মে নিয়োগ করিয়া—স্বীয় অসন্দিগ্ধ ও উচ্চমনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সকল কারণেই বিধর্ম্মী হইয়াও তিনি হিন্দু হৃদয়ের পূজা পাইয়াছিলেন। কীর্ত্তি তাঁহাকে যশের উজ্জ্বল-তর মণিখচিত সিংহাসনে বসাইয়া চির অমর করিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মবল স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি, বিশ্বজনীন সাম্যভাব, হিন্দু হৃদয়ের সারবত্তা-অনুভব-শক্তি. পরবর্ত্তী বাদসাহদিগের ছিল না বলিয়াই, মোগল সাম্রাজ্য অতি শীঘ্রই শোচনীয় রূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। আকবরের ও আরঙ্গীবের রাষ্ট্রনীতির তুলনা করিয়া দেখিলেই ইতি-হাসজ্ঞ পাঠক ইহার প্রমাণ পাইতে পারিবেন।

দক্ষিণে মানসিংহ, বীরবল, ভগবান দাস ও বামে টোডরমল্লকে লইয়া আকবরসাহ যে সমস্ত লোকহিতকর অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন—ভারত অনেক দিন. ধরিয়া তাহার ফল ভোগ করিতেছে। ইংরাজ অনেক স্থলে সেই সকল বন্দোবস্ত ঈষৎ পরিবর্ত্তিত বা অপরিবর্ত্তিত ভাবে আজও প্রচলন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সময়ে, যে প্রকার মানসিংহ ও টোডর মল্ল জন্মিয়াছিল—তাহার পর হইতে আজও পর্য্যন্ত ভারতে তদ্রূপ আর কেহ জন্মিল না। আবুল ফজল টোডর মল্লের প্রতি বিদ্বেষভাব বশতঃ তাঁহার জীবনের রাজনৈতিক সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নাই যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা হইতেই নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী সংকলিত হইল ।

আবুল ফজলের গ্রন্থ ছাড়া "মসীর উল্ উমারা" নামক আর একখানি পারস্য গ্রন্থেও ক্ষত্রিয়বীর টোডর মল্লের কতক বিবরণ পাওয়া যায়। আকবরের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষের পূর্ব্বে, এই গ্রন্থে টোডর মল্লের কোন উল্লেখ নাই কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে বিশেষ রূপে উপলব্ধি হয়—টোডর মল্ল আকবরের রাজত্বারম্ভের প্রথম. হইতেই না হউক তাহার কিয়ৎকাল পরেই দিল্লী সরকারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। টোডরমল্ল জাতিতে পঞ্জাবী ক্ষত্রিয় ও লাহোর তাঁহার জন্মস্থান।

খাঁজামানের বিদ্রোহ ব্যাপারে আমরা সর্ব্ব প্রথমে টোডর মল্লের নাম শুনিতে পাই। আকবরের রাজত্বের দশম বৎসরে উজ্‌বেকদিগের সহিত যোগাযোগ করিয়া খাঁজামান জোয়ানপুরে বিদ্রোহ ব্যাপার বড় গুরুতর করিয়া তোলেন, আকবর এই বিদ্রোহ ব্যাপার দমন করিতে স্বয়ং সসৈন্যে আসিতেছিলেন। খাঁজামান বেগতিক দেখিয়া জোয়ানপুর পরিত্যাগ করিয়া গাজিপুরে পলায়ন করিলেন। আকবর সাহ মনহিম খাঁকে—খাঁজামানের অনুসরণে প্রেরণ করিলেন। মনহিম খাঁ খাঁজামানের হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ ছিলেন—সুতরাং তিনি বিদ্রোহীকে সহসা আক্রমণ না করিয়া বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার

করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। খাঁজামান নিরূপায় হইয়া অগত্যা বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু ইহার কিয়ৎকাল পরে—ইস্কান্দার খাঁ ও বাহাদুর সাহ নামক বিদ্রোহী দ্বয় বাদসাহ-সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া দিলে—খাঁজামান পুনরায় বাদসাহের বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিলেন। আকবর শুনিলেন খাঁজামান পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া মাণিকপুরে বাহাদুর সাহের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এবার তিনি হিন্দু রাজা টোডর মল্ল ও কুলীখাঁকে ৬০০০ সৈন্যের সহিত আগরা হইতে প্রেরণ করিলেন। কুলী খাঁ ও টোডর মল্ল গোপনে বারবেরিলিতে উপস্থিত হইয়া শতাধিক সৈন্যের সহিত নিঃশব্দে নদী পার হইলেন.এবং বাহাদুর সাহকে সহসা ধৃত করিয়া বাদসাহের নিকট বন্দী ভাবে পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্রোহের পরিণাম ফল বাহাদুরের শিরচ্ছেদ। ইহার কিয়দ্দিবস পরেই আকবরের নিকট খাঁজামানের ছিন্ন মুণ্ড প্রেরিত হইল। "মসির উল উমরা" র গ্রন্থকার বলেন—যদি খাঁজামান টোডর মল্লের আক্রমণের পূর্ব্বে হস্তী হইতে দুর্ঘটনাবশে ভূপতিত হইয়া তাহার পদদলিত ও সাংঘাতিক রূপে আহত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে অবরোধ করা টোডরের পক্ষে অসাধ্য কার্য্য হইত। যাহা হউক এই ব্যাপারে টোডর মল্ল বিশেষ কৌশল ও সাহস দেখাইয়া বাদসাহের প্রসাদ ভাজন হইয়াছিলেন।

ইহার পর আকবর সাহ গুজরাট জয় করেন। গুজরাট জয়ের পর তাহার আভ্যন্তরিণ সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য তিনি টোডর মল্লকে গুজরাটে প্রেরণ করিলেন। রাজস্ব সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়া টোডর মল্ল গুজরাটের রাজস্ব বন্দোবস্ত নূতন করিয়া বাদসাহের আয় বৃদ্ধি করিলেন। প্রজাগণও তাঁহার নূতন বন্দোবস্তে বিশেষ প্রীতিলাভ করিল।

পাটনা জয়ের পর টোডর মল্ল বাদসাহের নিকট হইতে সম্মানসূচক রাজ পরিচ্ছদ লাভ করিয়া মনহিম খাঁর সহিত বাঙ্গলা জয়ে প্রেরিত হন। কি কারণে বাধ্য হইয়া আকবর সাহ বাঙ্গলায় সৈন্য প্রেরণ করেন—তাহা আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

আকবরের সময়ে নবাব সোলেমানের পুত্র দাবুদসাহ বাঙ্গলা মস্‌নদের অধিকারী ছিলেন। দায়ুদের সময়ে বাঙ্গলার অতিশয় সমৃদ্ধি সম্পন্ন অবস্থা। দুইজন বাঙ্গালী তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত। নবাব নিজেও আত্মসুখে-বিরত, প্রজা সুখ বর্দ্ধনে অনুরত, অপক্ষপাতী, সদালাপী ও দান পরায়ণ। কোষাগার ধনে পরিপূর্ণ—প্রজার গৃহ ধান্যে পরিপূর্ণ—রাজ্যে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বা দুর্ভিক্ষাদি কিছুই নাই। হিন্দুর ক্ষমতা অধিক ছিল বলিয়া—মুসলমানেও হিন্দুর উঁপর বড় একটা অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। যে দুইজন বাঙ্গালী রাজ্য মধ্যে সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত—তাঁহারা বাল্যকাল হইতে নবাবের পরম বন্ধু ও সহায় ছিলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহরিকে রাজা বিক্রমাদিত্য ও কনিষ্ঠ জানকীবল্লভকে "রাজা বসন্ত রায় উপাধি দিয়া—গৌড়াধীপ প্রথমকে মন্ত্রী পদে—ও দ্বিতীয়কে স্বীয় রাজ্যের রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত কর্ম্মের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

যতদিন গৌড়াধীপ দায়ুদ খাঁ এই দুই বিখ্যাত বাঙ্গালী সচিবের পরামর্শানুসারে—রাজ কার্য্য চালাইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার কোন অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। তিনিও স্বীয় মন্ত্রীদিগের উপর যে প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস দেখাইতেন—তাঁহারাও প্রাণপণে স্বীয় প্রভুর মঙ্গলার্থে নানাবিধ সৎপরামর্শ দান—ও রাজ্যের প্রত্যেক কার্য্যের উপর নজর রাখিতেন। কিন্তু এই সময়ে কুগ্রহবশে দায়ুদের মনে নানা প্রকার দুরাশা উদয় হইতে লাগিল। তাঁহার আশে পাশে যে সকল মুসলমান কর্ম্মচারী থাকিত, তাহারা তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিল। এতদিন পর্য্যন্ত দিল্লীর সরকারে দায়ুদ নিয়মিত কর দিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু তাহাদের মন্ত্রণানুসারে তিনি আত্মহিত ভুলিয়া দুরাশার উত্তেজনায় দিল্লীর খাজনা বন্ধ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় এ সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন—কিন্তু আসন্নকালে প্রায়ই বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে সুতরাং তিনি মন্ত্রীদ্বয়ের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। দায়ুদ কর প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়া দিল্লীর পথে ও বাঙ্গলার প্রান্ত সীমার স্থানে স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিলেন। কতিপয় বৎসর এইরূপ করিয়া তিনি আরও বলশালী হইয়া উঠিলেন। স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিবার বাসনাও এই সময়ে কুবুদ্ধিবশে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। গৌড়ে এক বিচিত্র রাজ সিংহাসন নির্ম্মাণে অতি ব্যস্ত হইয়া—নানা স্থান হইতে শ্বেত, রক্ত, পীত, ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু দ্রব্যের আমদানী করিতে লাগিলেন। ভিতরে ভিতরে যে কি কালানল ধূমায়িত হইতেছিল—কি মহা যজ্ঞের আয়োজন হইতেছিল তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী ও তদুপযোগী—গোলন্দাজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দায়ুদ খাঁ তাহাদের বাঙ্গলার সীমান্ত দেশে প্রেরণ করিলেন—স্বনামে মুদ্রা প্রচলনও আরম্ভ হইল। দিল্লী হইতে যে সকল কর্ম্মচারী খাজনা লইতে বাঙ্গলায় আসিত—পথি মধ্যে গুপ্ত হত্যাকারী নিয়োগ করিয়া দায়ুদ তাহাদের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। নবাবের এই প্রকার কুমতি দেখিয়া—এ সময়ে কোন প্রকার সদুপদেশ—অনুর্ব্বর ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় নিষ্ফল হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রভুভক্ত অমাত্যদ্বয় স্ব স্ব প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিলেন। দায়ুদের পতন অনিবার্য্য দেখিয়া তাঁহারা স্ব স্ব সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ গৌড় হইতে গোপনে স্থানান্তরিত করিয়া এক মনোনীত স্থলে রক্ষা করিলেন ও নিজেরা গৌড়ে বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানই পরে যশোহর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল এবং এই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঔরসেই বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন।

দায়ুদের এই সকল যথেচ্ছাচার কাহিনী যথা সময়ে বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—প্রথমতঃ খাজনা বন্ধ করিয়া দায়ুদ মহাপরাধী হইতেছেন—

তাহার উপর স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছেন—বাদসাহ রুষ্টচিত্তে মহারাজ তোড়লমলকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। তোড়লমলের উপর আদেশ হইল দায়ুদের "ছিন্ন মস্তকই এই সমস্ত যথেচ্ছাচারের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত"। এই অনুজ্ঞামতে তোড়লমল সসৈন্যে বাঙ্গলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাদসাহী আমলে দিল্লী ও আগ্রার দরবারে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত রাজবংশের এক এক জন করিয়া উকীল থাকিত—দায়ুদেরও বাদসাহের দরবারে এইরূপ একজন উকীল ছিল। উপস্থিত বিপৎপাতে আকুলিত হইয়া সে ব্যক্তি দায়ুদকে গোপনে এই ভয়ানক সংবাদ পাঠাইয়া দিল। টোডরমল্ল সৈন্যদল লইয়া দুই মাসে কাশী আসিয়া পৌছিলেন—তিনি ক্রমশঃ যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন—ততই দায়ুদের অন্তরাত্মা শুষ্ক হইতে লাগিল—পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া তিনি রাজমহলের নিভৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে—কিয়দংশ ধন সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার মন্ত্রী রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করিয়া বারেন্দ্র ভূমিতে প্রস্থান করিলেন। গৌড়ের অতুল ঐশ্বর্য্য—সুদৃঢ় পরিখাবেষ্টিত দুর্গ—মণিময় সিংহাসন—কিছুতেই দায়ুদের পলায়ন নিবৃত্তি করিতে পারিল না।

টোডরমল্ল অনেক স্থানে নদী পার হইতে দায়ুদের সৈন্য সামন্তের নিকট যথেষ্ট বাধা পাইয়াছিলেন—এই সমস্ত ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাঁহার অনেক সৈন্য নষ্ট হইল—তিনি দিল্লীতে এই সংবাদ প্রেরণ করিলে বাদসাহ দায়ুদের প্রতি আরও রুষ্ট হইয়া একেবারে অধিক সংখ্যক সৈন্য পাঠাইলেন, ইহারা অবিশ্রান্ত কুচ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গ লইল। এই বিপুল সৈন্য লইয়া রাজা টোডরমল্ল রাজ মহলের দুর্গ অধিকার করিলেন এবং উচ্ছলিত অর্ণব প্রবাহবৎ এই অগণিত সৈন্যরাশি গৌড়ের সুদৃঢ় ভিত্তিমূল কম্পিত করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিল। কেহই তাঁহাদিগকে বাধা দিল না—বিনা যুদ্ধে বাঙ্গলা জয় হইল। পূর্ব্বেও একবার এইরূপ ব্যঙ্গ-যুদ্ধে বাঙ্গালার হিন্দু রাজত্ব লোপ পাইয়াছিল।

তোড়লমল্ল গৌড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—অনন্ত কোলাহলময় রাজপুরী জনশূন্য হইয়াছে—সুগম্ভীর পরিখাবেষ্টিত দুর্গ সেনাশূন্য—প্রশস্ত রাজপথ জনস্রোত শূন্য—গৃহ মানব শূন্য—ধন রত্নাদি শূন্য, মরাই ধান্য শূন্য। রাজপুরীর সকল স্থান অন্বেষণ করিলেন—কোথায়ও, হিসাবাদি সম্বন্ধে কোন সরকারী কাগজ পত্র পাইলেন না। তাঁহার অনন্ত কোলাহলময় সৈন্যরাজি—কিয়ৎকালের জন্য সেই জনশূন্য নগরীর—শ্রীভঙ্গ-নিস্তব্ধভাব দূর করিল। কাগজপত্র অভাবে রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কোন উপায় না করিতে পারিয়া টোড়রমল্ল অতিশয় চিন্তিত হইলেন। সন্ধান করিয়া—অভয় দিয়া—দায়ুদের দুই পলায়িত মন্ত্রীকে দরবারে হাজির করাইলেন ও তাঁহাদের নিকট [illegible]ায় সমস্ত সন্ধান লইয়া যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন।

তোড়লমল্ল ক্রমে কোন উপায়ে সন্ধান পাইলেন দায়ুদ রাজমহলের কোন নিভৃত পর্ব্বত গুহায় বাস করিতেছেন। ঘোষণা করিয়া দিলেন তিনি যদি সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাদসাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন তাহা হইলে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। ভ্রান্ত দায়ুদ এই ঘোষণায় বিশ্বাস করিয়া পরিজন বর্গের কথা না শুনিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া তোড়রমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তোড়রমল্ল দায়ুদকে পাইয়া তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া মোগলের রক্ত পতাকায় কলস করিয়া দিলেন ও তাহার বেগমগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া আগরায় বাদসাহের নিকট পাঠাইলেন। এই কার্য্য চিরকালই তাঁহার অপযশ ঘোষণা করিবে।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

জীবন প্রদীপ উপন্যাস। শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা ব্রাহ্ম মিষণ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১।৶০।

আমরা এই বৃহৎ (৮ পেজি ৩৬০ পৃষ্ঠা পরিমিত) উপন্যাসখানি আদ্যোপান্ত যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি, কিন্তু দুঃখিত হইয়া বলিতে বাধ্য হইলাম, পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইতে পারি নাই। উপন্যাস সাধারণ গল্প হইতে অনেক উচ্চ পদার্থ। উপন্যাস, ইতিহাস ও কবিতার সমবায়। অথবা ইতিহাসে মনুষ্য সমাজের যে অংশের চিত্র নাই, উপন্যাসে তাহা আছে। ইতিহাসে জাতি বিশেষের যুদ্ধ বিগ্রহাদি অন্যান্য জাতির সহিত সম্বন্ধ এবং দেশের রাজা এবং নানা রাজকীয় ঘটনাদির বিবরণ থাকে, কিন্তু সমাজের আচার ব্যবহারাদির কোন চিত্র প্রায় থাকে না। উপন্যাস সেই অভাব পূরণ করিয়া থাকে, এবং সেই জন্য উপন্যাসের এত আদর, সেই জন্য সর ওয়াল্টর স্কটের উপন্যাসগুলি এত প্রশংসিত। আবার ইতিহাসে যেমন এক সময়ের দেশের বাহ্যিক ও অন্তর্জাতিক ঘটনাগুলির যথার্থ ও সত্য বিবরণ থাকা উচিত; কিন্তু তাহার পরিবর্তে যদি ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন পরস্পর দূরবর্ত্তী ও অসম্বদ্ধ ঘটনাগুলির একত্র জটিল ভাবে বর্ণনা থাকে তবে তাহা ইতিহাস না হইয়া যেমন আষাঢ়ে গল্প হয়, সেইরূপ উপন্যাসেও কোন বিশেষ সময়ের সমাজ চরিত্র অন্য সময়ের সহিত অসংশ্লিষ্ট রূপে দেখান কর্ত্তব্য, নতুবা সে উপন্যাসও সাধারণ গল্প ব্যতীত আর কিছুই হয় না। আলোচ্য পুস্তক আমরা এই দোষে পূর্ণ দেখিলাম। আবার কবিতা হিসাবে উপন্যাসে মনুষ্যের অন্তরের ও অন্তরের কার্য্য প্রণালীর যথার্থ বিবরণ থাকা উচিত। মনুষ্যের অন্তরে রিপু ও ইন্দ্রিয়ের আবেগ ও কার্য্য, হিংসা, ঈর্ষা প্রণয় প্রভৃতি, এবং তাহাদের কার্য্য ফল যেরূপ যথার্থ হইতে পারে, তাহারই সুন্দর চিত্র দেখান উপ-

ন্যাসের কর্ত্তব্য। নতুবা যাহা মনুষ্যের অন্তর চরিত্রে হইতে পারে না, তাহা উপন্যাস নাম-যোগ্য রচনাতে থাকিতে পারে না। বস্তুত উপন্যাস মনুষ্যের সমাজ চরিত্রের ও অন্তর-চরিত্রের দর্পণ স্বরূপ। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে এই সম্বন্ধে অনেক স্থানে ব্যতিক্রম দেখিলাম।

নায়িকা পাষাণী বা কুন্তলের প্রমাতামহ "মহারাজা কৃষ্ণগোপাল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার কালে বাঙ্গালার কয়েকটি বড় বড় জেলার উপরে সর্ব্বপ্রধান দেওয়ান ছিলেন * * বিপুল অর্থ-রাশি সঞ্চয় করেন * * বহু বিস্তৃত জমিদারি করেন। (১০৩ পৃষ্ঠা)। ইহাতে বুঝা যায় যে গ্রন্থকার কৃষ্ণগোপালকে ইং ১৭৯৩ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী বা অন্ততঃ তৎসাময়িক লোক রূপে অবতারণা করিয়াছেন, কারণ ১৭৯৩ সালের দশশাল বন্দোবস্ত হইতেই কোম্পানির দেওয়ানাদি রাখিবার প্রথা উঠিয়া যায়, এবং তৎপরিবর্ত্তে কলেক্টর প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

"পাষাণী কিন্তু শুধুই বৃদ্ধের দন্ত হীন মুখ গহ্বরের আন্দোলন দেখিয়াই ছুটিয়া পালাইত।" ইহাতে দেখা যাইতেছে পাষাণী তাঁহার জীবদ্দশায় জন্মিয়াছে। এখন যদি কৃষ্ণগোপাল নিতান্ত কম বয়সে—এমন কি ২০ বৎসরের সময় হইতে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন—এবং ১০ বৎসরের মধ্যেও বিষয় করিয়া লইয়া থাকেন—যাহার কমে আর অতটা বিষয় করিয়া তোলা সম্ভব নয়—তাহা হইলেও ১৭৯৩ সালে তাঁহার বয়স ৩০। তাহার পর যখন পাষাণী জন্মিয়াছে তখন তাঁহার বয়স ৭০। ৮০ ধরা যাউক—কেননা বৃদ্ধই প্রপৌত্রীকে যমবরা করিবেন স্থির করেন—৮০ হইতে অধিক বয়স্কের অতটা স্থির বুদ্ধি, বিবেচনা-শক্তি সঙ্গত হয় না। তাহা যদি হয় তবে পাষাণীর যখন বয়স ষোল বৎসর যে সময় উপন্যাসের আরম্ভ তখন ঊনবিংশ শতাব্দির অর্দ্ধেকও অগ্রসর হয় নাই। তখন খোলা ভাঁটিই বা কোথা—কিরোসিন তেলই বা কোথা? তখন এরূপ বি এ পরীক্ষা ছিল কি না তাহাও সন্দেহ। লেখক তখনকার কথা লিখিতে গিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান কালের কথাই লিখিয়াছেন।

গ্রন্থের নায়িকা এখন হইতে ৫০। ৬০ বৎসরের পূর্ব্বের ষোল বৎসরের বালিকা—মিণ্টনের প্যারাডাইস লষ্ট, সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত, সংস্কৃত সমস্ত সংহিতা, পুরাণ, উপনিষদ, পাণিনী, মুগ্ধবোধ, অমরকোষ, (নং ৩১৩ পৃষ্ঠা) তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ, ইমর্সন, কার্লাইল, আরবিক নীতি গ্রন্থ, পারসীক কবি হাফেজ প্রভৃতি সমুদয় পাঠ করিয়াছেন!!! এ সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিব। গ্রন্থকার দেখাইতে পারেন কি তাঁহার লিখিত ঘটনার ৬০ বৎসর পরে ১৬ বৎসরের বালিকার পরিবর্ত্তে ৩২ বৎসরের কোন যুবক এককালে অতগুলি পুস্তক পাঠ সমাপন করিয়াছেন? গ্রন্থের ঘটনার সময় উপরোক্ত পুস্তকগুলির অধিকাংশের নাম পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী শুনে নাই। আবার কেবল ঐ পুস্তক গুলিতেই পাষাণীর বিদ্যার পরিসমাপ্তি হয় নাই। পাষাণী

সমুদয় ইংরাজি খবরের কাগজ পড়িতে ও বেশ বুঝিতে পারে এবং দক্ষতার সহিত রাজনীতি পর্য্যালোচনা করে! আবার কেবল একা পাষাণীই এরূপ শিক্ষিত নহে, পাষাণীর মাতামহ হরগোবিন্দ ও গ্রন্থের নায়ক শশাঙ্কাশেখরও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক শিক্ষিত!

গ্রন্থকারের বর্ণনায় দেখা যায় তিনি চলিত (কিঞ্চিৎ সংশোধিত) হিন্দু আচার 'ব্যবহারের পক্ষপাতী (২৫, ২৭, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ১১২, ১৮৮, ৩০৬ পৃষ্ঠা ইত্যাদি.) এবং নায়িকা পাষাণীর শিক্ষক, প্রতিপালক ও মাতামহ হরগোবিন্দ (যদিও শিক্ষিত তথাপি) সে কালের লোক। কিন্তু তিনি কোন্ হিন্দু আচার ব্যবহারানুসারে বা কোন্ হিন্দু শাস্ত্র মত নিজ দৌহিত্রীর বিবাহ না দিয়া চিরকুমারী করিয়া রাখিলেন এবং তজ্জন্য কোন সামাজিক ক্ষতি বা দণ্ড ভোগ করিলেন না তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থকার এরূপ কোথাও বলেন নাই যে পাষাণী কুলীনকন্যা, উপযুক্ত কুলের পাত্রাভাবে তাহার বিবাহ হয় নাই। বলা বাহুল্য উক্তরূপ বিশেষস্থল ব্যতীত হিন্দু শাস্ত্র মতে উপযুক্ত সময়ে কন্যার বিবাহ না দিলে কন্যা কর্ত্তার মহা ধর্ম্ম হানি, নরক গমন প্রভৃতি' হইয়া থাকে। পৃথিবীর উপকারার্থ স্ত্রীলোকের চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করা খৃষ্টীয় প্রথা, এদেশের কোন শাস্ত্রে বা আচারে উহা নাই। আবার গ্রন্থের শেষ ভাগে ৩৫৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার একটী বিধবা বিবাহও দিয়াছেন!

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ দুই স্বতন্ত্র স্থানের দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোকের বর্ণনা আছে। এক তুলসীগ্রামের উপরোক্ত হরগোবিন্দ, পাষাণী, ভবানীশঙ্কর প্রভৃতি। অপর আসামের সন্নিকটস্থ বিলাসপুর নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা, রাজপুত্র শশাঙ্ক শেখর প্রভৃতি। (এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রধান সম্বন্ধ পাষাণীর, প্রতি শশাঙ্কশেখরের'প্রণয়।)

গ্রন্থকার ৫৪ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন বিলাসপুরের রাজা অর্থাভাবে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কর-অনাদায় বশত রাজ সংসার ঋণে ডুবিয়া আছে। ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন সৌধমালার চারিদিকের ভগ্নপ্রায় উচ্চপ্রাচীর, "সম্মুখেই বহুকালের জীর্ণপ্রায় ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু" "ফটকের স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়া বট অশ্বত্থের চারা বাহির হইয়াছে;" ইত্যাদি। এই ত গেল রাজার ও রাজ্যের বাহ্যিক অবস্থা। কিন্তু ইহার পরই ৪৮ পৃষ্ঠায় অন্দর মহলের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা মৃত নবাব ওয়াজিফ আলি সাহের সুসময়ে লক্ষ্ণৌ রাজত্বকালে তাঁহার অন্দরমহলের প্রতিরূপ। "নন্দনগিরি ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচটী প্রহরী রক্ষিত ফটক পার হইয়া একটী বড় মহলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহলের ফটকে কয়েকটী স্ত্রীলোক পাহারা দিতে ছিল।" এখানে শতাধিক পরিচারিকা নানা কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে।" কেহ কাপড় নিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ সুগন্ধি তৈল পাত্র হাতে করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। কেহ ফুলের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে। এক শ্রেণীর পারচারিকাগণ কিছু উচ্চ দরের। ইহারা দেখিতে সুন্দরী এবং অপেক্ষাকৃত মূল্যবান সাজ সজ্জায় সজ্জিত। এইরূপ বার তেরটী যুবতী বহুমূল্য বেশভূষায় অলঙ্কৃত একটী প্রৌঢ়া সুন্দরীকে ঘিরিয়া পরিচর্য্যা করিতেছে।" সুন্দরী

একখানি হীরা ও সোণার পাতালতা ফুলের কাজ করা মুক্তার ঝালর যুক্ত মখমলে মোড়া রূপার চৌকি বা ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর বসিয়া আছেন। সুসজ্জিত সেবিকাদের মধ্যে কেহ সুন্দরীর চুলরাশি নিয়া সোনার চিরুণীতে আঁচড়াইয়া দিতেছে। কেহ রূপার ডাটা, বিশিষ্ট, ময়ূরপুচ্ছের বড় পাখা নিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে।" (রাজার আরও দুই রাণী ছিলেন, তাঁহারাও সম্ভবতঃ এইরূপ রাজকীয় ভাবে থাকিতেন।) কিন্তু দুই স্থলের এই দুই প্রকার বর্ণনার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই।

কুন্তী রাজার মধ্যম রাণী। তাঁহার (ও বড় রাণীর) পুত্র হয় নাই, ছোটরাণীর পুত্র (শশাঙ্কশেখর) আছে, তাহাকে যুবরাজ করা হইবে ইহাতে কুন্তীর হিংসা হইতে পারে, এবং সেই পুত্রের ও তাহার মাতার প্রতি অনিষ্ট চেষ্টা এমন কি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টাও কুন্তীর পক্ষে (স্থল বিশেষে) সুসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু ইহার উপর গ্রন্থকার অত্যন্ত বাড়াবাড়ী করিয়া সমুদয় অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। কুন্তীর পিতা নন্দন গিরি এইমাত্র কন্যার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন, কিন্তু তিনি তৎপূর্ব্বেই হিংসায় উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছেন এবং কন্যাকে উত্তেজিত করিতেছেন। তাঁহার হিংসা প্রবৃত্তি কন্যার অপেক্ষাও অধিকতর তীক্ষ্ণ। কন্যা ও পিতার হিংসাস্থল ছোটরাণী ও তাহার পুত্র। কিন্তু তাহাদিগকে উৎসন্ন করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। বড় রাণীকে মারিলেন, বিলাসপুর লুঠপাট ও অগ্নিসাৎ করিলেন এবং রাজা ও রাজ্যকে সম্পূর্ণ উচ্ছন্ন করিলেন, এতদূর বাড়াবাড়ী করায় তাঁহাদের কি স্বার্থ ও কি উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এ হিংসা অস্বাভাবিক ও উহার কার্য্যও অস্বাভাবিক।

"শুষ্ক চুলযুক্ত মানুষের মাথার খুলী" হইতে পারে কি, আমরা গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি। বড় রাণী-লীলাকে কুন্তীর হত্যা করা ও হত্যা প্রণালী, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষত কুন্তীর মত অবস্থাপন্ন স্ত্রীলোকের পক্ষে, অতি অস্বাভাবিক ও অতি-কুৎসিৎ দৃশ্য। ৬৭ হইতে ৭১ পৃষ্ঠা।

১৩২—১৩৪ পৃষ্ঠা। সরমা ও মধুমতীর হত্যাকালে "ওর রক্ত খাব ওর কলজে খাব" ইত্যাদি উক্তি ও পরে সরমার ছিন্ন মস্তক লইয়া সুখদার নৃত্য—সুখদা স্বৈরিণী ও নেশার অধীন হইলেও—অত্যন্ত অস্বাভাবিক; এবং এ দৃশ্যও অতি কুৎসিৎ।

"আশা আমরা তোমাকে এ চর্ম্ম চক্ষে কখনও দেখি নাই। * * তোমার হাত দেখি নাই মুখ দেখি নাই, বাঁশি দেখি নাই, কিন্তু লক্ষ লক্ষবার তোমার বাঁশীর স্বপ্ন মাখা মধুর গান শুনিয়াছি।" ৭৪ পৃষ্ঠা। এইরূপ অর্থহীন বাক্য বিন্যাস পুস্তকে অনেক আছে।

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালাদেশে তান্ত্রিক আরাধনার ও তদানুসঙ্গিক নানা জঘন্য কাণ্ডের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। শুনা গিয়াছে গোপনে নরবলি হইত, নর মস্তক লইয়া বা শবের উপর বসিয়া শ্মশানে কালী আরাধনা হইত ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কোথাও কখন শুনিনাই যে মৃত শবের ঝল্‌সান হাত পাগুলি কাটিয়া নৈবেদ্য সাজান হইতেছে, এবং তাহা "ধর মায়ের মহাপ্রসাদ খাও" বলিয়া দেওয়া হইতেছে। ৮৩ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকারের রচিত হরগোবিন্দের মকদ্দমার বিচার অতি কৌতুক জনক। ভবানী-শঙ্করের পক্ষীয় একজন ব্যারিষ্টারের (৫০। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে মফস্বলের আদালতে ব্যারিষ্টারের উপস্থিতি!) অনুরোধে বিচারক হরগোবিন্দের দিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

যে সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আপনার পিতাঠাকুর এই টাকা ধার করিয়াছে, সে সম্পত্তি কাহার? এরূপ প্রশ্ন প্রতিপক্ষ ভবানীশঙ্করের পক্ষ হইতে হইতে পারে না। বিষয় বিনামী প্রমাণ করিবার জন্য হরগোবিন্দের পক্ষ হইতেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। পরে হরগোবিন্দ বলিতেছেন "পিতাঠাকুরের ঋণ পরিশোধের জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে যেন স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে কোন প্রকার সদনুষ্ঠান করা হয়। আমি আদালতের হস্তে আমার সমস্ত সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলাম।" ১৬৯ পৃষ্ঠা। আদালতের হস্তে এরূপ ক্ষমতা দিবার এবং আদাললতের লইবার কোন ক্ষমতা বা বিধি নাই।

গ্রন্থকার স্থানে স্থানে রাজনীতির পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। ৫৮ ও ৬০ পৃষ্ঠা। গ্রন্থকারের মত দেশীয় স্বাধীন রাজ্যগুলি হইতে ভারতের অপকার ব্যতীত উপকার হইতেছে না। হইার পরিবর্ত্তে সমস্ত ভারতে ইংরাজের অখণ্ড শাসন বিস্তৃত হইলে ভাল হইবে। ইত্যাদি। আমরা এ মতের প্রতিবাদী। এ মত যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এমন কি চিন্তাশীল ইংরাজও স্বীকার করেন, এবং বর্ত্তমান দেশীয় রাজ্যগুলি যাহাতে দেশীয় রাজাদিগের হাতে রক্ষিত হয়, তাহার জন্যই সকলে ইচ্ছুক। এবিষয়ে পূর্ণরূপে গ্রন্থকারের প্রতিবাদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়, এজন্য এস্থলে আমাদের মতমাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলাম।

এ পর্য্যন্ত গ্রন্থের দোষোল্লেখ করিয়াই আসিতেছি, সাধারণের নিকট আমাদের কর্ত্তব্যানুরোধেই তাহা করিয়াছি এজন্য গ্রন্থকার আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। গ্রন্থকার বোধ হয় নবীন লেখক, এজন্যে তাঁহার পুস্তকে অনেকগুলি দোষ ঘটিয়াছে। গন্থকারের ভবিষ্যৎ রচনা দোষহীন হইবে এবং তাহা পড়িয়া আমরা সুখী হইব এরূপ আশা করি। আলোচ্য গ্রন্থে প্রশংসার বিষয়ও অনেক আছে, নিম্নে তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিলাম।

নায়িকা পাষাণীর চরিত্র বিকাশ মন্দ হয় নাই। ভবানী শঙ্করের তুল্য পাষাণ হৃদয় অধার্ম্মিকের সংস্কার, হরগোবিন্দের নিঃস্বার্থপরতা, অমায়িকতা, পরোপকারিতা, বিদ্যাবতী হইলেও কুন্তলার সরলতা ও নিরহঙ্কারিতা, খাসিয়াদিগের বিশুদ্ধ চরিত্র, সে কালের লোকের (কৃষ্ণগোপালের) ধর্ম্ম ভাব, খাসিয়া পর্ব্বতে সন্ন্যাসীপরিবারের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-কলাপ, ইত্যাদির বর্ণনা অতীব সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম আঁকিবার নিমিত্ত গ্রন্থকার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তাহাতে সফলও হইয়াছেন। মেজর হটনের মুখে এদেশীয়দিগের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, এবং তাহাতে গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা বেশ অনুভূত হইতেছে। পুস্তকের শেষ ভাগে পাষাণীর বিষয় ত্যাগ, শশাঙ্ক শেখরের মৃত্যু দৃশ্য প্রভৃতি উত্তম হইয়াছে।

শ্রী——দাস।

স্থানাভাবে এবার হেঁয়ালি নাট্য গেল না। গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর 'বেহাত'। শ্রীযুক্ত, উপেন্দ্রনাথ সেন, বিধুভূষণ ঘোষ, হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ ঘোষ, ও শ্রীমতী মৃণালিনী দাসী ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

মানবীকরণই বটে।

প্রথম প্রস্তাব।

বর্ত্তমান সালের কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতীতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত "মানবীকরণ" নামে একটী চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা বিশেষ দক্ষতার সহিত লিখিত হইলেও আমাদের নিকট অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। এজন্য আমরা তাহার সমালোচন করা আবশ্যক মনে করিতেছি। আমরা এই উদ্দেশ্যে দুইটী প্রস্তাব লিখিব। প্রথমটীতে দ্বিজেন্দ্র বাবুর যুক্তির ত্রুটি প্রদর্শন এবং দ্বিতীয়টীতে ঈশ্বরে চৈতন্য আরোপ করা "মানবীকরণই বটে" বলিয়া প্রতিপাদন করিব। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্র বাবুর উত্তর প্রকাশিত হইলে দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিত হইবে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু ঈশ্বরে মানুষ্যের গুণ আরোপ করাকে "মানবীকরণ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। চৈতন্য যে একটী গুণ ইহা মনুষ্য "প্রথমতঃ আপনাতেই উপলব্ধি করে।" সুতরাং ইহা মনুষ্যেরই ধর্ম্ম। অতএব যখন আমরা ঈশ্বরকে চৈতন্য স্বরূপ বলি তখন আমরা ঈশ্বরে মনুষ্যের গুণ আরোপ করি। ইহা সত্য হইলে "ঈশ্বরেতে অচেতন-ধর্ম্ম আরোপ করা" অর্থাৎ "ঈশ্বরকে অন্ধ জড়-সত্তা রূপে প্রতিপাদন করা ভিন্ন—আর আমাদের গত্যন্তর থাকে না।" দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই বিতণ্ডার মর্ম্ম এই দাঁড়াইতেছে যে, আমরা কোন গ্রামের ক এবং খ নামে দুই ব্যক্তিকে মাত্র প্রবন্ধ লিখিতে পারে বলিয়া জানি; অতএব যদি সেই গ্রাম হইতে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং কোন কারণে নির্ণয় করিতে পারি যে, সেই প্রবন্ধ ক কর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই, তবে আমরা নিশ্চয় স্থির করিব যে তাহা খ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি—আমাদের অপরিচিত কোন ব্যক্তি কি সেই প্রবন্ধের লেখক হইতে পারেন না? ১ *

১ * ক যদি প্রবন্ধের লেখক না হ'ন, তবে খ তাহার লেখক; না হয় গ তাহার লেখক (যদিচ গ-কে আমি চিনি না); না হয় ঘ তাহার লেখক; কিন্তু খ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত আউড়িয়া যাইবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, শুদ্ধ কেবল এই মাত্র বলিলেই এক কথায় ফুরাইয়া যায় যে, ক যখন প্রবন্ধের লেখক নহেন, তখন অবশ্য অ-ক (অর্থাৎ ক ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি) তাহার লেখক। ঈশ্বর যদি চেতন পদার্থ না হ'ন, তবে তিনি পৃথিবী—না হয় জল—না হয় বায়ু—না হয় অগ্নি—না হয় আমার জ্ঞানের অগোচর অন্য কোন জড় পদার্থ; কিন্তু মিছামিছি এতগুলা বাক্য ব্যয় না করিয়া আমরা এক কথায় বলিয়াছি যে, ঈশ্বর যদি সচেতন পদার্থ না হ'ন তবে তিনি অচেতন পদার্থ—জড় পদার্থ। আমরা যদি বলিতাম যে, ঈশ্বর যদি চেতন-পদার্থ না হ'ন তবে

ইহা স্বীকার করিলাম যে জড়ত্ব ও চেতনা দুইটী স্বতন্ত্র গুণ এবং এই দুই গুণ ভিন্ন অন্য কোনও গুণই জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইলেই কি আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিব যে, জগতে অন্য কোনও গুণই নাই? কেন, ঈশ্বর কি জড় বা চেতন ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারেন না? বাস্তবিক ঈশ্বর যে অন্য কোনও গুণ স্বরূপ হইতে পারেন না ঈশ্বর-বিশ্বাসী মনুষ্যের এমত সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার নাই। আমরা দ্বিজেন্দ্র বাবুকে জড়ত্ব ও চৈতন্যের সংজ্ঞা করিতে অনুরোধ করিতেছি। অন্যথা অন্য কোনও গুণ জগতে আছে কিনা তাহার আলোচনা হইতে পারে না। ২ †

তিনি পৃথিবী, তাহা হইলেই প্রতিবাদীর মুখে এ কথা শোভা পাইত যে, কেন—তিনি জল হইলেও তো হইতে পারেন, বায়ু হইলেও তো হইতে পারেন, ইত্যাদি; কিন্তু আমরা তো তাহা বলি নাই; আমরা শুধু এই বলিয়াছি যে, তিনি যদি চেতন না হ'ন, তবে তিনি অচেতন। যাহা ক নহে তাহা অবশ্য অ-ক;—তাহা খ-ই হউক্‌ আর, গ-ই হউক্‌, আর, ঘ-ই হউক্‌,—তাহা অ-ক তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সেইরূপ, যাহা চেতন নহে—তাহা স্থূল ভূতই হউক্‌ আর সূক্ষ্ম ভূতই হউক্‌ আর যাহাই হউক্‌—তাহা অচেতন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। অচেতন-পদার্থের নামই জড় পদার্থ, আর জড়-পদার্থের নামই অচেতন পদার্থ। অনালোকের নামই অন্ধকার এবং অন্ধকারের নামই অনালোক। অচেতনতা—কাষ্ঠ, পাষাণ, স্থূল ভূত, সূক্ষ্ম ভূত, ইত্যাদি সমস্ত জড় পদার্থেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অতীব সূক্ষ্ম জড় পদার্থও অচেতনতা-বিষয়ে কাষ্ঠ-পাষাণের সহিত সমধর্ম্মী। উপরে যাহা বলা হইল, তাহার চুম্বক এইঃ—

দ্বি

২ † আমরা চেতন পদার্থও দেখিয়াছি অচেতন পদার্থও দেখিয়াছি,—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু সেই জন্যই কি আমরা বলি যে, যাহা চেতন নয় তাহা অচেতন? মনে কর যেন আমি কাক এবং বক ভিন্ন আর কোন পক্ষী দেখি নাই; তাহা হইলে নিতান্ত মূর্খ না হইলে কেহ আর এ কথা বলিতে সাহসী হইবে না যে, যাহা কাক নহে, তাহা বক—যেন কাক আর বক ছাড়া ত্রিভুবনের কোন স্থানেই আর-কোন পক্ষী থাকিতে পারে না! কিন্তু "যাহা কাক নহে তাহা বক" এ কথা বলা স্বতন্ত্র, আর "যাহা কাক নহে তাহা অ-কাক" এ কথা বলা স্বতন্ত্র; পূর্ব্বোক্ত কথার কিছুই স্থিরতা নাই, শেষোক্ত কথা সুনিশ্চিত সত্য। আমরা যদি বলিতাম "যাহা চেতন নহে তাহা স্থূল-ভূত, তাহা হইলে প্রতিবাদী বলিতে পারিতেন যে, "কেন—তাহা সূক্ষ্ম ভূত হইলেও তো হইতে পারে; কিন্তু এরূপ অনিশ্চিত কথা আমরা কোথাও বলি নাই; আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা যৎপরোনাস্তি সুনিশ্চিত; তাহা এই—"যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন—তাহা জড়।" অচেতন পদার্থকেই আমরা জড় পদার্থ বলিয়াছি—তা সে স্থূল ভূতই হউক আর সূক্ষ্ম ভূতই হউক্‌ তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। হংস যদি কাক না হয় তবে তাহা অ-কাক—এ কথা বলিতে কোন দোষ আছে কি? অতএব "ঈশ্বর যদি সচেতন-পদার্থ না হ'ন

অপর দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেন প্রস্তর পাষাণ অপেক্ষা মনুষ্যই উৎকৃষ্ট এবং প্রস্তর পাষাণের অজ্ঞান বা অচৈতন্য অপেক্ষা মনুষ্যের জ্ঞান বা চৈতন্যই উৎকৃষ্ট। তদ্ধেতু মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞানপথে অগ্রসর হওয়াই ঊর্দ্ধগতি এবং অজ্ঞান পথে গমন করাই অধোগতি। "এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়—ঊর্দ্ধগতির পথ না অধোগতির পথ—জ্ঞানের পথ না অজ্ঞানের পথ?" এই যুক্তি কেবল উৎকৃষ্টতা এবং ঊর্দ্ধগতিত্বের উপর সংস্থাপিত। কারণ মনুষ্যের জ্ঞান জড়ের অজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ঈশ্বরকে জ্ঞানময় বলিতে হইবে। এই স্থলে উৎকৃষ্ট শব্দের অর্থ কি তাহাও জানা আবশ্যক। এখন একটী উদাহরণ লইয়া এই যুক্তির তাৎপর্য্য প্রদর্শন করা যাউক। মনে কর শ্যাম, রাম এবং যদু নামে তিন ব্যক্তি আছে। তন্মধ্যে শ্যাম কিরূপ গুণ বিশিষ্ট তাহা আমরা জানিনা, কিন্তু তাহার গুণ রাম এবং যদুর গুণ দর্শন করিয়া নিরূপণ করিতে হইবে। পরন্তু দেখা যাইতেছে যে, রাম যখন যদু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তখন যে উৎকৃষ্ট গুণ রামের আছে তাহা শ্যামেরও হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। কারণ তাহা না করিলে দ্বিজেন্দ্র বাবুর যুক্তি মতে শ্যামের জ্ঞান লাভ জন্য ঊর্দ্ধগতির অথবা জ্ঞানের পথ অবলম্বন না করিয়া অধোগতির অথবা অজ্ঞানের পথই অবলম্বন করিতে হয়; যাহা মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয় নহে। ৩ ‡

তবে তিনি অচেতন পদার্থ সংক্ষেপে জড় পদার্থ" এই সহজ কথাটির ভিতর প্রতিবাদী যে কোন্‌খানটিতে দোষ দেখিলেন তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইউরোপীয় ন্যায়-শাস্ত্রে dichotomy (দ্বিখণ্ডীকরণ বলিয়া যুক্তি-প্রকরণের যে একটি মূল-নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতিবাদীর সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইবে।

এস্থলে জড়ত্ব ও চৈতন্যের সংজ্ঞা করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন দেখিতেছি না; কেননা যে-কোন বস্তু হউক্ না কেন—ক ই হউক্, খ-ই হউক্, আর গ-ই হউক্—তাহারই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যাহা ক নহে তাহা অ-ক, যাহা খ নহে তাহা অ-খ, যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন। দ্বি

৩ ‡ শুধু যে কেবল মনুষ্যেরই জ্ঞান অজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা নহে—জ্ঞান-মাত্রই অজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; যদি বল যে, উৎকৃষ্ট কিসে? তবে তাহার উত্তর এই যে, ধন-বিষয়ে ধনী দরিদ্র-অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; বিদ্যা-বিষয়ে গুরু শিষ্য-অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; ধর্ম্ম বিষয়ে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; জ্ঞান-বিষয়ে সচেতন পদার্থ অচেতন পদার্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ধন-বিষয়ে নির্ধন অপেক্ষা ধনবান্‌কে উৎকৃষ্ট বলি কেন? না যেহেতু নির্ধন ব্যক্তির ধনের অভাব আছে, ধনবান্ ব্যক্তির ধনের অভাব নাই। জ্ঞান-বিষয়ে সচেতন পদার্থকে অচেতন পদার্থ-অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলি কেন? না যেহেতু অচেতন সত্তাতে জ্ঞানালোকের অভাব আছে—সচেতন সত্তা জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত। একজন তুখোড় নৈয়ায়িক এখানে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বলিতে পারেন যে, অভাব না থাকাই যদি শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ হয়, তবে নির্ধন ব্যক্তিতে তো দারিদ্র্যের অভাব নাই, ধনবান্ ব্যক্তিতে দারিদ্র্যের অভাব আছে; সুতরাং দারিদ্র্য বিষয়ে—ধনবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা নির্ধন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ! এ কথার উত্তর দিতে হইলে নৈয়ায়িকের উপর নৈয়ায়িকতা করিতে

এক স্থানে এই লিখিত আছে—"পাছে সৃষ্ট বস্তুর কোন গুণ ঈশ্বরেতে আরোপ করা হয়, এই ভয়ে তুমি তাঁহাকে সচেতন পুরুষ বলিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু শুধু কি মনুষ্যই একা সৃষ্ট বস্তু—জড় বস্তু কি সৃষ্ট বস্তু নহে ?" দ্বিজেন্দ্র বাবু "জড় বস্তু" শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। ইহাতে জড়পিণ্ডও বুঝা যাইতে

হয়—চোরের উপর বাটপাড়ি করিতে হয় ; তাহাতে হানিই বা কি—অতএব দেখা যাক্ ;—এক ব্যক্তির খালি মাথা, এবং আর-এক ব্যক্তির মাথায় উষ্ণীশ রহিয়াছে ; যাহার খালি মাথা তাহার উষ্ণীশের অভাব রহিয়াছে, কিন্তু উষ্ণীশ-ধারী ব্যক্তির খালি মাথার অভাব নাই। উষ্ণীশ বিহীন ব্যক্তির শুদ্ধ কেবল খালি মাথা আছে কিন্তু উষ্ণীশ নাই ; উষ্ণীশ-ধারী ব্যক্তির খালি মাথাও আছে এবং তাহাতে উষ্ণীশও আছে—দুইই আছে। নির্ধনের শূন্য ভাণ্ডার—তাই সে দরিদ্র, ধনবানের পূর্ণ ভাণ্ডার—তাই সে ধনী ; নির্ধন ব্যক্তির শুধু কেবল শূন্য ভাণ্ডারই আছে—ধন নাই ; ধনবান্ ব্যক্তির শূন্য ভাণ্ডারও আছে ধনও আছে—দুইই আছে ; আর, দুয়ের সংযোগেই তাহার ভাণ্ডারের পূর্ণতা সম্পাদিত হইতেছে ; কেননা, পূর্ণ ভাণ্ডার = শূন্য-ভাণ্ডার + ধন। এই কথাটি গণিত-শাস্ত্র অনুসারে এইরূপ দাঁড়ায় যে, যাহার ১ আছে তাহার ০ও আছে, কেননা ১ = ০ + ১ ; কিন্তু যাহার শুদ্ধ কেবল ০ আছে, তাহার ১ নাই। অতএব, শূন্য-ভাণ্ডার—যাহা দারিদ্র্যের আর এক নাম—তাহা যে, কেবল নির্ধন ব্যক্তিরই আছে—ধনবান্ ব্যক্তির নাই তাহা নহে ; শূন্য ভাণ্ডার উভয়েরই আছে ; তবে কি ? না নির্ধনের শূন্য ভাণ্ডারই সার ; ধনবানের শূন্য ভাণ্ডার ধন-দ্বারা পরিপূরিত হইয়া "পূর্ণ ভাণ্ডার" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন উষ্ণীশধারী-ব্যক্তির খালি মাথার অভাব নাই, তেমনি ধনী ব্যক্তির শূন্য-ভাণ্ডারের (দারিদ্র্যের) অভাব নাই (মনে করিলেই সে দরিদ্র হইতে পারে—দরিদ্র হওয়া তাহার স্বেচ্ছাধীন); কিন্তু নির্ধন ব্যক্তির ধনের অভাব আছে। এই-রূপ দেখা যাইতেছে যে, দারিদ্র্যের অভাব কাহারো নাই ; ধনবানেরও দারিদ্র্যের অভাব নাই—নির্ধনেরও দারিদ্র্যের অভাব নাই ; উষ্ণীশধারী ব্যক্তিরও খালি মাথার অভাব নাই—উষ্ণীশ-বিহীন ব্যক্তিরও খালি মাথার অভাব নাই ; কিন্তু, ধনের অভাব—শুধু কেবল নির্ধনেরই আছে ; উষ্ণীশের অভাব শুদ্ধ কেবল উষ্ণীশ-বিহীন ব্যক্তিরই আছে। অতএব তুখোড় নৈয়ায়িকের এই যে একটি কথা যে, নির্ধন ব্যক্তির দারিদ্র্যের অভাব নাই—ধনবান ব্যক্তির দারিদ্র্যের অভাব আছে—অতএব দারিদ্র্য-বিষয়ে ধনী অপেক্ষা নির্ধন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, এ কথা নিতান্তই অমূলক ; যেহেতু উপরে দেখা গেল যে, ধনবান্ ব্যক্তির দারিদ্র্যের অভাব নাই, নির্ধন ব্যক্তিরই ধনের অভাব আছে। অতএব অভাবই হীনতার লক্ষণ এবং পূর্ণতাই শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন, চেতনত্ব এবং অচেতনত্ব এ দুই লক্ষণের মধ্যে কোন্‌টিই বা অভাব-জ্ঞাপক, আর কোন্‌টিই বা পূর্ণতা-জ্ঞাপক তাহা দেখা যা'ক্ ; যেটিকে দেখিব—অভাব জ্ঞাপক, তাহাকেই বলিব—নিকৃষ্ট ; আর, যে-টিকে দেখিব—পূর্ণতা-জ্ঞাপক, তাহাকেই বলিব—উৎকৃষ্ট। চেতন-পদার্থ যে, কি, তাহা আমরা জানি ; আর, অচেতন পদার্থ যে, কি, তাহাও আমরা জানি ; দুইই আমাদের জ্ঞানের বিষয়—দুইই জ্ঞেয়। যখন আমি বৃক্ষকে দৃষ্ট বস্তু বলিয়া জানিতেছি, তখন সেই সঙ্গে আমি আপনাকে দ্রষ্টা বলিয়া জানিতেছি ; দুইকেই আমি জানিতেছি—সুতরাং দুইই আমার জ্ঞানের বিষয়—দুইই জ্ঞেয় ; জ্ঞেয়ত্ব দুয়েরই ধর্ম্ম—আমারও ধর্ম্ম—বৃক্ষেরও ধর্ম্ম ; জ্ঞেয়ত্বের অভাব আমাতেও নাই—

পারে এবং জড়পিণ্ডের উপাদানও বুঝা যাইতে পারে। যদি জড়পিণ্ডই এই শব্দের লক্ষ্য হয়, তবে আমরা তাহাকে সৃষ্ট বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে যদি উপাদান পদার্থও গণ্য করা হইয়া থাকে তবে আমরা তাহাকে সৃষ্ট বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। জগতের কোথায়ও যখন উপদান পদার্থের উৎপত্তি ও

বৃক্ষেতেও নাই। যেমন, উষ্ণীশ-ধারী ব্যক্তিরও খালি মাথার অভাব নাই—উষ্ণীশ বিহীন ব্যক্তিরও খালি মাথার অভাব নাই, তেমনি আমাতেও (সচেতন পদার্থেও) জ্ঞেয়ত্বের অভাব নাই, বৃক্ষেতেও (অচেতন-পদার্থেও) জ্ঞেয়ত্বের অভাব নাই। কিন্তু বৃক্ষ জ্ঞাতা নহে, আমি জ্ঞাতা ; অচেতন পদার্থে জ্ঞাতৃত্বের অভাব আছে—সচেতন পদার্থে জ্ঞাতৃত্বের অভাব নাই। সচেতন পদার্থে জ্ঞেয়ত্বও আছে—জ্ঞাতৃত্বও আছে—দুইই আছে ; অচেতন পদার্থে শুদ্ধ কেবল জ্ঞেয়ত্ব আছে—জ্ঞাতৃত্ব নাই। প্রদীপ যেমন আপনাকে আপনি প্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে গৃহস্থিত ঘট-পটাদি প্রকাশ করে, চেতন পদার্থ তেমনি আপনাকে আপনি জানে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বিষয় জানে। প্রদীপ প্রকাশ করে (আপনাকে এবং ঘটাদিকে প্রকাশ করে) এবং প্রকাশ পায়—প্রকাশক এবং প্রকাশ্য—দুইই ; ঘটাদি প্রকাশ করে না—শুদ্ধ কেবল প্রকাশ পায়, ঘটাদি শুদ্ধ কেবল প্রকাশ্য—প্রকাশক নহে। প্রদীপে যেমন প্রকাশক এবং প্রকাশ্য দুইই একাধারে বর্ত্তমান, সচেতন পদার্থে—তেমনি—জ্ঞাতৃ-সত্তা এবং জ্ঞেয়-সত্তা দুইই একাধারে বর্ত্তমান ; কাজেই বলিতে হইতেছে যে সচেতন পদার্থের সত্তার ভাণ্ডার অপেক্ষাকৃত পরিপূর্ণ ; আর, অচেতন পদার্থে যখন জ্ঞাতৃ-সত্তার অভাব আছে, তখন অবশ্য তাহার সত্তার ভাণ্ডার অপেক্ষাকৃত পরিশূন্য ; এই জন্যই বলি যে, অচেতন-পদার্থ অপেক্ষা সচেতন পদার্থ উৎকৃষ্ট। অতএব প্রতিবাদী এই যে একটি কথা বলিয়াছেন যে, "মনুষ্যের জ্ঞান জড়ের অজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ঈশ্বরকে জ্ঞানময় বলিতে হইবে" এ কথা কোন কাজের কথা নহে ; কেননা, মনুষ্যের কেবল নহে কিন্তু সকলেরই জ্ঞান—জ্ঞান মাত্রই—অজ্ঞান-অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাহা মনুষ্যে আছে—তাহাই কি উৎকৃষ্ট ? মনুষ্যে তো জ্ঞানও আছে—অজ্ঞানও আছে ; জ্ঞানই বা তবে উৎকৃষ্ট হয় কেন—অজ্ঞানই বা উৎকৃষ্ট না হয় কেন ? অতএব জ্ঞান মনুষ্যেতে আছে বলিয়াই যে, জ্ঞান উৎকৃষ্ট, তাহা নহে ; জ্ঞানে সত্তার আধিক্য আছে বলিয়াই—জ্ঞান-পদার্থে জ্ঞাতৃ-সত্তা এবং জ্ঞেয়-সত্তা দুইই একাধারে বর্ত্তমান বলিয়াই—জ্ঞান উৎকৃষ্ট ; আর, অজ্ঞান-পদার্থে জ্ঞাতৃ-সত্তার অভাব আছে বলিয়াই তাহা নিকৃষ্ট। কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞান পূর্ণ-জ্ঞান নহে ; মনুষ্য পূর্ণ মাত্রায় আপনাকেও জানে না—অন্যকেও জানে না। রেণু-একটিকেও পূর্ণ-মাত্রায় জানিতে হইলে সমস্ত জগৎকে পূর্ণ-মাত্রায় জানা আবশ্যক—সর্ব্বজ্ঞ হওয়া আবশ্যক ; কেননা, প্রত্যেক বস্তুই সমস্ত জগতের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত। মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ নহে—সুতরাং মনুষ্যের জ্ঞান পূর্ণ-জ্ঞান নহে। কিন্তু আবার, সকল অপূর্ণ সত্তাই এক অদ্বিতীয় পূর্ণ সত্তার আশ্রয় সাপেক্ষ—ইহা না মানিলেই নয়। পূর্ণ সত্তাতে জ্ঞাতৃ-সত্তা এবং জ্ঞেয়-সত্তা দুইই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ; তাই আমরা বলি যে, সর্ব্ব জগতের মূলস্থিত পূর্ণ সত্তা পরিপূর্ণ সচেতন সত্তা। মনুষ্যের জ্ঞান আছে বলিয়াই কিছু আর আমরা ঈশ্বরকে সচেতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করি না,—তবে কি ? না পরিপূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে সত্তার পূর্ণতা হয় না বলিয়া আমরা ঈশ্বরকে পরিপূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করি। "চন্দ্রের যখন এপিট আছে—তখন তাহার ওপিট

বিনাশ দৃষ্ট হয় না তখন যে ব্যক্তি উহাকে স্থষ্ট বস্তু বলিয়া উল্লেখ করিবেন তিনিই উহার উৎপন্নত্ব প্রমাণ করিতে বাধ্য। ৪ §

আছে" ইহা যেমন সুনিশ্চিত, "ঈশ্বর যখন পূর্ণসতা—তখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান" ইহাও তেমনি সুনিশ্চিত। রামের সদ্‌গুণ আছে বলিয়া শ্যামেরও অবিকল সেইরূপ সদ্‌গুণ আছে" এ কথা স্বতন্ত্র এবং "ঈশ্বর পূর্ণ সত্য বলিয়া তিনি পূর্ণ-জ্ঞান" এ কথা স্বতন্ত্র; শেষোক্ত কথার সঙ্গে বরং এই উপমাটি সংলগ্ন হয় যে, পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্ব আছে বলিয়া তাহা চতুষ্কোণ; সমুদ্রের যখন উপরি-ভাগ আছে তখন তাহার অন্তস্তলও আছে; চন্দ্রের যখন এ পিট আছে তখন তাহার ও-পিটও আছে, ঈশ্বর যখন পূর্ণ-সত্য তখন তিনি পূর্ণজ্ঞান। যদি মনুষ্যের জ্ঞান আছে বলিয়াই ঈশ্বরেতে জ্ঞানের আরোপ করিতে হয়—তবে তাঁহাতে অপূর্ণ জ্ঞানের আরোপ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে; এরূপ করাও যা, আর, মনুষ্যের হস্ত আছে বলিয়া ঈশ্বরের হস্ত আছে সিদ্ধান্ত করাও তা— দুইই মানবীকরণ। কিন্তু আমরা আমাদের প্রস্তাবে স্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছি যে, ঈশ্বরকে সত্যং জ্ঞান মনন্তং বলা মানবীকরণ নহে। উপরে যাহা বলা হইল তাহার চুম্বক এই;—জগতের কোন পদার্থই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে; প্রত্যেক বস্তু সমস্ত জগতের আশ্রয়াধীন—সুতরাং পরতন্ত্র এবং অপূর্ণ; অপূর্ণ সত্তা আপনাতে আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না—তাহা পূর্ণ-সত্তার আশ্রয়াধীন; পূর্ণ সত্তাতে কোন সত্তারই অভাব থাকিতে পারে না, জ্ঞাতৃ-সত্তারও অভাব থাকিতে পারে না—জ্ঞেয়-সত্তারও অভাব থাকিতে পারে না—পরন্তু দুইই পূর্ণ-মাত্রায় বর্ত্তমান; অতএব ঈশ্বর পরিপূর্ণ সচেতন পুরুষ? দ্বি

৪ § অচেতন পদার্থকেই আমরা জড়পদার্থ বলিয়াছি। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুইই। জগতের মূল উপাদান কারণ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে—তাহা ঈশ্বরের জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত—কাজেই তাহা জড় বস্তু নহে; তবে কি? না সেই নিমিত্ত-সহকৃত উপাদান কারণ হইতে অচেতন-রূপী কার্য্য যত কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই জড়-বস্তু; পিণ্ডরূপী জড়বস্তুও জড়বস্তু, আর, সেই পিণ্ডের মূলস্থিত অচেতন শক্তিরূপী জড়বস্তুও জড়বস্তু;—কিন্তু সেই অচেতন শক্তির মূলে জ্ঞানময় ঐশীশক্তি যাহা বিদ্যমান আছে তাহা ঈশ্বরের জ্ঞানালোকে আলোকিত; সুতরাং তাহা জড়বস্তু নহে। মূল উপাদানের উৎপত্তি বিনাশ নাই—ইহা আমাদের শিরোধার্য্য; আমাদের অভিপ্রায় শুদ্ধ কেবল এই যে, সেই উপাদান যে অংশে সর্ব্বমূলাধার ঐশী-শক্তি সে অংশে তাহা জড় বস্তু নহে; যে অংশে তাহা অন্ধশক্তিরূপে এবং পিণ্ডরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছে সেই অংশেই তাহা জড়বস্তু। এখানে এইটি দেখা আবশ্যক যে, সকল খণ্ড আকাশই অসীম আকাশের অন্তর্ভূত সুতরাং অসীম আকাশে কোন খণ্ড আকাশেরই অভাব নাই; কিন্তু বিশেষ বিশেষ খণ্ড আকাশে আর আর সমস্ত আকাশেরই অভাব আছে; এ যেমন তেমনি—সমস্ত জগতের সমস্ত সচেতন এবং অচেতন শক্তি ঐশী-শক্তিরই বিশেষ বিশেষ আবির্ভাব—ঐশীশক্তিতে কোন শক্তিরই অভাব নাই; কিন্তু জগতের অভ্যন্তর-স্থিত বিশেষ বিশেষ শক্তিতে আর আর সমস্ত শক্তিরই অভাব আছে। মনুষ্যের ধীশক্তি সচে-তন শক্তি—পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি অচেতন শক্তি—দুয়েতেই অন্যোন্যের অভাব আছে; কিন্তু জগতের চেতনাচেতন সমস্ত শক্তিই ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সচেতন শক্তির আবির্ভাব—ঈশ্বরের মহতীশক্তিতে কোন শক্তিরই অভাব থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের মহতীশক্তি

অপূর্ণ মনুষ্য কিরূপে ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধি করে এই বিষয়ের মীমাংসা স্বরূপে দ্বিজেন্দ্র বাবু তৃতীয় পরিচ্ছেদের (পারাগ্রাফের) এক স্থানে বলেন –"আমরা চক্ষে যখন অন্ধকার দেখি—আমাদের মন তখন যেমন আলোকের দিকে প্রধাবিত হয়; আমরা উদরে যখন ক্ষুধা অনুভব করি—আমাদের মন তখন যেমন অন্নের দিকে প্রধাবিত হয়; সেইরূপ আমরা যখন আমাদের আপনাদের অপূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করি, তখন আমাদের আত্মা ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে প্রধাবিত হয়।" এতদ্রূপ যুক্তি প্রয়োগের নাম উপমান। উপমানের উদ্দেশ্য সাদৃশ্য প্রদর্শন। দ্বিজেন্দ্রবাবু অন্ধকার ও ক্ষুধাকে আমাদের অপূর্ণতার সহিত এবং আলোক ও অন্নভোজনকে ঈশ্বরের পূর্ণতার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এখন যদি স্বীকারও করা যায় যে আলোক ও অন্নভোজনই যথাক্রমে অন্ধকার ও ক্ষুধার পূর্ণতা, এবং আমরা অন্ধকার দর্শন ও ক্ষুধা অনুভব করিলে স্বভাবতঃই যথা-ক্রমে আলোক দর্শন ও অন্নভোজন করিতে চাহি, তাহা হইলেও কি আলোক দর্শন ও অন্নভোজনের সহিত ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধির তুলনা হইতে পারে? আমরা যে অন্ধকার দেখিলে আলোক দর্শন করিতে এবং ক্ষুধা অনুভব করিলে অন্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি তাহা কেবল পূর্ব্ব হইতে ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা উৎপন্ন অসুখ নিবারণ হইতে দেখিয়াছি বলিয়াই করিয়া থাকি।৫ * কিন্তু আমরা অপূর্ণ হওয়াতে

সমস্ত জগতেরই মূল উপাদান—এবং তাহা ঈশ্বরের জ্ঞানালোকে আলোকিত। আমরা বলি এই যে সমস্ত জগতের মূল উপাদান অচেতন জড়-পিণ্ডও নহে, অচেতন জড়-শক্তিও নহে; তাহা ঐশীশক্তি—পরমাত্মার আত্মশক্তি—পরিপূর্ণ সচেতন শক্তি; আরো এই বলি যে, শক্তি-রূপী জড় বস্তুও যেমন—পিণ্ড-রূপী জড়বস্তুও তেমনি—দুইই অচেতন-ধর্ম্মী, এইজন্য দুইই জড়-শব্দের বাচ্য। দ্বি

৫ * হংস-শাবক যে অণ্ড হইতে বাহির হইয়াই পুষ্করিণীর দিকে ধাবিত হয়; তাহার পূর্ব্বে সে কি কোন-কালে সন্তরণ-সুখ অনুভব করিয়াছিল? না সদ্যোজাত শিশু পূর্ব্বে কোন কালে মাতৃস্তন আস্বাদন করিয়াছিল? শিশুর জন্মিবার পূর্ব্ব-হইতেই মাতৃস্তন আছে এবং তাহার সহিত শিশুর পোষ্য- পোষকতা সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত আছে; তাই সদ্যোজাত শিশু ক্ষুধা অনুভব করিবামাত্রই মাতৃস্তনের প্রতি উন্মুখ হয়। পূর্ব্ব হইতেই পরমাত্মা বর্ত্তমান আছেন, এবং তাঁহার সহিত জীবাত্মার পোষ্যপোষকতা সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত আছে, তাই আমরা আমাদের আত্মার অপূর্ণতারূপ ক্ষুধা অনুভব করিবা-মাত্রই তাঁহার প্রতি উন্মুখ হই; যেহেতু পূর্ণ পুরুষ ব্যতিরেকে অপূর্ণাত্মার অভাব পূরণ করা আর কাহারো কার্য্য হইতে পারে না। পূর্ণ পরমাত্মা হইতেই আমরা হইয়াছি এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা বর্ত্তমান রহিয়াছি; তাঁহার পূর্ণ-সত্তার ভাণ্ডার হইতেই আমাদের সত্তার ভাণ্ডার নিয়তই পরিপূরিত হইতেছে; এই জন্য শিশু যেমন মাতার স্নেহ-ভাণ্ডার সহজেই হাত বাড়াইয়া পায়, আমরা সেইরূপ ঈশ্বরের পূর্ণসত্তা সহজেই উপলব্ধি করি। "কেমন করিয়া উপলব্ধি করি" এ কথার উত্তর এই যে, যেমন করিয়া উপলব্ধি করা জ্ঞানের নিয়মানুযায়ী তেমনি করিয়া উপলব্ধি করি; পূর্ণ এবং অপূর্ণ দুয়ের প্রতিযোগে দুইকে উপলব্ধি করি। আকাশের বেলায় যেমন—অসীম আকাশের প্রতিযোগে খণ্ড

যদি ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধ করিতেই অক্ষম হই, তবে ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধি করা কোনও দিনই হইবার নহে। তাহা অদ্য যেরূপ অজ্ঞাত আছে, মৃত্যুর দিবসেও সেই-রূপ অননুভূত থাকিবে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু অপর বলেন—"সসীম আকাশ-মাত্রই অসীম আকাশকে অপেক্ষা করে, সাবলম্ব মাত্রই নিরবলম্বকে অপেক্ষা করে—অপূর্ণ মাত্রই পূর্ণকে অপেক্ষা করে—পরতন্ত্র মাত্রই স্বতন্ত্রকে অপেক্ষা করে।" এই স্থলে "অপেক্ষা করে" শব্দের অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা কি একই অর্থে এই চারিস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে না স্থান বিশেষে কোন প্রভেদ আছে? তবে তাহা যে কি এবং যদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তবে সেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ যে কি তাহা আমরা পরিষ্কাররূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ৬ +

দ্বিজেন্দ্র বাবু সর্ব্বশেষ পরিচ্ছেদে বলিলেন "বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে নির্ঘাত যুক্তি বলিয়া—একেবারেই ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া স্থিরস্থার করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা এই;—জগতে অশেষবিধ অমঙ্গল দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও ঈশ্বরবাদী জগৎকর্ত্তাকে মঙ্গল স্বরূপ বলিতে ছাড়েন না; ঈশ্বরবাদী, লোকহিতৈষী মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে ঈশ্বরকে মনোমধ্যে গড়িয়া তোলেন,—ইহা মানবীকরণ নহে তো আর কি?" দ্বিজেন্দ্র বাবু যদি এস্থলে "বৈজ্ঞানিকেরা" না বলিয়া "দার্শনিকেরা" বলিতেন, তাহা হইলে বোধ করি ঠিক কথা হইত। আমরা যতদূর জানি তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, বৈজ্ঞানি-কেরা মানবীকরণ লইয়া তর্কই করেন না। বৈজ্ঞানিকদিগের অধিকাংশই ঈশ্বর বিশ্বাসী আস্তিক। উহাঁরা জগতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বাকার করেন না এবং ঈশ্বরকে কোন সাক্ষাৎ অমঙ্গল জন্য দায়ী বলিয়াও গণ্য করেন না। উহাঁদের মতে ঈশ্বরের নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে ক্রমবিকাশ হইয়া জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই বিকাশ পরিবেষ্টিত অবস্থার দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে স্থান বিশেষে মঙ্গল এবং স্থান বিশেষে অমঙ্গল ঘটিতেছে। উহাঁরা সেই মঙ্গল ও অমঙ্গলকে সম্প্রাপক অবস্থার উপরই স্থাপন করেন, কিন্তু জগৎ-নিয়ন্তার সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বের উপর অর্পণ করেন না। অপিচ যে সকল বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর-বিশ্বাসী নহেন তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার বিরুদ্ধে অন্যবিধ

আকাশ উপলব্ধি করি এবং খণ্ড আকাশের প্রতিযোগে অসীম আকাশ উপলব্ধি করি—দুইই এক সঙ্গে উপলব্ধি করি; আশ্রয়-আশ্রিতের বেলায় যেমন—স্বাতন্ত্র্যের প্রতি-যোগে পারতন্ত্র্য উপলব্ধি করি এবং পারতন্ত্র্যের প্রতিযোগে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করি—দুইই এক সঙ্গে উপলব্ধি করি; উহাও সেইরূপ। দ্বি

৬ + এই সহজ কথাটি বুঝিতে প্রতিবাদীর এত ভার বোধ হইতেছে কেন বুঝিতে পারিলাম না; ইংরাজীতে বলিলে যদি ইনি বুঝিতে পারেন তবে উহা এই বই আর কিছুই নহে যে, Correlatives mutually presuppose or imply each other. দ্বি

অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে সেই সমস্ত অস্ত্রের আদর্শ প্রদর্শন করিব। ৭ ‡

শ্রী প্রভাতচন্দ্র সেন।

রামঝোরা।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, তাঁহার স্ত্রী, আমার ব্রাহ্মবন্ধু হায়দরাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হীরানন্দ, সিন্দ্ টাইম্স্ পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক (সিন্দ্ টাইম্স্ সংপ্রতি ইংরেজ হস্তগত হইয়াছে) শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও আমি একদিন সমুদ্র সম্ভোগে যাই। বেলা ৯টার সময় আমরা রওয়ানা হই। কিয়ামারি

---

৭ ‡ বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থ এখানে scientist, বিজ্ঞান-বাদী। ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি যাঁহাদের আস্থা নাই, শুদ্ধ কেবল বাহ্য বিষয়ের পরীক্ষাই যাঁহাদের একমাত্র নির্ভর-স্থল, তাঁহারাই এখানে বৈজ্ঞানিক নামে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কোন্ বৈজ্ঞানিক কি বলেন কি না বলেন—তাহার সবিস্তর বিবরণের সঙ্গে আমার লিখিত প্রস্তাবের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। অনেক বৈজ্ঞানিক (অথবা বিজ্ঞান-ভক্ত দার্শনিক—নামে কিছুই আইসে যায় না) মানবীকরণের ভয়ে ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলিতে কুণ্ঠিত হ'ন; আমরা দেখাইয়াছি যে, মনুষ্যের প্রজ্ঞা-চক্ষু বিকসিত হইলে মনুষ্য কাজে কাজেই ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলিয়া উপলব্ধি করে। আমার তাৎপর্য্য কেবল এই যে, মনুষ্য যখন নিজে বিশুদ্ধ মঙ্গল-কার্য্যে পারদর্শী হয়, যখন তাহার নিজের অন্তর-স্থিত সমস্ত উদ্দেশ্যই মঙ্গল উদ্দেশ্য হয়, তখন সে প্রকৃতির অভ্যন্তর স্থিত নিগূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করে এবং ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলিয়া ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করে; এরূপ ধ্রুব-জ্ঞান মনুষ্যের সাধন-সাপেক্ষ। যাহার পুত্র হইয়াছে সে যেমন পিতার মঙ্গল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে—আর-একজন যাহার পুত্র হয় নাই সে তেমন-টি পারে না কেন? পুত্রবান্ ব্যক্তি পুত্রের হিত-সাধনে নিজে নাকি কৃতকর্ম্মা, এজন্য পিতার মঙ্গল উদ্দেশ্য সে যেমন বুঝিতে পারে—পুত্রহীন ব্যক্তি তেমনটি পারে না; এ যেমন, তেমনি—নিজে যিনি জগতের হিত সাধনে কৃতকর্ম্মা, ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য তিনি যেমন বুঝিতে পারেন—অন্যে তেমনটি না পারিবারই কথা। যদি বল যে, এমন-সব ব্যক্তি আছেন যাঁহারা মঙ্গল-কার্য্যে খুবই তৎপর অথচ তাঁহারা সংশয়-বাদী; তবে তাহার উত্তর এই যে, তাঁহাদের মঙ্গল-কার্য্য নিতান্তই অঙ্গহীন; হয় তাঁহারা অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মঙ্গল-কার্য্যে রত হ'ন; কোন্ মাতা ক্রোড়ের শিশুর মঙ্গলের জন্য লালায়িত নহে? নয় যশোলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া মঙ্গল কার্য্যে রত হ'ন; নয় প্রাপ্তির আশায় মঙ্গল-কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন; কিন্তু বিশুদ্ধ মঙ্গল উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করা আর এক-প্রকার। অন্ধ সংস্কার বিষয়-লালসা এবং স্বার্থাভিসন্ধি হইতে যিনি পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তিনি বাহিরের কোন কিছু দ্বারা বিচলিত না হইয়া আত্মার গভীর অভ্যন্তর হইতে কার্য্য করেন; এরূপ অবস্থায় আত্মার সেই গভীর অভ্যন্তরে পরমাত্মার চরম উদ্দেশ্য—সর্ব্ব জগতের মঙ্গল উদ্দেশ্য—সাধকের সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত প্রজ্ঞানেত্রে কখনই অপ্রকাশ থাকিতে পারে না। দ্বি

বন্দরে নৌকায় আরোহণ করিতে হইবে। পথে কারাচির শহর মার্কেট্ হইতে বাবু হীরানন্দ চাল ডাল, নানা রকমের তরকারি, কলা, ডালিম, কমলালেবু, চিনেবাদাম প্রভৃতি দ্রব্য কিনিয়া লইলেন। অবিলম্বে আমরা কিয়ামারিতে পৌঁছিলাম। কিয়ামারি কারাচির বন্দর, কারাচি হইতে ৪।৫ মাইল। এখানে শত শত দেশী সমুদ্রগামী-নৌকা ও বিদেশী জাহাজ সমুদ্র বক্ষে দিবানিশি ভাসিতেছে। বন্দরের আরম্ভ স্থানে দেশী-সমুদ্রগামী-নৌকার জেটি বা মাল বোঝাইয়ের স্থান। অগভীর সমুদ্রাংশ বাঁধিয়া ইহা-দিগের জন্য স্থান করা হইয়াছে। শত শত নৌকা জেটিতে বাঁধা রহিয়াছে। নৌকা-গুলি সামান্য নয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। ইহারা সমুদ্রের তীর-বাণিজ্য (Coasting trade) বহন করে—কচ্ ও বোম্বাই পর্য্যন্ত যায়—মৎস্য ফলাদিই ইহারা বেশী বহন করে। ইহারা তীরে তীরে বাহিয়া যায়—পাল উড়াইয়া যায়—সমুদ্রের এমনি মহিমা আর মানুষের এমনি কৌশল, বায়ু যে দিকেই বহুক না কেন, নৌকা পাল উড়াইয়া গন্তব্য দিকে চলে। শুষ্ক লোনা মাছের কারবারই বেশী—তাই এ দেশী জেটির সান্নিধ্য বড় নাসিকারঞ্জন নয়—শুষ্ক মৎস্যের গন্ধে সমুদ্রতীরেও নরনাসিকা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। দেশী জেটির অনতিদূরেই করাচির পোতাশ্রয় (Harbour)। দেশী জেটিও এই পোতাশ্রয়ের অন্তর্গত, তবে পোতাশ্রয়ের কতকটা স্থান বাঁধিয়া তাহার জন্য জায়গা করা হইয়াছে। পোতাশ্রয়টি বোম্বাই পোতাশ্রয় হইতে ছোট। পোতাশ্রয় কারাচির পশ্চিম দক্ষিণে। পশ্চিম দক্ষিণে কারাচির সহিত মিলিত ধীরব-নিবাস স্থান। এখানে অসংখ্য ধীবর বাস করে। ইহারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় পাল উড়াইয়া মুক্ত সমুদ্রে মাছ ধরে। পোতাশ্রয় তরঙ্গভঞ্জন (Break-water) রক্ষিত ও শতপোতাকীর্ণ বলিয়া সেখানে সামুদ্রিক মাছ বড় একটা পাওয়া যায় না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধীবর-তরণীগুলি যখন দুগ্ধশ্বেত পাল উড়াইয়া সমুদ্র হৃদয়ে বিচরণ করে তখন তাহাদের শোভা মনোহর ও বিস্ময়কর। মনে হয় এক একটা বিশাল রাজহংস সমুদ্র বক্ষে ভাসিতেছে। ধীবর বাসভূমি হইতে অসংলগ্ন হইয়া সমুদ্র হৃদয়ে পোতাশ্রয় মুখে ম্যানোরা দ্বীপ দাঁড়াইয়া। কিয়ামারি, কারাচি, ধীবর বাসভূমি ও ম্যানোরা দ্বীপের মধ্যে যে সমুদ্রাংশ তাহাই কারাচি পোতাশ্রয়। পোতাশ্রয় ৫।৬ মাইল লম্বা ও ৩।৪ মাইল চৌড়া হইবে। আমরা দেশী জেটি হইতে অবিলম্বে বিদেশী জেটিতে উপনীত হইলাম। দেশী জেটি ছাড়িতে না ছাড়িতেই একজন কৃষ্ণবর্ণ দৃঢ় শরীর নাবিক আমা-দের গাড়ী ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল; তাহার বোটের মত বোট্ যে কিয়ামারি বন্দরে নাই এ বিষয়ে অজস্র বক্তৃতা করিতে লাগিল; তাহায় বোটের ফার্ষ্টক্লাসত্বের নিদর্শনী টিকেট দেখাইল; ৩ টাকা পাইলেই সে সমস্তদিন আমাদের সমুদ্র দেখাইবে অঙ্গীকার করিল, মাঝে মাঝে একবার পশ্চাতে হটিয়া আমাদের গাড়ীর কর্ত্তা যিনি গাড়ীর পশ্চাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহার সুপারিশ ভিক্ষা করিল, গাড়ীর কর্ত্তা সার্টিফাই করি-

লেন এমন বোট আর কারো নাই; মূঢ় আমরা কারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া বেথাতির জেটির দিকে চলিলাম। গাড়ী থামিলে বাবু হীরানন্দ নৌকা ভাড়া করিতে নামিলেন। আমিও নামিলাম। শীঘ্রই হীরানন্দ বাবুর যে দশা দেখিলাম তাহাতে ভীরু বাঙ্গালির আর তাঁহার সঙ্গে যাইতে ভরসা হইল না। মাছি যেমন গুড়ের উপর, ইংরেজি স্কুলের ছেলেরা যেমন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর, বাঙ্গালা খবরের কাগজের এডিটররা যেমন ইংরেজের উপর, এঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানরা যেমন বাবুর উপর তেমনি মাঝিরা হীরানন্দের উপর পড়িল। কেহ হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে মাঝি-সমুদ্র হইতে এক কিনারায় আনিবার চেষ্টা পাইতেছে; কেহ কোট্ লাঙ্গুল (হীরানন্দ বাবুর কোটে লাঙ্গুল আছে কি না যদিও আমি নিশ্চিত বলিতে পারি না) ধরিয়া সেই উদ্দেশ্য সাধনেই সচেষ্ট হইতেছে; প্রত্যেকেই অপর সকলের নৌকা অতি খারাপ ও ভয়শঙ্কুল প্রতিপাদন করিবার জন্য মুখ-চোথাগ্রে হাত নাড়িয়া বক্তৃতা করিতেছে। হীরানন্দ বাবুর দশা দেখিয়া হৃদয়ে দয়ার উৎস উথলিয়া উঠিল,কিন্তু মাঝি-সমুদ্রে মজ্জমান দেখিয়াও তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে ভরসা পাইলাম না। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এইরূপ হাবুডুবু খাইয়া, তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করিয়া অদৃষ্ট-বলে হীরানন্দ বাবু ডেঙ্গা পাইলেন—যে অর্দ্ধ পথে আমাদের গাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল তাহারই বোট পৌনে-দুটাকায় সমস্ত দিনের জন্য ভাড়া করা হইল। পৃথিবীতে কামড়ে পড়ে থাকার মত জিনিশ নাই—ধরেছ তো ছেড়োনা; লাথি খাও, জুতো খাও, গাল খাও, কামড়ে পড়ে থাকো, তোমার জয় নিশ্চয়। একটা সত্য গল্প মনে পড়লো। বাঙ্গলার একজন সেকেলে লোক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটির আশায় এক কমিশ্যনর সাহেবের কুঠিতে যাওয়া আসা করিতেন। অনেক দিন যাওয়া আসা করিতেছেন, খোষামোদ, তোষামোদ, হুজুর, গরীব-পরোয়া, খোদাবন্দ, মা বাপ করিতেছেন, কিন্তু কমিশনর সাহেব কিছুই করিতেছেন না। এক দিন কমিশ্যনর সাহেব আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে আমাদের ডেপুটিত্বাকাঙ্ক্ষী গেটের সম্মুখে উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া সাহেবের কুকুরটা খেউ খেউ করিয়া তাহার দিকে ছুটিল, বাবু কহিলেন, "ওরে তুই কি আজও জানিস না—তুই যেমন খোদাবন্দের কুকুর আমিও তেমনি তাঁরই কুকুর—যিনি তোকে খেতে দেন, তিনি আমাকেও খেতে দেন।" সাহেব শুনিয়া অবাক—কিন্তু পক্ষকাল মধ্যে বাবু-জির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল—তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। তাই বলি কামড়ে পড়ে থাকবে—লাথি খাও, জুতো খাও, কামড়ে পড়ে থাকবে, তোমার জয় নিশ্চিত। কিন্তু ফিলজফাইজিং ছেড়ে এখন আমাদের যাত্রার কাহিনী লিখি। জেটির নীচে নীচে অনেক বোট—ইহারা সমুদ্রে বেড়াবার বোট, ম্যানোরা প্রভৃতি দ্বীপে যাইবার বোট। সিঁড়ি দিয়া আমরা বোটে নামিলাম। বোট্‌গুলি বেশ, ৭।৮ জন লোক বেশ বসে যাওয়া যায়। বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য কোন কিছু নাই—তবে এদেশে বৃষ্টি হয় না বলিলেই হয়,—বৎসরে ৪।৫ ইঞ্চ মাত্র বৃষ্টি। আজ বৃষ্টির সময়ে কে সমুদ্রে বেড়াইতেই

বা যায়। রৌদ্র কষ্ট নিবারণের জন্য একখানি ছোট সামিয়ানা প্রয়োজন হইলে টাঙ্গান হয়, হালের দিকে নৌকাদেহে সংলগ্ন বেঞ্চ আছে—তাহার উপরে তুলোর রঙ্গিন গদি। সম্মুখে খুব মোটা শক্ত মাস্তুল। আমাদের দেশে পাল প্রায় চতুষ্কোণ এখানে ত্রিকোণ ত্রিভুজ। ত্রিভুজ না হইলে সকল দিকে নৌকা চালান যাইত না। চারটা দাঁড় আছে—চার জন দাড়ি—একজন মাঝি।

আমরা সকলে উঠিলে নৌকা ছাড়িয়া দিল। দাঁড় বাহিয়া চলিল। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড উচ্চ বৈলাতিক জাহাজ সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া,মাল বোঝাই করিবে। আরো কতগুলি বড় জাহাজ এখানে ওখানে কুম্ভকর্ণের মত পড়িয়া আছে। একটা মস্ত ডেজর (পোতাশ্রয়ে ৬।৭টা ড্রেজর Dredger) পোতাশ্রয় গর্ভে যেখানে বালুকা কর্দ্দম দেখিতেছে সেখানের বালুকাকর্দ্দম উঠাইয়া তীরে লইয়া ফেলিতেছে। ৬ মাস ড্রেজরের কাজ বন্ধ রাখিলে পোতাশ্রয় ভরিয়া যায়—বড় জাহাজ চলিবার মত থাকে না—তাই ড্রেজর পোতাশ্রয়ের বালুকাকর্দ্দম উত্তোলনে সর্ব্বদা নিযুক্ত। মানুষ কি না করিতে পারে—সমুদ্রের বালুকা-রাশি উঠাইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া আপদ সঙ্কুল সমুদ্রকে নিরাপদ পোতাশ্রয় করিতে পারে। আমি তরঙ্গ-ভঞ্জন বা ব্রেকওয়াটরের উল্লেখ করিয়াছি। ম্যানোরা দ্বীপ হইতে এই তরঙ্গভঞ্জন সমুদ্রে ১৫০০ ফিট গিয়াছে। ইহা একটা কঙ্ক্রীট্ (Concrite) অর্থাৎ চুন-বালুকা-প্রস্তর-খণ্ড সম্মিলন-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রাচীর। প্রথমে রাশি রাশি বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে ভিত্তিস্থান্ উচ্চ হইলে তাহার উপরে কঙ্ক্রিট-প্রাচীরখণ্ড (blocks) সকল বসান হয়। এক একটা প্রাচীর-খণ্ড ২৭৫ টন ভারি। ম্যানোরাতেই ইহা তৈয়ার হয়। এই তরঙ্গ-ভঞ্জন-প্রাচীর কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কখনও জলে ডুবিয়া যায়। তরঙ্গভঞ্জন তরঙ্গভঞ্জনই বটে—মুক্ত সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ গর্জ্জন করিতেছে, তরঙ্গভঞ্জনাবদ্ধ পোতাশ্রয়ে সমুদ্র ঈষদান্দোলিত। আমরা কিছু দূর পোতাশ্রয়ে কিয়ামারির তীরে তীরে দাঁড় বাহিয়া গেলাম—হাওয়া নাই, পাল যদিও খাড়া করা হইয়াছিল নৌকা অতি ধীরে চলিতেছিল। দাঁড় ছাড়িয়া গুণ ধরিল, গুণ টানিয়া নৌকা চলিতে লাগিল। কিয়ামারির তীরে তীরে চলিতেছিলাম। সে তীর কি রকম পাঠককে বলিব। পোতাশ্রয়ের কিয়ামারি তীরটা ছোট বড় প্রস্তরখণ্ডে বাঁধান,সমুদ্রাক্রমণ নিবারণই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রস্তরময় তীরে এক অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম। এত কাঁকড়া কখনো দেখি নাই। শত শত কাঁকড়া ছোট বড়, কৃষ্ণ, শ্বেত, লাল, নীল, হরিৎ, চিত্র বিচিত্র-প্রস্তর-খণ্ডের উপরে চলিতেছে। প্রস্তর খণ্ডে খণ্ডে যে সব গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা জলে ভরা, সেই গর্ত্ত হইতে এই কাঁকড়াগুলি বাহিয়া উঠিতেছে, শত শত পাথরের উপরে বসিয়া আছে, যেন রোদ পোহা-ইতেছে—শত শত বাহিয়া উঠিতেছে, শত শত ঝুপ করিয়া জলে পড়িতেছে। জেটি হইতে পোতাশ্রয়ের মুখ পর্য্যন্ত সমস্তটা তীরে এই অনন্ত কাঁকড়া শ্রেণী দেখিলাম। এক

একটা কাঁকড়া খুব বড়। এখানকার কাঁকড়া প্রায়ই কাল—ইহারাই কারাচির বাজারে বিক্রয় হয়। পোতাশ্রয়ের কারাচি-তীরের এক অংশের নাম ক্লিফ্‌টন্ (Clifton)। এখানে জাহাজ আসিতে পারে না, কেননা ইহা অতি অগভীর। ক্লিফটনের বালু ভূমিতে যে কাঁকড়া পাওয়া যায় তাহারা শাদা। কাঁকড়া দেখিতে দেখিতে আমরা কিয়ামারিতীর পশ্চাতে ফেলিলাম। সম্মুখে পোতাশ্রয়-মুখে ম্যানোরা দ্বীপ। আমরা ম্যানোরায় না গিয়া ক্লিফটন্ উপসাগরের মুখস্থিত রামঝোরা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে গেলাম। এখানে এক সরল রেখায় তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে—দ্বীপ না বলিয়া ইহাদিগকে সামুদ্রিক পাহাড় বলিলে ঠিক হয়, কেন না ইহারা সমুদ্র বন্দর হইতে পাহাড়ের মত একেবারে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে। কেবল ইহারা নহে, পৃথিবীর অধিকাংশ দ্বীপই পার্ব্বত্য, সমুদ্র গর্ত্তস্থ পর্ব্বতোপরে সংস্থিত। এই যে তিনটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উল্লেখ করিলাম, ইহারা অতি নিকটে নিকটে। ইহারা যে এক সময়ে একটা অভিন্ন দ্বীপ বা পাহাড় ছিল তাহারা সন্দেহ নাই। এই দ্বীপ তিনটিই জনপ্রাণী শূন্য। জলপক্ষীরা ইহাদের উপরে আসিয়া বাসা করে। পোতাশ্রয়-মুখের বাহির হইলেই দক্ষিণে ও পূর্ব্বে অনন্ত বিস্তৃত সিন্ধু। এখানে আসিয়া আমরা হাওয়া পাইলাম—পালে আমাদের ক্ষুদ্র নৌকা শান্ত সিন্ধু হৃদয়ে তর তর করিয়া চলিল। রামঝোরার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা রামঝোরায় উপনীত হইলাম। রামঝোরার নিকটে যে আর দুটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, তাহার একটি খুব উচ্চ পাহাড়, সমুদ্র হইতে চারিদিকেই এমন খাড়া হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাতে চড়া দুরে থাকুক পদক্ষেপ করিবারও মানুষের সাধ্য নাই। রামঝোরা দ্বীপ বা পাহাড়ে একটি বড় সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম। দ্বীপটির মধ্যস্থল দিয়া এ পাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত সমুদ্র একটি সুরঙ্গ করিয়াছেন—খুব ছোট নৌকা হইলে পাহাড়ের নীচ দিয়া ভাটার সময় এ পাশ হইতে ওপাশে চলিয়া যাওয়া যায়—জোয়ারের সময় জল উঁচু হইয়া উঠিয়া সুরঙ্গ অর্দ্ধেক বুজাইয়া ফেলে।

আমরা রামঝোরা প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে নামিলাম বা উঠিলাম। প্রদক্ষিণ যে কোন পুণ্যার্থে করিলাম তাহা নহে, উঠিবার মত জায়গার অন্বেষণে। যে স্থানে উঠিলাম সেখানে জল পর্য্যন্ত গোটা কতক সিঁড়ি বানান আছে। এখানে যোগী তপস্বীরা নাকি অনেক সময়ে নির্জ্জনে যোগ তপস্যা করিতে আসেন—আসিয়া অনেক দিন থাকেন। যোগী তপস্বী আসিয়াছেন শুনিলেই করাচি হইতে বিশ্বাসীরা দুগ্ধ ফল মূলাদি লইয়া এখানে তাঁহাদিগের সেবা করে। রামঝোরায় উঠিয়া আমরা ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলাম, কোথাও থাকিবার বা ছায়ায় বসিবার মত জায়গা দেখিতে পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম এখানে যোগী তপস্বীরা কোথা বাস করেন। হীরানন্দ বাবু আগে আগে বিশ্রাম স্থান তল্লাশ করিয়া চলিলেন, সহসা তিনি "ইয়ুরিকা" "ইয়ুরিকা" বলিয়া উঠিলেন—দেখি তিনি পাহাড় বাহিয়া উঠিয়া একটি সচ্ছায় স্থানে দাঁড়াইয়া।

আমরাও মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিয়া সেখানে উঠিলাম—উঠিয়া দেখি সেটি একটি পাহাড়-দেহে ক্ষুদ্র অৰ্দ্ধ গহ্বর। অৰ্দ্ধ গহ্বর বলিলাম, কেন না সম্মুখটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত—দোতলা দালানের বারান্দার মত। পাহাড়ের দিকে পিঠ করিয়া বসো, অনন্ত অবিরতোর্ম্মিময় সিন্ধু তোমার পদতলে। দৃশ্যটি সত্য সত্যই যোগীজন মনোহারী—দেখিয়া আমরা সম্মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলাম। এখানে মাঝিরা আমাদের কাপড় চোপড়, খাদ্যদ্রব্যাদি সকল নিয়া আসিল। এই পাৰ্ব্বত্য স্বভাব-বারান্দার একটুকু উপরে আর একটি বারান্দা, সেখানে পাথর বসাইয়া চুলা সৃষ্টি করা হইল। আমরা সকলে সমুদ্র জলে স্নান করিলাম। পৰ্ব্বতের কিনারা অত্যন্ত খাড়া, সমুদ্র গভীর, নামিয়া স্নান করা বিপদসঙ্কুল, তাই আমরা পূৰ্ব্বোক্ত সিঁড়ির উপর বসিয়া জল তুলিয়া স্নান করিলাম। ক্লিফটন উপসাগরে (Clifton Bay) আমি ইতিপূৰ্ব্বে স্নান করিয়াছিলাম, সেখানে অবগাহন স্নান হইয়াছিল, সেখানে বহুদূর পৰ্য্যন্ত সমুদ্র অতি অগভীর; বালুকাময় ভূমিতে তরঙ্গাভিঘাতে সেখানে জল সৰ্ব্বদাই পঙ্কিল। এখানে সমুদ্র গভীর, জল নিৰ্ম্মল, স্নান করিয়া বড়ই সুখ হইল। সমুদ্রজলে মুখ ধুইলাম, তাহার সুখ বর্ণনাতীত। সমুদ্র জল যে কত লবণাক্ত যাহারা তাহা কখনো মুখে করে নাই বুঝিতে পারে না। চোখ বুজিয়া জল ঢালিতে হয়, তথাপি রক্ষা নাই, দু এক বিন্দু জল চোখে ঢুকিলেই চোকের জ্বালায় অস্থির হইতে হয়। হীরানন্দ বাবু আমাদের অন্নপূর্ণা—স্নানের স্থানেই পাঁও-রুটি, লালকলা, চীনেবাদাম আনিয়া রাখিয়াছিলেন; স্নান করিয়া উঠিয়াই নাস্তা করিলাম। মহেন্দ্র বাবু এদিকে বারান্দায় বসিয়া মহিমাময়ের মহিমা কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমরা যাইয়া সে উপাসনায় যোগদান করিলাম। মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী উপরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনায় যোগ দিতেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি শঙ্খ-ধ্বনি করিতেছিলেন। উপাসনা শেষ হইলে মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী খিচুড়ি চড়াইলেন—তাহাতে অজস্র ওলকপি আর আলু বর্ষণ হইল। চচ্চরি চড়িল, বেগুণ পুড়িল। মহেন্দ্র বাবু রান্নার যোগাড় দিতে লাগিলেন। রান্না হইলে নাচের বারান্দায় কদলীপত্র বিছাইয়া অন্নপ্রাশন করা গেল। খুব ঘি ঢালিয়া, দই মাখিয়া, কলা কামড়িয়া খিচুড়ি খাওয়া গেলো, রান্না ভাল হয়েছিল, অমৃতের মত লাগ'লো। ঘরে শত ব্যঞ্জন পলান্ন হইলেও পথে ঘাটে খিচুড়ি বা ডাল ভাত যেমন ভাল লাগে তেমন লাগে না।

আহারান্তে প্রকৃতি তত্ত্বানুসন্ধানে নীচে অবতরণ করিলাম। এখানেও বাবু হীরানন্দই আমাদের নেতা। জোয়ারের সময় জল অনেক উঁচুতে ওঠে। পাহাড়ের গায়ে অনেক গৰ্ত্ত আছে, জোয়ারের সময়ে তাহারা জলে পূর্ণ হইয়া থাকে। এরকম একটা গর্ত্তের ধারে আমরা বসিলাম—দেখি তাহাতে অসংখ্য কাঁকড়া। জল নিৰ্ম্মল, সূৰ্য্যা-লোকে তলদেশ পৰ্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। আমরা গৰ্ত্ত প্রাচীরে একটি অতি মনোহর সবুজ রঙ্গের ঝিনুক দেখিলাম। তাহাকে উঠাইবার জন্যে নীচু হইয়া চাহিয়া

দেখি ৬।৭টা আরো সেই রকম পরম সুন্দর ঝিনুক গর্ত্ত-প্রাচীরে ও তলদেশে রহিয়াছে। একটা জলপাত্র আনিয়া আমরা জলসেচন আরম্ভ করিলাম। যেমন জল ফেলিতে লাগিলাম অসংখ্য কাঁকড়া গর্ত্তের গা ও অন্তর্গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া দৌড়িয়া ঝাঁপিয়া সমুদ্রে পড়িতে লাগিল। এক রকম অতি ঘৃণাজনক কদাকার টিকৃটিকির মত মাছ লাফাইয়া সমুদ্রে যাইতে লাগিল। জলসেচন হইলে দেখিলাম যেখানে ২।৩টা খুব সুন্দর ঝিনুক সেখানে একটা সুরঙ্গ আছে। সুরঙ্গের কাছে হাত বাড়াইতে ভয় হইল—লাঠি সুরঙ্গে প্রবেশ করিলাম। আর বহু কাঁকড়া তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ববৎ সমুদ্রে পড়িতে লাগিল। কাঁকড়া ও বীভৎস মৎস্য কীট গুলি বাহির হইয়া গেলে আমরা ঝিনুক উঠাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। সে কি সামান্য চেষ্টা! গর্ত্ত-প্রাচীরের ভিতরে তাহারা এমনি শক্ত হইয়া শরীর প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছে, সাধ্য কি কেহ তাহাদের উঠায়। সঙ্গে কোন লৌহাস্ত্র ছিল না—লাঠি দিয়া আর হাত দিয়াই ৩টা ঝিনুক উঠান গেল—একটা ভাঙ্গিয়া গেল। ৩টা ঝিনুক আমাদের ভাষায় ৩ জোড়া ঝিনুক। দুটা ঝিনুকে একটা জীবন্ত ঝিনুক হয়। এগুলি জীবন্ত ঝিনুক। বাক্সের ছাত বা ঢাকন যেমন কব্জা দ্বারা পশ্চাদ্দেশে বদ্ধ থাকে, দুটা ঝিনুকও পশ্চাৎ বা পৃষ্ঠদেশে তেমনি বদ্ধ থাকে। আর সমস্ত জায়গাটা মুক্ত থাকে, অর্থাৎ যখন ঝিনুকের খেয়াল হয় তখন তিনি সে সমস্তটা স্থান খুলিতে পারেন, খুলিয়া ভিতর হইতে নাড়ীভুড়ি বাহির করিয়া চলাচল করিতে পারেন। কিন্তু এখানে বোধ হয় আমার প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural History) ভুল হইল কেননা ঝিনুককে আমরা প্রস্তরদেহে যে রকম গভীর ও শক্তনিবিষ্ট দেখিয়াছিলাম, তাহাতে মনে হয় যে তাহারা আরও শত সহস্র সামুদ্রিক জীবের ন্যায় অচল—যেখানে জন্ম সেখানেই মৃত্যু—শুধু মুক্ত স্থানটা ব্যাদান করিয়া তদাগ্র সমুপাগত খাদ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। এ বিষয়ে সংশয় নাই—যাহারা অয়েস্তর ও মুক্তা ঝিনুক উঠায় তাহারা সমুদ্র গর্ত্তস্থ পাহাড়ের দেহ হইতে তাহাদিগকে অস্ত্র দিয়া কাটিয়া উঠায়। আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি এই যে রামঝোরা ও তাহার সন্নিহিত দুটি শৈলদ্বীপ ইহাদিগকে ইংরেজরা অয়েস্টর রক্‌স্ (Oyster rocks) বলিয়া থাকেন। কারাচির বাজারে অয়েষ্টরের অন্ত নাই, তাহারা এই শৈলদ্বীপের জলতল-শৈলেতে ধৃত হয়। জলের উপরে অর্থাৎ যেখান হইতে জল নামিয়া গিয়াছে সেখানে আমরা বহু অয়েষ্টরের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম একটি জীবন্তও দেখিলাম, অন্যগুলি ধীবরেরা উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল শৈল-সংলগ্ন শেল-গুলি পড়িয়া রহিয়াছে।

কাঁকড়া, টিট্‌টিকি-মৎস্য ঝিনুক ও অয়েষ্টর তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া আমরা বিহঙ্গতত্ত্ব নির্ণয়ে চলিলাম। পাহাড়ের একটা উঁচু-জায়গায় পাখীর বাসা মনে হইল, আর পাখীরা অনিবার পরিত্যজ্য পরিত্যাগ করিয়া সেখানে যে পাহাড়-দেহের হোয়াইট-

ওয়াশ্ বা চূণকাম করিয়াছেন তাহাতে আমাদের নজর আকর্ষণ করিল। পাখীর বাসায় মনে করিয়াছিলাম পাখী, পার্ব্বত্য ছাগ আর বান্দরই উঠিতে পারে। হীরানন্দ বাবু আমার সে ভ্রান্তি শীঘ্রই দূর করিলেন, তিনি চার লাফে সেখানে দাঁড়াইলেন; নগেন্দ্র বাবুর বিশেষ পদবৃদ্ধি, তিনি তিন লাফেই সে স্থানে উপনীত হইলেন; আমি বেচারী মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিতে যাইয়া অর্দ্ধ পথেই থামিলাম। নগেন্দ্র বাবু আমায় টানিয়া উঠাইলেন। সেখানে পাখীর বাসা টাসা কিছুই নাই, একটি পোর্টরের ভগ্ন বোতল পড়িয়া আছে—কোন ব্রিটনীয় মহাত্মা সিন্ধুবক্ষে শৈলশিরে বসিয়া মদখাইয়া শরীর মন চরিতার্থ করিয়াছিলেন। আমাদিগের ঋষিরা যেখানে আসিলে বিশ্বেশ্বরের মহিমা-সাগরে ডুবিয়া নিরাহারে বা স্বল্পাহারে তাহার ধ্যান করেন, ব্রিটনীয় সেখানে মদ খাইয়া চরিতার্থ হন।

পক্ষিকুলায় হইতে অবতরণ করিয়া আমরা আবার সামুদ্রিক প্রাণি-জীবন দর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম। উল্লিখিত গর্ত্তের অপেক্ষা বড় একটা জলপূর্ণ গর্ত্তের ধারে বসিলাম—বসিয়া সত্য সত্যই অনেক অপূর্ব্বদৃষ্ট প্রাণী দেখিলাম। ইহাদিগকে জলোদ্ভিদ প্রাণী বলা যাইতে পারে। ইহারা গর্ত্তপ্রাচারের অঙ্গসংলগ্ন,—মৃত্তিকায় যেমন উদ্ভিদ জন্মায় ইহারা ঠিক সেইরূপ গর্ত্তপ্রাচীরে জন্মিয়াছে। ইহাদিগের অণুমাত্রও চলদ্‌শক্তি নাই। দেখিতেও ইহারা উদ্ভিদেরই মত। এক রকম জলোদ্ভিদ প্রাণী দেখিলাম, তাহারা অতিক্ষুদ্র শিরাষ পুষ্পের মত, ধরণটা ❋ এই রকম ও এত টুকু। দেখিয়া কোন জলায় পুষ্প বলিয়া মনে হয়। লাঠি বা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ কর অমনি ফুলটি বুজিয়া যাইবে—প্রাচীর দেহগত দেহে সে ফুল প্রবেশ করিবে, তুমি শুধু চক্রাকৃতি একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখিতে পাইবে। উদ্ভিদ হইতে ইহাদের বিশেষত্ব এই যে স্পর্শ করিলে উদ্ভিদ স্পর্শ জ্ঞান হয়না, মাংসল প্রাণি দেহ স্পর্শ জ্ঞান হয়। ইহারা নানা রঙ্গের হয়, সবুজ, নীল, লাল। আর এক এক জায়গায় একই রঙ্গের সহস্র সহস্র লাগালাগি হইয়া থাকে বলিয়া সে স্থানটাই রঙ্গিন বলিয়া মনে হয়; কোন প্রাণী আছে বলিয়া সে রঙ্গ হইয়াছে কল্পনায়ও আসে না; এক রকম বড় ঘৃণাজনক প্রাণী দেখিলাম—কুক্কুর বিড়ালাদির ময়লার মত দেখিতে—পাথরের গায়ে পড়িয়া আছে, জেলির মত আটা, জেলির মত চক্‌চকে, দেখিলে বমি আসে। এখানে ঝিনুক একটা অতি অদ্ভুত রকমের দেখিলাম। সেটা কাল সাদায় পাকড়াপাকড়ি। গর্ত্তের গায়ে এমনি কামড়িয়া পড়িয়াছিল যে তাহার বুকের নীচে দিয়া ছুরি চালাইয়া অতি কষ্টে তাহাকে উঠাইতে পারিলাম। উঠাইয়া তাহাকে ডেঙ্গায় রাখিলাম। দু মিনিট পরে উঠাইতে গিয়া দেখি সেই রকম শক্ত হইয়া পড়িয়া আছে—সেই রকম বুকের নীচে ছুরি দিয়া উঠাইতে হইল। এটা ডবল ঝিনুক নহে— একটা ঝিনুক মাটিতে ফেলিলে যে ভাবে থাকে এটা সে ভাবে পড়িয়া ছিল—আর ইহার বুকপেট এমনি আঁটাল কে সে সেখানে চাহে সেখানে দুরুচ্ছেদ্য লাগা লাগিয়া

থাকিতে পারে। আর এক রকম প্রাণী দেখিলাম তাহারা যেন আরও অদ্ভুত। আস্ত সুপারি শুকাইলে যেমন দেখায় সেই রকম দেখিতে। এই জাতীয় প্রাণী পাথরের উপরে সহস্র সহস্র খাড়া হইয়া আছে। ইহাদিগকে না মাড়াইয়া পদক্ষেপ করিতে পার এমন স্থান রামখোরার শীর্ষদেশ ভিন্ন কোথাও নাই। ইহারা খুব শক্ত কাঠের মত কঠিন—আমরা ইহাদিগকে প্রাণী কখনো মনে করি নাই, কল্পনাও করিতে পারিতাম না। গর্ত্তে যখন আমরা নানা প্রকার প্রাণী দেখিতেছিলাম তখন সহসা আমাদের জলের ভিতরেও এই রকমের পদার্থ নজরে পড়িল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম ইহারাও প্রাণী, কাষ্ঠদেহের উর্দ্ধভাগে যে গর্ত্ত আছে তাহাতে মাংসল প্রাণী নড়িতেছে। আমরা দেখিয়া অবাক হইলাম। উপরে আসিয়া যে সহস্র সহস্র এই জাতীয় পদার্থ আমরা মাড়াইয়া চলিয়াছিলাম, দেখি তাহাদের মধ্যেও বহুসংখ্যক এখনও জীবিত। এরকম প্রাণীর কথা কেতাবে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু কখনো চাক্ষুষ দেখি নাই। আজ দেখিয়া বিস্ময়ে ডুবিয়া গেলাম—বিশ্বপতির মহিমা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

এদিকে দিবা অবসান প্রায়। আমরা তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিলাম। বেশ হাওয়া দিতেছিল। পালবলে নৌকা উন্মুক্ত সমুদ্রের দিকে দ্রুত চলিতে লাগিল। আমরা তরঙ্গ ভঞ্জন পর্য্যন্ত যাইব। যেমনই অগ্রসর হইতে লাগিলাম তেমনি সিন্ধু শোভা ও মহিমা বাড়িতে লাগিল। সূর্য্য-কিরণে সিন্ধু হাসিতেছিল, সিন্ধু হৃদয়ে অসংখ্য সামুদ্রিক গাল্ (Seagull) পক্ষী—শোলার পক্ষীর ন্যায় ভাসিয়া অপূর্ব্ব শোভা করিতেছিল। সামুদ্রিক গাল আমাদের গাঙ্গচীল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু উভয়ে দেখিতে যে অনেকটা এক রকম তাহার সন্দেহ নাই। সাগর হৃদয়ে এই অসংখ্য ভাসমান গালের শোভা অতি মনোহারী, কখনো ভুলিতে পারিব না। উন্মুক্ত সাগরের যতই নিকটে আসিতে লাগিলাম ততই নৌকা তরঙ্গশিরে নাচিতে লাগিল। যে শোভা সে দিন দেখিলাম, যে সুখ সে দিন ভোগ করিলাম, আমরণ তাহা মনে থাকিবে। তরঙ্গ ভঞ্জনের পাশ হইয়া আমরা ম্যানোরার পাশ দিয়া চলিলাম। দিবা অবসান বলিয়া আমাদের সেদিন ম্যানোরায় উঠিয়া দেখা হইল না। পোতাশ্রয় পার হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা কিয়ামারিতে উপনীত হইলাম।

শ্রী শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্রোহ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুদুর্গম বনমধ্যে সুপ্রশস্ত মুক্ত ভূমি। এই মুক্তভূমির একদিকে নিবিড় অরণ্য পথ, অন্য তিন দিকে পাহাড়ের সোজা সোজা পাষাণ প্রাচীর। প্রাচীরের বাহির পৃষ্ঠ গাছে গাছে পূর্ণ কিন্তু ভিতর পিঠ এখন উলঙ্গ তৃণপত্র হীন যে দেখিলে মনে হয় কে যেন করাত দিয়া পাহাড় গাত্রকে এখনি এমন মসৃণ করিয়া কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই উলঙ্গ সোজা সোজা পাহাড়ের গায়ে গায়ে মৌমাছির বড় বড় লাল চাক, তাহার কাছে কাছে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর, গহ্বর—নিশাচর পক্ষীতে পূর্ণ।

একটি পাহাড় গাত্র হইতে একটি জল প্রপাত পড়িতেছে—পড়িয়া নীচে একটি জলাশয় হইয়াছে, জলাশয় হইতে একটি সঙ্কীর্ণ জলধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া বড় বড় প্রস্তর চাঙ্গড়ার মধ্য দিয়া অদূর অরণ্যের পাদপমূল ধৌত করিয়া কে জানে কোথায় বিলীন হইয়া পড়িতেছে।

আজ অন্ধকার রজনীতে এই নিস্তব্ধ নির্জ্জন সুদুর্গম জলাশয় তটে ধূধূ করিয়া আগুণ জলিতেছে, আগুণের চারি পাশে বিদ্রোহী ভীলেরা বসিয়া ধীরে ধীরে কথা বার্ত্তা কহিতেছে। তাহাদের বহু জনের সেই গুণ গুণ শব্দে অরণ্য যেন চমকিয়া উঠিতেছে, নির্ঝর প্রপাত আর শুনা যাইতেছে না—এই বিজন প্রদেশের নিস্তব্ধতা যেন সহসা কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া রাঙ্গা চক্ষু মেলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তাহাদের চুপি চুপি কথা আর রহে না—বিলম্ব যেন আর সহেনা। কি জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল—আর যেন সে অপেক্ষায় থাকিতে পারে না। তাহাদের অধীর উৎসাহ সেই আঁধার নিশীথের আগুণে তাহাদের মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে—তাহারা আর পারে না—সে উৎসাহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। রাজা দূরে, বিপদ দূরে,—আশঙ্কা দূরে—নিকটে কেবল তাহারা আপনারা এক সংকল্পী বদ্ধ পরিকর সশস্ত্র দল, আর তাহাদের আপনাদের উৎসাহ ও অভীষ্ট জয়। এ অবস্থায় তাহাদের চুপি চুপি কথা আর কতক্ষণ চুপি থাকে? তাহাদের অধীরতা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল, তাহাদের মৃদুস্বর ক্রমশই স্ফীত হইয়া বন্যার মত অল্পে অল্পে বনপ্রদেশ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, দলপতি ব্যস্ত হইয়া বারম্বার 'শান্ত হও শান্ত হও' করিয়া তাহাদিগকে থামাইতে লাগিলেন, এবং সতৃষ্ণ উৎসুক নেত্রে অরণ্য পথের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

সহসা অরণ্যের এই অস্পষ্ট কোলাহল স্তম্ভিত করিয়া দিয়া অদূর অরণ্য হইতে একবার তীক্ষ্ণকণ্ঠ 'কু' ধ্বনি উত্থিত হইল—মুহূর্ত্তে বিদ্রোহীগণ থামিয়া পড়িল—এই

'কু'ধ্বনি বন প্রান্তে মিলাইয়া পড়িতে না পড়িতে চারিদিক সুগভীর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল,—রুদ্ধশ্বাস নির্ঝর কেবল এই স্তব্ধতায় প্রাণ পাইয়া সজোরে নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে আবার জলপ্রপাতের গভীর গম্ভীর শব্দ স্তব্ধ অরণ্যের প্রাণে তান তুলিল। দলপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একজন যুবক বাম হস্তে মশাল—দক্ষিণ হস্তে যষ্টি লইয়া অরণ্যপথে জলাশয়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল—তাহাকে একাকী দেখিয়া বিদ্রোহীদিগের উৎসাহ ভাব সহসা তাহাদের প্রক্ষিপ্ত ছায়ার মত মলিন হইয়া গেল। দলপতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"কই জুমিয়া কই?" উত্তর হইল "তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।" জম্বুর হৃৎকম্পন শব্দ সেই বিজনতার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বলিলেন—"খুজিয়া পাইলেনা? গেল কোথা?

"কেহ জানে না।"

"বৌ?"

"বৌ নাই। মেয়ে নাই। বোধ করি তাহাদের শুদ্ধ লইয়া গিয়াছে।"

শুষ্ক পত্রের আগুণ ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু একটা বাতাস উঠিলেই সহসা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যেমন নিভিয়া যায় তেমনি উক্ত সংবাদে ভীলদিগের প্রদীপ্ত মুখ সহসা অন্ধকার হইয়া গেল। কিন্তু যে বাতাসে শুষ্ক পত্র অগ্নিহীন হয় সেই বাতাসে কাঠের আগুণ আরো জ্বলে বই নেভে না। লঘুদ্রব্য যেমন সহজে ধরে তেমনি সহজে নিভে—ভারা জিনিসে একবার আগুণ ধরিলে আর রক্ষা নাই। জম্বু যখন শুনিলেন জুমিয়া চলিয়া গিয়াছে -সেই জুমিয়া—যাহার উপর তিনি সমস্ত আশা ভরষা স্থাপন করিয়াছেন, যাহাকে হৃদয়ের শোণিত দিয়া এতদিন পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, সেই জুমিয়া আজ তাঁহার সমস্ত আশা ভাঙ্গিয়া সুখশান্তি হরণ করিয়া কৃতঘ্ন পাষণ্ডের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে, তখন মুহূর্ত্তকাল তিনি বজ্রাহতের ন্যায় নিস্তব্ধ জ্ঞানহীন হইয়া পড়িলেন,—কিন্তু মুহূর্ত্তে তাঁহার সে ভাব চলিয়া গেল, তাঁহার সে নিস্তেজতা মুহূর্ত্তে জ্বলন্ত উত্তেজনায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সত্য বটে তিনি জুমিয়াকে ভাল বাসেন,—কিন্তু তাঁহার ব্রতকে তিনি তাহা অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন। এই ব্রত তাহার জীবন, জুমিয়া এই জীবনের সুখ মাত্র, ইহা তাঁহার প্রেম, জুমিয়া এই প্রেমের আধার মাত্র, ইহা তাঁহার আশা, জুমিয়া এই আশার ভরষামাত্র—ইহা তাঁহার তৃষ্ণা—জুমিয়া এই তৃষ্ণার জল মাত্র; সুতরাং সুখ শান্তি পানীয় হারাইয়া মুহূর্ত্তকাল জম্বু অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, কিন্তু যন্ত্রণা-কাতর পিপাসিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার উত্তেজনা আরো বাড়িয়া উঠিল। সেই যন্ত্রণা সেই পিপাসা অন্য উপায়ে নিবৃত্তি করিবার স্পৃহা আরো বাড়িয়া উঠিল। বাধা পাইলে দুর্ব্বল যে সে নুইয়া পড়ে—কিন্তু সবল আরো ভীষণ হইয়া উঠে। জম্বু অসভ্য—কিন্তু সবল হৃদয়, উচ্চ উদ্দেশ্যধারী। একটি উচ্চভাব হৃদয়ে ধরিয়া তাহার চরণে সমস্ত

জীবন—সুখ শান্তি তিনি উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, ক্ষুদ্র বাধায় তাহাকে দমাইতে পারে কি?

জঙ্গু উত্তেজিত অথচ সুস্পষ্ট গম্ভীর স্বরে বলিলেন" জুমিয়া ভীরু! জুমিয়া কাপুরুষ! সে গিয়াছে যাক্, তাহাকে আমাদের আবশ্যক নাই—তোমরা কে তাহার স্থানে দলপতি হইবে বল?"

নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁহার কথা ধ্বনিত হইয়া নিস্তব্ধতায় মিশাইয়া গেল, বিদ্রোহীরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু কেহ একটি কথা কহিল না, কেহ একপদ অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল না। জঙ্গু আবার বলিলেন "একজন ভীরুর মুখ চাহিয়া তোরা কি তবে এই কাজে আসিয়াছিলি—যে তাহাকে না পাইয়া সব হাল ছাড়িয়া দিবি?"

কুমু বলিল—"আমরা একজন রাজা চাই, কার সঙ্গে আমরা কাজ করিব?"

চারিদিকে অমনি একটা অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি উত্থিত উঠিল "আমরা রাজা চাই—আমরা রাজা চাই।"

জঙ্গু বলিলেন "কে তোমাদের মধ্যে রাজা হইবে—এস—এই ধনুর্ব্বাণ লইয়া শপথ কর—" জঙ্গুর কথা শেষ না হইতে আর একবার কোলাহল উঠিল "আমরা রাজা চাই—রাজা চাই" কিন্তু কেহ রাজা হইতে অগ্রসর হইল না। জঙ্গু তখন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যে গিয়াছে সে আমার পুত্র নহে, আয় বেটা তুইই রাজা হইবি।"

চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল, জঙ্গু কটী হইতে একটি বাণ খুলিয়া হাতে ধরিয়া সেই গম্ভীর নিশীথের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"এই বাণে মন্দালিককে গুহা হত্যা করিয়াছে এই বাণ হাতে লইয়া শপথ কর গুহার বংশ নির্ম্মূল করিয়া দেশ উদ্ধার করিবি—"

পিতার প্রতিধ্বনির মত কম্পিত কণ্ঠে পুত্র ধীরে ধীরে সেই শপথ আওড়াইয়া গেল। আর কেহ একটি কথা কহিল না—একবার জয়ধ্বনি উঠিল না, চারিদিকের নিরুৎসাহের মধ্যে পুত্রের শপথ বাণী ধ্বনিত হইয়া আস্তে আস্তে মিলাইয়া পড়িল। নিভনিভ আগুণের আলোকে পাষাণ প্রাচীরের দীর্ঘ ছায়া জলাশয়ে ফুটিয়াছিল, স্তব্ধ বিদ্রোহীদের চোখের উপর কেবল তাহা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, আর তাহাদের মাথার উপর এক একটা চামচিকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

* * * *

সকলে চলিয়া গেছে, ভোর হয় হয়—কিন্তু এখনো অরণ্য অন্ধকার, জটিল বৃক্ষভেদ করিয়া এখানে এখনো উষার আলোক প্রবেশ করিতে পারে নাই, পাখীরা অন্ধকারেই গান গাহিয়া উঠিয়াছে, বনফুলের সুগন্ধ অন্ধকারের মধ্যেই চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। একাকী জঙ্গু এই সময় অরণ্যতলে একটি শালবৃক্ষকে প্রণাম করিতে করিতে

বলিলেন—"শাল গাছ, এ কি তোর কারখানা! আমাদের কি শান্তি নাই? তোকে সোনায় মড়াইব, তোর তলায় হাজার ছাগ বলি দিব, আমাদের কষ্ট তুই দূর করিবি নাকি? তাহারা বড় লোক? তাহাদের মঙ্গলের জন্যই বুঝি তুই সব করিতেছিস? ক্ষুদ্র লোকের কথা বুঝি তোর কাণে পৌঁছে না? ক্ষুদ্র লোকের উপহার কি তোর উপাদেয় নহে? শাল গাছ! আমরা বড় হইব, যেমন বড় ছিলাম তেমনি হইব, যে বড় সে ছোট হইবে, ক্ষুদ্র লোকের না—বড় লোকেরই তুই উপহার পাইবি, শাল গাছ আমাদের শান্তি দে" জঙ্গ আশায় নিরাশায় বিশ্বাসে সংশয়ে আকুলমনা হইয়া শালগাছের নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীর যখন যে দেশে কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধি হয়, প্রায় একজনের দ্বারাই হইয়া থাকে, দেশের অন্তর নিহিত সমগ্র রুদ্ধ শক্তি দিয়া সময় যে ক্ষুদ্র একজনকে গঠিত করিয়া তোলে, তাহার শক্তি তরঙ্গিত হইয়া দেশের শত সহস্রকে সঞ্চালিত, অনুপ্রাণিত করে।

ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই সপরিবারে যে রাষ্ট্র বিপ্লবে প্রাণ হারাইলেন নেপোলিয়নের কটাক্ষপাতে সেই বিপ্লব স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এই শক্তি হৃদয়ে ধরিয়াই ম্যাটসিনি সমগ্র ইটালি উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন, ওয়ালেস স্কটলণ্ডকে স্বদেশানুরাগে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন। প্রতাপ সিংহ ভারতেশ্বর আকবরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আর ইহার অভাবেই, সিরাজউদ্দৌলার সহস্র সৈন্য, বাঙ্গলার কোটী কোটী লোক বিনাযুদ্ধে ক্লাইবের নিকট নতশির হইয়াছিল, আর কে বলিতে পারে এইরূপ বিনা যুদ্ধে কেবল একজন সামান্য লোকের অঙ্গুলির তাড়নে একদিন ইংরাজের এই সসাগরা ভারত রাজত্ব ছারখার হইয়া যাইবে কি না? তাই বলিতেছি বিদ্রোহী ভীলেরা যে "রাজা চাই" বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল তাহা অকারণে নহে। জংলা তাহাদের রাজা হইল বটে—কিন্তু রাজার গুণ তাহাতে কিছুই ছিল না—যে দীপ্ত উৎসাহ দেখিয়া তাহারা উৎসাহ পাইবে এমন উৎসাহ তাহার কই। যে দৃঢ় সংকল্প যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকালেও সৈনিকদিগকে অটল রাখিতে পারে—এমন সংকল্প তাহার কই? যে বীরত্ব, সাহস দেখিয়া সৈনিকেরা জীবন মরণে তাহার ভক্ত হইয়া দাঁড়াইবে—এমন সাহস তাহার কই? জুমিয়া তাহাদের মনের মত অধিনায়ক ছিল, জুমিয়ার কটাক্ষ চালনে তাহারা উত্তেজিত হইতে পারিত, তাহার অটল সাহস দেখিয়া নির্ভয়ে তাহারা মৃত্যুর অনুসরণ করিতে পারিত, সে অধিনায়ক নাই সে জুমিয়া নাই, বিদ্রোহীদিগের উৎসাহ আর কে ধরিয়া রাখে? জঙ্গুর উৎসাহ বাক্যে তাহার দেশানুরাগ-বাক্যে মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা

একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠে—তিনিএক পা সরিয়া গেলে আবার নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। তাহারা কেবল কথা চায় না, তাহারা একজন সাথের সাথী, কর্ম্মের কর্ম্মী অধিনায়ক চায়, জঙ্গু তাহা পারেন না, শপথে তাঁহার হাত পা বদ্ধ।

দিন যাইতেছে, মাস যাইতেছে, জঙ্গু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কত পরামর্শ হইতেছে, কত সংকল্প হইতেছে, কিন্তু কাজের সময় সকলই ভণ্ডুল হইয়া পড়িতেছে। পরামর্শের সময় যাহারা অধিক আস্ফালন করে, মুহুর্মুহু নাগাদিত্যের মস্তক চিবাইতে থাকে, উৎসাহের উন্মত্ততায় সম্মুখের গমনশীল নিরীহ শৃগাল কুকুরকে বাণাহত না করিয়া ছাড়ে না, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে সরিয়া পড়ে। সেই সময় তাহাদের আত্মাভিমান মস্ত হইয়া উঠে, জঙ্গু কোন দিন নাংলুর সহিত আগে কথা না কহিয়া কাংলুর সহিত কহিয়াছেন, ভদিয়ার মত যোগ্য লোক থাকিতে খুদিয়াকে হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়াছেন, এই রকম শত সহস্র কথা তাহাদের মনে পড়িয়া যায় জঙ্গু যে নিতান্ত মতলব করিয়া যোগ্যদিগকে ছাঁটিয়া অযোগ্যদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন সে বিষয়ে তাহাদের আর সন্দেহ থাকে না, একটা রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষির বিপ্লবের মধ্যে সমস্ত একতা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, কাজের সময় সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়ে।

একদিন সব স্থির, দোলোৎসব নিশিতে উৎসবোন্মত্ত সৈনিকেরা সিদ্ধিপানে বিহ্বল হইয়া থাকিবে, ভীলেরা ধীরে ধীরে দুর্গে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ অস্ত্রাগার আক্রমণ করিবে। সন্ধ্যার সময় শালবৃক্ষ তলে সকলে একত্র হইয়া সেখান হইতে সকলে শুভ যাত্রা করিবে। জঙ্গু, তাহার পুত্র ও কতিপয় বন্ধুর সহিত সন্ধ্যা হইতে অন্য সকলের অপেক্ষায় শালবৃক্ষ তলে আসিয়া বসিয়াছেন। রাত্রি হইল তবু তাহাদের দেখা নাই। জঙ্গু বুঝিলেন একটা কি গোল হইয়াছে। নিরাশ হৃদয়ে তাহাদের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। পূর্ণিমা রাত্রি, জ্যোৎস্নায় দুর দূরান্তর একখানি স্বপ্ন দৃশ্যের মত নেত্রপথে পড়িতেছে, দূরের অস্পষ্ট উৎসবকোলাহল জঙ্গুর নিরানন্দ হৃদয়ে একটা ভীতি জাগরিত করিতেছে, তিনি দ্রুত গতিতে চলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, হঠাৎ যেন নিকটের কোথা হইতে পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি একটু দাঁড়াইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন, কিছুদূর গিয়াই অদূরের একটি বৃক্ষতলে জনতা দেখিতে পাইলেন, সেইখানে দাঁড়াইলেন, তাহারা যেমন কথা কহিতেছিল কহিতে লাগিল, দুই তিন জন তাহার মধ্যে প্রধান বক্তা, আর সকলেই শ্রোতা, একজন কহিল—"তোরা যাইতে চাস ত যা, মুই ত না"—

দ্বিতীয় জন কহিল "মরবার সময় মরিবু মোরা, আর রাজা হইবার বেলায় তানার ছেলেডা!"

ক্রুদ্ধ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন কহিল—"মরিবুই বা কেন মোরা? এ রাজার রাজ্যে মোদের কষ্ট কি!"

আর একজন বলিল—"তার তরে মরিবু কেন মুরা? কাহার লাগিন মরিব, জুমিয়া থাকিত ত সে জুদ কথা"—

প্রথম বক্তা বলিল—"কিন্তু জংলা রাজা হইল কোন গুণটায়? মোরা কি সেইডার চেয়ে কিছু কম!"

দ্বিতীয় বক্তা বলিল—"মুইরা এক্তটাই কি ফেলা ছ্যাড়া। সেদিন কাল্লু মোদের দিকে পিছন করি বসিল, কেন তানাটা কি কথা কইতে নারিল?"

সকলে গস গস করিয়া উঠিল—বলিল "মুরা কেউ যাইব না" এই সময় জঙ্গু তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সকলে বলিল—"জঙ্গুডা, মরিব মুইরা—রাজা হইবে তোর ছেলেডা! তোরা রাজা হইবার লাগিন মোদের মরিতে লইয়া যাইতেছিস"?

জঙ্গু ব্যথিত হইলেন, দেখিলেন তিনি যাহাদের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতেছেন, আপনার অমঙ্গলই ব্রত করিয়াছেন তাহারাই তাহাকে দোষী করিতেছে, জঙ্গু আর্দ্র স্বরে বলিলেন "বৎসগণ শোন, আমার রাজ্যের জন্য নহে তোমাদের প্রাণ রক্ষার জন্যই তোমাদের মরিতে আমি ডাকিতেছি। প্রাণ না দিলে প্রাণ পাওয়া যায় না, যদি প্রাণ দেও ত তোমাদের স্ত্রী পুত্রের জন্যই দিবে, কি ছিল—চাহিয়া দেখ কি হইয়াছে, যদি প্রাণ যায়, নিজের অধিকারের জন্যই যাইবে, নিজের রাজ্যের জন্যই যাইবে, আমার জন্য নহে। তোমরা যে উপযুক্ত সেই রাজ্য গ্রহণ করিবে, আমি কে যে রাজ্য দিব আর নিব"?

দশকণ্ঠ একস্বরে বলিয়া উঠিল—"তবে তোমার ছেলেকে কেন রাজা করিয়াছ? নাংলু তার চেয়ে কম কি?"

সে দিন তাহারা নিজেই যে কেহ রাজা হইতে অগ্রসর হয় নাই, সে কথা আর জঙ্গু উত্থাপন করিলেন না—বলিলেন—

"এ রাজা আসল রাজা নয়। এখন যাহারা সমুখে দাঁড়াইবে—যদি বিদ্রোহ প্রকাশ হয় ত বিপদ তাহাদের উপরেই আসিবে। তোমাদের নিরাপদ করিতেই আমরা সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু হউক তাহাই হউক, নাংলুই নেতা হউক, আমার পুত্র তাহার সামান্য আজ্ঞাকারী মাত্র হইবে"

সকলের মুখ যেন মেঘ মুক্ত হইল, সকলের আহ্লাদের মধ্যে নাংলুই নেতা হইল। কিন্তু ইহাতেও কাজ বড় একটা অগ্রসর হইল না। দুর্গ আক্রমণের সঙ্কল্প সঙ্কল্প-অবস্থাতেই ক্রমে মরিয়া গেল, সকলের মতে বিশেষতঃ নাংলুর মতে তাহা বড়ই কঠিন ব্যাপার, কাজেই তাহারা এ সঙ্কল্প ছাড়িয়া অন্য নানারূপ সহজ উপায় স্থির করিতে লাগিল। একদিন স্থির হইল রাজা যখন স্নানে আগমন করিবেন তখন বিদ্রোহীরা তাহাকে আক্রমণ করিবে। পরামর্শের সময় নাংলু মহা উৎসাহ প্রকাশ করিল, কিন্তু আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় একেবারে বাঁকিয়া বসিল। বলিল সে নেতা

হইয়াছে বলিয়া সকাল বেলা সূর্য্যের আলোকে রাজাকে বধ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইতে আসে নাই। এ সমস্তই জঙ্গুর শঠতা, তাহাকে রাজা করিয়া জব্দ করিবার জন্য জঙ্গু এরূপ ফন্দী করিতেছে। সমস্তই ভাঙ্গিয়া গেল, প্রভাতে রাজা স্নান করিয়া গৃহে গেলেন, জনপ্রাণী তাঁহার পথে উঁকি মারিল না।

এইরূপে ক্রমাগত উপায়ের উপর উপায় স্থির হইতে লাগিল, পরামর্শের উপর পরামর্শ চলিতে লাগিল আর সঙ্গে সঙ্গে বৎসরের পর বৎসরও কাটিতে লাগিল, কাজে কিছুই হইয়া উঠিল না। জঙ্গু দিন দিন হতাশ অবসন্ন হইতে লাগিলেন, জংলার অক্ষমতা প্রতিপদে বুঝিতে লাগিলেন, দেখিলেন লোকের মত লোক নাই। বিপদের মুখো মুখী হইতে পারে এমন একজন নাই, এমন কেহ নাই যে সূর্য্যের মত আপনার তেজে সকলকে তেজস্বী করিতে পারে। অধীনতায় সকলে অবসন্ন নিস্তেজ, কার্য্যক্ষেত্রে আগুয়ান হইতে তাহারা অপারক, কেবল অপারক নহে অধিক ভাগ অপদার্থ, তাহারা ভাল করিতে পারে না মন্দ করে, কিন্তু এখন তাহাদের দল হইতে তাড়াইলেও মঙ্গল নাই, তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে যদি বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়া দেয়—ত অঙ্কুরেই সমস্ত নির্ব্বাপিত হইবে। প্রতিদিন হতাশ হইয়া জঙ্গু জুমিয়ার অভাব প্রাণপণে অনুভব করিতে লাগিলেন।

তবুও জঙ্গু আশা ত্যাগ করিলেন না, প্রতিপদে ব্যর্থ হইয়া প্রতি তরঙ্গে আহত হইয়া তবু হাল ধরিয়া রহিলেন। একে একে বিদ্রোহীগণ সরিয়া পড়িতে লাগিল, দল ভাঙ্গিয়া গেল, পরামর্শের জন্যও আর কেহ আসে না, নিমন্ত্রণ করিলেও জঙ্গুর গৃহ কেহ মাড়ায় না, তখনো জঙ্গু নিরাশার আশা ধরিয়া উত্তেজিত হৃদয়ে সবলে হাল ধরিয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জঙ্গু কহিলেন, "কাল নাগাদিত্য শীকারে যাইবেন, ইহা ঠিক, আমি জানিয়া আসিলাম।"

জংলা বলিল—"কিন্তু আর কেহই যে আসিতে চাহে না"—

জঙ্গুর গম্ভীর ললাটে ক্রোধের রেখা পড়িল বলিলেন, "জুমিয়া হইলে এরূপ উত্তর করিত না। তুমি কি কেহই নহে?"

জংলা থতমত খাইয়া বলিল—"কিন্তু একা আমি—"

"একা তুমি? একজনকে মারিতে কয়জনের আবশ্যক? এতদিন বাণ ধরিতে শিখিয়াছ কি জন্য? জুমিয়া থাকিলে এ পাঁচ বৎসর কি এরূপ বৃথায় যায়?"

জংলার চোখে জল আসিল—জঙ্গু বলিলেন—"যদি সাহস না থাকে স্পষ্ট করিয়া বল, আর যদি সাহস থাকে যদি যাইতে চাও—ত একাকীই যাও। অধিক লোকে কাজ হয় না—কেবল গণ্ডগোল হয়, আমাদের শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছে—আবার কেন লোকজন!"

জংলা বলিল "তাহাই হইবে। কাল আমি একাকীই যাইব।"

পিতাপুত্রে সে রাত্রে প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কার্য্যসিদ্ধির পরামর্শ চলিল। অবশেষে গভীর রাত্রে জঙ্গু আশায়, নিরাশায় উদ্বিগ্ন হইয়া পুত্রকে বিদায় করিলেন।

জংলা বিদায় হইল, পিতার দিকে চাহিয়া বিদায় হইল—আর কাহারো সহিত দেখা করিয়া গেল না, গৃহের দিকে পর্য্যন্ত ভাল করিয়া একবার চাহিয়া দেখিল না, তাহাতেও যেন তাহার সাহস নাই। যখন পিতার নিকট হইতে দূরে আসিয়া পড়িল—তখন একবার ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু তাহার অন্ধকার-হৃদয়ের অন্ধকার ছাড়া তখন আর কিছুই দেখিতে পাইল না, জংলার রুদ্ধ হৃদয় উথলিয়া উঠিল,—জংলা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল, চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল—"আমি জংলা—আমি কি করিয়া জুমিয়া হইব? জংলা মরিতে যাইতেছে—জংলা মরিবে,—জংলা তবু জুমিয়া হইতে পারিবে না। জুমিয়া তোর ক্ষমতা জংলার নাই, তোর যোগ্যতা জংলার নাই—তোর কিছুই জংলার নাই—তবে জংলা যে সে জুমিয়া হইবে কিরূপে? যদি জংলা জুমিয়াই হইবে—তবে সে জংলা হইল কেন? বাবাডা, তুই জংলাকে মরিতে পাঠাইতেছিস—সে মরিবে, তবু সে জুমিয়া হইতে পারিবে না।"

জংলা তাহার দুঃখ ভার লইয়া দ্রুত চলিতে লাগিল, আকাশের তারা আকাশে মিলাইয়া পড়িল, পূর্ব্ব গগণ ঈষৎ আলোকিত হইয়া ক্রমে নানা বর্ণে চিত্রিত হইতে লাগিল, পথিক দু-একজন জংলার পাশ দিয়া চলিয়া গেল, জংলা চারিদিক একবার চকিত দৃষ্টিতে দেখিয়া বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বনে প্রবেশ করিয়া একটি উচ্চ বৃক্ষে উঠিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই একদল শিকারী তাঁহার নেত্র পথে পড়িল, জংলা ত্রস্তে গাছ হইতে নামিয়া গাছের ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইল। শিকারীদল নিকটবর্ত্তী হইল, জংলা ঝোপের মধ্য হইতে রাজাকে দেখিতে পাইল, শরীরের সমস্ত শোণিত তাহার চনচন করিয়া উঠিল। ইহার জন্যই তাহাদের এত অস্বস্তি এত কষ্ট! কতদিন হইতে ইহার জন্যই তাহারা অপেক্ষা করিতেছে? জঙ্গুর প্রত্যেক উত্তেজনাবাক্য তাহার মনে পড়িতে লাগিল, একটা অস্বাভাবিক সাহসে হঠাৎ তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। শিকারীদল ঝোপের পাশ দিয়া কিছু দূরে যাইতে না যাইতে রাজার মস্তক লক্ষ্য করিয়া সে বাণ নিক্ষেপ করিল।

শিকারীদের মধ্যে সহসা একটা মহা কোলাহল উথিত হইল, চারিদিকে ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, জংলা এদিকে বাণনিক্ষেপ করিয়াই গাছের ভিতর দিয়া দিয়া অলক্ষ্যে ছুটিয়া পলায়ন করিল। বনের মধ্যে একস্থানে দুজন কাঠুরিয়া-ভীল কাঠ সংগ্রহ করিতেছিল, ছুটিতে ছুটিতে একবার তাহাদের চোখের উপর আসিয়া পড়িল। হঠাৎ একজনকে ছুটিতে দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইয়াছে কি ব্যাপার?" এই

সময় দৈবক্রমে একটা হরিণ সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল, জংলা ছুটিতে ছুটিতে সেইদিকে আঙ্গুল দিয়া উত্তর করিল—"শীকার শীকার"।

তাহারা বুঝিল সে ঐ শীকার ধরিতে ছুটিয়াছে। তাহাদেরও কৌতূহল হইল। হরিণ যে দিকে ছুটিয়াছিল তাহারাও কাঠ ফেলিয়া সেই দিকে ছুটিল। জংলা গতিক মন্দ দেখিয়া পথ বদলাইয়া একটা নিবিড় জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। কাঠুরিয়া দুইজন শীকারান্বেষণে এদিক ওদিক খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল, তাহার পর রার্জ-সৈনিক কর্ত্তৃক সহসা বন্দী হইল।

হেঁয়ালি নাট্য।

গৃহকর্ত্তা গোপাল বাবু, পুরাতনানুরাগী-নব্য-গ্র্যাজুয়েট হরিদাস এম, এ, জ্ঞানদাস বি, এ, বৃদ্ধ ভটচায মশায়, তদ্বন্ধু ভজহরি প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসীন।

ভটচায। "যাই বল - যাই কও—সেকালের মত গাইয়ে আজকাল নেই।"

গোপাল। না মশায়,—এ মস্ত গাইয়ে—একবার তার গান শুনে তবে ওকথা বলবেন।

ভজহরি। বলি কার পালাটা হবে?

গোপাল। কারো পালা টালা নয় মশায়—এ হোল ওস্তাদ মানুষ—কালোয়াতি খেয়াল ধ্রুপদ—

হরি। খেয়াল ধ্রুপদ? তার চেয়েত টপ্পাই ভাল।

জ্ঞান। টপ্পাটাই হোল কি না More modern invention.

হরি। Modern invention বলেই কি ভাল বলতে হবে নাকি? বল দেখি বাবু আমাদের আগে যা ছিল তার চেয়ে এখন ভাল কি হয়েছে?

জ্ঞান। তা নাই হোল—তবে তুমি যে বল্লে টপ্পা ভাল?

হরি। আমি ভাল বল্লুম—because ভাল, because আমার ভাল লাগে, আর—because খেয়াল ধ্রুপদ are nothing but barbarian-like meaning-less gurgling of sound-notes only.

গোপাল। আরে তোমরা যে ঝগড়া করতে বসলে!

হরি। মশায়, ঝগড়া কি, এ ত ঠিক কথা—বলুন দেখি আগে যা ছিল তার চেয়ে এখন ভাল কি হয়েছে?

জ্ঞান। তা ত অস্বীকার করছিনে।

হরি। তা করছ না? বস্—তবে সব চুকে গেল—Then let us be friends again—shake hands and say—আমাদের আগে যা ছিল তার চেয়ে ভাল কিছু হয়নি।

ভটচায। বেঁচে থাক বাবা, তোমার মত বুঝদার ছেলে আমি একটি আর দেখিনি! বড় ঠিক কথা—সেদিনের মত আর কি এখন কিছু আছে? সেই যে রাম যাত্রা—রামলক্ষণ ছোট দুইটি ভাই—বুকে চন্দনের চিত্র বিচিত্র, নাকে নোলক, মাথায় চূড়া—হাতে ধনুর্ব্বাণ—নৃত্য করিতে করিতে হুহুঙ্কারকারী—সোনার মুণ্ডধারী রাক্ষস পতি দশাননকে—

ভজ। আহাহা—আর সেই কৃষ্ণ যাত্রা—ধড়া চূড়াধারী বালককৃষ্ণ—রাঙ্গা লাঠির বাঁশি হাতে, অলকা তিলকায় সেজে, রাধার প্রেমে গদ গদ হয়ে, সরু গলায়, সরুসুরে, অধিকারী বিন্দে দূতীকে যখন বিনয় করে বলছেন—

রাধা রাধা বলে—

মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনাজলে—তখন—"

হরিদাস। উঃ কি চমৎকার গান!

রাধা রাধা বলে—

মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনাজলে।

এমন সহজ ভাবের, সহজ ভাষায় গান এখন আর কোন কবির মুখ হতে বার হয় না। ইংরাজি অনুকরণে পড়ে—কবিতা আর আমাদের নেই!

আহা—রাধা রাধা বলে

মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনা জলে—"

জ্ঞান। এখন হলে একজন বলতেন

মান করে থাকা আজকি সাজে

বনে এমন ফুল ফুটেছে

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে চল চল কুঞ্জমাঝে।

সেক্স্পিয়র বলেছেন—Othello thy ocupation is gone—আমরাও বলতে পারি, কবিতা Thy time is gone—অর্থাৎ কবিতা তোমার কাল আর নেই।

ভট। পয়ারের কথা বলছ বুঝি? তা যদি বল্লে ত শোন। বর্দ্ধমানের রাজা দারিকানাথ ঠাকুরের বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি এঁকে জাতে উঠাবার অভিপ্রায়ে—মহা অনুনয় বিনয় করে নদের রাজাকে একখানা পত্র দেন—তার উত্তরে নদের রাজা আর কিছু না বলে এই দুই ছত্র পয়ার লিখে পাঠান—

আমি—নহি তব অবাধ্য

এ—বহুজনরব বহুজনসাধ্য

অস্যার্থ—আমি তোমার অবাধ্য নই, আমার ইচ্ছা আমি তাঁকে জাতে উঠাই,—কিন্তু যাহা বহুজনে জানে তা একা আমার সাধ্য নয়।

দেখেছ ত বাবা! ছুই ছত্রের মধ্যে কি কারখানা!

ভজহরি। আজকাল এমন পয়ার আর হতে হয় না!

গোপাল। মশায়গণ, আজ দেখছি আপনাদের কষ্ট ভোগ করার জন্যই নিমন্ত্রণ করেছি, গায়ক মশায় আপনাদের মনের মত উচ্চাঙ্গের কবিতার গান গাইতে পারবেন কি না আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে।

হরি। রাধা রাধা বলে—পরাণ ত্যজিব আমি যমুনার জলে—কি সুন্দর! আর কিছু নয়—একটা এরূপ গান শোনার জন্য কি করা না যেতে পারে?

গায়কের প্রবেশ।

গোপাল। এই যে গায়ক মশায়—মশায়! আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছি—আপনাকে আজ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড করতে হচ্ছে।

গায়ক। কেন মশায়, দলে এসে পড়েছি নাকি?

ভটচায। (হাসিয়া)—তা বলতে পারেন—বলতে পারেন—মশায় একটি রামযাত্রা—

ভজহরি। একটি কৃষ্ণ যাত্রা—

জ্ঞান। মশায়, আমরা আপনাকে একটি উচ্চাঙ্গের টপ্পা গাইতে বলছি,—

হরি। রাধা রাধা বলে—জীবন ত্যজিব আমি যমুনাজলে—মশায় জানেন কি?

গায়ক। (অবাক হইয়া) গোপাল বাবু আপনি ত জানেন ধ্রুপদ খেয়াল নিয়েই আমার কারবার?

গোপাল। কি করবেন মশায়—এঁরা ওস্তাদি গান শুনতে চান না, এঁদের মনের মত গানই আগে হোক।

গায়ক। (স্বগত) কি বিপদ—এ দেখছি ভেড়ার দলে এসে পড়া গেছে—তবে ভেড়াই সাজা যাক। একটা হাসির গান শেখা গেছলো সেইটে গাই—

গান।

ছক্রগাড়ী, চক্র নাড়ি—বক্র পাড়ি মারিছে
বঙ্ককাম্ ফুংকি বেণু—যন্ত্র তন্ত্র সারিছে—

হরিদাস। (চোখ্ বুজিয়া) ওহো ওহো—

ভটচায। (মৃদুস্বরে) হরিদাস বাবু গানটা কি হোল, ভাল বুঝতে পারছিনে।

হরিদাস। বুঝতে পারছেন না! গানের অর্থ বড় চমৎকার! আমাদের দেহরূপ এই যে ছক্র গাড়ী—এই গাড়ী যখন প্রবৃত্তিরূপ চক্র নাড়িয়া বক্র পাড়ি মারে তখন বঙ্ককাম্

অর্থাৎ পরমাত্মারূপী কৃষ্ণ—আমাদের আত্মার মধ্যে সুবুদ্ধির বাঁশি বাজাইয়া—আমাদের বিকৃত মনরূপ যন্ত্র মেরামৎ করেন। বুঝলেন মশায়?

গোপাল। Ah! Philosophy with a vengeance!! এরা দেখছি ridiculous-কেও sublime ক'রে তুলতে পারি!

হরিদাস। (কর্ণপাত না করিয়া) কি ভাষা!

জ্ঞানদাস।—(গদ গদ হইয়া) কি ভাব!

ভজহরি। ওহে ওহো!

ভটচায। আহা আহা।

চারি জনের দশা প্রাপ্ত।

লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ।

অমরাবতী বিনিন্দিত অযোধ্যানগরীতে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল মহিমান্বিত আর্য্যনৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন—ভুবনবিদিত দেবাবতার ভগবান রামচন্দ্র যাঁহাদের কুলতিলক বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের ধারাবাহিক বিবরণ কবিগুরু বাল্মীকি কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে গাথাবদ্ধ হয়। বাল্মীকির রামায়ণে কেবল অযোধ্যা কেন—সমসাময়িক অন্যান্য বর্দ্ধিষ্ণু জনপদেরও যথা সম্ভব বিবরণ পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের সময়ে সমস্ত ভারতের ভৌগলিক বৃত্তান্ত জানিতে হইলেও, এই মহাকাব্য হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। সে সকল আমাদের প্রসঙ্গভুক্ত নহে বলিয়া আপাততঃ তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

রামায়ণের পর কবিকুল তিলক মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন—মহাভারতে রামায়ণ বর্ণিত বর্ণনার অনুসরণ করিয়া সূর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের বংশ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই দুই বিভিন্ন সময়ের মহাকাব্য-সংনিবদ্ধ বংশতালিকার তুলনায় সমালোচন করিলে অনেক স্থলে ঘোরতর অনৈক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকাংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই হউক বা অন্য যে কারণে হউক প্রাচীন ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধারের পথে নানা প্রকার অন্তরায় আসিয়া পড়ে।

বৈবস্বত মনু সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ, তাঁহাকে ধরিয়া ভগবান রামচন্দ্র পর্য্যন্ত বাল্মীকি সর্ব্ব সমেত ষড়ত্রিংশৎ নৃপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন—কিন্তু ব্যাসদেবের বর্ণনানুসারে আমরা এই সময়ের মধ্যে সপ্ত পঞ্চাশত জন রাজার নামোল্লেখ দেখিতে পাই। উচ্চদরের প্রত্নতত্ত্ববিৎদিগের হস্তে পড়িলে এই বিষয়ের জটিলতা ঘুচিবার অনেক সম্ভাবনা আছে।

রামচন্দ্রের পর—কুশ অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। * কুশ হইতে অযোধ্যাধিপতি বৃহদ্বল একস্ত্রিংশ পুরুষ। বৃহদ্বল যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী ও কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ইনিই অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন। বৃহদ্বল হইতে সুমিত্র উনবিংশ পুরুষ সুমিত্রের পর ভাগবতে অন্য কোন নরপতির নামোল্লেখ নাই। কথিত আছে সুমিত্র বিক্রমাদিত্যের সমসময়িক।

সুমিত্রের পর হইতেই অযোধ্যার মহাপতন আরম্ভ হইল। † মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং যাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি যাহার শাসন দণ্ড চালনা করিয়াছিলেন—যে অযোধ্যা এক সময়ে সমগ্র ভারতের শিরাকেন্দ্র হইয়াছিল—সুমিত্রের পর হইতেই তাহা কালের কঠোর শাসনে বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সুমিত্রের পর হইতে অযোধ্যার ইতিহাস ঘোর অন্ধতমসে আবৃত।

ইহার পর বৌদ্ধ প্রধান কালের সূচনা। অযোধ্যার ইতিহাস এ সময়েও ঘোরতর কুহেলিকায় সমাবৃত। সম্ভবতঃ সূর্য্যবংশীয়েরা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলে এবং ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে এখানে বৌদ্ধদিগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব বাড়িয়াছিল। ইহার পর অযোধ্যায় আমরা বিক্রমাজিত নামক এক প্রবল প্রতাপান্বিত হিন্দু নরপতির কথা শুনিতে পাই। এই বিক্রমাজিত কে—ইহার প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করা অতিশয় দুরূহ। বিক্রমাজিত অযোধ্যা অধিকার করিয়া তাহার লুপ্ত কৃতিসমূহ উদ্ধার করিতে আরম্ভ করিলেন। জঙ্গল কাটাইয়া, পথ পরিষ্কার করিয়া, ভগ্ন প্রায় ও ভগ্নাবশেষ প্রাসাদগুলির জীর্ণ সংস্কার করিয়া তিনি অযোধ্যায় পুনর্জীবন দান করিলেন। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় যে সমস্ত রামায়ণ কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল হিন্দু রাজা বিক্রমাজিৎ অনুসন্ধান দ্বারা তাহার যথেষ্ট পুনরুদ্ধার করিলেন। নিজেও অনেক স্থানে প্রাসাদ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া নগরীর শোভাসম্পাদন করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় বিক্রমাজিত তিন শতের উপর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন—বর্ত্তমান কালে

* রামচন্দ্রের, কুশ ও লব, লক্ষণের অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, ভরতের, তক্ষ ও পুষ্কর, শত্রুঘ্নের, সুবাহু ও সুরসেন নামক পুত্র জন্মিয়াছিল। সূর্য্যবংশীয়দের চির প্রচলিত প্রথানুসারে কুশ অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কুশ বংশীয় বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যাভ। এই হিরণ্যাভ মহর্ষি জৈমিনির শিষ্য ও মহাযোগী ছিলেন। জৈমিনির নিকটেই যাজ্ঞবল্ক্য যোগাভ্যাস করেন। হিরণ্যাভ ও যাজ্ঞবল্ক্য এক গুরুর ছাত্র।

† বিষ্ণুপুরাণোক্তি এই—

"ইক্ষ্বাকুণা ময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতিঃ।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥

ইক্ষাকু বংশ রাজা সুমিত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে কারণ কলি যুগে উক্ত রাজা হইতেই এই বংশের লোপ হইবে।

তাহার সমস্তই লোপ হইয়া গিয়াছে কেবল অতি অল্প সংখ্যক অতীতের স্মৃতির সাক্ষ্য রূপে দণ্ডায়মান।

কোন সুবিখ্যাত ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন—সূর্য্যবংশীয়দিগের পরে শ্রাবস্তীয় রাজারা অনেক কাল ধরিয়া অযোধ্যায় রাজত্ব করেন। প্রাচীন কোশলের মধ্যে শ্রাবস্তী একটী প্রসিদ্ধ স্থান। ইক্ষ্বাকু হইতে অষ্টম পুরুষ—যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাব রাজা এই নগর স্থাপন করেন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান যে সময়ে শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন—সেই সময়ে তিনি নগরের ভগ্ন অট্টালিকাময়ী পতনাবস্থা দেখিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ প্রধান কালে রাজ চক্রবর্ত্তী অশোক অযোধ্যায় বিশেষ ক্ষমতা চালনা করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ যে যে স্থলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন তাহার মধ্যে অযোধ্যাও একটী। তাঁহার সময়ে অবশ্য অযোধ্যা একটী জনপূর্ণা নগরী ছিল—নচেৎ তিনি—বারাণসীর ন্যায় অযোধ্যায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিবেন কেন? অযোধ্যায় বুদ্ধের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অশোকের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল—অযোধ্যার নানাস্থানে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ মন্দির মঠ ও স্তূপাদিও সংগঠিত হইয়াছিল—হিয়াংসাং অযোধ্যায় আসিয়া ভিক্ষু ও পরিব্রাজক পূর্ণ বিশটী বৌদ্ধ মন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচারে যে সমস্ত হিন্দু কৃতি লোপ হয়—বিক্রমাজিত আসিয়া তাহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বিক্রমাজিতের পর—সমুদ্রপাল নামক জনৈক নরপতি এখানে রাজত্ব করেন। জনশ্রুতি, এই সমুদ্রপাল শরচালনার সিদ্ধবিদ্যা বলে বিক্রমাজিতকে নিহত করিয়া অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সমুদ্রপাল-বংশীয়েরা অব্যাহত প্রভাবে বহু কাল ধরিয়া অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর অযোধ্যা পুনরায় বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সমুদ্রপালের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার প্রস্তরময় প্রতিকৃতি আজও লক্ষ্ণৌএর আজবঘরে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর শুনিতে পাওয়া যায়, জৈনধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের হস্তে অযোধ্যার শাসনভার আসিয়া পড়ে। অযোধ্যায় আজও যে সকল জৈনকীর্ত্তি বর্ত্তমান তাহা হইতে এই প্রকার অনুমান করা যায় এক সময়ে এইস্থানে জৈনদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। কয়েকটী প্রধান প্রধান জৈন "তীর্থাঙ্কর" অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে—আদিনাথ, অজিতনাথ, অভিনন্দননাথ, সুমন্তনাথ, ও অনন্তনাথ প্রভৃতি কয়েক জনই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের সকলেরই কোন না কোন স্মরণ চিহ্ন আজও অযোধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। সোমবংশীয়দিগকে পরাজিত করিয়া জৈন একাদশ শতাব্দীর শেষে কণোজের রাজা চন্দ্রদেব অযোধ্যা অধিকার করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন মহম্মদঘোরি কৌশলজাল বিস্তারে হিন্দুকুল শ্রেষ্ঠ পৃথ্বিরাজের ধ্বংশ সাধন করিয়া কণোজ রাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত করেন। কণোজ জয়ের পর অযোধ্যা

লুণ্ঠন করিয়া তিনি তথায় স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে অযোধ্যা মুসলমানের হস্তে পতিত হয়। কিন্তু আমরা আকবরের রাজত্ব সময় হইতে অযোধ্যার মুসলমান ইতিহাস জানি। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মুসলমান রাজত্বের ধারাবাহিক্ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা বর্ত্তমানে অতিশয় দুর্ঘট। আমরা অন্য প্রসঙ্গে এই বিষয়ের পুনরালোচনা করিব।

প্রধান প্রধান হিন্দুতীর্থ গুলির মধ্যে সাতটী বিষ্ণুর অঙ্গসম্ভূত বলিয়া কথিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রকার দিগের মতে বিষ্ণুর পদ হইতে উজ্জয়িনী বা অবন্তিকা, কটীদেশ হইতে কাঞ্চী, নাভিদেশ হইতে দ্বারকা, হৃদয় হইতে হরিদ্বার, স্কন্ধ হইতে মথুরা—নাসিকাগ্রভাগ হইতে বারাণসী ও মস্তক হইতে অযোধ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। বিষ্ণুর মস্তক হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিষ্ণু অবতার রামচন্দ্রের লীলাভূমি বলিয়া অযোধ্যা একটী প্রধানতম হিন্দু তীর্থ। আজও ইহার মধ্যে অনেক পবিত্র স্মরণীয় স্থল আছে—যাহা পাণ্ডারা তীর্থযাত্রীদিগকে আগ্রহের সহিত দেখাইয়া দেয়। যদিও সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই—তথাপি আদর্শ চরিত্র রামচন্দ্রের কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ বলিয়া এই গুলি দেখিতে আমাদের মন স্বতই আবেগপূর্ণ হইয়া থাকে।

রাম চন্দ্রের লীলা সম্পর্কীয় দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে, মণিপর্ব্বত, স্বর্গদ্বার, রামকোট রত্নমণ্ডপ, জন্মভূমি, অশোক বাটিকা, ও রামরেখাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত, বারণসীর ন্যায় অযোধ্যায় কতকগুলি পবিত্রকুণ্ড, কূপ ও ঘাট আছে। ইহাদের মধ্যে দণ্ডাবধারণ কুণ্ড, হনুমানকুণ্ড, সুবর্ণস্থানকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, দশরথকুণ্ড, কৌশল্যাকুণ্ড, কৈকেয়ীকুণ্ড, সুমিত্রাকুণ্ড, রুক্মিনীকুণ্ড, চিত্রোদককুণ্ড, ধনযক্ষকুণ্ড, বশিষ্ঠকুণ্ড, অনিমোচনকুণ্ড, সহস্রধারা বা লক্ষণকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের পুংখাণুপুংখ বিবরণ দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব সুতরাং সংক্ষেপে ইহাদের সম্বন্ধে দুচারিটী কথা বলিব।

মণি-পর্ব্বত—অযোধ্যায় প্রবেশ করিবামাত্র প্রথম দর্শনীয় বস্তু। ইহা একটী অনতিউচ্চ মৃত্তিকা ও কঙ্করস্তূপ—উর্দ্ধতা আন্দাজ বোধ হয় ৫০ হস্তের উর্দ্ধ হইবে না। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডারা বলে অনন্তাবতার লক্ষণ লঙ্কার মহাসমরে শক্তিশেলে পড়িলে পবননন্দন হনুমান বিশল্যকরণী আনিতে যাত্রা করে। বানরে ঔষধের গাছ কি চিনিবে কাজেই সমস্ত পর্ব্বতখণ্ড মাথায় লইয়া শূন্য পথে আসিতে লাগিল। অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রামনাম করিবামাত্রই ভরত না জানিয়া তাহাকে বাটুলাঘাতে ভূমিশায়ী করেন। প্রকাণ্ড পর্ব্বত সমেত হনুমান ভরত-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বেদনায় ব্যথিত হইয়া ভূমিতে পতিত হওয়াতে গন্ধমাদন পর্ব্বতের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যায়। এই মণি পর্ব্বতকেই পাণ্ডারা গন্ধমাদনের ভগ্নাংশ বলিয়া দেখাইয়া দেয়। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় এই স্তূপের নিম্নে একখানি খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছিল—তাহাতে লিখিত আছে "মগধ রাজবংশের নন্দীবর্দ্ধন নামক রাজা মণিপর্ব্বত

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন"। আবার কেহ কেহ বলেন ইহা একটি প্রাচীন ভগ্নাবশেষ বৌদ্ধ স্তূপ।

স্বর্গদ্বার—অযোধ্যার মধ্যে প্রধান পবিত্র ভূমি। ইহার বিস্তৃতি প্রায় ছয় শত হইবে। "অযোধ্যা মাহাত্ম্য" মতে স্বর্গদ্বার দেখিলে মানবে চরমমুক্তি লাভ করে। লক্ষ্মণকুণ্ডের অতি সন্নিকটেই ইহা অবস্থিত। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে তীর্থযাত্রীরা স্বর্গদ্বার দেখিতে আসিয়া থাকে। এইস্থানে রাম সীতার প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি অত্যুচ্চ মন্দির মধ্যে সংস্থাপিত আছে। স্বর্গদ্বারের বর্ত্তমান অবস্থা ভগ্নপ্রায়। পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয় ইন্দোরাধিশ্বরী অহল্যাবাই অযোধ্যা ভ্রমণে আসিয়া স্বর্গদ্বারের ভগ্ন মন্দির সংস্কার কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। আজও ইন্দোর রাজসরকার হইতে এখানকার দেবালয়ের সাহায্যার্থে বৎসর বৎসর অর্থসাহায্য আসিয়া থাকে। প্রবল হিন্দুদ্বেষী গোঁড়া মুসলমান সম্রাট আরংজিব কোন হিন্দুতীর্থকেই ছাড়িয়া কথা কন নাই—স্বর্গদ্বারের নিকটে একটী ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়া আজও অযোধ্যায় স্বীয় কীর্ত্তি প্রচার করিতেছেন।

রাম কোট—অযোধ্যার প্রাচীন দুর্গ। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ নিধন করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গ ছিল বলিয়া পাণ্ডারা এই স্থানটী বিশেষ যত্নের সহিত দেখায়। লঙ্কা-সমর হইতে প্রত্যাগত কপি ও রাক্ষস সৈন্যের হস্তে এই দুর্গ রক্ষার ভার ছিল। দুর্গের ভিতর কয়েকটী রাজপ্রাসাদ ও চারিপাশে সুগভীর পরিখা ও অনেকগুলি বুরুজ ছিল। রাজপ্রাসাদের দ্বারে পরম ভক্ত হনুমান—তাহার দক্ষিণ প্রদেশে সুগ্রীব ও অঙ্গদ,—দুর্গের দক্ষিণ ফটকে নল, নীল, সুষেণ, ও পূর্ব্বদিকে "নবরত্ন প্রাসাদের" উত্তর ভাগে গবাক্ষ, পশ্চিম দ্বারে দুধবক্র, বিভীষণ, ও জাম্বুবান প্রভৃতি সেনাপতিগণ পাহারা দিয়া দুর্গ রক্ষা করিতেন। অসংখ্য তীর্থ যাত্রী এই পবিত্র স্থল দেখিতে আসিয়া মন্দির মধ্যস্থ হনুমান প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকেন।

রত্নমণ্ডপ—রাম কোটের মধ্যে অতিশয় পবিত্র স্থান। "অযোধ্যা মাহাত্ম্য" মতে এইস্থানে পূর্ব্বে একটা কল্পবৃক্ষ ও একখানি রত্ন সিংহাসন ছিল। রত্নমণ্ডপের চারিদিকে অসংখ্য সুগন্ধি দীপ জ্বলিত ও চারিধার নানাবিধ সুখদ-গন্ধ দ্রব্যে পরিপূরিত থাকিত। সিংহাসনের মধ্যে, রত্নময় অষ্টদল পদ্ম প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় কিরণ বিস্তার করিত। এই অষ্টদল পদ্মে ভগবান রামচন্দ্র ও অষ্টালঙ্কার ভূষিতা সীতাদেবীর মূর্ত্তি। পার্শ্বে চামর ও ছত্রধারী প্রশান্ত মূর্ত্তি ভরত লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন। পদতলে ভক্তপ্রবর হনুমান ও চারিদিকে বানর মণ্ডলী। প্রাচীন পবিত্রতার জন্য তীর্থ যাত্রীরা মহা ভক্তির সহিত রামকোটে আসিয়া শাস্ত্রোচিত কার্য্যানুষ্ঠান ও দানধ্যানাদি করিয়া থাকে।

জন্ম ভূমি—এই স্থানে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, মাধবী শুক্ল পক্ষে, মঙ্গল বাসরে শ্রীরামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। রামের জন্ম ভূমি বলিয়াই এই স্থান শত শত বার দেখিয়াও তৃপ্তি

হয় না। মনে অতীত স্মৃতির সুমধুর ঝঙ্কার জাগিয়া উঠে। হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস পূর্ণ-স্রোতে বহিতে থাকে। বশিষ্ঠের বাসভবনের অতি সান্নিধ্যে জন্মভূমি স্থান। অযোধ্যা মাহাত্ম্য-পুরাণের মতে, রামনবমীর দিনে এই স্থান দেখিলে ও উপবাস অর্চ্চনাদি করিলে "সহস্র গোদানের," "রাজসূয়" ও "অগ্নিহোত্র" যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। আজ কাল জন্ম স্থানের একাংশ মুসলমানের অত্যাচারে অতিশয় অপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। ভারতে মোগল রাজবংশ স্থাপয়িতা বিধর্ম্মী বাবর মৃগয়া করিতে আসিয়া এই স্থানে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই স্থানে তিনি একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মুসলমান রাজা হিন্দুর দেবালয়ের কাছে মস্‌জিদ্ করিতে গেলে যাহা যাহা অত্যাচার উপদ্রব করা আবশ্যক বাবর তাহার কিছুই ত্রুটি করেন নাই। জন্ম স্থানের অত্যুজ্জ্বল কৃষ্ণ-প্রস্তরময় সুদৃশ্য মন্দির ভাঙ্গিয়া তিনি স্বনির্ম্মিত মস্‌জিদের স্তম্ভ ও সোপান রচনা করিয়াছিলেন। এই মস্‌জিদের সান্নিধ্যে কতকগুলি হিন্দু দেব-মন্দির আছে—আজ কাল মন্দির ও মুসলমান-মস্‌জিদের মধ্যে রেল দিয়া ব্যবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে উভয় জাতির পর্ব্বোপলক্ষে এইস্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিত—আজ কাল ইংরাজ শাসনের গুণে তাহার অনেক নিবৃত্তি হইয়াছে।

অশোক বাটিকা—সরযূ ও তৎশাখা তিলোদকীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা শ্রীরামচন্দ্রের বিলাস কানন ছিল। সেই সময়ে ইহার চারিদিক চন্দন, অগুরু, কালাগুরু, রত্নমঞ্জরী, দেবতরু, নাগকেশর, মহুয়া, আসন, সরতার, লোধ, কদম্ব, অর্জ্জুন, সুতবর, প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষে পরিপূরিত থাকিত। অযোধ্যা মাহাত্ম্য মতে সীতা দেবী সদা সর্ব্বদা রামচন্দ্রের সহিত এই প্রমোদোদ্যানে বেড়াইতে আসিতেন। এই স্থানে সীতা দেবী স্বহস্তে একটী কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন তাহা আজও সীতাকুণ্ড বলিয়া পরিচিত।

রাম-রেখা—সরযূর পূর্ব্বদিকে। শ্রীরামচন্দ্র স্বহস্তে বাণ দ্বারা তাঁহার পালিত গোবৃন্দের জল পানের সুবিধার জন্য এইস্থান দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন—চৈত্র শুক্ল পক্ষে তীর্থযাত্রার সময় এখানে আসিলে পুরাণের মতে ব্রাহ্মণ-বিদ্যা, ক্ষত্রিয়-বল, বৈশ্য ধন, শূদ্র স্বচ্ছন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অযোধ্যায় যে কয়েকটী কুণ্ড আছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্বনাম-প্রসিদ্ধ। এজন্য তাহাদের বিবরণ দিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। আমরা কেবল নিম্ন লিখিত কয়েকটীর বিবরণ প্রদান করিলাম।

দণ্ডধারণকুণ্ড—ভগবান রামচন্দ্র প্রজাবেষ্টিত হইয়া এইস্থানে দণ্ড ধারণ করিতেন।

সুবর্ণস্থানকুণ্ড—এক সময়ে সূর্য্য বংশাবতংশ প্রভূত ক্ষমতাবান রঘুরাজ, বশি-

ষ্ঠাদি মুনিগণের পরামর্শে "বিশ্বজিত" যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ ব্যাপারে মহারাজ রঘু রাজভাণ্ডারস্থ সমস্ত স্বর্ণরৌপ্যাদি অজস্রপরিমাণে দীন দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে বিতরণ করিয়াছিলেন। রাজভাণ্ডারে আর তিলমাত্র স্বর্ণরৌপ্যাদি রহিল না। এই সময়ে কৌত নামক এক সিদ্ধতপা সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মুনি মহারাজ রঘুর নিকট কোটী সংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রা প্রার্থনা করেন। মহারাজের ভাণ্ডার তখন শূন্য প্রায়। কোটী ছাড়িয়া শতসংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রারও অভাব। সুতরাং অমিততেজা রঘু কুবেরের নিকট সুবর্ণ প্রার্থনা করিলেন। কুবের প্রদত্ত অসংখ্য সুবর্ণ পাইয়া মহারাজ রঘু তাহা হইতে ব্রাহ্মণকে প্রয়োজন মত লইয়া যাইতে সম্মতি দিলেন। যে স্থানে কুবের প্রদত্ত স্তূপাকার স্বর্ণ একত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহাই সুবর্ণ-স্থানকুণ্ড বলিয়া বিখ্যাত। এই স্থানে বৈশাখী শুক্লপক্ষে অধিক সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

রুক্মিণীকুণ্ড — একদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা ও রুক্মিণী দেবীকে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে তীর্থ ভ্রমণ করিতে আসেন। নানাবিধ স্বনামবিখ্যাত কুণ্ড দেখিয়া রুক্মিণী দেবী অযোধ্যায় কৃষ্ণের বাসস্থানের নিকটে এককুণ্ড খণন করাইলেন। তাহা আজও "রুক্মিণীকুণ্ড" নামে পরিচিত। পুরাণের মতে এইস্থলে আসিলে বন্ধ্যা পুত্র লাভ করে। এইরূপ প্রবাদ থাকাতে এস্থলে অনেক সময় স্ত্রীলোকের জনতা অধিক হইয়া থাকে।

চিত্রোদককুণ্ড—রাজা দশরথ "পুত্রেষ্টি যজ্ঞ" করিয়া এই স্থানে অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের জল দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বলিয়া ইহা "চিত্রোদক" নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। প্রবাদ এই ব্রাহ্মণেরা রাশিকৃত চরুপাক করিয়া এই কুণ্ডের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, চরুর দুগ্ধের প্রভাবে সমস্ত জল শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ধনযক্ষকুণ্ড — এই স্থলে একজন যক্ষ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের ধন সম্পত্তি রক্ষা করিত।

ঋণমোচনকুণ্ড—মহর্ষি লোমশ, এই কুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃ, দেব, ও ঋষি ঋণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার সহিত সরযুর সংযোগ আছে।

সহস্রধার কুণ্ড—ইহার অপর নাম লক্ষণকুণ্ড। অগ্রজ কর্ত্তৃক বর্জিত হইবার পর অনন্তাবতার লক্ষণ এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র—শেষ নাগরাজ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এই স্থান বিদীর্ণ করিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হন। সহস্রফণা-শেষ নাগের মস্তকচালনে এই স্থান সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম সহস্রধার কুণ্ড হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ইহার নিকটেই গুপ্ত দ্বার। এই গুপ্তদ্বার দিয়া রামচন্দ্র পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অযোধ্যা প্রদেশে সর্ব্বসমেত প্রায় শতাধিক গণনীয় হিন্দু মন্দির আছে। মসজিদের সংখ্যা ৩৬। রামনবমীর সময় অযোধ্যায় মহোৎসবের ও তীর্থ-যাত্রীর সংখ্যা অতিশয় অধিক হইয়া থাকে।

উপরে আমরা যথাসম্ভব অযোধ্যার প্রাচীন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম। এক্ষণে বর্ত্তমান কালের কথা বলিব। মোগল রাজত্বের পতনের মুখে যে সকল প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি স্বল্প উদ্যমে ও চতুরতায় মোগল বাদসাহকে উপেক্ষা করিয়া নূতন নূতন রাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিজাম উল্‌মুলুক ও সাদতখাঁই সর্ব্বপ্রধান। সাদত খাঁর সময় হইতেই অযোধ্যার প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই অযোধ্যার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইতে থাকে। সাদত ও ইহার উত্তরাধিকারীরা প্রথমে লক্ষ্ণৌ প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে সুদূরে, এলাহাবাদ, কাণপুর, গাজিপুর, ও রোহিল খণ্ড প্রদেশে আপনাদের শাসন ক্ষমতা বিস্তার করেন।

সাদত খাঁ ও নিজাম উলমুলুক প্রায় সমকালেই স্বস্ব ক্ষমতা বিস্তার করেন। তাঁহারা উভয়েই প্রায় এক সময়ে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন—কিন্তু হায় নিজাম বংশ আজও উজ্জ্বলভাবে রাজত্ব করিতেছেন কিন্তু সাদতের বংশ অতি অল্পকালের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরিশেষে ইংরাজের বন্দীরূপে তাঁহাদের অনুগ্রহ মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজের সংমিশ্রণে ইংরাজের কূট বুদ্ধি জালে জড়িত হইয়া ইংরাজের অদমনীয় অর্থপিপাসা শান্তি করিতে গিয়া সাদতের বংশ আজ এ প্রকার শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজের সহিত দেশীয় রাজগণের যেথানেই সীমাতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা ও মাথামাথি ভাব জন্মিয়াছে সেইথানেই সেই দেশীয় রাজ্যের পতন হইয়াছে। আমাদের অপেক্ষা ইতিহাস এবিষয়ে অধিক সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে।

সাদতখাঁ অযোধ্যার নবাব বংশের আদি পুরুষ—তাঁহার পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েকজন মুসলমান ভূপতি অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নবাব উজীরদিগের নাম।	রাজাদিগের নাম।
(১) নবাব সাদত খাঁ বাহাদুর বুরহান উল্‌মুলুক।	(১) গাজিউদ্দিন হায়দর।
	(২) নশীরুদ্দিন হায়দর।
(২) „ মনসুর আলি খাঁ সফ্‌দার জঙ্গ বাহাদুর।	(৩) মহম্মদ আলিশা।
	(৪) আমজাদ আলিশা।
(৩) „ সুজাউদ্দৌলা বাহাদুর।	(৪) ওয়াজিদ আলিশা। (Ex-king of Oudh)
(৪) „ আসফ্‌উদ্দৌলা বাহাদুর।	
(৫) „ সাদত আলি খাঁ বাহাদুর।	

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে—যে সাদত খাঁ হইতে ক্রমান্বয়ে দশজন নবাব অযোধ্যায় রাজত্ব করেন। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষ ভূপতি নবাব ওয়াজিদ আলি সা সম্প্রতি কলিকাতার দক্ষিণ মুচিখোলায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

সাদত খাঁ—অযোধ্যার নবাব বংশের স্থাপয়িতা। স্বীয় দক্ষতা, অধ্যবসায় ও

সাহসের গুণে অতি সামান্য অবস্থা হইতে, ইনি উচ্চতর পদবীতে আরোহণ করেন। সীমান্ত দেশ হইতে ভারতে যে সমস্ত লোক, অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাদত খাঁও একজন। নৈসাপুরে ইহার আদিম বাসস্থান ছিল। ১৭০৫খৃঃ অব্দে নৈসাপুর হইতে দশবৎসরের বালক মহম্মদ আমিন ভাগ্য পরীক্ষার্থে পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হন। পাটনায় তাঁহার সহোদর ও পিতা অবস্থান করিতেছিলেন।—মহম্মদ আমিন আসিয়া দেখিলেন পিতার মৃত্যু হইয়াছে সুতরাং তাঁহারা দুই ভায়ে পাটনা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লি প্রবেশ করিলেন। নবাব মারবুলান্দ খাঁর নিকট মহম্মদ আমিনের এক চাকরী জুটিল—কিন্তু উদ্ধত প্রকৃতি-যুবক কোন বিশেষ কারণে প্রভুর বিদ্রূপ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া চাকৃরি ছাড়িয়া দিলেন। এই সময় হইতেই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর প্রসন্না হইলেন—তাঁহার এত দিনের সাধনার এই সময়ে ফল লাভ হইল। দিল্লীর বাদসাহের নিকট ক্রমশঃ যুবক মহম্মদ আমিন পরিচিত হইয়া উঠিলেন। স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার জোরে বাদসাহের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। কিয়ৎকালের পর—বাদসাহের সম্মতিতে তিনি অযোধ্যার সুবাদারি প্রাপ্ত হইলেন। মহম্মদ আমিন, সাদত খাঁ উপাধি ধারণ করিয়া অযোধ্যার মসনদে বসিলেন।

সাদত খাঁ যে সময়ে অযোধ্যায় প্রথম প্রবেশ করেন তখন এখানে সর্ব্ববিষয়ে বড়ই বিশৃঙ্খলতা চলিতেছিল। কতকগুলি ক্ষমতাপন্ন জমীদারই দেশ শাসন করিতেছিলেন। প্রজার সম্পত্তি রক্ষা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না—স্বস্ব প্রভুত্ব বর্দ্ধন কার্য্যেই তাঁহাদের দিন কাটিত।

দরিদ্র ও সহায়হীনদিগেরই সমূহ বিপদ, তাহারাই সর্ব্বপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। প্রজা বীজবপন করিয়া শস্য উৎপাদন করিল—শস্য কাটিয়া আনিয়া একত্রে সংগ্রহ করিল—ইতিমধ্যে একদল লুটেড়া আসিয়া তাহা লুঠ করিয়া লইয়া গেল। একজন পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিল—অপর ব্যক্তি বলপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে সেই গুলি কাড়িয়া লইল। যাহারা পূর্ব্বে সুবাদারি করিয়া ছিলেন. তাঁহাদেরও লক্ষ্যের ততটা স্থিরতা ছিল না। সাদত খাঁ অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়াই সমস্ত দেশের এই প্রকার অবনতি ও শোচনীয় অবস্থা দেখিলেন। কিন্তু তিনি স্থির থাকিবার লোক নহেন—উৎপীড়িত দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রথমেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীদিগকে ক্ষমতাহীন করিলেন, রাজ্যশাসনের সুশৃঙ্খলার্থে নানাবিধ বিধি প্রণয়ন করিলেন। পুনরায় রাজ্যমধ্যে ইহাতে শান্তি আসিল, প্রজাকুল সুস্থ হইল, দুষ্টের দমন হইল—সকল বিষয়ে বিশৃঙ্খলতা দূর হইতে লাগিল—ও রাজকোষে প্রচুর অর্থ জমিয়া গেল। সাদত খাঁ এই প্রকারে প্রজাপুঞ্জের হৃদয়াধিকার করিয়া প্রশস্ত ভিত্তির উপর এক বিশাল রাজ্য সংস্থাপন করিলেন।

নূতন বড়মানুষদিগের ন্যায় সাদত খাঁ জাঁকজমক ভাল বাসিতেন না। তাঁহার

উত্তরাধিকারীরা যে প্রকারে কাল কাটাইয়াছিলেন, সাদত তাহার এক চতুর্থাংশ সুখও ভোগ করিতে পান নাই। প্রজার সুখ বৃদ্ধিই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং নিজের সুখের চেষ্টায় তিনি বড় ব্যতিব্যস্ত হন নাই। তিনি রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত, লক্ষ্ণৌএর পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা সেখজাদাদিগের একজন বংশধরের নিকট, সামান্য ভাড়ায় একটী বাটী বর্ত্তমান মচ্ছি ভবনের অতি সান্নিধ্যে ভাড়া করিয়া লয়েন। সেই ভাড়াটীয়া সামান্য বাটীই সুবাদারের রাজপ্রাসাদের কার্য্য করিত। প্রথম প্রথম বাটীর অধিকারী-দিগকে সাদত খাঁ নিয়মিত ভাড়া দিয়া আসিতেছিলেন—কিন্তু পরিশেষে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহার ভিত্তিমূল—দৃঢ় করিতে হইলে যে যে গুণের আবশ্যক সাদত খাঁর তাহার কোন গুলিরই অভাব ছিল না। শান্তির সময়ে প্রজাবৃন্দের মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকিতে তাঁহার যেমন আমোদ ছিল—যুদ্ধের সময়ে অগ্রণীরূপে সৈন্য পরিচালন করিতেও তিনি সেইরূপ আমোদ উপলব্ধি করিতেন। প্রজাপুঞ্জের সুখ সম্বর্দ্ধনার্থে নানাবিধ মঙ্গলময় ব্যবস্থা প্রণয়ণে তিনি যেমন বুদ্ধির উৎকর্ষতা দেখাইয়া ছিলেন—শত্রুর মস্তকে তরবারি আঘাত কার্য্যেও সেই প্রকার শারীরিক বীর্য্যের শ্রেষ্ঠতা দেখাইতেন, সমসাময়িক বীরগণের মধ্যে তিনিও একজন বিশেষ বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ভগবান সিংহ নামক আর একজন হিন্দুবীর কেবল মাত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ছিলেন, ভগবান সিংহকে সকলেই অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন বলিয়া জানিত। কিন্তু কোন সময়ে সাদত খাঁর সহিত ভগবান সিংহের কোন বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে তাঁহারা উভয়েই মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন—হিন্দুবীর ভগবান্ সেই যুদ্ধে সাদতের হস্তের প্রথম আঘাতেই নিহত হন। ভগবানকে নিহত করাতে—সাদতের যশোরাশি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। আজও অনেকে গল্প স্থলে এই সমস্ত কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

সাদতের যশোরাশি নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক নহে। জনশ্রুতি এই—যে তিনি এবং নিজাম উভয়েই একযোগে মন্ত্রণা করিয়া নাজির সাহকে ভারতাক্রমণে প্রবর্ত্তিত করেন। ইহার পরিণাম ফল যে তাঁহারই পক্ষে বিষময় হইয়াছিল—তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লীর তৎকালীন বাদসাহ সাদতের চক্ষুঃশূল ছিলেন—যখন নাজির সাহ দিল্লী প্রবেশ করিলেন, অর্থ সংগ্রহই যে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বাদসাহ ইহা জানিতে পারিলেন। ক্ষীণ প্রতাপ বাদসাহ—নাদিরের গতি রোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে দুই কোটী টাকা প্রদান করিতে সম্মত হন। নাদির শাও বিনারক্তপাতে এতগুলি টাকা পাইয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নিজামের মন্ত্রণায় সাদত খাঁ নাদিরকে বলিয়া পাঠাই-লেন—"মহাশয়! দুই কোটী টাকা অতি সামান্য ইহা দিল্লীর বাদসাহের উপযুক্ত প্রতি-দান নহে। আপনি ইহা গ্রহণ করিলে আমি নিজ ক্ষুদ্র রাজ্যের এক কোণ হইতে

দুই লক্ষ টাকা অনায়াসে তুলিয়া দিতে পারি”। নাদির সাহের ইহাতে চক্ষু ফুটিল। ভারতেরও অদৃষ্টে লুণ্ঠন আছে সুতরাং তাহাও অসম্পূর্ণ থাকিল না। নাদির সাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া যাহা পাইলেন তাহাতে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না—তিনি সাদত খাঁর কথিত দুই লক্ষ টাকা তাঁহার নিকট হইতে দাবি করিয়া বসিলেন। উৎক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র যে শত্রু বিনাশ করিয়া আসিয়া পুনরায় তাঁহার গাত্রে লাগিবে—ইহা সাদত খাঁর বিশ্বাস হয় নাই। শত্রুর বিনাশেচ্ছায় তিনি যে জাল পাতিয়াছিলেন তাহাতে যে নিজেই আবদ্ধ হইবেন ইহা তাঁহার আদৌ ধারণা ছিল না। এই প্রকার বিপৎপাতে সাদত অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন—প্রিয়বন্ধু জ্ঞানে নিজামের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। নিজাম বরাবরই সাদত খাঁকে বন্ধুভাবে না ভাবিয়া প্রধান প্রতি-দ্বন্দী বলিয়া ভাবিতেন—কিন্তু মৌখিক সদ্ভাবে তাঁহার কোন ত্রুটি ছিল না—তিনি সাদত খাঁকে বলিলেন—“ভাই! আমিও তোমার ন্যায় দায়ে পড়িয়াছি—আমাকেও নাদিরকে টাকা দিতে হইবে—কিন্তু অর্থ কোথায় পাইব—বিষ পানে ইহলোক ত্যাগ করিয়া এই দায় মুক্ত হই—ইহাই আমার বাসনা”। সাদত এই কথায় ভুলিলেন—কথাটা একবার তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেন না—নিজ শিবিরে আসিয়া তাড়া-তাড়ি হলাহল গলধঃকরণ করিলেন। ইহাতেই তাঁহার জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

মৃত্যুর সময় সাদত খাঁ নয় লক্ষ টাকা কোষাগারে রাখিয়া যান। প্রজালুণ্ঠন করিয়া এই অর্থ সঞ্চিত হয় নাই বটে—কিন্তু ধনীর উপর তাঁহার মাঝে মাঝে উৎপাৎ চলিত। অযোধ্যার বিশৃঙ্খলতার সময়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র নবাব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—সাদত আলির দৃষ্টি তাহাদিগের উপর পড়াতে তাহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িল। ইহাতে অযোধ্যার মধ্যে সুশাসনের প্রাদুর্ভাব ও সর্ব্বপ্রকার প্রজার উন্নতি হইয়া ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব প্রভুর সহিত বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ব্যবহার করিতে গিয়া তিনি বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া নিজে ফাঁদে পড়িলেন ও জীবন হারাইলেন। প্রভুদ্রোহিতাই সাদত খাঁর জীবনের প্রধান কলঙ্ক।

সাদতের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার মৃত্যুর পর অযোধ্যার সিংহাসন প্রার্থী হইয়া নাদিরের সম্মতি চাহিয়া পাঠান। জ্যেষ্ঠ সেরজঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া নাদির সাহ, কনিষ্ঠ সফ্দার-জঙ্গকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে সনন্দ দেন। সফদারজঙ্গ—সাদত খাঁর জামাতা। সাদতের একজন হিন্দুমন্ত্রী এই সময়ে সিংহাসন প্রার্থী সফ্দার জঙ্গের বিশেষ সহায়তা করেন। মস্-নদে বসিয়া সফ্দারজঙ্গ মনসুর আলি খাঁ উপাধি ধারণ করেন। ইনি একজন কূটরাজনীতিজ্ঞ পুরুষ। সাদত খাঁ বাহুবলে যে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার উত্তাধিকারী মনসুর স্বীয় বুদ্ধিবলে তাহার ভিত্তিমূল দৃঢ় সংগঠিত করিয়া লয়েন। নিজের রাজ্য ছাড়া তিনি দিল্লীর বাদসাহের চঞ্চল ক্ষমতা স্থির রাখিবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাদসাহ মহম্মদ সাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আমেদশা মনসুর আলি খাঁকে নিজ উজীর নিযুক্ত করেন।

রোহিল খণ্ডের প্রতি অযোধ্যার নবাবগণের চিরকালই লোলুপ দৃষ্টি। সফ্দার জঙ্গ উজীর হইয়া রোহিল খণ্ড গ্রাস করিবার চেষ্টা করিলেন। রোহিল্লা বংশের স্থাপয়িতা আলিমহম্মদ এই সময়ে গতায়ু হওয়াতে নবাবের উদ্দেশ্য সিদ্ধি-পথ সরল হইয়া উঠিল। তিনি রোহিল্লাদিগের মধ্যে তৎকালীন প্রধান ক্ষমতাবান্ কায়েম খাঁকে হস্তগত করিয়া রোহিল্লাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধে কায়েম খাঁ নিহত হইলে তিনি তাহার ভ্রাতা আমেদ খাঁকে একটী জায়গীর ও ভাতা দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। রোহিল খণ্ড প্রকারান্তরে তাঁহার হস্তগত হইল ও এই নবাধিকৃত প্রদেশ ও অযোধ্যার শাসন-ভার নবাব তাঁহার ডেপুটী রাজা নকুল কিশোরকে অর্পণ করিয়া বাদসাহের সহায়তায় দিল্লী গমন করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটিয়া উঠিল—যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই মনসুরের অদৃষ্ট চক্র বিপরীত দিকে ঘূর্ণিত হইল।

আফ্রিদী জাতীয় এক কাবুলী রমণী সুতা কাটিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। রাজা নকুলকিশোরের একজন সিপাহী এই যুবতী রমণীর প্রতি অকারণে অত্যাচার করিয়া তাহার সতীত্ব নষ্টের চেষ্টা করে। সেই রমণী রাজা নকুল কিশোরের নিকট বিচারার্থী না হইয়া একেবারে আমেদ খাঁর নিকট উপস্থিত হয়। আমেদ খাঁর কোন ক্ষমতাই ছিল না—তিনি কেবল অযোধ্যার নবাবের মাসহারার উপর নির্ভর করিয়া কাল কাটাইতেছিলেন। এই বীর্য্যবতী স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল—"আমীর আমেদ খাঁ! তুমি বৃথা ঐ শিরোপার ভার বহন করিতেছ! তোমার এ প্রকার সুখভোগে শত ধিক্! তোমার স্বজাতীয় একজন অসহায়া অবলার উপর কাফের সাহস করিয়া অত্যাচার করিল—আর তুমি এখনও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ? হায়! তুমি যদি তোমার পিতার পুত্র না হইয়া কন্যা হইয়া জন্মাইতে তাহা হইলে বড়ই সুখের হইত।" আমেদ খাঁর নিদ্রিত মনোবৃত্তি গুলি এই তীক্ষ্ণ তিরস্কারাঘাতে জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মনে মনে ধিক্কার জন্মিল, পরাধীনতার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল—আমেদ খাঁ একদল ধনী সার্থবাহকে সুযোগমতে লুঠ করিয়া লইলেন। অনেক অর্থ সঞ্চিত হইল—তদ্দারা তিনি বহুল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। দ্রুতগতিতে ফরেক্কাবাদ প্রবেশ করিয়া তথাকার কোতোয়ালকে নিহত করিয়া এক মাসের মধ্যে ফরেক্কাবাদ হস্তগত করিলেন।

রাজা নকুলকিশোর রায়, ফরেক্কাবাদ তাঁহার হস্তবহির্ভূত হইয়াছে—ও ক্ষীণবীর্য্য আমেদ খাঁ দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি নিজে অতিশয় সাহসী ও বীর পুরুষ ছিলেন। প্রভুর আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি একদল সেনা লইয়া লক্ষ্ণৌ হইতে কালী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন।

এইস্থানে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে উত্তেজিত আফ্গান সৈন্য দ্বারা তিনি নিহত হয়েন। আমেদ খাঁর বিজয়ী সৈন্যগণ নদীপার হইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিবাদে অযোধ্যা হস্তগত করে। সফ্দারজঙ্গ এই সময়ে দিল্লী হইতে, এই বিপদ বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া দুই লক্ষেরও উপর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। বল বৃদ্ধির কারণ, তৎকালীন প্রধান যোদ্ধা ভরতপুরের জাঠদিগের নায়ক, সূর্য্যমল্লকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। আমেদ খাঁর সৈন্যবল ইহার তুলনায় অনেক কম ছিল, নবাবের বিপুল-সৈন্য তরঙ্গে আমেদ খাঁ কোথায় যে ঢাকিয়া যাইতেন তাহার স্থিরতা নাই—কিন্তু বুদ্ধিবলে তিনিই জয়শ্রী লাভ করিলেন। নবাব সম্মুখ রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন—আমেদ পার্শ্বের এক দল সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া হঠাৎ নবাবের সম্মুখীন হইলেন। এই আকস্মিক বিপদপাতে নবাব রণক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সৈন্যগণও অধিনায়ককে পলাইতে দেখিয়া ইতস্তত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল—পরিশেষে আমেদ খাঁরই জয় হইল। কিন্তু পরিশেষে মহারাষ্ট্রদিগের সহায়তায় নবাব সফ্দারজঙ্গ স্বীয় রাজ্য সম্পূর্ণ রূপে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। আমেদ খাঁর বীরকীর্ত্তি আজও রোহিল খণ্ডের স্থানে স্থানে গীত হইয়া থাকে।

এই প্রকার যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, সফদারজঙ্গ দেশের ও রাজধানীর শোভা সম্বর্দ্ধনের জন্য কোন কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন নাই। কেবল "মচ্ছিভবন" নামক বর্ত্তমান প্রকাণ্ড দুর্গ ইঁহার সময়ে নির্ম্মিত হয়। প্রাচীন লক্ষণপুর বা লক্ষণাবতী যে যে উচ্চ স্থলের উপরে ছিল, সেই স্থানেই মচ্ছিভবন দুর্গ আজও বিরাজমান রহিয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে এ প্রকার জনপ্রবাদ আছে যে "মচ্ছিভবন" যাহার দখলে থাকে, লক্ষ্ণৌ প্রদেশ নিশ্চয়ই তাহার করতলস্থ হইবে। "মচ্ছিভবন" নবাবী আমলের প্রকাণ্ড দুর্গ, আজ কাল তাহাতে প্রকৃত দুর্গশ্রী-জ্ঞাপক কোন চিহ্নই নাই। যাহা কিছু বা ছিল ৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাহার অধিকাংশই তোপের মুখে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে কেবল পরিত্যক্ত বারাক শ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখিবার নাই। ইহার অধিকাংশ স্থলই দেখিলাম, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। অযোধ্যার নবাবদিগের রাজ-চিহ্ন (Emblem) একটী মৎস্যের প্রতিকৃতি। এই দুর্গ দ্বার দুইটী প্রকাণ্ড মৎস্যাকৃতি চিহ্ন যুক্ত ছিল বলিয়া ইহার নাম "মচ্ছিভবন" হইয়াছে। ওয়াজিদ্ আলির কৈশর বাগের "লাখী গেটে" ও অযোধ্যার নবাবদিগের অন্যান্য প্রাসাদাংশে এই প্রকার মৎস্য-চিহ্ন আজও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা রাজ্যচ্যুত বর্ত্তমান নবাব ওয়াজিদ্ আলির গার্ডন-রিচের বিলাস ভবন দেখিয়াছেন—তাঁহারা এই কথার যথার্থতা আরও উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মচ্ছিভবন ছাড়া সফদার জঙ্গ গোমতীর উপর সর্ব্বপ্রথমে একটী পুল তৈয়ারি করিয়া দেন—আজও সেই পুলটী বর্ত্তমান আছে।

ক্রমশঃ।

প্লেটো।

আমরা এক্ষণে কার্মিডিজ্ নামক প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই একটী মত এস্থলে বলিতেছি। সাধারণভাষায় আমরা যে সকল কথা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদিগের বাস্তবিক অর্থ আমরা প্রায় বুঝি না। অথচ অনেক বিষয়ে আমরা ঐ সকল কথা প্রয়োগ করি এবং এমন কি তদনুসারে লোককে আবার নিন্দা কিম্বা প্রশংসা করি। পরিমিত স্বভাব এইরূপ একটী কথা—কিরূপ মানসিক অবস্থা হইলে ঐ নাম দেওয়া যাইতে পারে তাহা আমরা ঠিক জানি না; অথচ আমরা সচরাচর বলি অমুকের স্বভাব পরিমিত অতএব সে প্রশংসার পাত্র আর অমুকের স্বভাব তাহা নহে অতএব সে নিন্দার পাত্র। সাধারণে এইরূপে যাহা বিচার করে তাহা অনেক সময় অবিচারে পরিপূর্ণ থাকে, এই নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজে পরীক্ষা করিয়া না দেখিয়া কোন বিষয়ে অন্য লোকের মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে সৎ ব্যক্তিকেও সাধারণে নিন্দা করে আর অসৎ ব্যক্তিকেও প্রশংসা করে—ইহাতে যে সমাজের যারপর নাই ক্ষতি হইয়া থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকৃত সক্রেটিস তাঁহার সময়ের গ্রীকদিগের মধ্যে সাধারণ্যে চলিত কথার অর্থ লইয়া তর্ক উঠাইতেন; তাঁহার শিষ্য প্লেটোও তাঁহার অনুকরণে কথার অর্থ লইয়া কথোপকথন রচনা করিয়া গিয়াছেন। কার্মিডিজ নামক প্রস্তাবে প্লেটো কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, পরিমিত স্বভাব কাহাকে বলে ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন তবে আর উক্ত প্রস্তাবের রচনায় লাভ কি? ইহার উত্তর এই যে সত্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বে উহার অনুসন্ধান করিতে হয়। অজ্ঞানতা রূপ গুহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া জ্ঞানালোকে আসিবার পূর্ব্বে এদিক ওদিকে অন্ধকারে ঘুরিতে হয়; একবার পথ পাইলে আর লোকে এই ঘুরিয়া বেড়ানর কথা মনে রাখে না। কিন্তু একবার কিরূপ করিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল তাহা মনে থাকিলে আর একবার কাজে লাগিতে পারে। অতএব সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে উহা কিরূপে অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা জানা আবশ্যক। এইরূপ অনুসন্ধান করিবার পদ্ধতি দেখাইবার নিমিত্ত গ্রীক পণ্ডিত কয়েকটি প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন, কার্মিডিজ তাহার মধ্যে একটী। এইরূপ প্রস্তাবে যে কেবল অনুসন্ধান করিবার পদ্ধতি জানা যায় তাহা নহে; কার্মিডিজে যেরূপে প্রশ্নোত্তর-ক্রমে তর্ক আছে ঐরূপ তর্ক করিবার ক্ষমতা না থাকিলে কোন একটী আবিষ্কৃত সত্য প্রতিপক্ষের সংশয় হইতে রক্ষা করা কঠিন। সত্য আবিষ্কার করিবার পরেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে আমরা চারিদিক হইতে অবলোকন না করি ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এই নিমিত্ত কোন সত্য অবগত হইলে উহা লইয়া

অন্য লোকের সহিত আলোচনা করিলে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি; এই নিমিত্তই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দুইটী পরস্পরের পরিপোষক। প্লেটোর লিখিত অনুসন্ধানাত্মক প্রস্তাবগুলি পাঠ করিলে সত্য অনুসন্ধান ও সত্য পরীক্ষা এই উভয় প্রকার কার্য্যে করিবার শক্তি জন্মে। কার্মিডিজ্ নামক কথোপকথনে উহার রচয়িতা যে কয়েকটী প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন সে গুলির মধ্যে দুই একটীর সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আবশ্যক হইতেছে। প্রথমতঃ বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

সাধারণতঃ আমরা যে সকল বিজ্ঞান দেখি তাহাদিগের এক একটী সহজে বোধগম্য বিষয় আছে। যেমন অঙ্কের উদ্দেশ্য—স্থান ও সংখ্যা এই দুই বিষয়ের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ; গণিতে সংখ্যার আর জ্যামিতিতে স্থানের প্রকৃতি অলোচিত হয় ইহা সকলেই মানেন। পদার্থ বিদ্যার উদ্দেশ্য পদার্থগত ভিন্ন ভিন্ন বলের (যেমন উত্তাপ, তড়িৎ, আলোক) কার্য্য ও প্রকৃতি নিরূপণ করা; রসায়নের উদ্দেশ্য পদার্থ সমূহের গঠন অর্থাৎ উহারা কি কি বস্তুতে কি কি পরিমাণে এবং কিরূপ নিয়মে গঠিত হয় তাহা অনুসন্ধান করা; জীবন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য উদ্ভিদ ও জন্তু এই উভয় প্রকার জীবের দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়া-গুলি কি প্রকারে কি কি যন্ত্রের সাহায্যে সাধিত হয় ইহা স্থির করা; সামাজিক বিজ্ঞানে সমাজের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি এই কয়টী বিষয় আলোচিত হয়, ইহা ব্যতীত আবার মানসিক বিজ্ঞানে মানসিক ঘটনাবলীর নিয়ম সমূহ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই সকল বিজ্ঞানের কি কি উদ্দেশ্য তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়; কিন্তু বিজ্ঞানের বিজ্ঞান দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে ইহা বুঝিতে পারা তত সহজ নয়। একটী উদাহরণ লওয়া যাউক; সমাজে কেহবা কৃষিকার্য্য করে. কেহবা শিল্প কার্য্য করে, কেহবা সৈনিক কার্য্য করে, কেহবা বিদ্যা অধ্যাপনা করে, ইত্যাদি। ইহাদিগের প্রত্যে-কেরই এক একটী ব্যবসায় আছে এবং এই ব্যবসায় গুলির বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। একের উদ্দেশ্য অপরের উদ্দেশ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বটে, কারণ সমাজ রক্ষার নিমিত্ত উক্ত সমুদয় ব্যবসায়েরই প্রয়োজন। কিন্তু যে ব্যক্তি সূত্রধরের কার্য্য করে তাহার তিল্লীর ব্যবসায়ের কথা লইয়া মাথা না ঘুরাইলেও চলিতে পারে, অর্থাৎ এক ব্যবসায়ের লোকের অন্য ব্যবসায়ের বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া না জানিলেও চলে। যাহা হউক এই সমুদায় ব্যবসায়ীদিগের উপরে এক ব্যক্তি থাকেন যাঁহার সমুদয় ব্যবসায় সম্বন্ধেই কিছু না কিছু জানা চাই। ইঁহার নাম বিধিপ্রণেতা, অর্থাৎ আইনকারক। যে ব্যক্তি সমাজে আইন চালাইতে চাহে তাহার সমুদায় ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য জানা উচিত। নতুবা তাহার আইন সমাজের অপকারের কারণ হইবে এবং সমাজের বিনাশের সহিত উহারও বিনাশ হইবে। ব্যবসায়ের মধ্যে যে রূপ আইন প্রণয়ন ব্যবসায়—বিজ্ঞানের মধ্যেও আবার সেই রূপ বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের বিষয় ও প্রকৃতি অবগত

হইয়া সমুদায় বিজ্ঞানের সাধারণ প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা উক্ত বিজ্ঞানের এক উদ্দেশ্য। যেমন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ দেখিয়া সমুদয় মানুষের সাধারণ গুণ নিরূপণ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ কি কি গুণ থাকিলে কোন একটী বস্তুকে মানুষ বলা যাইতে পারে, সেইরূপ আবার সমুদয় বিজ্ঞানের সাধারণ গুণ কি তাহাতে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জ্ঞান, অতএব বিজ্ঞানের বিজ্ঞানে জ্ঞানের প্রকৃতি কি তাহা নিরূপিত হইবে। আর আমরা কি কি বিষয় জানি ও কি কি বিষয় জানিনা, এবং কি কি বিষয় জানিতে পারি ও কি কি বিষয় জানিতে পারি না ইহাও উক্ত বিজ্ঞানে আলোচিত হইবে। কেহ এস্থলে বলিতে পারেন যে যেসকল বিষয় আমরা জানিনা কিম্বা জানিতে পারিনা সে সকল বিষয়ের চিন্তা আমাদিগের মনে আদৌ কিরূপে উপস্থিত হইবে—যাহা জানিনা তাহা চিন্তাও করিনা। প্রশ্নটী জটিল, সুতরাং বিশেষ করিয়া বুঝিয়া দেখার আবশ্যক। যেসকল বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ মাত্র আমরা অবগত নহি, সেসকল বিষয় অবশ্য আমরা কখনও ভাবিনা; যেমন মানুষের অপেক্ষা যদি কোন উচ্চতর জীব থাকে এবং তাহার কোন নূতন ইন্দ্রিয় থাকে তবে সে উক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিবে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিনা, সুতরাং চিন্তাও করিনা। কিন্তু অনেক সময় আমরা যাহা জানি তাহা হইতেই আবার আমরা যাহা জানিনা তাহার কথা উঠে; উল্লিখিত উদাহরণে আমাদিগের জ্ঞাত ইন্দ্রিয় সমূহ হইতে অজ্ঞাত একটী ইন্দ্রিয়ের কল্পনা করা হইয়াছে। রামকে দেখিয়া রামের ভাই দেখিতে কিরূপ ইহা আমার মনে হইতে পারে এবং তাহা যদি আমি না জানি তবে ইচ্ছা করিলে জানিতে পারি; কিন্তু আমার স্বকীয় প্রকৃতি জানিয়া যখন আবার বহিঃস্থিত প্রস্তর খণ্ডের প্রকৃতি অবগত হইতে ইচ্ছুক হই, তখন আমার ইচ্ছাটী সহজে কার্য্যে পরিণত করিবার যো নাই। এইরূপে দেখা যায় যে কতকগুলি বিষয় আমরা জানি এবং না জানিলেও জানিতে পারি আর কতকগুলি বিষয় আমরা জানি না এবং আপাততঃ বোধ হয় জানিতে পারিও না। বিজ্ঞানের বিজ্ঞান দ্বারা একটী প্রধান কার্য্য এই সাধিত হইতে পারে যে উহা অন্য সমুদয় বিজ্ঞানের নায়ক হইতে পারে। বিজ্ঞানের কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং কিরূপ প্রণালীতে উক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিতে চেষ্টা করা উচিত ইহা অন্য সমুদয় বিজ্ঞান উক্ত বিজ্ঞান হইতেই জানিতে পারে। অদ্যাবধিও বিজ্ঞানের বিজ্ঞান গঠিত হয় নাই, কারণ অদ্যাবধিও এমন মানুষ জন্মে নাই যে সমুদয় বিজ্ঞানগুলি স্বায়ত্ত করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এখানে ওখানে এক আধজন (যেমন কোম্‌ট্‌,মিল,বেন. জেভন্স) লোক দেখা যায় যে উক্ত বিজ্ঞান সংস্থাপন করিতে অন্ততঃ চেষ্টা করিয়াছেন। প্লেটোর পক্ষে ইহা অতি গৌরবের বিষয় যে তিনি অতি পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কোন একটী গুরুতর বিষয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করাই অতি কঠিন, কিন্তু উহা একবার কল্পিত হইলে অন্য লোকে পরে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে। কলম্বসের পূর্ব্বে বর্ত্তমান কালে কেহ আমেরিকার, অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়।

● কার্মিডিজ্ নামক প্রস্তাবে আর একটী বিজ্ঞানের উল্লেখ দেখা যায়—হিতাহিতের বিজ্ঞান। কি কি বস্তু আমাদিগের হিতের আর কি কি বস্তু আমাদিগের অহিতের ইহা জানিতে পারিলে আমরা তদনুসারে কার্য্য করিয়া স্ব স্ব জীবন সার্থক করিতে পারি; কিন্তু হায়! মানুষ এতই ক্ষুদ্রজীব যে এই সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইল তথাপি আমাদিগের কিসে বাস্তবিক হিত হয় আর কিসে অহিত হয় তাহা নির্ণয় হইল না। না বুঝিয়া অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অনেক সময়ে মনে করি বটে যে আমাদিগের গন্তব্য পথ আমরা অবগত আছি, কিন্তু ভাবিতে গেলেই গোলযোগ। কি স্বকীয় ব্যাপার, কি পারিবারিক ব্যাপার, কি সামাজিক ব্যাপার—যে কোন দিকেই চাহিনা কেন সেদিকেই দেখিতে পাই যে যাহা আমি করি তাহা অন্য লোকের অনুকরণে। প্রায় সমুদয় বিষয়েই আমি কোন গূঢ় কারণ না দেখিয়া কেবল অভ্যাস বশে কার্য্য করিয়া থাকি। ইহা একপ্রকার দাসত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহে; তবে আমি উহা সাধারণতঃ জানিতে পাই না কারণ উহা এক্ষণে আমার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সময় সময় বটে আমার মনে এক প্রকার চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন মনে করি এসব যাহা করিতেছি তাহা কেন করি। কিন্তু ওরূপ চিন্তা অধিকক্ষণ মনে স্থান পায় না, সংসারের মোহমায়া, অভ্যাসের অন্ধবল আসিয়া আমায় আবার পূর্ব্ব পথে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে জগতে সার কি, আমাদিগের কিসে হিত হইবে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করা যাইতে পারে। যে বিজ্ঞানে এই মহৎ প্রশ্ন আলোচিত হয় তাহাকে হিতাহিত-বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লোকে এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়াছে—যাহাকে দর্শন বলা যায়, তাহার চরম ফল এই প্রশ্নের মীমাংসা। ভিন্ন ভিন্ন সময় ও দেশের দর্শন শাস্ত্র অবগত থাকিলে ঐ সকল সময় ও দেশের সভ্যতার ইতিহাস অবগত হইতে পারা যায়; অতএব সাধারণ লোকের নিকট দর্শনের ইতিহাস নীরস বোধ হইলেও প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে উহা মনোমুগ্ধকর বস্তু। দুঃখের বিষয় আমাদিগের এই 'পয়ার' ও উপন্যাস প্লাবিত দেশে এক্ষণে এ সকল গুরুতর বিষয়ের আদর নাই—এমন কি লোকে বিজ্ঞান ও দর্শনের নাম শুনিলেই শশব্যস্ত হইয়া পড়ে; ইহা কেবল মনোবৃত্তি সমূহের নিস্তেজতার চিহ্ন ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহা হউক, আশা করা যায় ক্রমে ক্রমে আমাদিগের এই দুরবস্থার অবসান হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান অদ্যাবধিও গঠিত হয় নাই; হিতাহিত-বিজ্ঞানের অবস্থাও তথৈবচ। ফলতঃ এ সকল বিষয়ে চিন্তা করিবার লোক অতি অল্পই আছে; ইহার কারণ, সাধারণ্যে এ সকল বিষয়ের আলোচনার তত আদর নাই। যাঁহারা তৎসত্ত্বেও এ গুলির সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিপক্ষে অন্ধ বিশ্বাসের দাসগণ আসিয়া সাধ্যমত ব্যাঘাত জন্মাইতে ত্রুটী করে নাই। সংসারের উন্নতির নিমিত্ত পণ্ডিতগণের সময় সময় কি দুঃসহ জ্বালা

যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা যাঁহারা এ বিষয়ে কিছু মাত্র অবগত আছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। বিজ্ঞানেব বিজ্ঞান ও হিতাহিত-বিজ্ঞান এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? আমাদিগের আলোচ্য কথোপকথনে প্লেটো দ্বিতীয় বিজ্ঞানের স্বপক্ষে মত দিয়াছেন; আমাদিগেরও এস্থলে তাঁহার সহিত মতের ঐক্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হইল, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান আসিয়া উহাদিগের সাধারণ প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া উহাদিগের নায়ক হইল, কিন্তু হিতাহিত-বিজ্ঞান এই নায়কের প্রধান মন্ত্রী; ইহার উপদেশ ভিন্ন নায়ক কোন কার্য্যের আদেশ করিতে পারেন না। সূক্ষ্মতঃ অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে হিতাহিত-বিজ্ঞান যেখানে একটী বিশেষ বিজ্ঞান মাত্র সেখানে অন্যান্য বিশেষ বিজ্ঞানের সহিত উহারও প্রকৃতি বিজ্ঞানের-বিজ্ঞান দ্বারা আলোচিত হইবে এবং এই শেষোক্ত বিজ্ঞান দ্বারা উহার কার্য্য পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু যখনই আমরা জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিব, যখনই জিজ্ঞাসা করিব এ কার্য্য করিলে ভাল হইবে কি না তখনই আমাদিগের হিতাহিত-বিজ্ঞানের শরণ লইতে হইবে। ফলতঃ চিন্তাক্ষেত্রে যেরূপ বিজ্ঞানের-বিজ্ঞান প্রধান, কার্য্যক্ষেত্রে সেইরূপ হিতাহিত-বিজ্ঞান প্রধান। এই অর্থেই প্লেটো বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান আমাদিগের পক্ষে উপকারী বস্তু নহে; অর্থাৎ হিতাহিত-বিজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান মানুষকে সুখী রাখিতে পারে না। মানুষ শুদ্ধ চিন্তাশীল বস্তু নহে; মানুষের প্রকৃতিতে অনেক গুলি কার্য্যোদ্দীপক বৃত্তি আছে; হিতাহিত-বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুতে এই বৃত্তি গুলিকে সৎপথে চালাইতে পারে না।

এক্ষণে দেখ এক সামান্য পরিমিত-স্বভাব এই বিষয়টী লইয়া প্লেটো কতগুলি গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন; সত্য বটে অনেক বিষয় তিনি কেবল মাত্র উত্থাপনই করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট উপকার আছে; একজনে যাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাষ পাইয়াছে আর একজন পরে তাহার পূর্ণমূর্ত্তি দেখিয়া জগজ্জনকে তাহা দেখায়। মোজেজ্‌ যদি ইহুদিগণকে তাহাদিগের ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত সুখময় দেশের অভিমুখে লইয়া না যাইতেন তাহা হইলে তাহারা কখনই সেখানে পৌছিতে পারিত না, অথচ মোজেজের ভাগ্যে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে দূরে সেই দেশের আভাষ পাওয়া মাত্র অন্য কিছু ঘটে নাই। বৈজ্ঞানিক জগতে এইরূপ এক একজন মোজেজ্‌ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়েন; ইঁহারা অতি পশ্চাৎ অবধি—সম্মুখে অতি দূর পর্য্যন্ত সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত করেন তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী লোকেরা সেই সিদ্ধান্তের আলোকে স্বস্ব অনুসন্ধেয় বিষয়ে পদক্ষেপ করিয়া থাকে।

আমরা এস্থলে কার্মিডিজ্‌ প্রস্তাবের দুই একটী মুখ্য বিষয়ের টীকা করিয়াছি; পাঠক দেখিতে পাইবেন যে প্লেটোর যুক্তি সকল স্থলে ঠিক নহে। যেমন তিনি যেখানে হোমরের নিদর্শনে লজ্জাশীলতা সকলসময় সৎবস্তু নহে ইহা প্রমাণ করিতে

উদ্যত হইয়াছেন সেখানে তাঁহার যুক্তি বাস্তবিক কোন যুক্তিই নহে। হোমর বলেন ক্ষুধার্ত্তের পক্ষে লজ্জাশীলতা উত্তম নহে—ইহার অর্থ এই যে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি লজ্জা করিয়া নীরব থাকিলে তাহার ক্ষতি হইবে। হোমরের অবশ্য এরূপ অর্থ নহে যে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি সলজ্জ ভাব ছাড়িয়া নির্লজ্জ হউক; সলজ্জ হওয়া আর লজ্জায় নীরব থাকা এক বিষয় নহে।

অবশেষে আর একটী কথা বলিতে হইতেছে; কোন কোন ব্যক্তির মতে 'কার্ম্মিডিজ্' রচনাটী প্লেটোর নহে; তাঁহার অনুকরণে অপর কেহ লিখিয়াছে। কিন্তু গ্রোট ও জাউয়েট উভয়েই উহা প্লেটোর রচনাবলীর অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

যে যাবে সে যাক্‌।

পূরবী, আড়াঠেকা।

যে যাবে সে যাক, দেখো, না যেন সে যায় খালি।
নিজে যাক্, নিয়ে যাক যে তাহার ছিল কালি!
বসন্ত ত গেলো যেন,
এত পাতা প'ড়ে কেন?
প্রেম যাক, প্রাণ যাক; স্রোত যাক্ নিয়ে বালি।
মিছে বরষার শেষে,
কে রবে শরত-বেশে,
লক্ষ্য-হারা মেঘ মত আকাশ-তলে!—
অতিথী যাইতে চায়,
কে ধ'রে রাখিবে তায়!
কেননা নিবায়ে যাবে, গেছে যে অনল জ্বালি?
প্রেম গেলে, স্মৃতি ল'য়ে
কে বাঁচিবে স'য়ে স'য়ে—
আকাশের পানে চেয়ে সজল চোখে?—
হেথা নাম, হোথা চিঠি,
হেথা-হোথা উটি-ইটি,
হেথা হাসি, হোথা দিঠি, সেথা ফুল-মালা ডালি!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

অন্ধকার নিশীথে।

(১)

তরুশিরে জ্বলিছে জোনাকি,
জ্বলিছে নিভিছে থাকি থাকি,
সংসারের মানুষের পারা,
হেসে কেঁদে হেসে কেঁদে সারা।
স্বয়ম্ভূর আরাধনে ভোর
যোগরতা প্রকৃতি সুন্দরী,
নিরমাল্য ভাসাইয়াছিলা
সময়ের প্রবাহ উপরি;
সেই সব তারকার ফুল,
দিবালোকে মুদিয়া রহিয়া,
নিশার পরশ পেয়ে মৃদু,
নীলাম্বরে ফুটিছে হাসিয়া।
ঝিল্লিরবে আঁধার যামিনী,
ঘুম পাড়ানিয়া গান গায়,
অবসাদে ঢালিয়া শরীর,
সেই তানে জগৎ ঘুমায়।
নিরিবিলি ঘুমায় বাতাস,
তরুশিরে শয়ন রচিয়া;
মাঝে মাঝে উঠিছে শিহরি,
কি যেন রে স্বপন দেখিয়া।

(২)

বুকের ভিতর আলগোছে,
ঘুমা তুই মনটী আমার,
তুই হায় কেন গো জাগিয়া,
তোর কেন এ দীন আকার?
কি যেন রে হারাইয়া গেছে,
কি যেন কি খুঁজিয়া না পা'স্!
একটী গো অভাবের মত,
শুধু শুধু মুখ তুলি চাস!
মধ্যাহ্নের নিঝুম কাননে,
নিঝুম সে উদার বিমানে,
একেলাটী দিশা হারাইয়া,
ফেরে যথা ব্যাকুল হইয়া,
উদাস সে কপোতের রব,
উপেক্ষিয়া মরত বিভব;
কত যেন অফুট ভাষায়—
প্রাণের রাগিণী কহি হায়;
ঘুমন্ত এ প্রকৃতির বুকে
নীরব এ স্তব্ধতার মুখে,
তুই ও তেমনি দিশাহারা
সে রাগিণী আলাপিয়া সারা।
অই দেখ্ ঘুমন্ত সরসী,
তারকার দেখিছে স্বপন,
তুই কেন তটদেশে বসি,
শুধুই করিবি জাগরণ?

(৩)

স্মিরিতির গোরস্থানে বসি,
অতীতের সমাধি উপরে,
সায়াহ্নের পবনের মত,
ফেলিস্ নিশাস্ অকাতরে?
সুখ ত চলিয়ে গেছে কবে,
দুখ সেও গেছে কি ছাড়িয়া?
বিষণ্ণ নয়ন মেলি তাই,
এক দৃষ্টে আছ নেহারিয়া?
পরাণের বিজনেতে বসি,
ওকি মন্ত্র জপিছ সদাই?
কি কাহিনী কহ অনিবার
আমি ত তা বুঝিয়া না পাই।
কি তোর হারিয়ে গেছে বল্
কারে তুই না প্যা'স্ খুঁজিয়া?
একটী গো হাহাকার পারা,
তাই শুধু আছিস্ চাহিয়া।

হিন্দু আর্য্য কি না ?

আত্মাভিমান খর্ব্ব করিয়া আমরা অনেকেই কোন একটা বিষয় ভাবিতে পারি না। সেটা দোষ। স্থির ভাবে একটা কথার কি অর্থ, তাহার অন্য অর্থ সম্ভব কি না, অন্য লোকে অন্য ভাবে তাহা ব্যবহার করে কি না এতটা না ভাবিলে সে কথাটা কি তাহা ঠিক বোঝা যায় না। আমাদের আজ কাল ভাবিবারও সময় কম হইয়া আসিতেছে। খানিকটা যন্ত্রের মত ঠিক যে টুকু ধরা বাঁধা আছে তাহা ছাড়া আমাদিগের আর কিছু করিবার শক্তি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু সেই জন্যেই নিজে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে যাঁহারা অনেক পরিশ্রম করিয়া সেই বিষয় কিছু মীমাংসা করিয়াছেন তাঁহারা কি বলেন তাহা আমাদিগের শোনা উচিত।

হিন্দু আর্য্য কি না ? এই প্রশ্নটির উত্তর যত সহজ হঠাৎ মনে হয় ততদূর সহজ নহে। এমন কি আজ কাল অনেক ইউরোপীয় মহা পণ্ডিতেরা প্রশ্নটির ঠিক উত্তর দিতে চাহেন না। দুই একজন বলেন হিন্দু আর্য্য নহে। আমরা যে নিতান্তই দুই এক কথায় তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি তাহাও নহে। তবে যদি আজ কালকার কথা অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয়েরা মূর্খ, তাহাদিগের বিজ্ঞান মিথ্যা, এইরূপ দুই চারিটি "স্বতঃসিদ্ধ" দ্বারা প্রশ্নটির উত্তর দিতে বসি তাহা হইলে কোন গোলই থাকে না। কিন্তু আমাদিগের আপনার মধ্যে প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়া দেখা যাক প্রশ্নটির উত্তর সহজ কি না ?

হিন্দু কাহাকে বলেন ?

"হিন্দু" কথাটি নিতান্ত অনার্য্য, নিতান্ত যাবনিক। আমরা "হিন্দু," আমাদিগের মত জগতে আর কেহ নাই, আমরা অদ্বিতীয়, শুনিলে কাহার হৃদয় না পুলকিত হয়। দম্ভে মাটিতে পা ঠেকে না। কিন্তু আমাদের এত গৌরবের "হিন্দু" নাম—জগতে যে নামের জোরে আমরা সহজে সকলকে উপেক্ষা করি, সেই নাম ম্লেচ্ছ প্রদত্ত। দুই একখানি খৃষ্টিয়ান পুস্তকে "হিন্দু" অর্থে "কালা আদ্মি" এবং "স্থান," অর্থাৎ "কালা আদ্মির মুলুক" কে হিন্দু স্থান বলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল খৃষ্টিয়ান রাজা শ্বেত চর্ম্ম, আর আমরা কালা আদ্মি সব দাস, অতএব "হিন্দু স্থানের" এরূপ যে অর্থ হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ভুল অর্থটির একটা গূঢ় কারণও আছে। সে কারণটি কি তাহা এদেশের একজন আজকালকার বড় লোকের মুখে প্রথম শুনি। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাহাকে আমি বলি যে ইংরাজেরা আমাদিগের দেশের বিষয় কিছুই জানে না বলিলেও চলে এবং উদাহরণ স্বরূপ উপরোক্ত খৃষ্টিয়ান পুস্তকে "হিন্দুস্থানের" কি অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহা বলি। তিনি আমাকে নির্লজ্জ ভাবে বলিলেন "ভুল কেন ? হিন্দু আরব দেশের কথা, তাহার অর্থ কাল"। আমি বলিলাম

যে তাহা হইতে পারে,কিন্তু হিন্দুস্থানের হিন্দু যে আরব হিন্দু "তাহার প্রমাণ কি।" তাহাতে তিনি তাঁহার পিতামহের আমলের একজন মৌলবীর দোহাই দিলেন। আমরা তখন দুজনেই বিদেশে। মৌলবীকে সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়া আনিতে পারি না। তাই একটা তর্ক উপস্থিত হইল। আমার প্রশ্নগুলির উত্তর তাঁহার নিকট পাই নাই।

১। "হিন্দুস্থান" যদি আরব "হিন্দ" এবং "স্থান" হয় তাহা হইলে হিন্দুর উ কোথা হইতে আসে?

২। "হিন্দ" আরব কথা, "স্থান" সংস্কৃত এবং আর্য্য কথা—এই দুইটির মিল হইল কেমন করিয়া?

৩। আরবরা "হিন্দু" কে "কালা আদ্‌মি" কেন বলিবে আরবরাও নিতান্ত "কালা আদ্‌মি"।

৪। গ্রীক্ ইতিহাস লেখকেরা "হিন্দু" কথাটি পারস্য দেশের লোকদিগের নিকট হইতে পাইয়াছেন। তাঁহারা যে "আরব" দিগের নিকট হইতে পাইয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ আছে কি?

৫। "হিন্দু" "সিন্ধু" কথার অপভ্রংশ। ঢাকা অঞ্চলের লোকের মত পারস্যদেশীয়গণ "স" স্থানে "হ" উচ্চারণ করেন। তাঁহারাও আর্য্য, তাঁহাদিগের ভাষাও আর্য্য অতএব "হিন্দু স্থান" অর্থে "সিন্ধু তীরবর্ত্তী" আর্য্যদিগের আবাস ভূমি বুঝাইত। কালে সমস্ত ভারতবর্ষের সেই নাম হওয়া আশ্চর্য্য কি?

৬। সপ্ত সিন্ধুর কুলে যাহারা বাস করিত তাহারা যে হিন্দু সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে কি?

শেষ প্রশ্নটির উত্তর সহজ, কিন্তু সেই সপ্তসিন্ধুবাসীরা আর্য্য কি না তাহা অন্য কথা। একটু মন দিয়া প্রশ্ন গুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে জাতি সম্বন্ধে হিন্দু-দিগের বিষয় কিছুই বলা হয় নাই, শুদ্ধ মাত্র ভাষার প্রমাণ দ্বারা হিন্দু কথাটি আর্য্য-বংশের, স্থান কথাটিও আর্য্য ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুস্থানবাসীরা আর্য্য কি না তাহা অন্য কথা। হিন্দুরা কি বিশেষ কোন একটি জাতি, না বিশেষ একটি ধর্ম্মা-বলম্বী?

আজ কাল হিন্দু বলিলে হিন্দু ধর্ম্মেরই কথা মনে পড়ে। কেহই বোধ হয় বলিবেন না যে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীরা একটি কোন স্বতন্ত্র জাতি। যেমন মুসলমান, যেমন খৃষ্টিয়ান তেমনি হিন্দু আর্য্য, অনার্য্য অনেক জাতিরই আখ্যা। তবে একটা প্রভেদ আছে। হিন্দুধর্ম্ম যে সে জাতি গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা অন্য জাতিকে আমাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করি নাই। যাহারা আপন ইচ্ছায়, বাগ্দী প্রভৃতি জাতির মত—আমাদিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করে এবং কালে সেই সকল সামাজিক

নিয়মে চলে তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে অনেক অসবর্ণ জাতিও আমাদিগের মত হিন্দু বলিয়া আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতিদিগের বিবাহ পদ্ধতি প্রায়ই এক। নিজের নিজের সমাজের মধ্যে বিবাহ প্রথা থাকার দরুণ তাহারা কতকটা অমিশ্রিত আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে হিন্দু কথাটি বলিবা মাত্র প্রথমতঃ, হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্ম, দ্বিতীয়তঃ হিন্দু জাতিকে বুঝায়। যদি আমরা—হিন্দু আর্য্য কিঁ না—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের কথা মন হইতে অপসৃত করিতে হইবে, কেবল মাত্র অমিশ্রিত জাতির সম্প্রদায় কতিপয়ের কথা আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু এই আলোচনা নিতান্তই সহজ নহে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থে অনেক প্রভেদ। বিশেষ বাঙ্গলায়, অনেকস্থানে কায়স্থ অর্থে কৈবর্ত্ত প্রভৃতিকে বুঝায়। দক্ষিণ অঞ্চলের কায়স্থরা উত্তরীয় কায়স্থদিগকে কায়স্থ বলিয়া অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র কিংবা রাঢ়ীই হউক না কেন, উভয়েই ব্রাহ্মণ, ইহার বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব হিন্দু আর্য্যকে এই কথার মীমাংসা করিতে হইলে ব্রাহ্মণ আর্য্য কি না এই মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। আমি ইহাই দেখাইতে চাই যে এই প্রশ্ন-টির দুই এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় না। ইহার উত্তর দিতে হইলে আর্য্য জাতির আদিম ইতিহাস কিছু জানা আবশ্যক। সেই ইতিহাস জানা বড় কঠিন। বিবিধ ভাষার বিবিধ গ্রন্থ পড়িতে হইবে, বিবিধ দেশের বৃত্তান্ত জানিতে হইবে, সমগ্র মানব-জাতির শারীরিক চিহ্ন গুলি আলোচনা করিতে হইবে। তাহার পর প্রশ্নটির উত্তর সম্ভব। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অনেকেরই ইহা জ্ঞান নাই। কোন একজন বিশেষ লোকের পক্ষে এতটা জ্ঞান অসম্ভব। অতএব প্রবন্ধের প্রথমেই আমাকে পাঠককে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কথা মানিতে বলিতে হইবে। ইহা দুঃখের বিষয়, কিন্তু লেখক তাহার জন্য অপরাধী নহে। আমাদিগের দেশের পণ্ডিতদিগের কথা যদি বলিতে পারিতাম তাহা হইলে সুখের বিষয় হইত। আমরা প্রায় কোন কথাই তলাইয়া বুঝিতে শিক্ষা করি নাই। আমাদিগের কথার কি কোন মূল্য আছে?

আর্য্য কে?

আধুনিক সংস্কৃতে "আর্য্য" "পূজ্য" ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাহার যে অন্য অর্থ ছিল তাহা "আর্য্যাবর্ত্ত" "আর্য্যভূমি" "আর্য্যদেশ" প্রভৃতি শব্দ হইতে প্রমাণ হয়। ঋগ্বেদে "আর্য্য" খানিকটা জাতির অর্থে ব্যবহৃত হয় দেখিতে পাওয়া যায়। "আর্য্য" এবং "দস্যু" অর্থাৎ "আর্য্য" এবং "অনার্য্য" এই ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ অনুমান হয়।

"বি জানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো" (ঋক্ ১ম, ৫১সূ, ৮।)

কাহারা "আর্য্য" এবং কাহারা "দস্যু" তাহা অবগত হও।

পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যএই তিন সম্প্রদায় আর্য্য বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। অথর্ব্ব-

বেদে আর্য্য এবং শূদ্র আর্য্য এবং অনার্য্য, অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির দরুণ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আর্য্য কথার যথার্থ অর্থ কি তাহা এখনও স্থির হয় নাই। নানা-মুনির নানা মত। অন্য প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রী আশুতোষ চৌধুরী।

তারকা-জ্যোতি।

মেঘ শূন্য অন্ধকার রাত্রে কনক-তারা খচিত আকাশের দিকে চাহিয়া কাহার হৃদয় না স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, কাহার না মনে হয়—অসীম আকাশের এই অসংখ্য তারকা-রাশি গণনা করিয়া নির্ণয় করা মনুষ্যের অসাধ্য। কিন্তু বিজ্ঞান এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ এই অসংখ্য তারকাকে সংখ্যাবদ্ধ করিয়াছেন। আকাশের দিকে চাহিয়া যাহা আমাদের অসংখ্য মনে হয়—তাঁহাদের গণনায় তাহা অতি সামান্য-সংখ্যক বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। আমরা খালি-চোখে যত তারকা দেখিতে পাই—তাহা অনুমান ছয় হাজার। এই ছয় হাজারের অর্দ্ধেক—অনুমান তিন হাজার মাত্র আমরা এক সময়ে দেখিতে পাই, কেননা আকাশ গোলকের অর্দ্ধেক মাত্র এক সময়ে আমাদের নেত্র পথে পড়ে, অপরার্দ্ধ আমাদের পদতলে থাকে। কিন্তু দূরবীক্ষণ দ্বারা ইহার বহুগুণ তারকা দেখিতে পাওয়া যায়। হার্শেলের ২০ ফুট দূরবীন দিয়া হার্শেল ও ষ্ট্রাব ২,০০,০০,০০০ দুই শত লক্ষ তারা গণনা করিয়াছিলেন। আধুনিক কালের বৃহৎ দূরবীক্ষণ দ্বারা যে তদপেক্ষা বহু সংখ্যক তারকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এই দূরবীক্ষণ-তারকার সংখ্যা এখনো নির্দ্ধারিতরূপে সংখ্যাবদ্ধ হয় নাই—ইহারা ৩,০০,০০,০০০ হইতে ৫,০০,০০,০০০, এরূপ অনুমিত হইয়া থাকে। দূরবীক্ষণ দিয়া যে সকল তারকা দেখা যায়—তাহাদিগকে দূরবীক্ষণ-তারকা বলা যায়।

জ্যোতির্ব্বিদগণ এইরূপে কেবল তারকার সংখ্যা গণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের পরস্পরের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য স্থির করিয়াছেন।

আকাশের দিকে চাহিলেই দেখা যায় কোন কোন তারা কেমন উজ্জ্বল, কোন কোন তারা নিতান্ত মিট মিটে, এমন কি ঔজ্জ্বল্যে কোনটির সহিত কোনটিরই প্রায় মিল দেখা যায় না। ঔজ্জ্বল্যের এইরূপ তারতম্যানুসারে তারকাগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। আমরা খালি চোখে যে সকল তারকা দেখিতে পাই তাহারা এইরূপে

ছয় শ্রেণীভুক্ত। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দেখিতে তাহারা প্রথম শ্রেণীর, এবং যাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অস্পষ্ট দেখা যায় তাহারা ষষ্ঠ শ্রেণীর-তারা নামে কথিত।

ষষ্ঠ শ্রেণীর তারকা অপেক্ষা অন্য শ্রেণীর তারকাদিগের ঔজ্জ্বল্য পরিমাণ কত গুণ করিয়া অধিক তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় বুঝা যাইবে।

ষষ্ঠ শ্রেণীর অপেক্ষা	ঔজ্জ্বল্য-পরিমাণ কত গুণ অধিক
পঞ্চ শ্রেণীর একটি তারকার	২ গুণ
চতুর্থ শ্রেণীর	৬ গুণ
তৃতীয় শ্রেণীর	১২ গুণ
দ্বিতীয় শ্রেণীর	২৫ গুণ
প্রথম শ্রেণীর	১০০ গুণ
সিরিয়াস নক্ষত্র-প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারকা	৩২৪ গুণ
সূর্য্য—সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী তারকা	৬,৪৮০,০০০০০০০০০ গুণ

উত্তর মেরু হইতে বিষুবরেখার ৩৫ ডিগ্রি দক্ষিণাকাশ পর্য্যন্ত উল্লিখিত কয় শ্রেণীর কত তারকা দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম শ্রেণীর	...	...	অনুমান ১৪
দ্বিতীয় শ্রেণীর	...	...	৪৮
তৃতীয় শ্রেণীর	...	...	১৫২
চতুর্থ শ্রেণীর	...	.	৩১৩
পঞ্চম শ্রেণীর	...	...	৮৫৪
ষষ্ঠ শ্রেণীর	...	...	২০১০
			মোট ৩৩৯১

উল্লিখিত তারকাগুলি ত খালি চোখেই দেখিতে পাওয়া যায়, আর যে ২০০ লক্ষ দুর-বীক্ষণ তারকার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে—উজ্জ্বলতায় তাহারা চতুর্দ্দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। অধিকতর ক্ষমতাশালী দুরবীন দ্বারা আরো নিম্নতর শ্রেণীর তারকা দেখা যায়।

তারকাদিগের এই যে ঔজ্জ্বল্য-বৈষম্য ইহার এই কয়রূপ কারণ হইতে পারে।

প্রথম। উহারা একই আয়তনের কিন্তু উহাদের দূরত্ব এক নহে। যে তারা পৃথিবী হইতে যত দূরে—তাহাই আমাদের নিকট তত অস্পষ্ট।

দ্বিতীয়। দূরত্ব সমান, কিন্তু আয়তনে কেহ ছোট—কেহ বড়—সেই হেতু যে যত ছোট—সেই তত অস্পষ্ট।

তৃতীয়। আয়তনও ভিন্ন, দূরত্বও ভিন্ন।

যে স্থলে তারকাদিগের দূরত্ব ঠিক নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়, সেস্থলে এই ঔজ্জ্বল্য বৈষম্যের কারণ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে কোনই গোল বাধে না। কিন্তু যেহেতু সকল স্থলে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না—সেই হেতু এবং অপরাপর কারণে জ্যোতির্ব্বিদ-গণ ইহাই সম্ভবপর বলিয়া স্থির করিয়াছেন যে,আয়তনাধিক্য বশতঃ তারকাদিগের ঔজ্জ্বল্যের বড় বিশেষ তারতম্য হয় না, দূরত্ব অনুসারেই ইহাদের ঔজ্জ্বল্য বৈষম্য ঘটিয়া থাকে।

তারকাদিগের দূরত্ব এতই অধিক যে ক্রোশ হিসাবে উহাদের দূরত্ব গণনা করিলে বাস্তবিক পক্ষে উহাদের দূরত্ব কিছুই ধারণা হয় না—সেই জন্য জ্যোতি-র্ব্বিদগণ আলোকের গতি ধরিয়া নক্ষত্রদিগের দূরত্ব গণনা করেন। আলোক এক সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল ভ্রমণ করে, অন্য কথায় পেণ্ডুলাম একবার দুলিতে যত সময় লাগে আলোক তাহার মধ্যে পৃথিবীর আট গুণ পরিধি বিশিষ্ট স্থান ভ্রমণ করিয়া আসে। নক্ষত্রগণ প্রভূত দূরে অবস্থিত হইলেও এই আলোক গতির গণনার সাহায্যে কতক গুলির দূরত্ব সুনিশ্চিৎ হইয়াছে।

সূর্য্য ছাড়িয়া—যে তারকা সূর্য্যের পরেই আমাদের অব্যবহিত নিকটে—তাহার আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে সাড়ে তিন বৎসর লাগে। এইরূপ গণনার দ্বারা দেখা যায়—গড়ে প্রথম শ্রেণীর তারকার আলোক ১৫॥ বৎসরে—দ্বিতীয় শ্রেণীর ২৮ বৎসরে, তৃতীয় শ্রেণীর ৪৩ বৎসরে, এইরূপে দ্বাদশ শ্রেণীর তারকালোক ৩৫০০ বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছে।

এই নক্ষত্র রাশির মধ্যে একটি মৃদু জ্যোতিঃশালী সুবিস্তৃত আলোক রেখা আকাশ গোলককে সমভাবে ভাগ করিয়া তাহার কটিবন্ধ স্বরূপ স্থিত—দেখা যায়। ইহাই ছায়া পথ। ছায়াপথ এত ঘন সংলগ্ন নক্ষত্র রাশি নির্ম্মিত যে, দূরবীক্ষণ ব্যতীত মানব চক্ষুতে ইহার যথার্থ প্রকৃতি প্রকাশিত হয় না।

আমরা বড় বড় তারকাদিগকে আকাশের এখানে একটি ওখানে একটি ছত্রভঙ্গরূপে বিচরণ করিতে দেখি—আর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাদিগের দ্বারাই আকাশ পূর্ণ দেখিতে পাই, ছায়াপথের সন্নিকটেই ক্রমশঃ সেই সকল তারকারাজির সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে দুই শত লক্ষ দূরবীণ তারকার কথা বলা হইয়াছে—অন্ততঃ তাহার ১৮০ লক্ষ ছায়াপথে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত।

তারকাদিগের দূরত্ব এবং ছায়া পথের এই ঘনসান্নবেশ তারকামণ্ডলা হইতে জ্যোতি-র্ব্বিদগণ বিশ্বাকাশের (Universe) আকারের গঠন নিরূপন করিয়া থাকেন।

তাঁহারা বলেন আকাশের যেদিকে তারকা রাশিকে নিতান্ত অস্পষ্ট এবং ঘন সন্নিবিষ্ট রূপে বিরাজিত দেখা যায়,সেই দিকেই যে বিশ্বাকাশ অধিকতর প্রসারিত—তাঁহা প্রত্যক্ষ। কারণ—সেই একইদিকে তাহারা দূরে দূরে একটির উপর একটি অসংখ্য পরিমাণে অনন্ত দূর পর্য্যন্ত অবস্থিত বলিয়াই তাঁহাদের এরূপ অস্পষ্ট এবং ঘন সংলগ্ন মনে হয়। ইহার অন্য কোন কারণ নাই। আমাদের সূর্য্য তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তারাটি হইতে যত দূরে, বাস্তবিক পক্ষে তাহারা একটি হইতে আর একটি অন্তত তত দূরে। ছায়াপথ হইতে যতই অন্যদিকে যাওয়া যায়, ততই নক্ষত্রের স্বল্পতা দেখা যায় সুতরাং ছায়া পথ-অভিমুখের বিশ্বাকাশ অপেক্ষা অপরদিক যে স্বল্প প্রসারিত,তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

মিলন ও বিরহ।

মিলন।

মিলন মিলন কতবারই বলি,
কইরে মিলন কই ?
মিলন চাহিতে বিরহ সায়রে
ডোঁব ডোব তরী সই।
ভাসা ভাসা নদী—আশা ভরা তরী
বেয়ে চলি ধীরি ধীরি,—
অনন্তের কূলে মধুর মিলনে
যদি রে মিশিতে পারি।

লইয়া বিদায় সবে চলে যায়,
দেখা না হইতে শেষ।
বুঝি—তাই ভয়ে মরি, যাই সরি সরি,
করিতে প্রাণে প্রবেশ।
লাগে যদি বোঝা, ফেলে যেয়ো সোজা,
গিয়াছে ফেলিয়া সবে।
একা আসিয়াছি, যাব চলে একা,
ভেসে ভেসে ভবার্ণবে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বিরহ।

অধরে মোহন হাসি
নয়নে অমৃত ভাসে,—
বিরহে জাগাতে শুধু
মিলন পরাণে আসে।
সুখের প্রভাত আশে
বিরহ চমকি চায়,—
হৃদয়ে আশার আলো
নয়নে আঁধার ভায়!
কইরে মিলন কোথা ?
সে কি হেথা আছে আর!
রাখিয়ে গিয়েছে শুধু
গরল পরশ তার।

তাপটুকু রেখে গেছে
প্রভাতের আলো নিয়ে।
হাসি যত নিয়ে গেছে
অশ্রু জল গেছে দিয়ে।
সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে
নিয়ে গেছে সন্ধ্যা তারা।
আঁধার পড়িয়ে আছে
সুষমা হইয়া হারা।
ফুলটি সে নিয়ে গেছে,
ফেলে গেছে কাঁটা দুটি!
বিরহ কাঁদিয়ে সারা,
নয়ন মেলিয়ে উঠি।

শ্রী——দেবী।

সমালোচনা।

মা ও ছেলে। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

আজকাল হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি—যেরূপ প্রণালীতে শিশু পালনের শিক্ষা দেন, লেখক গল্পচ্ছলে এই পুস্তকে তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। পুস্তকখানি বড়ই ভাল হইয়াছে। এতদিন এরূপ পুস্তকের আমাদের নিতান্তই অভাব ছিল। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এ পুস্তক রাখা উচিত।

আত্ম চিন্তা। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সদুপদেশ পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে পূর্ণ। প্রসঙ্গগুলি সবই সুখপাঠ্য।

রৈবতক। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। এই পুস্তকখানি মহাভারতের সুভদ্রা হরণ অলবম্বন করিয়া রচিত। বলিতে কষ্ট হইতেছে গ্রন্থকার 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রণয়ণ করিয়া যে যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন, সমালোচ্য পুস্তকখানি তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিক কোন বিষয় লইয়া লিখিতে হইলে—তাহা কাব্যই হউক, আর নাটকই হউক, প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের মূল চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কিন্তু উপস্থিত কাব্যে তাহার নিতান্তই ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। আমরা ভগবদ্গীতার কৃষ্ণে যাহা দেখিয়াছি নবীন বাবুর কৃষ্ণে তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না, এমন কি, রৈবতকের শ্রীকৃষ্ণে সামান্যতঃ যে একটু গাম্ভীর্য্য—তাহাও নাই। প্রমাণার্থ প্রথমেই আমরা সত্যভামার সখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন উদ্ধৃত করিতেছি।

কৃষ্ণ। "গালি দিস বিষ মুখী, টানি বজ্র জিহ্বা তোর,
সাজাইব অনার্য্যের কালী।
সখী। 'বোকা পুরুষের বুকে, নাচি তবে মন সুখে,
রণ রঙ্গে দিয়া করতালি॥

অন্যত্র সত্যভামার মানভঞ্জনে কৃষ্ণকে অশক্ত দেখিয়া সুলোচনা সখী বলিতেছেন—

"যাদুমণি যদি পার, রৈবতক শৃঙ্গ নাড়,
তবু এ মানের ঢেঁকী নারিবে নাড়িতে।
কেবল এ সুলোচনা, ল্যাজে চড়ি ধান-ভাণা,
এই প্রেম যন্ত্র তব পারে নাচাইতে।

তাহার পর সখীর এইরূপ রহস্যে দুর্জ্জয়মানিনী সত্যভামা সাধের মানে ভঙ্গ দিয়া উঠিয়া—

'পোড়ামুখী আমি ঢেঁকী, ঘাড়ে কত রক্ত দেখি,
বলি বাঘিনীর মত এক লম্ফে রাণী,
ধরিলা, কেশের রাশ, ছিঁড়িল কেশের পাশ,
ইত্যাদি।

আর একটী নমুনা দিতেছি, এটী সিন্ধুতীর হইতে প্রভাত সূর্য্যের উত্থান বর্ণনা।

"সুনীল লহরী সনে নাচিয়া নাচিয়া,
গ্রীবামাত্র পরশিয়া সমুদ্র সলিল।
মিশাইল গ্রীবা, দেখ একলম্ফে রবি
উঠিলেন নীলাকাশে ঝলসি নয়ন"

কাব্য ত দেখিতেছি মহাভারত লইয়া—কিন্তু ইহাতে কথায় কথায় রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা

কাণ্ডের উপযোগী এত 'লম্ফ' কেন? ইহা নিতান্তই রুচিবিরুদ্ধ, এরূপ ভাষাও কাব্যের ভাষা নহে।

গ্রন্থের প্রারম্ভে অর্জ্জুনকে দুর্ব্বাশার শাপ ভয়ে ভীত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"অর্জ্জুন বালক তুমি, নরের অদৃষ্ট
ব্রাহ্মণের শাপাধীন হইত যদ্যপি
আজি এ ভারতবর্ষ হইত শ্মশান"

অন্যত্র "নাহি কিহে কেহ——
ব্রাহ্মণ রহস্যারণ্যে করিয়া প্রবেশ
আপন বিবরে সর্প ধরি মন্ত্র বলে
তাহার এ বিষদন্ত করে উৎপাটন?"

যিনি ভৃগুপদ চিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণের মুখে ব্রাহ্মণের প্রতি ও রূপ তাচ্ছিল্য ভাব ও পরুষ উক্তি কি নিতান্তই বিকৃত কল্পনা নয়? বোধ হয় কবি নূতনত্বের অনুরোধেই এইরূপ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের উপর কবির আন্তরিক কোপ, প্রমাণ, ত্রয়োদশসর্গে দুর্ব্বাসাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া, বলরাম বলিতেছেন—

স্বগত "পুতি গন্ধে যায় প্রাণ, নাহি সুরাপাত্র কাছে,
শ্মশানের গন্ধে ভরপুর,
যে গন্ধ লেগেছে নাকে, ছয়মাসে নাহি যাবে,
কেমনে এ পাপ করি দূর॥

আবার "দুর্ব্বাসা স্বগতে কহে, পুণ্য বড় মিথ্যা নহে,
কি দুর্গন্ধ রাম রাম রাম!
পুণ্য বিনা আসে কভু, দুর্ব্বাসা নরকে হেন,
নরাধম মদ্য পায়ী স্থান"

নবীন বাবুর কৃষ্ণ নিতান্তই নবীন—ঋষিগণকে সূর্য্য বন্দনা করিতে দেখিলে তাঁহার গা জ্বলিয়া যায়—তিনি অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলেন—

"অন্ধ জড় উপাসক! হেন মহাশক্তি
নিত্য বিদ্যমান যার নয়নের কাছে
সে কেন পূজিবে ওই অন্ধ প্রভাকর"

মনে হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায়, অর্জ্জুনকে স্বীয় বিভূতি নির্দ্দেশের সময় এইরূপ বলেন, "আদিত্যানামহং বিষ্ণু জ্যোতিষাং রবি রংশুমান" অর্থাৎ আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু ও জ্যোতির্গণের মধ্যে আমি প্রকাশক সূর্য্য।

ঋষিগণ সূর্য্য বন্দনা করিতেন বলিয়া কখনই 'জড়োপাসক' ছিলেন না, নবীন বাবুর কৃষ্ণ এ সিদ্ধান্ত কোথায় পাইলেন? 'অন্ধ জড়োপাসক কাহাকে বলে—যাহারা স্বতন্ত্র

চৈতন্যের স্বত্তা না মানিয়া সূর্য্য, পর্ব্বত বা বৃহৎ নদী বিশেষকে বিশ্বাধীপ ঈশ্বর বোধে পূজা করিয়া থাকে। কোন জড়ের গুণ বর্ণন বা স্তুতিবাদ করিলে যদি জড়োপাসক হয় তাহা হইলে মনুষ্য মাত্রেই ত জড়োপাসক—বিশেষতঃ কবিরা।

গ্রন্থকার কাব্যের অষ্টম ও অষ্টাদশ সর্গটী সমস্তই নাগকন্যা জরৎকারুর বর্ণনার শেষ করিয়াছেন। ইহার কি আবশ্যক ছিল বুঝিতে পারি না, ইহাতে অনর্থক গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অষ্টমসর্গ হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক বর্গকে উপহার দিতেছি। নাগকন্যা জরৎকারুকে বিবাহে উদাসীনা দেখিয়া সখী বলিতেছেন।

সখী। "ছাড় ব্যঙ্গ রাজ কন্যা, তোমার যৌবন বন্যা,
এইরূপে করিতে কি ক্ষয়?
অতুল কুন্তল পাশ, পুরাবেনা কারো আশ,
বাঁধিবেনা কাহারো হৃদয়।"

জর। সখী যে বন্যার টান, সহস্র অর্ণব যাণ,
ভাসাইতে পারে সুখ পার।
এক ভেলা বক্ষে ধরি, ভাসাইয়া এক তরী,
কি সুখ হইবে বল তার?
যেই মহা জলধর, এই বিশ্ব চরাচর,
ভাসাইতে পারে বরিষণে।
একটী চাতক প্রাণে, ক্ষুদ্র বারি বিন্দু দানে,
তার তৃপ্তি হইবে কেমনে?

সখী। একি কথা সতীনারী, জুড়াবে কেমন করি,
একাধিক চাতকের প্রাণ॥

জর। ক্ষুদ্র মুখ ক্ষুদ্র ভাষা, ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র আশা,
ক্ষুদ্র তুই নাহি তোর জ্ঞান॥

সখীর আশা ত ক্ষুদ্রই, কিন্তু জরৎকারুর প্রশস্ত হৃদয় ও বিশ্ব প্লাবিত প্রেমের আমরা যাহা পরিচয় পাইয়াছি তাহা না পাইলেই ভাল হইত।

জরৎকারুর স্বামী মুনি জরৎকার নিদ্রিত, নাগ কন্যা তাঁহার চরণ সেবন করিতে করিতে (স্বগত)

"একি শব্দ বাপ! একি ধ্বনি নাসিকার,
ধোপাদের গাধা যেন করিছে চীৎকার,
রাগে অনুরাগে থক থকানি যেমন,
নাসিকার ধ্বনিতেও বীরত্ব তেমন।"

সমস্ত পুস্তক খানিতে এইরূপ ছিবলামী, কেবল রুক্মিণী দেবীই স্বভাবে আছেন তাঁহার কথা বার্ত্তা অনেকটা ভাল, স্থানে স্থানে কবিত্বের আভাস পাওয়া যায়, ফুলের প্রণয় ভাষা—গীতটী আমাদের ভাগ লাগিয়াছে।

বিদ্রোহ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আজকাল খবর তারে চলে, কিন্তু যখন তারের বন্দবস্ত ছিল না তখন যে খবর চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিত তাহাও নহে, তখন খবর, বাতাসে চলিত। রাজা যে শীকার করিতে গিয়া নিজে শীকার হইবার উদ্যোগে ছিলেন—এ কথা কাহারো জানিতে বাকী নাই, রাজ্যের সীমা হইতে সীমান্তরে একথা রাষ্ট্র হইয়াছে; কেবল রাষ্ট্র নহে, নানা-স্থানে নানা রূপ অলঙ্কার বিশিষ্ট হইয়া যাহা নহে তাহা পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছে। একে নূতন খবর, তাহার পর আবার এত বড় একটা খবর, সহরে গ্রামে, মাঠে, ঘাটে, দোকানে বাজারে, রন্ধনশালায়, শয়ন-গৃহে, যেখানে সেখানে এই কথা। ক্ষুদ্র তিন পাহাড় গ্রাম (তিন পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম তিন পাহাড়) যেখানে পলাতক জুমিয়া সপরিবারে লুকাইয়া আছে, সেখানেও আজ প্রাতঃকালে এই কথার গুলজার চলিয়াছে, কৃষকেরা রাখালেরা গরু লইয়া মাঠে যাইতে যাইতে এই গল্প সুরু করিয়াছে।

একজন বলিতেছিল—"উঃ এমন ত কখনো শুনিনি? গুজব না ত?"

আর একজন কহিল—"গুজব! যখন মরা রাজাকে প্রহরীরা পুকুর থেকে বার করে তোলে তখন প্যারীলাল সেখানে দাঁড়িয়ে? কেমন প্যারীলাল?"

গরুর লেজের হাত লেজে রহিল, সকলে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে প্যারীলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্যারীলাল কোন কার্য্যোপলক্ষে সম্প্রতি ইদর গিয়াছিল সেই কাল রাত্রে এ সংবাদ বাড়ী আনিয়াছে। প্যারীলাল আজ মস্ত লোক, সে গাম্ভারী চালে দুই হাত বুকের মধ্যে আঁটিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"না আমি দাঁড়িয়ে দেখিনি, যে সেখানে দাঁড়িয়েছিল তার মুখেই আমি শুনেছি।"

"ঐ তাহলেই হোল!"

"যে মেরেছে সে ধরা পড়েছে?"

প্যারীলাল একটা হেঁয়ালির মত একটু মাথা নাড়িয়া বলিল—"না—হ্যাঁ—এই ভীল কতকগুলা ধরা পড়েছে—কিন্তু বুঝলে কি না"—

কিন্তু কেহই কিছু বুঝিল না, বুঝিবার আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিল, প্যারীলাল বলিল—"অমন মারা কি মানুষের কর্ম্ম—"

"কে মারবে তবে?" চারিদিক হইতে এই উৎসুক প্রশ্ন উঠিল।

প্যারীলাল গূঢ়-অর্থ-পূর্ণ কটাক্ষে ইতস্ততঃ চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"সঙ্গীণ ব্যাপার—সমস্তই ভূতের কাণ্ড!" সকলে অবাক হইয়া রহিল, প্যারীলাল বলিল—"পাহাড়ের চূড়ার উপর তুলে সেখানে মুখ গুজরে নাকি মেরে ফেলেছে।"

একটা রহস্য ভেদ হইল, সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। একজন বলিল—"পাহাড়ের চূড়ায় তুলে মেরেছে—তবে পুকুরে না?

প্যারীলাল রাগিয়া উঠিল, বলিল—"আ খেলে যা, সেখানে আর কি পুকুর থাকতে নেই, এ রকম গাঁজাখুরে কথা বল্লে আমার দেখছি কথা বন্ধ করতে হয়।" এই কথায় কুতূহল শ্রোতৃবর্গ বড়ই ভীত হইলেন, সকলে এক বাক্যে উল্লিখিত মন্দ বক্তার নিন্দাবাদ করিয়া তাহাকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া দিলেন, ওরূপ আর একটি কথা কহিলে সে হতভাগার যে আর এখানে—এমন কি—আর কোন খানে ঠাঁই নাই, দশ জনে মিলিয়া কেহ তাহাকে ইহা বুঝাইতে বাকী রাখিলেন না। এইরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত সহানুভূতি-সিঞ্চিত হইয়া প্যারীলাল যখন আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন তখন একজন আবার সাহস পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তা মানুষে মারিনি,—ভূতে যে মেরেছে, এটা ত রাজা জেনেছে?

আর একজন বলিল—"তা সত্যি? নইলে বিনি-দোষে অন্যেরা মারা যাবে?"

যে ইতিপূর্ব্বে একবার কথা কহিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিল, আবার সে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল "কিন্তু রাজা না মরেছেন?"

তাওত বটে! এবার কেহ রাগ করিল না, গম্ভীর ভাবে কেবল একটা ঘাড় নাড়ানাড়ি পড়িয়া গেল। যেন লাখ কথার এক কথা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। দু এক জন বলিল—

"তাই ত, তবে বিচার করবে কে?" আর একজন উত্তর করিলেন "রাজা না থাকলেই রাণী বিচার করে? তার জন্য আর ভাবনা কি?"

প্যারীলাল বলিল—"বিচার কি আর এখনো বাকী আছে, সে সব হয়ে গেছে।" কি বিচার হইয়াছে জানিবার জন্য সকলে উৎসুক হইয়া উঠিল—প্যারীলাল বলিল—"রাজ্যে যত ভীল আছে সবার মাথা নেবার হুকুম হয়েছে।"

সকলে অবাক হইয়া রহিল, একজন কেবল বলিল—"তবে এ যাত্রা বড়ই বেঁচে যাওয়া গেল! জুমিয়ার কাছে ও বছর আধ মন গম ধার নিয়েছিনু—এখন শুদে-আসলে তিন মন দাঁড়িয়েছে। বেটা দেখা হলেই সেই গম দাবী করে, 'এখন আমি তার মাথা দাবী করব—কেমন কি না? ঐ যে বেটা বলতে বলতে আসছে!"

প্যারীলাল ইদর হইতে ফিরিয়াছে শুনিয়া জুমিয়া বাড়ীর খবর জানিতে তাহার কাছেই আসিতেছিল। অন্য সময় জুমিয়ার সহিত দেখা হইলেই ঋণদার সরিতে চেষ্টা করিত, আজ সে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু জুমিয়া তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া প্যারীলালকে বলিল—"বাবাডার সঙ্গে দেখা হইল কি? যা বলিতে বলিনু বলিয়াছিস?"

সে বলিল—"না তাহা পারি নাই—রাজধানীতে বড় গোলযোগ, এখন কি তাঁদে-

দের সঙ্গে দেখা করার যো আছে, যে দেখা করে তাহার পর্য্যন্ত মাথা যায়।" বিস্মিত জুমিয়ার কর্ণে ক্রমে সমস্তই উঠিল,—জুমিয়াকে ব্যথিত অবসন্ন দেখিয়া একজন কহিল "জুমিয়া ভাবিস নে, আমরা থাকিতে তোর মাথা লইতে কেহ পারিবে না। কেন' তুই কি আমাদের মন্দ প্রতিবাসী ?" কিন্তু ঋণদার গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তবে কিন্তু আমার ধানের ভাগটা এইবেলা কমাইয়া দিক্"—

জুমিয়া কাহারো কথায় লক্ষ্য না করিয়া বলিল "সকলের মাথা যায়, আমারো যাইবে,—আমি আজই ইদর যাইব"—

ঋণদার বলিল—"গমগুলা ?"

জুমিয়া বলিল—"ছাড়িয়া দিলাম, তোর দিতে হইবে না।" ঋণদারের তখন আবার আর এক ভাবনা পড়িয়া গেল, বলিল—"না তাহা হইবে না। তোর ঋণ লইয়া আমি মরিব বুঝি ? এক সের গম আমি তোকে আনিয়া দিই,—তুই তাহা লইয়া আমাকে রেহাই দে।"

ঋণদার মাঠ হইতে বিকালে বাড়ী গিয়াই আগে একসের গম জুমিয়ার বাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিল, কিন্তু আসিয়া যখন দেখিল জুমিয়া বাড়ী নাই, তখন পরজন্মের ঋণের ভারে নিতান্ত ভারগ্রস্ত হইয়াও ইহ জন্মের বোঝা হইতে নিষ্কৃতি বোধ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

জুমিয়া ১৫ দিনের মধ্যেই বাড়ী পৌঁছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জুমিয়া যাহা শুনিয়াছে তাহা ঠিক নহে, বাণাঘাতে নাগাদিত্যের মৃত্যু হওয়া দূরে থাক, তিনি অক্ষত বাঁচিয়া গিয়াছেন, বাণ তাঁহার কেশ গাছি পর্য্যন্ত স্পর্শ না করিয়া কেবল উষ্ণীষ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু জম্বু সেই দিন হইতে শয্যাগত। সেই দিন হইতে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। (সেই দিন যখন জম্বু জানিতে পারিলেন অংলা অকৃতকার্য্য হইয়াছে—কেবল তাহাই নহে, তাহার উপর আর একটা অনর্থ ঘটিয়াছে, দুই জন ভীল বন্দী হইয়াছে,—তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই যে জম্বু সংজ্ঞাহীন হইয়া কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন তাহার পর ১৫ দিন ধরিয়া তাঁহার আর সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইল না। যদিও পরে অল্পে অল্পে জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছে কিন্তু বাঁচিবার আর আশা নাই। ভগ্ন হৃদয়, নিরাশ প্রাণ, অবশ শরীর লইয়া তিনি এখন যতই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ততই তাঁহার কেবল জুমিয়াকে মনে পড়িতেছে, এতদিন যে উদ্দেশ্য, যে আশা হৃদয়ে ধরিয়া তিনি আর সব ভুলিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সে আশা হারাইয়া জুমিয়ার জন্য তিনি আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বুঝি তাঁহার এই আকুলস্মৃতির গভীরতম প্রদেশে

তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটা আশার ক্ষীণরেখা এখনো বহিতে থাকে, তাঁহার এই শেষসময়ের শেষকথা জুমিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না, বুঝি বা এইরূপ একটা লুক্কায়িত বিশ্বাসে জুমিয়ার জন্য তাঁহাকে অধিক পাগল করিয়া তোলে!

ভোর হইয়াছে। পরিষ্কার বসন্তের প্রভাত। জঙ্গুর রুদ্ধ দ্বার গৃহে প্রভাতের এ নির্ম্মলতা পূর্ণমাত্রায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, দেয়ালের উঁচু দুইটি ছোট জানালার গহ্বর দিয়া জঙ্গুর বিছানার উপর খানিকটা সূর্য্য কিরণ পড়িয়াছে, তাহার আলোকে সমস্ত ঘরখানি অল্প অল্প উজ্জ্বল হইয়াছে। অনেকক্ষণ হইতে জঙ্গু জাগিয়া আছেন, বিছানায় শুইয়া তাঁহার কতকি মনে পড়িতেছে, সেও এমনি একটি সকালবেলা, এইরূপ আধো আলোক আধো অন্ধকারে বসিয়া জুমিয়ার সহিত শেষ কথা কহিয়াছিলেন। আর সকলি তেমনি আছে, দেয়ালের সেই ধনুর্ব্বাণ তেমনি রহিয়াছে, কেবল সেই যে সে চলিয়া গিয়াছে আর আসে নাই। জুমিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন, বাতাসে বন্ধ-দ্বার অল্প অল্প নড়িতেছিল, জুমিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার আগে আস্তে আস্তে এইরূপে সে দ্বার নড়াইত। আজ কাল বাতাসে যখন এইরূপ নড়ে, তাঁহার মনে হয় জুমিয়া আসিতেছে। এক এক বার ইহা এত সত্য বলিয়া মনে হয় তিনি জুমিয়া জুমিয়া করিয়া ডাকিয়া উঠেন, কিন্তু দ্বার যেমন বন্ধ তেমনি থাকে, আজও কি মনে হইল হঠাৎ একবার জুমিয়া জুমিয়া করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, বাহির হইতে শিকলি বন্ধ ছিল হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল, আজ সত্যই জুমিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—জঙ্গুর অসাড় হৃদয়েও রক্ততরঙ্গ উথলিয়া উঠিল—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, জুমিয়া কাঁদিয়া পিতার শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। জঙ্গুর দুই নেত্র ভাসিয়া জল পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে যখন জল প্লাবিত চক্ষু জঙ্গু উন্মীলিত করিলেন—দেখিলেন দুই জন স্ত্রীলোক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। পুত্রবধূকে চিনিতে পারিলেন—কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বালিকা এখন এত বড় হইয়াছে যে তাহাকে সহজে আর চেনা যায় না, তাহার দিকে চাহিয়া তাঁহার দৃষ্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল, উথলিত অশ্রু শুকাইয়া পড়িল, তাঁহার সম্মুখে একটি দেবী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান দেখিলেন—তাহার লাবণ্য জ্যোতিতে তাঁহার অন্ধকার হৃদয় হঠাৎ যেন পূরিয়া গেল, নিরাশ হৃদয় যেন আশা পূর্ণ হইয়া উঠিল—তিনি বলিলেন "সুহার এত বড় হইয়াছে! এস বৎস আমার কাছে এস" সুহার তাহার নিকটে বসিল, জুমিয়ার পানে চাহিয়া এতদিন তাহার যে তৃপ্তি হইত বালিকাকে দেখিয়া তাহার সেইরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ হইল, তাহার নয়নে সেইরূপ আশা দেখিতে পাইলেন—তিনি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যে দুই জন নিরপরাধী ভীল অপরাধী রূপে ধৃত হইয়াছে—মাসাবধি পরে আজ তাহাদের বিচার। এ দুই জন ছাড়া ইহার মধ্যে যদি আরো কেহ থাকে—সেই সন্ধান জন্য এত দিন বিচার বন্ধ ছিল—কিন্তু আর কাহারো সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বিচারাসনে রাজা, তাঁহার দুই পার্শ্বে সভাসদগণ, সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভীল দুইজন দণ্ডায়মান।

আজ বিচারালয় লোকে লোকারণ্য, কিন্তু কাহারো মুখে কথাটি নাই, কুতূহল দর্শক বৃন্দ নিঃশব্দে নিস্তব্ধে বিচারের শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। রাজা এখনো একটি কথা কহেন নাই, মন্ত্রী অপরাধীদিগকে যাহা বলিতেছেন রাজা স্তব্ধ গম্ভীর ভাবে অপরাধীদিগের দিকে চাহিয়া তাহা শুনিতেছেন। রাজার দৃষ্টিতে ক্রোধ কিছুমাত্র নাই, একটা বিষণ্ণ করুণ ভাবে তাহার মুখকান্তি সুগম্ভীর, ভীলদিগকে দেখিয়া রাজার তাহাদিগকে দোষী বলিয়া মনে হইতেছে না, তাহাদিগকে তিনি যতই দেখিতেছেন, তাঁহার জুমিয়াকে মনে পড়িতেছে। তাহার সেই বলিষ্ঠ মূর্ত্তি, সরল ভাব, অসম সাহস, রাজার প্রতি পরিপ্লুত-প্রেমভক্তি সব মনে পড়িয়া যাইতেছে, তাঁহার সেই প্রীতিবিভাসিত হৃদয়ালোকে অপরাধীর মলিন মুখশ্রী অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। তিনি যতই দেখিতেছেন যতই ভাবিতেছেন কিছুতেই তাহাদের অপরাধী বলিয়া মনে হইতেছে না, কেনই বা অকারণে তাহারা রাজহত্যা করিতে যাইবে, তিনি তাহাদের কি করিয়াছেন? পাগল না হইলে বিনা কারণে এরূপ কাজ কেহ করে! তাঁহার পিতামহকে একজন ভীল মারিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কারণ ছিল। রাজার মুখকান্তি ক্রমশই অধিকতর অন্ধকার হইতে লাগিল, মন্ত্রী যখন অপরাধীদিগকে শাসাইতে লাগিলেন রাজা একাগ্রমনে বলিতে লাগিলেন—'ভগবান! সংশয় হইতে আমাকে দূরে রাখ, যখন ন্যায়ান্যায় বিচারের ভার দিয়া তোমার প্রতিনিধি করিয়া সংসারে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ—তখন তোমার ন্যায় জ্যোতি দিয়া আমার অন্ধ নয়ন ফুটাইয়া দাও, আমি দোষী নির্দ্দোষীকে যেন এক করিয়া না ফেলি, তোমার সত্য করুণা দিয়া আমি যেন বিচার করিতে সমর্থ হই,"

মন্ত্রী যখন বিচার একরূপ শেষ করিয়া মহারাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখিতেছেন ত? ইহারা যে অপরাধী তাহাতে আর সন্দেহ নাই, প্রাণদণ্ডই একমাত্র ইহাদের দণ্ড, এখন মহারাজের অনুমতির মাত্র অপেক্ষা"—পুরোহিত গণপতি যখন তাহাতে সায় দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"প্রাণদণ্ডই ইহাদের একমাত্র দণ্ড"—বিদূষক যখন তাহার স্বাভাবিক হাস্যভাব গাম্ভীর্য্যে পরিণত করিয়া অস্বাভাবিক স্বরে বলিলেন,

"তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে,—প্রাণদণ্ড, প্রাণদণ্ড"—মহারাজ তখন মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—

"আগে প্রমাণ তবে দণ্ডাজ্ঞা, আগেই দণ্ডাজ্ঞা দিতে আমার অধিকার কি?"

মন্ত্রী একটু বিস্মিত হইলেন—বলিলেন—"মহারাজ প্রমাণের কি কিছু অভাব দেখিলেন?

রাজা গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"সম্পূর্ণই। উহাদের কি আমার প্রতি তীর ছুঁড়িতে কেহ দেখিয়াছে?

মন্ত্রী। "না দেখুক, সকল সময় প্রত্যক্ষ দেখিয়া যদি প্রমাণ স্থির করিতে হয়—তবে বিচার একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। যতদূর সম্ভব তাহাতে উহাদের দোষে সন্দেহ নাই?"

রাজা বলিলেন—"যতদূর সম্ভব! সম্ভব অসম্ভব আমরা কি বুঝি? পৃথিবীতে সবই অসম্ভব, সবই সম্ভব" গণপতি বলিলেন "সে কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক"

মন্ত্রী বলিলেন—"তা সত্য, কিন্তু আমরা যাহা বুঝি তাহা লইয়াই ত আমাদের কাজ করিতে হইবে, যতদূর বুঝা গেল তাহাতে উহাদের প্রতি ত আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতেছে।"

রাজা বলিলেন—"সন্দেহ হইতেছে? কিন্তু সন্দেহ ত আর প্রমাণ নহে"—

মন্ত্রী বলিলেন, "সন্দেহ প্রমাণ না হউক, প্রমাণ হইতেই এ সন্দেহ!"

রাজার মুখ জ্বলিয়া উঠিল, রাজার প্রথমে যে টলমল ভাবটুক ছিল সভাসদদিগের প্রতিকূল বাক্যে সেটুকও রহিল না, বলিলেন—"না ইহা প্রমাণ নহে, ইহা যথেচ্ছাচার।"

গণপতি আস্তে আস্তে বলিলেন "চমৎকার কথা!"

মন্ত্রী ঘাড়হেঁট করিলেন, বুঝিলেন আজ তিনি ঠিক রাজার মেজাজটা বুঝিয়া চলিতে পারেন নাই, আর যে প্রমাণের উপর বিচারের নিষ্পত্তি নির্ভর করিতেছে না তাহা বুঝিলেন, বুঝিলেন, এ বিচারের গতি এখন কোন দিকে, আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

রাজা ও সভাসদদিগের এই গুপ্ত পরামর্শের ফল জানিতে সকলে অধীর হইয়া উঠিল, রাজমুখ হইতে মৃত্যুদণ্ড শুনিবার অপেক্ষায় অপরাধীদিগের হৃৎপিণ্ডে প্রতিক্ষণে রক্তের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতে লাগিল; রাজা অপরাধীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা সে দিন আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলে?"

তাহারা অবিচলিত কণ্ঠে বলিল "না"

রাজার মুখে একটা জয়ের ভাব প্রকাশ পাইল, তখন যদি তাহাদের দোষ প্রমাণ হয় ত সেটা যেন তাঁহারি লজ্জার কথা! তাহাতে যেন তাঁহারি পরাজয়! মহারাজ তীব্র কটাক্ষে মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন -যেন এতটা সমস্ত মন্ত্রীরই দোষ। মন্ত্রী একটু

থতমত খাইয়া বলিলেন—"উহারা যদি দোষী না হইবে, তবে প্রহরীদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিল কেন ?"

রাজা তীব্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"ওসব কথা ত আগেই হইয়া গেছে, উহারা পলায়ন করে নাই—শীকার দেখিয়া ছুটিয়াছিল।

মন্ত্রী। "অথচ বলিতেছে তীর ছুঁড়ে নাই ? শীকার করিতে গিয়া তীর ছুঁড়িবে না—কোন কথাটা ঠিক !"

রাজা বলিলেন—"সবটাই ঠিক ! তীর না ছুঁড়িয়াও শীকার করা যায়।

মন্ত্রী। "তবে তীর কোথা হইতে আসিল ?"

মন্ত্রি কয়েদীদিগকে সম্বোধন করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা যদি তীর ছুঁড়িলে না, তবে কে ছুঁড়িয়াছিল।"

উত্তর। তাহা জানি না। একজনকে কেবল আমরা ছুটিতে দেখিয়াছিলাম।

মন্ত্রী। "তোমরা একজনকে ছুটিতে দেখিলে—আর সৈনিকরা দেখিল না!" অপরাধীগণ ভড়কিয়া গেল, কোন উত্তর করিল না।

রাজা বলিলেন—"তাহা উহাদের অপরাধ নহে।"

মন্ত্রী। সে রাজদ্রোহীকে ছুটিয়া যাইতে দেখিলে—তবে ধরিবার চেষ্টা করিলেনা কেন?

উত্তর। "আমরা মনে করিয়াছিলাম—সে হরিণ শীকারে ছুটিতেছে সেই সময় একটা হরিণকে ছুটিয়া যাইতে দেখি, তাহা ছাড়া আমরা কিছু জানিতাম না।" রাজা বলিলেন—"বাস্তবিক তাহারো কোন অপরাধ না থাকিতে পারে, পশুবধ করিতে দৈবাৎ আমার দিকে তাহার বাণ আসিয়া পড়িয়াছিল ?"

মন্ত্রী বলিলেন "যদি তোমরা নির্দ্দোষ তবে রাজার প্রহরীদিগের নিকট আত্ম-সমর্পণ না করিয়া তাহাদের উপর বল প্রয়োগ করিয়াছিলে কেন ?"

উত্তর হইল "ধর্ম্মাবতার আমরা নির্দ্দোষী, বিনা দোষে প্রহরীরা কেন আমাদের বন্দী করিবে।"

কয়েদীরা এতটা আশ্বস্ত হইয়াছিল যে অসঙ্কোচে তাহাদের আপত্তির কারণ জানাইয়া দিল। মন্ত্রী কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু রাজার ইঙ্গিতে নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

রাজা বলিলেন—"কিন্তু সাবধান, এমন কার্য্য আর করিওনা, রাজপ্রহরীর আর কখনো অসম্মান করিলে গুরুদণ্ড পাইবে। ঐ অপরাধে তোমাদের এক মাস কারাবাস, তাহার পর মুক্তি। যাও, প্রহরী উহাদের লইয়া যাও।"

দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া লোকেরা থ হইয়া গেল, কয়েদীরা আহ্লাদে মূর্চ্ছা যাইতে কেবল বাকী রহিল, সভাসদদিগের মুখে কোন বাক্য সরিল না। পুরোহিত হরিতাচার্য্য সম্প্রতি তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি নিস্তব্ধে, এতক্ষণ বিচারের শেষ প্রতীক্ষা করি-

তেছিলেন—রাজার এই অসাধারণ ক্ষমাশীলতায়—এই পুণ্যময় বিচারে উৎফুল্ল হইয়া রাজাকে আশীষ করিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হঠাৎ বিচারালয়ের দ্বার দেশ হইতে একটা জয় ধ্বনি উঠিল, একজন ভীল, দুই হাতে ভীড় ঠেলিয়া উন্মত্ত আহ্লাদে জয় হউক, জয় হউক, বলিতে বলিতে রাজসিংহাসনের নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল, রাজা আহ্লাদে বিস্ময়ে মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া শত সহস্র বিস্মিত দর্শকের নেত্রের উপরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নবাগত ভীল আর কেহ নহে জুমিয়া। রাজার এই ব্যবহারে হরিতাচার্য্যও বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মুখের আশীষ মুখেই মিলাইয়া গেল, তিনি স্তম্ভিত ভাবে জুমিয়াকে দেখিতে লাগিলেন।

যখন সভা সঙ্গ হইল, দর্শকগণ চলিয়া গেল, জুমিয়া চলিয়া গেল—রাজা অন্তঃপুরে যাইবার জন্য উঠিলেন—তখন হরিতাচার্য্য নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আর একটু বসিতে আজ্ঞা হউক, একটি কথা আছে" রাজা বসিলেন, মন্ত্রী বিদূষক গণপতিও বসিলেন, হরিতাচার্য্যও আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন "মহারাজ ভীলের সহিত এরূপ বন্ধুতা কি রাজোচিত ?"

মহারাজ সহসা ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন—তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—"কেন তাহাতে ক্ষতি কি ? মহারাজ গুহা ত ইহা রাজানুচিত মনে করেন নাই"—

পুরোহিত বলিলেন, "কিন্তু আশাদিত্য ভীল কর্ত্তৃক নিহত হইতে গিয়াছিলেন মনে আছে কি ?"

নাগাদিত্য বলিলেন, "ঐ ভয়ে যদি জুমিয়ার সহিত বন্ধুতা অনুচিত জ্ঞান করেন তাহা হইলে আমি নির্ভীক আছি"—পুরোহিতের মুখ গম্ভীর হইল—রাজা হাসিয়া বলিলেন "আপনার মুখ দেখিলে কেহ মনে করিবে আপনি যেন মৃত্যুর সম্মুখে"।

পুরোহিত বলিলেন "মহারাজ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইতে আমার ভয় নাই—আপনার কোন অমঙ্গল না ঘটে ইহাই আমার ভাবনা,"

রাজা বলিলেন—"আমার অমঙ্গল না ঘটিতে পারে তাহা আমি বলিতে পারি না—কিন্তু জুমিয়া হইতে ঘটিবে না"—

পুরোহিত বলিলেন—"কিন্তু ইহাতে প্রজারা অসন্তুষ্ট হইতে পারে ?

রাজা একটু ক্রুদ্ধ হইলেন—বলিলেন, "আমি কাহাকে বন্ধু ভাবি না ভাবি ইহা আমার হৃদয়ের ব্যাপার, রাজা বলিয়া আমার হৃদয়ের স্বাধীনতা আমি প্রজার নিকট বিক্রয় করি নাই !"

পুরোহিত বলিলেন, "রাজা হইলে তাহাও করিতে হয় বই কি ? রামচন্দ্র কি করিয়াছিলেন ?"

রাজার কথাটা ভাল লাগিল না—কিন্তু সহসা কি উত্তর দিবেন—ভাবিয়া পাইলেন

না, কিছু পরে বলিলেন, "কিন্তু প্রজারা যখন অসন্তুষ্ট হইবে তখন সে কথা। এখন পর্য্যন্ত ত তাহা হয় নাই।"

পুরোহিত বলিলেন—"আমার বিশ্বাস বিপরীত"।

রাজা বলিলেন—"আপনার বিশ্বাস হইতে পারে—কিন্তু আর কেহ ওরূপ বলিবে না,—গণপতি ঠাকুর আপনার কি মনে হয় ?"

গণপতি বিপদে পড়িলেন, রাজা কি উত্তর প্রত্যাশা করেন তাহা বুঝিলেন, তাহার বিপরীত বলিতে সাহস হইল না—একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"প্রজারা—কই—অসন্তুষ্ট ত দেখিতেছি না—"

পুরোহিত বলিলেন—"কিন্তু তোমরা কি অসন্তুষ্ট নহ ? রাজার এরূপ ব্যবহার কি উচিত বিবেচনা করিতেছ ?"

মন্ত্রী রাজার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার ক্রুদ্ধ কটাক্ষ তাঁহার নজরে পড়িল—বিচারের সময় তিনি রাজার মতের বিরুদ্ধে চলিয়াছেন—তাঁহার ইচ্ছা এখন রাজার মনের মত কথা বলেন, তিনি বলিলেন—"রাজা যাহা করেন তাহাই উচিত"

পুরোহিত বলিলেন "অন্যায় করিলেও ?"

রাজা বলিলেন—"কিন্তু জুমিয়াকে ভালবাসা একটা অন্যায় কাজ নহে।

পুরোহিত দেখিলেন তাঁহার মনে যা আছে তাহা যতক্ষণ বলিতে না পারেন—ততক্ষণ রাজা কিছুই বুঝিবেন না—অথচ তাহা খুলিয়া বলিবারও যো নাই—তিনি আর একরূপ করিয়া বুঝাইবার ইচ্ছায় বলিলেন "অনেক সময় একটা কাজ আসলে অন্যায় না হইয়াও অন্যায়, যদি—"

রাজার আর ধৈর্য্য রহিল না—এরূপ করিয়া তাঁহার কথার উপর কথা শোনা তাঁহার অভ্যাস নাই—তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কাজটা আসলে অন্যায় না হইলেই হইল—আমি আর কিছু চাহি না।" ইহার উপর আর কিছু বলিবার নাই—রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ।

"Garden of India! Fading flower!
Wihers thy bosom fair—
State, upstart ; üserer devour
What Flood, Famine spare" A. H. H.
Pest Frost

সুজাউদ্দৌলা—মনসুর আলি সফ্‌দার জঙ্গের পুত্র। সুজার সিংহাসনাধিরোহণ সময়ে তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র মহম্মদ কুলী খাঁ প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন বলিয়া সুজা

তাঁহাকে নিহত করিয়া নিজের পথ নিষ্কণ্টক করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। দিল্লীর বাদসাহ-সরকারে এই সময়ে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ বাদসাহ তাঁহার সচিব গাজীউদ্দিনের হস্তে আবদ্ধ হইয়া কারাগারে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র আলিগোহর সাহায্য প্রার্থনায় আর্য্যাবর্ত্তের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে অযোধ্যার নবাবদিগেরই যথেষ্ট প্রভুত্ব ও সৈন্য-বল ছিল—সুতরাং রাজ্যহীন নিরাশ্রয় বাদসাহ-পুত্র সুজার শরণাপন্ন হইলেন।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে সফ্দার জঙ্গ দিল্লীর বাদসাহের উজীরি করিয়াছিলেন—তিনি নাম মাত্র উজীর ছিলেন, সদা সর্ব্বদা দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকিতেন না—অযোধ্যার শাসন কার্য্যেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তথাপি উজীর সহায় ছিলেন বলিয়া—বাদসাহ এপর্য্যন্ত স্বীয় ক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কুগ্রহ বশতঃ তাঁহার দুর্ম্মতি ঘটিল, বিধাতা দিল্লী রাজ বংশের এতাদৃশ শোচনীয় পরিণাম লিখিয়াছেন বলিয়াই—তিনি সফ্দার জঙ্গকে উজীরী হইতে বঞ্চিত করিলেন। সফ্দার জঙ্গ বাদসাহের অন্তঃপুর রক্ষক জওয়াইদ্ নামক জনৈক প্রধান খোজাকে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া বাদসাহ তাঁহাকে ইস্তফা দিয়া নিজাম উল্‌মুলুক বংশীয় গাজিউদ্দিনকে সেই পদ প্রদান করেন। এই গাজিউদ্দিন পরিশেষে অশেষ ক্ষমতা সঞ্চয় করিয়া বাদসাহকে বন্দী করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বাদসাহ অযোধ্যার নবাবগণের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে—কিন্তু তাঁহার পুত্র (সাহজাদা) ঘটনা বশে বাধ্য হইয়া পুনরায় তাহাদের সাহায্য প্রার্থী হইলেন।

আলিগোহর অযোধ্যায় আসিয়া সুজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন—সুজাউদ্দৌল্লা সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন সহজেই সাহজাদার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা সুজার খুল্লতাত পুত্র পূর্ব্বোক্ত মহম্মদ কুলীও অনুরুদ্ধ হইয়া সুজার সৈন্যের সহিত একযোগে সাহজাদার সহায়তা করিতে উদ্যোগী হইলেন। সুজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্ব্বদাই মহম্মদ কুলীর উপর অলক্ষ্যভাবে ঘুরিতেছিল—বাদসাহ-পুত্র বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে যাইবেন শুনিয়া মহম্মদ সসৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। সুজা ইতস্ততঃ করিয়া পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন—মহম্মদকুলী অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া তিনি সহসা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এলাহাবাদের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মহম্মদকুলী ফিরিয়া আসিয়া এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ দিবার জন্য চেষ্টা করিলেন বটে—কিন্তু সহসা ধৃত হইয়া সুজার হস্তে নিহত হইলেন।

বাদসাহ এদিকে ক্লাইবের সহিত সন্ধি করিয়া দিল্লীতে ফিরিলেন। দিল্লীতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার বৃদ্ধ পিতা নিহত হইয়াছেন ও দিল্লী শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। কলে কৌশলে উজীরের হস্ত হইতে মসনদ অধিকার করিয়া সাহজাদা সুজাউদ্দৌলাকে স্বীয় উজীর নিযুক্ত করিলেন।

পাটনায় হত্যাকাণ্ড সমাধা করিয়া বাঙ্গালার শেষ মুসলমান নবাব মীরকাশেম আলি খাঁ বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গিয়া সুজার শরণাপন্ন হইলেন। ইংরাজ দৃঢ় পদে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, অথচ তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান নাই, কাজেই সুজার সহায়তা ভিন্ন মীরকাশিমের পক্ষে অন্য উপায় ছিল না। সুজাউদ্দৌলা কোরাণ স্পর্শ করিয়া বিপন্ন নবাবকে রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইতিহাসের সকল কথা বলিতে গেলে আমাদের স্থানে কুলাইবে না, এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে মীরকাশিমের সুজার সহিত সম্মিলনের পরিণাম বক্‌সারের মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাশিম সুজার জ্ঞাতসারে ইংরাজদিগের অলক্ষ্যে রোহিলখণ্ডে পলায়ন করেন— এবং সুজাও ঘটনাবশে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধির কথানুযায়ী উজীর ইংরাজ কোম্পানীকে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫০ লক্ষ ও সৈন্যাধ্যক্ষকে আটলক্ষ টাকা প্রদান করেন। এই সময় হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজের সহিত অযোধ্যার নবাব সরকারের প্রথম সংমিশ্রণ ঘটে। কিন্তু এই সংমিশ্রণই পরিশেষে সুজার বংশধরগণের পক্ষে ভয়ানক বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল। ইহাতে ইংরাজের স্বার্থ বহুদূর বিস্তৃত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে ইংরাজ রাজত্বের মূল সুদৃঢ় করে। পলাশীর ব্যঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজ বাঙ্গালার কোমল মৃত্তিকায় সিংহ পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন—এবং বক্‌সারের যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তে প্রকৃত ক্ষমতা বিস্তার করিলেন।

নবাব উজীর সুজাউদ্দৌলা যে অতিশয় কার্য্যদক্ষ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি সম্পন্ন শাসনকর্ত্তা ছিলেন—একথা তাঁহার পরমশত্রুও স্বীকার করিয়াছেন। বক্‌সারের যুদ্ধের পর চারি বৎসরের মধ্যে তিনি রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। এই উন্নতির সহিত তিনি রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিয়া কোষাগারে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কেবল রাজকোষ পরিপূরণ কেন— রাজ্য রক্ষার্থে যথেষ্ট সেনাবলও বৃদ্ধি করেন এবং সুদক্ষ ফরাসী সেনানীদিগের তত্ত্বাবধারণে সেনাগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদের ব্যবহারার্থে স্বীয় রাজধানী ফৈজাবাদে এক শেলেখানা স্থাপন করেন। সুজার এ সকল উন্নতি নানাকারণে ইংরাজের চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা-সৈন্যবল কমাইয়া উজীরকে আপনাদের চত্বরে আনিবার ছলান্বেষণ করিতে লাগিলেন।

বক্‌সারের যুদ্ধের পর ইংরাজের সহিত অযোধ্যার নবাব উজীরের যে সন্ধি হয় সুজা বরাবরই তাহার নিয়ম পালন করিয়া আসিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত উল্লিখিত সন্ধির এমন কোন ব্যভিচার ঘটে নাই যাহাতে সুজা ইংরাজের নিকট সন্ধিভঙ্গ দোষে দোষী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। কিন্তু সৈন্যবল বৃদ্ধি করাতে ইংরাজ তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। হায়দারআলির সহিত নবাব

উজীর কোন প্রকার চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছেন—এই সন্দেহ করিয়া কলিকাতা কৌন্সিল নানাস্থানে প্রণিধি প্রেরণ করিয়া প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পরিণামে প্রকাশ পাইল—সুজা এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, তিনি বিশ্বাস-হন্তারক নহেন—কিন্তু ইংরাজদিগের বিশ্বাসী হিতকারী বন্ধু। * কলিকাতা কৌন্সিল এত প্রমাণ পাইয়াও সন্দেহ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুজার সৈন্য কমাইতে না পারিলে তাঁহারা সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবেন না—ইহা তাঁহাদের বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল। সাধনেই সিদ্ধি—সুতরাং ইংরাজই পরিশেষে জয়লাভ করিলেন। জানি না কি গূঢ় কারণে মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় সুজা বিনা বাক্যব্যয়ে ইংরাজের সহিত পুনরায় সন্ধি করিতে ব্যগ্র হইলেন। এই সন্ধির ফলে ইংরাজ তাঁহার সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া ৩৫ হাজারে আনিলেন। এই নূতন সন্ধির শেষে ইহাও বলা হইল—এ পর্য্যন্ত নবাবের সহিত যে সমস্ত সন্ধি করা হইয়াছে যদি তাহার সমস্ত নিয়ম তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ মানিয়া চলেন তাহা হইলে ইহার পরে আর কোন প্রকার নূতন সন্ধির প্রস্তাবনা হইবে না। কিন্তু পরিণামে ইংরাজ এই সত্য বাক্য বারম্বার লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

সুজা উদ্দৌলাকে কোম্পানী কামধেনু ভাবিয়াছিলেন—যখন যে কোন উপায়েই হউক পাক দিয়া দোহন করিলেই কিছুনা কিছু যেন লাভ হইবেই হইবে। ডাইরেক্টারদের চুণারের গগনস্পর্শী-দুর্গের উপর বরাবরই নজর ছিল। কর্ম্মচারীদের উপর তাঁহাদের আদেশ ছিল—যে কোন উপায়েই হউক চুণার দুর্গ হস্তগত করা চাই। ১৭৬৫ অব্দের সন্ধির স্বত্বানুযায়ী পাওনা টাকার কিয়দংশের জামিন স্বরূপ ইংরাজ চুণার দুর্গ—নিজ দখলে রাখেন। নবাব যখন বক্রী টাকা শোধ করিয়া দিলেন—কাজেই চক্ষুলজ্জায় ইংরাজকে আপাততঃ চুণার ছাড়িয়া দিতে হইল—কিন্তু লোভ ছাড়িলেন না! এই সময়ে ইষ্ট সিদ্ধির আর এক উপায় ঘটিয়া উঠিল। মারহাট্টারা ও রোহিল্লারা অযোধ্যা

---

* স্বনাম খ্যাত হায়দারআলি এই সময়ে সুজাউদ্দৌলাকে পত্র লেখেন "আপনার ন্যায় প্রভূত সৈন্যবল শালী, স্বাধীনচেতা রাজা কেন ইংরাজের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন আপনি সসৈন্যে আমার সহিত যোগদান করিয়া পদোচিত গৌরব রক্ষা করুন।" সুজা ইহার উত্তরে এই মর্ম্মে লেখেন—"আমার প্রভূত সৈন্যরাজি ইংরাজের বিপক্ষে চালিত হইবার জন্য শিক্ষিত হয় নাই। ইংরাজের সহায়তার জন্যই হইয়াছে।" এই পত্র ইংরাজ রেসিডেন্টের কৌশলে ধরা পড়ে কিন্তু তিনি প্রকৃত মর্ম্মাবগত হইয়া নবাবের মত লইয়া তাহা কলিকাতা পাঠাইয়া দেন। তবুও কলিকাতা কৌন্সিল ভ্রমবিশ্বাস ছাড়িতে পারিলেন না—নবাব উজীরের বন্ধুত্বের এই অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও নিজেদের খল-বৃত্তি ছাড়িলেন না, সুজা তাঁহাদের চক্ষে তথাপি নির্দ্দোষী বলিয়া পরিগণিত হইলেন না। উপযুক্ত প্রতিদানই বটে!!!

M. Mushehooddin's Papers on Oudh.

আক্রমণের চেষ্টা দেখিতেছে—এই প্রকার গুজব ওঠাতে ইংরাজ নবাব উজীরের রাজ্য রক্ষার্থে চুণার ও এলাহাবাদ দুর্গ নিজ দখলে লইয়া সুদৃঢ় করিবার প্রস্তাব করিলেন। জানিনা কি কারণে সুজা অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। মারহাট্টারা পশ্চিম হইতে ও রোহিল্লারা উত্তর দিক হইতে অযোধ্যা আক্রমণ করিবার কল্পনা করিতেছিল কিন্তু চুণার ও এলাহাবাদ ক্রমান্বয়ে অযোধ্যার দক্ষিণ ও পূর্ব্বে অবস্থিত,—এই দুর্গদ্বয় দখল লইয়ে কি প্রকারে ইংরাজ অযোধ্যা রক্ষা করিবেন তাহা তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন! যাহা হউক এই কৌশলে চুণার দখল করিয়া কোম্পানী চির-সঞ্চিত মনোসাধ পূর্ণ করিলেন—এবং সুজার সহিত আর কোন প্রকার নূতন বন্দোবস্ত করিবেন না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহাও ভঙ্গ করিলেন।

সুজা এতকাল ধরিয়া ইংরাজের দাবিদাওয়া নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু আর পারিলেন না। দাহ্-প্রলেপের ন্যায় কোম্পানীর এই সমস্ত নিত্য নূতন বন্দোবস্ত তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি গবর্ণর জেনারেলের সহিত বেনারসে সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

হেষ্টিংস সাহেব সেই সময়ে বাঙ্গলার গবর্ণর। তাঁহার সময়ে কোম্পানীর রাজস্বের অতিশয় সঙ্কটময় অবস্থা। টাকার অকুলান চারিদিকে, অথচ ডাইরেকটারেরা সমুদ্র পার হইতে "আরও টাকা চাই" বলিয়া দাবি করিতেছিলেন। ন্যায় পথে থাকিয়া অবশ্য এই টাকা সংগ্রহ হইবে—অথচ প্রজারও কোন অনিষ্ট বা উৎপীড়ন হইবে না—ডাইরেক্টারেরা এ উপদেশ দিতেও ক্রুটি করেন নাই। অন্য কোন ধর্ম্মভীরু লোক এই সময়ে কোম্পানীর গবর্ণর থাকিলে বোধ হয় চাকরী ছাড়িয়া পালাইতেন। কিন্তু হেষ্টিংস সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, এত লাভের, এত সুখের চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং সদসৎবৃত্তি পরিশূন্য হইয়া—ন্যায় অন্যায় বিচারে ইচ্ছা করিয়া অন্ধ হইয়া হেষ্টিংস সাহেব চাকরি বজায় রাখিয়া ডাইরেক্টরদের বাসনা পূর্ণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। দিল্লীর বাদসাহ এই সময়ে হীন প্রতাপ হইয়াছিলেন, ইংরাজও জানিতেন আর ত তাঁহার নিকট ফারমান্ লইতে যুক্ত কর দাঁড়াইতে হইবে না—তবে আর কিসের ভয়—সুতরং ছল খুঁজিয়া তাঁহার নিকট হইতে ১৭৬৫ সালের সন্ধি-প্রদত্ত কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ কাড়িয়া লইলেন। কে তাহাতে বাধা-দেয়? কোম্পানীর নাম তখন আর্য্যবর্ত্তে ধারে ধীরে স্বীয় মোহিনী মায়া বিস্তার করিতেছিল। হেষ্টিংস এই দুইটী প্রদেশ লইয়া দেখিলেন ইহাতে তাঁহার কোনও উপকার হইবে না—কিন্তু সুজা উদ্দৌলাকে বিক্রয় করিতে পারিলে এক ঢিলে দুইটী পাখি মারা হইবে। এই দুই প্রদেশ ক্রয় প্রস্তাবে সুজাউদ্দৌলাও সম্মত হইলেন। ১৭৭৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বারাণসীতে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল—এই সন্ধি-বলে কোম্পানি সুজাকে কোরা ও এলাহাবাদ ৫ কোটী টাকায় বিক্রয় করিলেন। ইহাও

উক্ত সন্ধিপত্রে বিশেষ করিয়া বলা হইল—"এই দুই প্রদেশ সম্বন্ধে কোম্পানী তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের সহিত ভবিষ্যতে আর কোন পরিবর্ত্তিত বন্দোবস্ত করিবেন না।" কিন্তু যাঁহারা অযোধ্যার বর্ত্তমান রাজনৈতিক ইতিহাস আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন—ইংরাজ এই সন্ধির উল্লিখিত স্বত্ব রক্ষা করিয়া চলেন নাই। অধিক পরের কথা নয়—সাদত আলির সময়েই শিক্ষিত কপোতের ন্যায় এই দুই প্রদেশ নব প্রভুর হস্ত হইতে—পুরাতন পালকের নিকট উপস্থিত হয়।

ইংরাজের সহিত সংমিশ্রণে সুজার প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইল—তাঁহার রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইল—দুর্গ দুইটী হস্তচ্যুত হইল—সেনাবল কমিল—এবং সন্ধির ক্রমাগত পরিবর্ত্তনে ও নূতন দাবি দাওয়ায় তিনি ক্রমশঃ ইংরাজের চত্বরে আসিয়া তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইতে লাগিলেন। ওয়াজিদ আলির সময়ে যে বিষবৃক্ষ মুকুলিত হইয়া ফল প্রসব করিয়াছিল—সুজার সময়ে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল।

ইহার পর আর কি বলিব—সুজার সম্বন্ধে বলিবার কথা অধিক নাই। রোহিল্লা যুদ্ধই ইহার পরের উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। সুজার রোহিল খণ্ডের উপর বরাবরই নজর ছিল—হেষ্টিংসের নজর ছিল টাকার উপর। যেখানে রুধিরের বন্দোবস্ত—হেষ্টিংস সেইখানেই কোলাকুলি করিতে অগ্রসর। অযোধ্যার নবাবের নিকট অজস্র অর্থ লইয়া কোটী সংখ্যক প্রজারক্ষক, ন্যায়পরায়ণ, উদারমনা হেষ্টিংস ধর্ম্মবিধানে সেই নিরীহ—নিরপরাধী জাতিকে সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার পরিণাম ইতিহাসে প্রকাশিত—সে কথার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন কি? রোহিল্লারা হেষ্টিংসের নৃশংসাচারে স্বাধীনতা হারাইল বটে—কিন্তু পরে হেষ্টিংসকে এ বিষয়ের জন্য যথেষ্ট অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। সুদূরে সাগর পারে এড্‌মণ্ড বর্ক নির্দ্দোষী গৌরবান্বিত রোহিল্লাদের চির অমর করিয়া গিয়াছেন—ইংরাজ ইতিহাসে রোহিল্লা-কীর্ত্তি চিরকালই হেষ্টিংসের অপযশ ঘোষণা করিবে। একথাও বলিয়া রাখা আবশ্যক এই সময় হইতে সুজার রাজ্যে তাহার ব্যয়ে একদল সৈন্য রক্ষা করিয়া ইংরাজ তাহার দায়িত্বভার আরও বৃদ্ধি করিলেন।

এতক্ষণ ইতিহাসের কথা বলিলাম। এক্ষণে সুজার নিজের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক ডো সাহেব—সুজার সমসাময়িক ছিলেন। নবাব উজীরের সহিত তাঁহার বিশেষ শত্রুতা ছিল, তথাপি তিনি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই সুজার চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার মতে—"সুজা অতিশয় সুশ্রী সুগঠনবিশিষ্ট ছিলেন—শরীরে বলের ও সাহসের অভাব ছিল না। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় এক খড়্গাঘাতে তিনি একটা প্রকাণ্ড মহিষের শিরশ্ছেদ করিতে পারিতেন। তিনি কার্য্যদক্ষ, উচ্চাভিলাষী ও শ্রমকুশল শাসনকর্ত্তা

ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিপূর্ণ চক্ষু দেখিলেই সহসা তাঁহার প্রতিভা বিভাসিত মুখ মণ্ডলের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িত। প্রাতে উঠিয়া নবাব অশ্বারোহণে দলবল লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিতেন। মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ব্যাঘ্র, বরাহ, হরিণ প্রভৃতি শীকার করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিয়া সুশীতল সুবাসিত জলে স্নান করিতেন। আহারাদির পর অপরাহ্নে কথন কথন রাজকার্য্য কথনও বা অন্তঃপুরে বেগমদিগের সহবাসে কাঁটাইতেন। স্কট ও ফ্রাঙ্কলিন নামক আর দুই জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ—সুজাকে "সুদক্ষ ন্যায়প্রিয়, উন্নত চরিত্র, স্থির বুদ্ধি, প্রজা সুখবর্দ্ধনেচ্ছু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এতদূর লোকপ্রিয় ছিলেন—সে জনরব এই—রোহিল্লাপতি হাফেজ রহমতের পুত্রেরাও তাঁহার মৃত্যুতে অশ্রুপাত করিয়াছিল। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ (বিনয় বাহাদুর) সুজার প্রধান মন্ত্রীর কর্ম্মে অভিষিক্ত ছিলেন।

স্বনাম খ্যাত স্বাধীন প্রকৃতি সার হেন্‌রি লরেন্স সুজার সম্বন্ধে অতি উচ্চদরের মত দিয়াছেন। তাঁহার মতে সুজা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, ভারতীয় শাসনকর্ত্তাদের সাধারণ গুণবিশিষ্ট ছিলেন। সাদত খাঁ ও সফ্‌দার জঙ্গ বীরপুরুষ ছিলেন—দুরাণী ও মারহাট্টাদিগের বিরুদ্ধে অনেকবার তাঁহাদের সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু সুজাও এপক্ষে বড় কম ছিলেন না। কি প্রকারে সুজা ইংরাজের বিরুদ্ধে বক্‌সারে অস্ত্র চালনা করিয়াছিলেন ও কি প্রকারে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন এ কথা আজও অযোধ্যায় গল্পচ্ছলে কথিত হইয়া থাকে। জনশ্রুতি এই—তাঁহার নিজ কর্ম্মচারীরা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কামানের মধ্যে যুদ্ধের সময় পাটের গোলা ভরিয়া আওয়াজ করিয়াছিল নচেৎ বক্‌সারের যুদ্ধে ইংরাজের কি হইত বলা যায় না। এই সকল বর্ণনা হইতে দেখা যায় সুজা একজন উৎকৃষ্টদরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন—কিন্তু ইংরাজের সহিত ঘনসংমিশ্রণে ক্রমশঃ স্বাধীন প্রকৃতি হারাইয়া তিনি নিজের ও উত্তরাধিকারীগণের যথেষ্ট সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছিলেন।

সুজা উদ্দৌলা বহুবেগম নাম্নী এক পারসীক রমণীকে বিবাহ করেন। বহুবেগম স্বরূপশালিনী পতিপরায়ণা ও তেজস্বী রমণী ছিলেন। সুজা তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। বক্সরের যুদ্ধের পর যে সময়ে সুজা যুদ্ধক্ষেত্রে এক প্রকার নিঃসম্বল হইয়া পড়েন সেই সময়ে বহুবেগম কতকগুলি গুপ্ত রত্নালঙ্কার আনিয়া তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই প্রকার পতিভক্তির জন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সুজা তাঁহাকে কতকগুলি জায়গীর ও নগদ অর্থ দিয়া যান। বহুবেগমের কথা বেগমদিগের ধনাপহরণ প্রসঙ্গে পাঠক আরও শুনিতে পাইবেন।

বহুবেগমের কবরস্থান ফয়জাবাদ—ফয়জাবাদে সুজার রাজধানী ছিল। এই গোর স্থান নির্ম্মাণ জন্য বেগমসাহেব কোম্পানীর হস্তে তিনলক্ষ টাকা রাখিয়া যান। কবরের রক্ষার জন্য, অতিথী সেবার জন্য ও যে সকল দাস দাসী থাকিবে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বা-

হার্থ অন্য প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া যান। ১৮১৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় কিন্তু ১৮৫৭ অব্দে কবর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ইংরাজ ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এক্ষণে প্রায় ৫০০০ টাকা বার্ষিক দিয়া থাকেন।

আসফ্‌উদ্দৌলা—সুজার মৃত্যুর পর অযোধ্যার মসনদ অধিকার করেন। ইনি অযোধ্যার চতুর্থ নবাব ও দিল্লীর বাদসাহের তৃতীয় উজীর। হীনবীর্য্য সাহআলমকে দুর্বৃত্ত জাবিতা খাঁর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া আসফ্‌উদ্দৌলা বাদসাহ কর্ত্তৃক দিল্লী দরবারের "উজীর" নিযুক্ত হন। তাঁহার রাজ্যারোহণের পর হইতে অযোধ্যার রাজনৈতিক আকাশ ক্রমশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সুজা যদিও অনেকটা স্বাধীনভাবে কাটাইয়া ছিলেন কিন্তু আসফ পিতার ন্যায় স্বাধীন ভাবে না কাটাইয়া অধিক পরিমাণে ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন। তিনি যতদিন রাজত্ব করিয়া ছিলেন ততদিনই ইংরাজ সমভাবে তাঁহাদের উপর যথেচ্ছা-ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলেন। প্রকৃত ঘটনাগুলি না বুঝাইলে একথা বিশেষ পরিস্ফুট হইবে না—সুতরাং আসফ সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ দিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার সময়ের অযোধ্যার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

সুজাও কবরস্থ হইলেন—ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ "তাঁহার মৃত্যুর সহিত পূর্ব্বসন্ধির সমস্ত স্বত্বই লোপ হইয়াছে" বলিয়া—দৃঢ়পদে, আশাপূর্ণ মনে—নূতন নবাবের সহিত সন্ধিবন্ধনে অগ্রসর হইলেন। সুজার শরীর কবরে জুড়াইতেছিল, কিন্তু আসফ পিতার হইয়া সমস্ত যন্ত্রণা ভুগিতে লাগিলেন। সুজার সহিত বন্দোবস্ত ছিল—কোম্পানীর এক দল সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ তাঁহার রাজ্যেই থাকিবে ও তিনি ২,১০০০০, টাকা ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক সাহায্য করিবেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত সংখ্যক সৈন্যের ব্যয়ভার স্বরূপ ইহার উপর আরও ৫০০০০, টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইল। বোধ হয় সৈন্যদের খোরাক্ বৃদ্ধি পাইয়াছিল! কলিকাতা কৌন্সিলের প্রধান যুক্তি এই "সুজার মৃত্যুর সহিত পূর্ব্বের সন্ধির সমস্ত কথাই শেষ হইয়াছে।" কামধেনু পীড়ন করিলে—প্রচুর ক্ষীররস পাওয়া যায় বুঝিয়া কোম্পানী নবাবকে আরও পীড়ন আরম্ভ করিলেন। বারাণসীর উপর ইংরাজের বরাবরই নজর ছিল। প্রধান হিন্দুতীর্থ বেনারস হইতে নবাবের প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা আয় হইত। সুজার সময়ে একবার বেণারস লইবার কথা উঠিয়াছিল কিন্তু তিনি ইহাতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হন। সুতরাং এ বিষয়ের সকল কথাই তখন চাপা পড়িয়া যায়। আসফ উদ্দৌলার সময় বারাণসী অধিকারের বাসনা পুনরায় তাঁহাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। রেসিডেণ্ট সাহেব নবাবের বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী মুক্তিয়ার উদ্দৌলার সহিত চক্রান্ত করিয়া বারাণসী ইংরাজ অধিকারে প্রদান করিবার জন্য গোপনে গোপনে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক্ করিয়া ফেলিলেন। প্রকৃত প্রভুভক্ত ভৃত্যই বটে!! * কিন্তু এ সম্বন্ধে

* Vide. Seir ul Matakherin. Mustapha's Translations.

আবার আর একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। নবাব আসফ উদ্দৌলা তাঁহার ভ্রাতা যাহাতে রোহিল খণ্ডের শাসনকর্ত্তৃত্ব না পান—এই সম্বন্ধে তাঁহার সহায়তা করিতে রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করেন—কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব বিনা রুধিরে কোন কাজ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বারাণসী ছাড়িয়া দিবার কথা হইল—অমনি তিনি সাহায্যদানে সম্মত হইলেন। ফলতঃ নবাবের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হউক—বারাণসী যে অন্যায় উপায়ে ইংরাজের করতলস্থ হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। সাধারণ কথায় ও সাধারণ লোকে এরূপ করিলে—তাহাকে সকলে কি বলিয়া থাকে তাহার বিবেচনা-ভার পাঠকের উপর রহিল। আসফ উদ্দৌলার সহিত—ব্রিস্টো সাহেব যে নূতন সন্ধি করেন—তাহার স্বত্বানুসারে (১) নবাব কোন ইউরোপীয়কেই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিনা সম্মতিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। (২) দিল্লীর বাদসাহ উভয় পক্ষের প্রতিকূলে যে বন্দোবস্ত করিবেন তাহাতে কোন পক্ষেই মত দিবেন না। (৩) কোরা ও এলাহাবাদ নবাবের থাকিবে—ও বেনারস গাজিপুর ইত্যাদি ইংরাজের দখলে আসিবে। (৪) সৈন্য রক্ষার ব্যয় আরও ৫০ হাজার টাকা বাড়ান হইবে এবং পিতৃকৃত সমস্ত ঋণ নবাব নির্ব্বিবাদে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। (৫) ইংরাজ নবাবের হইয়া দোয়াব, রোহিলখণ্ড কোরা এলাহাবাদ প্রভৃতি রক্ষা করিবেন ও এই উদ্দেশ্যে আর একদল "স্বল্পকাল স্থায়ী সৈন্য" (Temporary Brigade) বাৎসরিক ১২লক্ষ টাকা ব্যয়ে অযোধ্যায় থাকিবে। "চিরস্থায়ী" সৈন্যদলের সহিত ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক। (৬) ইহা ব্যতীত মেজর পামার সাহেব কোম্পানীর এজেণ্ট স্বরূপে বৎসরে দুই লক্ষ টাকা বেতনে রেসিডেণ্টের সাহায্যার্থে অযোধ্যায় দরবারে থাকিবেন। নবাব উজীরের উপর অযথা ব্যয় ভার চাপান সম্বন্ধে প্রথমে ডাইরেক্টারদের বিশেষ আপত্তি ছিল—কিন্তু তাঁহাদের ভারতীয় কর্ম্মচারীরা যখন লাভ বাড়াইয়া সকল কার্য্য সিদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিলেন তখন তাঁহারা অতিশয় আপ্যায়িত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। * এই সন্ধির চতুর্থ স্বত্বানুযায়ী ইংরাজ আসফের নিকট হইতে—তাঁহার পিতৃকৃত ঋণের বাকী বকেয়া সমস্তই আদায় করিয়া লইলেন—কিন্তু ইহাঁরাই পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"সুজার মৃত্যুতে তাঁহার সহিত সমস্ত বন্দোবস্তই লোপ হইয়াছিল"—সুতরাং কি প্রকারে সেই লুপ্ত

* It is with singular satisfaction we observe, at any time the attention paid by our servants to the great interest of their employers—and it is with peculiar pleasure we signify our entire approbation of the late Treaty concluded with Nawab-Asufudowla son of Sujaudowlah by which such terms are procured, as seem to promise us solid and permanant advantages Form the Court of Directors—to the Govr: Genl: in Council.

বন্দোবস্তের পাওনা টাকা আদায় করা যুক্তি সঙ্গত হইয়াছিল—পাঠক তাহা অনুমান করিয়া লইবেন।

"স্থায়ী" ও "অস্থায়ী" অর্থাৎ "Permanant" এবং "Temporary" আখ্যা দিয়া যে দুই দল সৈন্য অযোধ্যার শান্তি ও সীমা রক্ষার্থে রাখা হইয়াছিল—নানা রকমে নবাব তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত বিনাবাক্য ব্যয়ে অনেক সহিয়াছিলেন কিন্তু আর পারিলেন না। এই অকারণ-নিযুক্ত অসংখ্য সৈন্য রাজির অনর্থক ব্যয় সংকুলান করিয়া তাঁহার পরিপূর্ণ-কোষ শূন্য হইতে লাগিল। তিনি এই সময়ে বাধ্য হইয়া হেষ্টিংসকে পত্র লিখিলেন "এপ্রকার ব্যয়ভার বহন করিতে আমি নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি; আমার দরবারের আবশ্যকীয় খরচ সমস্ত কমাইয়া দিয়াছি—রাজ পরিবারের অনেকের মাসহারার টাকা চতুর্থাংশ করিয়া দিয়াছি—ইহাতে তাহাদের বড়ই দুর্দ্দশা হইয়াছে! আমার নিজ দরবারের কর্ম্মচারী সকলেরও বেতন বাকী পড়িয়া রহিয়াছে—এবং আমার নিজ ও পিতৃঋণ এখনো সমস্ত শোধ হয় নাই—খরচ বাড়িতেছে দেখিয়া খাজনার হার বাড়ান হইতেছে কিন্তু তাহাতে কেবল প্রজারাই মরিতেছে। বেতন না পাওয়াতে আমার পুরাতন কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্তও চাকৃরি ছাড়িয়া যাইতেছে—ইহাতে আমার খাজনা আদায়ের পক্ষে বড় অসুবিধা হই-তেছে। আমার নিজ নিয়োজিত সৈন্য ছাড়িয়া যাইতেছে—তালুকদারেরা যদি বিদ্রোহী হয় তাহা হইলে তাহাদের দমনোপযুক্ত সৈন্যও আমার নাই। আমার অধীনে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী আছে তাহারা সকলেই স্বস্ব প্রভু—এ সৈন্য রাখায় আমার কোন লাভ নাই অতএব এগুলি হইতে আমার অব্যাহতি দেওয়া হউক। † হেষ্টিংস মনে মনে ভাবিয়া ছিলেন—আসফ্উদ্দৌলা তাঁহাদের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। তিনি যে এতদূর সাহস করিয়া তাহার নিজের ও রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাকে পত্র লিখিবেন—ইহা তাঁহার আদৌ ধারণা হয় নাই। সুতরাং নবাবের পত্র পাইয়া তিনি অতিশয় রুষ্ট ও মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি রেসিডেণ্টকে লিখিলেন—"নবাব যে সকল নজীর দেখাইয়া সৈন্যভার কমাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন—তাহা নানা কারণে গ্রহণীয় নহে। তিনি রাজ্য রক্ষার্থ আমাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় এই সৈন্যদল অযোধ্যায় রাখিয়াছেন—সৈন্য সেখানে রাখা বা সরাইয়া দেওয়ার কর্ত্তব্যতা বিবেচনার ভার আমা-দের উপর—ইহা তাঁহার কার্য্য বা কর্ত্তব্য ভুক্ত নহে। ‡ মজার কথা বটে!! এই পত্র-খানির ভাব দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন অযোধ্যা সম্বন্ধে হেষ্টিংস কতকদূর যথেচ্ছা

† Select Committee. 10th Report Appendix 7.

‡ Vide—10th Report select Committee. Appendix 9.

ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছিলেন। * আমার নিজের রাজ্য রক্ষার্থ সৈন্যের প্রয়োজন, আমি দেখিতেছি তাহাতে আর প্রয়োজন নাই—আমার নিজের কার্য্যের গুরুত্ব আমি বুঝিতে পারিলাম না অপরে তাহা বুঝিল—এ প্রকার যথেচ্ছাচার-পূর্ণ কূটনীতি অযোধ্যা সম্বন্ধে পরিচালন করিয়া হেষ্টিংস জগতের সমক্ষে কেন—পরলোকে ও যথেষ্ট অপরাধী হইয়াছিলেন। মানবের আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি অনেক সময়ে তাহাকে ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতে উত্তেজিত করে। হেষ্টিংস আত্ম রক্ষার জন্য--নিয়োগ-কর্ত্তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য—নবাবের প্রতি এই সকল নীতিবিগর্হিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিটা তাঁহার চরিত্রের প্রবলাংশ। "আত্মরক্ষা" শব্দে এইস্থলে দোষী ব্যক্তির আত্মরক্ষা বুঝিতে হইবে। গত বৎসরের ভারতীতে নন্দকুমারের বৃত্তান্ত পড়িয়া বিশেষ প্রতীতি হয়, আত্ম রক্ষার জন্যই হেষ্টিংস চক্রান্ত করিয়া নন্দকুমারকে প্রাণে মারিলেন। অযথা সৈন্যভার নবাবের স্কন্ধে চাপাইয়া কোম্পানী নবাবের উপকার করিতেছিলেন কি না সে সম্বন্ধে কৌন্সিলের স্বাধীন প্রকৃতি সদস্য ফ্রান্সিস্ সাহেব কি লিখিয়াছেন দেখুন। ফ্রান্সিস্ এক দিন প্রকাশ্য কৌন্সিলে বলিয়াছিলেন—"Notorious ! that the English army had devoured his Revenues and his country under color of defending it." --(Bengal Secret consultations 15 th Dec: 1779.) এ সম্বন্ধে ইহার পর আর আমরা কোন কথা বলিতে চাই না।

আস্ফের প্রথম পত্রের ফল পাঠক উপরে দেখিলেন—ইহার পর কোম্পানীর কর্ম্মচারিরা নবাবের নিকট তাহাদের সমস্ত পাওনা টাকার জন্য ঘোরতর তাগাদা আরম্ভ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫বৎসরের দেনা ক্রমশঃ পরিশোধের পরও সুদের সুদ ধরিয়া মোট দেনা এক কোটী চল্লিশলক্ষের ও উপর দাঁড়াইল। কলিকাতা কৌন্সিল ক্রমাগতঃ পীড়ন করিতে লাগিলেন, নবাব বলিতে লাগিলেন—"আমার যাহা কিছু ছিল সব দিয়াছি—এখন আর কোথা হইতে দিব ?" এই ঘটনার

* অযোধ্যার সুপ্রসিদ্ধ কমিশনার সুবিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ লেখক মহাত্মা স্যরহেনরি লরেন্স এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন—

"Most assuredly, Warren Hastings Lord Teign mouth, Lord wellesley, Lord Hastings, Lord Aucland would never have acted in private life, as they did in the capacity of Governors towards prostrate Oudh. Lords Cornwillis, Minto, Bentinck and Ellenborough were the only governors who did not take the advantage of the weakness of Oudh or to increase its burdens. The *earliest* offender against Oudh was W. Hastings though Mr Gleig tried to defend him with the energy of a Biographer."

পর হেষ্টিংস নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তাব করেন এবং ডাইরেক্টারদের আজ্ঞার বিরুদ্ধে—মিডলটন সাহেবকে (তাঁহার নিজের লোক) অযোধ্যায় রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে ইংরাজি ১৭৮১ সাল পড়িয়াছে। এই বৎসর হেষ্টিংস উপর্য্যুপরি দুইটী কুকার্য্য করিয়াছিলেন। রাজা চেৎসিংহের সর্ব্বনাশ করিয়া তিনি এই সময়ে বেণারসে অবস্থান করিতেছিলেন। নবাব—চেৎসিংহের পরিণামের কথা শুনিলেন, একবার নিজেরও ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা ভাবিলেন—হেষ্টিংসের সহিত দেখা করা ভিন্ন আর অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না। হেষ্টিংসের নিকট লোক দ্বারায় সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু তিনি নবাবের এ প্রস্তাব বড় সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন আমি বারাণসীতে এরূপ বিপদে পড়িয়াছি ভাবিয়া হয়তঃ নবাব আমার সহায়তায় অগ্রসর হইতেছেন। এই আত্মাভিমানে মুগ্ধ হইয়া বিশেষ প্রগল্‌ভার সহিত তিনি নবাবকে বারাণসীতে আসিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু নবাব উজীর নিজের গায়ের জ্বালায় ছট্‌পট্‌ করিতেছিলেন—ইংরাজের দাবি দাওয়ায় তাঁহার রাজ্য ছারখারে যাইতেছিল তাঁহার মনের সুখ নষ্ট হইতেছিল, অধিকার কমিতেছিল, কোষাগার শূন্য ও প্রজাকুল জর্জ্জরিত হইতেছিল—সুতরাং তিনি থাকিতে না পারিয়া চুণারে (চণ্ডালগড়) আসিয়া বাঙ্গলার গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে মিলনে উভয় পক্ষের অনেক সুখ দুঃখের আদব কায়দার, দেনা পাওনার কথা হইল—নবাবের অদৃষ্ট অনেকটা ফিরিল বটে—কিন্তু সেই নিরাপরাধিনী, অসূর্য্যম্পশ্যা, চিরসুখভোগীনী বেগমগণের সর্ব্বনাশের কথাও এ সম্মিলনে বাকি থাকিল না।

চুনারের মিলনে যে সমস্ত বন্দোবস্ত হয়, তদনুযায়ী ধরিতে গেলে কোম্পানী,নবাবের প্রতি যথেষ্ট উদারতাই দেখাইলেন এরূপ বোধ হয়। এই বন্দোবস্তে এই স্থির হইল—নবাবের সহিত নূতন সন্ধিতে যে Temporary Brigade (অস্থায়ী সৈন্যদল) তাঁহার রাজ্য রক্ষার্থে রাখা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া লওয়া হইবে কেবল রেসিডেণ্ট সাহেবের রক্ষার জন্য ও সুজার সহিত সাবেক বন্দোবস্তানুযায়ী কয়েক দল সৈন্য অযোধ্যায় থাকিবে, এবং নবাব জায়গিরদারদের উপযুক্ত পেন্সন বরাদ্দ করিয়া যে যে জায়গীর অধিকার ভুক্ত করিতে চাহেন তাহাও করিতে পারিবেন ইত্যাদি। কিন্তু ইহার মধ্যে সাধারণের চক্ষু হইতে একটী বিষয় গোপন রাখিবার জন্য একটী যবনিকা দেওয়াছিল, যবনিকার অন্তরালে রহিল বেগমদিগের উচ্ছেদ কল্পনা। পরিণামে অশেষ লাভ ছিল বলিয়াই হেষ্টিংস নবাবকে একপ্রকার রেহাই দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পূর্ব্বে যখন নবাব স্বীয় দুরবস্থা সম্বন্ধে হেষ্টিংসকে কলিকাতায় পত্র লিখিয়াছিলেন তখন তিনি তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে পত্রের মাথায়

কাঁঠাল ভাঙ্গিবার সুযোগ দেখিয়া তাঁহা বিশ্বাস করিলেন। হেষ্টিংস সাহেব নিতান্ত বেরসিক লোক ছিলেন না—মূলে রস পাইয়াছিলেন বলিয়াই সৈন্যদল উঠাইয়া লইয়া নবাবের সুবিধা করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এড্‌মণ্ডবার্ক ও ব্রিন্‌সলী শেরিডান অযোধ্যার বেগমদিগকে অমর করিয়া গিয়াছেন—সুদূরে সাগর পারে যে সেরিডানের বজ্রনাদী, বিচিত্র ভাষা জড়িত, লোমহর্ষক কাহিনীপূর্ণ বেগম-অত্যাচারের কথা শুনিয়া ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে সম্ভ্রান্ত মহিলারা মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, যাহাদের জন্য হেষ্টিংস ও ইলাইজা ইম্পি পরিশেষে বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছিলেন—তাহাদের কথা এই প্রবন্ধে আদ্যোপান্ত বলিতে গেলে স্থানাভাবের বিশেষ সম্ভাবনা। পরে "অযোধ্যার বেগম" শীর্ষক দিয়া আমার এ বিষয়ের পুনরালোচনা করিবার চেষ্টা দেখিব। বর্ত্তমানে এ বিষয়ে প্রসঙ্গোপযোগী কয়েকটী কথা বলিব।

মৃত নবাব সুজাউদ্দৌলার প্রিয়তমা পত্নী, বহু বেগম ও তাঁহার পূজনীয়া বৃদ্ধা মাতা "বড় বেগম" অযোধ্যা প্রদেশের কতকগুলি জায়গীরের স্বত্ব হইতে আপনাদের খরচ চালাইতেন। সুজা ইহাদের বড় ভাল বাসিতেন বলিয়া এই জায়গীর গুলি ও বহু সংখ্যক নগদ টাকা ইহাদিগকে মৃত্যুকালে দিয়া যান। জনরব—সুজা পরিত্যক্ত এই অর্থ রাশিকে বহুগুণ করিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। হেষ্টিংসের কাণে একথা অনেক দিন গিয়াছিল—কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনও কথা তুলিবার বিশেষ সুযোগ ঘটে নাই। বারাণসীর ব্যাপারে অর্থ সম্বন্ধে হেষ্টিংস বড় নিরাশ হইয়াছিলেন—সুতরাং বেগমদিগের দ্বারা সেই অদম্য অর্থ পিপাসা তৃপ্তি করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে সুজার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই—তাঁহার মাতা বহু বেগম ইংরাজ গবর্ণরের নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করেন "আমার পুত্র আসফ্ উদ্দৌলা আমার নিকট হইতে দফায় দফায় প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কোম্পানীর দেনা শোধের জন্য লইয়াছে—কিন্তু এক্ষণে পুনরায় আবার ৩০ লক্ষ টাকার দাবি করিতেছে আপনারা যদি দায়িক হন—অথবা আমার প্রতি আসফ্ ভবিষ্যতে আর কোন অত্যাচার না করিতে পারে এরূপ সুবিধাও করিয়া দেন তাহা হইলে আমি এই বিশ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।", গবর্ণমেণ্ট—"নবাব ভবিষ্যতে তাঁহার উপর আর কোন অত্যাচার করিতে পারিবেন না"—এইরূপ আশ্বাস প্রদান করাতে বেগম আসফ্‌উদ্দৌলাকে উক্ত ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ইহার পর কিয়ৎকাল মাতার উপর নবাবের দাবি দাওয়া স্থগিত থাকিল বটে কিন্তু বড় বেগমের উপর (তাঁহার পিতামহী) তাঁহার বড় হাত দরাজ হইয়া উঠিল। রেসিডেণ্ট মিডলটন সাহেব লিখিলেন—"নবাব তাঁহার পিতামহীর উপর বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন—বড় বেগম সেই জন্য মক্কা যাইতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু নবাব তাঁহাকে যাইতে দিতেছেন না—কেন না এরূপ করিলে বেগমের সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হস্তান্তরিত হইয়া পড়িবে।" ইহার পর বেগমেরা এই

বিষয় রেসিডেণ্ট সাহেবকে জানাইলে তিনি হেষ্টিংসের আজ্ঞামত বড় বেগমকে "নবাব তাঁহার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবেন না এইরূপ আশ্বাস দেন। এই সকল কথার আন্দোলন চলিতেছে—এমন সময়ে কলিকাতা কৌন্সিল পুনরায় বহু বেগমের নিকট হইতে নবাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাইলেন। মিডল্‌টন সাহেব এই মর্ম্মে লিখিলেন—"নবাব বেগমের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে বড় বাড়াইয়াছেন—আমি তাঁহাকে অনুযোগ ও উপদেশ দ্বারা যত দূর রাখিতে পারি তাহার চেষ্টা করিয়াছি। বহু বেগমের উপর অত্যাচার নিবারণ সম্বন্ধে আমরা সন্ধিসূত্রে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ আছি * * * এবিষয়ের সদ্‌যুক্তি কি হইতে পারে ? (১) গবর্ণর জেনারল ও কৌন্সিল উত্তর পাঠাইলেন (এই সময়ে মন্‌সন ক্লেবারিং মরিয়া গিয়াছেন—সুতরাং হেষ্টিংসের কৌন্সিলে অক্ষত ক্ষমতা) "বড় বেগমের প্রতি অত্যাচার সম্বন্ধে আমাদের কোন হাত না থাকিলেও আপনি নবাবকে কোম্পানীর নামে জানাইবেন যে তাঁহার এই প্রকার ব্যবহারে আমরা অতিশয় দুঃখিত। ছোট বেগমের সম্বন্ধে আমরা একপ্রকার প্রতিভূ স্বরূপ আছি। নবাব পূর্ব্ব সন্ধির স্বত্ব মানিয়া চলেন এই আমাদের অনুরোধ।" ১৭৭৮ সালে এই সমস্ত লেখালেখি হয়—ইহার পর ৮১ সালে হেষ্টিংসের সহিত নবাব চুনারে সাক্ষাৎ করেন। যে বেগমদিগকে হেষ্টিংস বরাবরই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিকেই পুনরায় স্বহস্তে ধ্বংশ করিবার জন্য তিনি নবাবের সহিত চুণারের উন্নত দুর্গে বসিয়া মন্ত্রণা আঁটিলেন। হৃদয়ের কমনীয় বৃত্তি গুলি বিসর্জ্জন করিয়া ন্যায় ও সমদর্শিতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া লোভের বশবর্ত্তী হইয়া হেষ্টিংস পরিশেষে এই ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নিরপরাধী বেগমদের উপর কয়েকটী গুরুতর অভিযোগ আনা হইল যে—তাঁহারা চেৎ সিংহকে সাহায্য করিবার জন্য অযোধ্যায় বিদ্রোহ উত্তেজনা করিবার চেষ্টা করিয়া নবাবের শাসন কার্য্যে গোলযোগ উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বেগমদিগের ধনাপহরণ কার্য্যে হেষ্টিংস সাহেবই প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু এই ঘোর নৃশংসতাময় চক্রান্তে আর ছয় জন অন্তঃসার শূন্য ব্যক্তি তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের সহাধ্যায়ী ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারক ন্যায়পরায়ণ ইলাইজা ইম্পিও বন্ধু স্নেহে আবদ্ধ হইয়া (যে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে তিনি নন্দকুমারকে বিনাদোষেই ইহলোক হইতে অপসৃত করেন) হেষ্টিংসের সাহায্য করিয়াছিলেন। তৃতীয় সহায় নেথিনিএল মিডলটন, ইনি হেষ্টিংসের নিজের লোক ইহার দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার জন্যই হেষ্টিংস ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট Bristow সাহেবকে লক্ষ্ণৌ দরবার হইতে

(১) Mr Middleton's Letter to Govr: Genl: in council dated Fyzabad 4: Feb 1778.

সরাইয়া ছিলেন। চতুর্থ সহায় হায়দর বেগখাঁ—ইনি নাম মাত্র নবাবের মন্ত্রী ছিলেন—এবং হেষ্টিংস সাহেব স্বয়ং নির্ব্বাচিত করিয়া ইহাকে উজীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন কর্ণেল হানে ও আলি ইব্রাহিম খাঁ নামক আর দুই জন লোক এই নিন্দনীয় কার্য্যে হেষ্টিংসের সহায়তা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শেষোক্ত দুইজন বেগমদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (২)

নবাব আস্‌ফ উদ্দৌলা হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ সময়ে এই ব্যাপারে যত সহজেই স্বীকৃত হউন না কেন—মাতা ও পিতামহীর সম্পত্তি হরণ করিতে কার্য্যকালে তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র ইম্পি সাহেব স্বীয় সীমাবহির্ভূত হইলেও লক্ষ্ণৌএ বেগমদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া কেবল জনরবের উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের অপরাধিনী স্থির করিলেন। বেগমেরা কি প্রকারে বিদ্রোহে লিপ্ত হইতে পারেন—পাঠক এই সামান্য ঘটনা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। বেনারসে চৈৎ সিংহের বিদ্রোহ ১৬ই আগষ্ট তারিখে ঘটে। কিন্তু ইহার এক মাস তিন দিন পরে অর্থাৎ ১০ সেপ্টেম্বর নবাবের সহিত হেষ্টিংসের চুণারে সাক্ষাৎ হয়! চুণারে সাক্ষাতের সময় বেগমদিগের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ হইবার পূর্ব্বেই হেষ্টিংস নবাবকে ধনাপহরণ জন্য উপদেশ দেন। ইলাইজা ইম্পি পরে লক্ষ্ণৌ গিয়া সাক্ষীগণের এফিডেবিট গ্রহণ করেন। দণ্ডাজ্ঞা পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়া পরে বিচার করা হইয়াছিল—ইহা পার্লামেণ্টের সমক্ষে হেষ্টিংসের নামে মহাভিযোগে বেশ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ইম্পির যে সকল সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাও বেগমদের দোষী প্রমাণ করিতে পারে নাই। আরও এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বেগমদের বিদ্রোহানুষ্ঠান কি প্রকারে সম্ভবে ?

বহু বেগমের নিকট আসফ উদ্দৌলা—কেবল যে মাতৃ ঋণে আবদ্ধ ছিলেন তাহা নহে—তাঁহার সহায়তায় তিনি মসনদ পাইয়াছিলেন—যখন সুজা রোষপরবশ হইয়া এক দিন তাঁহাকে কাটিতে গিয়াছিলেন—তখন বহু বেগম স্বীয় স্কন্ধে অস্ত্রাঘাত লইয়া মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এ সকল কথা নবাবের মনে একে একে জাগিয়া উঠিল। হেষ্টিংসের নিকট প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইলেও লক্ষ্ণৌ আসিয়া তিনি এ বিষয়ে ক্রমাগত অসম্মতি দেখাইতে লাগিলেন। মিডলটন সাহেব এই কথা হেষ্টিংসকে জানাইলে—তিনি তাঁহাকে বল প্রয়োগের ও নবাবের ক্ষমতার উপর স্বাধীন ক্ষমতা চালাইবার পরামর্শ দিলেন। নবাব এইবার বড় বিপদে পড়িলেন—সমস্ত অযোধ্যা প্রদেশের সমক্ষে এই প্রকারে অন্তঃসারশূন্য ও ক্ষমতাহীন প্রমাণিত হওয়া অপেক্ষা তিনি এই নৃসংশকার্য্যে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইলেন।

(২) Sheridan's speeches Westminister Hall 34th day Jan 10 th.

রেসিডেণ্ট সাহেবকে সঙ্গে লইয়া নবাব আসফ উদ্দৌলা ১৭৮২ সালের ৮ই জানুয়ারি ফয়জাবাদে অসহায়া রমণীবৃন্দের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ১২ই জানুয়ারি বেগমদিগের রাজপ্রসাদের চারিদিকে সৈন্য সমাবেশ করা হইল। জওয়ার আলি খাঁ ও বেহার আলি খাঁ নামক দুই জন বৃদ্ধ, ও ভূতপূর্ব্ব নবাবের বিশ্বাসী খোজাকে অনাহারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নানাবিধ রাক্ষসোচিত যাতনা দিয়া ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হইল। ইহারা বেগমদিগের রক্ষক ছিল—কোথায় কি আছে সকলই জানিত—সুতরাং ইহাদের যন্ত্রণা দিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের অভীষ্ট পূর্ণ হইল। বেগমদিগকেও নিরাহারে বন্দিনী করিয়া রাখিয়া অনেক পীড়ন করা হইল। এ নৃশংসাচরণের কথা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আমরা লেখনা কলঙ্কিত করিতে চাই না। নবাব যে কেবল ইহাতে ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভ করিলেন তাহা নহে এই ব্যাপারে হেষ্টিংস সাহেবও নবাবের নিকট হইতে প্রায় দশ লক্ষ টাকা উৎকোচ লইলেন। ধন্য হেষ্টিংস! ধন্য তোমার ধনলোলুপতা!! হেষ্টিংসের সময়ে নবাব আসফ উদ্দৌলার যতদূর শোচনীয় অবনতি হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। পরে কর্ণওয়ালিস আসিয়া তাহার অনেক প্রতিকার করেন। ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া এক্ষণে আমরা নবাবের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিব।

নবাব আসফ উদ্দৌলার সময় হইতে প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্ণৌএর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আরম্ভ হইতে থাকে। সুজার রাজধানী ফয়জাবাদে ছিল—সুতরাং লক্ষ্ণৌএর উন্নতি কল্পে তিনি অতি অল্প কার্য্যই করিয়াছিলেন। আসফ উদ্দৌলা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। তিনি রিক্তহস্তে, পূর্ব্ব সঞ্চিত, ও তাঁহার নিজ আদায়ী রক্ষিত রাজস্বের অধিকাংশই লক্ষ্ণৌএর সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধনার্থে ব্যয় করেন। ইহার সময়েই বিখ্যাত "রুমীদরওয়াজা" নামক গগনস্পর্শী ও সুন্দর কারুকার্য্যময় ফটক নির্ম্মিত হয়। কনষ্টাণ্টনোপলের কোন ফটকের অনুকরণে নবাব আসফ উদ্দৌলা এই দরওয়াজা নির্ম্মাণ করেন। এই ফটকটী অতি সুন্দর শিল্পকৌশল-বিশিষ্ট খিলাননির্ম্মিত—এতাদৃশ উচ্চ খিলান দিল্লী ব্যতীত আর অন্য কোন স্থলেই দৃষ্টিগোচর হয় না। আজ কাল ইংরাজ রাজত্বে বড় বড় রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার মৎলব আঁটিয়া কত শত খিলানযুক্ত প্রসাদ তৈয়ারি করিতেছেন—কিন্তু ইহার ন্যায় সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় একটীও দেখিতে পাই না। নবাব আজ প্রায় ৯০ বৎসর লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন—কত শত ঝঞ্ঝাবাত, বৃষ্টি, এই সকল, প্রাসাদাংশের উপর সমভাবে বহিয়া গিয়াছে—তথাপি আজও ইহা অক্ষতভাবে দণ্ডায়মান। ঝড় বৃষ্টির কথা দূরে থাক্—সুপ্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইহার—ও লক্ষ্ণৌএর অন্যান্য বাড়ী গুলির উপর দিয়া কত শত গোলাগুলি চলিয়া গিয়াছে—তথাপি সামান্য আঘাত চিহ্ন ভিন্ন ইহাদের গাত্রে আর কোন ক্ষতি-লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। লক্ষ্ণৌএর প্রাসাদ গুলির মধ্যে প্রধান ইমামবাড়া,

হোসেনাবাদ, কৈশরবাগ, ছত্রমঞ্জিল, ও—লামার্টিনিয়ার সর্ব্বপ্রধান। প্রধান ইমামবাড়ী একটী সুবৃহৎ, সুপ্রশস্ত, সুন্দর শিল্পকার্য্যময়, সমাধিমন্দির। অধীশ্বর বিহনে ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা হতশ্রী হইয়াছে বটে তথাপি এখনও সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য হারায় নাই। দুইটী বড় বড় দ্বার পার হইয়া প্রবেশ করিলে,—প্রথমেই সম্মুখে একটী বিস্তৃত উঠান,—ও চারিদিকে সৌধমালা দৃষ্টিপথে পড়ে। ইহার পর কয়েকটী সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিলে আর একটী দরওয়াজা পার হওয়া যায়। এই দ্বিতীয় দরওয়াজা হইতে দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত উঠান ৫।৭ হাত নিম্নে বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকার ক্রমোচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর আসফ উদ্দোলার ইমামবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ফটক পার হইলেই একটী জলপূর্ণ, মার্ব্বলপ্রস্তরময় চৌবাচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিলাম, পূর্ব্বে এই চৌবাচ্ছা সুপরিস্কৃত জলে পরিপূর্ণ থাকিত, ও নেমাজের সময় ইহার জল ব্যবহৃত হইত।

এই প্রধান ইমামবাড়ী আসফউদ্দোলা স্বীয় কবরোদ্দেশে, সংগঠিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই প্রাসাদের মধ্যস্থলে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। সেই সমাধিস্থলের চতুর্দ্দিক রৌপ্যময় রেলিং দ্বারা বেষ্টিত—ও একখানি বহুমূল্য বস্ত্রে আবরিত। এই মার্ব্বল প্রস্তরময় সমাধির সম্মুখে, নবাব সাহেবের পাগড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। সমাধি মন্দির মধ্যে কয়েক খানি মোমের তাজিয়া আছে; ইমামবাড়ীস্থ একজন ভৃত্য একখানি তাজিয়া দেখাইয়া বলিল—ইহা আসফ উদ্দোলার সময়ে নির্ম্মিত। এ প্রকার সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত খিলানযুক্ত বাটী আমরা কখনও দেখি নাই। জগতে ইহা কোন দেশেরই অট্টালিকার অনুকরণে নির্ম্মিত নহে। ইহা প্রস্তুত করিতে এক লক্ষের উপর খরচ পড়িয়াছিল। আসফউদ্দোলা কয়েক জন বিখ্যাত স্থপতিবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিকে ডাকাইয়া ইহার Plan তৈয়ার করিতে আজ্ঞা দেন। তৎকালীন প্রধান স্থপতি কফিয়ৎ-উদ্দোলা, একটী নক্সা আঁকিয়া নবাবকে দেখাইলেন ও তাঁহার নকসাই মঞ্জুর হইল। এই বাটীর ভিত্তিমূল অতিশয় দৃঢ় ও সুগভীর ও সমুদায় গৃহটী সম্পূর্ণ-রূপে কাষ্ঠবর্জ্জিত—দিল্লীর বাদসাহী কয়েকটী প্রাসাদ ছাড়া এ প্রকার ধরণের খিলানওয়ালা বাটী আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার গঠন এতদূর সুদৃঢ় যে সিপাহী বিদ্রোহের ভয়ানক অবস্থায় ইহার উপর কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমাগত গুলি গোলা বর্ষণ হওয়াতেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই! ইহার মেঝের উপর দিয়া কয়েকটী ১৮ পাউণ্ডার কামান টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তথাপি মেঝিয়ার কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আজকাল বড় বড় সিবিল ইঞ্জিনিয়ার ইংরাজের রাজত্বে মোটা মাহিনা খাইয়া বড় বড় এমারত তৈয়ার করিতেছেন বটে—কিন্তু নবাবী আমলের এই সমস্ত অট্টালিকার সহিত বর্ত্তমানের তুলনা আদৌ হইতে পারে না। দেশীয় শিল্পের এই প্রকার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ দেখিয়া আমরা অতিশয় উল্লাসিত হইলাম—নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া শিল্পীর অনেক প্রশংসা করিলাম বটে—কিন্তু আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী

উল্লাসের মধ্যে বিষাদের কালিমাময়-ছায়া আসিয়া পড়িল। অতীতের স্মৃতি আমাদের মনে সহসা জাগিয়া উঠিল—মনে করিলাম যাহারা এই সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে তাহারা আজ কোথায়? প্রতিমাশূন্য চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায়—গৃহস্থশূন্য বসতবাটীর ন্যায়,—রাজাশূন্য রাজ্যের ন্যায়,—পতিবিহীনা হিন্দুরমণীর ন্যায় ইহার সকল সুখ সৌন্দর্য্য চির কালের মত কাল-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে কলরব স্রোত বহিতে ক্ষান্ত হইয়াছে তাহা আর সে প্রকার উল্লাসের বেগে বহে না। নবাবদিগের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সকল সৌন্দর্য্যই গিয়াছে—থাকিবার মধ্যে অলুণ্ঠনীয় সমাধি ও কয়েকটী তাজিয়া ও রাজপতাকা, ও কতকগুলি ঝাড় লণ্ঠন। এই সুদীর্ঘ ইমামবাড়ী, এক্ষণে জনশূন্য হইয়াছে। রক্ষক ও সমাগত দর্শকদিগের বাক্যালাপ শব্দ ভিন্ন আর কোন কোলাহলই শ্রুতি গোচর হয় না।

অযোধ্যার নবাবগণের মধ্যে আসফউদ্দৌলা সর্ব্বাপেক্ষা দানশীল ছিলেন। এ প্রকার মুক্ত হস্তে সৎকার্য্যে দান করিতে এখানকার কোন নবাবই সক্ষম হন নাই। এই ইমামবাড়ী প্রস্তুত হইবার সময়ে, তিনি যে প্রকার অমানুষিক দানশীলতা দেখাইয়াছেন—যতদিন ইহা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তাঁহার দানশীলতার কথা কেহ ভুলিতে পারিবে না। ১৭৮৪ খৃঃঅব্দে তাঁহার রাজত্বকালে, যে সময়ে এই প্রধান ইমামবাড়ী প্রস্তুত হইতেছিল—সেই সময়ে অযোধ্যা প্রদেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বাড়ীর গাঁথনি আরম্ভ হইয়াছে—শুনিয়া অনেক দুর্ভিক্ষপীড়িত ভদ্রলোক, পেটের দায়ে এই প্রকার সামান্য কার্য্যে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হন। আসফউদ্দৌলা ঘটনাক্রমে ইহা জানিতে পারেন ও সেই সকল দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে নিশীথ সময়ে আসিয়া নির্জ্জনে কাজ করিয়া যাইত। নবাব নিজে কখন কখন উপস্থিত থাকিয়া ইহাদের কার্য্য দেখিতেন ও সামান্য পরিশ্রমে দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য দিতেন, আবার তাহারা চলিয়া গেলে তাহাদের কাজ বাড়াইবার জন্য গ্রথিত অংশগুলি পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেন। এই প্রকার কার্য্য দ্বারা কত শত লোক যে অকাল মৃত্যু ও অনাহারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আসফ হিন্দু ও মুসলমান উভয় বিধ প্রজাকেই সমানভাবে দেখিতেন কোন জাতিরই কষ্ট তাঁহার সহ্য হইত না।

আসফ উদ্দৌলা কতকাল হইল মরিয়াছেন—তথাপি আজও লোকে তাঁহার নাম ভুলে নাই। গ্রাম্য সঙ্গীতে, আজও আসফের বদান্যতা গীত হইয়া থাকে—আজও ছোট বড় সকলে বলিয়া থাকে

"যিস্কো না দেয় আল্লা—
উস্‌কো দে আসফ্ উদ্দৌলা"

"রুমিদরওয়াজা" ও "বড় ইমামবাড়ী" ছাড়া, আসফ উদ্দৌলা—দৌলতখানা নামক

সুপ্রসিদ্ধ রাজপ্রাসাদ ও রেসিডেন্সি ভবন নির্ম্মাণ করান। দৌলতখানা গোমতীর ধারেই নির্ম্মিত হয় ও ইহার সন্নিধ্যেই গোমতী হইতে এক অত্যুচ্চ ভূমি খণ্ডের উপর রেসিডেন্ট সাহেবের আবাস স্থান নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান ভগ্নপ্রায় রেসিডেন্সিই আসফ উদ্দৌলার সময়ে নির্ম্মিত।

সুপ্রসিদ্ধ লামার্টিনিয়ার ভবন (ইংরাজিতে ইহাকে Constaulia বলিত) পিতৃমাতৃহীন ইউরোপীয় সৈনিক বালকদিগের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী General Claud Martyns এর ব্যয়ে ও উদ্যোগে স্থাপিত। ক্লড মার্টিন প্রথমে কোম্পানীর অধীনে চাকরী করিয়া পরে নবাবের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেন। লক্ষ্ণৌ দেখিতে আসিলে মার্টিনের এই অত্যাশ্চর্য্য শিল্প কৌশলময়, সুবৃহৎ প্রসাদ না দেখিলে, চক্ষের সার্থকতা হয় না। জেনারেল ক্লড্ মার্টিন সাহেব (কলিকাতার La martinere স্থাপয়িতা) নিজে নকশা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় তত্ত্বাবধারণে এই অত্যাশ্চর্য্য বাটীটি নির্ম্মাণ করেন। নকশা প্রস্তুত করিয়া নবাবকে দেখাইতে গেলে নবাব তাঁহার নিকট হইতে এক লক্ষ টাকায় সেই বাটী ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মার্টিন, তখন কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসেন। পরে বাটী প্রস্তুত হইয়া গেলে ভবিষ্যৎ নবাবদিগের লোলুপ দৃষ্টি হইতে এই কীর্ত্তিটীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ট্রষ্টীদিগকে সেই গৃহমধ্যে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশ তাঁহার মৃত্যুর পর রক্ষিত হইয়াছিল। মার্টিন বিলক্ষণ বুঝিতেন মুসলমান কখন সমাধির উপর অত্যাচার করে না— বস্তুত তাঁহার এই অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। নবাবের হাত হইতে এই প্রকার কৌশল করিয়া তিনি নিজ কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া যান। ১৮৫৭ সালে ভয়ানক সিপাহী বিদ্রোহের সময়, উন্মত্ত রণোল্লাসযুক্ত সিপাহীগণ, মার্টিনের সমাধি ভগ্ন করিয়া মৃত্তিকা গর্ভ হইতে তাঁহার হাড়গুলি তুলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। সাহেবদিগের উপর বিদ্রোহী সিপাহীরা যে কতদূর বীতানুরাগ হইয়াছিল তাহা এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যাইতে পারে। বিদ্রোহীরা স্থান ত্যাগ করিলে—সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্থি গুলি কুড়াইয়া লইয়া পুনর্ব্বার সমাধিস্থ করা হয়। এই লামার্টিনিয়ারে আজও কতকগুলি পিতৃমাতৃহীন সৈনিক বালক খোরাক পোযাক, ও শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

উল্লিখিত কয়েকটী প্রাসাদ ও ইমাম বাড়ী ছাড়া, আসফ উদ্দৌলা কয়েকটী প্রধান বাগান, "গঞ্জ" স্থাপন করেন। লক্ষ্ণৌ নগরীর সীমা ইহাঁর সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আসফ উদ্দৌলার গঞ্জ গুলি আজও বর্ত্তমান। তাঁহার নির্ম্মিত "আয়েষবাগ্" যদিও শ্রীহীন হইয়াছে—তথাপি "চারবাগ" আজও জন সঙ্কুল। এই চারবাগ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ ষ্টেসন নির্ম্মিত হইয়াছে। চারবাগের ভগ্নপ্রায় ফটক গুলি আজও ষ্টেসনের অনতিদূরে বন জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

আসফ উদ্দৌলা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাঁহার সমকালীন কোন মুসলমান

ভূপতি, তাঁহা অপেক্ষা যাহাতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত না হয় ইহাই তাঁহার অন্তরের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম ও টিপুসুলতান কতগুলি হস্তী রাখিতেন—তাঁহাদের কত টাকা মূল্যের জহরতাদি আছে—ইহাই কেবল তাঁহার অনুসন্ধানীয় ছিল। এই প্রকারে প্রতিযোগীতা করিয়া তিনি বার শত হস্তী ক্রয় করেন। তাঁহার পুত্র ওয়াজিদ আলিখাঁর বিবাহের সময় বরযাত্র দলের সঙ্গে বার শত হস্তী সুসজ্জিত হইয়া গমন করিয়াছিল এবং বরের গায়ে প্রায় দুই কোটী টাকার আভরণ ছিল। আজও এদেশে কাহারও খুব জাঁকজমকের বিবাহ হইলে লোকে আসফ উদ্দৌলার পুত্রের বিবাহের সহিত তুলনা করিয়া থাকে।

বসন্ত পঞ্চমী।

মানস সরঃজলে,
হৃদি কমলদলে,
বিহরে বীণাবাদিনী—

রুনু রুনু রুণ্ রুণ্,
মূর্চ্ছনা সুনিপুণ,
গুণ, গুণ, সঙ্গীত ধ্বনি!—

পহিরণ ফুলসাজ,
বসন্ত-রাগরাজ
খেলত, এ তারে ও তারে!

মৃদুল ফুলবায়
উত্তরী উড়ে যায়!
কুন্তল দুলয়ি অধীরে।

মুকুট মুঞ্জরী
আকুল পড়ে ঝরি
চঞ্চল-চিকুর-চাঁচরা!

নাচত, রঙ্গিণী
সঙ্গিণী, সুহাসিনী
মুখর, চরণ মঞ্জীরা।

যত রাগ সুন্দরী
জননী বাণী ঘেরি
গাহত, বন্দনা গানে,

অঞ্জলি-প্রেমফুল,
লয়ে কোবিদ কুল,
গদ গদ, ফুল্ল নয়ানে।

লম্বিত ঘন কেশ,
শুভ্র উজল বেশ
অধর-মধুর-হাসিনী,

নমঃ নমঃ সরস্বতী,
দেবী ভারতী
পীযূষ ভাষ-ভাষিণী।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

তারকা-রাশি।

তারকা-জ্যোতি নামক প্রবন্ধে নক্ষত্র জগতের একটি সমগ্র দৃশ্য পাঠকের নিকট উন্মুক্ত করা হইয়াছে। এই সমগ্র নক্ষত্র জগৎকে জ্যোতির্ব্বিদগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাশিতে বিভক্ত করিয়া—তন্মধ্য হইতে আবার কি প্রণালী অনুসারে এক একটি নক্ষত্র নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন তাহা এই পরিচ্ছেদে বলা হইতেছে।

যেমন পৃথিবীর এক একটি রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত তেমনি নক্ষত্র রাজ্যও রাশি নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। আকাশের এক এক ভাগের কতকগুলি নক্ষত্র রাশি লইয়া সেই নক্ষত্র রাশির কল্পিত আকৃতি অনুসারে এক একটি রাশি আখ্যা প্রাপ্ত।

নক্ষত্র জগৎ অতি পুরাতন কাল হইতে উক্তরূপ রাশি-বিভাগে বিভক্ত। হিন্দু জ্যোতিষ-গ্রন্থে রাশিচক্রের (পৃথিবী যে পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে সেই চক্র-পথকে রাশিচক্র কহে) মেষ বৃষ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশি—রোহিনী ভরণী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্রের সমষ্টি। কত পুরাকালে এই নক্ষত্র-রাশি হিন্দু জ্যোতিষী কর্ত্তৃক এইরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহা আমরা জানি না। তবে হিন্দু জ্যোতিষই যে পৃথিবীর আদি জ্যোতিষ,—উক্ত রাশি সকল যে অন্ততঃ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যবেক্ষিত এবং নির্ণীত হইয়াছিল—তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন না আর্য্যভট্টের জ্যোতিষ গ্রন্থই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার গ্রন্থ, সেই সময় ভারতবর্ষে জ্যোতিষের যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এই গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। পৃথিবী যে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে ইয়োরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে মাত্র তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে—কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট বলিতেছেন—"ভূপঞ্জরঃ স্থিরোভূরে বাবৃত্তা বৃত্ত্য প্রতিদৈবসিকো উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহানাং।"

"পৃথিবীর আবর্ত্তন বশতই স্থির নক্ষত্র মণ্ডল এবং গ্রহগণের উদয় অস্ত হইতেছে।"

পৃথিবীর সমস্ত গতিই তখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এমন কি ক্রান্তিপাতের বক্রগতি Precession of the Equenoxes যে পৃথিবীর গতিসম্ভূত তাহা অল্পদিন মাত্র ইয়োরোপে নিরূপিত হইয়াছে কিন্তু আর্য্যভট্ট ইহাও কহিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আর্য্যভট্টের পূর্ব্বেও যে নক্ষত্র জগতের উক্ত রাশি নির্ণীত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কিছুই কঠিন নহে। কিন্তু আর্য্যভট্টের কতদিন পূর্ব্বে—প্রথম কাহার দ্বারা উহা নির্নীত হইয়াছিল—তাহা কেহ বলিতে পারে না—পারিবার সম্ভাবনাও নাই। তবে খৃষ্টের জন্মিবার তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জ্যোতিষ আলোচনা দেখা যায়, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের যত্ন ও অনুসন্ধানে ইহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। এখন নক্ষত্র রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার রাশি নির্ণয় করা—জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম ও সহজ কাজ,

সুতরাং খৃষ্টের জন্মিবার তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নক্ষত্রদিগের উল্লিখিত রাশি বিভাগ হইয়াছিল—ইহা অনুমান করিলেও নিতান্ত অযৌক্তিক হয় না।

সে যাহা হউক, ইয়োরপ প্রথম মিশরের নিকট জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান শিক্ষা করে। মিসর-দেশবাসী হিপার্কসই ধরিতে গেলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গুরু। খৃষ্টাব্দের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি আকাশে ১০২২টি নক্ষত্র গণনা করেন। খৃষ্টাব্দের দেড়শত বৎসর পরে মিশরবাসী টলেমি সেই তারাগুলিকে ৪৮ রাশিতে বিভক্ত করেন। তাহার পর ষোড়শ শতাব্দীতে টাইকো ব্রাহি ইহার সহিত আর দুইটি রাশি যুক্ত করেন—উক্ত ৫০ রাশির সহিত আধুনিককালে আর ৬৯টি রাশি যুক্ত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১০৯টি হইয়াছে। এই ১০৯টির মধ্যে দ্বাদশটি রাশি পৃথিবীর প্রদক্ষিণ পথে অধিষ্ঠিত। আমরা প্রথমে রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির ল্যাটিন ইংরাজি ও বাঙ্গলা নাম নিম্নে প্রদান করিলাম।

লাটিন	ইংরাজি	বাঙ্গলা বা সংস্কৃত
Aries	The Ram	মেষ
Taurus	The Bull	বৃষ
Gemini	The Heavenly Twins	মিথুন
Cancer	The Crab	কর্কট
Leo	The Lion	সিংহ
Virgo	The Virgin	কন্যা
Libra	The Scales	তুলা
Scorpio	The Scorpion	বৃশ্চিক
Sagittarious	Archer	ধনু
Capricornus	Hegoat	মকর
Aquarius	Tne Man	কুম্ভ
Pisces	The Fish	মীন

রাশিচক্রের এই দ্বাদশ রাশির উপরি ভাগে যে সকল নক্ষত্র রাশি দেখা যায়—তাহা উত্তর দিকে অবস্থিত, তাহাদিগকে উত্তরের রাশি বলে। উত্তর রাশির মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটি প্রধান—

	লাটিন	ইংরাজি	বাঙ্গলা *
১	Ursa major	The great bear (the plough)	সপ্তর্ষি মণ্ডল।

* ডেরাডুন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালামোহন ঘোষ আমাদের এই বাঙ্গলা নামগুলি দিয়াছেন। বিশেষ প্রসিদ্ধ কয়েকটি ছাড়া হিন্দু জ্যোতিষে রাশি চক্রের বহির্ভাগস্থ নক্ষত্রের নাম পাওয়া যায় না। এখানে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানই আমাদের শিক্ষণীয়—সুতরাং তাহা জানিবারও বিশেষ আবশ্যক নাই।

	লাটিন	ইংরাজি	বাঙ্গলা
২	Ursa minor	The Little bear	ধ্রুব নক্ষত্র মণ্ডল।
৩	Draco	The Dragon	
৪	Cepheus	Cepheus	
৫	Bootes	Bootes	এই নক্ষত্র রাশির প্রধান নক্ষত্রটি আমাদের তুলা রাশির অন্তর্গত স্বাতি নক্ষত্র—সুতরাং ইহাকে স্বাতি নক্ষত্রমণ্ডল বলা যাইতে পারে।
৬	Corona borealis	The Northern Crown	
৭	Hercules	Hercules	
৮	Lyra	The Lyre	ইহার প্রধান নক্ষত্রটির নাম অভিজিৎ।
৯	Cygnus	The Swan	
১০	Cassiopea	Cassiopea (The Lady's Chair)	
১১	Perseus	Perseus	
১২	Auriga	The Waggoner	
১৩	Serpentarius	The serpent Bearer	
১৪	Serpens	The serpent	
১৫	Sagitta	The Arrow	ধনুরাশির অন্তর্গত পূর্ব্বাষাড়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র দুইটি এই নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যে আছে।
১৬	Aquila	The Eagle	ইহার প্রধান নক্ষত্রটি শ্রবণা নক্ষত্র—ইহা মকরের অন্তে অধিষ্ঠিত।
১৭	Delphinus	The Dolphin	ইহার একটি নক্ষত্র ধনিষ্ঠা—ইহা কুম্ভরাশির অন্তর্গত।
১৮	Equuleus	The Little Horse	
১৯	Pegasus	The Winged Horse	ইহার মধ্যে পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র দুইটি আছে প্রথমটি কুম্ভরাশির অন্তে, দ্বিতীয়টি মীনরাশিতে অধিষ্ঠিত।
২০	Andromeda	Andromeda	
২১	Triangulum	The Triangle	
২২	Camelopardalis	The Cameleopard	
২৩	Canes Venatici	The Hunting dogs	
২৪	Vulpecula et Anser	The Fox and the Goose	
২৫	Cor Caroli	Charles Heart	

রাশি চক্রের নিম্ন দেশে যে কয়েকটি রাশি আছে—তাহা দক্ষিণ ভাগের রাশি। তাহাদের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটি প্রধান।

	লাটিন	ইংরাজি	বাঙ্গলা
১	Cetus	The Whale	
২	Orion	Orion	কালপুরুষ মৃগশিরা এবং আর্দ্রা নক্ষত্রদ্বয় ইহার মধ্যে অবস্থিত। এই উভয় নক্ষত্র মিথুন রাশিতে অবস্থিত—তন্মধ্যে মৃগশিরা বৃষ রাশি ও মিথুন রাশির সন্ধিস্থলে।
৩	Eridanus	The River Eridanus	
৪	Lepus	The Hare	
৫	Canis major	The great dog	
৬	Canis minor	The little dog	
৭	Argo Navis	The Ship Argo	
৮	Hydra	The Snake	ইহার মধ্যে কর্কট রাশির অন্তর্গত পুনর্ব্বসু নক্ষত্রটি আছে।
৯	Crater	The Cup	
১০	Corvus	The Crow	
১১	Centaurus	The Centaur	ইহার মধ্যে কন্যা রাশির হস্তা নক্ষত্র আছে।
১২	Lupus	The Wolf	
১৩	Ara	The Alter	
১৪	Corna Australis	The Southern Crown	
১৫	Piscis Australis	The Southern Fish	
১৬	Monoceros	The Unicorn	
১৭	Columba Noachi	Noah's Dove	
১৮	Crux Australis	The southern cross	

সমস্ত আকাশ এইরূপ নক্ষত্র রাশিতে বিভক্ত হইলে পর—এখন কেবল বাকী থাকে সেই রাশিস্থিত প্রত্যেকটি নক্ষত্রকে চিনিবার একটি উপায় স্থির করা।

জ্যোতির্ব্বিদগণ ইহার একটি অতি সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন। একটি রাশির মধ্যে যে তারাটি সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, সেই তারাটিকে সেই রাশির ক-তারা বলা হয়। এইরূপে রাশিস্থিত তারকার ঔজ্জ্বল্যের ক্রম-অনুসারে রাশির নামের সহিত গ্রীক অক্ষরের ক, খ, গ, ঘ, পূর্ব্ব-যুক্ত হইয়া প্রত্যেক তারাটির নামকরণ হইয়া থাকে।

এইখানে একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। লাইরা (Lyra) রাশির সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারাটির কথা আমি লিখিতে চাই—কিরূপে লিখিব? আমাকে লিখিতে হইবে a lyrœ। এখানে লাইরা শব্দটি ষষ্ঠি বিভক্তিযুক্ত হইয়া—তাহার আগে a অক্ষর বসিয়াছে—ইহার অর্থ লাইরার a। বাঙ্গলায় লিখিতে হইলে আমরা লিখিব ক-লাইরা, কিম্বা লাইরার ক। a Ursœ Minoris কিম্বা আর্ষা মাইনরের-ক বলিলে বুঝিতে হইবে উক্ত রাশির সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারকাটি।

এইরূপ আধুনিক নাম করণ ছাড়া—কতকগুলি উজ্জ্বল তারকার প্রাচীন কাল হইতে এক একটি নাম আছে। যেমন, ক-লাইরা বেগা (Vega) ক-বুটিস আর্কটরাস (Arcturus) খ-ওরায়ন রিগেল নামে (Regel) ও ক-আর্ষা মাইনর ধ্রুবনক্ষত্র (Polaris, Pole star) নামে অভিহিত।

আকাশের প্রথম শ্রেণীর অত্যুজ্জ্বল বিংশতি তারকার নাম—ইহাদের ঔজ্জ্বল্য মর্য্যাদা-অনুসারে যথা ক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

		কোন রাশিতে আছে
Sirius *	সিরিয়াস	Canis Major
Canopus	ক্যানোপাস	Argo
Alpha	অ্যালফা	Centaur
Arcturus	আর্কটরাস	Bootes
Regel	রিগেল	Orion
Capella	ক্যাপেলা	Auriga
Vega	বেগা	Lyra
Procyon	প্রোকায়ন	Canis Minor
Betelgeuse	বেটেলগুস্	Orion
Achernar	আকার্ণর	Eridanus
Aldebaran	অ্যালডেবেরণ	Taurus
Beta, Centauri	বিটা, সেণ্টরি	Centaur
Alpha, Crucis	অ্যালফা, ক্রুসিস	Crux
Antares	অ্যানট্যারিশ	Scorpio
Atair	আটেয়ার	Aquila
Spica	স্পাইকা	Virgo
Fomalhaut	ফোমালহট	Piscis Australis

* ইহাকে মৃগব্যাধ বা লুব্ধক কহে। ইহা আকাশের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারকা।

Beta Crucis	বিটা ক্রুসিস	Crux
Pollux	পোলাক্স	Gemini
Regulus	রেগুলাস	Leo

পৃথিবীর ম্যাপের ন্যায় আকাশেরও ম্যাপ আছে, পাঠকগণ তাহার সহিত মিলাইয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই প্রবন্ধোক্ত রাশি, নক্ষত্রের সহিত সবিশেষ পরিচিত হইতে পারিবেন।

নক্ষত্রগণ আমাদের নিকট হইতে এত প্রভূতদূরে অবস্থিত যে সহস্র সহস্র বৎসরের কমে স্বাভাবিক চক্ষুতে ইহাদের গতি কিছুই অনুভূত হয় না। শত শত বৎসর পূর্ব্বে হিপার্কস, টলেমি প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ যে নক্ষত্র রাশিকে আকাশের যে স্থানে দেখিয়া গিয়াছেন স্বাভাবিক চক্ষে দেখিলে আজও তাঁহারা তাহাদিগকে ঠিক সেই একই স্থানে দেখিতে পাইতেন, কিন্তু তথাপি বাস্তবিক পক্ষে ইহারাও গতিশীল। আমাদের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি তারকার গতি জ্যোতির্ব্বিদগণ দূরবীন যন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন, কেবল তাহাই নহে—সেইগতির পরিমাণ পর্য্যন্ত তাঁহারা নিরূপণ করিয়াছেন। রেলগাড়ী যত দ্রুত চলে, পৃথিবী তাহার সহস্রগুণ দ্রুতবেগে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে,—আর্কটরাস নক্ষত্র পৃথিবীর তিনগুণ বেগে চলিয়া—প্রতি সেকেণ্ডে অন্তত ৪৫ মাইল ভ্রমণ করিতেছে। আমাদের এই সূর্য্য, ইহাও নক্ষত্র জগতের একটি তারকা, ইহা পৃথিবী চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ ৪ মাইল বেগে হারকিউলিস রাশির দিকে ধাবিত হইতেছে। সূর্য্যের এই গতি দ্বারা নক্ষত্রদিগের ক্রমশ অল্পে অল্পে যে স্থান পরিবর্ত্তিত হইতেছে দূরবীণ যন্ত্রদ্বারা জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহা বুঝিতে পারেন।

নক্ষত্রদিগের উল্লিখিত যে গতি তাহা প্রকৃতগতি, ইহা ছাড়া পৃথিবীর দৈনিকগতি ও বাৎসরিক গতির সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রদিগের (ধ্রুব নক্ষত্র ছাড়া) আমরা যে গতি অনুভব করি—তাহা তাহাদের দৃশ্যতঃ গতিমাত্র। কেননা পৃথিবী ঘুরিতেছে ইহা ত আমরা অনুভব করি না কাজেই পৃথিবী যত ঘুরিতে থাকে—আমরা ততই তারকা রাশিকে ঘুরিয়া যাইতে দেখি। নক্ষত্র জগতের এই দৃশ্যতঃ গতি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই একজন দর্শকের চক্ষে প্রতিভাত হয়।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

অনন্তের স্বপ্ন।

অনন্ত সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম কল্পনা করিয়া থাকেন। ডিকুইন্সির অনন্তের কল্পনাটি আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

স্বপ্ন হইতে তুলিয়া এক ব্যক্তিকে স্বর্গের দ্বারের নিকট আনিয়া ঈশ্বর তাহাকে বলি-

লেন "তুমি এখানে আসিয়া আমার বিশাল রাজ্যের সৌন্দর্য্য দর্শন কর"—এবং তাঁহার সিংহাসনের চতুস্পার্শ্বস্থ দেবতাগণের প্রতি আদেশ করিলেন "তোমাদের মধ্যে কেহ এক-জন ইহাকে লও, লইয়া ইহার ধূলি-নির্ম্মিত মাংসাবরণ উন্মুক্ত করিয়া, ক্ষীণ মানব দৃষ্টির পরিবর্ত্তে ইহাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান কর এবং ইহার নাসারন্ধ্রে নূতন জীবন বায়ু অর্পণ কর। কেবল এই মাত্র দেখিও ইহার ক্রন্দনশীল ত্রাস-পরায়ণ মানব হৃদয়ের যেন কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিও না।"

ঈশ্বরের এই আজ্ঞায় একজন দেবদূত সেই মানব সঙ্গে অনন্ত সমুদ্রপার-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল, এবং বিদায় শব্দ উচ্চারণ না করিয়াই স্বর্গ দ্বার হইতে অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে পদক্ষেপণ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নিঃশব্দ দেবপক্ষ যোজনা দ্বারা তাঁহারা বহুবিস্তৃত জীবনমৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী মরুময় রাজ্য উল্লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বর দত্ত গতির প্রভাবে বিশ্বভুবনের কোন অজ্ঞাত রাজ্যের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে পৌঁছিবা মাত্র স্বর্গের স্থির আলোকরশ্মি তাহাদের নেত্রগোচর হইল, গ্রহগণের দ্রুত পদক্ষেপণের বজ্র-নিনাদ তাহাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল এবং জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যগণের প্রচণ্ড দীপ্তা-লোক তাহাদের নয়নে বিভাসিত হইল।

এই সকল ত্যাগ করিয়া আরো বহুদূরে আসিবা মাত্র তাহারা দেখিল প্রভাত এবং সায়ং-জ্যোৎস্নার অনন্ত যুগল-রূপ—প্রকাশিত অথচ অপ্রকাশিত-রূপে সম্মুখে বিরাজ করিতেছে, এবং দক্ষিণে ও বামে সুবৃহৎ তারকামণ্ডলীগুলি পরে পরে স্তরে স্তরে বিচিত্র-ভাবে অপরূপ-শোভায় সুবিস্তৃত-প্রাচীরাকারে স্বর্গধামকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এক একটি মণ্ডলী যেন সেই স্বর্গপ্রাসাদের তোরণস্বরূপ—আর সকলই সেই অনন্ত-রাজ্যের দিব্যাভাষরূপে বিরাজমান। তথায় আর উচ্চ নিম্নের প্রভেদ বুঝা যায় না যেন উভয়ে মিশিয়া একাকার ধারণ করিয়াছে।

তাহারা অনন্ত বিশ্বভুবন হইতে স্বর্গরাজ্যের অনন্ত পথে অগ্রসর হইতে লাগিল,—বিশ্বের একদেশ হইতে আর একদেশে চলিতে লাগিল, এক রাজ্য উল্লঙ্ঘন করিয়া অপর রাজ্যে উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। এমন সময় পথিমধ্যে একস্থানে হঠাৎ বহুদূর হইতে বিশ্বভেদী এই গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইল "এখনও সম্মুখে অনন্ত জগৎমণ্ডলী। পরিত্যক্ত অতি গভীর নিম্ন প্রদেশ হইতেও তাহারা অধিকতর সুগভীর, পশ্চাৎবর্ত্তী গ্রহ জগৎ হইতেও তাহারা অধিকতর গম্ভীর-ঘোষণাপূর্ণ বজ্রনিনাদ-সম্বদ্ধ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মণ্ডল হইতেও উচ্চ অতি উচ্চ-স্পর্শিত। তোমরা যতই অগ্রসর হইতেছ তাহারা ততই তোমা-দের নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

এই বাণী শ্রবণান্তে দুর্ব্বল মানব-হৃদয় আর সুস্থির থাকিতে পারিল না। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল, অবশেষে একেবারে হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। পরে বলিল—"হে দেব আমি আর অগ্রসর হইব না। মানব হৃদয়

অনন্তের এই অসীমতায় বজ্রাহতের ন্যায় মুমূর্ষপ্রায় হইয়াছে। ঈশ্বরের অতুল কীর্ত্তি মনুষ্যের পক্ষে দুঃসহনীয়। আমি এই বিশাল বিস্তৃত বিশ্বরাজ্যের কোন অন্ত দেখিতে পাইতেছি না, অতএব এইস্থানেই শয়ন করিয়া মুখ লুকাইয়া অনন্তের বিশালত্বের হস্ত হইতে অব্যাহতি লই।” চতুস্পার্শস্থ উজ্জ্বল তারকাগণ হইতে সমস্বরে এই উত্তর আসিল “ওহে দেববর, তুমি ত বিলক্ষণ জানিতেছ এই ব্যক্তি যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য। ঈশ্বরের বিশাল বিশ্বরাজ্যের যে কোন সীমা আছে তাহা আমরাও অবগত নহি, কিম্বা ইহার যে অন্ত আছে তাহা কখন শুনিও নাই।” তদুত্তরে দেবদূত তাঁহার সহচর মানবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“যথার্থই কি এই রাজ্যের কোন শেষ নাই? এবং এই দুঃখেই কি তুমি প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?” তাহার প্রশ্নের কোনও উত্তর না পাইয়া তিনি স্বয়ং উত্তর করিলেন “পরমেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের অন্তও কোথাও নাই এবং ইহার আদিও নাই।”

দৃষ্টি।

একদিন সন্ধ্যাকালে একটী চারি কোণ স্থানের মধ্য দিয়া আমি হরিদ্রাবর্ণের আকাশ দেখিলাম; খানিকক্ষণ দেখিয়া পরে একটী শ্বেতবর্ণ স্থানের দিকে চাহিলাম, তখন ঐখানে পূর্ব্বের ন্যায় একটী চারি কোণ স্থান দেখিতে পাইলাম—আরও দেখিতে পাইলাম যে উহার বর্ণ নীল। আবার সে দিন আমি রাত্রিতে একটী ল্যাম্পের সবুজ বর্ণ ঢাকনির দিকে চাহিলাম—সবুজ ঢাকনির মধ্য দিয়া কেরোশিন তৈলের বাতির হরিদ্রা আলোক আসিয়া আমার চক্ষে পড়িল। খানিক ক্ষণ ঢাকনির দিকে চাহিয়া পরে একখানি সাদা কাগজের দিকে চাহিলাম, তখন ঐ কাগজের উপর একপ্রকার লাল রঙ্গের একটী ছবি দেখিলাম, উহা দেখিতে ঢাকনিটীর মত। আমি ইহাও দেখিলাম যে ঢাকনির দিকে খানিক চাহিয়াই যদি চক্ষু বুজি তবে ঠিক ঢাকনির রঙ্গের ন্যায় রঙ্গওয়ালা উহার একটী ছবি দেখিতে পাওয়া যায়; পরে অবিলম্বে কাগজের দিকে চাহিলে পূর্ব্বোক্তরূপ ছবি দেখা যায়। এই সকল ঘটনার অর্থ কি? এগুলি স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে আমিদিগের দুইটী বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক—প্রথমতঃ আলোকের প্রকৃতি, দ্বিতীয়তঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রকৃতি। আলোক সম্বন্ধে মুখ্যতঃ এই কয়টী কথা জানা আছে—যাহাকে আমরা আলোক বলি উহা একপ্রকার ইন্দ্রিয়জাত মানসিক অবস্থা মাত্র; যাহা হইতে এই মানসিক অবস্থা ঘটে তাহা নীলও নহে হরিদ্রাও নহে, সবুজও নহে লালও নহে, তাহা কোন বর্ণেরই নহে, ফলতঃ তাহা একপ্রকার

গতি বিশেষ। যখন কোন বস্তু হইতে আলোক পাওয়া যায়, ঐ বস্তুর অণুগুলি এদিক ওদিক দুলিতে থাকে আর এই দোলন বশতঃ চারিদিকে উহার তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়। জল রাশির মধ্যে একটী ঢিল ফেলিলে যেমন উহাতে তরঙ্গ দেখা দেয়, সেইরূপ এই জগতের ঈথর সমুদ্রে কোন একটী বস্তু নড়িলে উহা হইতে তরঙ্গ উৎপাদিত হয়। [এখানে বলা আবশ্যক যে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মতে জগতের সর্ব্বত্র এক অতি সূক্ষ্ম পদার্থ ব্যাপ্ত আছে; পণ্ডিতেরা তাহাকে ঈথর বলেন।] ঐ তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগের চক্ষুর উপর কার্য্য করিলে আমাদিগের আলোক-জ্ঞান জন্মে। আলোকের তরঙ্গ সম্বন্ধে মোটামুটি এই কয়টী বিষয় বলিলেই চলিবে; আলোক যে দিকে চলে উহার তরঙ্গ ঠিক তাহার উপর লম্বভাবে ঘটিয়া থাকে—যেমন, একটী রজ্জুর এক মুখ একজন ধরিয়া থাকুক, অন্য মুখ ধরিয়া আর একজন উপর হইতে নীচে ঝাঁকি দিউক; দেখিবে রজ্জুর উপর দিয়া উহার তরঙ্গ চলিয়া যাইবে, তরঙ্গে রজ্জুর কতক অংশ বা উপরে উঠিয়াছে আর কতক অংশ বা নীচে নামিয়াছে। উপর হইতে নীচে ঝাঁকি না দিয়া যদি ডাহিন হইতে বামে ঝাঁকি দেওয়া হয়, তাহা হইলে রজ্জুর অংশগুলি সর্পের গাত্রের ন্যায় এপাশ ওপাশ বক্র হইবে। যেরূপেই ঝাঁকি দেওয়া হউক না কেন, দেখা যাইবে যে তরঙ্গ গুলি রজ্জুর উপর লম্ব ভাবে চলিয়া যায়, অর্থাৎ তরঙ্গে রজ্জু যেদিকে কিম্বা যে দিক হইতে ঝুঁকিয়া পড়িবে সে দিকটী রজ্জুর রেখার পক্ষে লম্ব রেখা হইবে। ঈথর মধ্য দিয়া যখন আলোকের কিরণ চলিয়া আইসে, তখন তরঙ্গগুলি ঐ কিরণ রেখার উপর লম্বভাবে ঘটে। একটী কাঠি লইয়া উহার কোন স্থলে একখানি কাগজ লম্বভাবে ধর, কাঠিটিকে কিরণ রেখা মনে করিলে উহার তরঙ্গ ঐ স্থলে ঐ কাগজের উপর ঘটিতেছে মনে করিতে হইবে; তরঙ্গবলে ঐস্থলে কাঠির বিন্দুটী সরল কিম্বা বৃত্তাকার কিম্বা ডিম্বচ্ছেদাকার রেখায় নড়িতে থাকিবে। আলোকের বর্ণ উহার দোলনের সময়ের উপর নির্ভর করে; আলোকবশতঃ ঈথরের অণুগুলি এদিক ওদিক দুলিতে থাকে, মনে কর কোন একটী অণু ক বিন্দুর এদিক ওদিক দুলিতেছে; উহা ক বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া একটী বৃত্তাকার কিম্বা একটী ডিম্বচ্ছেদাকার রেখায় ঘুরিয়া আবার ক বিন্দুতে আসিল, অথবা ক বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া একদিকে সরলরেখায় খ পর্য্যন্ত যাইল, পরে খ হইতে কয়ে ফিরিয়া আসিল কিন্তু সেখানে তিষ্ঠাইতে না পারিয়া অপর দিকে গ পর্য্যন্ত যাইল আবার সেখান হইতে কয়ে ফিরিয়া আসিল। এইরূপে একটী সম্পূর্ণ দোলনে যে সময় লাগে তাহাকে দোলনের সময় বলে। লাল আলোকের দোলন সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আর বায়লেট বা বেগুণে আলোকের সর্ব্বাপেক্ষা অল্প—অন্যান্য আলোকের দোলন সময় এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী। লাল হইতে আরম্ভ করিয়া অরেঞ্জ কমলালেবুর ন্যায় রঙ্গ,) হরিদ্রা, সবুজ ও নীল ক্রমে বায়লেট পর্য্যন্ত দোলন সময় ক্রমাগত কম দেখা যায়। আলোকের তেজ উহার দোলনের বিস্তৃতির উপর নির্ভর

করে; মধ্য বিন্দুর দুই দিকে যে দুই বিন্দুর (যেমন উপরে খ ও গ) মধ্যে দোলন ঘটে, সে দুয়ের মধ্যে যে দূরত্ব তাহাকে উহার বিস্তৃতি কহে। দোলন সময় এক হইলেও বিস্তৃতি অল্প পরিমাণে বিভিন্ন হইতে পারে, যে আলোকের দোলন বিস্তৃতি যত অধিক তাহার প্রখরতাও তত অধিক। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে দোলন সময় বিভেদে আলোকের বর্ণ বিভেদ ঘটে আর দোলনের সময় এক হইয়া বিস্তৃতি বিভেদ হইলে একই বর্ণের প্রখরতা বিভেদ ঘটে। পণ্ডিতেরা আরও স্থির করিয়াছেন যে তিনটী বর্ণ আদি বর্ণ ইহাদিগের নাম লোহিত সবুজ ও বায়লেট। অন্যান্য সমুদয় বর্ণ এই কয় বর্ণের সংযোগে উৎপন্ন হয়, অরেঞ্জ ও হরিদ্রা, লোহিত ও সবুজের, আর নাল সবুজ ও বায়লেটের সংযোগে; অরেঞ্জে লোহিতের আর হরিদ্রায় সবুজের অংশ অধিক। শ্বেত আলোকে লোহিত সবুজ ও বায়লেট এই তিন প্রকার আলোকই আছে। এস্থলে সংযোগ শব্দে গতির সংযোগ বুঝিতে হইবে, একই বিন্দুতে দুইটী গতির শক্তি প্রযুক্ত হইলে ঐ দুয়ে নূতন একটী গতি হয়; লোহিত সবুজ ও আলোকের দোলনগতিতে অরেঞ্জ কিম্বা হরিদ্রা আলোকের দোলন-গতি উৎপন্ন হয়। এক্ষণে দেখা যাউক আলোকের তরঙ্গগুলি কি প্রকারে প্রবাহিত হয়; মনে কর দূরে একটী অণু হইতে আলোকের কিরণ আমার চক্ষুতে আসিয়া পড়িতেছে। ঐ অণুটী তাহা হইলে দুলিতেছে মনে করিতে হইবে; উহা দুলিতে দুলিতে উহার পার্শ্ববর্ত্তী অণুকে আঘাত করিল, তাহাতে সে দুলিতে আরম্ভ করিল, তাহা হইতে আবার তাহার পার্শ্ববর্ত্তী এই ক্রমে অবশেষে আমার চক্ষুর ঠিক সম্মুখের অণুতে আসিয়া ঐ দোলনগতি পৌঁছাইল। বায়ুর মধ্য দিয়া আলোক এক সেকেণ্ডে ১৮৬,৫০০ মাইল চলিয়া থাকে; উক্ত অণু আমার চক্ষু হইতে কত দূরে অবস্থিত ইহা জানা থাকলেই উহা হইতে আলোক আসিয়া আমার চক্ষুতে পৌঁছাইতে কত সময় লাগিবে তাহা সহজেই বলা যাইতে পারে। মনে কর অণুটী আমার চক্ষু হইতে ১০০ মাইল দূরে, তাহা হইলে চক্ষুতে আলোক আসিতে এক সেকেণ্ডের ১৮৬৫ ভাগের এক ভাগ লাগিবে, অর্থাৎ অণুটী হইতে প্রবাহের ধাক্কা চক্ষুতে আসিয়া পৌঁছাইতে ঐ সময় লাগিবে, অণুটী হইতে খানিক পরে আবার আমার দিকে প্রবাহ আসিবে তাহাতে আবার একটী ধাক্কা আমার চক্ষুতে আসিবে। অণুটী একবার যে বিন্দু হইতে ধাক্কা পাঠায় আবার সেখানে ফিরিয়া আসিলে তাহার একটী দোলন সম্পূর্ণ হইবে; একবার ধাক্কা প্রেরিত হইবার পর একটী দোলন সময় যখন অতীত হইবে তখন আর একটী ধাক্কা প্রেরিত হইবে। অতএব একটী ধাক্কা যখন আসিয়া আমার চক্ষুতে পৌঁছায় তাহার পর একটী দোলন-সময় অতীত হইলে আর একটী ধাক্কা আসিয়া পৌঁছিবে। অণুটী তালে তালে ধাক্কা পাঠাইতে থাকিবে, আমার চক্ষুতে আসিয়াও তালে তালে ধাক্কা লাগিবে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা হইতে গণনা করিয়াছেন যে গাঢ় লাল আলোকের দোলন এক সেকেণ্ডে ৪০০,০০০০০০,০০০০০০ বার ঘটে আর গাঢ় বায়লেটের ৭৬০,০০০০০০,০০০০০০.

বার; অন্যান্য আলোকের এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী। অর্থাৎ যখন আমি গাঢ় লাল বর্ণ অনুভব করি তখন আমার চক্ষুতে এক সেকেণ্ডে প্রথমোক্ত সংখ্যা ধাক্কা আসিয়া আঘাত করে, গাঢ় বায়লেটের পক্ষে দ্বিতীয়োক্ত সংখ্যা, আর অন্যান্য আলোকের পক্ষে ঐ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী এক একটী সংখ্যা। এক দোলন-সময়ের মধ্যে আলোক তরঙ্গ যতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে তাহাকে এক প্রবাহ দৈর্ঘ্য কহে। যে কোন বর্ণের আলোকই হউক না কেন বায়ুতে উহার গতির দ্রুততা প্রায় একই হইবে, সুতরাং যাহার দোলন সময় যত অধিক তাহার প্রবাহ-দৈর্ঘ্য তত অধিক—গাঢ় লালের দোলন-সময় বায়লেটের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ আর সেই নিমিত্ত উহার প্রবাহ-দৈর্ঘ্যও উহার অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। এক প্রবাহ-দৈর্ঘ্যের মধ্যে যতগুলি অণু থাকে তাহাদিগের প্রথমটীর দোলন যখন একবার সম্পূর্ণ হয়, শেষটীর দোলন তখন আরম্ভ হয়, মধ্যবর্ত্তীটীর দোলন অর্দ্ধেক শেষ হয়, এক চতুর্থাংশ দৈর্ঘ্যে অবস্থিত অণুটীর দোলন বারআনা শেষ হয় আর তিন চতুর্থাংশ দৈর্ঘ্যে অবস্থিত অণুটীর দোলন সিকি শেষ হয়। অন্যান্য অণুগুলির কতখানি দোলন শেষ হয় তাহা উহা হইতেই বুঝা যাইবে। এইত গেল আলোকের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত; এখন চক্ষুর বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। চক্ষুর প্রায় সম্মুখভাগে স্বচ্ছ একটী লেন্‌স্ আছে; এখানে লেন্‌স্ শব্দে দুইটী সমান বৃত্তের পরস্পর ছেদনে মধ্যস্থলে যেরূপ আকৃতি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আকৃতির একটী বস্তু বুঝিতে হইবে। চক্ষুতে যে সকল কিরণ আসিয়া পড়ে সে গুলি ঐ লেন্‌স্ দ্বারা কেন্দ্রীভূত হয় অর্থাৎ এক স্থলে একত্রীকৃত হয়; চক্ষুর পৃষ্ঠভাগে রেটিনা নামক স্নায়ু জালের উপর কিরণ গুলি কেন্দ্রীভূত হইলে তাহা হইতে চক্ষুর স্নায়ু দ্বারা আলোকের ইঙ্গিত মস্তিষ্কে চলিয়া যায়। লেন্‌স্ ও রেটিনার মধ্যে এক প্রকার অর্দ্ধ কঠিন বস্তু আছে, তাহা দেখিতে কতকটা কাচের ন্যায়—এই নিমিত্ত তাহাকে কাচবৎ বস্তু বলে। চক্ষুর স্নায়ু একটী রজ্জুর ন্যায় পদার্থ, উহা মস্তিষ্ক হইতে আসিয়া চক্ষুর পৃষ্ঠদেশে প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকে, এবং তথা হইতে চক্ষুঃ গোলকের পৃষ্ঠদিকের অর্দ্ধেকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া একটী জাল প্রস্তুত করে; এই স্নায়ুজালকে রেটিনা বলে। আলোকের তরঙ্গ উল্লিখিত কাচবৎ বস্তুর মধ্য দিয়া আসিয়া রেটিনায় পড়িলে সেখান হইতে সহজেই চক্ষুর স্নায়ুতে যায়। চক্ষুর স্নায়ু দ্বারা কিরূপে তাহার ইঙ্গিত মস্তিষ্কে যায় তাহা জানা নাই; কেহ বা বলেন স্নায়বীর ইঙ্গিতের গতি তড়িতের গতির ন্যায়, কেহ বা বলেন তাহা নহে—উহা দ্বারা স্নায়ুসূত্রের অণুগুলির একটীর পর একটী এই ক্রমে রাসায়নিক গঠন ক্ষণকালের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র। অর্থাৎ কেহ বলেন ধাতবীয় শলাকায় একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যেরূপে তড়িৎ চলিয়া যায় স্নায়ু সূত্র দিয়াও সেইরূপে উক্ত ইঙ্গিত চলিয়া যায়; তাঁহারা আরও বলেন উক্ত ইঙ্গিতের গতি এক প্রকার তড়িৎ গতি মাত্র। অপর মতটী এই যে এই ইঙ্গিত তড়িতের সহিত এক প্রকৃতি নহে, উহা এক

প্রকার ক্ষণস্থায়ী রাসায়নিক পরিবর্ত্তন মাত্র। স্নায়ু সূত্রের অণুগুলিতে একটী হইতে পরবর্ত্তীটীতে যখন এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে,ইন্দ্রিয় জ্ঞান-জনক ইঙ্গিতও তখন সেই সঙ্গে চলিতে থাকে ; ফলতঃ ঐ পরিবর্ত্তনই এই ইঙ্গিত। স্নায়ু দ্বারা ইঙ্গিত যেরূপ দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে তাহা বাহিরে আলোকের গতির দ্রুততার তুলনায় কিছুই নহে ; তথাপি মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে একটী মেল ট্রেণ যেরূপ দ্রুত চলে স্নায়বীয় ইঙ্গিতও সেইরূপ দ্রুত চলে, অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে ১০০ হইতে ৩০০ ফুট চলে। ইন্দ্রিয়জাত ইঙ্গিত মস্তিষ্কে যাইয়া কার্য্য করিলে আমাদিগের যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান বলে।

এক্ষণে আমরা উল্লিখিত ঘটনা দুইটীর কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি ; যখন অনেকক্ষণ হরিদ্রাবর্ণ স্থানের দিকে চাওয়া যায়, তখন রেটিনার যে অংশে আলোক পড়িয়া উহার ছবি গঠিত হয় সে অংশ হরিদ্রা আলোকের পক্ষে অন্ধ হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ অনেকক্ষণ ধরিয়া উক্ত আলোক ঐ স্থলে কার্য্য করায়, ঐ স্থলের স্নায়ুগুলি আর কিছুক্ষণের নিমিত্ত ঐ আলোকের ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে সমর্থ থাকে না। পরে যখন শ্বেত বর্ণ স্থানের দিকে চাওয়া যায়, তখন ঐ শ্বেত আলোকের হরিদ্রা অংশ দ্বারা রেটিনার ঐ স্থলে কোন কার্য্য হয় না ; বাকী নীল অংশ দ্বারা ইঙ্গিত প্রেরিত হওয়ায় নীল বর্ণের একটী স্থান দৃষ্ট হয়। হরিদ্রা ও নীল এই দুই বর্ণকে পরিপোষক বর্ণ বলা যাইতে পারে, কারণ উহাদিগের দ্বারা পরস্পরের পরিপুষ্টি সাধিত হয় অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া শ্বেত বর্ণ উৎপন্ন করে। সেইরূপ আবার সবুজ ও লাল পরস্পরের পরিপোষক আর ইহা হইতেই ঢাকনিটীর কথা উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। ঢাকনি সবুজ বর্ণ আর বাতির আলোক ঈষৎ হরিদ্রা মিশ্রিত শ্বেত বর্ণ ; ঢাকনির মধ্য দিয়া যখন ঐ আলোক আইসে তখন উহা মুখ্যতঃ সবুজ, তবে কিঞ্চিৎ হরিদ্রার ভাগও থাকে ; এই ঈষৎ-হরিদ্রা সবুজ আলোকের পরিপোষক বর্ণ এক প্রকার লাল বলিয়া বোধ হইবে, অর্থাৎ উহাতে বায়লেট ও লাল এই দুই বর্ণ থাকিবে। কোন বর্ণের পরিপোষক বর্ণ কি হইবে তাহা এই নিয়মে স্থির করিতে হইবে। লাল, সবুজ, ও বায়লেট এই তিনে শ্বেত হয়, কোন বর্ণে এই তিনের কোন্ কোন্টী কি কি পরিমাণে আছে তাহা জানিলে উহাতে আর কোন্ কোন্ বর্ণ কি কি পরিমাণে থাকিলে শ্বেত হইবে ইহা সহজেই স্থির করা যাইতে পারে, অতএব উহার পরিপোষক বর্ণ কি তাহাও বলা যাইতে পারে। যেমন, উপরে সবুজ ও ঈষৎ হরিদ্রা মিশ্রিত বর্ণে সবুজ ও ঈষৎ লাল আছে ; সুতরাং উহার পরিপোষক বর্ণে বায়লেট ও লাল থাকিবে। ঢাকনিটীর দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া অবিলম্বে চক্ষু বুজিলে প্রথমে ঢাকনির ন্যায় রঙ্গবিশিষ্ট ঢাকনির একটী ছবি দেখা যায়, ইহার অর্থ এই যে কোন আলোক চক্ষুর উপর কার্য্য করিলে উহার ফল এক সেকেণ্ডের প্রায় এক অষ্টমাংশ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে—সুতরাং ঐ সময়ে ঢাকনির দিকে না তাকাইলেও ঢাকনির ছবি দেখা যাইতে পারে।

দৃষ্টি সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রশ্ন এস্থলে উত্থাপন করা যাইতে পারে। কোন্ বস্তু কত দূরে তাহা আমরা দেখিয়া বলিতে পারি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে দৃষ্টি দ্বারা জ্ঞাত দূরত্ব শব্দে বাস্তবিক কি বুঝায়; যখন আমি বলি অমুক বস্তু পঞ্চাশ হাত দূরে, তখন তাহাতে এই বুঝি যে আমি যদি আমার হাত দিয়া বরাবর ঐ বস্তু পর্য্যন্ত মাপিয়া যাই তাহা হইলে ঐ সংখ্যা দাঁড়াইবে। আবার আমি যদি বলি অমুক বস্তু একশ ফুট দূরে, তাহা হইলে এই বুঝি যে ঐ বস্তু পর্য্যন্ত বরাবর পা ফেলিয়া যাইলে একশবার পা ফেলিতে হইবে। অবশ্য হাত দিয়া কিম্বা পা দিয়া না মাপিয়া হাতের বা পায়ের সমান একটী কাঠি দিয়া মাপা সহজ, সেই নিমিত্ত সাধারণতঃ এই সহজ উপায় দ্বারাই দূরত্ব মাপা হইয়া থাকে। যাহা হউক, দূরত্ব শব্দে শারীরিক পরিশ্রম বুঝায়, অমুক বস্তুর দূরত্ব কত এই প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ এই যে সেই বস্তু পর্য্যন্ত যাইতে হইলে কতবার পদনিক্ষেপ করিতে হইবে। চক্ষু দ্বারা কি প্রকারে দূরত্ব নিরূপণ হইতে পারে? মনে কর আমি একটী থামের নিকট দাঁড়াইয়া আছি, উহা কত উচ্চ তাহা দেখিতে পাইতেছি; আমি যখন থামের নিকট হইতে এক পা, দুপা করিয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাই তখন থাম আমার নিকট ক্রমেই ছোট হইতে থাকে; খানিক দূর সরিয়া যাইলে খানিক ছোট হইবে, আরও খানিক যাইলে আরও খানিক হইবে। এইরূপে আমি যদি থামের নিকট বারবার যাতায়াত করি, তাহা হইলে কত দূরে ঐ থাম কত ছোট দেখাইবে ইহা অবশেষে আমার ধারণা হইবে। পরে কোন স্থান হইতে থামের উচ্চতা দেখিয়াই উহা ঐ স্থান হইতে কত দূরে তাহা বলিতে পারিব। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে দূরত্ব প্রকৃত পক্ষে দৃষ্টি দ্বারা জানা যায় না, দৃষ্টি দ্বারা কোন বস্তুর উচ্চতা জানিতে পারা যায়; কোন স্থল হইতে কোন বস্তুর যে উচ্চতা বোধ হয় তাহার সহিত ঐ বস্তুর বাস্তবিক উচ্চতা তুলনা করিয়া ঐ স্থল হইতে ঐ বস্তু কত দূরে তাহা পূর্ব্ব অভ্যাস হইতে বলিয়া দিতে পারা যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বে ঐ বস্তু হইতে যখন ক্রমাগত সরিয়া গিয়াছি, তখন উহা হইতে কত দূরে গিয়াছি তাহা শারীরিক পরিশ্রম হইতে বুঝিতে পারিয়াছি; এবং সেই সঙ্গে বস্তুর উচ্চতা-বিভেদও জ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে উচ্চতা দেখিয়াই ঐ পরিশ্রমের কথা মনে পড়ে, অর্থাৎ বস্তু হইতে কত খানি সরিয়া আসিলে ঐ উচ্চতা হইবে তাহা মনে পড়ে। প্রকৃত পক্ষে দূরত্বজ্ঞান শারীরিক পরিশ্রম হইতে জন্মে, দৃষ্টি দ্বারা কেবল ঐ পরিশ্রমের কথা স্মরণ হয় মাত্র। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কিরূপে দূরত্বজ্ঞান জন্মে তাহা একটু বিশেষ করিয়া বলা যাউক। আমি থামের সম্মুখে যখন আছি, তখন যে স্থানে আছি তাহার জ্ঞান স্পর্শ দ্বারা জন্মে; স্থানটী স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, সুতরাং স্পর্শ দ্বারা স্থানের জ্ঞান জন্মিবে। ঐ স্থান হইতে সরিয়া আর একস্থানে আসিলাম, আসিতে যত খানি শক্তি ব্যয় করিতে হইল তাহা পায়ের মাংসপেশীর স্নায়ু হইতে অনুভূত হইবে আর

যে স্থানে আসিলাম তাহার জ্ঞান স্পর্শ দ্বারা জন্মিবে। যাতায়াতে যে শক্তি ব্যয় হয় তাহা পায়ের মাংসপেশী দ্বারা হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ঐ পেশীর স্নায়ু হইতেই আমরা শক্তির মাত্রা অনুভব করি। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে দূরত্বজ্ঞানের মূল দুইটী, স্পর্শ ও শক্তিব্যয়-বোধ। যে যে স্থানে আসি তাহা স্পর্শ হইতে জানি আর যতখানি আসি তাহা শক্তি ব্যয়ের মাত্রা হইতে বুঝি। আমি যখন কোন বস্তু হইতে সরিয়া যাই, তখন দৃষ্টি দ্বারা উচ্চতাভেদ দেখি আর সে সঙ্গে স্পর্শ ও শক্তি ব্যয় এই দুয়েরও ভেদ অনুভূত হয়। দুইটী বিষয় এক সঙ্গে অনুভূত হইলে পরে একটী মনে হইলে অপরটীও মনে হয়; অতএব উচ্চতা দেখিয়া স্পর্শ ও শক্তি ব্যয়ের কথা মনে হয় আর তাহা হইতে দূরত্ব জ্ঞান জন্মে। এস্থলে কেবল উচ্চতার কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু দূরত্বভেদে যেমন উচ্চতাভেদ সেইরূপ আবার দৈর্ঘ্যেরও ভেদ হয়। অতএব শুদ্ধ যে কেবল উচ্চতা দেখিয়াই দূরত্ব অনুমান করি, তাহা নহে; উচ্চতার সঙ্গে দৈর্ঘ্যও লক্ষ্য করি। [দৃষ্টি দ্বারা বস্তুর যে উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য অনুভূত হয় তাহা রেটিনায় ঐ বস্তুর যে ছবি পড়ে তাহার উচ্চতা ও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে।] দৃষ্টি দ্বারা দূরত্ব জ্ঞানের আরও কয়েকটী উপায় আছে; যে বস্তু যত দূরে সে বস্তু তত অস্পষ্ট দেখায়; আবার বস্তুর দূরত্ব অধিক হইলে উহার দিকে চক্ষু দুইটীর অক্ষরেখা সমান্তরাল ভাবে রাখা হয়, দূরত্ব যত কমিয়া আইসে অক্ষরেখাদ্বয়ও তত সমান্তরাল অবস্থা ত্যাগ করিয়া পরস্পরের উপর হেলিয়া পড়ে; ইহা ব্যতীত আবার দূরত্ব যত কম হয় উভয় চক্ষুরই লেন্‌স্ স্বভাবতঃ মধ্য দেশে তত অধিক স্থূল হয়। বস্তুর উচ্চতার বিভেদ দেখিয়া যেমন দূরত্ব বিভেদ জানা যায়, উক্ত তিন প্রকার সঙ্কেত হইতেও উহা সেইরূপ জানা যায়। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে এগুলি কেবল মাত্র সঙ্কেত, দূরত্বজ্ঞান বাস্তবিক পক্ষে শারীরিক পরিশ্রম হইতে জন্মে—সঙ্কেতে ঐ পরিশ্রমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় আর তখন দূরত্ব জ্ঞান জন্মে।

দৃষ্টি বিষয়ে আর একটী প্রশ্ন এই—কোন বস্তু দেখিবার সময় দুই চক্ষুতে উহার দুইটী ছবি হয়, বস্তুটী তবে একটী বলিয়া বোধ হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে ঐ দুই ছবি হইতে আমরা বস্তু এক কি দুই ইহা জানিতে পাই না; বস্তুটী যে এক তাহা আমরা পূর্ব্বে স্পর্শ দ্বারা জানিতে পাই—স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুই ছবি দ্বারা দৃষ্টিও জন্মে। পরে কোন সময়ে ঐরূপ দুই ছবি দ্বারা দৃষ্টি জন্মিলে উক্ত স্পর্শের কথা মনে পড়ে আর তখন বস্তুটীও এক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। চক্ষুদ্বয়ে কোন বস্তুর যে দুই ছবি গঠিত হয় সে দুইটী ঠিক একরকম নহে; বাম চক্ষু স্থিত ছবিতে বস্তুর বামদিকের ভাগ অধিক প্রকাশ পায়, আর দক্ষিণ চক্ষুস্থিত ছবিতে দক্ষিণ দিকের ভাগ। যাহাকে আমরা ঘন-অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট বস্তু বলি তাহার তিনটী আয়তন আমরা শক্তি ব্যয় সহকারে স্পর্শ দ্বারা অবগত হই; অর্থাৎ বস্তু তিন আয়তন বিশিষ্ট ইহা

বুঝিতে হইলে শক্তি ব্যয় করিয়া উহার তিন দিক স্পর্শ করিতে হয়; কিন্তু এই স্পর্শের সহিত আবার ঐ দুইটী ছবি দ্বারা দৃষ্টিও লাভ হয়। পরে যখন বস্তুটী কেবল দেখি, তখন ঐরূপ দৃষ্টিতে ঐ স্পর্শের কথা স্মরণ হয় আর তখন বস্তুটী তিন আয়তন বিশিষ্ট বোধ হয়। পূর্ব্বে যেমন দূরত্ব বিষয়ে এক্ষণে আবার সেইরূপ বস্তুর একত্ব ও ঘনত্ব বিষয়ে দেখা যাইতেছে যে শক্তি ব্যয়কারী স্পর্শ দ্বারাই এই জ্ঞান জন্মে, দৃষ্টি কেবল ঐ স্পর্শের সঙ্কেত মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উচ্চতা দেখিয়া দূরত্ব অনুমান করা যায়; অর্থাৎ বাস্তবিক উচ্চতার সহিত দৃশ্যমান উচ্চতার তুলনা করিয়া। কিন্তু যখন বাস্তবিক উচ্চতা জানা না থাকে, তখন কিরূপে দূরত্ব অনুমান হইবে। এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন; তবে এই বলা যাইতে পারে যে দৃশ্যমান উচ্চতার পরিমাণ আর চক্ষুদ্বয়ের দুই অক্ষরেখা পরস্পরের উপর যতখানি হেলিয়া আছে তাহার পরিমাণ এই দুইটী বোধ হইলে দূরত্ব অনুমিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে দ্বিতীয় পরিমাণটী জ্ঞাত হইলে বস্তুর প্রকৃত উচ্চতা অনুমান করা যাইতে পারে আর তাহা হইলে উহার সহিত দৃশ্যমান উচ্চতার তুলনা করিয়া দূরত্বজ্ঞান জন্মে।

মনে কর খানিক দূরে একটী বস্তু আছে—ঐ বস্তু কতদূরে তাহা আমি স্পর্শ ও শক্তি ব্যয় এই দুইটী দ্বারা জানিতে পারি। ঐ দূর হইতে যখন আমি বস্তুর দিকে তাকাই তখন চক্ষুদ্বয়ের অক্ষ রেখা দুইটী পরস্পরের উপর কি পরিমাণে হেলিয়া আছে তাহা চক্ষুর মাংসপেশী হইতে জানিতে পারি, কারণ ঐরূপ হেলাইয়া রাখিতে মাংসপেশীর সাহায্য প্রয়োজন হয়। অক্ষদ্বয় যে পরিমাণে হেলিয়া আছে তাহাকে উহাদিগের আনতির পরিমাণ বলা হইবে। ইহা ভিন্ন বস্তুটীর যে ছবি রেটিনায় গঠিত হয় তাহা হইতে উহার দৃশ্যমান উচ্চতা অবগত হওয়া যায়। একই সময়ে তিনটী বিষয় মনে উপস্থিত হয়, বস্তুর দূরত্ব, অক্ষদ্বয়ের আনতি, আর বস্তুর দৃশ্যমান উচ্চতা; ইহা ছাড়া বস্তুর প্রকৃত উচ্চতা কি তাহা উহার নিকট যাইলে বুঝা যায়। আমরা দেখিতে পাই যে অক্ষদ্বয়ের আনতির পরিবর্ত্তন না হইলে (অর্থাৎ দূরত্বের পরিবর্ত্তন না হইলে, কারণ দূরত্ব ভেদে উক্ত আনতির ভেদ হয়) বস্তুর প্রকৃত উচ্চতা ভেদে উহার দৃশ্যমান উচ্চতার ভেদ হয়। আবার ইহাও দেখা যায় যে বস্তুর প্রকৃত উচ্চতা এক থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে উহার দৃশ্যমান উচ্চতার ভেদ হয়, আর ঐ সঙ্গে দূরত্ব ভেদের সহিত অক্ষদ্বয়ের আনতি ভেদ উপলব্ধ হইবে। এইরূপে অক্ষদ্বয়ের আনতি, দৃশ্যমান উচ্চতা, আর প্রকৃত উচ্চতা এই তিন রাশির বিষয়ে আমার এতটা জ্ঞান দাঁড়াইবে যে অবশেষে পূর্ব্ব দুইটী রাশি জানিলেই শেষ রাশিটী অর্থাৎ প্রকৃত উচ্চতা বলিয়া দিতে পারিব। পরে প্রকৃত উচ্চতার সহিত দৃশ্যমান উচ্চতার তুলনা করিয়া দূরত্ব কত তাহাও বলিতে পারিব। এই গেল এক পক্ষের মত; অপর পক্ষে এমতও হইতে পারে যে অক্ষদ্বয়ের আনতি হইতে অতীতে

অর্জ্জিত অভ্যাস দ্বারা (কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দূরত্ব ভেদে আনতি ভেদ হয়, কত খানি দূর হইলে কত আনতি হয় তাহা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হইয়া আইসে) প্রথমে আমরা দূরত্ব নির্ণয় করি, পরে দূরত্বের সহিত দৃশ্যমান উচ্চতার তুলনা করিয়া প্রকৃত উচ্চতা কি তাহা বলি। ফলতঃ প্রথম পক্ষে অক্ষ-আনতি ও দৃশ্যমান উচ্চতা এই দুয়ে প্রকৃত উচ্চতা জ্ঞান জন্মে আর তাহা হইতে দূরত্ব নির্ণয় হয়, আর দ্বিতীয় পক্ষে অক্ষ-আনতি হইতে দূরত্ব, পরে এই দূরত্ব ও দৃশ্যমান উচ্চতা হইতে প্রকৃত উচ্চতা নির্ণয় হয়—এই বলা হয়। কোন বস্তুর দৃশ্যমান উচ্চতা কত হইবে তাহা চক্ষুর লেন্সের কেন্দ্রভাগে ঐ বস্তুর উপর ও নীচে হইতে দুইটী রেখা টানিলে এই দুই রেখায় মধ্যে যে কোণ হইবে তাহার উপর নির্ভর করে—এই কোণ যত বড় কিম্বা যত ছোট হইবে রেটিনায় বস্তুর ছবিও তত বড় বা তত ছোট হইবে। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রেটিনায় যে ছবি গঠিত হয় তাহার আয়তনের উপর বস্তুর দৃশ্যমান আয়তন নির্ভর করে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

টোডর মল্ল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ফেরিস্তার ইতিহাসে আমরা টোডর মল্ল কর্তৃক বাঙ্গালা জয়ের অন্য প্রকার বিবরণ দেখিতে পাই। মনাইম খাঁ দায়ুদকে সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত করিলে আকবর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজা টোডর মল্লকে সসৈন্যে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন—বাদসাহ হুকুম দিলেন—"নয় দায়ুদকে দিল্লী দরবারের বশ্যতা স্বীকার করাইয়া নিয়মমত খাজনা দিতে প্রবৃত্ত করাইবে—নচেৎ তাঁহাকে বাঙ্গলা হইতে দূর করিয়া দিবে।" বাদসাহের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া টোডর মল্ল সসৈন্যে বাঙ্গলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। দায়ুদ খাঁ অতিশয় চতুর প্রকৃতি ছিলেন বাদসাহের সহিত সন্ধি করা তাঁহার মনের কথা ছিল না, স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া তিনি এক প্রকার আত্মহারা হইয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ লোডী খাঁ নামক কোন বিশ্বস্ত সেনানী এই সময়ে বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করাতে মনাইম খাঁর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তিনি সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করেন। লোডী খাঁকে নিহত করিয়া আত্ম-বিগ্রহের মূলোৎপাটন করিয়া দায়ুদ খাঁ নিশ্চিন্তচিত্ত হইলেন, এবং মনাইম খাঁর সহিত কৃত-সন্ধি ভঙ্গ করিয়া সহসা তাঁহাকে শোন ও গঙ্গার সম্মিলন স্থলে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধের পরিণাম, তাঁহার পক্ষে সুখের হইল না—তিনি পরাজিত হইয়া নদী পার হইয়া পাটনা অবরোধ করিলেন।

এই সংবাদ আকবরের নিকট পৌঁছিল। তিনি বিলম্ব না করিয়া—সেই দুর্দ্দান্ত বর্ষায়, সহস্র নৌকা পূর্ণ করিয়া অসংখ্য সৈন্যরাজি লইয়া—বাঙ্গালার দিকে ধাবিত হইলেন। পথি মধ্যে একদিন বেনারসে বিশ্রাম করা হইল—বেনারস হইতে পরিবার বর্গকে কুমারদিগের রক্ষণে দিয়া—বাদসাহ একবারে পাটনায় উপস্থিত হইলেন। দায়ুদের পাটনা অবরোধেও কোন ফল হয় নাই—তাঁহার প্রধান সেনানী ইশা খাঁ, পাটনার অবরোধ কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়া নিহত হওয়াতে দায়ুদ আকবরের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। আকবর সাহ সসৈন্যে নদীর অপর পারে হাজিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। সন্ধির প্রস্তাবে আকবর জ্বলিয়া উঠিলেন—পূর্ব্বেও ত একবার সন্ধি হইয়াছিল! আকবর দূতকে বলিলেন—"তোমার প্রভুকে বলিও - "তাঁহার ন্যায় বীর সাহসী আমার সৈন্য মধ্যে অনেকেই আছে। যদি তিনি দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বীরের ন্যায় স্বীয় অদৃষ্ট ও বলাবল পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন—তাহা হইলে আমি তাঁহাকে দ্বন্দ যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।" প্রস্তাবটা দায়ুদের বড় মনঃপুত হইল না। "য পলায়তি স জীবতি" এই সত্য বাক্যের অনুসরণে তিনি উড়িষ্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাদসাহ এই ব্যাপার দেখিয়া টোডর মল্লকে তাঁহার অনুসরণে ও মনাহিম খাঁকে পাটনার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

টোডর মল্ল দায়ুদের অনুসরণে ধাবমান হইলে উড়িষ্যার পথে তাঁহার সহিত দায়ুদের পুত্র জুনীদ খাঁর দুইটী যুদ্ধ ঘটে। টোডর মল্ল এই যুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরাজিত প্রায় হইয়াছিলেন। কিন্তু মনাইম খাঁ তাঁহার সাহায্যার্থে আসিয়া জোটাতে—তিনি পুনরায় বল সঞ্চয় করিয়া—দায়ুদের অনুসরণে চলিলেন। দায়ুদ খাঁ আর আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া বঙ্গোপসাগরের কূলে—রাজা টোডর মল্লের হস্তে ধৃত ও পরাজিত হন। *

ইহার পর টোডর মল্ল বাঙ্গলার রাজস্ব সংস্কার কার্য্যে মনোযোগ দেন। বাঙ্গলাকে কয়েকটী সুবায় বিভক্ত করিয়া—প্রত্যেক সুবার অধীনস্থ জমীগুলির জরিপ ও ফসলের তারতম্যানুসারে কর নির্দ্ধারণ করিয়া বাদসাহের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করিয়া দেন। করদ রাজাগণের নিকট হইতে যে পরিমাণে রাজস্ব প্রতিবর্ষে দিল্লী সরকারে জমা হইত—টোডর মল্লের বন্দোবস্তের গুণে তাহা চারিগুণ বৃদ্ধি পাইল। বাঙ্গলা হইতে চলিয়া যাইবার সময় তিনি বহু সংখ্যক লুণ্ঠিত দ্রব্য ও ৩। ৪ শত হস্তী বাদসাহকে উপহার দিবার জন্য আগরায় লইয়া গিয়াছিলেন।

* Muhamud Kasim Ferista's works—published by O. T. Society London.

ইহার পর বৎসর, আকবর তাঁহার হিন্দু রাজস্ব-সচিবকে গুজরাটের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনার্থে পাঠাইয়া দেন। উজীর খাঁ নামক আর একজন রাজস্ব সচিব তাঁহার পূর্ব্বে গুজরাটের রাজস্ব বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্য বিশেষ সন্তোষজনক না হওয়াতে বাদসাহ টোডরমল্লকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। টোডর মল্ল যে সময়ে গুজরাটে প্রবেশ করিলেন—সেই সময়ে মজঃফর খাঁ নামক—দিল্লী সরকারের একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। উজীর খাঁ তোডর মল্লকে দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন—কিন্তু তিনি সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে বাহির হইলেন। আহম্মদাবাদ হইতে বীর ক্রোশ দূরে ধল্‌কায় এক ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়—সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মজঃফর জুনাগড়ে পলায়ন করেন।

এই বৎসরেই আকবর সাহ, আজমীর হইতে পঞ্জাবে যাত্রা করেন। টোডর মল্ল বাদসাহের সমভিব্যাহারী হইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন—সুতরাং তিনিও আজমীরে আসিয়া তাঁহার সহিত সদলে জুটিলেন। এই সময়ে তাড়াতাড়িতে ও বিশৃঙ্খলায়, রাজা টোডর মল্লের কয়েকটী শিবলিঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকটী গৃহ-বিগ্রহ মূর্ত্তি আজমীরে পড়িয়া থাকে। যাত্রা কালে সে গুলিও সঙ্গে যাইতেছে এইরূপ অনুমান করিয়া তদ্বিষয়ে কোন খোঁজ খবর লওয়া হয় নাই—কিছুদূর গিয়া কুচ করিবার সময়, রাজা তাঁহার সমভিব্যাহারী পূজককে এই সমস্ত বিগ্রহগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কূচ করিলেই আহারাদির উদ্যোগ করা হইয়া থাকে। নিকটে নদী থাকিলে বা কোন পবিত্র দেবালয় থাকিলে হিন্দুরা গিয়া তথায় দেবোপাসনা করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতেন। রাজা তোড়কমল্ল পরম হিন্দুছিলেন—গৃহদেবতার উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ব্রাহ্মণকে সেইগুলি অর্চ্চনার জন্য আনিতে বলিলে সে মৌণাবলম্বন করিল। রাজা ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিলেন। গৃহদেবতা পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করা হইয়াছে ইহাতে যথেষ্ট বিরক্ত হইলেন। পূজা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। সুতরাং এই সময়ে সেই বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াতে কয়েক দিবস অন্নজল ত্যাগ করিয়া উপবাসী রহিলেন। আকবর সাহের কর্ণে এই কথা গেল, তিনি সচিবকে অনেক বুঝাইলেন—ও ইহার পর হইতে সদাসর্ব্বদাই তাঁহার বিষণ্ণ চিত্তকে সংযম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আকবরের আন্তরিক যত্নে হিন্দু উজীর অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ইহার পর আকবর ফতেপুর সিক্রিতে আইসেন। এইস্থানে আসিয়া বাঙ্গলা ও বিহারের বিদ্রোহ সংবাদ তাঁহার কর্ণে উঠিল। পুনরায় তিনি বিদ্রোহ দমন করিতে টোডরমল্লকে বাঙ্গলায় প্রেরণ করিলেন। সাদিক খাঁ ও তারমন খাঁ নামক আর দুইজন সেনানীকে তাঁহার "কুমকী" বা সহকারী করিয়া পাঠান হইল। বোটামের গবর্ণরকেও তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য পরওয়ানা দেওয়া হইল। বিদ্রোহীরা প্রায়

ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী ও পাচশত হস্তী এবং তদুপযুক্ত কামানাদি লইয়া মুঙ্গেরের সন্নিহিত হইল। এই সময়ে তোডরমলের নিজের দলের মধ্যে বিদ্রোহ লক্ষণ দেখা যাইতেছিল—সুতবাং ভবিষ্যৎ-বিপদাকাঙ্ক্ষায় তিনি মুঙ্গের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহীরা আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই অবরোধ সময়ে দুইজন মোগল সেনানী—(হুমায়ুন ফারমিলি ও তারখাঁ দেওয়ান।) মোগলশিবির ত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী দলে গিয়া জুটিলেন। যদিও এই সময়ে দুর্গমধ্যে আবশ্যকীয় দ্রব্যজাতের বিশেষ অভাব হইয়াছিল—তথাপি টোডরমল্ল বিশেষ সংযমের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অবরোধে কোন বিশেষ ফল হইল না দেখিয়া বিদ্রোহীগণ মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া পাটনায় রাজ কোষাগার লুণ্ঠনের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। পাহাড় খাঁ নামক মোগল সেনানী সমস্ত অর্থই স্থানীয় দুর্গে লইয়া গিয়াছিলেন—তোড়রমল্ল পাহাড় খাঁর সহায়তা জন্য আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এবারের যুদ্ধে সমস্ত বিহারের দক্ষিণাংশ মোগল সরকার ভুক্ত হইল।

আকবরের রাজত্বের সপ্তবিংশ বৎসরে টোডর মল্ল, মোগল সাম্রাজ্যের "দেওয়ান" নিযুক্ত হন। আকবর নামার তৃতীয় খণ্ডে টোডর মল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়। "আসলজমা তুমার" প্রথার সৃষ্টি করিয়া তিনি যথেষ্ট প্রতিভার ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া-ছিলেন। তাঁহার রাজস্ববন্দোবস্তগুণে সরকারের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি—ও প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মোট কথা এই—তাঁহার মৃত্যুর পর ভারতে আর টোডর মল্ল জন্মায় নাই।

আকবর নামায় লিখিত আছে রাজকীয় টাকশালের সংস্করণে কার্য্যে টোডরমল্ল যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তৎপ্রণোদিত ব্যবস্থানুসারে এই বিভাগে পূর্ব্ব প্রচলিত বিশৃঙ্খলপ্রথা সংস্কৃত হইয়া নূতনতর নিয়ম প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রণোদিত নিয়মানুসারে টাকশাল বিভাগের কার্য্য কিপ্রকারে চলিত—এ বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে। আগামী বারে আমরা এ বিষয়ের পুনরালোচনা করিব।

আকবরের রাজত্বের প্রথমাংশে রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত হিসাবাদি হিন্দীতে রাখা হইত—হিন্দুকর্ম্মচারীরাই চিরকালই এই প্রথার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। রাজা টোডরমল্ল রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ণ করিয়া এই নিয়ম করেন উল্লিখিত হিসাব পত্রাদি ইহার পর হইতে পারসীতে লিখিত হইবে। এই ব্যবস্থা প্রচলন হইলে সকল হিন্দুকর্ম্মচারীই পারসীতে সুশিক্ষিত হইতে আরম্ভ করিলেন। আজ কাল ইংরাজের রাজত্বে আমরা যে প্রকার ইংরাজীর আলোচনা করিতেছি—টোডর মল্লের সময়ে সেইরূপ পারসীর যথেষ্ট আলোচনা হয়। পূর্ব্বে পারসী ভাষায় অদক্ষ বলিয়া অনেক প্রতিভাশালী হিন্দু উচ্চ রাজকর্ম্ম হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। হিন্দু রাজস্ব-

সচিব এই শোচনীয় অভাব উপলব্ধি করিয়া উল্লিখিত ব্যবস্থা প্রচলন দ্বারা যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

সৈনিক বিভাগে রাজা মানসিংহ—"সপ্ত হাজারী মন্সবদার" হইয়াছিলেন। কোন বিখ্যাত ইতিহাসকার—মান সিংহের এই উন্নতি—টোডর মল্লের সুব্যবহার গুণে হইয়াছিল একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। টোডর মল্ল রাজস্ব সংস্করণ কার্য্যে যে সকল ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছিলেন আকবর সাহ অপরিবর্ত্তিত ভাবে তাহার অধিকাংশই গ্রহণ করেন। হিন্দু প্রতিভার তিনি কতদূর সম্মান রাখিতেন এই ঘটনা হইতেই তাহা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয়।

বাদসাহ তাঁহার রাজত্বের ঊনবিংশ বৎসরে টোডর মল্লের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানিত করেন। এ প্রকার সম্মান মোগল রাজত্বে কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই—ইংরাজ রাজত্বে ঘটিয়াছে কি না এবিষয়েও সন্দেহ আছে।

পদবৃদ্ধির সহিত এই সময়ে রাজা টোডর মল্লের অনেক শত্রু বৃদ্ধি হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বের দ্বাত্রিংশ বৎসরে আজমীর হইতে যাত্রাকালীন পথি মধ্যে একজন ক্ষত্রিয় গোপনে তাঁহার জীবন বিনাশের উদ্যোগ করে কিন্তু দুরাত্মা এই দুরভিপ্রায় সিদ্ধির উদ্যোগের মুখেই ধৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থলে দ্বিখণ্ডিত হয়।

ভারতের সীমান্ত দেশে ইউসফ্‌জীকের বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে—রাজা মানসিংহ সসৈন্যে তাহাদের দমন করিবার জন্য প্রেরিত হন। এই যুদ্ধ যাত্রায় টোডর মল্লও মানসিংহের সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। বাদসাহ তাঁহার রাজত্বের চতুর্বিংশ বৎসরে কাশ্মীর যাত্রা করেন—টোডরমল্ল এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বাদসাহ হিন্দুরাজা-টোডরমল্লকে লাহোরের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করেন।

এই সময়ে রাজ কার্য্য-জনিত গুরুতর পরিশ্রমে ও বয়োধিক্য বশতঃ রাজা টোডর মল্লের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া আসিতেছিল—সুতরাং তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অবসর লইবার মানস করিলেন। আকবরকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা যে প্রকার তাহাতে এই সমস্ত গুরুতরভার বহন করা ক্রমশঃ আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া আসিতেছে। আমি বাদসাহ-সরকার হইতে অবসর লইয়া নির্জ্জনে হরিদ্বারে জাহ্নবী তীরে জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিতে বাসনা করি।" বাদসাহ প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন—কিন্তু টোডর মল্লকে ছাড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের তৃপ্তি জন্মিল না। ইহার কয়েক মাস পরে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন "নির্জ্জনে হরিদ্বার মুখে, গঙ্গাতীরে বসিয়া ধর্ম্মাচরণ করা অপেক্ষা—স্বীয় কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিলে আপনার অধিকতর ধর্ম্ম সঞ্চয় হইতে পারে। আপনি পুনরায় আসিয়া সরকারের কার্য্যে

নিযুক্ত হউন।" টোডরমল্ল বাদসাহের আহ্বান উপেক্ষা করিলেন না বটে কিন্তু ফিরিয়া আসিবার অতি অল্পকাল পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন (হিজরা ৯৯৮ অব্দে)।* তাঁহার পুত্র "কুমার ধারু অতিশয় বীর পুরুষ ছিলেন। আকবরের অধীনে সপ্ত শতের অধিনায়ক হইয়া খাঁ খানানের সহিত—সিন্ধু প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়া কুমার অতি অল্প বয়সেই সমরক্ষেত্রে নিহত হন। জনপ্রবাদ এই, তিনি স্বর্গ-নির্ম্মিত লাল দিয়া স্বীয় যুদ্ধ-অশ্বের খুরগুলি মণ্ডিত করিয়া দিতেন।

মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা হিন্দু রাজা টোডর মল্লকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামী ও উদ্ধত স্বভাব প্রভৃতি দোষে দোষী করিলেও—তিনি যে একজন উচ্চদরের প্রতিভা-সম্পন্ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শী, সর্ব্বজনপ্রিয় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার সুবন্দোবস্তে সরকারের আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল—প্রজার সুখ বাড়িয়াছিল—দেশে শান্তি ও ঐশ্বর্য্য বাড়িয়াছিল—রাজদরবারে হিন্দুর আধিপত্য অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। যতদিন ভারতে আকবর, আবুলফজল, মানসিংহের স্মৃতি না লোপ হইবে—ততদিন—টোডরমল্লের নাম ভুলিয়া যাওয়া ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

"তাফ্রিউল ইমারত" নামক পারস্য গ্রন্থের মতে তোডরমল্ল অতি অল্পবয়সেই পিতৃ-বিয়োগ শোক অনুভব করেন। এই সময়ে তাঁহার সংসারে দারিদ্রতা পূর্ণ-প্রভাবে আধিপত্য করিতেছিল। কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি প্রতিভা বলে তিনি অল্পকাল মধ্যেই সামান্য সরকারী হইতে সুবৃহৎ মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন।

তোডরমল্লের সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহ করা অতিশয় দুর্ঘট। নানাস্থান হইতে ক্ষুদ্র ও অসংযত অংশ সমূহ সংগ্রহ করিয়া যতদূর পাওয়া গিয়াছে—তাহা একত্রী-কৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তোডরমল্লের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

প্লেটো—টিমীয়স্।

সক্রেটিস্। এক, দুই, তিন; হে প্রিয় টিমীয়স, তোমরা যে চারিজন কল্য আমার অতিথি হইয়াছিলে এবং অদ্য আমাকে আতিথ্য দান করিবে বলিয়াছিলে সে চারিজনের চতুর্থ ব্যক্তি কোথায়?

---

* টোডরমল্লের কিয়দ্দিবস পরেই মানসিংহের পিতা রাজা ভগবান দাস—মূত্রকৃচ্ছ রোগে আক্রান্ত হইয়া লাহোরে প্রাণত্যাগ করেন। তোডরমল্লের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আসিয়াই ইনি এই রোগে আক্রান্ত হন।

টিমীয়স্। তাঁহার অসুখ হইয়াছে সক্রেটিস ; নচেৎ তিনি অদ্যকার এ সভায় কখনও অনুপস্থিত থাকিতেন না।

সঃ। তবে সে ব্যক্তি যদি নাই আইসে তবে তুমি ও অপর দুই জন তাহার স্থান পূর্ণ করিবে ?

টিঃ। অবশ্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব ; কল্য তুমি আমাদিগের উৎকৃষ্টরূপ আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলে, অদ্য আমরা যে কয়জন উপস্থিত আছি তাহার প্রতিদান দিব।

উল্লিখিত কথাগুলির মর্ম্ম এই যে মনুষ্যসমাজ কিরূপ হওয়া উচিত এই বিষয়ে সক্রেটিস কতকগুলি লোকের সহিত পূর্ব্বে যে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন,—টিমীয়স্ ক্রিটিয়াস, হার্ম্মক্রাটিস এবং আর এক ব্যক্তি এই চারিজনকে গত কল্য তাহার বৃত্তান্ত অবগত করান ; এবং এক্ষণে তিনি তাঁহার ঐ পরিশ্রমের প্রতিদান স্বরূপ একটি বিষয় তাঁহাদিগের নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারাও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত। সমাজ কি নিয়মে গঠিত হওয়া উচিত, সমাজস্থ ব্যক্তিদিগকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত এই সব কথা তিনি গল্পচ্ছলে বলিয়াছেন ; এক্ষণে সমাজ কিরূপে যুদ্ধকার্য্য করিবে এই বিষয়টী গল্পচ্ছলে অন্য কেহ বলিয়া যায় এই তাঁহার ইচ্ছা। সক্রেটিস এই বিষয়টী শুনিতে চাহেন। ইহা বর্ণনা করা তাঁহার নিজের সাধ্যায়ত্ত নহে ; কবিগণও এ বিষয় বর্ণনা করেন নাই—তাঁহারা এসব বিষয় তাঁহাদের কবিত্বের বহির্ভূত জ্ঞান করেন। গ্রীকদিগের মধ্যে সফিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানী এই নামে একদল লোক ছিল, তাহারা যুবকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ভার গ্রহণ করিত ; তাঁহারা খুব বাক্‌পটু কিন্তু তাঁহারা কোন স্থলেই স্থির হইয়া বাস করেন না, সুতরাং যুদ্ধের ও শান্তির সময় জনগণকে কিরূপে চালান উচিত তাহা তাঁহারাও বলিতে পারিবেন না। টিমীয়স ইটালী দেশের লক্রিস সহরের অধিবাসী—এই সহরের বিধি সমূহ উৎকৃষ্ট—আর টিমীয়স ধন, জ্ঞান, পদমর্য্যাদা সর্ব্ববিষয়ে একজন প্রধান ব্যক্তি, ক্রিটিয়াস উল্লিখিত বিষয় উত্তমরূপ জানেন ইহা আথেন্‌সবাসী মাত্রই অবগত আছেন, আর হার্ম্মক্রাটিসও দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা উপযোগী-জ্ঞান ও প্রকৃতি-সম্পন্ন ইহা অনেকেই বলে,—অতএব সক্রেটিসের ইচ্ছা যে তাঁহারা এক্ষণে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন।

তিনি সমাজের কিরূপ চিত্র অঙ্কিত করেন তাহা সাধারণতন্ত্র গ্রন্থে সবিস্তারে দেখা যায়। বর্ত্তমান কথোপকথনে সক্রেটিস উহার স্থূল মর্ম্ম বলিয়াছেন, তাঁহার মতে সমাজে শ্রমজীবী, যোদ্ধা, ও বিধিপ্রণেতা এই কয়টী শ্রেণী থাকা উচিত ; ইহারা কেহ অপরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। যাঁহারা যোদ্ধা হইবে, তাহারা সকলে মিলিয়া একত্র থাকিবে, জীবন ধারণ করিবার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজন তাহারা তাহাই পাইবে ; ইহা ব্যতীত তাহাদিগের স্বকীয় কোন সম্পত্তি থাকিবে না—এমন

কি তাহাদিগের নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যাও থাকিবে না। সমাজকে দেশীয় ও বিদেশীয় শত্রু হইতে রক্ষা করাই তাহাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে।

অতঃপর হার্মক্রাটিস সক্রেটিসকে বলিলেন যে তাঁহারা তাঁহার অভিপ্রেত যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন। তিনি আরও বলিলেন যে কাল তাঁহারা ক্রিটিয়াসের বাড়ীতে ঐ বিষয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ক্রিটিয়াস একটী পুরাতন পরম্পরাগত গল্প তাঁহাদিগকে বলেন—সেটী শুনিলে সক্রেটিস খুসী হইতে পারেন।

ক্রিঃ—বলিলেন যে, তিনি তাহা বলিতে প্রস্তুত আছেন; এখন টিমীয়সের সম্মতি পাইলে হয়।

টিঃ—সহজেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন ক্রিঃ তাঁহার পিতামহ ক্রিটিয়াসের নিকট হইতে যে একটী গল্প শুনেন তাহার মর্ম্ম বলিলেন; এই গল্পটী ক্রিটিয়াস আবার তাঁহার পিতা ড্রপিডাসের নিকট শুনেন আর ড্রপিডাসকে উহা স্বয়ং সোলন বলিয়াছিলেন। গল্পটির স্থূল কথা এই যে সোলন মিশর দেশে যাত্রা করেন এবং সেখানকার পুরোহিতদিগের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। একদিন কথায় কথায় এক বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁহাকে বলিলেন যে জ্ঞানের বিষয়ে তাঁহার জাতি (গ্রীকগণ) শিশু সন্তান মাত্র। ইহার কারণ এই যে আথেন্স্ নগরে বহুপূর্ব্বে যে সকল লোক ছিল তাহারা দৈব বিপাকে বিনষ্ট হয়, পরে আবার যাহারা আসিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করে তাহারা ঐ পুরাকালের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে কিছুই জানিত না—সুতরাং ঐ পুরাকালীন ব্যক্তিদিগের বিনাশের সহিত আথেন্সে তাহাদিগের বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসাদিও লোপ পাইল; কিন্তু মিশর দেশে তাহাদিগের ইতিবৃত্ত রক্ষিত হইয়াছে, কারণ ঐ দেশে কখনও ঐ রূপে দৈববিপ্লব ঘটে নাই। আর এই ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে এককালে আটলাণ্টিস নামে আটলাণ্টিক মহাসাগরে (বর্ত্তমান জিব্রল্টারের নিকট) এক প্রধান দ্বীপ ছিল। এই দ্বীপের অধিবাসীগণ ইয়োরোপ ও আসিয়ার প্রজাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। উহারা এক সময় আথেন্স্ ও মিশর এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ আক্রমণ করিল; তখন কেবল আথেন্সের ঐ পুরাতন অধিবাসীরাই তাহাদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করে; এবং জয়লাভ করিয়া অনেকজাতিকে অধীনতা শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করে। যাহা হউক পরে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প, বৃষ্টি ও বন্যা উপস্থিত হয়—তাহাতে ঐ দ্বীপ সমুদ্রে জলমগ্ন এবং আথেনসের অধিবাসীগণও ভূমিসাৎ হয়।

ক্রিঃ—এই গল্পটী সবিস্তারে বলিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব এই "যেহেতু টিমিয়স একজন জ্যোতির্ব্বিৎ ও পদার্থবিৎ পণ্ডিত, অতএব তিনি প্রথমতঃ বিশ্বসংসারের উৎপত্তি ও মানবের সৃষ্টি বর্ণনা করুন। তাহার পরে আমরা মনে করিব যে ঐ মানব গঠিত সমাজ তোমার (সক্রেটিসের) আদর্শ সমাজের বিধি সমূহ দ্বারা গঠিত

হইল; এবং অবশেষে ঐ সমাজের লোকগণ কিরূপে যুদ্ধবিগ্রহাদি করে তাহা আমি বর্ণনা করিব, যেন মিশরদেশের পুরোহিত-উক্ত সেই আথেনসের পুরাতন অধিবাসী গণই ঐ সকল কার্য্য করিতেছে।” সঃ এই প্রস্তাবে বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং টিমীয়সকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তিনি বোধ হয় তাহা হইলে তাঁহার বর্ণনা আরম্ভ করিবেন এবং প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বপ্রথমে দেবগণের আরাধনা করিবেন।

টিঃ। হে সক্রেটিস, কি বড় কি ছোট সকল কাজের প্রথমেই লোকে দেবতা-দিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। এবং আমরাও যেখানে সৃষ্ট ও অসৃষ্ট সমুদয় বিশ্বের প্রকৃতি বর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়াছি সেখানে আমাদিগের কর্ত্তব্য দেব দেবী-দিগের নিকট এই প্রার্থনা করা যে আমরা যাহা কিছু বলিব তাহা তাঁহাদিগের সন্তোষ-প্রদ হয় এবং আমাদিগের প্রকৃতির বিরোধী না হয়। অতএব আমরা এক্ষণে তাঁহা-দিগের নামগ্রহণ করিতেছি এবং আমার পক্ষে বিশেষ করিয়া এই বলিতেছি যে আমি যেন আমার মনোমত করিয়া এই প্রস্তাবনাটী শেষ করিতে পারি এবং এরূপ করিয়া বলিতে পারি যাহাতে তোমার বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট না হয়। প্রথমতঃ আমাদিগের ইহা স্থির করা আবশ্যক—যাহা চিরস্থায়ী ও অনাদি আর যাহা চিরকালই আরম্ভ হইতেছে অথচ কখনও স্থায়ী হইতেছে না এই দুয়ের প্রকৃতি কি। যাহা জ্ঞান ও চিন্তা দ্বারা অব-গত হওয়া যায় তাহা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় আর যাহা জ্ঞান দ্বারা নহে কেবল ইন্দ্রিয় সাহায্যে ইতর বুদ্ধি দ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহা আরম্ভ হইয়াই লোপ পায়, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। যাহার আরম্ভ আছে অর্থাৎ অনাদি নহে তাহার কোন না কোন একটী কারণও আছে, যেহেতু কারণ ব্যতীত কিছুই সৃষ্ট হইতে পারে না। নির্ম্মাতা যদি কোন অপরিবর্ত্তনীয় ও একমেব ভাববিশিষ্ট বস্তুর অনুকরণে কোন পদার্থ প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে উহা সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠববিশিষ্ট হয়; কিন্তু যাহা সৃষ্ট বস্তুর অনুকরণে প্রস্তুত হয় তাহা কখনও নির্দ্দোষ হয় না। এই যে সংসার দেখিতেছি ইহা কি অনাদি, না ইহা সৃষ্ট পদার্থ? যেখানে দেখা যাইতেছে যে এই সংসার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু, সেখানে অবশ্য ইহাকে সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর বিশ্ব নির্ম্মাতা জগৎ সৃষ্টি কালে যে উহা কোন অনাদি বস্তুর আদর্শে সৃষ্টি করেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ হইতে পারে না, কারণ এই জগৎ সৃষ্ট বস্তু সমূহের মধ্যে অতি রমণীয় পদার্থ এবং ইহার নির্ম্মাতাও অদ্বিতীয় পুরুষ। এই জগৎ যেখানে নিজে কোন অনাদি বস্তু নহে, ফলতঃ ঐরূপ কোন বস্তুর অনুকরণ মাত্র—সেখানে জগতের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যাইবে তাহা অখণ্ডনীয় না হইতে পারে। অর্থাৎ যেমন বিষয়, তেমনই তাহার বৃত্তান্ত; যে বিষয়টী স্বয়ং অনাদি, তাহার বৃত্তান্ত তদনুরূপ অখণ্ডনীয় আর যে বিষয়টী তাহা নহে, তাহার বৃত্তান্তও অখণ্ডনীয় নহে। যাহা হউক, আমরা ক্ষুদ্র মানব ভিন্ন অন্য

কিছু নহি, অতএব যাহা সম্ভবপর তাহা জানিতে পারিলেই আমাদিগের সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য; যাহা নিঃসন্দেহ সত্য তাহা জানিতে না পারিলেও আমাদিগের চুপ করিয়া থাকা বিধেয়।

সঃ। বেশ বলিয়াছ, টিমীয়স। তুমি যে অর্থে যে কথা বলিবে আমরাও সেই অর্থে সে কথা গ্রহণ করিব। তোমার উপক্রমণিকা শুনিয়া খুসী হইয়াছি; এক্ষণে আসল কথা বল এই অনুরোধ করিতেছি।

টিঃ। স্রষ্টা কেন এই জগৎ উৎপাদন ও সৃষ্টি করেন, তাহা তবে বলি। তিনি সৎ আর যে সৎ সে কখনও কাহারও ঈর্ষা করে না; এবং সেই নিমিত্ত তিনি সকল বস্তুই যথাসম্ভব আপনার ন্যায় সৎ হইবে এই ইচ্ছা করেন। সমুদায় দৃশ্যমান জগতই তিনি গতিশীল দেখিতে পাইলেন এবং যখন দেখিলেন যে উহার গতি কোন নিয়মানুযায়ী নহে, তখন তিনি উহাকে নিয়মাধীন করিলেন। যিনি স্বয়ং সর্ব্বোত্তম, তিনি কোন বস্তুই উৎকৃষ্টতম না করিয়া সৃষ্টি করেন না। বুদ্ধিবিশিষ্ট হওয়া বুদ্ধিহীন হওয়া অপেক্ষা উত্তম আর আত্মা ব্যতীত বুদ্ধি থাকে না—অতএব স্রষ্টা জগতের দেহে আত্মা এবং সেই আত্মায় বুদ্ধি দিয়া উহার সৃজন করেন। অতঃপর দেখা যাউক, এই জগৎ—যাহাকে আমরা জীবন্ত মনে করিতেছি—কোন্ জন্তুর আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে। সংসারে যত প্রকার জন্তু আছে সে সমুদয় যাহার মধ্যে আছে, তাহারই আদর্শে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ আদিতে এমন একটী আদর্শ জন্তু ছিল, যাহাতে অন্যান্য সমুদয় জন্তুই অন্তর্হিত ছিল, আর এই জন্তুর অনুকরণে জগৎ গঠিত হইয়াছে। আদর্শ একটী, অতএব তাহার অনুকরণ এই জগৎ ইহাও একটী, জগৎ একের অধিক নহে। যাহা সৃষ্ট তাহাই দেহবিশিষ্ট, এবং স্পর্শ ও দর্শন এই দুয়ের গ্রাহ্য। কোন বস্তুতে অগ্নি না থাকিলে তাহা দর্শন গ্রাহ্য হয় না, আর যাহা কঠিন নহে তাহা স্পর্শ গ্রাহ্য নহে এবং মৃত্তিকায় গঠিত না হইলে কোন পদার্থ কঠিন হয় না; অতএব ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিবার সময় উহা অগ্নি ও মৃত্তিকায় গঠিত করেন। কোন পদার্থে দুইটী বস্তু থাকিলে উহাদিগকে সংযুক্ত রাখিবার নিমিত্ত একটী তৃতীয় বস্তুর প্রয়োজন হয়। মনে কর ক ও খ দুইটী বস্তু ও গ ঐ দুয়ের সংযোগ সাধক তৃতীয় বস্তু, যদি গয়ের সহিত কয়ের যে অনুপাত, খয়ের সহিত গয়ের সেই অনুপাত হয় তবে ঐ সংযোগ উৎকৃষ্ট হইবে। অগ্নি ও মৃত্তিকা দুইটী ঘন বস্তু অতএব ঐ দুয়ের মধ্যে দুইটী সংযোগকারী রাশির প্রয়োজন—আর এই দুইটী বায়ু ও জল। অগ্নি ও মৃত্তিকা যদি ঘন অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ-বিশিষ্ট না হইয়া ক্ষেত্রবৎ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে উহাদিগকে সংযোগ করিবার নিমিত্ত একটী রাশি হইলেই চলিত। [এস্থলে প্লেটোর কথার অর্থ কি তাহা ঠিক বলা যায় না। একজন বলেন যে এক, দুই, তিন, পাঁচ, সাত, এগার, তের ইত্যাদি যে সকল রাশি কেবল মাত্র এক এই রাশি দ্বারা বিভাগ করা যায়

অর্থাৎ অন্য কোন রাশি দ্বারা বিভক্ত হয় না, এই রূপ রাশির বর্গ দুই রাশির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার কেবল একটী রাশি হইতে পারে; আর এই রূপ রাশির ঘন দুই রাশির মধ্যে ঐ প্রকার দুইটী রাশি হইতে পারে। প্লেটোর উদ্দেশ্য এই হইতে পারে যে অগ্নির সহিত বায়ুর যে সম্বন্ধ, বায়ুর সহিত জলের, আর জলের সহিত মৃত্তিকার সেই সম্বন্ধ। একটী উদাহরণ দিয়া উল্লিখিত গণিত বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে; ৩ এবং ৫ এই দুয়ের বর্গ ৯ আর এই দুই রাশির মধ্যে ১৫ লইলে দেখা যায় যে $\frac{৯}{১৫}=\frac{১৫}{২৫}$; ৩ এবং ৫ এর ঘন ২৭ এবং ১২৫, এই দুয়ের মধ্যে এমন একটী মধ্যম রাশি নাই যাহাতে ঐরূপ সমানুপাত হইবে কিন্তু দুইটী মধ্যম রাশিতে সমানুপাত পাওয়া যায়,—একটী ৪৫ আর একটী ৭৫. $\frac{২৭}{৪৫}=\frac{৪৫}{৭৫}=\frac{৭৫}{১২৫}$।] এইরূপে জগৎরূপ জন্তুর দেহ অগ্নি, বায়ু, জল, ও মৃত্তিকা এই চারি উপাদান হইতে গঠিত হইয়াছে আর এই চারিটী উহাতে সামঞ্জস্য ভাবে বিদ্যমান আছে।

যে চারিটী উপাদানে জগৎ গঠিত হয় সে চারিটীর সমুদয়ই উহাতে ব্যবহৃত হয়—সুতরাং জগৎকে বাহির হইতে উৎপাত করিবার আর কিছুই রহিল না এবং অন্য একটী জগৎ উৎপন্ন হওয়ারও কোন সামগ্রী রহিল না। জগতের আকৃতি সম্পূর্ণ গোলাকার; উহার বাহিরের ভাগ মসৃণ, ইহার কারণ এই যে উহার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন নাই (অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিলে বাহিরের ভাগ বরাবর মসৃণ হইত না কোনস্থল বা উচ্চ কোনস্থল বা নীচ হইত।) বিশ্বকর্ত্তা জগৎকে যে গতি দিয়াছেন তাহাতে উহা এক স্থলে থাকিয়াই বৃত্তাকারে ঘুরে, এইরূপ গতি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ন্যায় যুক্ত। এই জগতের দেহের কেন্দ্রস্থলে তিনি উঁহার আত্মা স্থাপন করিলেন আর এই আত্মা দেহের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দিলেন, এমনকি আত্মা দেহের বাহিরে উহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। আত্মা দেহকে চালাইবে, অতএব আত্মাতে তিনপ্রকার বস্তুর সার রহিল (১) পরিবর্ত্তন বিহীন, অবিভাজ্য অংশ, (২) পরিবর্ত্তনশীল, বিভাজ্য অংশ, (৩) ঐ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী একটী অংশ দুয়েরই সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে। প্রথম বস্তুটিতে চিন্তনীয় ভাব সমূহ বুঝিতে হইবে, যেমন সংজ্ঞা; দ্বিতীয়টীতে, জড় বস্তু সমূহ। চিন্তনীয় ভাবের প্রকৃতি এই যে উহা এক, অবিভাজ্য, অপরিবর্ত্তনীয়; জড়ের প্রকৃতি এই যে উহা বিভাজ্য, বহুরূপী ও পরিবর্ত্তনশীল) উক্ত তিনটী বস্তুতে যে আত্মা গঠিত হইল তাহা এক বিশেষ (সামঞ্জস্যাত্মক) নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাগ করা হইল এবং পরে সমুদয় আত্মাকে লম্বালম্বি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটী বৃত্তাকারে স্থাপিত করা হইল, একটী বাহিরের আর একটী ভিতরের বৃত্ত। এই বৃত্ত দুইটী মধ্যস্থ কেন্দ্র বেড়িয়া ঘুরিতে লাগিল; বাহিরের বৃত্তটীতে আত্মার অবিভাজ্য বস্তু রহিল আর ভিতরের বৃত্তটীতে বিভাজ্য বস্তুটী। বাহিরের (নক্ষত্ররাশির) বৃত্তের গতি এক, অবিভক্ত; আর ভিতরের বৃত্তের গতি বিভক্ত হইয়া পাঁচটী গ্রহ এবং সূর্য্য ও

চন্দ্র এই সাতটী পদার্থের গতিতে পরিণত হইল। বাহিরের বৃত্তের গতি ডাহিনদিকে আর ভিতরের কয়টী বৃত্তের গতি বিপরীত দিকে বামে হইল। বাহিরের বৃত্তের গতি ভিতরের প্রত্যেক বৃত্তের গতি অপেক্ষা প্রবলতর অতএব শেষোক্ত বৃত্তগুলির বিপরীত দিকে ঘুরিবার চেষ্টা থাকিলেও প্রথমোক্ত বৃত্ত যে দিকে ঘুরে সেই দিকেই ঘুরিতে বাধ্য হয়। ক্রমশঃ।

ভুল-ভাঙ্গা।

ফুলে ফুলে যে বেড়ায়
সে ভুলে এসেছিল হেথা,
ভেঙ্গেছে সে ভুল-ঘোর
তাই বুঝি পেয়ে গেল ব্যথা!

ভেবেছিল বা সে মনে
হেথা ফোটে বড় সুখে ফুল,
এসে এই ফুল-বনে
শেষে ভ্রমরের ঘটে ভুল।

সোহাগের ভরে ছুলি
হেথা বহে হরষের বায়,
হেথাকার পাখিগুলি
তারা হরষের গান গায়।

তরু-কোলে লতিকায়
হেথা সাজাইতে অনুরাগে,
অনুপম সুষমায়
বুঝি মধু ঋতু চির জাগে।

হেসে পড়ে চাঁদ গ'লে
হেথা ফুল মুখে খেয়ে চুম,
নিজে পড়ে পুন চ'লে
এসে লতায় পাড়াতে ঘুম।

এসেছিল হেথা তাই
মনে বাসনা করিয়ে কত,
দেখিল সে সব নাই
তাই দাঁড়াতে পারিল না ত!

আশার লতাটি তার
তাই তখনি পড়িল নুয়ে,
প্রাণের হরষ-ভার
তার লুটিয়ে পড়িল ভুঁয়ে।

হাসিরাশি ভরা প্রাণে
তার উছলি পড়িল ব্যথা,
চ'লে গেল অভিমানে
কারে কহিল না কোন কথা।

সমুখে তরুটি এই
ছিল এই সে লতাটি পিছু,
ফিরিল ঘুরিল সেই
তবু দেখিল না চেয়ে কিছু।

যেতেছিনু কাছে তার
আমি কি যেন বলিব ব'লে,
গিয়ে দেখি—নাই আর
সে যে কোথায় গিয়েছে চ'লে!

তাই সে আকুল প্রাণ
মোর ডুবেছে শোকের সরে,—
তবুও জাগায়ে গান
আমি রেখেছি তাহার তরে।

তরণী রেখেছি বেঁধে
আমি অকূলে আপনি ভেসে,
আপনি গিয়েছে কেঁদে
সে যে আমারে কাঁদাতে এসে।

একটি গোলাপ ফুল
ছিল বন-পাশে যেথা ফুটি,
ক'রে গেছে সেথা ভুল
ফেলে শিশিরের ফোঁটা দুটি।

মন খুঁজেছিনু তার
বটে পাই নি দেখিতে তাতে
তবুও বুঝেছি সার
তাও নে যেতে পারে নি সাথে!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

হেঁয়ালি নাট্য।*

অন্ধ পরামাণিক ও স্কুলের ছাত্র রমেশের তর্ক স্থলে সুরেশের প্রবেশ।

সুরেশ। আ রে ব্যাপার টা কি? অত ক্ষেপেছিস কেন!

রমেশ। দেখ না বেটা নিজে জন্মান্ধ তাই ওর ধ্রুব বিশ্বাস সবাই অন্ধ! কিছুতে কি—

অন্ধ। (হাসিয়া) রমেশ বাবা চটোনা—সত্যি কথা—বলেছি, এ ত রাগের কথা নয়!

রমেশ। আবার হাসি দেখ না, আপ্যায়িত হয়ে গেলুম আর কি! ফের যদি সবাইকে কানা বলবি—তো তোকে দেখিয়ে দেব?

অন্ধ। আমিত বাবা তাই চাই, তাহলেইত সব গোল চুকে যায়। কিন্তু যতক্ষণ দেখাতে না পার—ততক্ষণ তুমি ত তুমি স্বয়ং ভগবান এসে বল্লেও আমার বিশ্বাস হবে না—যে দেখার মত জিনিস পৃথিবীতে একটা কিছু আছে!

* গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর কারবার। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

রমেশ। "শুনছ সুরেশ—শুনছ? এমন আহাম্মক, বেহেড, বেআদব কাণা কোথায় দেখেছ!

সুরেশ। তুই একটু থাম,—আচ্ছা আমি ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। পরামাণিক মশায়—যদি লোকে দেখতে পায় না, তবে কাজ করে কি করে?

অন্ধ। "হাঃ হাঃ লোকে দেখতে না পেলে কাজ করতে পারে না? আমি কি ক'রে কাজ করি?

সুরেশ। "তুমি রাস্তা চিনে যেতে পার?

অন্ধ। রাস্তা চেনা! রাস্তার কোথায় গাড়ী ঘোড়া লোকজন বল না সব বলে দিচ্ছি।

সুরেশ। সত্যি নাকি? আচ্ছা তা যেন পারলে কোনটা কেমন জিনিস বলতে পার?

রমেশ। ওবেটা সব পারে—ওর অসাধ্য কিছু নেই। ও জিনিসে হাত দিয়ে কিসের তৈরি—কি রকম গড়ণ, কত বড়—সব বলতে পারে—কোন ঘরে গেলে ঘরটা কত বড় তার কোথায় জানালা দরজা তা পর্য্যন্ত বলতে পারে, অক্ষরে হাত বুলিয়ে পড়তে পর্য্যন্ত শিখেছিল, এক কথায় ওটা পারে না—এমন কাজই নেই, ওটা খোদার খাসী! আর যেটা পারে না সেইটে বল্লেই বলে মিথ্যা কথা!

অন্ধ। হা হাঃ সুরেশ বাবা তুমি কাকে কি বল কিছুই জ্ঞান কাণ্ড নেই।

রমেশ। তুই চুপ কর, তোর দৃষ্টিকাণ্ড নেই।

অন্ধ। হা হাঃ দৃষ্টি কাণ্ড! তা নাকি কারো আছে? সব স্পর্শ কাণ্ড।

সুরেশ। আচ্ছা আমার কাপড়টা স্পর্শ করে বল দেখি এর কি রং।

অন্ধ। রং আবার নাকি আছে? যা আছে এখনি বলে দিচ্ছি—কাপড়টা শক্ত কি নরম দাও বলে দিই। আমাকে ঠকালেই ত আর ঠকব না। এই জন্যে যার ইস্কুল ছেড়েছি। হা হাঃ সে এক গল্প। পণ্ডিতমশায় আমাকে একদিন বুঝাচ্ছেন আকাশে বিন্দুর মত ছোট্ট ছোট্ট তারা নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আসলে তারা পৃথিবীর মত মস্ত মস্ত। বলি পৃথিবীর মত মস্ত জিনিসকে যদি তোমরা বিন্দুর মত ছোট দেখ তবে তোমাদের চোখে দরকার! ওরকম ভুল বুঝাই যদি দৃষ্টির কাজ হয় ত আমার সৌভাগ্য যে আমার দৃষ্টি নেই। ঐ শুনে অবধি আর আমি স্কুল মাড়াই নি, ও সব মিথ্যা শেখা আমার কর্ম্ম নয়।

সুরেশ। আচ্ছা পণ্ডিতই যেন মিথ্যা বল্লেন—কিন্তু পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই তবে দেখার কথা বলে কেন?

অন্ধ। হয়েছে কি—একজন চালাক লোক জাঁক করার জন্য এই মিথ্যা দৃষ্টির সৃষ্টি করে, তার দেখাদেখি এখন সকলেই ঐ কথা বলে।

রমেশ। কিন্তু চোখ বলে আমাদের যে ইন্দ্রিয়টা আছে এর কি তবে কোনই আবশ্যক নেই ?

অন্ধ। কেন চোখ দিয়ে ঠাণ্ডা গরম সব চেয়ে শীঘ্র বুঝা যায়। রোদে আগুণে চোখে যত শীঘ্র ঝাঁজ লাগে এমন ত শরীরের আর কোথায় লাগে না। তা ছাড়া সকলেরই—বিশেষ মেয়েদের কাঁদবার জন্যই চোখের দরকার।

রমেশ। বটে! বেটাকে এক ঘা বসিয়ে দে ত, চোখটা ওর দরকারে আসুক!

সুরেশ। ওর সঙ্গে তর্কে পারব না—চল যাওয়া যাক।

রমেশ। শুধু যাওয়া না—ওর জ্বালায় আমি দেশ ছাড়তেও রাজি!

উভয়ের প্রস্থান।

ঘোড়দৌড়ের নিকটবর্ত্তী লোক সমাকীর্ণ-মাঠে রাখাল গোপাল প্রভৃতি বালকগণ ও অন্ধ।

অন্ধ। (স্বগত) দেখবে ত সবই। সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। অথচ সব ঘোড়-দৌড় দেখবে বলে এসেছ। সবাই মিথ্যাবাদী। আসল আমিও যেমন দেখছি ওরাও তেমনি দেখছে, তবে সেটা সাহস করে কেউ স্বীকার কর্ত্তে পারে না। লোকও ত কম হয়নি, যে রকম গোল শুনছি তাতে অনেক লোক মনে হচ্ছে। ঠিক কথা—এই ছেলেদের জিজ্ঞাসা করা যাক কত লোক। উত্তর শুনলেই ধরা পড়বে সত্য বলছে কি মিথ্যা বলছে। আমাকে এনেছে মজা করার জন্য। দেখা যাক কে কাকে নিয়ে মজা করে। (প্রকাশ্যে) ও গোপাল ও রাখাল বাবু!

গোপাল। "আজ্ঞে হুজুর আদেশ কি ?

অন্ধ। কত আন্দাজ লোক এসেছে ?

গো। এই চার পাঁচশ হবে বোধ হয়।

কৃষ্ণ। চার পাঁচশ কি দু হাজারের কম ত না।

রা। দু হাজার—অত হবে না এই ১০।১২শ হবে।

অন্ধ। এই তোমরা সত্য বলছ, না ? তার চেয়ে সত্য বল যে দেখতে পাও না যার যা মনে আসছে বলে দিচ্ছ। সত্য যদি দেখতে পেতে সবাই এক দেখতে।

একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ।

ভদ্রলোক। (গোপালের প্রতি) কোনখানে শেষে ঘোড়া থামান হবে জানেন ?

গো। ওই যে ওখানে একটা মস্ত হলদে বাড়ী দেখছেন ওরই কাছে।

ভ। কই হলদে বাড়ীত দেখছি নে। কাল রাত্রে ওদিক দিয়ে আসার সময় একটা সাদা বড় বাড়ী দেখেছিলুম বটে, সেইটে বলছেন বুঝি।

একটী ছেলে। হাঁ বাবা-সেইটেই। রাত্রে কাল সাদা দেখাচ্ছিল আসলে হলদে।

অন্ধ। (স্বগত) কারো কথার ঠিক নাই।

আর একজন। ওটা কি বাড়ী?

দ্বিতীয়। ওত একটা মন্দির— দেখছ না চূড়া উঠেছে?

তৃতীয়। চূড়া! ও বাড়ীর পিছনে কটা বড় বড় গাছ। দূর থেকে চূড়া মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয়। কখন না। ও নিশ্চয় মন্দির (আর একজনের দিকে চাহিয়া) হরি বাবু কি বলেন?

হ। (কিছুক্ষণ দেখিয়া) না বাপু আমি ঠিক বলতে পারছিনে অতদূর আমার চোখ যায় না।

অন্ধ। এতগুল লোকের মধ্যে এই যা দেখছি একটু সত্যি বল্লে।

একজন অন্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভি। জয় হোক বাবা অন্ধকে কিছু ভিক্ষা দাও।

অন্ধ। এই দিকে এস। (দুটা কথা কয়ে বাঁচা যাবে। মিথ্যা শুনতে শুনতে কাঁণ গেল।)

(দুই অন্ধের কথোপকথন। একজন ইতর লোকের প্রবেশ ও অন্ধ ভিক্ষুককে দেখিয়া)

কেও শ্যাম না? এ কি চেহারা হয়েছে?

ভি। (আহ্লাদে) হরি দাদা নাকি? এস ভাই কাছে এস—আর চোখ নেই যে দেখি। চেহারার কথা আর কও কেন? ব্যায়রামে চোখ গিয়ে অবধি সব গেছে ছেলেগুলোর জন্য পথের ভিক্ষুক হয়েছি।

অন্ধ। আগে তবে তুমি দেখতে পেতে?

ভি। আগে পেতুম বই কি? আমার যেমন চোখের তেজ ছিল তা আর বলার না। অন্ধকারে কাজ করেছি। চোখ গিয়েই ত এই হাল।

অন্ধ। বদমায়েস, মিথ্যাবাদী! এতক্ষণ আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা হচ্ছিল। ভাগ্যিস কিছু দিই নি। আগে দেখতে পেতে এখন পাও না! আমার সঙ্গে চালাকী! বল না কেন এতদিন মিথ্যা বলে চালিয়েছ আর চালিয়ে উঠতে পার না। দূর হ এখান থেকে। কি মিথ্যাবাদী!

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মহাত্মা জন হাওয়ার্ড। শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। পূর্ব্বে ইয়োরোপে কারাবাসীদিগের যেরূপ ভীষণ দুর্দ্দশা সহ্য করিতে হইত, তাহা পড়িলে গায়ের রক্ত জল হইয়া আসে। হাওয়ার্ডই প্রথমে দুর্ভাগা বন্দীগণের দুঃখে দুঃখী হইয়া কারা সংস্কার কার্য্যে প্রাণপণ করেন। তাঁহার যত্নে সমগ্র ইয়োরপের কারাগার কষ্ট প্রশমিত হয়। এই মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া তিনি যেরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা একজন ইয়োরপীয়েরই সম্ভবে! যদি কোন ভারতবাসী নিজের দেশের জন্য ইহার এক চতুর্থাংশও পরিশ্রম করেন ত আমরা ধন্য জ্ঞান করি!

পুস্তক খানি পড়িলে ইয়োরপের মাহাত্ম্য দেখিয়া হৃদয় যেমন ভক্তি পূর্ণ হয়, তেমনি নিজের দেশে এইরূপ লোকের অভাব দেখিয়া হৃদয় নৈরাশ্য-পূর্ণ হইয়া উঠে। দেশের জন্য, পরের জন্য, মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আমরা কবে ঐরূপ জীবন উৎসর্গ করিতে শিখিব! এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, মহৎ লোকের জীবন বঙ্গভাষায় যতই প্রকাশিত হয় ততই ভাল।

ভগিনী ডোরা। ভগিনী ডোরার জীবনও আত্মোৎসর্গের একটি দৃষ্টান্ত স্থল। নিজের সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া অসহায় দীন দরিদ্রদিগের সেবায় তিনি কিরূপ পূর্ণ হৃদয়ে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন—তাহা পড়িলে হৃদয় ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া উঠে। বঙ্গীয় ভগিনিগণ, একবার এই জীবনী খানি পাঠ করুন!

বুদ্ধদেব চরিত। শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

নলদময়ন্তী। ঐ।

এই কাব্য নাটক দুইখানির সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার বড় কিছু নাই, অনেক দিন হইতে এ দুইখানি ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়া আসিতেছে—সাধারণের নিকট ইহার দোষ গুণ সকলি বিদিত।

বিদ্রোহ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কমলাবতীর পুত্র ছিল না, সুতরাং তাঁহার কন্যা সত্যবতীর বংশই একলিঙ্গ দেবের মন্দিরের অধিকারী। কিন্তু জ্যেষ্ঠানুক্রমে এ অধিকার প্রাপ্তির নিয়ম নাই। যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম তিনিই এই মন্দিরের পুরোহিত। এই সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী পুরোহিতই ইদরদিগের কুলাচার্য্য বলিয়া গণ্য এবং ইঁহাদের গণনা ও পরামর্শ দ্বারাই রাজাগণ চালিত হইয়া থাকেন।

মৃত পুরোহিত দেবাচার্য্যের দুইটি ভ্রাতৃষ্পুত্র ছিলেন—হরিতাচার্য্য কনিষ্ঠ। নাগাদিত্য শিশু কালে পিতৃ মাতৃ হীন হইলে তাঁহার লালন পালনের ভার যখন তাঁহার খুল্ল-তাত বুধাদিত্যের হস্তে আসে—তাহারি অব্যবহিত পরে দেবাচার্য্যের মৃত্যু হয় এবং ষোড়শ বর্ষের বালক হরিদাচার্য্যের হস্তে উক্ত মন্দিরের পৌরহিত্য ভার আসিয়া পড়ে।

বালক হইলেও হরিতাচার্য্যের-পাণ্ডিত্য যশে ইদর পূর্ণ হইয়াছিল, ইহার মধ্যেই তিনি তাঁহার বংশের শিক্ষায় জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদিতেও দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং বালক বলিয়া ইঁহার মান্যের অভাব ছিল না। রাজ্য-ভার হস্তে পাইয়াই বুধাদিত্য হরিদাচার্য্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আশাপুরে রাজনিবাস হইলেও ইঁহারা ইদরের মন্দিরেই বাস করিতেন, আবশ্যক হইলে রাজ আহ্বানে মাত্র এখানে আগমন করিতেন।

এখন তাঁহাকে ডাকিবার উদ্দেশ্য নাগাদিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ করা। পণ্ডিত আসিলে একটি নির্দ্ধারিত শুভ দিনে হরিতাচার্য্যকে একটি নির্জ্জন কক্ষে ডাকিয়া বুধাদিত্য তাঁহার হস্তে নাগাদিত্যের জন্ম-কোষ্ঠি দিলেন, জন্ম কোষ্ঠি দেবাচার্য্যের গণিত। আচার্য্য কোষ্ঠি চক্র গণনা করিতে লাগিলেন—সহসা তাঁহার গৌর মুখ পাণ্ডু বর্ণ হইয়া গেল,—রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেখিতেছেন"?

তিনি মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"যৌবনে মৃত্যুভয়! অস্ত্রাঘাত, অস্ত্রাঘাত!"

রাজা বলিলেন—"সেই জন্যই আপনাকে ডাকিয়াছি। গুরুদেব দেবাচার্য্য এই গ্রহ খণ্ডনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—এখন ইহার প্রতিকার আপনার হাতে'—

আচার্য্যের মুখ অন্ধকার হইল, প্রতিকার কি তাঁহার সাধ্য! তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান যে ইহার পক্ষে নিতান্ত সামান্য!

বলিলেন "আমি সামান্য মানুষ হইয়া বিধাতার লিপি খণ্ডনে কি সমর্থ হইব!"

রাজা বলিলেন—"আপনি দেব পুরোহিত—দেব লিপি খণ্ডন আপনার সাধ্য না হউক—তাঁহাকে প্রসন্ন করা আপনার সাধ্য;—আপনি তাঁহাকে প্রসন্ন করুন তিনি আপনার লিপি আপনি খণ্ডন করিবেন।"

হরিতাচার্য্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন—রাজা বলিলেন "এ গ্রহ খণ্ডন যদি সাধ্যাতীত হইত—তবে আপনার জ্যেষ্ঠ তাত তাহার ভার লইতেন না,—অবশ্য ইহা সিদ্ধনীয়।"

হরিতাচার্য্য ভাবিলেন—তাহা সত্য, বলিলেন—"তাহাই হউক—চেষ্টার ত্রুটি হইবে না, পরে যাহা হয় আপান জানিতে পারিবেন—"

আচার্য্য কোষ্ঠি সঙ্গে লইয়া বাস গৃহে গেলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন—দেখিলেন ২০ হইতে ২২ বৎসর পর্য্যন্ত নাগাদিত্যের বিপদের কাল। ২২ বৎসর—চৈত্র সংক্রান্তি! অতি ভয়ানক! সাংঘাতিক! অস্ত্রাঘাত! কোথা হইতে অস্ত্র আসিতেছে, স্পষ্ট ধরিতে পারিলেন না।। স্ত্রী পুরুষ উভয় হইতেই এ মৃত্যুভয় এই পর্য্যন্ত বুঝিলেন, ভাবিলেন—তবে কি বিদ্রোহ? গণনা করিলেন—দেখিলেন—দূরে চিত্রের পার্শ্বে লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা-অন্ধকার—কিন্তু রাজার সম্মুখে দুই একটি মনুষ্য! বুঝিলেন বিদ্রোহ হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে রাজার অমঙ্গল নাই। রাজার মৃত্যুর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ দুই এক জন স্ত্রী পুরুষের সহিত। ইহার পর আর সব অন্ধকার, আর কিছু তলাইতে পারিলেন না। যদি কারণ সম্যক না জানিলেন—তবে প্রতিকার কিরূপে করিবেন! দেখিলেন—এখনো জ্যোতির্ব্বিদ্যা তাঁহার কিছুই শেখা হয় নাই—নিজ বিদ্যার প্রভাবেই জ্যেষ্ঠ-তাত বলিতে পারিয়াছিলেন—গ্রহ খণ্ডিত হইবে, তাঁহার তেমন বিদ্যা কই? তাঁহার অকালে শিক্ষা ভগ্ন হইয়াছে গুরুর বিদ্যা আয়ত্ত না করিতে গুরু মরিয়াছেন। হরিতাচার্য্য পীড়িত হইলেন, দেখিলেন তাঁহার উপর লোকের বিশ্বাস কি অসীম, কিন্তু যথার্থ পক্ষে তাহার ক্ষমতা কত অল্প। তাঁহার উপর রাজ্য রাজা—নিজের মঙ্গলামঙ্গল রাখিয়া দিয়াছে, তাঁহার দায়ীত্ব কতদূর! হরিতাচার্য্য সেই বিশ্বাসের যোগ্য হইতে সঙ্কল্প করিলেন, রাজপুত্রের জীবন বুধাদিত্য তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন—তাঁহার জীবন রক্ষা যাহাতে করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। ইদরে গিয়া তাহার জন্য প্রতিদিন স্বস্ত্যয়ণ করিতে লাগিলেন এবং নিজে রীতিমত আবার জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে দুইচার বৎসর গেল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক জ্ঞান লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার সন্তুষ্টি জন্মিল না, তিনি চান—সমস্ত ঘটনা এবং তাহার কারণ ছবির মত তাঁহার সমুখে প্রত্যক্ষ করিবেন—কিন্তু তাহা দেখিতে পান না, এখনো সমস্ত ধূঁয়া ধূঁয়া ছায়া ছায়া, আগেকার অপেক্ষা সেই ছায়ার মাত্রা গাঢ় এই মাত্র উন্নতি। দেখিলেন

গুরুর কৃপা ভিন্ন নিজে শিখিয়া কিছু করিতে পারিবেন না। দক্ষিণের একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের নাম শুনিয়াছিলেন—সেইখানে গমন করিলেন। যাইবার সময় বুধাদিত্যকে বলিয়া গেলেন বালকের মঙ্গল উদ্দেশ্যেই তিনি যাইতেছেন, হয়ত কৃতকার্য্য হইয়াই ফিরিবেন। ৮ বৎসরের বালক নাগাদিত্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

হরিতাচার্য্যকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বল্লভাচার্য্য আশ্চর্য্য হইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমার কাছে কি শিখিবে?"—

"জ্যোতির্ব্বিদ্যা"

"জ্যোতির্ব্বিদ্যা তুমি যথেষ্টই জান"

"তাহাতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ দেখিতে চাই"

"তাহা হইলে যোগাভ্যাস কর,জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি তোমার যাহা হইবার হইয়াছে যোগ নহিলে জ্যোতির্ব্বিদ্যার জ্ঞান পূর্ণ হয় না।"

"যোগে কতদিনে সিদ্ধি লাভ হইবে"।

বল্লভ পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন—"সিদ্ধির কি সীমা আছে? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্ত জ্ঞানশক্তির সহিত আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানকে এক করাই যোগ, অনন্ত কালে ইহার সিদ্ধি। যোগে তোমাকে এক উন্নতি হইতে আর এক উন্নতিতে, এক সিদ্ধি হইতে আর একসিদ্ধির পথে অগ্রসর করিবে মাত্র। তবে ইহা বলা যায় যে, যে জ্ঞান তুমি পাইতে ব্যগ্র, ৫ বৎসর যোগাভ্যাস করিলে—তাহা পাইতে পারিবে, আধ্যাত্মিক ভাব তোমাতে প্রচুর বিদ্যমান দেখিতেছি"।

বাল্যকাল হইতে হরিতাচার্য্য সত্যানুরাগী, আত্মজ্ঞান-পিপাসিত, অকালে গুরুহীন হইয়া তাঁহার সে পিপাসা মিটে নাই, নিজে রাজগুরু হইয়া গুরুর কর্ত্তব্য অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহার আর সব আকাঙ্ক্ষা এত দিন নিবৃত্ত রাখিতে হইয়াছিল। তাঁহার কর্ত্তব্য এবং অনুরাগ এখন একই পথে শুনিয়া তিনি আহ্লাদিত হইলেন—বলিলেন "তবে আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন, আমি যোগ শিক্ষা করিব"—

বল্লভ বলিলেন—"আমি তোমার উপযুক্ত গুরু নহি—তুমি যদি যোগ শিক্ষা করিতে চাও ত আমার গুরুর নিকট গমন কর, তিনি গোকর্ণে বাস করেন, কিন্তু এখন তাঁহার দেখা পাইতে হইলে হরিদ্বার যাইতে হইবে—সেখানে তীর্থ গমন করিয়াছেন"।

সেই দিনই হরিতাচার্য্য হরিদ্বার যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বল্লভ বলিলেন—"কিন্তু একটি কথা—তুমি যে জ্ঞান পাইতে ব্যস্ত যোগ দ্বারা সে জ্ঞান পাইলে তখন তোমার তাহা কাজে লাগিবে কি না সন্দেহ। সকল অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য সমান থাকে না, জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে কর্ত্তব্য জ্ঞানও ভিন্নরূপ হইয়া যায়। দেখ অসভ্যদিগের কর্ত্তব্য আত্মপরিবারের মধ্যেই অধিক পরিমাণে অবস্থিত—মানুষ যত জ্ঞান বুদ্ধিতে উন্নত হইয়া সভ্যনাম লাভ করে ততই প্রতিবাসী হইতে—ক্রমে মনুষ্য সমাজে তাহাদের কর্ত্তব্য

স্থাপিত হয়। সেইরূপ রাজার গ্রহ খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে জীবন দানই এখন তুমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছ—কিন্তু যখন তুমি যোগদ্বারা বিশ্বের মঙ্গলে সর্ব্ব মঙ্গল জ্ঞান করিবে—তখন, যদি দেখিতে পাও রাজার প্রাণ রক্ষায় বিশ্বের নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে, বিশ্বের যে শক্তিতে রাজার প্রাণ নষ্ট হইতেছে—তাহার উপর হস্ত নিক্ষেপ করিলে বিশ্বরাজ্যের অমঙ্গল সাধিত হইবে—তখন তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে বিশ্বের নিয়তির পথে দণ্ডায়মান হইতে নিষেধ করিবে, তোমার ইচ্ছা তোমার জ্ঞান কেবল অনন্ত ইচ্ছা অনন্ত জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া চালিত হইতে চাহিবে। ব্যক্তি বিশেষের কর্ম্মফলের প্রতি তুমি উদাসীন হইয়া পড়িবে।"

হরিতাচার্য্য স্তম্ভিত হইলেন—যেন কাহার প্রতিধ্বনির মত বলিলেন, "কাজে লাগিবে না!"

বল্লভাচার্য্য বলিলেন—"সম্ভবতঃ না। কই এত ত সিদ্ধ পুরুষ আছেন—ব্যক্তি বিশে-ষের কর্ম্মে ত তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন না,—তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন—কিন্তু তাঁহারা যে উদাসীন অবশ্য ইহার নিগূঢ় কারণ আছে।"

হরিতাচার্য্য খানিকক্ষণ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—তাহার পর বলিলেন "না দেব তবে আমি যোগাভ্যাস করিব না। আমি কেবল জানিতে চাই—নাগাদিত্যের ভাগ্য প্রতিবিধানের কোন উপায় আছে কি না,—তাহা কি কেহ বলিয়া দিবেন না!"

বল্লভ বলিলেন—"যাঁহারা জানিতে পারেন—তাঁহারাই বলিতে সক্ষম। যদি গুরু ইচ্ছা করেন তিনিই বলিতে পারেন ইহার কি উপায় আছে, আমার সে ক্ষমতা নাই।"

হরিতাচার্য্য তাঁহার উদ্দেশে হরিদ্বার গমন করিলেন, সেখানে গিয়া শুনিলেন—অল্পদিন হইল তিনি দ্বারকায় গিয়াছেন, হরিতাচার্য্য দ্বারকা যাত্রা করিলেন, সেখানেও তাঁহার দেখা পাইলেন না, শুনিলেন তিনি সেতুবন্ধ দর্শনে গিয়াছেন। এইরূপে হরিতাচার্য্য তাঁহার অন্বেষণে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল তবু তাঁহার দর্শন পাইলেন না। তাঁহার দর্শন লাভে নিরাশ হইয়া আর একবার বল্লভ পণ্ডিতের নিকট গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবেন স্থির করিলেন। যদি দেখার কোন উপায় পান ত ভালই—নহিলে সেখান হইতে দেশে ফিরিবেন—এই ভাবিলেন।

পথে কত যোগী সন্ন্যাসীর সহিত সহযাত্রী হইয়া বেড়াইলেন কেহই তাঁহার প্রশ্ন মীমাংসায় সক্ষম হইল না—সকলেই বলে অদৃষ্ট খণ্ডন করা কাহারো সাধ্য নহে।

পথে নাসিক আসিয়া পড়িল,—নাসিকে তখন পঞ্চবটীর মেলা,—একদিন মেলা শেষ হইলে তিনি গোদাবরী নদীতে সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া নদী তীরের একটি নির্জ্জন স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন—তিনি যেখানেই থাকুন নিয়মিত স্বস্ত্যয়ন করিতে ভুলিতেন না,—এই সময় একজন সন্ন্যাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। ক্রমে

স্বস্ত্যয়ন শেষ হইল, অগ্নি নিভিয়া গেল—অগ্নি নিভিয়া লাল অঙ্গারাবশিষ্ট মাত্র রহিল,—সন্ন্যাসীর প্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল,সন্ন্যাসী তখন তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন, তিনিও মেলা দর্শনে আসিয়াছেন—আগেই হরিতাচার্য্যের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে;—নানা কথার মাঝখানে তিনি বলিলেন "বৎস তুমি প্রতিদিন স্বস্ত্যয়ন কর কি জন্য ?"

হরিতাচার্য্য আশ্চর্য্য হইলেন, প্রতিদিন যে তিনি স্বস্ত্যয়ন করেন—তাহা সন্ন্যাসী কি রূপে জানিলেন ?

বলিলেন—"আপনি কি করিয়া জানিলেন ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"তুমি স্বস্ত্যয়ন করিতেছ দেখিলাম—তাহা হইতে মনে হইল—প্রতিদিনই স্বস্ত্যয়ন কর, ইহার আর কোন গূঢ় কারণ নাই"।

তথাপি হরিদাচার্য্যের মন ভক্তিপূর্ণ হইল—তিনি বলিলেন—"ইদর-রাজ নাগাদিত্যের মঙ্গল কামনায় আমি প্রতি দিন স্বস্ত্যয়ন করিয়া আসিতেছি—দেবদেব মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গ্রহ খণ্ডন করুন এই আমার প্রার্থনা"।

তিনি বলিলেন—"বৎস তুমি কর্ম্মফল মান ?" হরিতাচার্য্য আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন—"হিন্দু হইয়া কর্ম্মফল মানিব না!"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমাদের নিয়তি কি কর্ম্মফল ছাড়া আর কিছু ?

হার। "কিন্তু কর্ম্মফল যিনি দিয়াছেন ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার অন্যথা করিতে পারেন,—বিচারক ইচ্ছা করিলে শাস্তি বন্ধ করিতে পারেন না কি ?

স। "পারেন, কিন্তু ন্যায্য রূপে পারেন না। হয় তাঁহার পক্ষপাতিতা করিতে হয়—না হয় নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়। মানুষ যে অসম্পূর্ণ আত্মা—তাহার ন্যায়ও অসম্পূর্ণ, সেই বিশ্বব্যাপী ন্যায়ের তুলনায় ইহা ধূলি খেলা মাত্র, এখানে কত অন্যায় অবিচার নির্ব্বিবাদে পার পাইতেছে, কিন্তু এখানেও যখন বিচারকের ঐরূপ দায়িত্ব তখন যাহার এই কার্য্য কারণ-নিয়তিতে বিশ্ব সংসার চলিতেছে—তুমি কি মনে কর—তোমার পূজা লইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত নিয়ম উল্টাইয়া দিবেন ?

হরি। "তবে কি স্রষ্টার করুণা নাই,—তিনি কি নিয়তিরূপ বজ্র লইয়া, দীন হীন সামান্য মনুষ্যের প্রতি কেবলি তাহা শাসাইয়া রহিয়াছেন। তাহাদের তবে নিস্তার কোথা ? তিনি মনুষ্যকে পূর্ণ জ্ঞান করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহাদের অকর্ম্মের দায়ী কে ? তিনিই না কি ?

স। এ সমস্তই তাঁহার করুণা। শাস্তির দ্বারা যতই মনুষ্য সংশোধিত হইতেছে ততই সে উন্নত জীব হইতেছে। কর্ম্মের জন্য যতই মনুষ্য দায়ী হইতেছে, যতই সে কর্ম্মের-ভোগ ভোগ করিতেছে ততই সে উচ্চ জীব হইতেছে। অভিজ্ঞতা জন্মে কিসে ? অভিজ্ঞতা কি আমাদের উন্নতির কারণ নহে ?

হরি। "কিন্তু তবে কি দেবপ্রসাদ বলিয়া কিছুই নাই ? আমরা যখন দুঃখে তাপে

কাতর হইয়া ডাকি আমাদের কি কেহ সাড়া দিবে না? আমরা পাপে তাপে মলিন হইয়া সান্ত্বনা চাহিলে কেহ কি কোলে লইবে না? সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের পিতা মাতা কেহ নাই, আমাদের হৃদয়ে প্রেম ঢালিবার কেহ নাই? পাষাণ নিয়তির মত পাষাণ দেবতা দুঃখ ক্লেশের মধ্যে আমাদিগকে টানিয়া লইতেছেন?”

স। “না তাহা নহে বৎস। দেবপ্রসাদ অবশ্যই আছে। কিন্তু সচরাচর আমরা যে উপায়ে তাহা লাভ করিতে যাই—সে উপায় ঠিক নহে। তুমি যদি প্রতিদিন চুরি কর—আর বিচারালয়ে আসিয়া বিচারকের নিকট, ক্রন্দন করিয়া তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা কর তবে কি তাহা পাইতে পার? যদি তাঁহার প্রসাদ পাইতে চাও ত তাঁহার নিয়মের অনুগামী হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর। একমাত্র কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মফলকে জয় করিতে পার; নিয়তিকে অতিক্রম করিতে পার, কেননা তাঁহার নিয়মানুযায়ী কাজ করিলেই মাত্র তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পার। বৎস তুমি জ্ঞানী হইয়া ইহা ভুলিলে কিরূপে! যাহার মঙ্গল করিতে চাও তাহার কর্ম্মকে সুপ্রসন্ন কর”—

এই সময় অদূরে কে ডাকিল “গুরুদেব”

সন্ন্যাসী উঠিলেন—বলিলেন, “যাহা বলিলাম একটু ভাবিয়া দেখিও, আমি এখন চলিলাম”।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন, হরিতাচার্য্যের মনে আরো অনেক প্রশ্ন উদয় হইয়াছিল—কিছুই জিজ্ঞাসা করা হইল না, অতিথি-মন্দিরে আসিয়াও আর সে রাত্রে তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, অন্য যাত্রীদিগকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সকলে আশ্চর্য্য প্রকাশ করিল, বলিল “উঁহাকে জাননা উনি সিদ্ধ বাবা”—হরিতাচার্য্য বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন—এতদিন যাঁহার সন্ধানে বেড়াইতেছেন তাঁহার সহিত দেখা হইল—কথা হইল—তবু সব কথা হইল না, ব্যথিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন “আজ কি আর এখানে আসিবেন?”

তাহারা বলিল “না উঁহার দেখা আর শীঘ্র পাইবে না—আর এক বৎসর পরে এই মেলায় আবার এইখানে উঁহাকে পাইবে”।

হরিতাচার্য্য তাঁহার অপেক্ষায় আর এক বৎসর বসিয়া রহিলেন—নিয়মিত সময়ে তাঁহার সহিত দেখা হইল, এবার আর তাঁহার হতাশ হইতে হইল না, যে জিজ্ঞাসার জন্য তিনি এতদিন দেশে বিদেশে কষ্ট ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—“বৎস সে দিন তোমার জিজ্ঞাসা না জানিয়া আমিত ইহারই উত্তর দিয়াছি। একজন আর একজনের অদৃষ্ট ভাঙ্গিতে গড়িতে পারে না, নিজের কর্ম্ম দ্বারাই মাত্র নিজের নিয়তি ফিরাইতে পারা যায়। একজন কেবল তাহার পথ দেখাইতে পারে মাত্র।”

হরিতাচার্য্য বলিলেন—"আপনি সেই পথই দেখাইয়া দিন যে পথে চলিয়া নাগাদিত্য বিপদোত্তীর্ণ হইবেন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"পথ একমাত্র আছে—রাজর্ষি জনকের মত নাগাদিত্য যদি আত্ম-সংযতবান হইতে পারেন তবেই তিনি বর্ত্তমান অদৃষ্টকে জয় করিবেন। এ নিয়তি তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফল নূতন জীবন লাভ করিলে নূতন কর্ম্মাধীন হইয়া এই নিয়তির খণ্ডন হইতে পারে। দুই উপায়ে নবজীবন পাওয়া যাইতে পারে—এক মৃত্যু দ্বারা আর এক যোগ দ্বারা, পাপময় প্রবৃত্তির নিধন দ্বারা। যদি তিনি মরিতে না চান ত তাঁহাকে নিবৃত্তি পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার অদৃষ্ট এড়াইবার ইহাই মাত্র পথ।"

এত দিন বিদেশে ঘুরিয়া, সন্ন্যাসীর এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আশাপূর্ণ চিত্তে হরিতাচার্য্য স্বদেশাভিমুখী হইলেন। নাগাদিত্যের সেই বালক মুখ যতই মনে পড়িতে লাগিল, তিনি ততই সে মুখে অপার্থিব আলোকজ্যোতি দেখিতে লাগিলেন তাঁহার হৃদয় ততই আশ্বস্ত হইতে লাগিল। এই আশা হৃদয়ে ধরিয়া—নাগাদিত্যের বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি দেশে ফিরিলেন। বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রকৃত বিপদ সম্ভাবনা নাই—সেই জন্যই হরিতাচার্য্য এতদিন বিলম্ব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে দিন দেশে ফিরিলেন—সেই দিনই ভীলদিগের বিচার। সেই বিচারে রাজার ক্ষমা শীলতা, উদারতা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার আশা এতদুর বর্দ্ধিত হইল—যে তাহার সফলতা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বিচার শেষে তাঁহার সেই আশালোক সহসা যে ঈষৎ ম্লান হইয়া গেল, সে মলিনতা ক্রমেই দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি বুঝিতে লাগিলেন—যে, নাগাদিত্য উদারপ্রকৃতি, মহৎচেতা কিন্তু বিবেচনাশূন্য, আত্মাভিমানী। আত্মাভিমান দ্বারাই তিনি বিশেষরূপ চালিত। তোষামোদ কারী সভাসদ পরিবেষ্টিত হইয়া দিন দিন তাঁহার এই দোষ বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিন তাঁহার এই প্রবৃত্তিতে আহুতি পড়িতেছে—তাঁহার দোষ সংশোধনের কেহ নাই, সভায় একজন এমন কেহ নাই যে সত্য কথা বলিয়া তাঁহার চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করে, তাঁহার যথার্থ বন্ধুতার কাজ করে। আচার্য্য গণপতি রাজার মঙ্গলই যাঁহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যিনি রাজাকে চালাইবেন—তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু, পূর্ব্বে আচার্য্য বংশে যাহা কখনো হয় নাই এখন তাহাই হইয়া থাকে, রাজা যাহা বলেন তাহাই তাঁহার শিরোধার্য্য। হরিতাচার্য্য থাকিলে এতদূর ঘটিতে পারিত না, তাঁহার প্রবৃত্তিকে তিনি অন্তত কতক পরিমাণেও বশে রাখিতে পারিতেন, এখন তাঁহাকে নিবৃত্তি পথে লইয়া যাওয়া একরূপ অসাধ্য সাধন, অদৃষ্ট যেন তাঁহাকে কবলস্থ করিবার জন্য চারিদিকের পথ মুক্ত করিয়া আনিতেছে। হরিতাচার্য্য নিরাশ হইয়াও হাল ছাড়িলেন না, নাগাদিত্যের অদৃষ্টের সহিত প্রাণপণ-সংগ্রাম সঙ্কল্প করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইয়াছে, প্রত্যুষে স্নানান্তে আরতি সমাপন করিয়া হরিতাচার্য্য মন্দিরে আসিয়া বসিয়াছেন, মৃদুল পবন হিল্লোলে নদী বক্ষে এক একটি বীচি সঞ্চালিত হইয়া ধীরে ধীরে উপকূলে আসিয়া লাগিতেছে, উপকূলে প্রতিহত হইয়া আবার সহস্র তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া সরিয়া সরিয়া পড়িতেছে হরিতাচার্য্য তাহাই দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন এ বিশ্ব সংসার সমস্তই বুঝি কালের তরঙ্গ, কালের স্রোত। এ স্রোত চলিয়াছে চলিয়াছে কেবলি চলিয়াছে, অদৃষ্ট-নিয়তির উপকূলে প্রতিহত হইয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কেবলি ভাসিয়া চলিয়াছে। এ গতি তাহার কে বা থামায়? কে বা তাহাকে ধরিয়া রাখে! কোন মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে মহান অর্থ পূরণ করিতে কালের এই অনন্তগতি ভগবান তুমিই তাহা জান?"

এখনো ভাল করিয়া রৌদ্র উঠে নাই, নদীতে লোক জনের বেশী ভীড় নাই, মন্দিরের ঘাটের পার্শ্বে কিছু দূরে একটা আঘাটায় কয়েক জন স্ত্রী পুরুষ মাত্র স্নান করিতেছিল, হরিতাচার্য্য দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে একটি বালিকা জল ভাঙ্গিয়া ঘাটের দিকে আসিতেছে। ক্রমে সে ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, তিনি স্নান করিবার সময় নদীর জলে তিনটি পদ্ম ভাসাইয়া আসিয়াছিলেন—তাহার দুইটি দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল একটি নিকটেই ভাসিতেছিল, নিকটেরটিকে সে হাত বাড়াইয়া ধরিল, হরিতাচার্য্য অবাক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য জ্যোতিতে প্রভাত যেন ভরিয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল যে যেন অন্য জগতের অশরীরি একখানি লাবণ্য ছায়া, কোন নন্দন কাননের একটি সুবাসময়ী ফুল, কোন স্বপ্নের যেন একটি জ্যোতির্ম্ময়ী তারকা মর্ত্ত্য রাজ্যে শরীর ধারণ করিয়াছে। এই সময় গোল উঠিল—রাজা আসিতেছেন—রাজা আসিতেছেন। দূরের আঘাটা হইতে একজন ডাকিল "রাজা আউছুরে এদিক পানে আয়" এখনো বালিকার দুইটি ফুল ধরিতে বাকী আছে—জলে শরীর ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি সেই দিকে সে ত্রস্তে পদ বাড়াইল। জলের আঘাত পাইয়া ফুল দুটি আর একটু সরিয়া গেল, বালিকা ব্যস্ত হইয়া আবার পা বাড়াইল, এই সময় একজন জলে নামিয়া বলিলেন—"সুন্দরী দাঁড়াও আমি ধরিয়া দিতেছি"—বালিকা ফুল ধরা ছাড়িয়া সচকিতে তাহার দিকে চাহিল, দেখিল—সেই পরিচিত সুরূপ সুন্দর দেবমূর্ত্তি। তাহার পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল—ছেলেবেলা সে তাহাকে বর বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিল মনে পড়িয়া গেল—লজ্জায় মুখটি আরক্তিম হইয়া উঠিল, রাজা যখন ফুল দুটি তাহার হাতে দিলেন সে আনত দৃষ্টিতেই তাহা ধরিল। এই সময় জুমিয়া ওঘাট হইতে এ ঘাটে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল—"সুহার

রাজাকে প্রণাম কর” সুহার একটু ইতস্ততঃ করিয়া জলের উপরেই ঢপ করিয়া মাথাটা নুয়াইল। জুমিয়া বলিল “মহারাজ আমার মেয়ে”—

জুমিয়ার মেয়ে সেই বালিকা! বেল ফুলের মত সেই ফুট ফুটে বালিকাটি এখন পদ্মের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে! রাজার কয়েক জন সভাসদ সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল, দু একজন জলের উপরই দাঁড়াইয়াছিল—জুমিয়ার মেয়ে শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল—বলিল “জুমিয়া তোমার মেয়ে এত সুন্দরী”—

জুমিয়া কোন কথা কহিল না—কেবল হাসিল। রাজা এতক্ষণ ভাল করিয়া তাহাকে দেখেন নাই, রাজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“সত্য! ও হাতে পদ্মগুলিও যেন মলিন হইয়া পড়িয়াছে—” সহসা বালিকার হাত হইতে ফুলগুলি পড়িয়া গেল, রাজা তুলিয়া দিলেন, বালিকা ফুলগুলি লইয়া ধীরে ধীরে তাহার পিতার সহিত অন্য ঘাটে সরিয়া গেল।

পুরোহিত মন্দিরের মধ্য হইতে এসকল দেখিতে পাইলেন,—একটা অন্ধকার আশঙ্কা তাহার মনের মধ্যে ঘনাইয়া আসিল, কাল রাজার জন্মতিথির উৎসব আসিতেছে, আজ তাঁহার বিংশ বৎসর পূর্ণ! রাজার ভবিষ্যতের একটা রুদ্ধ দ্বার সহসা যেন তাহার চক্ষে উন্মুক্ত হইল। রাজার অষ্টমে শনি কেতুর দৃষ্টি মনে পড়িয়া গেল, সন্ন্যাসীর কথা— “রাজার সংযতবান জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক—” মনে পড়িয়া গেল, পুরোহিত দুশ্চিন্তা ভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। রাজা স্নানের পর দেব প্রণাম করিতে আসিলে হরিতাচার্য্য তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—“বৎস প্রবৃত্তির মত রিপু আর নাই, তোমার সম্মুখে ভয়ানক বিপদ, একমাত্র প্রবৃত্তি জয় দ্বারাই তুমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পার—সাবধান হও বৎস সাবধান হও—” সহসা এরূপ কথার অর্থ রাজা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইলেন—বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হরিতাচার্য্য বলিলেন, “বৎস অন্য স্ত্রীর প্রতি আসক্তি মহাপাপ—পুরুষের তাহা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকাই উচিত—এরূপ প্রবৃত্তি যে দমন না করে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য” রাজা এইবার তাহার কথার অর্থ বুঝিলেন। হরিতাচার্য্যের এই অন্যায় সন্দেহে রাজা বিরক্ত হইলেন, ক্রুদ্ধ হইলেন—বলিলেন “ঠাকুর—আমি বিশুদ্ধ, আপনার ভয়ের কোন আবশ্যক নাই”—

হরিতাচার্য্য বলিলেন “নিজের উপর অত বিশ্বাস করিতে নাই—আমরা অসম্পূর্ণ জীব, সাবধান না হইলে প্রতি নিমেষেই আমাদের পদস্খলন হইতে পারে—প্রলোভনের নিকট হইতে আমরা যত দূরে থাকি ততই ভাল—বৎস আজ যে বালিকার সহিত তোমাকে দেখিলাম তাহার নিকট হইতে তুমি দূরে থাকিও; নহিলে অজ্ঞাতে তুমি বিপদের পথে যাইবে, তখন আর ইচ্ছা করিলেও সরিতে পারিবে না”।

বিনা প্রার্থনীয় বিনা প্রয়োজনে জোর করিয়া উপদেশ গলায় গুজিয়া দেওয়ার মত

সংসারে অপ্রীতিকর বস্তু কমই আছে। রাজা পুরোহিত বাক্যে আর কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। এ সমস্তই তাঁহার বৃথা সন্দেহ মনে হইল। মনে করিলেন এত অল্পে যাহারা পাপ সন্দেহ করে তাহারাই কি ঘোর পাপী নহে। এ কথা মনে করিয়াই সহসা শিহরিয়া উঠিলেন—ইহাতে আচার্য্যের উপর দোষ স্পর্শে! তাড়াতাড়ি মন হইতে এ কথা তাড়াইয়া ভাবিলেন যাহারা চির দিন ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিতেছে—যাহারা স্ত্রীলোক দেখিলেই সরিয়া যাইতে শিক্ষা করে—তাহারা সহজেই স্ত্রীলোক হইতে আশঙ্কা কল্পনা করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি?

যাই হউক রাজার মনে হরিতাচর্য্যের কথায় ভাল ফল হইল না।

আকাশের তারা নক্ষত্রের সহিত মনুষ্য জীবনের সম্বন্ধ লইয়াই হরিতাচার্য্য ব্যস্ত, শাস্ত্রের কূট যুক্তি লইয়াই হরিতাচার্য্যের মস্তক আলোড়িত কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয়ের কোন ক্ষুদ্র তারে ঘা পড়িলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার নিকট লক্ষ ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে—তাহা তিনি বুঝেন না, সে বিজ্ঞানে তিনি অনভিজ্ঞ। সুতরাং সে বিষয়ে কথা কহিতে গিয়া যে তিনি বিপরীত করিয়া বসিবেন—তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু রাজাকে এইরূপ পরামর্শ দান করিয়া তিনি মনে মনে সন্তোষ লাভ করিলেন, রাজা যখন গম্ভীর হইয়া চলিয়া গেলেন তিনি ভাবিলেন তাহার কথার নিশ্চয়ই গুণ ধরিয়াছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্তব্ধনিশায়, নির্জ্জন মন্দিরে দুইজনের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

গণপতি বলিলেন—"দেব—আর প্রতীক্ষায় রাখিবেন না, আপনার ভ্রাতা আমাকে শিষ্য করিয়া গিয়াছেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সে পদ বজায় রাখুন—আমাকে শিষ্য বলিয়া চরণে রাখুন।" গণপতি হরিতাচার্য্যের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি, তাঁহার ভ্রাতার শিষ্য হইয়া তাঁহার অবর্ত্তমানে তিনি এ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, হরিতাচার্য্য এক দিন আসিয়া তাহার এ অধিকার যে গ্রহণ করিবেন একথা তাঁহার মনেও হয় নাই, এত দিন তাঁর দেখা নাই সকলেই ভাবিত তাঁর মৃত্যু হইয়াছে। এখন তাঁহার অধিকার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি যদি শিষ্য করিয়া যান তবেই তাঁহার অবর্ত্তমানে গণপতি এই মন্দিরের অধিপতি হইতে পারেন—নহিলে তাহার আশা ভরষা নাই। গণপতির চির পরিচিত মন্দির কক্ষাদি আজ আর তাহার নহে, আজ তিনি আপনার রাজ্যে দাঁড়াইয়া পরের অনুগ্রহের ভিখারী, পরিচিতের মধ্যে দাঁড়াইয়া সকলি আজ তাঁহার অপরিচিত। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ঔৎসুক্য পূর্ণ নেত্রে হরিতাচার্য্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—হরিতাচার্য্য বলিলেন—"পুরোহিতের কাজ তোমার নহে বৎস। পুরোহিতের

কর্ত্তব্য রাজার তোষামোদ নহে, তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর করা। তাহা যে না পারে তাহাকে আমার শিষ্য বলিব কিরূপে” ?

গণপতির মুখ মলিন হইয়া গেল—মুখে কথা ফুটিল না। হরিতাচার্য্য আবার বলিলেন—“কেবল শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া লোকের সম্মান উপার্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্তে জীবন কাটাইবার জন্যই একলিঙ্গদেবের পুরোহিত হওয়া নহে। যদি সমস্ত রাজ্যের শুভাশুভের দায়ীত্ব ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইতে পার—তবেই পুরোহিত হও”—

গণপতি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—“প্রভু অবিচার করিবেন না—রাজা যথেচ্ছাচারী হইলে আমাদের কর্ত্তব্য পালনের উপায় কি ? তিনি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করেন কি ?”

পুরোহিত বলিলেন—“তিনি গ্রহণ করুন, না করুন তাহা তোমার ভাবিবার আবশ্যক নাই, তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিয়াছ কি ? তাঁহাকে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর করিতে কি চেষ্টা করা হইয়াছে ?

গণপতি বলিলেন—“কিন্তু তাহার কিরূপ ফল হয়—আপনিই ত দেখিতেছেন,—আপনিইত পারিতেছেন না”—

হরিতাচার্য্য উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—“আমি না পারি—চেষ্টার ত্রুটি করিব না। না পারি পৌরহিত্য ত্যাগ করিব”—

খানিকক্ষণ দুইজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। গণপতি খানিক পরে বলিলেন “প্রভু এরূপ শিক্ষা আগে পাই নাই। আমাকে ত্যাগ করিবেন না, আমাকে আপনার মত করিয়া লউন।”

হরিতাচার্য্য খানিকটা ভাবিলেন, বলিলেন—“আচ্ছা বৎস, তাহাই হইবে। উপযুক্ত হইতে যদি সমর্থ হও শিষ্যরূপে গ্রহণ করিব।—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তোমার যোগ্যতা দেখিতে ইচ্ছা করি”—

গণপতির যে মনের মত কথা হইল তাহা নহে, উপযুক্ত হইব বলা যেমন সহজ উপযুক্ততা দেখান তেমন নহে। তথাপি ইহার উপর কথা কহিতে আর সাহস করিলেন না, বুঝিলেন তাহা বৃথা। গণপতি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তিনিও একটু পরে কক্ষ হইতে উঠিয়া মন্দিরের সোপানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন—স্তব্ধ নিশা জ্যোৎস্না প্লাবিত। নিকটের শুভ্র মন্দির শুভ্র প্রাসাদ শুভ্রতর করিয়া, নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া, পরপারের কৃষ্ণপাহাড় শ্রেণী কৃষ্ণ মেঘের মত সুস্পষ্ট করিয়া,বিশ্বচরাচর আপন প্রেমের হাসিতে হাসাইয়া তুলিয়া সেই রজত-কৌমুদী কে জানে কোন্ অনন্তের উদ্দেশে ভাসিয়া চলিয়াছে। সেই জ্যোৎস্নার পানে চাহিয়া হরিতাচার্য্য ব্যথিত হইয়া পড়িলেন, কতস্মৃতি তাহার হৃদয় দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, বিদেশ যাত্রার আগের দিন দুই ভ্রাতায় নদীতীরের একটি নাগকেশর তলায় বসিয়া যে এইরূপ

একটি জ্যোৎস্নাময়ী নিশা যাপন করিয়াছিলেন, তাহা বড় মনে পড়িতে লাগিল। আজ সে নাগকেশরের চিহ্নমাত্র নাই, আর যাহার সহিত কথোপকথনে সে রাত্রি মুহূর্ত্তের মত কাটিয়া গিয়াছিল—যাঁহার উৎসাহ বাক্য বিদেশে কষ্ট দুঃখের মধ্যেও তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে তাঁহাকে অটল রাখিয়াছিল—সে ভ্রাতা তাঁর কোথায়? আর আর? সে সব কিছুই নাই! এই দশবৎসরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন! কতকি নাই—কতকি নূতন হইয়াছে! সেই কোমল বালক নাগাদিত্য এখন যুবক যথেচ্ছাচারী রাজা! হরিতাচার্য্য, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—চারিদিকের এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে সম্মুখের মন্দির কক্ষটি অনিত্যের স্থির প্রতিমা স্বরূপ তাঁহার নয়নে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি বিদেশ যাত্রার সময়—এ কক্ষের যেখানে যাহা দেখিয়া গিয়াছিলেন আজও তাহাই আছে, কক্ষের কোলঙ্গায় কোলঙ্গায় সেই পুঁথির রাশি—দেয়ালে দেয়ালে সেই দেবদেবীর চিত্রপট, গৃহের মধ্যস্থলে দেব দেব মহাদেব তেমনি অটল ভাবে বিরাজিত,—এ মন্দিরের কিছুই পরিবর্ত্তন নাই। হরিতাচার্য্য একলিঙ্গের সম্মুখস্থ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে মনে মনে বলিলেন—ভগবান সকলি তোমার ইচ্ছা, ক্ষুদ্র মনুষ্য হইয়া ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া কেন তবে অদৃষ্ট-অনন্তশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে এ ইচ্ছা, এ প্রবৃত্তি? যখন যুঝিবার এ প্রবৃত্তি--এ ইচ্ছা রহিয়াছে তখন অবশ্যই অদৃষ্টের উপর আধিপত্য রহিয়াছে। ভগবান, তুমি জ্ঞান দিয়াছ—ইচ্ছা দিয়াছ—অথচ সে জ্ঞানের কোন সফলতা দেও নাই, অন্ধ অদৃষ্ট দিয়াছ ইহা কখনো হইতে পারে না। তবে প্রভু বল দেও—অদৃষ্টকে অধিকারে আনিতে তাহার বল দেও—" করযোড়ে কায় মনে তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, দ্বিপ্রহরের যখন নহবৎ বাজিল—তখন উঠিয়া আঁরতি আরম্ভ করিলেন।

সুখের অবসাদ।

রূপের মদিরা পিয়ে
　　নিশীথ বিহ্বলকায়!
কত সাধ ওঠে মনে
　　কত স্বপ্ন উথলায়!
নদী গাহে কূলে কূলে
　　নিভৃতে কুহরে পিক,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফোটা কলি
　　সৌরভে আকুল দিক।

পূরবে উঠেছে চাঁদ
　　মধুর জ্যোছনা ফোটে,
ওপারে দিগন্ত মেঘে
　　বিজলি চমকি ছোটে।
থেকে থেকে দু-এ-খানি
　　জলদ ঈষৎ কালো,
ঢেকে ঢেকে, মেখে যায়
　　চাঁদের হাসির আলো।

কোথা কোন দূর হতে
আর্দ্র বায়ু গায়ে লাগে,
বসন্তের মাঝখানে
সহসা বরষা জাগে।
মধুর মিলন মাঝে
এ যেন বিরহ গান,
প্রেমের স্বপন সাধে
যেন জাগে অভিমান।
অকুল আকুল সুখে
কি যেন কি অবসাদ,
চাঁদের এ হাসি মাঝে
ডুবিয়া মরিতে সাধ।

মানবীকরণই বটে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর "মানবীকরণ" নামক প্রবন্ধের যুক্তি যে যে স্থলে ত্রুটিযুক্ত ও অস্পষ্ট বোধ হইয়াছিল, আমরা প্রথম প্রস্তাবে কেবল সেই সেই স্থলের আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার উত্তর স্বরূপে দ্বিজেন্দ্র বাবু যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এত কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে যে, একটী মাত্র প্রাস্তাবে সেই সমুদয় ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। এজন্য আমাদিগকে আরও একাধিক প্রস্তাব লিখিতে হইবে। পরন্তু ঐ সমুদয়ের উদ্দেশ্য এক থাকাতে আমরা তাহার আখ্যা পরিবর্ত্তন করিব না। তাহা "মানবীকরণই বটে" থাকিবে। অপিচ ঈশ্বরে চেতন ধর্ম্ম আরোপ করা যে মানবীকরণই বটে ইহা আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবেও প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব না। কেবল দ্বিজেন্দ্র বাবুর যুক্তি সমস্ত তাঁহার আলোচিত বিষয়ের কতদূর অনুকূল হইয়াছে তাহাই প্রদর্শন করিব।

দ্বিজেন্দ্র বাবু মানবীকরণ নামক প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলেন যে, "অনেকের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরেতে চেতন-ধর্ম্ম আরোপ করা মানবীকরণ।" ইহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি জানিয়া শুনিয়াই লোকের এতদ্রূপ বিশ্বাসের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু পরে যখন তিনি বলেন যে, "এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরেতে অচেতন-ধর্ম্ম আরোপ করা ভিন্ন আর আমাদের গত্যন্তর থাকে না" তখন আমরা এই বুঝিতে পারি যে তিনি কেবল নিজের মনের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু যে সকল ঈশ্বর বিশ্বাসী মনুষ্য ঈশ্বরকে চৈতন্য স্বরূপ বলিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহারা যে বাস্তবিক ঈশ্বরকে কি বলিয়া মনে করেন, তাহা তিনি অনুসন্ধান করেন নাই। তাহা করিলে তিনি কদাপি আমাদের আপত্তির উত্তরে বলিতেন না যে, "ঈশ্বর যদি চেতন পদার্থ না হন, তবে

তিনি পৃথিবী—না হয় জল—না হয় বায়ু—না হয় অগ্নি—না হয় আমার জ্ঞানের অগোচর অন্য কোন জড় পদার্থ।"

☞ (নিম্ন নির্দ্দিষ্ট [ ] এইরূপ দুইটি ঘের-চিহ্নের মধ্যবর্ত্তী অংশ-গুলি বর্ত্তমান প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর; সে-গুলিকে পাঠক যেন বর্ত্তমান প্রস্তাবেরই সামিল মনে না করেন। পাঠকের যাহাতে সেরূপ ভ্রম না হয় এই উদ্দেশে ঐ অংশ-গুলিতে আমার নামের আদ্যক্ষর যুড়িয়া দিলাম॥ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর॥)

[যাঁহারা বাস্তবিক মনে করেন যে, ঈশ্বর চেতন পদার্থও নহেন—অচেতন পদার্থও নহেন, অথবা যাহা একই কথা—ঈশ্বর অচেতন চেতন পদার্থ, তাঁহাদের মনের কথা তাঁহারাই জানেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, দুই "না" = এক "হাঁ" (Two negatives make one positive); "অচেতন নহেন" অর্থাৎ সচেতন; "ঈশ্বর সচেতনও নহেন—অচেতনও নহেন" এ কথার অর্থই এই যে, "ঈশ্বর সচেতনও নহেন—সচেতনও বটেন।" যাঁহারা এইরূপ দুই মুখা অস্ত্র ব্যবহার করেন—"হয়"কে নয় করেন এবং "নয়"কে হয় করেন—তাঁহাদের সহিত তর্কে আঁটিয়া ওঠা যাহার তাহার কর্ম্ম নহে;—তাঁহাদের জ্ঞান এমনি উদার-প্রকৃতি যে, সে জ্ঞানের নিকট "গোল চতুষ্কোণ" "তমোময় আলোক" "বক্র সরল রেখা" "অন্ধ পথপ্রদর্শক" "অচেতন চেতন" ইহাদের কেহই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে—সে জ্ঞান পাত্রাপাত্র সকলকেই আদরের সহিত ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করে। কিন্তু অত উদারতা কি যে-সে ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে শোভা পায়? অতএব আমরা হারি মানিতেছি—প্রতিবাদী এ যাত্রা আমাদিগকে ছাড়িয়া দি'ন।—শ্রীদ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবুর যুক্তির ক্রটি নির্দ্দেশ করাই আমাদের প্রতিবাদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং আমরা যখন দ্বিজেন্দ্র বাবুকে দেখিয়াছিলাম যে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী অথচ চেতনবাদী নহে এরূপ লোককে জড়বাদী বলিয়াই প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার যুক্তির মূলে যে, ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে তাহা আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

["যাহারা চেতন-বাদী নহে—তাহারা অচেতন-বাদী" এ কথা কিছু আর আমার নিজের ঘর-গড়া কথা নহে যে, আমি একা তাহার জন্য অপরাধী! সকল লোকেই বলে যে, যাহা চেতন নহে তাহা অচেতন। আজ কেবল এই একটি নূতন কথা শুনিতেছি যে, "এরূপ হইলেও হইতে পারে যে, যাহা সচেতন নহে,—তাহা অচেতনও নহে।" চিরকালই আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, দুই "না" = এক "হাঁ;" সুতরাং অচেতন নহে বলা-ও যা, আর, সচেতন বলা-ও তা; কাজেই "যাহা সচেতন নহে তাহা অচেতনও নহে" এ কথা বলা-ও যা, আর, "যাহা সচেতন নহে তাহা সচেতন" এ কথা বলা-ও তা. দুইই সমান। কিন্তু "যাহা সচেতন নহে তাহা সচেতন" এ কথাটির মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করা অসামান্য ধী-শক্তি ভিন্ন যে-সে ক্ষুদ্র বুদ্ধির কর্ম্ম নহে—সুতরাং এ বিষয়-টিতে আমাদের বুদ্ধির ত্রুটি নিতান্তই মার্জ্জনীয়।—শ্রীদ্বি০

তাহাতেই আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছিলাম যে "কেন, ঈশ্বর কি জড় বা চেতন ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারেন না ?" (৪৮৮ পৃষ্ঠায় ৩।৪ পঁক্তি।) বাস্তবিক যে সকল ঈশ্বর-বিশ্বাসী আস্তিক ঈশ্বরকে চৈতন্যময় বলিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা যে, জড় পদার্থ-কেই গত্যন্তর বলিয়া ঈশ্বররূপে স্বীকার করিবেন এমত হইতে পারে না। এরূপ মনুষ্যের ঈশ্বর জড় পদার্থও নহে এবং চৈতন্য ও নহে, কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞানের অতীত এমত এক পদার্থ যাহার কোনও রূপ জ্ঞান জগৎ দেখিয়া উপলব্ধি করা যাইতে পারে না। এরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাসী যে কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন কিন্তু প্রাকৃত মনুষ্য তাহার প্রমাণ স্বরূপে আমরা দুইটী নাম উল্লেখ করিতেছি। এক জন শারীর বিধানবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার জন ড্রিস্‌ডেল্ এবং অন্য জন জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত রিচার্ড প্রক্‌টার।

[আমরা কি বড় লোকের এতই ক্রীত-দাস যে, বড়লোকের ভ্রমকেও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য না করিলে কিছুতেই আর আমাদের নিস্তার নাই ? "অচেতন নহে" অর্থাৎ সচেতন, অথচ "সচেতন নহে" অর্থাৎ অচেতন, এরূপ সৃষ্টি-ছাড়া কথা একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতই বলুন্, আর, একজন বদ্ধ পাগলেই বলুক্, উহা জ্ঞানবান্ মনুষ্য-মাত্রেরই অগ্রাহ্য। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—কাব্যের অলঙ্কার-চ্ছলে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং এখনো বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর চেতনও নহেন এবং অচেতনও নহেন। কিন্তু তাহার অর্থ কি ? তাহার অর্থ কি এই যে, ঈশ্বর সত্য-সত্যই চেতন পদার্থ নহেন ? কথনই না ! প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাই আবার স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর পরিপূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ। ওরূপ বচন-সকলের অর্থ আর কিছু নয়—শুদ্ধ কেবল এই যে, ঈশ্বর অচেতন নহেন এবং মনুষ্যাদির ন্যায় পরি-মিত চেতনও নহেন,—তিনি পরিপূর্ণ চেতন-পদার্থ। আমরা অলঙ্কার চ্ছলে এরূপ কথা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, সমুদ্র পুষ্করিণীও নহে—পুষ্করিণী ছাড়া অন্য কোন জলাশয়ও নহে ; কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, বাস্তবিকই সমুদ্র পুষ্করিণী-ছাড়া অন্য কোন জলা-শয় নহে—তাহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, সমুদ্র পুষ্করিণীও নহে আর পুষ্করিণী-ছাড়া আর যত সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়—যেমন কূপ, ঝিল, খাল, নদী নালা—তাহাও নহে। কিন্তু প্রতিবাদীর জানা উচিত যে, এরূপ আলঙ্কারিক ভাষা এক শোভা পায় কবি-তাতে—আর শোভা পায় ঘরাও কথা-বার্ত্তায়—এ ভিন্ন বিজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে তাহা কোন ক্রমেই শোভা পায় না।—শ্রীদ্বি]

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, দ্বিজেন্দ্র বাবু যে প্রকার ঈশ্বর বিশ্বাসী লোকের আলো-চনা করিয়াছেন সেই প্রকার মনুষ্যও পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতবর হেকেল তাহার উদাহরণ স্থল। হেকেলের মতাবলম্বীগণ আপনাদিগকে ঈশ্বর বিশ্বাসী আস্তিক বলিয়া পরিচয় দেন বটে, কিন্তু উহাঁরা ঈশ্বর বিশ্বাসী জগতের নিকট ঈশ্বর

বিশ্বাসী আস্তিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। উহাঁরা বাস্তবিক জড়বাদী নাস্তিক। কারণ উহাঁরা যখন জগতের উৎপত্তিকে অন্ধ জড় শক্তির উপরই স্থাপন করেন তখন উহাঁদের ঈশ্বর স্বাধীন জ্ঞানময় পুরুষ নহেন। সুতরাং তাহা ঈশ্বর নামে অভিহিত হইতে পারে না।

দ্বিজেন্দ্র বাবু যখন গত্যন্তর বলিয়া, জড়বাদীকেই প্রতিপক্ষরূপে বরণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত তর্ক জড়বাদীর সহিতই চলিতেছে বলিতে হইবে। অতএব তাঁহার যুক্তি সমস্ত জড়বাদীকে প্রবোধ দিবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না তাহা এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে অচেতন অপেক্ষা চেতন এবং অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান উৎকৃষ্ট। আর উৎকৃষ্ট শব্দের অর্থ চৈতন্য ও জ্ঞানের সত্ত্বাযুক্ত। অর্থাৎ চৈতন্য ও জ্ঞান চেতন পদার্থে আছে, কিন্তু জড়ে অথবা অচেতনে নাই। সুতরাং চেতনের ভাণ্ডার জড়ের ভাণ্ডার অপেক্ষা পরিপূর্ণ। অতএব চেতন পদার্থ জড় বা অচেতন বস্তু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী। দ্বিজেন্দ্র বাবু ন্যায় শাস্ত্রের বিতণ্ডা দ্বারা এই ব্যাখ্যান সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তিনি ন্যায় শাস্ত্রের তর্কের অনুরোধে শব্দ শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। শব্দশাস্ত্র মতে একবিধ গুণ না থাকিলে কোনও দুই বস্তুর মধ্যে তুলনা হইতে পারে না। অতএব যদি তিনি এমত এক গুণ গ্রহণ করিতেন যাহা চেতন ও অচেতন উভয়েতেই আছে, তাহা হইলে তাঁহার উৎকৃষ্ট শব্দ দ্বারা উহাদের মধ্যে ইতর বিশেষ করাতে শব্দ শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করা হইত না। কিন্তু যখন তিনি চেতনের এমত এক গুণ লইয়াছেন যাহা জড় পদার্থে কিছু মাত্র নাই, তখন উৎকৃষ্ট শব্দ দ্বারা যে কিরূপে উহাদের মধ্যে ইতর বিশেষ করা যাইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

[আমরা তো জানি—ব্যাকরণকেই শব্দ-শাস্ত্র বলে। ব্যাকরণের সহিত এখানকার তর্কবিতর্কের যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কোন্ ব্যাকরণ শাস্ত্রে বলে যে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে শুদ্ধ কেবল ব্রাহ্মণেরই তুলনা চলিতে পারে,—ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের কোন প্রকারেই তুলনা চলিতে পারে না? বর্ত্তমান স্থলে শব্দ-শাস্ত্রকে সাক্ষী মান্য করা, আর, এখানকার কোন খুনী মোকদ্দমায় খুনের যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য গ্লাড্‌ষ্টোন্‌কে সাক্ষী মান্য করা—দুইই সমান। অতএব নিরীহ শব্দ-শাস্ত্রকে আদালতে আনিয়া অপ্রস্তুত করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না—প্রতিবাদী আমাদিগকে সাদা-সীধা রকমে জিজ্ঞাসা করিলেই আমরা তাঁহাকে মুক্ত কণ্ঠে বলিতাম যে, চেতন-পদার্থ এবং অচেতন-পদার্থ এ দুয়ের মধ্যে আদবেই যে, কোন সাধারণ-ধর্ম্ম নাই, এরূপ কথা আমরা কুত্রাপি বলি নাই, সুতরাং তাহার জন্য আমরা কোন অংশেই দায়ী নহি। "মানবীকরণ" প্রবন্ধে আমরা স্পষ্টই বলিয়াছি

যে, জড়বস্তুরও সত্তা আছে, মনুষ্যেরও সত্তা আছে, ঈশ্বরেরও সত্তা আছে; সত্তা চেতনা-চেতন সকলেরই সাধারণ ধর্ম্ম। তাহার মধ্যে বিশেষ কেবল এই যে, জড়বস্তুর সত্তা অচেতন সত্তা; মনুষ্যের সত্তা অপূর্ণ সচেতন সত্তা; ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ সচেতন সত্তা। প্রতিবাদী আর একবার "মানবীকরণ" ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। শ্রীদ্বি]

এখন মনে কর উৎকৃষ্ট শব্দ সুসঙ্গত রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্র বাবুর যুক্তি জড়বাদী প্রতিপক্ষকে প্রবোধ দিতে পারিবে কি না? জড়বাদীর মতে সৃষ্টি শক্তি কোনও জ্ঞানময় পুরুষ নহে, কিন্তু অন্ধ জড় শক্তি মাত্র। দ্বিজেন্দ্র বাবু এতদ্রূপ জড়বাদীকে বলিতেছেন—তুমি ঈশ্বরকে চেতন পুরুষ না বলিয়া জড় পদার্থ বলিতেছ কেন? যখন অচেতন অপেক্ষা চেতন উৎকৃষ্ট এবং অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান উৎকৃষ্ট, তখন তোমার পক্ষে অচেতন বা অজ্ঞানের পথ অপেক্ষা চেতন বা জ্ঞানের পথই অবলম্বন করা শ্রেয়। কারণ তাহা না করিলে তোমাকে ঊর্দ্ধগতি না হইয়া অধোগতিই হইতে হয়। যদি তুমি তথাপি অধোগতির পথই অবলম্বন কর, তাহা হইলে পৃথিবী উল্টিয়া যাইবে—মনুষ্য পৃথিবীর মস্তকের উপর হইতে পদপ্রান্তে নিপতিত হইবে এবং প্রস্তর পাষাণ পৃথিবীর পদ-প্রান্ত হইতে মস্তকের উপর আরোহণ করিবে। "কেন না ঈশ্বর স্বয়ং প্রস্তর পাষাণের সমধর্ম্মী।" (মানবীকরণের ১ম পরিচ্ছেদের শেষ অংশ।) পাঠক! এখন ভাবিয়া দেখ দেখি জড়বাদী এই যুক্তিতে পরাভব মানিবে কি না? যদি আমাদিগকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তবে আমরা নিঃসঙ্কচিত্তে বলিব যে, এরূপ যুক্তিতে জড়বাদীর মন টলিবার নহে। জড়বাদী তখন উত্তর দিবেন যে, আমি সৃষ্টির কার্য্য প্রস্তর পাষাণ প্রভৃতি জড় শক্তি দ্বারাই সম্পন্ন হইতে দেখিতেছি। সুতরাং তোমার জ্ঞানের পথ ও ঊর্দ্ধগতির পথের অনুরোধে আমি নিজের জ্ঞানকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাহা অবিশ্বাস না করিলেই যদি পৃথিবী উল্টিয়া যায়, যাইবে। আমি তাহা কিরূপে নিবারণ করিব?

[অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান যে কিসে উৎকৃষ্ট, তাহা আমরা গতবারের টিপ্পনীতে বিস্তার-পূর্ব্বক দেখাইয়াছি; অতএব পরমাত্মা যদি অচেতন পদার্থ হ'ন, তবে তিনি মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট; এরূপ স্থলে পরমাত্মার দিকে গতি ঊর্দ্ধগতি না হইয়া উল্টা আরো অধোগতি—এ তো সোজা কথা পড়িয়া আছে। সোজা কথায় মন-টলাটলি কিরূপ—বুঝিতে পারিলাম না। খুব একজন সদ্বক্তার বক্তৃতায় লোকের মন টলিতে পারে বটে, কিন্তু "একে একে দুই হয়" "যাহা সচেতন নহে তাহা অচেতন" "নিকৃষ্টের দিকে গতি অধোগতি" এই সকল সোজা কথায় কাহারো বা মন টলে কাহারো বা টলে না—ইহা তো কোথাও দেখিও নাই শুনিও নাই। জড়বাদী জড়শক্তি দ্বারাই জগতের কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছেন—এ কথাটি নিতান্তই গায়ের জোরের কথা। ইহা আমরা বিলক্ষণই অবগত আছি এবং জড়বাদী নিজেও মনে মনে বিলক্ষণই

অবগত আছেন যে, "জড় শক্তির মূলে ঐশী শক্তি নাই" এটা তাঁহার চক্ষে-দেখা কথা নহে, স্বতঃসিদ্ধ মূল তত্ত্বও নহে ;—এটা কেবল অনুমানের কথা ; অনুমান সত্যও হইতে পারে, অসত্যও হইতে পারে ; ইহা জানিয়াও যিনি অনুমানের কোট বজায় রাখিবার জন্য পৃথিবী উল্টাইয়া দিতে প্রস্তুত, তাঁহার গায়ের জোরের সহিত আঁটিয়া ওটে—কাহার সাধ্য ? শ্রীদ্বি]

জড়বাদী হয় তো বলিবেন—তোমার মতে যাহা চেতন নহে তাহাই জড়। তুমি উদ্ভিজ্জকেও জড় (৪৯১ পৃষ্ঠার ৭।৮ পঁক্তি) পদার্থ বলিতেছ। কিন্তু উদ্ভিজ্জের জীবন আছে। অতএব তোমার মতে জীবন এক প্রকার জড় শক্তি। তাহা হইলে, মনুষ্যের জীবনও এক প্রকার জড় শক্তি। কিন্তু আমি এই জড় শক্তিকেই শারীর যন্ত্রাদি সৃজন করিতে দেখিতেছি।

[এমনও একপ্রকার প্রাণী আছে—যাহা জীব কিম্বা উদ্ভিদ্—কি যে—আজিও তাহা স্থির হয় নাই। তাহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই কেবল স্থির বলিতে পারা যায় যে, জীব এবং উদ্ভিদের সাধারণ ধর্ম্ম যে, প্রাণ, তাহা তাহার আছে ; কিন্তু জীবের বিশেষ ধর্ম্ম যে, চেতন, তাহা তাহার আছে কি না তাহা সংশয়-স্থল। এরূপ স্থলে, হয় তাহার চেতন আছে, নয় তাহার চেতন নাই ; যদি তাহার চেতন থাকে, তবে তাহা জীব ; যদি তাহার চেতন না থাকে তবে তাহা উদ্ভিদ্। বৈজ্ঞানিকেরা তাহাতে চেতনের কোন স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পা'ন নাই বলিয়া, তাহাকে হঠাৎ জীব বলিতে নারাজ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের মতে এটা সুনিশ্চিত যে, হয় তাহা জীব—নয় তাহা উদ্ভিদ্—দুয়ের এক; কেহই এরূপ বলেন না যে,তাহা প্রাণী (organic being) বটে অথচ তাহা জীবও নহে—উদ্ভিদ্ও নহে। উদ্ভিদের জীবন আছে—ইহা সত্য, কিন্তু তাহার চেতন নাই. এই জন্য তাহা অচেতন। পশু পক্ষীর চেতন আছে বটে, কিন্তু তাহাদের চেতন আপনার প্রতি ফিরিয়া দেখে না, অর্থাৎ তাহাদের যে, চেতন আছে, তাহা তাহারা নিজে জানে না। ক্ষুধা যে কি তাহা তাহারা জানে, এই জন্য অন্নের চেষ্টায় ফিরে ; কিন্তু তাহাদের চেতন থাকা সত্ত্বেও চেতন যে, কি, তাহা তাহারা জানে না, এই জন্য তাহারা জ্ঞানের অনুশীলন করে না; তাহাদের চেতন কেবল ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতিকে জানিয়াই ক্ষান্ত—তাহা আপনাকে আপনি জানে না ; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের চেতন এক-মুখা চেতন। মনুষ্য শুদ্ধ কেবল ক্ষুধা তৃষ্ণাদি জানিয়াই ক্ষান্ত নহে কিন্তু তাহা ছাড়া সে আপনাকে আপনি জ্ঞাতা বলিয়া জানে—এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যের চেতন দুই-মুখা। অতএব ইহা স্থির যে, উদ্ভিদের জীবন আছে কিন্তু চেতন নাই ; পশু-পক্ষীর এক-মুখা চেতন আছে কিন্তু দুই-মুখা চেতন নাই ; মনুষ্যের দুই-মুখা চেতন আছে কিন্তু পরিপূর্ণ চেতন নাই—মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ নহে। চেতন-বিহীন জীবনী-শক্তি শুদ্ধ কেবল আমার মতে নয়—কিন্তু সকলেরই মতে—অচেতন-শক্তি, সংক্ষেপে—জড় শক্তি।

জড়বাদী যদি জড়-শক্তিকে শরীর-যন্ত্রাদি সৃজন করিতে দেখিয়া থাকেন, তবে তিনি দিব্য চক্ষুতেই তাহা দেখিয়া থাকিবেন; কেন না কোন শক্তিই কাহারো চক্ষুর গম্য নহে। জড়বস্তুর চলাচলি আমরা চক্ষে দেখি বটে, কিন্তু সেই চলাচলির প্রবর্ত্তক শক্তি দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত। শক্তিকে আমরা চক্ষে দেখি না বটে, কিন্তু যখনই আমরা এক বস্তুকে আর এক বস্তু কর্তৃক চালিত হইতে দেখি, অথবা আপনি আপনাকে চালনা করি, তখনই আমরা শক্তির প্রভাব জ্ঞানে উপলব্ধি করি। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, ঘটনা-মাত্রেরই কারণ আছে এবং সেই কারণের শক্তি দ্বারাই ঘটনা প্রবর্ত্তিত হয়। কারণ প্রথমতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (১) সাক্ষাৎ কারণ, (২) গৌণ কারণ এবং (৩) মূল কারণ। সাক্ষাৎ কারণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (১) অপূর্ণ স্বাধীন কারণ এবং (২) পরাধীন কারণ। প্রথমে সাক্ষাৎ কারণের বিষয় আলোচনা করা যাউক্—তাহার পরে মূল কারণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে—কাহাকে আমরা সাক্ষাৎ কারণ বলিতেছি—তাহা স্থির-রূপে নির্দেশ করা আবশ্যক। মনে কর, ক'য়ের কারণ খ, খ'য়ের কারণ গ; এরূপ স্থলে খ ও ক'য়ের কারণ, গ-ও ক'য়ের কারণ; কিন্তু খ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক'য়ের কারণ, গ পরম্পরা-সম্বন্ধে ক'য়ের কারণ; খ ক'য়ের সাক্ষাৎ কারণ, গ ক'য়ের গৌণ কারণ। পুনশ্চ; মনে কর তুমি আমাকে বলিলে "অমুক ব্যক্তি বড়ই ভাল লোক—তিনি আলাপের উপযুক্ত;" আর মনে কর—তাহার পরদিনই আমি সেই সৎলোকটির সহিত দেখা করিতে চলিলাম; এরূপ স্থলে আমার সেই চলন-কার্য্যের সাক্ষাৎ কারণ আমি আপনি—তাহার গৌণ কারণ তোমার উত্তেজনা-বাক্য। কেননা চলিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে "আমি সৎলোকটির সহিত দেখা করিতে চলি" এইরূপ নিয়ম স্থির করিয়া তদনুসারে চলিতে আরম্ভ করিলাম; সুতরাং আমার নিজের নিয়মানুযায়ী নিজের উদ্যমই আমার ঐ চলন-কার্য্য-টির সাক্ষাৎ কারণ—তোমার উত্তেজনা-বাক্য তাহার গৌণ-কারণ-মাত্র। এইরূপ সজ্ঞান কারণ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আপনি আপনাকে নিয়মিত করে, পরম্পরা সম্বন্ধে অন্য কর্তৃক নিয়মিত হয়; তাহা যে অংশে আপনি আপনা-কর্তৃক নিয়মিত হয়—সেই অংশে তাহা আপনি আপনার অধীন—সেই অংশে তাহা স্বাধীন; আর, যে অংশে তাহা অন্য কর্তৃক নিয়মিত হয় সেই অংশে তাহা পরাধীন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য যখন সজ্ঞান-ভাবে কোন কার্য্য করে, তখন সে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বাধীন কারণ এবং পরম্পরা-সম্বন্ধে পরাধীন কারণ। তবেই হইতেছে যে, মনুষ্য স্বাধীন কারণ বটে কিন্তু সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন কারণ নহে। জড়বস্তু কোন অংশেই স্বাধীন কারণ নহে; জড়বস্তুর প্রত্যেক পরমাণু অন্যান্য পরমাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহাদের কেহই আপনাকে আপনি নিয়মিত করে না। পৃথিবী সূর্য্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বারা নিয়মিত হয়—সূর্য্য অন্যান্য জগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-

দ্বারা নিয়মিত হয়—প্রত্যেক পরমাণু অন্যান্য পরমাণুর আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বারা নিয়মিত হয়। অতএব স্থির হইল যে, (১) মনুষ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বাধীন কারণ, পরম্পরা-সম্বন্ধে পরাধীন কারণ; অথবা যাহা একই কথা—অপূর্ণ স্বাধীন কারণ; (২) জড়বস্তু পরাধীন কারণ। এই গেল সাক্ষাৎ কারণ;—এখন মূল কারণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

প্রথম; পরাধীন বস্তু আপনার উপর আপনি নির্ভর করিয়া স্থিতি করিতে পারে না; তাহাকে অন্যের উপর নির্ভর করিতেই হইবে।

দ্বিতীয়; পরাধীন বস্তুর নির্ভর-স্থলও যদি পরাধীন হয় তবে উভয়ে মিলিয়া একটি পরাধীন বস্তু; কাজেই উভয়ে মিলিয়া তৃতীয় কোন-একটি বস্তুর উপর নির্ভর করে।

তৃতীয়; চন্দ্রের একটি পরমাণু পরাধীন—তাহাকে চন্দ্রের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে; কিন্তু চন্দ্রও পরাধীন; চান্দ্র্য পরমাণু এবং চন্দ্র উভয়ে মিলিয়া পৃথিবীর উপর নির্ভর করিতেছে; কিন্তু পৃথিবীও পরাধীন; চান্দ্র্য চরমাণু, চন্দ্র এবং পৃথিবী তিনই সৌর জগতের উপর নির্ভর করিতেছে; কিন্তু সৌর জগৎও পরাধীন; চান্দ্র্য পরমাণু অবধি করিয়া সৌর জগৎ পর্য্যন্ত সমস্তই ন্যাক্ষত্রিক জগতের উপর নির্ভর করিতেছে; এবং জ্যোতির্ব্বিৎ লাপ্লাসের নৈহারিক সিদ্ধান্ত (Nebular theory) যদি সত্য হয়, তবে চান্দ্র্য পরমাণু অবধি করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্তই নৈহারিক জগতের উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব একা কেবল চান্দ্র্য পরমাণু নহে—কিন্তু চান্দ্র্য পরমাণু + চন্দ্র + পৃথিবী + সৌর জগৎ + ইত্যাদি, সমস্তই অন্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ। পৌরাণিক উদাহরণ দ্বারা মন্তব্য কথাটি আরো সংক্ষেপে ব্যক্ত হইতে পারে; পৃথিবী বাসুকীর উপর দাঁড়াইয়া আছে বলাও-য়া, আর, এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ-প্রদর্শন করিতেছে বলাও তা, দুইই সমান; কেননা পৃথিবী যেমন অন্যের আশ্রয় সাপেক্ষ বাসুকীও তেমনি অন্যের আশ্রয় সাপেক্ষ; "পৃথিবী কাহার উপর দাঁড়াইয়া আছে" এ যেমন একটি জিজ্ঞাস্য বিষয়, "পৃথিবী + বাসুকী কাহার উপর দাঁড়াইয়া আছে" ইহাও অবিকল তেমনি একটি জিজ্ঞাস্য বিষয়; যদি বল যে, বাসুকী হস্তীর উপর—হস্তী কচ্ছপের উপর—দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতেও প্রশ্ন মীমাংসার হালে পানি পায় না; কেননা "পৃথিবী + বাসুকী + হস্তী + কচ্ছপ কাহার উপর দাঁড়াইয়া আছে" ইহাও অবিকল ঐরূপ আর একটি জিজ্ঞাস্য বিষয়। এইরূপ পরাধীন বস্তু-পরম্পরার সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হউক্ না কেন, শুদ্ধ কেবল সেই সংখ্যা বৃদ্ধির প্রসাদাৎ পরাধীন বস্তু সকলের পরাধীনতা ঘুচিতে পারে না;—পূর্ব্বে নয় ক্ষুদ্র একটি পরমাণু আকাশের এক টেরে পড়িয়া টিম্ টিম্ করিতেছিল, এখন নয় শত সহস্র বস্তু মিলিয়া প্রকাণ্ড বৃহৎ একটা পরাধীন বস্তু দিক্ দিগন্তর যুড়িয়া বসিল—এই যা প্রভেদ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র পরমাণুটিও পরাধীন—সুতরাং অন্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ, আর, শেষোক্ত বৃহৎ বস্তুটাও পরাধীন—সুতরাং অন্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ।

অতএব যেখানে যত পরাধীন বস্তু আছে তাহাদের আপাদ-মস্তক সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া সমস্তটার প্রতি যদি চিন্তার লক্ষ নিবিষ্ট করা যায়, তবে দাঁড়ায় এই যে, তাহা একটা প্রকাণ্ড বৃহৎ পরাধীন বস্তু এবং তাহা ছাড়া দ্বিতীয় পরাধীন বস্তু নাই; কেননা সমস্ত পরাধীন বস্তুকেই তাহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। তাহা যখন পরাধীন বস্তু তখন তাহাকে অন্যের উপর নির্ভর করিতেই হইবে—কিন্তু তাহা ছাড়া যখন দ্বিতীয় পরাধীন বস্তু নাই তখন তাহা স্বাধীন বস্তু ছাড়া আর কাহার উপর নির্ভর করিবে? অতএব সমস্ত পরাধীন জগৎ একমাত্র স্বাধীন কারণের উপর নির্ভর করিতেছে। স্বাধীন কারণ কাহাকে বলে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। আপনার নিয়মানুসারে আপনি কার্য্য করাই স্বাধীনতার লক্ষণ; আর, অন্য দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করাই পরাধীনতার লক্ষণ। জ্ঞানবান্ পুরুষ ভিন্ন আর কেহই আপনি আপনার নিয়মে কার্য্য করিতে সক্ষম নহে; কেননা আপনার কার্য্যের নিয়ম আপনি আপনার জ্ঞানাভ্যন্তরে স্থির করিলে তবেই তাহা কার্য্যকর্ত্তার আপনার নিয়ম হয়, এবং তদনুসারে চলিলে কার্য্য কর্ত্তার আপনার নিয়মে আপনি চলা হয়। অতএব স্বাধীন কারণও যা, আর জ্ঞানবান্ আত্মাও তা—একই কথা। অপিচ সমস্ত জগৎ যখন মূল কারণের অধীন, তখন মূল কারণ অবশ্য কাহারো অধীন নহেন—সুতরাং তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষ। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, মনুষ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বাধীন কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে পরাধীন; এখন দেখা যাইতেছে যে, মূল কারণ কোন অংশেই পরাধীন নহেন—এই অর্থেই তিনি শুদ্ধ-শুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ।

এখন বক্তব্য এই যে, জড়বাদীও জড়শক্তি-হইতে জ্ঞান উদ্গীর্ণ হইতে দেখেন নাই, আর, ঈশ্বরবাদীও ঈশ্বরকে ভ্রূণে বসিয়া জীব সৃষ্টি করিতে দেখেন নাই। আমরা যখন জীব উৎপন্ন হইতে দেখি তখন আমরা এইরূপ স্থির করি যে, তাহার সাক্ষাৎ কারণ পিতামাতা এবং মূল কারণ পরমেশ্বর, কিন্তু কোন শক্তিকে (না সাক্ষাৎ কারণের শক্তিকে—না মূল-কারণের শক্তিকে) আমরা শরীর যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে দেখি না। ঘটনা-মাত্রেরই কারণ আছে এবং সকল কারণই মূল কারণের আশ্রয়াধীন—ইহা চক্ষে দেখিবার সামগ্রী নহে,—উহা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করিবার সামগ্রী।—শ্রীদ্বি]

যদি তুমি বল যে, শারীর যন্ত্রাদির সৃষ্টি জড় শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় না, কিন্তু কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ভ্রূণে ও উদ্ভিজ্জবীজে বসিয়া থাকিয়া উহাদের অবয়ব আদি প্রস্তুত করে, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি সেই জ্ঞানবান্ স্রষ্টার সৃজন কার্য্যে ভ্রান্তি জন্মে কেন? হয়তো কোন শিশুর হস্ত পদের অঙ্গুলীই উৎপাদন করিল না, না হয় দুই একটা অতিরিক্তই উৎপাদন করিল। অথবা মলদ্বার ও মলনালী প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র উৎপন্ন না হইলে শিশুটী বাঁচিতে পারে না, তাহারই বা অভাব রাখিয়া দিল।

তোমার ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞই হন, তবে তিনি মলদ্বার ও মলনালী বিহীন ভ্রূণ প্রস্তুত করিলেন কেন? এরূপ শিশু যে ভূমিষ্ঠ হইয়াই অবিলম্বে মরিয়া যাইবে তাহা কি তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন না?

["ঈশ্বর ভ্রূণে বসিয়া জীব সৃষ্টি করেন" এ কথাটাই হাস্যাস্পদ। আমরা যখন হস্ত চালনা করি তখন কি আমরা হস্তের মধ্যে বসিয়া হস্ত চালনা করি? যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে ভ্রূণে বসিয়া জীব সৃষ্টি করিতে হইবে—এ কথার কোন অর্থ নাই। বসা দাঁড়ানো প্রভৃতি শারীরিক কার্য্য আত্মাতে আরোপ করা নিতান্তই "জড়ীকরণ"। তবে, কাব্যের অলঙ্কার ছলে—উপমাচ্ছলে—ওরূপ কথা ভালো ভাবে প্রয়োগ করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই। কঠোপনিষদে আছে "আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" "তিনি বসিয়া থাকিয়া দূরে ভ্রমণ করেন, তিনি শয়ান থাকিয়া সর্ব্বত্র গমন করেন;" ইহা উপমা-মাত্র; কিন্তু উপমার মধ্যেও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, শারীরিক কার্য্যের সহিত আধ্যাত্মিক কার্য্যের উপমা হয় না। আমাদের জ্ঞান অনেক স্থলে পরাভব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অনেক স্থলে পরাভব প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহা যে মূল-স্থলেও পরাভব প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। বিজ্ঞান—পৃথিবীর বিশাল পরিভ্রমণ পথ মাপিয়া-যুপিয়া ঠিক্ করিয়াছে, অথচ একটি বালুকণার বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারে না। একটি বালুকণার এক স্থান হইতে আর এক স্থানে উঠিয়া যাওয়ার সহিত—অথবা একটি ভ্রূণের প্রাণ বিয়োগের সহিত—জগতের ভাল মন্দের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা জানিতে হইলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া আবশ্যক; অতএব এ কথা বলিতে আমরা একটুও লজ্জিত নহি যে, আমরা তাহা ঘুণাক্ষরেও জানি না। কিন্তু এই মূল বিষয়টা আমরা খুবই জানি যে, সমস্তেরই চরম-গতি সুশৃঙ্খলার দিকে; বিশৃঙ্খলা সোপান-মাত্র, সুশৃঙ্খলাই গম্য স্থান। ঈশ্বরই কেবল একাকী পূর্ণ; দ্বিতীয় পূর্ণ—দ্বিতীয় ঈশ্বর—সৃষ্টির বিষয় নহে; অপূর্ণই সৃষ্টির একমাত্র বিষয়। অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে যাওয়া—বিশৃঙ্খলা হইতে সুশৃঙ্খলার দিকে যাওয়া—ইহাই জগতের নিয়ম; একেবারেই সর্ব্বতোভাবে সুশৃঙ্খল হইয়া ওঠা—পূর্ণ হইয়া ওঠা—জগতের নিয়ম নহে। "মঙ্গলময় ঈশ্বর যখন মূলে বর্ত্তমান আছেন, তখন সকল বিশৃঙ্খলাই সুশৃঙ্খলার সোপান" ইহাই অপূর্ণ জগতের একমাত্র আশা-ভরসা। এ আশা শুদ্ধ কেবল আশা-মাত্র নহে; জগতের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবিধান-চেষ্টা, এবং সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থায়িত্ব-রক্ষার চেষ্টা লাগিয়া আছে; কোথাও বা প্রচ্ছন্ন ভাবে—কোথাও বা স্পষ্ট-ভাবে। এখানকার যুক্তি এরূপ একটা অলীক কথা নহে যে, জগৎ পূর্ণ মঙ্গল অতএব ঈশ্বর পূর্ণ মঙ্গল; এখানকার যুক্তি কেবল এই যে, পূর্ণ মঙ্গলের আশ্রয় ব্যতিরেকে অপূর্ণ মঙ্গল থাকিতে পারে না, অতএব ঈশ্বর পূর্ণ মঙ্গল।—শ্রীদ্বি]

জড়বাদী হয় তো জড় শক্তির নিপুণতার উদাহরণ স্বরূপ এই কথাও বলিতে

পারেন যে, "ফটোগ্রাফ নামক যন্ত্র দ্বারা যে মনুষ্যাদির আকৃতি অবিকল চিত্রিত হয়, তাহা অন্ধ জড় শক্তিই করে—না কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ সেই রাসায়নিক পদার্থ মাখানো কাচে বসিয়া করিয়া থাকে? অতএব আমাদের বিবেচনায় জড়বাদীর সহিত তর্ক করিতে হইলে কেবল উর্দ্ধগতি ও অধোগতি এবং পৃথিবী উল্টিয়া যাওয়ার কথা বলিলে চলিবে না, কিন্তু এমত যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইবে যাহাতে জড়বাদী নিরুত্তর হইতে পারেন। যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু জড়বাদীকে দেখাইয়া দিতে পারেন যে, অন্ধজড় শক্তিতে প্রাকৃতিক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, তাহা বাস্তবিক জ্ঞানময় পুরুষ ভিন্ন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, তাহা হইলে কেবল আমরা বলিতে পারি যে জড়বাদী দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট পরাভব স্বীকার করিবেন।

[ফটোগ্রাফের চিত্রের সাক্ষাৎ কারণ আলোক; কিন্তু আলোক স্বাধীন কারণ নহে —আলোক সজ্ঞান-ভাবে ফটোগ্রাফ চিত্রিত করে না। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পরাধীন কারণ কখনই মূল-কারণ হইতে পারে না। অতএব আলোক যদিচ উক্ত চিত্রের সাক্ষাৎ কারণ—তথাপি তাহা মূল-কারণ নহে; মূল কারণ—পরমেশ্বর; তাঁহারই আশ্রয় প্রসাদাৎ আলোক ফটোগ্রাফ্ চিত্রিত করে। কলের জল যাহা কলিকাতা-বাসীরা প্রত্যহ ব্যবহার করে, তাহার সম্বন্ধে এক ব্যক্তি যদি বলে যে, তাহা চোঙ্গা হইতে আসিতেছে; এবং আর এক ব্যক্তি যদি বলে যে, তাহা গঙ্গা হইতে আসিতেছে; তবে দুই ব্যক্তির কথাই সত্য; প্রভেদ কেবল এই যে, প্রথম ব্যক্তি কলের জলের সাক্ষাৎ আকরের কথা বলিতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি কলের জলের মূল আকরের কথা বলিতেছে। এ যেমন—তেমনি আলোকের শক্তি দ্বারা ফটোগ্রাফ চিত্রিত হইতেছে—এ কথাও সত্য, আর, ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা ফটোগ্রাফ চিত্রিত হইতেছে—এ কথাও সত্য; প্রভেদ কেবল এই যে, আলোক সাক্ষাৎ কারণ, ঈশ্বর মূল কারণ।—শ্রীদ্বি]

আমরা প্রতিবাদ কালে বলিয়াছিলাম যে দ্বিজেন্দ্র বাবু যে জড় পদার্থকে সৃষ্ট বস্তু বলিতেছেন তাহা জড় পিণ্ড না উপাদান পদার্থ? তদুত্তরে দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেন যে, জড় পদার্থ শব্দে অচেতন বস্তুকেই বুঝিতে হইবে। কি জড়পিণ্ড কি উপাদন পদার্থ ইহার যাহা কিছু অচেতন রূপী তাহাই সৃষ্ট। আর যাহা কিছু চেতনরূপী অচেতন জড়ের মূলে বিদ্যমান আছে, তাহা "ঈশ্বরের জ্ঞানালোকে প্রতীপ্ত—কাজেই তাহা জড় বস্তু নহে।" সুতরাং তাহা সৃষ্ট বস্তুও নহে। ইহা বাস্তবিক মূলাধার "ঐশী শক্তি" মাত্র। দ্বিজেন্দ্র বাবু এইরূপে যত কথা বলিয়াছেন তাহা কেবল উপদেশের ভাষারই বলিয়াছেন। কিন্তু যখন জড়বাদীর সহিত তাঁহার এই তর্ক চলিতেছে, তখন জড়বাদী কি তাঁহার যুক্তি হীন উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিবে? বাস্তবিক আমাদের বিবেচনায় কেবল উপদেশের ভাষায় জড় পদার্থের উৎপন্নত্ব জ্ঞাপন করিলে মীমাংসা হইবে না।

["সত্য কহিবে" "মিথ্যা কহিবে না" এই প্রকার বিধি-নিষেধের ভাষাকেই

সচরাচর আমরা উপদেশের ভাষা বলিয়া থাকি। আমরা যদি বলিতাম যে, "ঈশ্বরকে সমস্ত জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ বলিয়া বিশ্বাস কর—নচেৎ তোমার ভাল হইবে না" তাহা হইলেই প্রতিবাদীর মুখে এ কথা শোভা পাইত যে, আমরা উপদেশের ভাষায় তাঁহাকে শিক্ষা দান করিতেছি। তা নয়—জগতের মূল উপাদান সম্বন্ধে তিনি আমাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা আমাদের মতামত ব্যক্ত করিলাম; এই অপরাধে প্রতিবাদী আমাদের কথা গুলির উপর চটিয়া উঠিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে এইরূপ এক কঠিন আদেশ প্রচার করিলেন যে, ও-সমস্ত কথা উপদেশের কোটায় নিক্ষিপ্ত হউক্। তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমরা জড়বস্তুর মূল উপাদানকে নিত্য বলি কি না, আর, তাহাকে আমরা সৃষ্ট বস্তু বলি কি না; আমরা তদুত্তরে বলিলাম যে, ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুইই সুতরাং ঐশী শক্তিই জগতের মূল উপাদান, কাজেই তাহা সৃষ্ট বস্তু নহে—তাহা নিত্য। ইহার কোন্‌খান্‌টিতে যে, উপদেশের ভাষা, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রতিবাদী আমাদের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা আমাদের মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি; তিনি যদি তাহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতাম। তাহার সাক্ষী;—প্রতিবাদী যখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, অজ্ঞান-অপেক্ষা জ্ঞান কিসে উৎকৃষ্ট? তখন আমরা তাঁহাকে তাহার প্রমাণ দেখাইতে কোন অংশেই ত্রুটি করি নাই। কিন্তু এবারে তিনি কেবল আমাদের মত জিজ্ঞসা করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও শুদ্ধ কেবল আমাদের মত ব্যক্ত করিয়াছি;—আমরা বলিয়াছি যে, ঐশী শক্তিই জগতের মূল উপাদান—ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুইই। এখন প্রতিবাদী আমাদের নিকট হইতে প্রমাণ তলব করিতেছেন। প্রমাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি—কিন্তু অতীব সংক্ষেপে; কেননা দর্শন-শাস্ত্রের ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া হ ক্ষ পর্য্যন্ত চুকাইয়া দিতে হইলে আগামী সমস্ত সম্বৎসর ভারতীতে আর কোন প্রবন্ধের স্থান-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। প্রমাণ;—ইতি পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, যিনি সর্ব্ব জগতের মূলাধার তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন কারণ; ইহা হইতেই আসিতেছে যে, তিনি বাহিরের কোন কিছুর সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন নাই—তিনি আপনা হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তিনি জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ দুইই। প্রতিবাদী যদি অপূর্ণ জগতে ইহার মোটামুটি উপমা দেখিতে চা'ন (কেবল উপমা-মাত্র তাহার অধিক আর কিছুই নহে) তবে তাহা এই;—"আমি বাহিরের কোন কিছু দ্বারা চালিত না হইয়া আপনার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অনুসারে চলিব" ধার্ম্মিক ব্যক্তি এইরূপ নিয়মে আপনাকে নিয়মিত করিয়া কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—ইহা সকলেরই জানা কথা; এরূপ স্থলে ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপনিই নিয়ন্তা এবং আপনিই আপনার নিয়মে নিয়মিত—বাহিরের কোন

প্রলোভন দ্বারা নিয়মিত নহেন। এস্থলে ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপনিই স্ব-কার্য্যের প্রবর্ত্তক এবং আপনিই স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত; অতএব বলা যাইতে পারে যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রবৃত্ত অংশটিই তাঁহার কার্য্যের উপাদান কারণ, এবং প্রবর্ত্তক অংশটি তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত কারণ—দুইই তিনি আপনি নিজে। সংক্ষিপ্ত প্রমাণ দিলাম এবং একটি স্থূল উপমা দিলাম—ইহার অধিক আর কিছুই এখানে সম্ভবে না। প্রতিবাদীর লেখার ভাবভঙ্গী দৃষ্টে আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি শুদ্ধ কেবল প্রত্যক্ষ এবং ভূয়োদর্শন-মূলক (Inductive) অনুমান—এই দুইটিকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া জানেন; স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান যে, সকল প্রমাণের মূল প্রমাণ, ইহা তাঁহার স্বপ্নের অগোচর। তিনি যদি বলেন "প্রমাণ দেও," তাহা আমরা দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যদি বলেন "আমি যেরূপ প্রমাণ চাই সেইরূপ প্রমাণ আমাকে দেও, আর কোন রূপ প্রমাণ দিলে আমি তাহা লইব না," তবে তাঁহার সেরূপ আব্দারের রসদ যোগানো আমাদের কর্ম্ম নহে—ইহা আমরা আগে-ভাগেই বলিয়া খালাস। কেননা, স্থল-ভেদে প্রমাণের প্রকার-ভেদ অনিবার্য্য। আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, "এই বস্ত্র খানি যে, সাত গজ, তাহার প্রমাণ কি?" তবে তাহার উত্তরে তুমি স্বচ্ছন্দে বলিতে পার যে, "মাপিয়া দেখ—তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে।" কিন্তু জ্যামিতি শিক্ষাকালে যদি কোন বালক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করে যে, সমান্তর-ভুজ চতুষ্কোণের (Parallelogram এর) কোণাকুনি প্রসারিত দুইটি রেখাই যে, সমান, তাহার প্রমাণ কি? তবে তখন আর শিক্ষক এ কথা বলিয়া পার পাইতে পারিবেন না যে, "মাপিয়া দেখ—তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে।" তখন শিক্ষককে কতক-গুলি স্বতঃসিদ্ধ মূল-তত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ-কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। কিন্তু বালক যদি এইরূপ আব্দার করে যে, ও-প্রমাণ কোন কাজের নহে—আমি নিজে না মাপিয়া দেখিলে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না," তবে তাহার উত্তরে শিক্ষক—এক যদি খুব সংক্ষেপে প্রমাণ প্রদর্শন করেন—তবেই যা (সে প্রমাণ আর কিছুই নয়—বেত্র), নচেৎ তাঁহাকে এত বিস্তীর্ণ প্রমাণ যোগাইতে হয় যে, কোথাও তাহার কূল কিনারা নাই; ছোটো, বড়, মাঝারি, অশেষ-প্রকার সমান্তর-ভুজ চতুষ্কোণের কোণাকুণি-রেখা-দ্বয় মাপিয়া না দেখিলে আর এটা স্থির হইতে পারে না যে, ঐরূপ চতুষ্কোণ-মাত্রেরই কোণাকুণি রেখাদ্বয় সমান। অশেষ রেখা মাপিয়া দেখা অনন্ত-কাল-সাপেক্ষ—সুতরাং তাহা মনুষ্যের অসাধ্য। যদি কতকগুলি মাপিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায়, তবে তাহা অবশিষ্ট গুলির পক্ষে কিছুমাত্র ফল-দায়ক হয় না; যদি এক শত বা ততোধিক ত্রিভুজের কোণ মাপিয়া দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তাহাদের প্রত্যেকের কোণ-ত্রয় পরস্পর অসমান, তবে তাহাতেই কিছু আর এরূপ প্রমাণ হইবে না যে, সকল ত্রিভুজেরই কোণ-ত্রয় অসমান। অতএব ভূয়োদর্শন (Induction) এখানে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে

না। এখানকার প্রমাণ তবে কি? স্বতঃসিদ্ধ সত্যই এখানকার প্রমাণের একমাত্র ভিত্তি-মূল; যেমন "দুই বিন্দুর মধ্যে সরল-রেখাই সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বতম পথ" ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিসে জানিলাম যে, উহা স্বতঃসিদ্ধ? না যেহেতু এখানে ভূয়োদর্শনের হালে পানি পায় না। ভূয়োদর্শন দ্বারা ও-তত্ত্বটি নির্ণয় করিতে হইলে দুই বিন্দুর মধ্যস্থিত শত সহস্র বক্র রেখা একে একে মাপিয়া দেখিলেও প্রমাণের দিকে এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না; কেননা অবশিষ্ট অসংখ্য বক্র রেখা যাহা এখনো মাপিয়া দেখা হয় নাই তাহাদের মধ্যে একটিও যে সরল রেখা অপেক্ষা ছোটো নহে তাহার প্রমাণ কি? ভূয়োদর্শনের একটি সিদ্ধান্ত এই যে "কাক মাত্রই কালো," কিন্তু এ সিদ্ধান্তটিকে অকাট্য করিয়া দাঁড় করাইতে হইলে, সমস্ত জগতের সমস্ত কাক পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক; আমরা এ পর্য্যন্ত একটিও সাদা কাক দেখি নাই—তাহাতে কি? আর কেহ হয় তো দেখিয়াছে। আমরা যেন ভূয়োদর্শনের পদ্ধতি অনুসারে স্থির স্থার করিয়া বসিয়া রহিলাম যে, কাক মাত্রই কালো, কিন্তু চন্দ্র লোকে বা সূর্য্যলোকে বা জগতের অন্য কুত্রাপি সাদা কাক নাই—এ কথা কে বলিল? অতএব ভূয়োদর্শনের কোন সিদ্ধান্তই অকাট্য সিদ্ধান্ত নহে। কিন্তু "দুই স্থানের মধ্যে সোজা পথই সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বতম পথ" ইহা একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত,—না চন্দ্র-লোকে—না সূর্য্য-লোকে—কোথাও ইহার ব্যভিচার সম্ভবে না; সুতরাং এ সিদ্ধান্ত আনুমানিক নহে কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ। তেমনি পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে—স্বাধীন কারণ মাত্রই সজ্ঞান কারণ—সকল কারণই মূল কারণের আশ্রয়াধীন—মূলকারণ সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন কারণ—মূল কারণ জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুইই—ইহার একটিও ভূয়োদর্শন-মূলক আনুমানিক সিদ্ধান্ত নহে; সকল-গুলিই স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীদ্বি]

জড়বাদী বলিবেন তোমার ঈশ্বর যে জ্ঞানময় চেতন পুরুষ তাহাই তুমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিপাদন কর।

[তাহা তো আমরা গতবারের টিপ্পনীতে প্রতিপাদন করিয়া চুকিয়াছি। এক কথা কতবার প্রতিপাদন করিতে হইবে? (১) অপূর্ণ সত্য পূর্ণ সত্যের আশ্রয়-সাপেক্ষ—ইহা স্বতঃসিদ্ধ; (২) পূর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে সত্যের পূর্ণতা হয় না—ইহা আমরা গত বারের টিপ্পনীতে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছি; (৩) অতএব যিনি সমস্ত জগতের মূলাধার, তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানময় পুরুষ। প্রতিপাদনের কি আর বাকি রহিল? শ্রীদ্বি]

তৎপর জড়ের কোন্ অংশ ঈশ্বরের "জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত" এবং কোন্ অংশ প্রদীপ্ত নহে তাহা পৃথক করিয়া দেখাইয়া দাও। অপর যে অংশকে তুমি সৃষ্ট বস্তু বলিতেছ তাহা যে বাস্তবিকই সৃষ্ট ইহাও প্রমাণ কর।

[আমরা যখনই কোন একটা সোজা কথা বলিব, অমনই তাহার একটা বাঁকা অর্থ ঘটাইয়া আমাদের সকল কথার ছল ধরিলে, তাহার প্রত্যুত্তর দিতে আমাদের মনে

নানা প্রকার কিন্তু উপস্থিত হয়—মনে হয় যে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই ঝক্‌মারি। ইহা অপেক্ষা সোজা কথা আর কি হইতে পারে যে, "মৃদ্‌ঘট যে-অংশে মৃত্তিকা সেই অংশে তাহা স্বীয় উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল এবং স্বীয় বিনাশের পরেও থাকিবে; আর যে-অংশে তাহা ঘটাকৃতি সে অংশে তাহা স্বীয় উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল না—স্বীয় বিনাশের পরেও থাকিবে না। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, "যে অংশে" ইহার অর্থ "যে হিসাবে" এ বই আর কিছুই নয়। ইহার উত্তরে প্রতিবাদী অংশ-শব্দকে (হিসাব-অর্থে নহে কিন্তু) প্রকৃত-পক্ষেই ভাগ-অর্থে গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন "মৃদ্‌ঘটের কোন্ অংশ মৃত্তিকা এবং কোন্ অংশ ঘটাকৃতি তাহা আমাকে দেখাইয়া দেও?" ইহার উত্তর শুধু এই হইতে পারে যে, মৃদ্‌ঘটের সর্ব্বাংশেই মৃত্তিকা ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছে। এ যেমন—তেমনি কাষ্ঠ বা পাষাণের সর্ব্বাংশেই জগতের মূল উপাদান ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছে; আর, সেই মূল উপাদান কাষ্ঠ বা পাষাণের উৎ-পত্তির পূর্ব্বেও ছিল এবং তাহাদের বিনাশের পরেও থাকিবে। কাষ্ঠ-পাষাণাদি পূর্ব্বে ছিল না, এখন হইয়াছে, এই জন্য তাহা সৃষ্ট বস্তু; কাষ্ঠ-পাষাণাদির মূল উপাদান চিরকালই আছে এই জন্য তাহা সৃষ্ট বস্তু নহে—তাহা ঈশ্বরেরই অন্তর্ভূত ঐশীশক্তি; সুতরাং তাঁহার জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত। শ্রী দ্বি]

এই সমস্ত প্রদর্শন করিয়া যদি তুমি একবার প্রতিপাদন করিতে পার যে জগতের মূলে একজন জ্ঞানময় পুরুষ আছেন, তাহা হইলে তুমি সেই ব্যক্তিতে যত কিছু বিশেষণ অর্পণ করিবে তাহা সমুদয়ই আমি স্বীকার করিয়া লইব। অতএব আমরা দ্বিজেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করি সৃষ্টি শক্তি যে একজন জ্ঞানময় পুরুষ তাহা তিনি যেন সর্ব্ব প্রথমেই প্রতিপাদন করেন। অন্যথা জড়বাদী তাঁহার উপদেশ বাক্যে ভুলিবেন না। তিনি যেরূপ জড়বাদীকে উপদেশ দিয়াছেন, জড়বাদীও সেইরূপ তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু তিনি কি সেই সমস্ত উপদেশ গ্রহণ করিবেন? যদি তিনি জড়বাদীর উপদেশ গ্রহণ না করেন, তবে জড়বাদী কেন তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবেন? অতএব চেতনবাদী ও জড়বাদীর মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইলে উভয়েরই যুক্তির পথ অবলম্বন করা উচিত। আমরা জড়বাদীর পক্ষ হইয়া বলিতেছি যে, দ্বিজেন্দ্র বাবু যে সকল আপত্তি উপস্থিত করিবেন জড়বাদী তাহার প্রতিকূলে যুক্তি প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত আছেন।

[স্বতঃসিদ্ধ সত্য কিছু আর আমার নিজের ঘড় গড়া সামগ্রী নহে; তাহা সকল জ্ঞানেরই সাধারণ সম্পত্তি। "সরল রেখা সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বতম পথ" "পরিবর্ত্তন মাত্রেরই কারণ আছে" "মূলকারণ সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন" "খণ্ড আকাশ অসীম আকাশের অন্তর্ভূত" "অপূর্ণ সত্য পূর্ণ সত্যের আশ্রয় সাপেক্ষ" এগুলি কেবল আমার স্বকপোল কল্পিত সিদ্ধান্ত নহে, কিন্তু সর্ব্ব-সাধারণতঃ সকল জ্ঞানেরই অকাট্য সিদ্ধান্ত; পরিস্ফুট

জ্ঞানে ঐগুলি পরিস্ফুট ভাবে অবস্থিতি করে—অস্ফুট জ্ঞানে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করে। যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিরোধী, তাঁহারা আপনাদেরই জ্ঞানের আপনারা বিরোধী, তাঁহারা শুদ্ধ যদি কেবল আমার বা আমার ন্যায় কোটি কোটি ব্যক্তির বিরোধী হইতেন তাহা হইলে তাহাতে কিছুই আসিত যাইত না। জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বগুলি যুক্তির ভিত্তিমূল; যুক্তির ভিক্তিমূলের বিপরীতে যিনি যুক্তি চালনা করেন—তিনি যে ডালে বসিয়া আছেন সেই ডাল কর্ত্তন করেন। ইহার একটি উদাহরণ; যুক্তির একটি ভিত্তিমূল এই যে, যাহা ক তাহা অ-ক নহে—যাহা চেতন তাহা অচেতন নহে;". ইউরোপীয় ন্যায় শাস্ত্রে ইহাকে বলে "Law of Contradiction"; যুক্তির এই ভিত্তি-মূলের বিরুদ্ধে কেহ যদি যুক্তি চালাইতে যা'ন, তবে, যে যুক্তি-অনুসারে তিনি ক'কে অ-ক বলিয়া—অথবা চেতনকে অচেতন বলিয়া—প্রতিপাদন করিবেন, সেই যুক্তি অনুসারেই তাঁহার যুক্তি অযুক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এইরূপে যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করেন—অযুক্তিই যাঁহাদের যুক্তি এবং অন্যায় শাস্ত্রই যাঁহাদের ন্যায়-শাস্ত্র—কাহার এত মাথা-ব্যথা যে তাঁহাদের সহিত অর্থ-শূন্য অলীক বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া শুধু শুধু সময় নষ্ট করিবে? দৈব-গতিকে যদি বা কাহাকেও দায়ে পড়িয়া ঐরূপ বাতাসের সহিত তলোয়ার-খেলায় লিপ্ত হইতে দেখা যায়—তথাপি এটা স্থির যে, সাধ করিয়া—ইচ্ছাপূর্ব্বক—কেহ আর সেরূপ বৃথা কার্য্যে কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হয় না। শ্রীদ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবু যেরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া মানবীকরণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জড় বস্তুতে অন্ধসত্তা, এবং মনুষ্যে তাহার অতিরিক্ত অপূর্ণ সচেতন সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা নির্দ্দোষই হইয়াছে বটে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে, তিনি ঈশ্বরেতে পরিপূর্ণ সচেতন সত্তা অর্পণ করিয়াছেন তাহা জড়বাদী নির্দ্দোষ যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। জড়বাদী যখন অপূর্ণ সচেতন সত্তা ভিন্ন পরিপূর্ণ সচেতন সত্তা জগতে দেখিতে পান না, তখন তাঁহার নিকট দ্বিজেন্দ্র বাবুর পরিপূর্ণ সচেতন সত্তা কাল্পনিক কথা মাত্র এবং প্রমাণ সাপেক্ষ।

[অসীম আকাশকে জড়বাদী কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন? তাহা বলিয়া খণ্ড আকাশ কি অসীম আকাশকে অপেক্ষা করে না? পূর্ণ সত্তা কেবল জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার সামগ্রী—চক্ষে দেখিবার সামগ্রী নহে। জ্ঞানকে চক্ষে দেখা যায় না বলিয়া—প্রতিবাদী যদি জ্ঞানের মূলতত্ত্ব-সকলকে কাল্পনিক কথা মাত্র মনে করেন, তবে আমার জ্ঞানও কাল্পনিক, তাঁহার জ্ঞানও কাল্পনিক; কাজেই আমার এবং তাঁহার দেখা শুনা বলা কহা সমস্তই কাল্পনিক! এরূপ স্থলে আমাদের উভয়েরই তর্কবিতর্কে ক্ষান্ত হওয়া শ্রেয়। শ্রী দ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে মনুষ্য নিজে অপূর্ণ হইয়াও স্বভাবজাত শক্তির বলে ঈশ্বরের

পূর্ণতা উপলব্ধ করে। তিনি এই বিষয়টী অন্ধকার দর্শনে আলোকের আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষুধার উদ্রেকে অন্ন ভোজনের ইচ্ছার সহিত তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন। আমরা প্রতিবাদ কালে বলিয়াছিলাম যে অন্ধকার দর্শন ও ক্ষুধা অনুভব করিলে যে আমরা যথা ক্রমে আলোক পাইতে এবং অন্নভোজন করিতে ইচ্ছা করি তাহা কেবল শিক্ষা নিবন্ধনই করিয়া থাকি। কিন্তু এই দুই ঘটনার সহিত ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধির তুলনা হইতে পারে না। কারণ পূর্ণতা উপলব্ধির শিক্ষা মনুষ্যের পক্ষে হওয়া অসম্ভব। আমাদের এই আপত্তির উত্তর স্বরূপে দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেন যে, "হংস-শাবক যে অণ্ড হইতে বাহির হইয়াই পুষ্করিণীর দিকে ধাবিত হয়, তাহার পূর্ব্বে সে কি কোন কালে সন্তরণ-সুখ অনুভব করিয়াছিল? না সদ্যোজাত শিশু পূর্ব্বে কোন কালে মাতৃস্তন আস্বাদন করিয়াছিল? শিশুর জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই মাতৃস্তন আছে এবং তাহার সহিত শিশুর পোষ্য পোষকতা সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত আছে; তাই সদ্যোজাত শিশু ক্ষুধা অনুভব করিবা মাত্রই মাতৃস্তনের প্রতি উন্মুখ হয়।" দ্বিজেন্দ্র বাবু হংসশাবক ও মানব শিশুর যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাদের জ্ঞান মতে ঠিক নহে। হংস শাবক অণ্ড হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে বটে, কিন্তু তাহা যে পুষ্করিনীতে যাইবার জন্যই করিয়া থাকে এমত নহে। ইহা বাস্তবিক স্বভাবজাত ইতস্ততঃ সঞ্চরণের ইচ্ছা হইতেই হয়। তবে যদি কখন কোন হংস শাবককে পুষ্করিণীর দিকেই যাইতে দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা বাস্তকিই ইচ্ছা নিবন্ধন নহে কিন্তু ঘটনা বশতঃই হইয়া থাকে। কারণ এরূপ স্থল দেখা গিয়াছে যে সম্মুখে জল থাকা সত্বেও তাহার দিকে হংসশাবক ধাবিত হয় নাই। মানব শিশুর মাতৃস্তন আকাঙ্ক্ষার কথাও তদ্রূপ ঠিক নহে। অনেক মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই ক্রন্দন করিয়া উঠে। তাহা স্থগিত হইয়া গেলে জিহ্বা দ্বারা মুখ লেহন ও ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করিতে থাকে। তখন কোন বস্তু—তাহা খাদ্যই হউক কি অখাদ্যই হউক— মুখে দিলে তাহা আগ্রহের সহিত লেহন করিতে থাকে। এই লেহন শিশুটী যে ইচ্ছা-পূর্ব্বকই করে এমত নহে, কিন্তু প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া (রিফ্লেক্স একসন্) নামক মেরু-দণ্ডের কার্য্য নিবন্ধনই করিয়া থাকে। প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বাস্তবিক শারীর বিধান বিদ্যার এক পরীক্ষিত ও প্রতিপন্ন তত্ত্ব। ভ্রূণ জরায়ুতে থাকিতেই উহার মেরুদণ্ডের এতদূর শিক্ষা হয় যে তাহা হইতে বহির্গত স্নায়ু সমস্তের পারিধ (পেরিফারেল্) প্রান্তে কোন বলে কার্য্য করিলে তাহার ক্রিয়া স্নায়ু-সূত্র যোগে মেরুদণ্ডে গমন করে এবং তথায় তাহার ক্রিয়া হইয়া একটী দ্বিতীয় বল স্বতন্ত্র স্নায়ু যোগে বহির্গত হয়। তাহাতেই ওষ্ঠ এবং জিহ্বার সঞ্চার সাধন করিয়া থাকে। এস্থলে পাঠক বলিতে পারেন ওষ্ঠ এবং জিহ্বার সেই সঞ্চার যে ইচ্ছা নিবন্ধন হয় না তাহার প্রমাণ কি? কোন বস্তু উপভোগ করিবার জ্ঞান হইতেই ইচ্ছা জন্মে। কিন্তু উপভোগ-জ্ঞান দর্শন আদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য

না হইলে উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি মানব শিশু মাতৃস্তন দর্শন করে তবেই তাহা উপভোগ করিবার জন্য উহার ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মানব শিশুর দর্শন আদি ইন্দ্রিয় জ্ঞানই হয় না। সুতরাং উহার তখন মাতৃস্তন উপভোগ করিবার জন্য ইচ্ছাও জন্মিতে পারে না। আমরা ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্বন্ধে যে সত্যের উল্লেখ করিলাম তাহা পাঠক নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

এস্থলে ইহাও আপত্তি হইতে পারে যে যখন হংস-শাবক অণ্ড হইতে বাহির হইয়াই ইতস্ততঃ সঞ্চরণ এবং মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই ওষ্ঠ এবং জিহ্বা সঞ্চালন করে, তখন এই দুই ক্রিয়া শক্তিকে স্বভাবজাত বলি না কেন? ইহার উত্তর স্বরূপে আমরা বলিতেছি যে এই দুই শক্তিও শিক্ষাজনিত। সেই শিক্ষা অণ্ড এবং জরায়ুর মধ্যেই সম্পন্ন হয়। জীব মাত্রই পরিবর্ত্তনশীল। সেই পরিবর্ত্তন পরিবেষ্টক বাহ্য জগতের ক্রিয়া প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। তদনুসারে কোন জীব বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিশেষ কোন গুণ প্রাপ্ত হইলে উহা আপন সন্তানকে তদ্দ্বারা অভিষিক্ত করে। এইরূপে জীবগণ যখন যে গুণ উপার্জ্জন করে, তখন তাহা পুরুষানুক্রমে চলিয়া স্থায়ী হয়। তাহাতেই হংস শাবক ও মানব শিশু পুষানুক্রমে গুণান্বিত হইয়া বহির্জগতে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বেই এমত শিক্ষিত মেরুদণ্ড ও স্নায়ু প্রাপ্ত হয় যে, উহারা বাহির হইয়াই ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ও ওষ্ঠ এবং জিহ্বা সঞ্চালন করিতে পারে।

[আমরা কেবল উপমাচ্ছলে বলিয়াছি যে,' শিশু যেমন মাতৃস্তনের জন্য লালায়িত, আত্মা সেইরূপ পরমাত্মার জন্য লালায়িত। কিন্তু প্রতিবাদীর জানা উচিত যে, চন্দ্রের সহিত মুখের উপমা দিলে এরূপ বুঝায় না যে, মুখ ঠিক চন্দ্রের ন্যায় চক্রাকৃতি। শিশুর আঁকুবাঁকুর সহিত আত্মার ব্যাকুলতার শুদ্ধ কেবল উপমা মাত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিক আর কিছুই নহে। উপমার মধ্যে যতটুকু সত্য থাকা সম্ভবে সেইটুকুই এখানে আমাদের মন্তব্য কথা; কঠোর প্রমাণ যাহা দেখাইবার তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়া চুকিয়াছি। "চন্দ্র বদন" এই কথা শুনিবা-মাত্র একজন যদি বলেন, "কি বলিলে? চন্দ্র বদন? মুখ কি কাহারো কখনো চন্দ্রের মত হইতে পারে?" তবে তাঁহাকে তাহার অর্থ ভাঙ্গিয়া বলা কি বিষম বিপত্তি? আমরা সেইরূপ এক বিষম বিপত্তি স্কন্ধে করিয়া উপরি-উক্ত উপমাটির অর্থ ভাঙ্গিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি;—একবার নয় একটু কষ্ট স্বীকার করিলাম! কিন্তু তৎপূর্ব্বে হংস শাবকের জলে যাওয়া বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা বারম্বার সেইরূপ ঘটনা চক্ষে দেখিয়াছি। প্রতিবাদী বলেন যে, ইতস্তত সঞ্চরণের ইচ্ছাই তাহার একমাত্র কারণ। মুরগির ছানারও তো ইতস্ততঃ সঞ্চরণের ইচ্ছা আছে—মুরগির ছানা তবে জলে নাবে না কেন? অতএব প্রমাণ হইতেছে যে, হংস-শাবক জলে যাইবার প্রবৃত্তি লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; এ নহে যে, অনেক দিন জলে যাতায়াত করিতে করিতে তাহার পর. তবে—হংস-

শাবকের ঐরূপ প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছে। বানর যে সর্প দেখিলেই ভয়ে আকুল হয়; বানর কি বারম্বার সর্পাঘাতে মৃত হইয়া তাহার পর তবে—সর্প যে কি পদার্থ—তাহার শিক্ষা পাইয়াছে? সর্প দর্শনের প্রতিক্ষিপ্ত (Reflex) ক্রিয়াতেই বা ভয়ের চিহ্ন দেখা দেয় কেন, আর রজ্জুদর্শনের প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়াতেই বা সেরূপ না হয় কেন? এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয়. কেন? যদি বল যে, বানর মাতৃগর্ভে অবস্থিতি কালেই সর্পের ভয় শিখিয়াছে; তবে জিজ্ঞাসা করি—বানরের মা সর্পের ভয় কোথা হইতে শিখিল? যদি এরূপ হয় যে বানরের আদি-পুরুষ ক্রমাগত সর্পাঘাতে মরিয়া ভূতের উপর ভূত হইয়াছিল এবং এখনকার বানর-সকল সেই ভুতানুভুতের বংশ, তবেই এ কথা যুক্তিতে স্থান পাইতে পারে যে, সেই আদিম বানর-ভূতের সর্পভয় বংশ-পরম্পরা ক্রমে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, সমস্ত জগতের সঙ্গে সমস্ত জগতের যোগ রহিয়াছে—কোথাও বা প্রকট ভাবে—কোথাও বা প্রচ্ছন্ন ভাবে। যেহেতু সমস্ত জগতের ভিত্তিমুল এক বই দুই নহে। সকলেই একই সৃষ্টির অন্তর্ভূত—কেহই সৃষ্টি-ছাড়া নহে; সকল বস্তুই পরস্পরের সহিত নানা প্রকার সম্পর্ক-সূত্রে গ্রথিত। এক তো এই স্বাভাবিক সম্পর্ক—তাহার উপরে আবার পাতানো সম্পর্কও আছে। কোথাও বা স্বভাবতই একজন আর এক জনের ভ্রাতা বা শত্রু—কোথাও বা ঘটনার গতিকে এক জন আর এক জনের ভ্রাতা বা শত্রু। বানর স্বভাবতই সর্পকে শত্রু বলিয়া ডরায়। মনুষ্যের জ্ঞানও সৃষ্টি ছাড়া বস্তু নহে—তাহা ভিতরে ভিতরে সমস্ত জগতের সহিত সম্পর্ক-সূত্রে গ্রথিত; সেই সম্পর্ক-সূত্রটি মনুষ্যের জ্ঞানে কখনো বা জাগিয়া উঠে—কখনো বা প্রসুপ্ত থাকে; কিন্তু সর্ব্বদাই তাহা গূঢ়ভাবে ভিতরে ভিতরে কার্য্য করে। সেই সম্পর্কের টানেই মনুষ্যের আত্মা পরমাত্মার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু আমরা এ কথা বলি না যে, সেই সম্পর্ক-জ্ঞান সকলের মনেই সমান মাত্রায় পরিস্ফুট। "সরল রেখা সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বতম পথ" এ জ্ঞান একজন চাসারও আছে, আর একজন পণ্ডিতেরও আছে; কিন্তু চাসার মনোমধ্যে ঐ জ্ঞান প্রসুপ্ত ভাবে আছে—পণ্ডিতের মনোমধ্যে পরিস্ফুট ভাবে আছে। কোন স্থানে শীঘ্র যাইতে হইলে একজন চাসাও সোজা পথ থাকিতে বাঁকা পথ অবলম্বন করে না; অথচ সেই চাসাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, দুইস্থানের মধ্যে কোন্ পথ সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্বতম, তাহা হইলে সে হয় তো ভেবরিয়া যাইবে। সে হয় তো বলিবে "কোন্ দুইস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?" বালকের মনোমধ্যে জ্যামিতির মূলতত্ত্ব সকল প্রসুপ্ত ভাবে আছে বলিয়াই তাহাকে জ্যামিতি শিখানো যাইতে পারে, নহিলে তাহাকে জ্যামিতি শিখানো অসম্ভব হইত। বালকের মনোমধ্যে যদি জ্যামিতির মুলতত্ত্ব সকল প্রসুপ্ত ভাবেও না থাকিত, তবে তাহাকে কোন জন্মেই জ্যামিতি শিখাইতে পারা যাইত না। ঈশ্বর জ্ঞানও সেইরূপ। ঈশ্বর জ্ঞান যদি মনুষ্যের মনে প্রসুপ্ত ভাবেও না থাকিত, তবে

কিছুতেই তাহাকে ঈশ্বর-জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিত না। ঈশ্বর-জ্ঞান যাহা মনুষ্যের অন্তঃকরণে প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে তাহাই আলোচনা উপদেশ বা দৃষ্টান্ত দ্বারা ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে—এ ভিন্ন ঈশ্বর-জ্ঞান কাহাকেও গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। "দুই বিন্দুর মধ্যে সরল রেখাই হ্রস্বতম পথ" এটা যে-ব্যক্তি আপনি না বোঝে,—অন্যে তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিবে না। কেহ যদি বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া বলে যে, দুই স্থানের মধ্যে এমন কোন বাঁকা পথ থাকিলেও থাকিতে পারে যাহা সোজা পথ অপেক্ষাও হ্রস্বতর তবে স্বয়ং বৃহস্পতি আসিলেও তাঁহাকে তাহার নিকট হারি মানিতে হয়। কোন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই মনুষ্যকে গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। নৈসর্গিক সংস্কারও কাহাকেও গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এই স্থানটিতেই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য। কিন্তু তাহা বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে অন্ধ সংস্কার বলা যাইতে পারে না; "ঘটনা মাত্রেরই কারণ আছে" ইহা অন্ধ সংস্কার নহে কিন্তু অকাট্য সত্য; খণ্ড আকাশ অসীম আকাশকে অপেক্ষা করে—ইহাও তেমনি; অপূর্ণ সত্তা পূর্ণ সত্তাকে অপেক্ষা করে, ইহাও তেমনি। শ্রীদ্বি]

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন হংস-শাবক ও মানব শিশু সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা উপদেশের ভাষায়ই বলিয়াছি, কিন্তু যুক্তির ভাষার বলি নাই। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ সমস্ত তত্ত্ব বিস্তৃত রূপে লিখিতে গেলে একখান পুস্তক হইয়া পড়ে। এজন্য আমরা ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক তত্ত্ব সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

এখন স্বীকার করা যাউক যে দ্বিজেন্দ্র বাবু হংস-শাবক ও মানব শিশু সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছেন তাহা সমুদায়ই ঠিক এবং উহাদের ঐ সমস্ত গুণ স্বভাবজাতই বটে। তাহা স্বীকার করিলেই কি এই কথা প্রতিপন্ন হয় যে, মনুষ্য স্বভাবজাত শক্তি বলেই ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধ করে? হংস-শাবক অণ্ড হইতে বাহির হওয়া মাত্রই পুষ্করিণীর দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু মানব শিশুতো তাহা করে না এবং করিতে পারে না। সুতরাং হংস-শাবক স্বভাবজাত শক্তি বলে যাহা কিছু করিবে মানব শিশু যে তাহাই করিবে এমত হইতে পারে না। আবার মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই ক্ষুধার উদ্রেক মতে মাতৃস্তনের দিকে উন্মুখ হয়। কিন্তু তখন কি উহার ঈশ্বর জ্ঞানও জন্মিয়া থাকে? তাহার ঈশ্বর জ্ঞান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই উৎপন্ন হয়, না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সমুচিত উপদেশ পাইলে জন্মিয়া থাকে? যদি ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই উৎপন্ন হয় এবং তাহা উহার প্রকৃতিতেই নিহিত থাকে, তবে কোন কোন মনুষ্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অতিক্রম করে কি রূপে? বাস্তবিক ঈশ্বর জ্ঞান যদি মনুষ্যের স্বভাবজাতই হয় তবে ইহা লইয়া তর্কই বা চলিতেছে কেন এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুই বা "মানবীকরণ" নামক প্রবন্ধ লিখিলেন কেন?

[ঈশ্বর-জ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবসিদ্ধ—ইহা সত্য। কিন্তু মনুষ্য আপনার স্বভাবের বিপরীতে চলিতে পারে এবং অনেক সময়ে চলেও। অনেক সময়ে মনুষ্য গোঁ'য়ের বা প্রলোভনের বা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া সোজা পথ থাকিতেও বাঁকা পথ অবলম্বন করে। শ্রী দ্বি]

আবার যে কেবল সভ্য জাতিতেই কোন কোন মনুষ্যের ঈশ্বর বিশ্বাস থাকে না এমত নহে, পৃথিবীতে এরূপ জাতীয় মনুষ্যও দেখা যায় যাহাদের ঈশ্বর-জ্ঞান এককালেই নাই। মেং গার্ডনার নামে কোন ইংরেজ ট্পাই নামক জুলুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "সূর্য্য এবং বৃক্ষগণকে কে সৃজন করিয়াছেন এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্ত এবং বৃক্ষগণের বৃদ্ধি কাহার কর্ত্তৃত্বে সম্পন্ন হয়, তাহা তুমি বলিতে পার?" ট্পাই উত্তর করিয়াছিলেন "আমরা উহাদিগকে দেখি বটে, কিন্তু উহারা কি রূপে আসে তাহা আমরা বলিতে পারি না; আমরা অনুমান করি যে উহারা আপনা হইতেই আসে।" অতএব ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধি করা যদি মনুষ্যের স্বভাবজাতই হয়, তবে তাহা জুলুদিগের নাই কেন? কেবল যে জুলুদিগেরই ঈশ্বর জ্ঞান নাই এমত নহে, আরও অনেক জাতি আছে যাহারা ঈশ্বর বিষয়ে জুলুদিগের সদৃশ। যথা, আণ্ডামানবাসী, মধ্য আসিয়ার কাফ্রি ও বুচানৈন জাতি, ইত্যাদি।

[এই বিষয় উপলক্ষে স্পেন্সর অনেক অনুসন্ধানের পর ঠিক্ ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। স্পেন্সর প্রমাণ করিয়াছেন যে, অনেক স্থলেই এইরূপ ঘটে যে, পাদ্‌রী সাহেব বলেন এক—অসভ্য বেচারী বুঝে আর; আবার অসভ্য-বেচারী বলে এক—পাদ্‌রী সাহেব বুঝেন আর। যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, পক্ষীর উড্ডয়ন কার্য্য কাহার কর্ত্তৃত্বে সম্পন্ন হয়, তবে আমিও এইরূপ উত্তর দিই যে, পক্ষী আপনা-আপনিই উড়ে। তিনি যে আমাকে মূল-কারণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তাহা আমি কিরূপে বুঝিব? শ্রী দ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবু যে অন্ধকার বর্ত্তমানে আলোক দর্শন ও ক্ষুধার উদ্রেকে অন্ন-ভোজনের ইচ্ছার সহিত ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধির তুলনা করিয়াছেন তাহার যৌক্তিকতাও তদ্রূপ। কারণ আলোক দর্শন ও অন্ন ভোজনের ইচ্ছা এক কথা এবং ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধি অন্য কথা। অন্ধকার ও ক্ষুধা উপস্থিত হইলেই যে যথাক্রমে আলোক দর্শন ও অন্ন ভোজনের ইচ্ছা জন্মে ইহা মনুষ্যের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহাতে ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধি স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধি যেমন স্বতন্ত্র বিষয় তেমন তাহা স্বতন্ত্ররূপেও প্রমাণ সাপেক্ষ। পরন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবু মানবী করণের ৬ পরিচ্ছেদে যে বলিয়াছেন "ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মনুষ্য কিছু আর তত্ত্বজ্ঞানী হয় না,—জ্ঞানোপার্জ্জন মনুষ্যের প্রযত্ন সাপেক্ষ" ইহা ঈশ্বরের পূর্ণতা উপলব্ধি সম্বন্ধে বর্ত্তিতে পারে কি না? যদি বর্ত্তিতে পারে তবে দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিজের

উক্তিই নিজের বিরুদ্ধে যাইতেছে। আর যদি বর্ত্তিতে না পারে, তবে ইহা না বর্ত্তিবার কারণ কি ?

[“ঘটনা মাত্রেরই কারণ আছে” “পূর্ণ সত্তা অপূর্ণ সত্তার আশ্রয়-সাপেক্ষ” ইত্যাদি সার্ব্ব-ভৌমিক তত্ত্ব-সকল প্রথম প্রথম মনুষ্যের জ্ঞানাভ্যন্তরে প্রসুপ্ত ভাবে কার্য্য করে—কিন্তু তাহার অনেক পরে মনুষ্য তাহা রীতিমত জ্ঞানে আয়ত্ত করে। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের প্রসুপ্ত অবস্থাই শিশুর স্তন-পান প্রভৃতি নৈসর্গিক সংস্কারের সহিত উপমেয়—তাহার বিকাশ অবস্থায় তাহা রীতিমত জ্ঞানালোকে উত্থিত হয়। ক্ষুদ্র বালক ব্যাকরণ পড়ে নাই অথচ ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কথা কহে—“আমি যা’বে” না বলিয়া “আমি যা’ব” বলে,—এ একরূপ ব্যাকরণ জ্ঞান ; কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্র যখন বলে যে, আমি যা’ব, তখন সে মনে মনে জানে যে, “আমি” কর্ত্তা, “যা’ব” ভবিষ্যৎ ক্রিয়া—এ আর একরূপ ব্যাকরণ-জ্ঞান ; এ দুয়ের মধ্যে যেরূপ বিকাশের তারতম্য, শিক্ষিত ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান এ দুয়ের মধ্যেও সেইরূপ। কিন্তু দুই অবস্থাতেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নিজেই নিজের প্রমাণ, তাহার দ্বিতীয় কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, চাসাই হউক্ আর পণ্ডিতই হউক্—এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে হইলে বিনা প্রয়োজনে সোজা পথ থাকিতে কেহই বাঁকা পথ দিয়া গমন করে না ; অথচ “দুই বিন্দুর মধ্যে সরল রেখাই সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্ব পথ” এ কথা শুনিলে চাসা তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। এ যেমন—তেমনি অপূর্ণ জগতের মূলে এক পূর্ণ সত্য বর্ত্তমান ইহা সকল মনুষ্যেরই জ্ঞানাভ্যন্তরে নিগূঢ় রূপে জাগিতেছে ; কিন্তু উহাকে রীতিমত জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে হইলে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করা আবশ্যক। এস্থলে এইটি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক যে, “সরল রেখা কেন হ্রস্বতম রেখা” ইহার যেমন দ্বিতীয় কোন প্রমাণ নাই, “অপূর্ণ সত্য কেন পূর্ণ সত্য-সাপেক্ষ” ইহারও তেমনি দ্বিতীয় কোন প্রমাণ নাই ; উভয়ই আপনি আপনার প্রমাণ। শ্রীদ্বি]

দ্বিজেন্দ্র বাবু তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে “অপেক্ষা করে” শব্দ চারি কথা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন। আমরা প্রতিবাদ কালে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি বাঙ্গলায় উত্তর না দিয়া একটী ইংরেজি বাক্য বলিয়াছেন। আমরা তদ্রূপ বাক্যের উল্লেখ এবং তদ্রূপ কথার বিচার দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বর্ট স্পেন্সরের “ফার্ষ্ট প্রিন্সিপল্‌স্” নামক গ্রন্থে দেখিয়াছি। দ্বিজেন্দ্র বাবু যখন ঐ সমস্ত বিষয়কে “কঠোর জ্ঞানের কথা” বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আমরা তাহার সমালোচন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা এই জানিতে চাই যে, স্পেন্সরের প্রদর্শিত যুক্তির অতিরিক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুর কোনও কথা বলিবার আছে কি না ? যদি থাকে তবে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন। পরন্তু আমাদের আরো একটী কথা বলি-

বার আছে। যদি আমাদিগকেই স্পেন্সরের যুক্তি উল্লেখ করিয়া তাহার আলোচনা করিতে হয়, তবে আমরা তাহা বিস্তৃত রূপে বর্ণন করিব না, কেবল আমাদের নিজের কথাই অধিক বলিব। যদি দ্বিজেন্দ্র বাবু নিজে স্পেন্সর কি অন্য কাহার যুক্তি প্রদর্শন করেন তবে ভারতীর পাঠকগণের তাহা বিস্তারিত রূপে জানিবার সুবিধা হইবে। অন্যথা আমরা যাহা কিছু সংক্ষেপে বর্ণন করিব তাহাতেই পাঠকগণকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

["Correlative smutually imply each other" এ কথা, স্পেন্সার বলিয়া থাকেন ভালই—না বলিয়া থাকেন তাহাতেও কাহারও কোন ক্ষতি নাই—কেননা উহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বল ব্যক্তি-বিশেষ হইতে আইসে না—তাহা জ্ঞানের মূল-প্রদেশ হইতে আইসে। শ্রীদ্বি]

চতুর্থ পরিচ্ছেদের উল্লিখিত বিষয়ের সহিত আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের কোনও সম্পর্ক নাই। এজন্য আমরা তাহার আলোচনা করিলাম না। তৎপর পরিচ্ছেদ গুলিতে এত কথা ও এত বিষয় উক্ত হইয়াছে যে তাহার আলোচনা করিতে গেলেই স্বতন্ত্র প্রস্তাব আবশ্যক। এজন্য সম্প্রতি আমরা তাহারও আলোচনা করিব না।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

যমক এবং বহুসঙ্গিক তারকা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা তারকাদিগের দুইরূপ গতির কথা উল্লেখ করিয়াছি; এক দৃশ্যতঃ গতি—পৃথিবীর গতি-বশত যাহা উৎপন্ন হয়, আর এক বাস্তব গতি—যাহা তাহাদিগের কোন এক দূর-লক্ষ্যাভিমুখী নিজ গতি। এই দুইটি গতি ছাড়া কতকগুলি তারকার আবার আর একরূপ গতি আছে। আকাশে এমন কতকগুলি তারা আছে—স্বাভাবিক চক্ষে দেখিলে যাহাদের এক একটি মাত্র বলিয়া মনে হয়—কিন্তু দূরবীন দ্বারা সেই এক একটি আবার দুইটি, তিনটি, চারিটি কোন কোন স্থলে আরো অধিক সংখ্যা-বিশিষ্ট বলিয়া প্রকাশ পায়। আমাদের সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহগণ যেমন সূর্য্যের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, উক্তরূপ বহু-সঙ্গিক তারকাগণ সেইরূপ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে। তবে গ্রহগণ যত অল্পকালে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে উক্ত তারকাদিগের পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সময় লাগে, কেননা যদিও তাহাদের এক একটিকে পরস্পরের নিতান্ত কাছাকাছি বলিয়া মনে হয় তথাপি বাস্তবিক পক্ষে

তাহারা একটির নিকট হইতে অন্যটি অনেক দূরে। সর্ব্বাপেক্ষা যে যমক তারার প্রদক্ষিণ সময় অল্প তাহারা ৩৬ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে।

চিত্র।

যমক তারার কক্ষ

আমরা উপরে যমক তারার কক্ষের একটি চিত্র প্রদান করিলাম। ইহারা পরস্পরে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, আবার সম্ভবতঃ আমাদের সূর্য্যের ন্যায় ইহাদের প্রত্যেকটির আবার স্বতন্ত্র গ্রহ উপগ্রহ আছে, এবং সেই গ্রহ উপগ্রহগণ একটি সূর্য্যের পরিবর্ত্তে এই দুইটি সূর্য্যের আলোক উত্তাপ পাইতেছে, এক কথায় এই গ্রহ জগৎ দুই সূর্য্যের দ্বারা চালিত হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, যদি এই তারকা দুইটি ভিন্ন বর্ণের হয় (তারকাদিগের সকলের বর্ণ একরূপ নহে,) তবে সেই গ্রহগণ দুইরূপ বর্ণের আলোকে আলোকিত হইয়া কি অপরূপ দৃশ্য ধারণ করিয়াছে!

লাইরা রাশির পঞ্চম নক্ষত্রটি অর্থাৎ ঙ-লাইরাটি প্রকৃত পক্ষে চারিটি তারার সমষ্টি। এই তারাটি স্বাভাবিক চক্ষে দেখিলে একটি মিটমিটে তারা বলিয়া মনে হয়—কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দূরবীণ দ্বারা—এমন কি একটি অপেরা গ্লাস দিয়া দেখিলেও এই একটির স্থলে দুইটি তারা ধরা পড়ে—আর একটি ক্ষমতাশালী দূরবীনের চক্ষে আবার এই দুইটির প্রত্যেকটি এক একটি যুগল বলিয়া প্রকাশ পায়। সেই জন্য এই তারাটি যমক-যুগল নামে অভিহিত।

চিত্র।

লাইরা রাশির যমক-যুগল তারকা।
১ অপেরাগ্লাসে এইরূপ দেখা যায়।
২ ছোট দূরবীনে এইরূপ দেখা যায়।
৩ বড় দূরবীনে এইরূপ দেখা যায়।
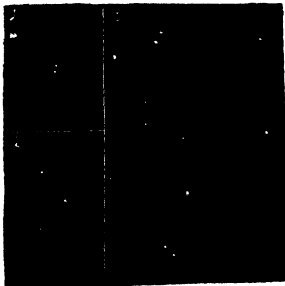
একই সূর্য্য অবলম্বন করিয়া আমাদের সৌর জগৎ—প্রণালী চলিতেছে, এইখানে আমরা চতুঃসূর্য্য-অবলম্বিত জগৎ প্রণালী দেখিতেছি। এই চতুঃসূর্য্যের এক একটি যুগলের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ভাবে স্ব-যুগলের মধ্যস্থিত কেন্দ্র বিন্দু অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, আবার এক একটি যুগল যুগলভাবে উভয় যুগলের মধ্যস্থিত কেন্দ্র বিন্দুকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

এই দুই যোড়া নক্ষত্রের মধ্যে যে যোড়ার নক্ষত্র দুইটি অপেক্ষাকৃত ঘেঁসাঘেসি করিয়া আছে সেই যোড়াটির প্রত্যেকে অনুমান ১০০০ বৎসরে এবং দূর-সন্নিবিষ্ট যোড়াটির প্রত্যেকে ইহার দ্বিগুণ সময়ে একবার স্বকক্ষ আবর্ত্তন করে—আর ১০ লক্ষ বৎসরের কিছু কম সময়ে প্রত্যেক যুগল তাহাদের বৃহত্তর কক্ষ একবার পরিভ্রমণ করে।

জ্যোতির্ব্বিদগণ ৬ হাজারের অধিক যমকতারা আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে

৭০০ তারার গতি তাঁহাদের গণনায়ত্ত হইয়াছে, কতকগুলি অত্যন্ত দ্রুতগামী। কতকগুলি যমক তারার দুইটি তারাই প্রায় সমান উজ্জ্বল, আবার কতকগুলির অন্যরূপ। এমন কি কখনো কখনো একটি প্রথম শ্রেণীর তারকার একটি চতুর্দ্দশ শ্রেণীর তারকাও সঙ্গী দেখা যায়। সিরিয়াস নক্ষত্রের অন্ততঃ এইরূপ একটি সঙ্গী আছে। নিম্নে কতকগুলি যমক তারার প্রদক্ষিণ কালের তালিকা প্রদত্ত হইল।

				বৎসর।
হারকিউলিস রাশির-য *	...	...	...	৩৬
করোণা-বরিয়ালিসের-ঙ	...	...	...	৪৩
কর্কট রাশির-য	...	...	...	৬০
সেণ্টরাস রাশির-ক	...	...	...	৭৫
সিংহ রাশির-ঙ	...	...	...	৮২
করোণা-বরিয়ালিসের-ছ	...	...	...	১০০
সিগনাস রাশির-ঘ	...	...	...	১৭০
সিগনাস রাশির-খ	...	...	...	৫০০
সিংহ রাশির-ছ	...	...	...	১২০০

আকাশের দিকে চাহিলে স্বাভাবিক চক্ষে অনেকগুলি তারকাকে যমক তারা বলিয়া মনে হয়,—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা যমক নহে—পরস্পর বহুদূরে অবস্থিত, কেবল এক সমরেখায় বর্ত্তমান বলিয়া পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে যমক বলিয়া মনে হয়—সেই জন্য ইহাদিগকে দৃশ্যতঃ যমক বলা যায়। আর যথার্থ ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ যমক তারকাগণ প্রকৃত-যমক নামে অভিহিত। যমক তারাদিগের পরস্পর দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারিলেই জ্যোতির্ব্বিদগণ ইহাদের প্রদক্ষিণ কাল প্রভৃতি নির্ণয় করিতে পারেন।

সিগনাস রাশির একটি যমক তারার পরস্পর দূরত্ব ৪,২৭৫,০০০,০০০ মাইল, কিন্তু তথাপি স্বাভাবিক চক্ষে দুইটিকে এক বলিয়া মনে হয়।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

* গত সংখ্যক ভারতীর তারকা-রাশি নামক প্রবন্ধ দেখ।

ধূমকেতুর প্রতি সন্ধ্যা।

(১)

কেতুমি আলোকবালা আসিতেছ ধীরে ধীরে,
উড়ায়ে আঁচল ধ্বজা কিরণ মুকুট শিরে!
হৃদে ধর কত আশা,
প্রাণে কত ভালবাসা,
কার মুখ চেয়ে চেয়ে
নেচে নেচে ধেয়ে ধেয়ে,
দিশাহারা শূন্য পথে ছুটিতেছ ঘুরে ফিরে?

(২)

অতি দূর দুরান্তরে কোথায় প্রবাসে ছিলে,
কতদিন পরে পুনঃ দেখা দিতে ফিরে এলে?
হাসি হাসি মুখখানি,
উড়ায়ে আঁচলখানি,
শত দ্বারী গ্রহগণে,
ভুলাইয়ে প্রলোভনে,
ঘূর্ণমান চক্রপথ লংঘিলে গো কি কৌশলে?

(৩)

চারিদিগে গ্রহগণ ফিরিতেছে থরে থরে,
মধ্যে পুরী মনোহরা, সূর্য্য তাহে বাস করে,
সে পুরীর অধীশ্বর
বিকাশি সহস্র কর,
চারিদিক পানে চেয়ে
ডাকিছেন গেয়ে গেয়ে,
"অন্ধকারে কে আছিস্ আয় আলোকের ঘরে"

(৪)

কি মোহে ভুলিছ বালা! দেখিছনা চোক্ মেলে!
ওতোর প্রেমের নিধি হৃদে আছে বহ্নিজ্বেলে
গিয়ে সে বহ্নির মাঝে
পুড়ে যে মরিবি তেজে,
তবে কেন, বল মেয়ে,
আসিতেছ ধেয়ে ধেয়ে?
এসেছ যদিবা তবে দূর হতে এস চলে।

(৫)

দুরন্ত গ্রহেরা সবে, এস সাবধান ভরে;
তা'রা যত চাঁদগণে পথে পেয়ে রাখে ধরে।
দেখো যেন তোমারেও
ধরিয়া না রাখে কেও,
সময় বুঝিয়া তুমি
লঙ্ঘিয়া তাদের ভূমি;
এস সখি কাছাকাছি এস হৃদয়ের পরে!

(৬)

অসীম আকাশ মাঝে মিশাইলি আলোরাশি,
কোথায় কোথায় তোর সে মোহন মৃদুহাসি!
হতাশে চৌদিকে চাই,
আর না দেখিতে পাই,
শূন্যপথে শূন্যমনে,
গেলি চলি কার সনে,
আর কি দিবিনে দেখা তৃষিতেরে হেথা আসি?

(৭)

কচি মেয়ে, পথভুলে কোন পথে গিয়েছিলি?
কেতোরে নিকটে পেয়ে রয়েছে পথআগুলি,
হৃদয়ে আগুন জ্বেলে
কোথায় গেলিরে ফেলে
চিরতরে আর কিরে,
দেখিতে পাবনা ফিরে?
ও আঁলো মহিমা খানি কেমনে রহিব ভুলি!

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নবাব সাদত আলি খাঁর কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আসফ উদ্দৌলার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সম্বন্ধে গুটিকত-কথা না বলিলে পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি হৃদয়ঙ্গম করান কঠিন হইবে, সুতরাং চুণারের সন্ধির পর হেষ্টিংস তাঁহার সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন ও লর্ড কর্ণওয়ালিস আসিয়া কি প্রকারে হেষ্টিংসকৃত অত্যাচারের সম্ভব মত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, তাহা অতি সংক্ষেপে বুঝাইব।

চুণারের অস্থায়ী সৈন্য দল স্থানান্তর করা সম্বন্ধে হেষ্টিংস সাহেব, নবাব আসফ উদ্দৌলার সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার সকল স্বত্ব রক্ষা করিয়া চলেন নাই। ইতস্ততঃ করিয়া পরবর্ত্তী দুই এক বৎসর কাটাইয়া দিয়া হেষ্টিংস সাহেব বাঙ্গালার শাসন দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন—ভবিতব্য যেন তৎকৃত সমস্ত অত্যাচারের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের জন্যই তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া চলিল।

এবারে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া ভারতে আসিলেন। অযোধ্যার ব্যাপার সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ কবিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন-কর্ত্তারা যে নানা উপায়ে, বিভিন্ন দাবি দাওয়ায় অযোধ্যার স্বর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তার বুঝিতে আর বিলম্ব রহিল না। নবাব উজীর ১৭৭৫ সালের সন্ধির স্বত্বানুযায়ী বৎসরে একত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার ও ১৭৮১ সালের সন্ধির স্বত্বানুযায়ী বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা কোম্পানিকে দিতে প্রতিশ্রুত ও বাধ্য ছিলেন ; কিন্তু গত নয় বৎসরের এই দুই সন্ধির স্বত্বাদি না মানিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীরা তাঁহার নিকট হইতে নানা উপলক্ষে বৎসরে ৮৫ লক্ষ টাকা হিসাবে আদায় করিয়া লইয়াছেন *। সুতরাং ন্যায়পরায়ণ কর্ণওয়ালিস্ নবাবের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিয়া এই সকল অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে মনঃস্থির করিলেন।

Temporary Brigade অযোধ্যা হইতে স্থানান্তরিত করানই নবাবের প্রধান উদ্দেশ্য। কর্ণওয়ালিস্‌কে,এই মর্ম্মে তিনি ইতিপূর্ব্বেই একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। অস্থায়ী

---

* সুখের বিষয় এই—অত্যাচারী হেষ্টিংসও অযোধ্যার প্রতি কোম্পানির অন্যায়াচরণের কথা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন "The number, influence, and enormous amount of salaries, pensions, emoluments of the Company's service—Civil and Military—in the Vizir's service have become an intolerable burden, upon the Revenue and authority of His Excellency"। মনে মনে এত বুঝিয়াও হেষ্টিংস অযোধ্যা সম্বন্ধে সুবিচার করেন নাই, ইহাতে তাঁহার যথেচ্ছাচারিতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

সৈন্য দল স্থানান্তর করার সম্বন্ধে গবর্ণর সাহেব অনেক অসুবিধা দেখিলেন, কিন্তু অন্য উপায়ে নবাবের ব্যয়ভার লাঘব করিতে ছাড়িলেন না। তাঁহার মতে "অস্থায়ী সৈন্য দল একেবারে অযোধ্যা হইতে উঠাইয়া লইলে নবাবের রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতে পারে, ইংরাজ সৈন্য নবাবের নিজ পালিত সৈন্য অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত সুতরাং ইহাদের ব্যয়ভার কমাইয়া দিলেই নবাবের বিশেষ উপকার করা হইল। এ পর্য্যন্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয়বিধ সৈন্যর পরিপোষণার্থে নবাবকে বাৎসরিক ৮৪লক্ষ টাকা ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছিল। কিন্তু অতঃপর এ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে ৫০ লক্ষের উপর এক কপর্দ্দকও দাবি দাওয়া করা হইবে না। তবে ইহাও বলা রহিল প্রয়োজনানুসারে নবাবের কার্য্যের জন্য এই ব্রিটিশ্ সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া বা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। যখন বাড়ান হইবে তখন নবাব বাড়ানর হার অনুসারে স্বীয় সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া দিতে পারিবেন।" এই বন্দোবস্ত সর্ব্বাংশে সুখপ্রদ না হইলেও বাৎসরিক ত্রিশ লক্ষ টাকা বায় কমাইয়া কর্ণওয়ালিস্ সাহেব যে নবাব উজীরের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

অযোধ্যার আভ্যন্তরিণ শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কোম্পানী যে নবাবের প্রভূত অনিষ্ট করিয়াছেন, দূরদর্শী কর্ণওয়ালিস্ ইহাও বেশ বুঝিলেন। এ বিষয়ের নূতন বন্দোবস্ত করিয়া তিনি নবাবকে লিখিলেন "বর্ত্তমানে আপনার রাজ্যে একজন রেসিডেণ্ট রাখা হইল, ইনি আপনার আভ্যন্তরিণ শাসন কার্য্যে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। অনেক ইংরাজ ব্যবসায়ী কোম্পানীর দোহাই দিয়া বিনা শুল্কে অযোধ্যায় বাণিজ্য করিবার জন্য রেসিডেণ্ট বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কোম্পানীর সহায়তায় আপনার নিকটে ছাড় লইয়া থাকে, ইহাতে অযোধ্যা সরকারের যথেষ্ট রাজস্ব হানি হয়। এবার রেসিডেণ্টকে দৃঢ় উপদেশ দেওয়া হইল যেন তিনি এপ্রকার ছাড়ের জন্য ভবিষ্যতে আপনাকে কোন প্রকার অনুরোধ না করেন। মোট কথা যাহাতে অযোধ্যার আভ্যন্তরিণ শাসন কার্য্যে সকল বিষয়ে আপনার হাত থাকে ও আপনার নিযুক্ত মন্ত্রীগণের ক্ষমতা ও উপদেশ অব্যাহত থাকে, রেসিডেণ্টকে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আপনার সরকারের বিরুদ্ধে স্বার্থ সিদ্ধি উদ্দেশ্যে অনেক লোকে আমাদের পত্রাদি লিখিত, এখন হইতে সে প্রকার পত্রাদিতে কোম্পানী কোন প্রকার মনোযোগ দিবেন না। কোম্পানীর নিকট আপনার যাহা বকেয়া দেনা আছে তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ ছাড়া বাকী অংশ আমরা ছাড়িয়া দিলাম। ইত্যাদি" †

---

† Papers relating to the East Indies printed by order of the House of Commons in 1806 No 2. PP. 1—14.

নবাব সাহেবও যে রাজকার্য্য সম্বন্ধে কোম্পানীর হস্তক্ষেপে অতিশয় বিরক্ত ও ভগ্ন হৃদয় হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি হইতে বেশ প্রমাণ হয়। কর্ণওয়ালিসের সহিত সাক্ষাৎ কালে তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন "As long as the

কিন্তু অবিশ্রান্ত সুখ ভোগ বিধাতা হতভাগ্য আসফের অদৃষ্টে লিখেন নাই। বিড়ম্বনা প্রতিপদেই তাঁহাকে ভ্রুকুটি বিস্তার করিয়া বিদ্রূপ করিতেছিল। লর্ডকর্ণওয়ালিস্ তাঁহার সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে মনের শান্তি দিয়াছিলেন ইহাতে অযোধ্যার শ্মশানময়ী ভাব দূর হইয়াছিল, অযোধ্যা পুনরায় শস্যশালিনী হইয়া হাসিতেছিল, প্রজার মুখে সুখের ছায়া পড়িয়াছিল, নবাব সাহেবও প্রসন্ন চিত্তে মনোনীত মন্ত্রী নিয়োগে বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজ্যের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শোর সাহেব তক্তে বসিয়া বিসদৃশ কল্পনায় মনকে চালিত করিলেন। নবাবের এ স্বচ্ছন্দতা, এ প্রফুল্ল মুখ তাঁহার সহ্য হইল না, নূতন তক্তে বসিলেই ত একটা সন্ধি করিতে হইবে সুতরাং তিনি অযোধ্যার রাজকোষের উপর নূতন ভার চাপাইবার জোগাড় করিতে লাগিলেন। এক-দল বিলাতি অশ্বারোহী ও একদল দেশীয় সৈন্য পুনরায় নবাবের স্কন্ধে চাপাইবার প্রস্তাব পাঠান হইল। এ প্রস্তাবে দুর্ভাগ্য আসফ মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, ক্রোধবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন—বলিয়া পাঠাইলেন "আমার সহিত আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাই চিরস্থায়ী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে সুতরাং ইহার উপর আমি আর এক কপর্দ্দকও দিতে স্বীকৃত নহি"। কিন্তু শরতের মেঘের ন্যায় নবাবের গর্জ্জন কোন ফল প্রসব করিল না, শোর তাহাতে দমিলেন না "সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" পন্থার অনুগামী হইয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন, দুগ্ধ দিবার সময় গাভী প্রায়ই ইতস্ততঃ হাত পা ছুড়িয়া থাকে, কিন্তু বাঁধিয়া ছাঁদিয়া লইলে তাহা হইতে কোন বিপদাশঙ্কা নাই, সুতরাং ছাঁদন দড়ি খুঁজিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহারাজা ঝাউলাল নবাবের প্রধান মন্ত্রণাদাতা, শোর এই দুষ্ট হিন্দুকে অনর্থের মূল ভাবিয়া তাঁহাকে একবারে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। কর্ত্তব্য পরায়ণ হিন্দুরাজা প্রভুভক্তি দেখাইতে গিয়া ইংরাজের হস্তে বন্দী হইয়া ইংরাজ রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন। নবাব এ সম্বন্ধে অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু কে শুনিবে?

১৭৯৭ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে শোর সাহেব লক্ষ্ণৌ উপস্থিত হইলেন। ভয় প্রদর্শনে বা

demands of the English Government upon the revenue of Oudh should remain unlimited, I could have no interest in establishing any system of economy, whilst the English should continue to interfere in the internal Government of my country, it would be in vain for me to attempt my salutery reform—for my subjects know I am only a cipher in my own dominions, and therefore laughed at and despised for my vain authority and that of my ministers." লর্ড কর্ণওয়ালিস্ যদিও অনেকাংশে নবাবের এই চির-সঞ্চিত বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শোর সাহেব তক্তে বসিয়া তাহার সমস্ত উল্টাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রলোভনে নবাবকে নূতন সন্ধিতে প্রবৃত্ত করানই এ যাত্রার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য নবাব ইহাতে পরিশেষে সম্মতি দান করিলেন।

নবাবের আভ্যন্তরিণ শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া শোর সাহেব আরও একটু বাহাদুরী দেখাইলেন। এ পর্য্যন্ত মন্ত্রী নিয়োগ নবাবের ইচ্ছানুসারেই হইতেছিল কিন্তু ইংরাজ গবর্ণর এইবার তাহাতে বাধা দিলেন। হায়দর বেগ অনেক দিন পূর্ব্বে কবরস্থ হইয়াছিলেন, নবাবের নজর ছিল আলমাস্ আলি খাঁর উপর। আলমাস আলি একজন সুদক্ষ,তীক্ষ্নদর্শী, কর্ত্তব্যপরায়ণ উজীর ছিলেন। স্বনামখ্যাত কর্ণেল শ্লিমান নিজে এই ব্যক্তির অনেক প্রসংশা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন "অযোধ্যা যে সমস্ত ক্ষমতাপন্ন ও যোগ্য লোক প্রসব করিয়াছিল, আলমাস্ আলি তাহার মধ্যে একজন। তাঁহার আমলে বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকা সরকারের আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, শ্মশানময়ী অযোধ্যাকে তিনি উদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন, প্রজার রক্ষণাবেক্ষণে তিনি পিতার ন্যায় যত্ন করিতেন, তালুকদারদের ক্ষমতায় বাধা দিয়া লোধ, কুর্ম্মী,রূচ্ প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর প্রজাগণকে প্রশ্রয় দিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার শাসনকাল অযোধ্যার সত্যযুগ (Golden age) বলিয়া কথিত হইত"। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সার জন শোর এই যোগ্য ব্যক্তিকে ঠেলিয়া রাখিয়া নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাফুজ্জল হোসেন নামক নিজ মনোনীত এক ব্যক্তিকে তাঁহার মন্ত্রী করিয়া দিলেন। তাফুজ্জল হোসেনকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত না করিয়া যদি এই সময়ে আলমাস্ আলিকে দরবারে রাখা হইত, তাহা হইলে বোধ হয় অযোধ্যা সম্বন্ধে বর্ত্তমান শোচনীয় পরিবর্ত্তন দেখা যাইত না। যাহা হউক এ কার্য্যে ইংরাজ গবর্ণরের জেদই বজায় রহিল; যাঁহার রাজ্য,যাঁহার প্রজা, যাঁহার সম্পত্তি, তিনি ইহাতে কোন আপত্তি করিতে পাইলেন না।

এই অস্বাভাবিক ঘটনার দুইটি শোচনীয় ফল ফলিল—প্রথমতঃ অযোধ্যার শাসন কার্য্যে নবাবের ক্ষমতা সম্পূর্ণ কমিয়া আসিল, তাঁহার রাজকোষ আরও ভারগ্রস্ত হইল; দ্বিতীয়তঃ নবাব আসফ্ উদ্দৌলা ইহাতে যথেষ্ট মর্ম্ম পীড়া পাইলেন। এই মর্ম্ম পীড়ায় তাঁহার উৎকট রোগ জন্মিল, পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, হাকিম ঔষধ পাত্র লইয়া নবাবের মুখে দিতে গেলেন, নবাব নিবারণ করিয়া বলিলেন "হাকিম সাহেব কেন বৃথা চেষ্টা পাইতেছ, ভগ্নহৃদয়ের আবার চিকিৎসা কি"। ইহার পরই তাঁহার প্রদাহ জর্জ্জরিত রাজদেহ ইমামবাড়ীর সুশীতল মর্ম্মর প্রস্তর-রচিত সমাধিতলে চির বিশ্রাম লাভ করিল। রাজ্যেশ্বর হইয়াও তিনি যে সমস্ত কঠোর যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, যে সমস্ত কঠোর পরীক্ষা তাঁহার উপর দিয়া গিয়াছিল, সমাধিস্থ হইয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

নবাব আসফ্ উদ্দৌলার সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিলাম। ইংরাজ তাঁহাকে যতই কাল-রঙ্গে চিত্রিত করুন না কেন, তাঁহাকে যতই অসার বিলাসপরায়ণ বলিয়া

বিদ্রূপ করুন না কেন, আমরা বলিতে চাই—যে হৃদয়ে অতদূর দয়া দাক্ষিণ্যাদি বিরাজিত ছিল,যে নাম গাইয়া পথে ভিখারীরা অর্থোপার্জ্জন করিত,যে নাম স্মরণ করিয়া হিন্দু-বণিক প্রাতে দোকানের ঝাঁপ খুলিত, যাঁহার মৃত্যুতে প্রজাগণ যথেষ্ট শোকসন্তপ্ত হইয়াছিল, যিনি হিন্দু মুসলমানে ভেদ জ্ঞান করিতেন না, তিনি যে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিলে উচ্চদরের শাসনকর্ত্তা হইতে পারিতেন না, ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আসফ কবে মরিয়াছেন, কিন্তু আজও আমাদের কাণে বাজিতেছে "যিস্কো না দে মৌলা—উস্কো দে আসফ উদ্দৌলা"।

নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর লর্ড টেন্‌মাউথ (শোরসাহেব) তাঁহার একমাত্র পুত্র উজীর আলিকে সিংহাসনে বসাইলেন। উজীর আলি স্বভাবতঃই ইংরাজ বিদ্বেষী ছিলেন—সুতরাং তিনি অধিক দিন মস্‌নদে বসিতে পারিলেন না। তাফুজ্জল হোসেনের প্ররোচনায় লর্ড টেন্‌মাউথ তাঁহাকে একবার সিংহাসনে বসাইয়া পুনরায় জারজতা দোষ বাহির করাইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। অযোধ্যার শূন্য সিংহাসনে সুজার অন্যতম পুত্র মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদত আলি খাঁ ইংরাজ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া শোভা পাইলেন। আর হতভাগ্য উজীর আলি পেন্সন ভোগী হইয়া—বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এই স্থানেই তিনি ইংরাজ রেসিডেণ্ট চেরি সাহেবকে হত্যা করিয়া স্বীয় নাম কলঙ্কিত করিয়াছিলেন।

চেরি সাহেবের হত্যাকাণ্ডের বিষয় জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে, সুতরাং সে সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। উজীর আলিকে অযোধ্যার সিংহাসন হইতে বঞ্চিত ও বারাণসীতে নির্ব্বাসিত করিয়াও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত চিত্ত হইলেন না। অযোধ্যার অত নিকটে উজীর আলি মনঃক্ষুন্ন অবস্থায় থাকিবেন, অথচ কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না, ইহা তাঁহাদের আদৌ বিশ্বাস হইল না—সুতরাং তাঁহাকে কলিকাতায় আনিবার পরামর্শ স্থির হইল। উজীর আলি অবশ্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না—অনেক আপত্তি, ও অনুনয় বিনয় করিলেও গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ রহিলেন। উজীর আলি মনে মনে প্রতিহিংসার মতলব আঁটিলেন।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে কোন বিশেষ কারণে বারাণসীর রেসিডেণ্ট চেরি সাহেবের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ করিবার বন্দোবস্ত থাকে। চেরি বেনারস সহর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে শিকরোলের সীমা মধ্যে বাস করিতেন। নবাব স্বীয় পারিষদবর্গ লইয়া তাঁহার সহিত কথামত দেখা করিতে গেলেন। প্রথমতঃ আদব কায়দা সম্ভাষণাদি দস্তুরমত শেষ হইল—পরে উজীর আলি চেরি সাহেবকে স্বীয় দুঃখ কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। এই কাহিনী দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করাই হইতেছিল, ক্রমশঃ নবাব সাহেবের ভাষা রুক্ষভাব ধারণ করিল, তিনি সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন দেখিয়া চেরি সাহেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন "আপনার এ

শোচনীয় পরিণামের জন্য আমি দায়িক নহি—আমার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই—সুতরাং এবিষয়ে আমায় অনুযোগ করা বৃথা” এই কথা শেষ না হইতে হইতেই নবাব সহসা অসিকোষ মুক্ত করিয়া চেরি সাহেবকে আঘাতিত করিলেন। নবাবের ইঙ্গিতে তাঁহার সঙ্গীগণও সকলেই তরবারি খুলিয়া বসিল—চেরি বিপদ্ বড় সহজ নয় দেখিয়া গবাক্ষ পথে পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে নবাবের জনৈক অনুচর তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিয়া তাঁহার বক্ষে আমূল বসাইয়া দিল। চেরির জীবন বায়ু এই আঘাতেই দেহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সেই ঘরে আরও দুইজন ইংরাজ ছিলেন—তাহাদের ও নিহত করিয়া উজীর আলি স্বদলে তৎসন্নিহিত অন্যান্য ইংরাজগণকে বিনাশ করিবার জন্য ধাবমান হইলেন। পথিমধ্যে আরও দুইজন ইংরাজ নিহত হইল, পরিশেষে একদল অশ্বারোহী সেনা আসিয়া পড়াতে উজীর আলি পলায়ন করিলেন—তাঁহাকে কেহই ধরিতে পারিল না। হতভাগ্য উজীর মনের যন্ত্রণায় এ প্রকারে কাপুরুষের ন্যায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমাপন করিয়া ভটোয়াল নামক পার্ব্বত্যস্থলে লুক্কায়িত হইলেন।

নবাব সাদত আলি খাঁ—মৃত নবাব আসফউদ্দৌলার সহোদর ও সুজার অন্যতম পুত্র। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে পলায়ন করিয়া বেনারসে ইংরাজ সীমা মধ্যে বাস করিতেছিলেন। উজীর আলিকে সিংহাসন হইতে তাড়ান হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সাদতকেই উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিলেন। সাদত আলি এতদিন তাঁহাদের আশ্রয়ে ছিলেন—সুতরাং তিনি যে তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রতিপদে কার্য্য করিবেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের জানিতে বাকী রহিল না। সাদত মনে মনে সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া ছিলেন—কিন্তু যখন চেরি সাহেব সহসা খস্‌ড়া সন্ধি-পত্র লইয়া তাহাকে মস্‌নদে বসাইবার অভিপ্রায় জানাইলেন, তখন নবাবের আর আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না। তিনি অম্লান বদনে সন্ধির সমস্ত স্বত্বেই সায় দিয়া বসিলেন। সন্ধির প্রথম স্বত্ব এই—এপর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবগণ যেমন ইংরাজের সহিত সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, নূতন নবাবও তদ্রূপ করিয়া চলিবেন। (২) কোম্পানীর সৈন্য যাহা নবাবের রাজ্য রক্ষার্থে রাখা হইয়াছে, তাহার ব্যয় ৫৬ লক্ষ টাকা হইতে ৭৬ লক্ষ টাকায় উঠাইয়া দেওয়া হইল। নবাবের সিংহাসনাধিরোহণের তারিখ হইতে এই টাকা দফায় দফায় প্রতি মাসে শোধ করিতে হইবে এবং ইহার সহিত বকেয়া দেনা যাহা আছে, তাহার সমস্তই পরিশোধ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন উজীর আলিকে বাৎসরিক দেড় লক্ষ ও অন্যান্য বেগমদিগকে উপযুক্ত মাসহরা দিতে হইবে। (৩) কোম্পানী তাঁহার সিংহাসনারোহণের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া ১২ লক্ষ টাকা তাঁহাদিগকে “নজরানা” স্বরূপ দিতে হইবে। (৪) যদি ঘটনা ক্রমে সৈন্য রক্ষার ব্যয়ের টাকা কোন রকমে বাকী পড়িয়া যায়,

তবে তাহার সম্পূর্ণ আদায়ের জন্য কোন প্রকার সন্তোষজনক জামিন দিতে হইবে। (৫) বিদেশীয় কোন শাসনকর্ত্তাদের সহিত কোম্পানীকে না জানাইয়া নবাব চিঠি পত্রাদি চালাইতে পারিবেন না এবং তাঁহার রাজ্যে কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছাড়া অপর কোন ইউরোপীয়কে আশ্রয় দিবেন না। (৬) ১৭৮৮ সালের ২৫ জুলাই তারিখে বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার স্বত্ব দস্তর মত মানিয়া চলিতে হইবে। (৭) অযোধ্যায় এক্ষণে দশহাজার ইংরাজ সেনা আছে—যদি কখনও ইহাদের সংখ্যা তের হাজারে বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে নবাব তাহার অতিরিক্ত ব্যয় ভার বহন করিবেন এবং যদি আট হাজারে উক্ত সৈন্য সংখ্যা কমিয়া আসে, তবে নবাব খরচের টাকা কমাইয়া দিতে পারিবেন। (৮) ইংরাজের অযোধ্যা প্রদেশে কোন প্রকার দুর্গাদি নাই—নবাব সাদতআলি ইংরাজদিগকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন ও তাঁহার বন্ধুত্বে কোম্পানীর বিশেষ ভক্তি আছে—সুতরাং নবাব কোম্পানীকে এলাহাবাদ দুর্গের সমস্ত স্বত্ব ছাড়িয়া দিবেন এবং এই দুর্গের সংস্করণ কার্য্যের জন্যও ৮ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। ইহা ভিন্ন ফতেগড় দুর্গের সংস্কারের জন্য নবাব কোম্পানীকে তিন লক্ষ টাকা দিবেন—ইত্যাদি। সন্ধিতে নানা ধরণের নানা কথা রহিল কিন্তু অযোধ্যার আভ্যন্তরিণ সুশাসনের সম্বন্ধে বন্দোবস্তের কোন কথাই যে রহিল না—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আজকাল পাশ্ করা বিবাহার্থীর কর্ত্তৃপক্ষগণ বরের জন্য কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে নানা বাবতে, নানা দফায় শোষণ করিয়া যদ্রূপ টানিয়া লইয়া থাকেন—অযোধ্যার সাদত আলির সম্বন্ধে ইংরাজ অনেকটা সেই প্রথা অবলম্বন করিলেন। *

সাদত আলি প্রথমে অনাদরে পরিত্যক্ত হইয়া অতিশয় বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাতে শাসনকর্ত্তার প্রকৃত গুণ অনেক ছিল। মৃগয়া মদ্যপান ও আনন্দোৎসবে ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া যে তাঁহাতে দূরদর্শিতার ও মিতব্যয়িতার অস্তিত্ব ছিল না—একথা বলিতে পারা যায় না। মস্নদে বসিবার পূর্ব্বে তিনি এইরূপ ছিলেন বটে, কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়সে যখন সিংহাসন দখল করিলেন, সেই সময় হইতে

---

* ইংরাজ এক বৎসরের মধ্যে অযোধ্যার নবাবের নিকট কত টাকা লইলেন, পাঠক একবার নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখুন—

১।	নবাবের রাজ্য রক্ষার জন্য সৈন্য ব্যয় ভার	...	৭৬০০০০০ টাকা।
২।	এলাহাবাদের দুর্গ সংস্করণ জন্য	...	৮০০০০০ ,,
৩।	ফতেগড় দুর্গ সংস্করণ জন্য	...	৩০০০০০ ,,
৪।	নবাবের সিংহাসন দখলে সহায়তা জন্য	...	১২০০০০০ ,,
	মোট		৯৯০০০০০ টাকা

ইহা ব্যতীত এলাহাবাদ দুর্গটি সম্পূর্ণ লাভ হইল এবং ইহা ছাড়া সৈন্য স্থানান্তরের ব্যয় বকেয়া বাকী ও মাসহরার টাকা নবাবের স্কন্ধে রহিল।

তাঁহার পুর্ব্ব প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। রাজ্যেশ্বর হইয়া তিনি নিজের কঠোর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব উপলব্ধি করিলেন, রাজমুকুট মাথায় দিয়াই তিনি "হজরত আব্বাস" নামক দেবালয়ে গিয়া ধর্ম্ম মতে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আমি আজ হইতে জীবনের আমোদ প্রমোদ সমস্ত ত্যাগ করিলাম, এ জীবন প্রজার কার্য্যে, রাজ্যের উন্নতি কল্পেই ব্যয়িত হইবে।" বলা বাহুল্য সাদতআলি এ প্রতিজ্ঞা প্রাণপণে রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।

সাদতআলি ইংরাজের সহিত যেরূপ বন্দোবস্তে সিংহাসন পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টে পালনীয় হইলেও তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাহার অনেক স্বত্ব পালন করিয়াছিলেন। সৈন্য ব্যয়ের সমস্ত টাকাই তিনি পরিশোধ করিয়াছিলেন— কারণ ১৮০১ সালের নূতন সন্ধিতে এসম্বন্ধে কোন বাকী বকেয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

সাদতআলির মস্‌নদ অধিকারের কিয়ৎকাল পরে ওয়েলেস্‌লী সাহেব গবর্ণর হইয়া আইসেন। ওয়েলেস্‌লীর ন্যায় ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ক্ষুধা শান্তি করিতে নবাবের স্বাধিকৃত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা কি—তাহা পরে বুঝাইতেছি।

ওয়েলেস্‌লীর সিংহাসনে বসিবার কিয়ৎকাল পরেই একটা জনরব উঠে সুবিখ্যাত আমেদ সা আবদালির পুত্র খাঁজামান ভারতবর্ষের প্রান্ত সীমাস্থ প্রদেশগুলি আক্রমণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ওয়েলেস্‌লী এই ঘটনায় বিশেষ সুযোগ পাইয়া পাছে অযোধ্যার উপর কোন প্রকার আক্রমণ হয় † এই অমূলক সন্দেহে নবাবকে স্ব-পালিত ও শিক্ষিত সেনার পরিবর্ত্তে ইংরাজ সেনা রাখিতে অনুরোধ করেন। আসফ্‌উদ্দৌলা প্রায় আশি হাজার সৈন্য নিজমতে শিক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা ইংরাজের শিক্ষা প্রণালীতেই শিক্ষিত হইয়াছিল এবং অনেক সময়ে ইংরাজ সেনাপতিদিগের উপদেশে পরিচালিত হইত। ওয়েলেস্‌লী এই আশি হাজার সৈন্য কমাইয়া তাহা ইংরাজ সৈন্য দ্বারা পূরণ করিয়া অযোধ্যার সৈনিক বিভাগ সম্পূর্ণরূপে নিজায়ত্ত করিতে মৎলব আঁটিলেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে নবাবের স্বাধীনতা তিলমাত্র থাকা সম্ভব নহে। সৈনিক বিভাগ এইরূপে আয়ত্ত করিয়া পরে নানা অছিলায় সিবিল বিভাগের ভারও নিজহস্তে লইয়া প্রকৃত পক্ষে অযোধ্যা শাসন করাই ওয়েলেস্‌লীর আন্ত-

---

† অযোধ্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখক মহম্মদ মনীহুদ্দীনের মতে—"এই সময়ে অযোধ্যার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না, ডাইরেক্টারেরা বরং অযোধ্যা হইতে সৈন্যভার উঠাইয়া লইবার পরামর্শ দেন; কিন্তু কলিকাতা কৌন্সিল ও গবর্ণর জেনেরল এই উদ্বৃত্ত সৈন্যের ব্যয়ভার কোম্পানীর স্কন্ধে না চাপাইয়া প্রকারান্তরে নবাবের স্কন্ধে চাপাইতে মনস্থ করেন। ইহাতেই প্রকারান্তরে এই বহিঃশত্রুর আক্রমণ কল্পনা করা হইয়াছিল।"

রিক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নবাবকে প্রকৃত রূপে না জানাইয়া তিনি সর্ব্ব প্রথমে সাদত আলিকে পত্র লিখিলেন "অযোধ্যাকে খাঁজামানের সম্ভবতঃ আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য "আপনার নিজরক্ষিত সেনার পরিবর্ত্তে বিট্রিস্ সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।" নবাব এই মর্ম্মে পত্র পাইয়া বড় একটা সুবিধা বুঝিলেন না। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন "আমি এবং আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা কখনও আপনাদের অনুরোধ উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই—চিরকালই সন্ধির স্বত্ব মানিয়া আসিতেছি এবং মিত্র ভাবাপন্ন আছি, এক্ষণে রাজ্য মধ্যে আমার নিজ সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া ইংরাজ সৈন্য বৃদ্ধি করিলে প্রজারা আমাকে নিতান্ত অসার ও সর্ব্ব বিষয়ে কোম্পানীর অধীন বলিয়া জানিবে। অতএব বর্ত্তমানে এ প্রস্তাব পরিত্যাগ করা হউক" ‡। ইহার উত্তরে ওয়েলেস্লী যাহা লিখিলেন, তাহা তীব্র ও তিরস্কারপূর্ণ ভাষায় বিজড়িত, এবং তাঁহার ন্যায় যথেচ্ছাচারী ও উগ্র প্রকৃতির লোকের নিকট ইহাই প্রকৃত আশা করা যাইতে পারে। নবাব তবুও ছাড়িলেন না, এ সম্বন্ধে আরও লেখালেখি চলিল; কিন্তু পরিশেষে ইংরাজ গবর্ণরই নিজের কোট বজায় রাখিলেন।

নবাব এই সময়ে বেগতিক দেখিয়া দুর্ব্বলের সহিত সবলের সংগ্রামের যে পরিণাম তাহাই প্রাপ্ত হইলেন। কোম্পানীর এতদূর অধীনে থাকিয়া রাজ্যভার পরিচালন করা তাঁহার মনঃপুত হইল না; একেত তিনি Highest bidder এ কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার উপর এই সমস্ত অত্যাচার—কাজেই সিংহাসন ত্যাগ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল। সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইবার সংকল্প করিলেন—একথা যখন ওয়েলেস্লীর কানে উঠিল, লর্ড সাহেব তখনই রেসিডেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন—নবাব রাজ্য ছাড়িয়া দিতে চান্ ভালই—কিন্তু একথা তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হউক, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীকে আমরা এই সিংহাসন দিব না"। এ কথায় সাদত আলির চমক্ ভাঙ্গিল—রাজ্য, সুখের আশা, রাজনাম তাঁহা হইতে একেবারে শেষ হইবে ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি সর্ব্বপ্রকার বিপদকে, নানা বিষয়িণী অধীনতাকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহাসন রাখিতে বাসনা করিলেন।

এদিকে ওয়েলেস্লী সাহেবের আর বিলম্ব সহিল না। তিনি বজ্রমুষ্টিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যে শীকার ধরিয়াছিলেন—তাহা কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করা যুক্তি সঙ্গত ভাবিলেন না। নবাবের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই তিনি স্বেচ্ছামত ১২ দল পদাতি ও ৪ দল অশ্বারোহী সৈন্য একেবারে অযোধ্যায় পাঠাইলেন। এই সময়ে লম্স্ডেন নামক একজন ধর্ম্মভীরু রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার দ্বারা কোন কাজ হইবে না ভাবিয়া লর্ড

---

‡ Letter dated 12 th January 1800.

ওয়েলেস্‌লী নিজে মনোনীত করিয়া কর্ণেল স্কট্‌কে পূর্ব্বেই অযোধ্যায় পাঠাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারীকে এই সকল সৈন্যের উপযুক্ত রসদ যোগাইবার ও নবাবের কোন প্রকার অসম্মতি স্থলে বল চালনার উপদেশ দিয়া লর্ড ওয়েলেসলী নিশ্চিন্ত হইলেন। কর্ণেল স্কট্‌ অনেক কৌশলে এই অতিরিক্ত সেনা নবাবের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিজ সৈনা ভার কমাইয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে খুব বাহাদুরী লইলেন। বলা বাহুল্য এই নূতন সৈন্যের খোরাক যোগাইবার জন্য নবাবের উপর অতিরিক্ত ৫৪ লক্ষ টাকা দাবি করা হইল।

নবাব্‌ সাহেব যখন অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিয়া এই অপ্রয়োজনীয় সৈন্য পালন ভার হইতে অব্যাহতি পাইলেন না, তখন অগত্যা ওয়েলেস্‌লী সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন "এই অতিরিক্ত সৈনা গ্রহণ করিতে আমি নারাজ নহি কিন্তু ইহাদের ব্যয়ভার কোথা হইতে যোগাইব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না"। ঘটনাটী নবাব উজীরের পক্ষে শাঁকের করাতের ন্যায় হইয়াছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লী নবাবের এই পত্রের উত্তরে রেসিডেণ্টকে লিখিলেন "that this is a confession of inability to satisfy the Company's demands, and that the subsidy is no longer safe, and that it must be secured by the cession of such a portion of Wazir's territories, as shall be fully adequate &." কথাটা ঠিক্‌ বটে, তুমি কোথা হইতে দিবে তাহা আমি কি করিয়া বলিব; দিবার ইচ্ছা থাকে, কোম্পানীর সহিত সৌহার্দ্দতা রাখিবার ইচ্ছা থাকে—নিজের রাজ্য আছেত, নগদ টাকা না পার রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দাওনা কেন? ওয়েলেস্‌লী সাহেব নাছোড়বান্দা লোক, নবাব দেখাইলেন যে এ পর্য্যন্ত কখনও তিনি কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা এক কড়া কড়ি বাকী রাখেন নাই, তবে তাহার উপর এ পীড়াপীড়ি কেন? কিন্তু সে কথা শোনে কে? দুর্ব্বলের আবার প্রবলের কাছে যুক্তি কি? ওয়েলেস্‌লী ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া স্বীয় ভ্রাতা হেন্‌রী ওয়েলেস্‌লীকে লক্ষ্ণৌ পাঠাইলেন। তাঁহাকে গোপনে উপদেশ দেওয়া হইল—নবাব যদি সহজে এই সমস্ত প্রদেশ ছাড়িয়া না দেন, তবে তাঁহাকে বল পূর্ব্বক সম্মত করাইবে অথবা একেবারে রাজ্যচ্যুত করিয়া নূতন উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিবে। দাদার ভাইত বটে—হেন্‌রী ওয়েলেস্‌লী লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াই দৃঢ়চিত্তে কাজে মনোনিবেশ করিলেন। নবাবের সকল প্রকার আপত্তি, যুক্তি, করুণাভিক্ষা সকলই কোম্পানীর রাজ্য-তৃষার মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। ১৮০১ সালের সুবিখ্যাত সন্ধি পত্রের স্বত্বগুলিতে ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে জবরদস্তিতে নবাবকে বাধ্য করিয়া হেনরি ওয়েলেস্‌লী কোম্পানীর নিমকের মর্য্যাদা রাখিলেন। যে প্রদেশগুলি গ্রাস করিবার জন্য স্যর জন শোর ক্রমাগত মুখ ব্যাদান করিয়াও কৃতকার্য্য হয়েন নাই *

---

* পাঠক যদি একখানি পুরাতন ভারতবর্ষের মানচিত্রে এই প্রদেশগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন ১৮০১ সালের সন্ধিতে যে প্রদেশগুলি

লর্ড ওয়েলেস্‌লী নবাবকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তাঁহা কাড়িয়া লইলেন। ৫৫ বৎসর পরে ড্যালহৌসি যে কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই সময়ে ওয়েলেস্‌লী সাহেব তাহার অর্দ্ধেক সম্পন্ন করিয়া রাখিলেন। এই স্মরণীয় সন্ধির স্বত্বানুসারে নবাব কোম্পানীকে রোহিলখণ্ড, ফরেক্কাবাদ, মৈনপুরী, ইটোয়া, কাণপুর, ফতেগড়, এলাহাবাদ, আজিমগঞ্জ, কোরা, বস্তী, গোরক্ষপুর প্রভৃতি বহুজন-পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী প্রদেশগুলি চিরকালের জন্য অর্পণ করিলেন। এই সকল প্রদেশের আয় সেই সময়ে এক কোটী পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার উপর ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই বিষয়ের দ্বিগুণের উপর আয়বৃদ্ধি করিয়াছেন।

এই অশ্রুতপূর্ব্ব সন্ধির স্বত্বানুসারে আরও স্থির হইল যে কোম্পানী এইবার হইতে সৈন্যরক্ষার সম্বন্ধে নবাবের নিকট আর এক কপর্দ্দকও অতিরিক্ত লইবেন না, নবাব নিজ অধীনে চারিদল পদাতিক, একদল নজীব, দুই সহস্র অশ্বারোহী ও তিন-শত গোলন্দাজ সৈন্য রাখিতে পারিবেন। কোম্পানীর অংশ বাদে তাঁহার নিজ রাজ্যের সর্ব্বস্থানেই তাঁহার অক্ষত ক্ষমতা থাকিবে ও এই অংশ তিনি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিতে পারিবেন। ১০ই নবেম্বর সন্ধিপত্র দস্তুর মত স্বাক্ষরিত হইল— কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই (সেপ্টেম্বরের শেষভাগে) কোম্পানী নবার্জ্জিত সম্পত্তি নবাবের সহিত পৃথক করিয়া লইলেন এবং হেন্‌রি ওয়েলেস্‌লি এই বিভাগের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। কোন বিখ্যাত স্পষ্টবাদী ইংরাজ বলিয়া গিয়াছেন—"Moderation of England is not unlike the ambition of other nations." অযোধ্যায় ইংরাজের ব্যবহার সম্বন্ধে একথা যে কতদূর প্রযুজ্য, তাহা সাধারণে অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

এই সন্ধির বলে সাদত আলি তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ হারাইলেন, তাঁহার অধীনস্থ প্রধান প্রধান দুইটি দুর্গ হস্তান্তরিত হইল—তাঁহার সেনা বল কমিল এবং যে কোরা ও

নবাব ইংরাজ কোম্পানীকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক দোয়াব বলিয়া কথিত হয়। সার জন শোর ইতিপূর্ব্বে এই দোয়াব প্রকারান্তরে দখল লইবার জন্য কতদূর লোলুপ হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত পত্রাংশ হইতে বেশ প্রমাণিত হয়। "If We can not take it as rulers and sovereigns, we might manage to take it on a lease, in the same manner as it is held by Almas Ali Khan and on his death we will take possession of the whole." Lord Teignmouth's letter dated 3 rd Oct: 1798.

১৮০১ সালের সন্ধিতে কতদূর অত্যাচার করা হইয়াছিল, তাহা সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ সার হেনরি লরেন্সের নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি হইতে বিশেষ প্রমাণিত হইবে। "Lord Wellesley's conduct in this transaction was much despotic * * In extorting the subsidy literally at the point of the bayonet and at the same time nearly doubling it he shut his eyes to the most obvious rules of justice. Cal. Rev. Vol. II. P. 411.

এলাহাবাদ কোম্পানী সুজাকে চিরকালের জন্য বিক্রয় করিয়াছিলেন, এই সন্ধির কূট নীতিতে তাহারা "শিক্ষিত কপোতের ন্যায়" পুনরায় পূর্ব্ব প্রভুর সমীপবর্ত্তী হইল।

এই ঘটনার পর নবাব তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দ্বাদশ বৎসর রাজ্যের উন্নতি কল্পে নিয়োজিত করেন। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্ব প্রথমে তালুকদারদের উপর পড়িল—ইহারা এই সময়ে এতদূর বর্দ্ধিতপ্রতাপ হইয়াছিল যে সময়ে সময়ে নবাবের ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যরূপে দাঁড়াইতে সাহস করিত। তালুকদারদের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সাধারণ প্রজার বিশেষতঃ কৃষিজীবির অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। সাদত সর্ব্বপ্রথমে এই দুর্দ্দান্ত তালুকদারদের শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন। একার্য্যে বিশেষ সৈন্যবল আবশ্যক। কেবল সৈন্যবল নহে—প্রয়োজনীয় সৈন্য যথেচ্ছা পরিচালনা করাও অত্যাবশ্যকীয়। নবাব এই কার্য্যে মন দিলে ইহা অনেক ইংরাজের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তাঁহারা তালুকদারদের পক্ষ ছিলেন; সুতরাং নানা উপায়ে নবাবের উদ্দেশ্য পথে বাধা দিতে লাগিলেন--কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সাদত এই সৈন্যবল যদেচ্ছা পরিচালন করিয়া অনেক বেনামী বেদখলী লাখেরাজ সম্পত্তি নিজ দখলে আনিলেন—ইজারার পরিবর্ত্তে রায়তের সুখকর "আমনী" প্রথার প্রচলন করিলেন। চাক্‌লাদারেরা পূর্ব্বে অনেক তহবিল ভাঙ্গিত, তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আসিতে লাগিল নবাব নিজে তাহার সমস্ত বিচার করিতেন। এক কথায় তিনি প্রজার রক্ষক ও তালুকদারের যম ছিলেন। তাঁহার শাসন ক্ষমতার সম্বন্ধে আমরা নিজে কিছু বলিতে চাহিনা, সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল শ্লিমান নিজ মুখে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।* কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এতাদৃশ উপযুক্ত শাসনকর্ত্তাকে লর্ড ওয়েলেস্‌লী "অকর্ম্মণ্য" "অনুপযুক্ত" বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

* Col. Sleeman সাদত আলির সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন—

"A man of great general ability who had mixed much in the society of British officers, had been well-trained in the habits of business, understood thoroughly the character, institution, and the requirements of his people—and above all was a sound judge of relative merits and capacities of the men from whom he had to select his officers, and a vigilant supervisor of of their actions * * To protect his subjects he knew well that he must with a strong hand keep down the large landed aristocracy who were then, as they are now (1850) very prone to grasp at the possessions of their weaker neighbours, either by force or in collusion with local authorties. In attempting these with the aid of British troops, some acts of oppression were no doubt committed and as the sympathies of the British officers were more with the landed aristocracy * * frequent misunderstandings arose, acts of just severity were made to appear to be acts of wanton oppression, and such as were really oppressive were exaggerated in to unheard of atrocities."

সাদত আলির সময়ে লক্ষ্ণৌএর উন্নতি কল্পে কয়েকটী বিখ্যাত অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। ইহাদের মধ্যে দিলারাম, দিলখুসি, হায়েত্‌বক্‌স, নূরবক্স কুঠী, মতিমহল, তারাকুঠী, প্রভৃতি মনোহর প্রাসাদ গুলিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। মতিমহলে সাদতের সময় হইতে বরাবরই পক্ষীর লড়াই হইত। অন্যান্য আমোদের মধ্যে চিড়িয়ার লড়াই লক্ষ্ণৌ এর নবাবদিগের প্রধান আমোদ। রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত এই আমোদ সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্ণৌ রাজবংশের এখনত অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে কিন্তু আজও এখানকার হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে চিড়িয়ার লড়াইএর বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। নবাব সাহেবেরা আহারাদির পরই এই আমোদে মত্ত হইতেন। আহারাদি শেষ হইলে টেবিলের উপর বস্ত্র বিছাইয়া দুইটি শিক্ষিতা পক্ষিণা আনিয়া সেই টেবিলের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই প্রকার ব্যঙ্গযুদ্ধে তাহাদের উত্তেজিত করিবার জন্য নানাবিধ উত্তেজক ঔষধ ও ভোজ্য এই সময়ে প্রস্তুত রাখা হইত। দুই পক্ষিণীর মধ্যে একটী পুংপক্ষী ছাড়িয়া দিলে সেই শিক্ষিত পুংপক্ষী ধীরে ধীরে মধ্যস্থলে গিয়া দাড়াইত এবং পক্ষিণীদিগকে যুদ্ধার্থে উৎসুক দেখিলেই ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িত। ইহার পর ভয়ানক যুদ্ধ! দুইটী পক্ষীতে ঠোক্‌রাঠুক্‌রী লাফালাফী করিয়া মহাসমর বাধাইত, চঞ্চু আঘাতে ও কৌশলময় গতিকে একটা আর একটাকে টেবিলশায়ী করিবার চেষ্টা করিত, পরিণামে যেটার জয় লাভ হইত সে নবাব সাহেবের বিশেষ আদর পাইত এবং তাহার রক্ষকও বিনা পুরস্কারে যাইত না। অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে মতিমহল ইংরাজের দখলে আসে কিন্তু সিপাহী-মহা বিদ্রোহে ইহা পুনরায় তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িলে—স্যর কলিন কাম্বেল আসিয়া তাহা পুনরায় দখল করেন। তারা কুঠী একটী মনোরম রাজকার্য্যময় সুবৃহৎ প্রাসাদ। ইহার এক অংশে একটী ক্ষুদ্র গোছের মান মন্দির ছিল। নবাবেরা এই-স্থানে উঠিয়া কখন কখন গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি পর্য্যালোচনা করিতেন। Col. Wilcox নামক একজন ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদের তত্ত্বাবধারণে কতকগুলি জ্যোতির্ষিক যন্ত্র এই প্রাসাদের অত্যুচ্চ চূড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে এবং এক্ষণে এই মনোরম প্রাসাদে "জুডিসিয়াল কমিসনারের" কাছারি বসিতেছে। দিলখুসী সহরের বাহিরে অবস্থিত—নবাব এই স্থলে আসিয়া পালিত জন্তু শিকার করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ লালবারদোয়ারি সাদত আলির সময়ে নির্ম্মিত হয়—নবাবেরা সমস্ত প্রাসাদটীকে "লাল-বার-দোয়ারী" ও অভিষেক গৃহ-টীকে "কসর উস্ সুলতান" বলিতেন। ইংরাজেরা ইহাকে Throne Room বলেন—এই স্থানে অভিষেকের সময় মহাদরবারে নবাবকে নজরাদি দিয়া রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য পদস্থলোকে সম্মান দেখাইতেন।

গাজীউদ্দিন হায়দার। সাদত আলি ১৮১৪ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে গতায়ু

হইলে—তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রফ্সাত উদ্দৌলা—গাজী উদ্দিন হায়দার নাম ধারণ করিয়া মস্নদ অধিকার করেন। মৃত নবাবের প্রথম পুত্র সমসউদ্দৌলা ইতিপূর্ব্বেই গতাসু হইয়াছিলেন—মহম্মদীয় দায়ভাগ (মজরউল্হ'র) অনুসারে সুতরাং তাঁহার পুত্রেরা মস্নদের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন। সাদত আলি মরিবার পূর্ব্বে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দান করিয়া কোম্পানীর সর্ব্বগ্রাসী জ্বলন্তপিপাসার অনেকটা শান্তি করিয়াছিলেন—সুতরাং তাঁহার পুত্রের সহিত এবার পূর্ব্ব প্রথামত আর কোন নূতন বন্দোবস্ত হইল না—কিন্তু অন্য উপায়ে কোম্পানী দুই লক্ষ টাকা অযোধ্যা সরকার হইতে আত্মসাৎ করিলেন। এই ঘটনাটি কি তাহা পাঠক নিম্নে দেখিতে পাইবেন।

নবাব মস্নদে বসিয়াই পিতার প্রিয়মন্ত্রী হাকিম মেহেদিকে পদচ্যুত করিয়া আগা-মীর নামক স্বীয় খানসামাকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। আগা-মীর তেজীয়ান্ প্রকৃতির লোক ছিলেন—সকল বিষয়ে যাহাতে রেসিডেণ্ট সাহেব হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন এই প্রকার চেষ্টা করিতেন বলিয়া তিনি শীঘ্রই তাঁহার বিরাগ ভাজন হইয়া উঠিলেন। নবাব স্বীয় মন্ত্রীকে রেসিডেণ্ট সাহেবের ফাঁদে পড়িতে দেখিয়া ভয় পাইলেন ও তাঁহার সন্তোষ সাধনের জন্য স্বীয় মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিয়া কারাবদ্ধ করিলেন। এই সময় হইতে রেসিডেণ্ট কর্ণেল বেলির সহিত নবাবের হৃদ্যতা বড়ই বাড়িয়া উঠিল—তিনি রেসিডেণ্টকে মিষ্ট ভাষায় "খুড়া" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রেসিডেণ্টও নানা-কাজে সহৃদয়তা দেখাইয়া খুড়াত্বের পরিচয় দিতেন। নবাব ও রেসিডেণ্টের এই প্রকার হরিহরী একাত্মভাব কলিকাতা কৌন্সিলের বড় মনে লাগিল। এই সময়ে নেপাল যুদ্ধ প্রভৃতিতে কোম্পানীর অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। লর্ড হেষ্টিংস এই সময়ে কোম্পানীর গবর্ণর,—অযোধ্যার পূর্ণ-কোষের উপর তাঁহার অগ্রে নজর পড়িল। রেসিডেণ্ট মুন্সী ও কর্ণেল বেলীর সহায়তায় মিষ্ট কথায়, প্রলোভনে, অথবা ভয় প্রদর্শনে নবাবকে রাজি করিয়া গবর্ণর সাহেব দুই লক্ষ টাকা অযোধ্যা সরকার হইতে ঋণ লইবার বন্দোবস্ত করিলেন। গবর্ণর জেনারেল রেসিডেণ্টকে উপদেশ দিলেন—"নবাব এই টাকা স্বেচ্ছায় দিতেছেন এইরূপ ভাব দেখাইয়া টাকা গ্রহণ করিতে হইবে" (To make it appear as a voluntary offer on the part of the Nawab) কার্য্যতঃ তাহাই করা হইল। এই ঋণ পরে অন্য উপায়ে শেষ করা হইয়াছিল। নগদ টাকা না দিয়া সুচতুর কোম্পানী নবাবকে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে খৈরুগড় ও নেপাল তিরাই নামক, পার্ব্বত্য বনজঙ্গলময় প্রদেশ প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইলেন—ফল কথা নবাব মন্ত্র মুগ্ধ হইয়া এই দুইটী প্রদেশ গ্রহণ করিলেন, ইহাতে তাঁহাদের লাভ হওয়া দূরে থাকুক—বন্দোবস্ত কার্য্যে যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল।

আর এক অভূতপূর্ব্ব উপায়ে লর্ড হেষ্টিংস নবাবের প্রতি এই ঋণের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাইলেন। এ পর্য্যন্ত অযোধ্যার নবাবগণ দিল্লীর দরবারের অধীনতা স্বীকার করিয়া

আসিতেছিলেন, তাঁহারা নাম মাত্র অধীন ছিলেন বটে কিন্তু কার্য্যতঃ সম্পূর্ণতঃ স্বাধীন বাদসাহ উপাধি ধারণ করিবার ইচ্ছা করিলেই সহজে পারিতেন—কিন্তু চক্ষু লজ্জার খাতিরে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত এ প্রকার কাজে প্রবৃত্ত হন নাই। লর্ড হেষ্টিংস নবাবকে আরও বাধ্য করিবার জন্য এই সুযোগে "সাহ" উপাধি ধারণ করিতে পরামর্শ দিলেন। নবাব গাজি উদ্দীন, "বাদসাহ" উপাধি ধারণ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিতে আরম্ভ করিলেন। মোট কথা এই চতুর ব্যবহারে সরল প্রকৃতি নবাব আপনাকে বিশেষ আপ্যায়িত বোধ করিলেন।

বাদসাহ গাজিউদ্দীনের সময়ে সুবিখ্যাত বিশপ হিবার লক্ষ্ণৌএ উপস্থিত হন। তাঁহার ন্যায় উন্নতমনা, ধর্ম্মপরায়ণ, অপক্ষপাতী, ধর্ম্মযাজক অযোধ্যার আভ্যন্তরিক শাসন কার্য্য সম্বন্ধে যে প্রকার মত দিয়াছেন, তাহা অযোধ্যার নবাবগণের স্বপক্ষে বিশেষ নজীর বলিয়া উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বিশপ্ সাহেবও কলিকাতায় থাকিয়া অযোধ্যার শাসন কার্য্যে বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে নানাবিধ বিবরণ শুনিয়া ছিলেন— তাহাদের যথার্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি লক্ষ্ণৌএর ও অযোধ্যা প্রদেশের কএক স্থলে ভ্রমণ করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। *

বিশপ হিবারের কাহিনী হইতে যতদূর সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইতে বেশ প্রমাণ হয় গাজিউদ্দীন বাদসাহের সময়ে অযোধ্যার অবস্থা ততদূর শোচনীয় ছিল না। অযোধ্যা শস্যশালিনী ছিল, রাজকোষ পরিপূর্ণ ছিল—বাদসাহ নিজে কৃতবিদ্য ছিলেন—এবং

---

* অযোধ্যার আভ্যন্তরিণ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"We had heard much of the misgoverned and desolate state of Oudh. Its peasants it is true, being a martial race, were all armed, but we found them peaceable and courteous. * In the village—the shops were neat and the appearence of the people comfortable and thriving * * I was pleased, however, and surprised after all which I had heard of Oudh to find the country so completely under the pough &c. We found invariable civility and good nature, * the people displaying on the whole a far greater spirit of hospitality and accomodation than two foreigners would have met with in London! * * I can bear witness certainly to the truth of the king's statement that his territories are really in a far better state of cultivation. * * From Lucknow to Sandee the country is as populous and well cultivated as most of the company's provinces. * * I can not but suspect therefore that the misfortunes and anarchy of Oudh are somewhat overrated. * * বিশপ সাহেব একজন প্রজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন যদি ইংরাজের হাতে রাজ্য যায় তবে কি তোমরা সুখী হও? সে ব্যক্তি উত্তর করিল—"Miserable as we are of all miseries keep us from that." স্বয়ং নবাবের সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—"He was fond as I have observed of study and in all points of oriental philology and philosophy, is really reckoned a learned man besides having a strong taste for mechanics and chemistry * * no single act of violence or oppression has ever been ascribed to him or supposed to have been perpetrated with his knowledge." Bishop. Heber's Journal Edited by his wife.

কথনও কোনপ্রকার অত্যাচারে বা পীড়নের কার্য্য তাঁহার নিজের দ্বারা বা অনুমতিতে ঘটিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। বিশেষ পরিবর্ত্তনের মধ্যে ইহার সময়ে সাদত আলির "আমনী" প্রথা উঠিয়া গিয়া পুরাতন "ইজারা" প্রথার প্রচলন হয়—কিন্তু ইহাতে ততদূর ঘোরতর অনিষ্ট সূচনা হইতে পারে না।

লক্ষ্ণৌএ গাজি উদ্দীন বাদসাহের অনেক কীর্ত্তি আছে। ইহার মধ্যে চৌলক্ষী, দর্শন-বিলাস সানজফ্, সাদত আলির সমাধি মন্দির, খরসদ মঞ্জিল প্রভৃতিই প্রধান। আমরা সর্ব্বাগ্রে সানজফের বিবরণ দিব।

"সাহ্ নজফ্" বা "নজফ্ আস্রফ" একটী প্রকাণ্ড সমাধি মন্দির। গাজিউদ্দীন বাদসাহ ইহা নিজ-সমাধির জন্য প্রস্তুত করেন। গোমতীর অতি সন্নিকটে স্থাপিত বলিয়া দূর হইতে বা কোন উচ্চস্থল হইতে ইহার দৃশ্য অতীব মনোরম। হোসেনাবাদের সহিত সাহনজফের সাহস করিয়া তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্মবীর মহম্মদের জামাতা আলির সমাধি "নজফ" নামক এক অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর সংস্থাপিত ছিল—নবাব তাহার অনুকরণে এই "সাহ-নজফ" নির্ম্মাণ করেন। আমরা সাহ নজফের সুদৃশ্যতা ও নির্ম্মাণকৌশলে মুগ্ধ হইয়া দুই তিন দিন ইহা দেখিতে গিয়াছিলাম। জ্যোৎস্নালোকে আমরা ইহার দীপালোকিত মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম এবং তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। শারদীয়া যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধ-রশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘ মধ্যে বিচরণ করিতেছে—পৃথিবী তলে পালিত উদ্যান লতা, মনোহর বিটপী শ্রেণী তদ্রূপ নীরবে চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষ পত্র সকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে, লতা গুল্ম মধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে—তাহাদের মনোহর গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। কৌমুদীবেষ্টিত সাহ-নজফের উচ্চচূড়ার উপর চন্দ্রকর লেখা পড়িয়া তাহার শুভ্রধবলকান্তির প্রসন্নতা আরো বৃদ্ধি করিয়াছে, আবার সেই অতিশুভ্র-ধবল অত্যুচ্চ প্রাসাদের চারিদিকে আলোকময়ী দীপমালার সহস্র সহস্র রশ্মি প্রতিভাত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এই ভাব দেখিয়া বোধ হইল যেন প্রফুল্লতা আসিয়া সৌন্দর্য্যের হাত ধরিয়াছে, প্রকৃতির কমনীয়তা আসিয়া মানবের শিল্পকৌশলের সহিত মিশিয়াছে। ফটক পার হইয়াই দুইপার্শ্বে কেয়ারি-করা মনোহর বৃক্ষশ্রেণী। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক জ্বলিতেছে; সেই চিরান্ধকার বৃক্ষকোল সেই স্নিগ্ধ মধুর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সহস্র নেত্র উন্মীলন করিয়া যেন দর্শকদিগকে প্রীতি সম্ভাষণ করিতেছে। মনে মনে ভাবিলাম এই কীর্ত্তি যে রাখিয়া গিয়াছে সে আজ কোথায়? তাহার বংশ-ধরেরাই বা কোথায়? কাহার আমোদ কে উপভোগ করিতেছে?

প্রথম গেটটী পার হইয়াই কিছুদূর গেলেই আর একটী অত্যুচ্চ তোরণ দৃষ্টিপথে পড়ে। ইহাই সানজফের প্রবেশ দ্বার—এইস্থল দিয়া সমাধি মন্দিরের সীমামধ্যস্থ চকে উপ-

স্থিত হওয়া যায়, হিন্দুর দেবালয়ের ন্যায় ইহার চারিদিকে চকমিলান বাড়ী—ও মধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির। রাস্তাগুলি অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, একটী শুষ্ক বৃক্ষপত্রও তথায় পাইবার যো নাই। উত্তরাংশের চকটী ঘুরিয়া আসিলেই সমাধি-মন্দিরের প্রবেশ দ্বার। সমাধি মন্দির বলিয়াই ইংরাজ ইহা দখল করিয়া লয়েন নাই। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে নবাবী আমলের অনেক পরিত্যক্ত পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহ গাত্রে অত্যুচ্চে কতকগুলি সুন্দর "বয়েৎ"ও তন্নিম্নে কৃত্রিম ফলপুষ্প শোভিত মহাজন পদাবলী সম্বলিত কতকগুলি সুবৃহৎ দর্পণ ও উপযুক্ত স্থল ব্যাপিয়া চারিদিকেই বেলোয়ারি দেয়ালগিরি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহা ব্যতীত শতাধিক শাখাবিশিষ্ট কয়েকটী বসা-ঝাড় কবরের নিকটে সাজান আছে ও তাহাতে সুগন্ধি দীপমসাল জ্বলিতেছে, কবরের উপরেই একটী প্রকাণ্ড খিলানময় গম্বুজ। এই প্রকাণ্ড সৌধের দেয়ালের চারি ধারে কয়েক খানি প্রকাণ্ড দর্পণে গৃহের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য সমস্তই প্রতিফলিত হইয়াছে— ইহাকে লক্ষ্ণৌয়ে শিশমহল বলিলে অত্যুক্তি হয় না; দ্বারের কাছে দুইখানি নবাবী আমলের চিত্রিত ছবি দেখিলাম। এক খানিতে নবাব সাদতআলি জেনারেল ক্লড-মার্টিনের সহিত করমর্দ্দন করিতেছেন—মেজের উপর চিড়িয়ার লড়াই হইতেছে, নবাবের দৃষ্টি তাহার দিকে অর্দ্ধন্যস্ত রহিয়াছে। নবাবের চারিদিকে সভাসদগণ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর একখানি ছবিতে, নবাব তাঞ্জামে করিয়া যাইতেছেন ও কয়েকটী যুবতী পরমাসুন্দরী কাহারিণী সেই তাঞ্জাম বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই দুইখানি বিরুদ্ধ ভাব-প্রকাশক ছবি কি উদ্দেশ্যে এখানে রাখা হইয়াছে, কিছু মাত্র বুঝিতে পারা গেল না। আমরা মন্দিরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছি—এমন সময়ে জনতার মধ্য হইতে একটা ভয়ানক কোলাহল উপস্থিত হইল। সংক্ষুব্ধ সমুদ্রোত্থিতবৎ জনপ্রবাহ ইতস্তত বিশৃঙ্খলভাবে চালিত হইতে লাগিল—ক্ষণকালের মধ্যে ৫।৭ জন আসাসোটাধারী চাপরাসি দ্রুতবেগে ভিড়ের মধ্যে দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে—দেখিতে পাইলাম। ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইল, বুঝি প্রাচীন নবাব বংশের কোন বংশধর সমাধি-মন্দিরে আলোক মালা দেখিতে আসিতেছেন। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে—সহরের কর্ত্তা জুডিসিয়াল কমিসনার-সাহেব তাঁহার আসিষ্টাণ্টগণ ও কয়েকটী সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবৃত হইয়া সমাধি মন্দিরে আলো দেখিতে যাইতেছেন। দুইধারের লোক আদব বাজাইতেছে। সাহেবও গম্ভীর মুখে দুই এক স্থলে তাহাদের প্রতিদান করিতেছেন। সাহেব ধীরে ধীরে ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলে, জনতার বিরলতা দেখিয়া আমরাও সরিয়া পড়িলাম। সাহ-নজফ লক্ষ্ণৌএর একটী প্রধান সৌন্দর্য্য। বড় ইমামবাড়ী,হোসেনাবাদ প্রভৃতির ন্যায় ইহাও অটলভাবে দাঁড়াইয়া নবাবদিগের কীর্ত্তি বহুকাল প্রচার করিবে। সিপাহী যুদ্ধের সময় সাহ-নজফের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হইয়াছিল—এই

প্রকাণ্ড সমাধি মন্দিরের সম্মুখেই Collin Campbell লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিতে আসিবার সময় শত্রুদিগের হস্তে অতিশয় বাধা প্রাপ্ত হন।

অযোধ্যার অধিকাংশ নবাবই স্বীয় কীর্ত্তি প্রচার করিবার জন্য স্ব স্ব সমাধি মন্দির ও বড় বড় এমারত নির্ম্মাণ করাইয়াছেন—কিন্তু পিতৃগৌরব বৃদ্ধি সৌকর্য্যার্থে কেহ কোন কীর্ত্তি স্থাপন করেন নাই। গাজিউদ্দিন হায়দর কেবল এ প্রকার কার্য্যের একমাত্র অনুষ্ঠাতা ও একমাত্র দৃষ্টান্ত। তাঁহার পিতা সাদত খাঁ, ও মাতা মুরশীদ জাদির নাম চির বিখ্যাত করিবার জন্য তিনি পাশাপাশি "আরামগা" নামক দুইটী প্রকাণ্ড সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই দুইটী সমাধি মন্দির ক্যানিং কলেজের অতি সান্নিধ্যেই অবস্থিত। ইহার অনতিদূরেই সুপ্রসিদ্ধ কৈশরবাগ। এই দুইটী সমাধি মন্দিরের মধ্যস্থল দিয়া একটী রাস্তা বরাবর ছত্রমঞ্জিল পর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রকাণ্ড সমাধি মন্দির দুইটী রাস্তার দুই ধারে গর্ব্বিত ভাবে দাঁড়াইয়া যেন ক্ষুদ্র পথিকদিগকে বিদ্রূপ করিতেছে। আমরা সাদত আলির সমাধি মন্দির মধ্যে সাহস করিয়া ঢুকিয়াছিলাম। অন্যান্য সমাধি মন্দির গুলির ন্যায় এগুলি সুরক্ষিত নহে। তজ্জন্য ইহার চারিদিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গৃহের মধ্যে রাশিকৃত জঞ্জাল জমিয়াছে—প্রকাণ্ড গম্বুজের নীচে, কার্ণিসের উপর পাখীতে বাসা করিয়াছে। গৃহমধ্যে তামসী রাক্ষসী বিকট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। ঘরটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে দুই একজন স্থানীয় অধিবাসী নিষেধ করিলেন—তাঁহারা বলিলেন—গৃহমধ্যে সর্পাদি হিংস্র সরীসৃপ বিচরণ করিয়া থাকে—এইজন্য কেহই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে যায় না। কিন্তু আমরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিলাম। ঘরটী এত শীতল যে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের আতপ তাপ ও পরিশ্রম-জনিত ঘর্ম্ম বিদূরিত হইয়া গেল। সাদত খাঁর গোরের (Towerএ) উঠিতে যাইতেছিলাম—কিন্তু বার বার সর্প ভয় দেখানতে কৌতূহলকে সেই স্থানে সমাধিস্থ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। মুরশীদ জাদির গোরের ভিতর যাইতে গেলেও ঐরূপ গোল। একটী লক্ষ্ণৌবাসী ভদ্রলোক বলিলেন—উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার একজন ইংরাজ এক কৃষ্ণসর্পের দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তদবধি আর কেহ উহার সামাবর্ত্তী হয় নাই। আমরা এ বাধায় কর্ণপাত না করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু সন্ধ্যার ছায়া তাহার ভিতর পড়াতে ঘরটী অতি অন্ধকার হইয়াছিল—সুতরাং ফিরিয়া আসিলাম। যেস্থলে সাদত আলির ও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছে পূর্ব্বে এই স্থানে গাজিউদ্দিন্ হায়দারের নিজ মহল ছিল। তিনি রাজ্যাধিকারী হইয়া সাদত খাঁর মহল অধিকার করিয়া নিজ প্রকাণ্ড বাটীটি ভূমিসাৎ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কোন উজীর সাহস করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে নবাব দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন—"আমি পিতার প্রাসাদ অধিকার করিয়াছি, তাঁহাকে তৎপরিবর্ত্তে নিজপ্রাসাদ প্রদান করিলাম। ঐ স্থানে আমি তাঁহার গোর নির্ম্মাণ করিয়া দিব। "সাহমঞ্জিল" নামে আর একটী ক্ষুদ্রপ্রাসাদ ইহাঁর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। নবাব এই প্রাসাদের উপর বসিয়া হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, হরিণ, বন্য বরাহ প্রভৃতি জন্তুর যুদ্ধ দেখিতেন।

দৈহিক বলও ক্ষণকালের জন্য তিরোহিত হয় এবং পিপাসার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; শরীরের পোষণ ক্রিয়ারও হ্রাস হয়; তন্নিবন্ধন দেহ শীর্ণ দুর্ব্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং বিবিধ স্নায়ু-শূল উপস্থিত হইয়া থাকে; কচিৎ মদাতঙ্কের ন্যায় লক্ষণও প্রকাশ পায়। পিত্তপ্রধান ধাতুতে ধূমপান করিলে মধ্যে মধ্যে ভেদ ও বমন হয় এবং তাহাতে নেসা হইলে ক্রমে শিরোঘূর্ণন, শারীরিক অবসাদন, পেশী-সকলের শৈথিল্য, নাড়ীর দৌর্ব্বল্য, ঘর্ম্ম, শরীরের শীতলতা প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। বায়ু-প্রধান ধাতুতে অধিকতর নেসা, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; কারণ উক্ত ধাতু-সম্পন্ন ব্যক্তির চঞ্চল স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া গুড়ুকের আক্ষেপ-নিবারক গুণে একেবারে মন্দীভূত হইয়া পড়ে এই নিমিত্ত দ্রুত আসিয়া ধূমপান করিলে লোকে স্তম্ভিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়ে।

তামাক দন্তশোধক নহে।

দন্তমূল দৃঢ় হইবেক বলিয়া অনেক ব্যক্তি তামাকের গুল-চূর্ণে দন্ত মার্জ্জন করে; অনেকের এই সংস্কার আছে যে উহার ধূমপানে দন্তমূলের দৃঢ়তা ও শুদ্ধি হয়; যাহারা শুকা খায়, এবং যাহারা তামাক পোড়া দন্তে দেয় তাহাদের সকলেরই এই বিশ্বাস। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তামাক দ্বারা দন্তের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে। মাঢ়ি দৃঢ় থাকিলেই দন্ত অলড় ও দৃঢ় থাকে। তামাক দ্বারা যখন মাংসপেশী শিথিল হইয়া যায়, তখন দন্তসকলও শ্লথমূল হইয়া পড়ে। গুলচূর্ণে দন্ত মার্জ্জন করিলে উহার কণা সকল দন্তমূলে সঞ্চিত হয়, এবং ক্রমে মাঢ়িকে শিথিল করিয়া ফেলে। পারদ-সেবন উর্দ্ধ-শ্লেষ্মা বা পুরাতন উদরাময় প্রভৃতির জন্য মাঢ়ি শিথিল হইলে তামাকের দ্বারা উহার প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া নিম্ব বকুল ও খদিরাদির কাষ্ঠে দন্ত ধাবন করিলে, এবং কষজলে কুলি করিলে উপকার পাইবার সম্ভাবনা। তামাকের অবসাদক গুণে দন্তমূলের স্নায়ু সকল অসাড় হইলে কিয়ৎক্ষণ ক্ষতজনিত যন্ত্রণা স্থগিত থাকে বটে; কিন্তু এমত বিষময় সামগ্রীর পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। শিশুদের এবং যাহারা তামাক খাওয়া অভ্যাস করে নাই তাহাদের দন্তপাঁতি কেমন সাদা, শক্ত ও সুশ্রী।

তামাক দ্বারা স্নায়ু দৌর্ব্বল্য।

এক্ষণে অনেক ব্যক্তিকে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যাইতেছে। ইংরাজিতে ইহাকে "নার্ভস্‌ডিবিলিটি" কহে। শুক্রক্ষয়, দুশ্চিন্তা ও অপরিমিত তামাকের ধূমপান ইহার কারণ বলিয়া চিকিৎসকেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মৃত মৌলবী তমিজ খাঁ কহিয়াছেন, তিনি এই স্নায়ুদৌর্ব্বল্য নামক বায়ু-কুপিত রোগাক্রান্ত অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুই কারণে যাহাদের রোগ হইয়াছিল, তাহাদিগকে সংযত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিতে ব্যবস্থা দিয়া এবং পুষ্টিকর আহার ও বলকর ঔষধ দিয়া নীরোগ করিয়াছিলেন। আর তাম্রকূট সেবন যাহাদিগের রোগের কারণ তাহাদিগকে আরোগ্য করিতে পারেন নাই; তামাকের অবসাদন গুণে তাহাদের মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা ও তাহার শাখাসকল এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, যে কুঁচিলা ও লৌহ ঘটিত স্নায়বীয় উত্তেজক ঔষধ সেবন দ্বারা তৎসমুদায় প্রকৃতস্থ হয় নাই। তাম্রকূট ধূমপায়ী এইমত আটাইশ জন রোগীর মধ্যে কেবল চারি জন তামাক ত্যাগ করাতে বিনা ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

কার গ্রাহ্য হয় না। বসন্তকালে যখন গোলাপ, কামিনী যূথী ও মল্লিকাদি পুষ্পের দূরগামী ও জনমনোহারী গন্ধে অন্ধ হইয়া ভৃঙ্গগণ রঙ্গ করিয়া বেড়ায়, তখন নাসারন্ধ্রকে নস্য পূর্ণ করিয়া রাখিলে ইচ্ছা করিয়া আঘ্রাণ সুখের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। বহুকাল ব্যবহার করিলে তালুর প্রান্তস্থ মাংসপেশী সকল শিথিল হয়, এজন্য অনুনাসিক বর্ণ উচ্চারণের ক্ষমতা থাকে না; অনেক প্রাচীন নস্য-সেবকের বাগযন্ত্রে গঙ্গা বঙ্গ প্রভৃতি শব্দ সকল যে গগ্‌গা বগ্‌গ রূপে উচ্চারিত হয় তাহার এই কারণ। অতিরিক্ত নস্য ব্যবহারের আর এক প্রধান দোষ এই যে, উহার কিয়দংশ গলনলী দিয়া আমাশয়ে প্রবিষ্ট হয় এবং মন্দাগ্নি ও রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে।' নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অপরিমিত নস্য ব্যবহার করিতেন বলিয়া রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। * তিনি প্রায় সমুদায় ইয়ুরোপ জয় করিয়াছিলেন কিন্তু সামান্য নস্যকে পরাভব করিতে পারেন নাই। "কদভ্যাস সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।"

চিকিৎসা শাস্ত্রে তামাকের এই কয়েকটি গুণ দৃষ্ট হয়, যথা স্নায়বীয় অবসাদক, বমন কারক, লালানিঃসারক, রেচক, কীটনাশক, রুক্ষ, আক্ষেপনিবারক এবং মাদক। চুঁয়াইলে উহা হইতে যে তৈল, নির্গত হয় তাহা জীবের শরীরে বিষের কার্য্য করে। উহা সুরাসার অহিফেন গাঁজা প্রভৃতি সমুদায় মাদক অপেক্ষা তীব্র এবং বিষধর্ম্মী; কোন ইউরোপীয় চিকিৎসক একটা কুকুরের গলদেশস্থিত শিরাতে ছিদ্র করিয়া তাহাতে প্রথমে সুরাসার ও তৎপরে অহিফেনের পিচকারী দিয়াছিলেন। তাহাতে কুকুরের কোন দৈহিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয় নাই, অপর একদিন এক বিন্দু তামাকতৈল ঐরূপে শিরাস্থ করিলে সে দুই বিপলের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। নলিচাতে যে তামাকের কাইট পড়ে, তাহাতে ঐ তৈল বিদ্যমান আছে; উহা যে বিষস্বরূপ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কাফ্রিরা এইমত তামাকের কাইট দিয়া সর্প বিনষ্ট করিয়া থাকে। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা অন্ত্রবদ্ধ রোগে এবং অন্ত্রবৃদ্ধি আবদ্ধ হইলে তাম্রকূটের পিচকারি দান করিতেন। তদ্ভিন্ন ধনুষ্টঙ্কার লিঙ্গ নালাপেক্ষ প্রভৃতি রোগেও উহা ব্যবহৃত হইত; কিন্তু তামাকের সাংঘাতিক বিষধর্ম্মী তৈল দ্বারা বিস্তর বিপদ সংঘটিত হওয়াতে উহা এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং অন্যান্য ঔষধ তাহার পরিবর্ত্তে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হইতেছে; গাঁজা, সুরা, চরস ও অহিফেনের সার ভাগ প্রভৃতি সকল মাদক অপেক্ষা, নিকটিন নামক তামাক তৈল ভয়ানক বিষ; ইহা অধুনাতন রসায়ন বিদ্যা ও দ্রব্যগুণ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, গুড়-ম্রক্ষিত হওয়াতেই তামাকের গুড়ুক নাম হইয়াছে। ইহার ধূম পান করিবার পূর্ব্বে হুকা, আল্‌বোলা, গট্‌কা, বিদ্‌রি ফুরশী প্রভৃতির জলে অনেক বিশোধিত হইয়া আসে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইতে পারে না। এ কারণ নলিচা ও কলিকার অন্তর্ভাগের ন্যায় গল-নালীতেও কাইট সঞ্চয় হইয়া থাকে এবং বায়ুনলীর মাংসতন্তু ও স্নায়ু সকল শিথিল হওয়াতে এমন স্পর্শ-শক্তি-হীন হইয়া পড়ে, যে পুনঃ পুনঃ তাহাতে তীব্র ধূম না লাগিলে আর সাড় হয় না। বায়ুকোষস্থিত স্নায়ু সকলের স্থিতিস্থাপকতা গুণ ক্রমে হ্রাস হইয়া আসে; বৃদ্ধাবস্থার অনেক পূর্ব্বে যে অধিকাংশ লোক কাশ-রোগাক্রান্ত হয়, অপরিমিত ধূমপান তাহার এক কারণ নির্ণীত হইয়াছে।

তাম্রকূট ধূমপানে ক্ষুধামান্দ্য করে; ক্ষুধার সময়ে ধূমপান করিলে বুভুক্ষার সহিত

* Anatomy of Drunkeness.

দিকে কাহার দৃষ্টি? মেকলে আমাদের মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকি, কিন্তু সমাজের এই মিথ্যা পালন করিতে আমরা কতদূর বিরক্তি প্রকাশ করি?

তোমরা বলিবে এ সমস্তই পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল—ইংরাজ সমাজের আদর্শ। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যে দোষ নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার গুণগুলির স্থানে আমরা দোষই অধিক গ্রহণ করি কেন? তাহা ছাড়া, পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল আমাদের উপর যেরূপই হউক না কেন—কিন্তু তাই বলিয়া ইংরাজ সমাজের আদর্শ—যে মিথ্যা-সমাজ সমাজের একটা ভাণ মাত্র ছায়া সমাজ ইহা বলিতে পারি না। ইংরাজ সমাজের আর সহস্র দোষ থাক হইা প্রকৃত সমাজ তাই তাহাদের এত উন্নতি। একজন পরস্ত্রী-হারকের সহিত আমাদের সমাজ স্বচ্ছন্দে একসঙ্গে বসিয়া পানাহার করিবে, কিন্তু ইংরাজ সমাজের এরূপ লোকের প্রতি কিরূপ আচরণ! সমাজের ঘৃণা কি ভয়ানক তাহা ইংরাজ সমাজই বুঝে, আমাদের সেরূপ সমাজও নাই অন্যায়ের প্রতি হাড়ে হাড়ে ঘৃণাও আমরা অনুভব করিতে জানি না!

রাজনৈতিক ব্যবহারে আমরা তাহাদের যথেষ্ট অন্যায়াচরণ দেখিতে পাই সত্য,—কিন্তু তাহাদের এই কার্য্যগত অন্যায়ের মধ্যে ন্যায়ের দিকে ভাবগত একটা দৃঢ় অনুরাগ দেখা যায়। এই অনুরাগ-বলে কত মহাত্মা ইংরাজ তাঁহাদের জাতির অন্যায় মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেন, বুঝিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করেন, বিজিতের হইয়া নিজজাতির সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করেন। এই মহাত্মাদিগের অভ্যুদয়ই তাহাদের সমাজের ফল, সমাজের মহত্ব। এইখানেই তাহাদের জাতিগত উদারতা, এই মহত্বে আমরা তাহাদের সহস্র সঙ্কীর্ণতা অন্যায়াচরণ ভুলিয়া তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমাদের যদি বড় লোক হইতে হয়—ত আমাদের প্রকৃত সমাজ গঠন করা আবশ্যক। রাজনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে যেমন রাজনৈতিক-কনগ্রেস স্থাপিত হইয়াছে—সামাজিক উন্নতির অভিপ্রায়ে এইরূপ একটা কিছু না করা হয় কেন?

সমালোচনা।

তামাকের গুণ ও দোষ। শ্রীসাতকড়ি দত্ত প্রণীত। লেখকের মতে তামাকে গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগই অধিক। অনেকগুলি ইয়োরপীয় ডাক্তারদিগের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মতটি তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পুস্তক হইতে নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ভরসা করি কেহ কেহ ইহা হইতে উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বাঙ্গালাতে তামাক এক্ষণে পাঁচ প্রকারে ব্যবহৃত হয়; যথা, চুরট, তামাক পোড়া, তাম্বুল সহিত, নস্য, এবং গুড়ুক। চুরট প্রভৃতি প্রথমোক্ত তিন প্রকারে তামাক ব্যবহার করিলে অধিক পরিমাণে লালা ক্ষরিত হয়। লালা অন্ন পরিপাকের এক প্রধান উপকরণ। এইরূপে অনর্থ লালার অপক্ষয় হইলে পরিপাক ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম হয়।

নিয়ত নস্য ব্যবহারে নাসিকার শ্লেষ্মাত্মক ঝিল্লিতে প্রদাহ জন্মে, সুতরাং অবিরত তাহার গাত্র হইতে শোণিতের জলীয়াংশ শ্লেষ্মারূপে নিঃসৃত হইতে থাকে। নস্য সেবনে আঘ্রাণ স্নায়ুর ক্রিয়া মন্দ হইয়া যায়; এজন্য অল্প দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ কিছু কিছু নাসি-

আমাদের সমাজ।

কেনা বড় হইতে চায়—আমরাও চাই। আমরা ধন চাই, মান চাই, গভর্ণমেণ্টের নিকট বড় বড় চাকরী চাই, আমরা ইংরাজের সমকক্ষ হইতে চাই, এক কথায় অধীন হইয়া আমরা স্বাধীন হইতে চাই। বেশ কথা, কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা কি ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া জয় হউক বলিয়া গভর্ণমেণ্টের দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইলেই আমাদের পূর্ণ হইবে? ভিক্ষা করিয়া শাক ভাতের কড়ি মিলিতে পারে—তাহাই আমাদের মিলি-তেছে—কিন্তু ভিক্ষায় কি আকাঙ্ক্ষা মেটে—বড় লোক হওয়া যায়?

তুমি বলিবে—কেন আমরা কি ভিক্ষা করিতেছি—আমাদের নিজের ধন নিজের অধিকার ফিরিয়া চাহিতেছি, ইহা কি ভিক্ষা? ইহা পাইব না কেন?

সংসার সেরূপ উদারতার উপর স্থাপিত নহে, যতক্ষণ চাহিতে হয় ততক্ষণ নিজের জিনিসও তোমার অধিকারের ধন নহে—তাহাও ভিক্ষা—আর ভিক্ষায় অধিকার মেলে না। যে আর্য্যজাতির বংশ বলিয়া তুমি গৌরব কর, যাহার উদারতা জগৎবিখ্যাত, সেই জাতি যখন ভারতের আদিমজাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—তখন তাঁহারা পরাজিতের প্রতি কিরূপ উদারতা দেখাইয়াছিলেন? সেই উদারতার গুণে এখনো তাহারা দাসের জাতি শূদ্র। আর সেই বেদস্পর্শ-নিষিদ্ধ শূদ্র জাতি আজ নিজের যোগ্যতা বলে বেদ প্রকাশ করিয়া ধন্য নাম লাভ করিতেছেন—কোন ব্রাহ্মণ আর্য্য তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে সমর্থ? যে দিন যোগ্য হইবে, সেদিন ভিক্ষার প্রয়োজন হইবে না, আপনা হইতে তোমাদের অধিকার তোমাদের হাতে আসিবে। যদি যোগ্য হইতে চাও ত সমাজকে মানুষ করিয়া তোল, সত্যের উপর মহত্ত্বের উপর জ্ঞানের উপর সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর।

এখন আমরা কথায় কথায় সমাজ সমাজ করি, প্রতিকার্য্যে সমাজের দোহাই দিই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের সমাজ আছে কি? সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধিত করিয়া সমাজ-গত প্রতি ব্যক্তির অন্যায় কার্য্য হইতে সমাজের জন সাধারণকে রক্ষা করাই সমাজের উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজশাসন ভয়ে কে আজ কোন অন্যায় কর্ম্মটা করিতে বাকা রাখিতেছে? কিছুদিন পূর্ব্বে বরং সমাজের একটা শাসন ছিল, কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে সমাজ তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিতে পারিত,—এবং করিত, কিন্তু এখন? এখন সমাজের ভয়ে অন্যায় কার্য্য করিতে কাহাকে কুণ্ঠিত হইতে হয় না, কিন্তু ন্যায় কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়। মিথ্যার উপরেই এখনকার সমাজের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ই এই সমাজের শিক্ষা। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাহা তুমি সত্য বলিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া শিক্ষা পাইতেছ, যদি সমাজ মানিয়া চল তবে তাহার বিপরীত তোমাকে করিতেই হইবে।—সমাজ ন্যায়কে দণ্ড বিধান করে—অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। বিধবা বিবাহ অন্যায়—কিন্তু গুপ্ত ভাবে শত সহস্র অপরাধ কর তাহা মার্জ-নীয়। নিয়মিত হোটেলে গিয়া অথবা মুসলমান চাকর রাখিয়া খানা খাও—তাহা সমাজ দেখিয়াও দেখিবে না,—তাহা দেখিলেই ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যায়—সুতরাং তাহা অপ্রকাশ্য। আর বিলাত যে যায়—সে মার্কামারা, —নিয়মিত যবনান্নাহারী আর্য্য হিন্দুগণ সেই প্রকাশ্য ম্লেচ্ছ-স্পৃষ্ট বিলাতীকে জাতিচ্যুত করিয়া তবে অন্য কথা কহেন। এইত সমাজের অবস্থা। আমাদের শিরা বিশিরার মধ্যে মিথ্যা প্রবিষ্ট করাইয়া সমাজ হাড়ে হাড়ে আমাদিগকে মিথ্যানুরাগী করিয়া তুলিতেছে—ইহার

বসন্তরাগ ও বাসন্তী-যামিনী।

"চূতাঙ্কুরে নৈব কৃতাবতংসো বিঘূর্ণমানা রুণ পদ্ম নেত্রঃ
পীতাম্বরঃ কাঞ্চন চারু দেহো বসন্ত রাগো যুবতী প্রিয়শ্চ।"

হরিত কানন, লতা কুঞ্জবন
দোয়েলা কোয়েলা গায়।
গন্ধে ভর ভর, ফুল্ল ফুল থর,
উথলে সুবাস বায়।
রসে মাতোয়ারা, ভ্রমরী ভ্রমরা
গুণ গুণ গুণ গুণ,
এ ফুলে ও ফুলে যেন বসে ভুলে.
সুচতুর সুনিপুণ!
মুকুট সুন্দর চূতাঙ্কুর থর!
দোদুল মৃদুল বায়,
সুপীত বসন, সুবর্ণ বরণ,
ফুলে ফুলময় কায়।
নাচে ধীরি ধীরি, ময়ূর ময়ূরী
খুলে চাঁদ আঁকা পাখা,
প্রেমে ঢর ঢর, নয়ন উজর,
মধুর আনন রাকা!
দুলি দুলি দুলি, মরাল মরালী
চারু সরোবরে ভাসে।
করে ফুলথর, প্রফুল্ল অধর
বসন্ত মৃদুল হাসে!

বাসন্তী-যামিনী।

বিমল নিশি, পুলকে দিশি
রজত হাসি হাসিছে।
আপনা হারা বিবশা ধরা
সুরভি-বাস শ্বাসিছে।

হেলিত ছায়া, ললিত কায়া,
দোদুল ফুল-লতিকা।
সমীর চুমে তটিনী ঘুমে,
উজল তারা-মালিকা!
কুসুম বধূ, হৃদয়ে মধু
বঁধুর মুখ চাহিয়া!
পুলকে গ'লি, বিভল অলি,
গাহিছে গান সাধিয়া।
কূজিত পিক মোহিত দিক
ডাকিছে ও কি বধূরে?
মধুর নিশি মধুর শশী,
মিশিছে মধু মধুরে!
আকুল প্রাণ, আকুল তান
চাহে চরণ কমল;
কোথায় সখা! দেহ হে দেখা?
ভকত আঁখি সজল।

বিদ্রোহ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুরের খাস মজলিষ। বিকালবেলায় সাজ সজ্জার পর মহিষী সেমন্তী সখিদিগকে লইয়া প্রমোদ গৃহে বসিয়াছেন, যুবতীগণের কাহারো হাতে বীণা, কাহারো হাতে সেতারা, কাহারো কোলে ঢোল কেহ বা মন্দিরা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা বসিয়া বসিয়া পায়ে ঘুঙ্গুর পরিতেছেন, এখনি নৃত্যগীতের একটা মহা ধূম পড়িয়া যাইবে, আয়োজন সবই ঠিক তবু সমস্তই বেঠিক, কোন্ গানটি যে আগে আরম্ভ হইবে সেই অবধি তাহা ঠিক হইয়া উঠিল না—লক্ষ্মী বলিলেন 'সেইটে ধর—এ ক্যায়সে পীরিতি বঁধুয়া,'

শ্যামা বলিল 'না, ওটা না, সেইটে, রাধা নামে বাজল বাঁশরী,'

অন্নপূর্ণা বলিল 'না না, বাজল রুণুঝুনু নাচ সহচরী'—

মহিষী বলিলেন 'আচ্ছা এইটাই হোক'

কিন্তু চম্পা তাহাতে আপত্তি করিলেন 'ছিঃ ওটা পচা,'

চামেলি বলিলেন 'তোর কাছে পচেছে আমাদের পচেনি, ঐটেই হোক,'

এইরূপে কোন গানটি গাহা হইবে তাহা লইয়া একের সঙ্গে অপরের সম্পূর্ণ মতের

অনৈক্য দাঁড়াইতে লাগিল, অবশেষে সর্ব্ববাদী-সম্মত না হউক একটি গান স্থির করিয়া মহিষী বলিলেন 'ঐটেই গা, আর গোল করিস নে'।

যাহাকে বলিলেন সে বলিল "তুমি আগে গাও" তখন এক গোল হইতে আর এক গোল পড়িয়া গেল, সকলেই সকলকে বলিতে লাগিল 'তুমি আগে গাও'!

গোলযোগ দেখিয়া মহিষী গাহিতে যাইতেছেন, তানপূরায় সুর দিয়াছেন—এই সময় তাঁহার দুই বৎসরের শিশু পুত্র ছুটিয়া আসিয়া তানপূরার কাছে কোলের উপর এক রকম করিয়া স্থান করিয়া লইল। ঘরের কোণে একটা মস্ত পাখোয়াজ ছিল সেই পাখোয়াজটাকে টানা হেঁচড়া করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া এতক্ষণ সে কোন প্রকারে এখানে আনিবার উদ্যোগে ছিল, রাণী তানপূরায় সুর দিবামাত্র পাখোয়াজটা ফেলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল, তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিল "হ্যাঁ গাও"

কিন্তু ইহাতে কি আর গান হয়? মহিষী তানপূরাটা ফেলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন—শ্যামাকে বলিলেন "না তুই ধর, তোর সঙ্গে আমি ধরিতেছি"

শ্যামা খুব ভাল গাহিতে পারিত। শিশু তাহা শুনিয়া আধো আধো সুরে বলিয়া উঠিল "না তুমি গাও ধামা গাবে না, হাঁ গাও" মহিষী আবার তাহার মুখ চুম্বন করিলেন বলিলেন—"না ধ্যামা গাবে না, আমার বাপ্পু গাবে, গা দেখি একটা" বাপ্পু বলিল "না তুমি গাও' রাণী বলিলেন 'আচ্ছা আমি গাহিতেছি তুই আমার সঙ্গে গা" বাপ্পু বলিল 'আচ্ছা'—রাণী গাহিলেন

> মধু বসন্ত সখিরে—
> যৌবন-আকুল—ফুল্ল কুসুম কুল
> উলসিত ঢল ঢল শশীকর মাখি রে।
> সমীরণ চঞ্চল, যমুনা কলকল,
> কুহরত কুহু কুহু নিকুঞ্জে পাখিরে।
> সুহাসিত যামিনী, সচকিত কামিনী
> কম্পিত হিয়াপর ঝর ঝর আঁখিরে।
> কাঁহা বৃন্দাবন হরি? কাঁহে মধু বাঁশরী
> বাজিল না আজু মরি রাধা রাধা ডাকিরে।

বালক আধো আধো অস্পষ্ট সুরে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল, সখীরা আস্তে আস্তে মন্দিরা বাজাইতে লাগিল, আস্তে আস্তে তানপূরাতে সুর ধরিল, সেই মধুর সঙ্গীত নিস্তব্ধে সকলে শুনিতে লাগিল। দুই একবার গাহিয়া রাণী থামিলেন, বালক বলিল 'আর একটা'

রাণী বলিলেন 'ঐ শ্যামাকে বল' বালক মায়ের গলা জড়াইয়া বলিল 'মা ধ্যামা না, তুমি" রাণী বলিলেন—'তবে শ্যামা রাগ করবে'

শ্যামা বলিল 'হ্যাঁ তবে আমি কাঁদব' বালক তবুও বলিল 'না ধ্যামা না, মা গাবে"

শ্যামা বলিল 'তবে আমি রাগ করলুম, আয় চম্পা আমরা আর এখানে থাকব না" চাঁপার হাত ধরিয়া শ্যামা গৃহের বাহির হইল,. বালক কাঁদিল, 'ধ্যামা ধ্যামা, না ধ্যামা যাবে না"

ধ্যামা বলিল 'ধ্যামা রাগ করেছে আর কি ধ্যামা থাকে"—বলিয়া চাঁপাকে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। রাণী বলিলেন 'রকম দেখ ছেলেকে কাঁদিয়ে গেল' তিনি আদর করিতে লাগিলেন, সে আবদার করিতে করিতে তাঁহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল, গানের পালা এইরূপ করিয়া শেষ হইল। সখীরা যন্ত্রাদি যেখানকার যা উঠাইয়া রাখিয়া আপন আপন কাজে কর্ম্মে গেল, রাণী ঘুমন্ত ছেলেকে দাসীর কোলে দিয়া বলিলেন—"তারা গেল কোথায় রে?"

"দাসী বলিল 'কারা মা?'

রাণী বলিলেন "শ্যামা আর চাঁপা?"

দাসী বলিল "তারা ঐ বাগানে গাছতলায় গিয়া বসে আছে"

রাণীও বাগানে গমন করিলেন, আড়াল হইতে গিয়া একজনের চোখ টিপিয়া ধরিবেন ভাবিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে আর সব ভুলিয়া গেলেন—শুনিলেন শ্যামা বলিতেছে "সত্যি ভীলের মেয়ে এত সুন্দরী? আমাদের রাণী থাকতে রাজা তার রূপে মুগ্ধ?

চাঁপা বলিল "সত্যি না ত কি মিথ্যে? লোকেরা কি বলছে তা বুঝি জানিসনে?

"কি বল দেখি?"

"ভীল খুন করতে গিয়েছিল তবুও যে ছেড়ে দিলেন সে আর কিছু না কেবল ভীলের মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে।"

রাণী আর লুকাইয়া রহিলেন না, নিকটে আসিয়া বলিলেন "কি কথা হচ্ছে? তোদের ভীলের মেয়ে কে সুন্দরী?"

রাণীকে দেখিয়া তাহারা জড় সড় হইয়া পড়িল শ্যামা বলিল—"ঐ চাঁপা বলিতেছিল"

চাঁপা বলিল "মাগো শ্যামা এত জানে, আমি না শুনলে কি আর বলি"?

ও কথা বলিল বলিয়া শ্যামার উপর সে মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল।

শ্যামা বলিল 'আমি কি বলছি যে না শুনে তুই বলেছিস? ও ওর স্বামীর কাছে এ সব কথা শুনেছে'।

চাঁপা একজন সভাসদের পত্নী, রাজমহিষীর কাছে সর্ব্বদাই থাকিত। রাণী বলিলেন—"তা যার কাছেই শুনেছিস তাকে বলিস এ রকম মিথ্যা কথা কয়ে রাজার নামে কলঙ্ক দিলে ভাল হইবে না—আর তোরা যদি এ কথা বলাবলি করবি তো তোদের মুখ দেখব না" রাণী রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সে দিন রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। কতদিন হইল ভীলদিগের বিচার হইয়া গিয়াছে এতদিন পরে সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা—বৃদ্ধের মত গম্ভীর ভাবে—রাজার উপর রাজা হইয়া তাঁহার সেই বিচারের বিচার করিতেছিলেন। কথার মধ্যে রাণী কহিলেন—"দোষীকে শাস্তি না দেওয়া কি অবিচার নহে ?"

রাজা বলিলেন—"দোষের প্রমাণ ?"

মহিষী। কেন যেরূপ অবস্থা—তাহাতে আর কি প্রমাণ চাও ?

রাজা। "উহারা যে দোষ একেবারেই অস্বীকার করে।"

মহিষী বলিলেন—"রাজার আমাদের খুব বিদ্যে। দোষ ক'রে আবার কে স্বীকার করে ? তা হ'লে কি বিচারালয়ের আবশ্যক হোত ?

রাজা একটু হাসিলেন, বলিলেন—"ভীলেরা মিথ্যা বলেনা।"

মহিষী বলিলেন—"না ভীলেরা মিথ্যা বলে না, যত মিথ্যা আমরাই বলি, আমাদের জন্যই তোমার বিচারালয়।"

রাজা দেখিলেন এরূপে কথা কহিয়া তিনি রাণীর সঙ্গে পারিবেন না—বলিলেন—"আচ্ছা না হয় আমি দোষীদিগকেই ক্ষমা করিয়াছি সেত সুখেরই কথা। দোষীদের লঘু শাস্তির জন্য অন্য সময় তুমি আমাকে কত অনুনয় কর বলদেখি ? আজ তোমার স্বভাবে অভাব ?"

রাণী দেখিলেন তিনি হঠিয়া যান, কিন্তু আপাততঃ তাঁহার নিতান্তই ইচ্ছা—রাজার বিচারটা ঠিক হয় নাই ইহা রাজার মুখ দিয়া স্বীকার করান, সুতরাং ছোট, সুন্দর মুখখানি আরো একটু গম্ভীর করিয়া বলিলেন—

"আমাদের স্ত্রীলোকের প্রাণ, ন্যায়রূপে হউক অন্যায় রূপে হউক—কাহাকেও কষ্ট পাইতে দেখিলে তাহার উপশম করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য রাজার কর্ত্তব্য এক নহে। এক সময়ে আমরা একজনের দুঃখ সুখ মঙ্গল অমঙ্গল ছাড়া ভাবিতে পারি না, তুমি রাজা সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল—সুখ দুঃখ তোমার হস্তে, সুতরাং রাজ্যের মঙ্গল রক্ষা করিতে হইলে বিচার-নিয়ম তুমি ভঙ্গ করিতে পার না, একজন দোষীকেও তুমি বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিতে পার না।"

রাজা বলিলেন—"সত্য কথা। কিন্তু একদিকে আমি যেমন রাজা—অন্য দিকে তেমনি মানুষ। আমার রাজার কর্ত্তব্য আছে মানুষের কর্ত্তব্য নাই ? এক প্রজা হইতে অন্য প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি যখন সিংহাসনে বসি—তখন আমি রাজা—তখন আমি নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দোষীকে ক্ষমা করিতে পারি না। কিন্তু আমার নিজের প্রতি যদি কেহ অত্যাচার করে তাহাকে ক্ষমা করিতে আমার অধিকার আছে, আমি

রাজা-প্রজার সম্পর্কে; কিন্তু নিজের সম্পর্কে আমি মানুষ, মানুষ মানুষকে ক্ষমা করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে আমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহাকে আমি যদি শাস্তি দিই—তাহাকে তুমি বিচার বলিতে পার না, তাহা প্রতিশোধ। প্রতিশোধ মনুষ্যের গুণ; ক্ষমা দেবতার। এ সম্বন্ধে আমাকে দেবতা হইতে দাও।"

রাণী আর তাঁহার তর্ক বজায় রাখিতে পারিলেন না, একটা গর্ব্বময় আহ্লাদে তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইয়া উঠিল, তিনি দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন—রাজা তাঁহার আহ্লাদ বুঝিয়া হাসিয়া ধীরে ধীরে কপালে চুম্বন করিলেন।

খানিক পরে সহসা রাণী মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন "মহারাজ, আর একটা কথা শুনিতেছি, কুব্জা নাকি রাজমহিষী হইবে, ভীলের মেয়ের রূপে নাকি ভুলিয়াছ ?

রাজা মহিষীর অলকগুচ্ছ ধরিয়া ধীরে ধীরে একটু নাড়াইয়া বলিলেন—"যে ভুলের মধ্যে ডুবিয়া আছি—এইটাই ভাঙ্গুক আগে।"

মহিষী বলিলেন—"তোমার না ভাঙ্গুক লোকে যে আমার ভুল ভাঙ্গাইতে ব্যস্ত।"

রাজা সোহাগ করিয়া বলিলেন—"লোকগুলা অধঃপাতে যায় না কেন ? তাহাদের জীবনে কি আর কাজ নাই ?"

রাণী হাসিয়া প্রেমপূর্ণ উথলিত চিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—বলিলেন "আমার এমন রাগ হয়েছিল ? দেখ দেখি তোমার নামে কিনা এই রকম করে বলে।"

রাজা হাসিয়া তাহার গাল ধরিয়া টিপিয়া দিলেন। রাণীর সব রাগ গলিয়া জল হইয়া গেল। তিনি সখীদের কথা যাহা শুনিয়াছেন হাসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। রাজা শুনিয়া একটু গম্ভীর হইয়া পড়িলেন—কয় মাস পূর্ব্বে পুরোহিত যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল, তাহার পর আবার এই সব! রাজা বলিলেন "লোক আকাশেও বাড়ী বানাইতে পারে।"

রাণী সোহাগের স্বরে বলিলেন—"তা বানাক্। তাতে ত আর কারো গায়ে ফোস্কা পড়িবে না।"

প্লেটো।

টিমীয়সের বর্ণনার বাকী অংশগুলি দেওয়ার পূর্ব্বে, আমরা এই স্থলে জগতের আত্মার গঠন ও বিভাগ বিষয়ে কিছু বলিতে চাহি। প্লেটোর মতে এই আত্মা তিনটী উপাদানে গঠিত; (১) অবিভাজ্য, অপরিবর্ত্তনীয়, একরূপী অংশ, (২) বিভাজ্য, পরিবর্ত্তন-

শীল, বহুরূপী অংশ. আর (৩, ঐ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী একটী অংশ, যাহা উভয়েরই সদৃশ। আত্মার এই তিনটী উপাদান নির্দ্দেশ করার কারণ এই যে প্লেটোর মতে বস্তু দুই প্রকার; এক চিন্তনীয় ভাবসমূহ, যেমন সৎতা, সুন্দরতা ন্যায্যতা ইত্যাদি, আর বিশেষ বিশেষ বস্তুসমূহ, যেমন সৎ মনুষ্য, সুন্দরী কন্যা, ন্যায্য কর্ম্ম ইত্যাদি। উক্ত ভাবসমূহের প্রকৃতি এই যে উহারা প্রত্যেকে একরূপী অর্থাৎ সত্‌তা, সুন্দরতা প্রভৃতির প্রত্যেকে একটী মাত্র বস্তু বুঝায় আর উহারা পরিবর্ত্তনশীল নহে অর্থাৎ ঐ সকল ভাব বরাবর এক অবস্থায় আছে। মনে কর সুন্দরতা বলিয়া একটী বস্তু আছে, এই বস্তু বরাবর একই ভাবে আছে আর উহা সংখ্যায় একের অধিক নহে; কিন্তু সুন্দর পদার্থ অনেকগুলি হইতে পারে, উহা বহুরূপী, আর উহা পরিবর্ত্তনশীল—যাহা এক্ষণে সুন্দর তাহা পর মুহূর্ত্তে সুন্দর না থাকিতে পারে। প্লেটোর মতে ঐ ভাবগুলিই বাস্তবিক অস্তিত্ববান্ এবং চিরস্থায়ী আর বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলি ঐ সকল ভাবের অনুকরণে গঠিত মাত্র, তাহারা অদ্য আছে কল্য নাই। তিনি আরও বলেন ভাবগুলি চিন্তার গ্রাহ্য আর বিশেষ পদার্থগুলি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য; ভাবগুলি মানসিক বস্তু আর পদার্থগুলি জড়বস্তু; ভাবগুলির সম্বন্ধে বাস্তবিক জ্ঞান লাভ করিয়া অখণ্ডনীয় সত্য প্রকটিত করিতে পারা যায়, পদার্থগুলির সম্বন্ধে কেবল মাত্র বিশ্বাসে উপনীত হইয়া সম্ভবপর কতকগুলি মত প্রকাশ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ যাহা স্বয়ং চিরস্থায়ী তাহার প্রকৃতি-প্রকাশক জ্ঞানটীও সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে; আর যাহা স্বয়ং ক্ষণস্থায়ী তাহার বিষয়ে আমরা নিশ্চয় কিছু জানিতে পারি না, যাহা জানিতে পারি তাহা সত্য হইতেও পারে, না হইতেও পারে, অতএব তাহা কেবল বিশ্বাসের বিষয়মাত্র, জ্ঞানের ~~বিষয়~~ নহে। জগতের আত্মার যদি ভাব সমূহ ও পদার্থ সমূহ উভয়ের সহিত সম্পর্ক থাকে তবে উহার সহিত ভাব সমূহের একটী অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধ আর পদার্থ সমূহের একটী পরিবর্ত্তনশীল সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক, আর এই দুয়ের সংযোগ সাধনের নিমিত্ত উভয়ের মধ্যম একটী অংশ থাকা উচিত। জগতের আত্মা তিনটী বস্তুতে গঠিত করিয়া পরে বিশ্বকর্ম্মা উহাকে বিভাগ করিলেন, প্রথমে উহা হইতে একটী ভাগ লইলেন পরে উহার দ্বিগুণ একটী ভাগ লইলেন, তৃতীয় ভাগটী প্রথমের তিন-গুণ, চতুর্থটী চারিগুণ ইত্যাদি—১, ২, ৩, ৪, ৯, ৮, ২৭ এই পরিমাণে সাতটী ভাগ লইলেন। ইহাতে ১, ২, ৪, ৮ এই কয়টী দ্বিগুণ মাত্রার আর ১, ৩, ৯, ২৭ এই কয়টী তিনগুণ মাত্রার ভাগ; এই কয়টী দ্বিগুণ ও তিনগুণ মাত্রার ভাগের প্রত্যেক দুইটীর মধ্যে ~~আবার~~ দুইটী করিয়া ভাগ লওয়া হইল, একটী ভাগ

$$\left[১, \frac{৪}{৩}, \frac{৩}{২}, ২, \frac{৮}{৩}, ৩, ৪, \frac{১৬}{৩}, ৬, ৮\right.$$

$$\left.১, \frac{৩}{২}, ২, ৩, \frac{৯}{২}, ৬, ৯, \frac{২৭}{২}, ১৮, ২৭\right]$$

এইরূপে উহার যেটি ঐ দুয়ের একটী অপেক্ষা যতগুণ অধিক অপরটী অপেক্ষা ততগুণ

কম, যেমন ৪/৩ এই সংখ্যা ১ ও ২ এই দুয়ের মধ্যে আছে, উহা ১ অপেক্ষা তাহার ১/৩ অধিক আর ২ অপেক্ষা তাহার ১/৩ অর্থাৎ মোটে ২/৩ কম। অপর ভাগ এরূপ যে, একটী অপেক্ষা তাহা যে রাশি দ্বারা অধিক অপরটী অপেক্ষা সেই রাশি দ্বারা কম, যেমন ৩/২ এই সংখ্যা ১ অপেক্ষা ১/২ দ্বারা অধিক আর ২ অপেক্ষা আবার ঐ রাশি দ্বারা কম। ১ ও ২ এই দুয়ের মধ্যে যেমন ৪/৩ ও ৩/২, ২ ও ৪ এই দুয়ের মধ্যে আবার সেইরূপ ৮/৩ ও ৩, ৪ ও ৮ এর মধ্যে ১৬/৩ ও ৬ ইত্যাদি। ঐ সকল অংশের মধ্যে যে যে দুই রাশিতে ৪/৩ এই অনুপাত আছে, সেখানে সেখানে আবার এমন দুইটী অংশ রাখা হইল যে তদ্দ্বারা ৯/৮ এই অনুপাত হয় এবং এই দুয়ের দ্বিতীয়টীর সহিত প্রথম দুয়ের দ্বিতীয়টীর ২৪৩ঃ২৫৬ এই অনুপাত হয়। যেমন ১ ও ৪/৩ এর মধ্যে ৯/৮ ও ৮১/৬৪, এখানে দেখা যায় যে ১, ৯/৮, ৮১/৬৪, ৪/৩ এই চারিটী রাশির চতুর্থ ও প্রথমে ৪/৩ এই অনুপাত, দ্বিতীয় ও প্রথমে ৯/৮, তৃতীয় ও দ্বিতীয়ে ৯/৮, আর চতুর্থ ও তৃতীয়ে ২৫৬/২৪৩, [সেইরূপ ৩/২, ২৭/১৬, ২৪৩/১২৮, ২; ২, ৯/৪, ৮১/৩২ ৮/৩; ৪, ৯/২, ৮১/১৬, ১৬/৩; ৬, ২৭/৪, ২৪৩/৩২, ৮।] এইরূপে যতগুলি অংশ লওয়া হইল, তাহাতে আত্মার সমুদয় ফুরাইয়া গেল। আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে কি কি অনুপাত তাহা বলা হইল; হিউএল বলেন যে এই রাশিগুলি সামঞ্জস্য বাচক, অতএব বোধ হয় জগতের আত্মা শব্দে প্লেটো উহার গতি উদ্দেশ করিয়াছেন, আর আত্মার ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের অংশ দ্বারা জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশের গতির অনুপাত বুঝিতে হইবে। সঙ্গীত যেমন কতকগুলি সামঞ্জস্যময় শব্দ, এই জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশের গতিও সেইরূপ কতকগুলি সামঞ্জস্যময় মাত্রায় থাকে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিশ্বকার জগতের আত্মাকে লম্বালম্বি দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ভাগ দুইটীকে পরস্পরের উপরে হেলাইয়া ধরিলেন, পরে তাহাদিগের প্রত্যেকের মুখ দুইটী ধরিয়া যুড়িয়া দি[illegible]—এইরূপে প্রত্যেকে একটী বৃত্তে পরিণত হইল—ভাগ দুইটী পূর্ব্বে যে বিন্দুতে পরস্পরের উপর হেলিয়াছিল এক্ষণে তাহার অপর পার্শ্বে আর একটী বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদন করিল। বৃত্ত দুইটী কিরূপে পরস্পরের উপর অবস্থিত হইল তাহা এক সহজ উপায়ে উপলব্ধ হইতে পারে। একটী ভাঁটার মধ্যস্থল বেড়িয়া একটী বৃত্ত টান, পরে এই বৃত্তের উপর (তেইশ ডিগ্রি) হেলাইয়া আর একটী বৃত্ত টান। এই বৃত্ত দুইটী যেমন পরস্পরকে দুই বিন্দুতে ছেদন করিয়া অবস্থিত থাকিবে, উল্লিখিত দুইটী বৃত্তও সেইরূপ অবস্থিত মনে করিতে হইবে। এইরূপে যে দুইটী বৃত্ত গঠিত হইল, তাহাদিগের উভয়ে একই কেন্দ্র বেড়িয়া সমান বেগে ও স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া ঘুরিতে লাগিল। দুইটী বৃত্তের মধ্যে একটী বাহিরের আর একটী ভিতরের। বাহিরের বৃত্তের গতির নাম * একরূপা গতি আর ভিতরের গতির নাম বহুরূপী গতি রাখা হইল;

* এই স্থলের অর্থ নানারূপ করা হইয়া থাকে। এখানে আমরা জাউএট ও হিউএলের অর্থ দিয়াছি। গতবার গ্রোটকে অনুসরণ করিয়া বলা হয় "বাহিরের বৃত্তটীতে

একরূপী গতি পার্শ্বদিকে ডাহিনে আর বহুরূপী গতি 'তেরাচে' ভাবে বাম দিকে হইল। একরূপী গতি অবিভক্ত রাখা হইল আর সেই নিমিত্ত প্রবল রহিল, কিন্তু বহুরূপীগতির বৃত্ত ছয় স্থলে ভাঙ্গিয়া যে সাতটী অংশ হইল, তাহা হইতে সাতটী অসমান বৃত্ত করা হইল। এই সাতটী বৃত্তের (ব্যাসার্দ্ধ) পরিমাণ ১, ২, ৩, ৪, ৯, ৮, ২৭ ; এই বৃত্ত কয়টী চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই কয়টী তারকার কক্ষ। এই সাতটী তারকার কক্ষগুলিকে বিশ্বকর্ত্তা পরস্পরের বিপরীত দিকে ঘুরিতে আদেশ দিলেন, এবং তিনটীকে (সূর্য্য, বুধ ও শুক্রকে) তিনি সমান বেগ দিলেন আর বাকী চারিটীকে তিনি পরস্পরের ও অপর তিনটীর সহিত অসমান বেগে ঘুরাইয়া দিলেন।

এস্থলে বাহিরের বৃত্তশব্দে জগতের নিরক্ষপ্রদেশ আর ভিতরের বৃত্ত শব্দে ক্রান্তিবৃত্ত † বুঝিতে হইবে ; নিরক্ষ প্রদেশ দিঙ্‌মণ্ডলের সমরেখ আর ক্রান্তিবৃত্ত তাহার উপর ২৩½ ডিগ্রিতে হেলিয়া অবস্থিত আছে, ইহার অর্দ্ধেক নিরক্ষবৃত্তের উপরে, অর্দ্ধেক নীচে। পৃথিবীকে এখানে জগতের মধ্যস্থলে ধরিয়া চন্দ্র সূর্য্যাদি উহার চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে ঘুরিতেছে মনে করা হইয়াছে। চন্দ্র সূর্য্যাদি জগতের দৈনিক গতিতে নিরক্ষ প্রদেশের সমান্তরালে একবার করিয়া নিজ অক্ষদণ্ডের উপর ঘুরে [অতএব তাহারা বাহিরের বৃত্তের প্রবলতর গতি দ্বারা চালিত হয়] আর তাহা ছাড়া তাহারা এই গতির বিপরীতে ক্রান্তিবৃত্তের সমান্তরালে (প্রথম গতির পথের উপর হেলিয়া) নিজ নিজ কক্ষে ঘুরিয়া থাকে আর এইরূপে চন্দ্র একমাসে, সূর্য্য বুধ ও শুক্র এক বৎসরে, মঙ্গল প্রায় দুই বৎসরে বৃহস্পতি প্রায় বার আর শনি প্রায় ত্রিশ বৎসরে একবার করিয়া নিজ কক্ষ ঘুরিয়া আইসে। [প্লেটোর মতে সূর্য্য, বুধ শুক্র এই তিনটীকে সমানবেগ দেওয়া হয়, ইহার অর্থ যদি এই বুঝায় যে উহারা সকলেই একই সময়ে নিজ নিজ কক্ষ ঘুরিয়া আইসে তাহা হইলে এক অর্থে ঠিক, কিন্তু বেগ বলিতে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কতখানি গতি হয় ইহা বুঝায়—সুতরাং কক্ষের পরিমাণ ভিন্ন হইলে বেগ ভিন্ন ধরিতে হইবে কারণ কক্ষ ঘুরিবার সময় তিনের পক্ষেই সমান।]

স্রষ্টা জগতের আত্মা গড়াইয়া পরে উহার দেহ প্রস্তুত করিলেন এবং তখন আত্মায় দেহ সংযুক্ত করিলেন ও একের কেন্দ্র অপরের কেন্দ্রের উপর যুক্ত করিলেন। আত্মা এইরূপে গগণের (জগতের) কেন্দ্র হইতে অন্তিম বাহির সীমা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিল আর নিজের মধ্যে নিজে ঘুরিয়া এক চিরস্থায়ী ও জ্ঞানময় ও সর্ব্বকাল

আত্মার অবিভাজ্য বস্তু রহিল আর ভিতরের বৃত্তটীতে বিভাজ্য বস্তুটী।" বহুরূপী গতি তেরাচে ভাবে ঘটে ইহার অর্থ এই যে, যে বৃত্তটীতে এই গতি ঘটে তাহা একরূপী-গতির বৃত্তের উপরে হেলিয়া (সাড়ে তেইশ ডিগ্রি) অবস্থিত।

† সূর্য্য সম্বৎসরে যে পথ ভ্রমণ করে তাহাকে ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ কহে।

ব্যাপী জীবন আরম্ভ করিল। জগতের দেহ দর্শনগোচর কিন্তু উহার আত্মা তাহা নহে, ইহাতে জ্ঞান ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে। আত্মা তিনটী বস্তুতে গঠিত; (১) একভাবাপন্ন বস্তু, (২) বহুরূপী বস্তু, আর (৩) উভয়ের মধ্যম একটী বস্তু; অতএব উহা অন্যান্য বস্তুগণের মধ্যে কি কি সম্বন্ধ তাহা সহজেই উপলব্ধি করিবে, সাদৃশ্য বা একত্ব উহার প্রথম অংশের সাহায্যে আর বিভিন্নতা দ্বিতীয় অংশের। আত্মার বুদ্ধি যখন জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রদেশে কার্য্য করে তখন মত ও বিশ্বাস উৎপন্ন হয় আর যখন জ্ঞানময় প্রদেশে কার্য্য করে তখন জ্ঞান ও বোধ উৎপন্ন হয়। [এইস্থলে প্লেটোর অর্থ কি তাহা বলা কঠিন, হিউএল উহা বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন। জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশই বা কোন্‌টী আর জ্ঞানময় অংশই বা কোন্‌টী—পূর্ব্বে দুইটী বৃত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, একটী বাহিরের আর একটী ভিতরের। বাহিরের বৃত্ত একরূপী, এইটীর নিকটে বোধ হয় জ্ঞানময় প্রদেশ আর অপরটী বহুরূপী, এইটীর নিকটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রদেশ। এখানে আর একটী বিষয় বলা আবশ্যক; প্লেটোর মতে জ্ঞান দুই প্রকার, এক সত্য, অখণ্ডনীয় চিরস্থায়ী জ্ঞান, ইহা কেবল সৎতা সৌন্দর্য্য প্রভৃতি চিন্তনীয় ভাব সমূহের সম্বন্ধেই সম্ভব। আর একপ্রকার জ্ঞান যাহা কেবল মত ও বিশ্বাস মাত্র, অর্থাৎ যাহা সত্য হইলেও পারে না হইলেও পারে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধে এই প্রকার জ্ঞান ভিন্ন অন্য প্রকার জ্ঞান সম্ভব নহে। সাধারণ লোকদিগের জ্ঞান দ্বিতীয় প্রকারের আর দার্শনিকদিগের জ্ঞান প্রথম প্রকারের। জগতের আত্মার কোন এক অংশে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা উহার বৃত্তের আবর্ত্তন দ্বারা সমুদয় অংশে পরিচালিত হয়; অখণ্ডনীয় জ্ঞান বাহিরের বৃত্তের আর মত ও বিশ্বাস ভিতরের বৃত্তের আবর্ত্তন দ্বারা। এইরূপে জগতের যেখানে যে যে বস্তু আছে তাহাদিগের সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিশ্বাস সমুদয় আত্মা জানিতে পায়। প্লেটোর এই সকল কল্পনা-প্রসূত বাক্যের অবশ্য কোন নিশ্চয় ব্যাখ্যা হইতে পারে না।]

যখন পিতা ও স্রষ্টা তাঁহার নির্ম্মিত বিশ্বকে গতিশীল ও জীবন্ত দেখিলেন তখন তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তিনি যে সমুদয় সনাতন দেবগণের অনুকরণে উহা নির্ম্মাণ করেন উহাকে তাঁহাদিগের আরও অধিক সদৃশ করিতে স্থির করিলেন। দেবগণ নিত্য পুরুষ, বিশ্বকেও স্রষ্টা যতদূর সম্ভব তদনুরূপ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু সৃষ্টবস্তুকে নিত্য করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অতএব স্রষ্টা বিশ্বে নিত্যত্ব গুণের একটী গতিশীল প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিলেন। নিত্যত্ব একরূপী আর উহার প্রতিকৃতি বহুরূপী; প্রতিকৃতিটী হইতেছে এই গতিশীল প্রকাণ্ড জগৎ যাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন দূরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিয়মানুযায়ী রূপে স্ব স্ব কক্ষ আবর্ত্তন করিতেছে। [অর্থাৎ এই প্রকাণ্ড জগৎ ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও তাহাদিগের গতি এই সকল অনন্তের প্রতিকৃতিতে গঠিত, এই সকল দেখিলে প্রকৃত-নিত্য ও অনন্ত কি

প্রকার বস্তু তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অনন্ত বলিলে এক বুঝায় অর্থাৎ যে অনন্ত সে বরাবর এক, আর জগতের গঠন ও গতি বহুরূপী অর্থাৎ উহাতে বহু-সংখ্যক অংশ আছে আর তাহাদিগের গতির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন।] অনন্তের প্রতি-কৃতিরূপ এই জগতের গতি সমূহই সময়—আদিতে সময় বিদ্যমান ছিল না; দিবারাত্র মাস ও বৎসর এই সকল জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না—জগতের সৃষ্টির সহিত উহা-দিগেরও সৃষ্টি হইল। নিত্যত্বের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত স্রষ্টা সময় সৃজন করিলেন, সময়ের সংখ্যা (দিবারাত্র প্রভৃতি) বিভেদ করিবার নিমিত্ত আর কত সময় (কত দিন, কত মাস ইত্যাদি) হইল ইহা যেন লিখিয়া রাখিবার নিমিত্ত চন্দ্র, সূর্য্য ও অপর পাঁচটী গ্রহের সৃষ্টি হইল আর বহুরূপী বৃত্তে তাহাদিগের কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল। পৃথিবী মধ্যস্থলে, তাহার পর চন্দ্র, আর তাহার পর সূর্য্য রহিল; শুক্র ও বুধ সূর্য্যের বিপরীতে কিন্তু তাহারা সমান বেগে চলিতে লাগিল—এই নিমিত্ত দেখা যায় যে উক্ত দুইটী তারা সূর্য্যকে আসিয়া ধরে এবং সূর্য্য কর্তৃক ধৃত হয়—অর্থাৎ তাহারা সূর্য্যের নিকট পৌঁছে আর সূর্য্য তাহাদিগের নিকট পৌঁছে। গ্রহ সাতটী জীবন্ত বস্তু হইল এবং তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সাধন করিতে শিখিল, এবং স্ব স্ব গতি আরম্ভ করিল। তাহারা বহুরূপী বৃত্তে (একরূপী বৃত্তের উপর হেলিয়া চলিতে থাকিল এবং একরূপী বৃত্তের গতি দ্বারা তাহাদিগের গতি শাসিত রহিল। [এই স্থলের অর্থ এই যে বাহিরের একরূপী বৃত্ত যখন এক দিবারাত্রে কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে একবার আবর্ত্তন করে, ভিতরের বহুরূপী বৃত্ত ভাঙ্গিয়া যে সাতটী কক্ষ হইয়াছে সে সাতটীর কক্ষের উল্লিখিত সাতটী গ্রহ ও ঐ সময়ে একবার স্ব স্ব অক্ষ-দণ্ড আবর্ত্তন করে, অতএব বাহিরের বৃত্তের গতি দ্বারা ভিতরের বৃত্তের গতি শাসিত হয়। ইহা ছাড়া এই সাতটী গ্রহ আবার স্ব স্ব কক্ষে ক্রান্তি বৃত্তের প্রায় সমান্তরালে বাহিরের বৃত্ত অর্থাৎ জগতের নিরক্ষ প্রদেশের উপর ২৩ ডিগ্রি আনত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপে কক্ষের পরিমাণ ভেদে কক্ষাবর্ত্তনের সময় ভেদ ঘটিয়া থাকে—এই সময় চন্দ্রের পক্ষে এক মাস, সূর্য্যের পক্ষে এক বৎসর, বুধ ও শুক্রেরও এক বৎসর আর মঙ্গলের প্রায় দুই, বৃহস্পতির প্রায় বার ও শনির প্রায় ত্রিশ বৎসর।] গ্রহদিগের মধ্যে কক্ষভেদে কেহ বা অল্প সময়ে কেহ বা অধিক সময়ে কক্ষ আবর্ত্তন করিতে লাগিল—বাহিরের বৃত্তের গতি উহাদিগের গতির বিপরীতে হওয়ায় ঐ বৃত্ত হইতে দেখিলে যে গ্রহ যত অধিক সময়ে কক্ষ আবর্ত্তন করে সে গ্রহ উহার তত অধিক নিকটে হইবে আর সেই নিমিত্ত তত অধিক শীঘ্র উহার নিকট আসিতেছে বোধ হইবে। যাহাতে গ্রহদিগের গতি দৃষ্টি গোচর হয় এই উদ্দেশে তাহাদিগের দ্বিতীয়টীতে স্রষ্টা অগ্নি জ্বালাইয়া দিলেন—ইহাকে আমরা সূর্য্য বলি। এইরূপে সমুদয় আকাশ আলোকিত হইল এবং আলোকে (বুদ্ধিজীবি) জন্তুগণ গ্রহাদি তারকাগণের গতি দর্শন করিয়া সংখ্যা-জ্ঞান লাভ করিবার

উপায় হইল ; এইরূপে রাত্রদিন সৃষ্টি হইল, উহা বাহিরের বৃত্তের একবার কেন্দ্র আবর্ত্তন কাল, চন্দ্র একবার কক্ষ ভ্রমণ করিলে মাস সৃষ্টি হইল, আর সূর্য্য একবার তাহার বক্ষে ভ্রমণ করিলে বৎসর হইল। অন্যান্য তারাগণের আবর্ত্তনের নিয়ম জটিল সাধারণ লোকে তাহার কিছুই জানে না, কিন্তু তাহাদিগের গতি দ্বারা এক "মহৎ বৎসর" গণনা করা যাইতে পারে। বাহিরের বৃত্তের আবর্ত্তন দ্বারা কাল গণনা করিয়া যত সময়ে সপ্তগ্রহের আবর্ত্তন ও বাহিরের বৃত্তের আবর্ত্তন সর্ব্ব প্রথমে যে যে স্থানে আরম্ভ হইয়াছিল আবার সেই সেই স্থানে সকলে একত্র ফিরিয়া আইসে তত সময়কে এক "মহৎ বৎসর" বলা যাইতে পারে। এইরূপে সৃষ্ট জগৎ যাহাক্তে তাহা যে বস্তুর (আদর্শ জন্তুর) নমুনায় গঠিত হইয়াছে যতদূর সম্ভব তাহার সদৃশ হইতে পারে এবং তাহার নিত্যত্ব অনুকরণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ কতকগুলি তারকা সৃষ্ট হইয়া গগনে আবর্ত্তন করিতে লাগিল।

এইরূপে সময় সৃষ্টি পর্য্যন্ত বিশ্বকার জগৎকে তাহার আদর্শের অনুরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু জগতে জীবন্ত পদার্থ না থাকায় উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল না। অতএব আদর্শের অনুকরণে পিতা জগতে জীব সৃষ্টি করিলেন; উক্ত আদর্শ জন্তুতে চারিপ্রকার জন্তু অন্তর্হিত ছিল—এক প্রকার জন্তু উৎকৃষ্ট (দেবগণ) আর তিনপ্রকার অপকৃষ্ট (মনুষ্য, পক্ষী ও পশু।) বিধাতা প্রথমতঃ দেবগণের সৃষ্টি করিলেন; ইহাঁদিগের মধ্যে পৃথিবী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, এবং জগতের কেন্দ্রস্থলে দিবারাত্রের উপর প্রহরী স্বরূপ অবস্থাপিত। পরে স্থির নক্ষত্র গুলি সৃষ্ট হইল, ইহারা প্রধানতঃ অগ্নি হইতে গঠিত, এবং বাহিরের বৃত্তে স্থাপিত, তাহাদিগকে বাহিরের বৃত্তে রাখিবার অভিপ্রায় এই যে ঐ প্রদেশ আলোকময় ও সমুজ্জ্বল থাকিবে। প্রত্যেক নক্ষত্র গোলাকৃতি করিয়া গঠিত হইল এবং দুইপ্রকার গতিপ্রাপ্ত হইল—এক গতি প্রত্যেকের স্বকীয়, আর এক গতি—বাহিরের বৃত্ত জগতের অক্ষদণ্ডের উপর যে আবর্ত্তন করে তাহার দ্বারা, সংঘটিত; অর্থাৎ প্রত্যেক নক্ষত্র (স্বকীয় অক্ষদণ্ডের উপর) আবর্ত্তন করিতে থাকিল আর তাহা ভিন্ন আবার বাহিরের বৃত্তের সহিত অগ্রমুখে আবর্ত্তন করিতে লাগিল—কিন্তু তাহাদিগের অন্য পাঁচ প্রকার (উর্দ্ধে, নিম্নে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে) গতি নাই। সুতরাং তাহারা গ্রহগণের ন্যায় জটিল ভাবে ঘুরে না, বরাবর একভাবে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে—এই নিমিত্ত তাহারা স্থির নক্ষত্র। আমাদিগের ধাত্রী-মাতা পৃথিবী, বিশ্বের মধ্যে যে এক দণ্ড আছে তাহার চতুষ্পার্শ্বে গ্রথিত, সেই পৃথিবীকে বিশ্বকার দিন ও রাত্রির রক্ষক ও সংঘটক করিয়া রাখিলেন; গগণের অন্তর্ভাগে যত দেবতা আছেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৃথিবী। গগণমণ্ডলস্থ নক্ষত্রগণ কিরূপ পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা কিরূপে পরস্পরের সম্মুখে আইসে, কি সময়ে তাহাদিগের কক্ষ আবর্ত্তন এক একবার শেষ হয়, কিরূপে তাহারা পরস্পরের নিকটে

উপস্থিত হয়, কোন্ কোন্টীর যোগ হয়, আর কোন্ কোন্টীর বিরোধ হয়, কিরূপে তাহারা পরস্পরের অগ্রে ও পশ্চাতে উপস্থিত হয়, কোন্ কোন্ সময়ে তাহারা গ্রহণে ঢাকা পড়ে, আর কোন্ কোন্ সময়ে পুনরায় দেখা দেয় এবং যাহারা গণনা করিতে পারে তাহাদিগকে জগতে কি ঘটিবে তাহার পূর্ব্ব সম্বাদ দেয় এবং মনে অত্যন্ত ভয় উৎপাদন করে—প্রতিকৃতি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে না পারিলে এই সকল বিষয় আলোচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। সৃষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য দেবগণের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট হউক এবং এবিষয়ের এই শেষ হউক।

উপরে পৃথিবী বিশ্বদণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে গ্রথিত এবং দিবারাত্রের সংঘটক এই কথা বলা হইয়াছে। এই বাক্যটী লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়—গ্রোটের মতে পৃথিবী উক্ত দণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে গ্রথিত এই কথায় পৃথিবী উহার চতুষ্পার্শ্বে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তন করিতেছে। অন্যান্য পণ্ডিতেরা (হিউএল,জাউএট প্রভৃতি) উহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন যে দিবারাত্র কিরূপে উৎপন্ন হয় ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর ঐ দৈনিক আবর্ত্তন কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু প্লেটো স্পষ্ট বলিয়াছেন যে বাহিরের বৃত্ত ও তৎসঙ্গে সূর্য্যাদি গ্রহগণ চব্বিশ ঘণ্টায় একবার জগতের দণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে (অতএব পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া) আবর্ত্তন করিয়া থাকে আর তাহাতে দিবারাত্রি সংঘটিত হয়। প্লেটোর যে এই মত ইহা গ্রোটও স্বীকার করেন; তবে আবার পৃথিবীর উক্ত আবর্ত্তন কল্পনা করার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে গ্রোট বলেন যে পৃথিবীর চব্বিশ ঘণ্টায় আবর্ত্তন ঐ সময়ে নক্ষত্রগণের আবর্ত্তনের অনুকূল নহে (অর্থাৎ একটী স্বীকার করিলে অপরটী স্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত হয় না) ইহা প্লেটো বুঝিতে পারেন নাই। প্রতিপক্ষে বলেন যে প্লেটো যে এই সামান্য বিষয়টী বুঝিতে পারেন নাই ইহা হইতে পারে না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে আরিষ্টোট্লের মতে প্লেটো পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন স্বীকার করেন; আরিষ্টোট্ল প্লেটোর ছাত্র ছিলেন, অতএব তাঁহার এ বিষয় জানিবার কথা। কিন্তু জাউএট বলেন যে আরিষ্টোট্ল প্লেটোর বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার (প্লেটোর) মতামত সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন সে সবের উপর তত আস্থা করা যাইতে পারে না, কারণ তিনি যে বিশেষ অনুশীলন করিয়া ঐ সব কথা বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। জাউএট আরও বলেন যে অন্যান্য গ্রন্থে প্লেটো যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মতে পৃথিবী গতিহীন বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, আর পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে ইহা যদি প্লেটো সত্য মনে করিতেন তাহা হইলে তিনি অবশ্য তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাইতেন।

(ক্রমশঃ).

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নশীরুদ্দিন হায়দর—তাঁহার পিতা গাজী উদ্দিনের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বাদসাহ রূপে অযোধ্যার মসনদ অধিকার করেন। ইহাঁর রাজ্যারোহণের পর দুই তিন বার মন্ত্রী পরিবর্ত্তন হওয়াতে প্রথমতঃ শাসন কার্য্য সম্বন্ধে একটু গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছিল। প্রথমটা নবাব আগামীরের উপর শুভদৃষ্টি করিয়াছিলেন—কিন্তু পরিশেষে তাঁহার উপর চটিয়া গিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। অন্যায় উপায়ে আগা-মীর যে সমস্ত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নবাবের কর্ণে ওঠাতে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। আগা-মীর এই ব্যাপারে ভগ্নমনোরথ ও নিঃসম্বল হইয়া স্বল্পাবশিষ্ট সম্পত্তি লইয়া গোপনে কাণপুরে পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পান। এই স্থানে আসিয়া একটী ছাপাখানা স্থাপন করিয়া অযোধ্যার শাসন-সম্বন্ধে নানাবিধ কাল্পনিক বিশৃঙ্খলতা পরিপূর্ণ প্রবন্ধাদি দ্বারা একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই আগা-মীরের জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক। সুপ্রসিদ্ধ কানপুর হত্যাকাণ্ড সময়ে ইহাঁর পুত্র নানা সাহেবের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

ইহার পর ফজল-আলিকে নবাব মন্ত্রীপদে নির্ব্বাচিত করিলেন—কিন্তু লোকটা ততদুর সুদক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন না হওয়াতে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মেহেদি আলিখাঁকে (পূর্ব্ব কথিত হাকিম মেহেদি) স্বীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। মেহেদি আলি অতিশয় চতুর, সুদক্ষ, শ্রমশীল কর্ম্মচারী ছিলেন। গাজিউদ্দিন কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি ফতেগড়ে ইংরাজ আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন এক্ষণে অযোধ্যার মন্ত্রী পদে পুনর্নিযুক্ত হইয়া তিনি লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া আসিলেন।

হাকিম মেহেদি লক্ষ্ণৌয়ে ফিরিয়া আসিবার কিয়ৎকাল পরেই লর্ড বেণ্টিক অযোধ্যায় উপস্থিত হন। ১৮২৮ সালে রেসিডেণ্ট সাহেব রিপোর্ট করিয়াছিলেন "অযোধ্যার অবস্থা আজকাল এত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে যে আমরা নিজ হাতে শাসনভার গ্রহণ না করিলে আর গত্যন্তর নাই।" নশীরুদ্দীনের সময়ে এ প্রকার কথাত উঠিতে পারে—কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতার সময়ে যখন এ প্রকার বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের কথা উঠিয়াছিল—হেষ্টিংস সাহেব তাহা শুনিয়া অযোধ্যা ভ্রমণে বাহির হন। ভ্রমণান্তে তিনি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া ও কথিত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কোন প্রমাণ না পাইয়া রেসিডেণ্টকে লিখিলেন—"I also assure the Nawab of my unqualified approbation and satisfaction

at witnessing the high state of cultivation in which I found the country as well as at its increased populousness and at the happiness and amport of all his excellency's subjects." কৈ ইহাতে ত, অত্যাচার অরাজকতার কথা কিছুই নাই—ইহার পর স্বয়ং গবর্ণর জেনারেলের মত ছাড়িয়া দিয়া আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিশপ্ হিবারের লিখিত বিবরণ দেখিতে পাঠকদের অনুরোধ করি। এ সকল হইতে নিঃসংশয়-রূপে প্রতিপন্ন হইবে—গাজিউদ্দিনের সময়ে অযোধ্যার অবস্থা কোম্পানীর নিজাধিকৃত প্রদেশ গুলির অপেক্ষা অপকৃষ্ট ছিল না। তার পরের কথা এই—তাঁহার মৃত্যুর সময় হইতে নশীরুদ্দীন বাহাদুরের সিংহাসনারোহণের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এতাদৃশ উন্নতিশালিনী সুশৃঙ্খলাময়ী অযোধ্যার অবস্থা যে অতিশয় শোচনীয় দশায় পরিণত হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করিতে আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্দিহান হই। কিন্তু লর্ড বেণ্টিকের মত ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তার কথাও সম্পূর্ণরূপে ঠেলিয়া রাখিতে পারা যায় না। বেণ্টিক সাহেব অযোধ্যায় আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের অবস্থার আরও উন্নতি করিতে নানাবিধ উপদেশ দিলেন। অযোধ্যার সম্পূর্ণ অবনতি হইলে কোম্পানী যে স্বহস্তে ইহার আভ্যন্তরিণ শাসনকার্য্যের ভার লইবেন একথাও বলা হইল। হাকিম মেহেদিকে বেণ্টিক সাহেব বেশ্ জানিতেন। নশীরুদ্দীনের সিংহাসনারোহণের পর হইতে ক্রমাগত মন্ত্রী পরিবর্ত্তনে যে শাসন কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে ইহাও বোধ হয় তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। মেহেদি সাহেবের হাতে অযোধ্যার বর্ত্তমান অবস্থা যে আরও উন্নত হইতে পারে—ইহা তিনি বেশ জানিতেন। সুতরাং অযোধ্যার আভ্যন্তরিণ শাসন কার্য্য সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া বিশেষ [illegible] ও সহানুভূতি দেখাইয়া তিনি সমস্তভার নবাবের ও তাঁহার মন্ত্রীদিগের হস্তে রাখিয়া গেলেন। ওয়েলেস্লী এ সময়ে থাকিলে বোধ হয় অযোধ্যা একবারে ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত হইয়া যাইত।

তালুকদারদের উপর হাকিম সাহেবের আগে নজর পড়িল। রাজ্যের যতকিছু গোলযোগ ইহাদের দ্বারাই হইতেছিল, সুতরাং দৃঢ় হস্তে তিনি তাহাদের ক্ষমতা যথা সম্ভব সংযত করিলেন। অন্যায় মাসহারা ও অপরিমিত বেতন ভোগ করিয়া অনেকে রাজকোষের উপর অযথা আক্রমণ করিতেছিল—তিনি ইহারও যথা সম্ভব প্রতীকার করিলেন। আভ্যন্তরিণ শাসন কার্য্যের আরও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তিনি আইন আদালত ও পুলিশ্ বিভাগের উচিত মত সংস্করণ করিলেন। চারি বৎসর বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা বেতনে তিনি নবাবের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—কিন্তু ইহার মধ্যে রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া শত্রুপক্ষের মুখ বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভবিতব্য বশে অযোধ্যার মহাপতন অনিবার্য্য হইয়াছিল—হাকিম সাহেবের এতগুণ থাকাতেও তিনি স্বীয় উগ্র স্বভাব ও হঠকারিতা নিবন্ধন নবাব সাহেবের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়া পদ-

চ্যুত হইলেন * এবং রৌসনউদ্দৌলা তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তৎকৃত সমস্ত সংস্করণই বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

গাজীউদ্দিন বাদসাহের নিকট হইতে কোম্পানী যদ্রূপ নেপাল যুদ্ধ প্রভৃতির অছিলায় টাকা কর্জ্জ করিয়া ছিলেন নশীরের নিকটও Special loan বলিয়া সেইরূপে বাষট্টিলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা কর্জ্জ করা হইয়াছিল। সন্ধির ধারায় † একথা লেখা ছিল—"শত-করা পাঁচটাকা হিসাবে কোম্পানী এই টাকার সুদ দিতে বাধ্য থাকিবেন, ইংরাজি মাস অনুসারে হিসাব চলিবে ও প্রতি তিন মাস অন্তর রেসিডেন্সী ভাণ্ডার হইতে বাদসাহ এই সুদের টাকা পাইবেন। এই সুদের টাকা তাঁহার নিজকোষস্থ না হইয়া নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ নিম্ন লিখিত হারে নবাবের নিয়োগানুসারে মাসহারা পাইবেন। (ইহার নিম্নে যাঁহারা মাসহারা বা ভাতা পাইবেন তাঁহাদের নাম লিখিত আছে)। কোম্পানী যতদিন না এই টাকা শোধ করিবেন ততদিন ইহার সুদ হইতে উল্লিখিত মাসহারা ভোগীগণ বংশানুক্রমে মাসহারা ভোগ করিতে থাকিবেন—এবং ইহাও বলা থাকিল ইহাদিগের মধ্যে যদি কাহারও বংশলোপ হয় তাহা হইলে তাঁহার অংশের টাকা আইন অনুসারে বাদসাহের নিজকোষাগার ভুক্ত হইবে।" এক কথায় বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে কোম্পানী এই টাকার এক কপর্দ্দকও বাদসাহ নশীরুদ্দিনকে ফিরাইয়া দেন নাই।

---

* কেহ কেহ বলেন হাকিম সাহেবের প্রতিদ্বন্দী আগা-মীরের কৌশলে তিনি পদচ্যুত হন। এই সময়ে হাকিম মেহেদি এমন একটি কুকার্য্য করিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহার চরিত্রে বিশেষ কালিমা পড়ে। মোটামুটি ঘটনাটী এই, রায় অমরসিংহ নামক একজন উচ্চপদস্থ তালুকদার নবাবের পিতার নিকট কয়েকখানি তালুক জমা করিয়া লইয়া-ছিলেন। হাকিম সাহেবের ইহার উপর বরাবরই লোভ ছিল,—তিনি অমর সিংহের উপর দম দিয়া সেই তালুকগুলি নিজজমাভুক্ত করিয়া লয়েন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দী অমরকে একেবারে ইহলোক হইতে সরাইতে না পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না সুতরাং তিনি একদিন রাত্রে গোপনে কয়েকটি লোক নিযুক্ত করিয়া ফাঁসী দিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। অমর সিংহের বিপুল বিভব ছিল হাকিম সাহেব তাহা সমস্তই দখল করিয়া লইয়া রটাইয়া দিলেন—"নিকাশ দিতে হইবে বলিয়া অমরসিংহ বিষপানে মরিয়াছেন!" অমরসিংহের শবদেহ দাহ করিবার জন্য আনা হইল—একজন লোক অন্ত্যেষ্টিকালে তাঁহার মুখের ভিতর তুলসী পাতা দিতে গিয়া দেখিতে পাইল একটি অঙ্গুলির কতকাংশ তাঁহার মুখের ভিতর রহিয়াছে। বোধ হয় মরিবার পূর্ব্বে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য অমরসিংহ হত্যাকারীর অঙ্গুলি দংশন করিয়াছিলেন। ঘটনাটি যে বিষপান নহে হত্যাকাণ্ড নবাবের কানে উঠিল। আগা-মীর এই সময়ে সুযোগ পাইয়া উঠিয়া পড়িয়া মেহেদির বিরুদ্ধে লাগিলেন, অপরাধ প্রমাণ হইল না বটে কিন্তু জনরব এই, নবাব হাকিম সাহেবের উপর এই ব্যাপারে বড়ই চটিয়া গেলেন। ইহার পরেই তাঁহার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে।

† Vide. Treaty dated march 1829. Par. Return of Treaties.

নসীরউদ্দিন বাদসাহ অতিশয় দানশাল ছিলেন,—খঞ্জ, অন্ধ, কুষ্ঠরোগী বা অন্য কোন প্রকারে বিকলাঙ্গ ও উপার্জ্জনাক্ষম নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের সাহায্য জন্য তিনি রেসিডেণ্ট সাহেবের হাতে শতকরা চারি টাকা স্থদে তিনলক্ষ টাকা সমর্পন করেন। এই টাকার স্থদ (মাসিক হাজার টাকা) হইতে রেসিডেণ্ট সাহেবের নিজতত্ত্বাবধারণে সমবেত দীন দরিদ্র কাঙ্গালীদিগকে যথোপযুক্ত সাহায্য করা হইত। বাদসাহ তাঁহার আজ্ঞাপত্রে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বলিয়াই গিয়াছিলেন—"আমার বংশধরেরা বা লক্ষ্ণৌ সরকারের কোন ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী কস্মিন্‌কালে এই টাকা অন্য বাবতে খরচ করিতে পারিবেন না। স্বয়ং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই টাকার প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবেন ও ইহার স্থদ হইতে এই প্রকারে নিঃসহায় উপার্জ্জনাক্ষম লোকদিগকে সাহায্য করা হইবে ও ইহা "অযোধ্যার বাদসাহ নশীরুদ্দিন হায়দারের দাতব্য "বলিয়া কথিত হইবে। ইহা ব্যতীত লক্ষ্ণৌ কলেজের ছাত্রদিগের সাহায্যার্থ বাদসাহ মাসিক তিন সহস্র টাকা দান করিতেন, রোগীদিগের জন্য সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া তথা হইতে তাহাদের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ঠগী ও ডাকাইতী অযোধ্যা হইতে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হয়—এ উদ্দেশ্যেও অনেক কার্য্য করিয়া তিনি স্বীয় নাম চির-বিখ্যাত করিয়া গিয়াছিলেন।

১৮৩৭ সালের ৭ই জুলাই রাত্রে সহসা বাদসাহের মৃত্যু হয়। রাজান্তঃপুরের কোন ভয়ানক চক্রান্তমুখে পতিত হইয়া বিষপানে নবাবের অকাল মৃত্যু ঘটে। এদিকে সেই গভীর নিশীথে নবাবের মৃতদেহ বস্ত্রাবৃত হইয়া এক পরিত্যক্ত কক্ষে পড়িয়া রহিল, ও দিকে এক ভয়ানক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল তাহা কি আমরা পরে বিবৃত করিতেছি।

অযোধ্যার নবাবদিগের অন্তঃপুর রক্ষার জন্য কতকগুলি করিয়া স্ত্রীসৈন্য থাকিত। শান্তির সময়ে ইহারা বেগম মহলের চারিদিকে পাহারা দিত এবং বেগমদিগের কোন বিপদাদি ঘটিলে প্রয়োজন পড়িলে তাহাদের সহায়তাও করিত। পুংসৈন্য অপেক্ষা ইহারা যে নির্জ্জীব, অশিক্ষিত ও বলহীন ছিল এরূপ নহে। নবাবের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ বাদসাহ বেগমের (মৃত নবাবের মাতা) কর্ণে উঠিলে তিনি সাহসাবলম্বনে এই সমস্ত স্ত্রীসৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফেরোজবক্স প্রাসাদের প্রশস্তকক্ষে স্বীয় পৌত্র মুন্নাজানকে মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। অনেকগুলি পুং সৈন্যও তাঁহার বাধ্য ছিল—তাহারাও বেগমের সহায়তা করণার্থে এই গভীর নিশীথে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিল। রেসিডেণ্ট সাহেব যে মৃত নবাবের পুত্র মুন্নাকে ঠেলিয়া রাখিয়া তাঁহার খুল্লতাত নশীরউদ্দৌলাকে সিংহাসন দিতে মনস্থ করিয়াছেন—ইহা বাদসাহবেগম পূর্ব্বেই সন্ধান পাইয়াছিলেন—সুতরাং সাহসাবলম্বনে স্বীয় পৌত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রেসিডেণ্টের কার্য্য কলাপে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। নশীর উদ্দৌলা এই সমস্ত ব্যাপারে ভয় পাইয়া লাল বার দোয়ারীর এক নিভৃত কক্ষে লুক্কাইত

হইলেন। ইতস্ততঃ মশালধারী ভ্রমণশীল সেনাগণের দর্পিত পদশব্দে ও অস্ত্রের ঝনঝনায়, সুগভীর তূর্য্যনিনাদে উত্তেজনাময় উল্লাস কোলাহলে সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদ স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সে মহোল্লাস সে তুরীনিনাদ দিগদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইল। ঘটনাটা কি—সেই গভীর নিশিথে রেসিডেণ্টের নিকটে পৌছিতে আর বিলম্ব রহিল না। রেসিডেণ্ট সাহেব দুগ্ধফেননিভ পালঙ্কে সুষুপ্তি সুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন সহসা জাগরিত হইয়া এই সংবাদে স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

রজনীর অন্ধকার দূর হইলে রেসিডেণ্ট কর্ণেল লো সাহেব, সাহসাবলম্বনে ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে দুই দল পদাতিক ও দুইটী কামান ও তদুপযুক্ত গোলন্দাজ লইয়া ফেরোজ বক্স কুঠীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। বাদসাহ-বেগমকে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হইল—কিন্তু এই বীর্য্যবতী রমণী কিছুতেই সিংহাসন ছাড়িতে চাহিলেন না—কর্ণেল সাহেব এই কারুকার্য্যময় প্রাসাদের উপর গোলাবর্ষণ করিতে হুকুম দিলেন—ইংরাজের বজ্রনাদী কামান জ্বলন্ত কালানল উদ্গীরণ করিয়া বেগমের সেনাগণকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। উভয় পক্ষের বিশেষতঃ বেগমের পক্ষের অনেক লোক এই অনল মুখে প্রাণত্যাগ করিল। বাদসাহ বেগম ও তাঁহার পৌত্র মুন্নাজান ইংরাজ সেনার হস্তে বন্দী হইলেন। কোম্পানীর সেনাগণ প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রত্নময় সিংহাসন ও অন্যান্য বহু মূল্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। * কোম্পানীর প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট সাহেব কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন—কোম্পানীর পক্ষে দুইজন সিপাহী মৃত ও আটজন আহত হইয়াছে—কিন্তু মনীরুদ্দীনের মতে বেগমের পক্ষে প্রায় ৫০০ শত লোক হত হইয়াছিল।

বেগমকে নজরবন্দীতে রাখিয়া রেসিডেণ্ট সাহেব ডাক্তার ষ্টিভেনসন্‌কে লইয়া মৃত নবাবের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। নবাবের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া তাহা কবরস্থ করিতে আজ্ঞা দিয়া ও কাপ্তেন প্যাটনকে মৃত নবাবের সম্পত্তি রক্ষার ভার দিয়া তিনি রেসিডেন্সীতে ফিরিয়া আসিলেন। রেসিডেন্সী-মুন্সীর সহায়তায় তাড়াতাড়ি পারসীতে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিয়া সেই দিন রাত্রি একটার সময় তাঁহার সহকারী লেপ্টেনাণ্ট সেক্ষপিয়ার, রেসিডেন্সী মুন্সী ইল্‌তিফত হোসেন খাঁ বাহাদুর ও দরবার উকীল মৌলবী গোলাম ইয়া খাঁকে নবাবের নিকট পাঠাইলেন। সেই গভীর নিশীথে নবাব সাহেব উল্লিখিত তিন জন লোকের সমুখে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া সেই পারসী কাগজ খানির নীচে "কবুল উওমনজুর" লিখিয়া দিলেন। সেই পারসী কাগজ

* Vide Oudh papers printed by order of the house of commons—Colonel Lowo's letter dated July 10th.

খানিতে যাহা লেখা ছিল তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সিংহাসন আমার হইলে কোম্পানী যে কোন নূতন সন্ধিতে আমায় বাধ্য হইতে বলিবেন আমি তাহাতেই রাজি হইব।"

সুপ্রসিদ্ধ "ছত্রমঞ্জিল" প্রাসাদ নশীরুদ্দীনের আমলে নির্ম্মিত হয়। ছত্রমঞ্জিলে বেগমেরা ও নবাব অনতি দূরে "ফেরোদবক্স" প্রাসাদে বাস করিতেন। নবাবের সাধের ছত্রমঞ্জিলে, এক সময়ে অসূর্য্যম্পশ্যা বেগম মহলে আজকাল ইংরাজের আফিস্ ও তাহার অতি সান্নিধ্যে একটি কুঠিতে United services ও Union নামক দুইটী ক্লব ও একটী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একজন জার্ম্মন সাহেব এই লাইব্রেরীর curator, ইহার অধীনে একজন গুজরাটী পণ্ডিত ছিলেন—তিনি অতি সহৃদয় ব্যক্তি, আমরা অপরিচিত হইলেও তিনি আমাদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা সাহেবের অনুমতি লইয়া ক্লব হাউস্ ও লাইব্রেরী দেখিয়া তয়খানা দেখিতে ভূগর্ভে নামিলাম। এই প্রকাণ্ড বাটীর নিম্নে যে একটী প্রকাণ্ড "ভূমধ্যস্থ গৃহ" আছে বাহির হইতে দেখিলে তাহা কিছুই বুঝিবার যো নাই। "তয়খানা" শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ দিতে গেলে— "ভূগর্ভস্থ নিদাঘ-প্রাসাদ" ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। যে সোপান রাজি দিয়া উপরে লাইব্রেরীতে গিয়াছিলাম, তাহারই এক অংশ বরাবর ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে দুই একস্থলে অন্ধকার ঠেকিল, নীচের কামরায় গিয়া দেখিলাম—ইহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যাহা কিছু ছিল সকলই কাল হস্তে চূর্ণীকৃত হইয়াছে। কাল হস্ত না বলিয়া ইংরাজ হস্ত বলিলে আরও ভাল হয়। সংস্করণাভাবে চারিদিকে বালি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, চারিদিকে ময়লা জমিয়া ঘরের মধ্যে একপ্রকার গন্ধ উৎপাদন করিয়াছে। হর্ম্ম্যতল একপ্রকার সুচিক্কন বহু মূল্য পালিশ পাথরে মণ্ডিত ছিল—এক্ষণে তাহার কিছুই নাই। এই অন্ধতমসাবৃত গৃহ মধ্যে বড় বড় সেল্‌ফে করিয়া গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যা প্রদেশোৎপন্ন যাবতীয় কাঠের নমুনা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। নবাবের প্রমোদ গৃহে শ্মশান ভাব প্রবেশ করিয়াছে, প্রফুল্লতার স্থান বিমর্ষতা আসিয়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে—আলোকের স্থানে অন্ধকার নৃত্য করিতেছে—উৎসবের আনন্দোচ্ছ্বাস-প্লাবিত কক্ষে—এক্ষণে বিষাদের হা হুতাশ—শুনা যাইতেছে। এই প্রাসাদ দেখিয়া আমাদের মনে অতীতের স্মৃতির সহিত বিষাদের কালিমাময়ী ছায়া পড়িল। পরিশেষে আমরা পণ্ডিতজীকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া গোমতীতীরে শীতলবায়ু সেবনে চলিলাম।

আজকাল গোমতীর উপর তিনটী পোল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একটী ইংরাজের তৈয়ারি ও অপর দুইটী নবাবদিগের। গোমতীর উপর লৌহময় পোলটী নশীরুদ্দীনের সময় বিলাত হইতে আনীত হয় ও পরবর্ত্তী নবাব মহম্মদ আলিশার আমলে ইহার কার্য্য শেষ হয়। এটী আজও অটল ভাবে দণ্ডায়মান,

সিপাহী মহাবিদ্রোহের সময়, এই পোলের কিনারায় চারিটী ১৮ পাউণ্ডার কামান ও কতকগুলি ইংরাজ গোলন্দাজ রাখিয়া স্যর হেন্‌রি লরেন্স বিদ্রোহীদিগের পুলপার হওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ আলীশা। অযোধ্যার তৃতীয় বাদসাহ ও অষ্টম নবাব—ইহাঁর পূর্ব্ব নাম নসীর উদ্দৌলা—সিংহাসনে বসিবার সময় মহম্মদ আলিসা নাম ধারণ করেন। ৭ই জুলাই রাত্রে কর্ণেল লো তাঁহাকে যে প্রতীজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লন্ তদনু-সারে গবর্ণর জেনেরলের সম্পূর্ণ সম্মতিতে একটী সন্ধিপত্র তাঁহার স্বাক্ষরিত করিয়া লওয়া হয়। অকলাণ্ড সাহেব এই সময়ে ভারতের শাসন কর্ত্তা। নবাব তাঁহারই অনুগ্রহে সিংহাসনে বসিয়াছেন—সুতরাং তাঁহার নিকট যাহা ধরা হইল—তাহা নিতান্ত অসহনীয় হইলেও—নবাব বিনাবাক্য ব্যয়ে তাহাতে সম্মতি দিলেন। ইহাই ১৮৩৭ সালের বিখ্যাত সন্ধি—ইহা লইয়াই ডালহৌসী পরে গোলযোগ বাধাইয়াছিলেন। নশীরুদ্দীনের রাজত্বের শেষাংশে অযোধ্যার অবস্থা অনেকটা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ভাগ্যে লর্ড বেণ্টিক সেই সময়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন—তাই রক্ষা। ন্যায় পরায়ণ বেণ্টিক সাহেব মনে মনে বুঝিয়াছিলেন—উভয় পক্ষের দোষেই অযোধ্যার এই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। ডাইরেক্টারেরা তাঁহাকে অযোধ্যার সমগ্র শাসন ভার নিজ হস্তে লইবার পরামর্শ দিলেও—তিনি নবাবকে অতিরিক্ত সময় দিয়া ক্রটী সংশোধন করিতে উপদেশ দেন। অক্‌লাণ্ড সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না—বেণ্টিঙ্কের ন্যায় উদারতা তাঁহার ছিল না। ১৮০১ সালের সন্ধির স্বত্বানুযায়ী সাদত আলি রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেও কোম্পানী নবাবের রাজ্য রক্ষার্থে অন্য কোন অতিরিক্ত দাবি করিবেন না একথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত থাকিলেও অকলাণ্ড সাহেব ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নবাবকে নূতন সন্ধিতে আবদ্ধ করিলেন। এই সন্ধির স্বত্বানুযায়ী প্রথমতঃ নবাব আর এক দল ইংরাজ সৈন্য ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধানে বাৎসরিক ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পালন করিতে বাধ্য হইলেন—দ্বিতীয়তঃ একথাও প্রকাশ রহিল—রেসি-ডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি দেওয়ানী, ফৌজদারী বিভাগের সংস্কার কার্য্যে মনোযোগ দিবেন। ঘটনাবশে (পরমেশ্বর না করুন) যদি বাদসাহ রেসিডেণ্টের উপ-দেশে অনাস্থা প্রদর্শন করেন—অথবা অযোধ্যার কোন অংশে কোন প্রকার অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলতা ও উৎপীড়ন উপস্থিত হইয়া সাধারণের শান্তির ব্যাঘাত করে; তাহা হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিজে কর্ম্মচারী নিয়োগ দ্বারা তাঁহাদের নিজ হস্তে ভার লইয়া সেই সেই প্রদেশাংশ শাসন করিবেন। এই পৃথক শাসনের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা নবাবের কোষাগারে প্রত্যর্পিত হইবে। আর একথাও রহিল—কোম্পানী এই প্রকার কোন প্রদেশাংশের শাসন ভার লইলে তাহাতে দেশীয় শাসন প্রথার সম্পূর্ণ প্রচলন করিবেন এবং উপযুক্ত সময়ে তাহার শাসন ভার

নবাবের হস্তে সমর্পণ করিবেন। * ইত্যাদি। কিন্তু সুখের বিষয় এই, একথা যখন কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা শুনিলেন তাঁহারা ইহার কোন অংশেই সম্মতি দিলেন না—গবর্ণর জেনারলকে তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন—"১৮০১ সালের সন্ধির পর আর কোন নূতন সন্ধিতে নবাবকে বাধ্য করা নিতান্ত অন্যায়।" লর্ড অকলাণ্ড এ সংবাদে বিমর্ষ হইলেন এবং অন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা সহৃদয়তা দেখাইয়া নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"১৮৩৭ সালের সন্ধিতে তিনি আর কোম্পানীর নিকট বাধ্য নহেন"। নবাব এই সংবাদ পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন—এবং ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গবর্ণর জেনারেলকে পত্র লিখিলেন। †

রাজ্যের উন্নতি কল্পে সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনের জন্য মহম্মদ আলি শা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগ্যক্রমে মমতাজিম উদ্দৌলা (হাকিমমেদী) এই সময়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়া ছিলেন। কয়েকমাস কার্য্য করিয়া তিনি গতাসু হইলে বাদসাহ তাঁহার পদে ক্রমান্বয়ে জাহির উদ্দৌলা, ও সরফ উদ্দৌলাকে যথাক্রমে নিযুক্ত করেন। ইহাদের সুমন্ত্রণায় ও কার্য্যকৌশলে অযোধ্যার অবস্থা অনেক উন্নত হইয়া উঠে। রাজ্যারোহণকালে নবাব ৭০ লক্ষ টাকা ভাণ্ডারে মজুত পাইয়াছিলেন—কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে ৮০ লক্ষ টাকার উপর খরচ করিয়াও প্রায় ৭৮ টাকা কোষাগারে মজুত রাখিয়া গিয়াছিলেন।

হোসেনাবাদ ইমামবাড়ী, জুম্মামসজিদ সপ্তখণ্ড, মিনার, প্রভৃতি বাদসাহ মহম্মদ আলি শার প্রধান কীর্ত্তি। ইহার মধ্যে প্রথমোক্তটীই তাঁহার জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—এই সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত ইমামবাড়ী তাঁহার সুদক্ষমন্ত্রী সরফউদ্দৌলার কীর্ত্তি। মহম্মদ আলি শা মৃত্যুর পর এই ইমামবাড়ী মধ্যস্থ কবরে সমাধিস্থ হন। গগণস্পর্শী কারু

---

* Oudh Papers. provisions of the Treaty with his majesty the king of Oudh Doted F. W. 18th Sept. 1837.

† By God ! the truth is that my deficient tongue fails to describe the commendations and encomiums, due to the justice and equity of the aforsaid Hon'ble members of the court of Directors and to the regard and justice of you, my benifactor, which have been seen and observed in this matter ; and in returning thanks and expressing gratitude for this great favour, and mark of commiseration which shall eternally and for ever be the means of increasing the dignity and wealth of this family, and shall cause the removal of apprehensions and anxieties of the sovereigns of this place in respect of all the burdensome terms relative to the Militery force mentioned in the aforsaid Treaty * *. Letter dated Lacknow. 28th January. Ul Ooul. Hijira. 125 to his Exelency the Governor of India.

কার্য্যময়-তোরণ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই ইমাম বাড়ীর সম্মুখে একটী সুদীর্ঘ জলপূর্ণ চৌবাচ্চা দৃষ্ট হয়। ইমামবাড়ীর উঠানটী আগাগোড়া প্রস্তর মণ্ডিত। আসফ্-উদ্দৌলার ইমামবাড়ীর ন্যায় এটিও সম্পূর্ণরূপে খিলান বর্জ্জিত। সুচিক্কণ হর্ম্যতলে বহুমূল্য বস্ত্রাবৃত মহম্মদ আলিশার কবর। বাহিরের দালানে একটি রৌপ্যময় নেমাজ-মঞ্চ, অত্যুচ্চে দেয়ালের গায় Balconyর ন্যায় কতকগুলি প্রস্তরময় বসিবার স্থান। শুনিলাম এইস্থানে পরদাবৃত হইয়া বেগম সাহেবরা নমাজ শুনিতেন। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ জুম্মামস্‌জিদের অনুকরণে নবাব মহম্মদ আলি একটি সুদীর্ঘ কারুকার্য্যময় মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই মসজিদ আজও অসম্পূর্ণ অবস্থায়, বনজঙ্গল সমাবৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সপ্তখণ্ড প্রাসাদ বা মিনার মহম্মদ আলিশার আর একটি কীর্ত্তি। কিন্তু ইহার চারিতলা পর্য্যন্ত শেষ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, নবাবের মৃত্যুর পর আর কেহ ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আমজাদ আলি শা অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

আমজাদ আলিশা—অযোধ্যার চতুর্থ বাদসাহ। ইহার রাজ্যারোহণের দুই মাস পরে সরফউদ্দৌলা মন্ত্রী পদ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর আমদাদ হোসেন আমিনোদ্দৌলা নাম ধারণ করিয়া বাদসাহের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই আমিনউদ্দৌলাই লক্ষ্ণৌএর আমিনাবাদের নির্ম্মাণ কর্ত্তা। কিন্তু আমিনউদ্দৌলাও পাঁচ মাসের অধিক টিকিতে পারেন নাই। ক্রমাগত মন্ত্রী পরিবর্ত্তনে ও নানা কারণে এই সময়ে অযোধ্যার অবস্থা অনেকটা শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। আমজাদ আলির পাপের ফল পরে তাঁহার পুত্রকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌএ গোমতীর উপর একটী সুদীর্ঘ সেতু ও সহর হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত একটী পাথরের রাস্তাই আমজাদ আলির আমলের উল্লেখ-যোগ্য কীর্ত্তি।

মহম্মদ ওয়াজিদ্ আলিশা—অযোধ্যায় শেষ বাদসাহ পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সে, পিতার মৃত্যুর পর (১৮৪৭ ফেব্রুয়ারি) অযোধ্যার মস্‌নদ অধিকার করেন। সাদত খাঁ যে রাজবংশের পত্তন করিয়াছিলেন—ওয়াজিদ আলি হইতেই তাহা লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কালের কতদূর পরিবর্ত্তনীয় ক্ষমতা, সে কেমন করিয়া রাজ্যেশ্বরকে ভিখারী করিতে পারে—বিলাসীকে কষ্ট সহিষ্ণু করিতে পারে, সুখীকে দুঃখের তীব্র যন্ত্রণায় ও নিরাশার চিরাভ্যস্তের মত করিতে পারে—তাহা এই হতভাগ্য ওয়াজিদআলির জীবন নাটকে বিশেষ রূপে পরিস্ফুট। তাঁহার মর্ম্ম পীড়া, তাঁহার শোচনীয় অধঃপতন, অকারণ রাজ্যচ্যুতি সম্বন্ধে ইংরাজের অভেদ্য কৌশলজাল সমস্ত পুংখানুপুংখ রূপে বিবৃত করিতে গেলে স্বল্প সময়ে কুলাইবে না। সুতরাং এস্থলে আমরা নিতান্ত আবশ্য-কীয় কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ দ্বারা বিষয়টী পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা দেখিব।

১৮৫৫ সালের ১৮ই জুন লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যার শাসন প্রণালীর শোচনীয় অবস্থা

দেখাইয়া এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লেখেন। এই মন্তব্যের শেষ ভাগে তিনি লিখিয়াছিলেন ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৭ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত তিন জন বাদসাহ অযোধ্যার মস্‌নদে বসিয়াছেন, কিন্তু এই কয়েক বৎসরের অযোধ্যায় অবনতি প্রাপ্ত অবস্থা কোম্পানীর উপদেশ ও অনুযোগ সত্বেও, কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।" ডালহৌসীর কথাটী কতদূর যুক্তিমূলক তাহা লর্ড অক্‌লাণ্ডের ১৮৩৯ সালের ৮ই জুলাইএর পত্র হইতে বেশ প্রমাণিত হয়। তিনি ঐ পত্রে শিমলা হইতে নবাবকে লিখিতেছেন "From the period you ascended the throne,your majesty has in comparison with times past greately inproved the kingdom * * অযোধ্যার অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা একটুও অবনতি প্রাপ্ত হয় নাই একথা আমরা বলিতে চাই না। কিন্তু একথা বলিতে চাই কোম্পানী অযোধ্যার আভ্যন্তরিণ অবস্থা উন্নত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে উপদেশ অনুযোগ করিলেও তাঁহারা কখনও সেই সমস্ত উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত অবসর দেন নাই। তাঁহারা উন্মত্ত তরঙ্গ সঙ্কুল মহাসাগর পার হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তরণী দেখাইয়া দেন নাই। রোগ যে ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইতেছে একথা বারবার বলিয়াছেন কিন্তু কখন ঔষধের ব্যবস্থা করেন নাই। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক রাজ্যের আভ্যন্তরিণ বিশৃঙ্খলা শুধরাইবার জন্য নবাবকে উপদেশ দিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী হাকিম মেহেদি যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এই সকল সংস্কার কার্য্যে রেসিডেণ্ট সাহেবের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তখন তিনি এ সমস্ত বিষয়ে বড় একটা কর্ণপাত করেন নাই * যখন ওয়াজিদ আলি সিংহাসনে বসিলেন সেই সময়ে সর্ব্ব প্রথমে নিজ বিশৃঙ্খল সেনারাজির উপর তাঁহার নজর পড়িল। নবাব পুরাতন সেনা সমস্ত ছাড়াইয়া দিয়া নিজ তত্বাবধানে নূতন দল সংগঠন করিয়া নিজে তাহাদের শিক্ষা কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা কোম্পানীর চক্ষে সহিল না। তাহারা রেসিডেণ্টকে দিয়া নবাবকে এরূপ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। †

লর্ডহার্ডিঞ্জ ১৮৪৭ সালে অক্টোবরের শেষ ভাগে পঞ্জাব হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় লক্ষ্ণৌ হইয়া আইসেন। এই সময়ে নবাবকে তিনি অযোধ্যায় আভ্যন্তরিণ উন্নতি কল্পে যে সমস্ত উপদেশ দেন, তাহার মর্ম্মানুসারে বাদসাহ ওয়াজিদ আলিশাহ তাঁহার মন্ত্রী আলিনকি খাঁর দ্বারা রেসিডেণ্টকে বলিয়া পাঠান—"কোম্পানীর রাজ্যের নিকটে আমার যে সমস্ত অধিকার আছে—তাহার মধ্যে আমি কোম্পানীর শাসন প্রণা মতে কার্য্য করিয়া তথাকার সুশৃঙ্খলা দেখিতে ইচ্ছা করি। এসম্বন্ধে কি কি নিয়মে

---

* See Mill's British India Edited by H. H. Wilson IX. P. 373

† Spoliation of Oudh by the E. I. Company Ch IV.

শাসন-কার্য্য পরিচালিত করা আমার মনোগত অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করিয়া আপনার মতামত জানিবার জন্য পাঠাইতেছি" নবাব যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন— তাহা রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট বিশেষ সারগর্ভ বলিয়া প্রতীত হওয়াতে তাহার দুই এক স্থলে পরিবর্ত্তন ও সম্পূর্ণ প্রস্তাবটীর উপর মতামত প্রকাশ করিবার জন্য তিনি তাঁহার সহকারী মেজার বার্ডকে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তৎকালীন গবর্ণর টমসন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। টমসন সাহেব বাদসাহের প্রস্তাব আদ্যোপান্ত পড়িয়া ও তাহার অনেকাংশ সমর্থন করিয়া কয়েক স্থলে কিয়দংশ পরিবর্ত্তন করেন। টমসনের মন্তব্য সমেত এই পরিবর্ত্তিত বন্দোবস্ত রেসিডেণ্ট সাহেব বাদসাহের নিকট পাঠাইলে তিনি সেইগুলি প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবে এই সময়ে কার্য্য আরম্ভ হইলেও ইহাতে আর কোন অন্তরায় উপস্থিত না হইলে—বোধ হয় লর্ড ডালহৌসী পরে "Misgovernment" লইয়া অতদূর বাড়াবাড়ি করিতেন না। কিন্তু ভবিতব্য যাহা তাহাই ঘটিবে—এ প্রকার প্রস্তাবে কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অন্তত একবার গবর্ণর জেনারেলকেও এ সমস্ত কথা জানান আবশ্যক সুতরাং এই পরিবর্ত্তিত প্রস্তাবের প্রতিলিপি তিনি কলিকাতায় লাট সাহেবের কাছে পাঠাইলেন। লাট সাহেবের হইয়া তৎকালিন Foreign Secretary স্যর হেনরি ইলিয়ট সাহেব এই প্রস্তাবে অমত করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন "If his Majesty the king of Oudh would give up the whole of his dominions the East India Government would think of it, but that it was not worth while to take so much trouble about a portion.

ইলিয়ট গবর্ণমেণ্টের মনের কথাই খুলিয়া বলিয়াছিলেন। আর দিনকতক বাদে যখন সমস্তটাই তাঁহাদের দখলে আসিবে তখন আর কিয়দংশের জন্য এত মাথাব্যথা কেন? দুঃখের এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছোটলাট্ টমসন, মেজরবার্ড, রেসিডেণ্ট কর্ণেল রিচমণ্ড প্রভৃতি সকলেই যাহা ভাল বলিয়া বুঝিলেন একা লাট সাহেব তাহা মন্দ বুঝিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। ইহাতে এই ফল হইল স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে গিয়া নবাব দুইবার প্রতিহত হইলেন পাঠকও এই ঘটনা হইতে বোধ হয় দেখিতে পাইলেন কোম্পানী কি প্রকারে উপদেশ দিতেন ও কি প্রকারে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর দিতেন। যাহা হউক এক্ষণে আমার এসব কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখাইতে থাকিব কি প্রকারে কর্ণেল শ্লিমান ও জেনারেল আউটরাম, অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত করিবার সম্বন্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন।

কর্ণেল শ্লিমান। ১৮৪৯ সালে কর্ণেল শ্লিমান সাহেব তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডেলহৌসীর নিয়োগানুসারে, বিশেষ কার্য্যে ব্রতী হইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। এই সময় হইতে নবাব ওয়াজিদ আলিশার অদৃষ্টাকাশে একখণ্ড কাল মেঘ উঠিল। আউটরামের সময়ে এই মেঘ খণ্ড বর্দ্ধিতায়তন হইয়া মহা ঝটিকা

উৎপন্ন করিয়াছিল। ঝটিকায় নবাবের সিংহাসন বিচলিত হইল, সমগ্র অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত হইল, নবাবের সহযোগী অন্যান্য দেশীয় নৃপতিগণ উন্মুক্ত নয়নে দেখিলেন কোম্পানির ক্ষমতা দেশীয় রাজাদিগের উপর কতদূর অপ্রতিহত এবং ডেলহৌসী আনন্দোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই কর্ণেল শ্লিমানের নাম শুনিয়াছেন। ঠগ সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ কার্য্যে বহুসাধ্য পরিশ্রম করিয়া তিনি ভারতের অত্যুপকার সাধন করিয়াছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর কাল এদেশে থাকিয়া কোম্পানির চাক্‌রি করিয়া তিনি ভারত সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন—দেশীয় রাজা ও দেশীয় প্রজা সম্বন্ধে ও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল—এক কথায় তিনি একজন উচ্চদরের Deploinat সুতরাং এই কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া লর্ড ডালহোসী অন্তরস্থ গভীর উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্বন্ধে যে নিশ্চিন্ত হইলেন তাহা বলা বাহুল্য। * শ্লিমান অযোধ্যার আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলেন বটে—কিন্তু অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই ডালহৌসী সাহেব তাঁহাকে দণ্ডাজ্ঞা বলিয়া দিয়াছিলেন। পূজা আরম্ভ হইল বটে কিন্তু তৎপূর্ব্বেই বলি উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল—এই প্রকারে ডালহৌসীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শ্লিমান সাহেব লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি অধিকার করিলেন। কি কুলগ্নে যে শ্লিমান লক্ষ্ণৌএর মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না—তাঁহার আগমনের স্বল্পকাল পরেই রাজ্যের চারিদিকে ভয়ানক দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। নবাবের রাজ-মুকুট চঞ্চল হইল। বাদসাহ অতুল রাজ্যেশ্বর হইয়াও সামান্য লোকের ন্যায়, প্রতি পদে পদে অপমানিত হইতে লাগিলেন এবং রাজ্যভার তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া কর্ণেল শ্লিমান কিপ্রকার ব্যবহার আরম্ভ করিলেন এক্ষণে তাহাই আমরা দেখাইব। ১৮৫৭ সালের মে মাসে রাজ্যচ্যুত বাদসাহ ওয়াজিদ আলি

* অযোধ্যা অধিকারই যে ডালহৌশীর একমাত্র মনোভিপ্রায় ছিল—তাহা তৎপ্রেরিত কর্ণেল শ্লিমানের নিম্ন লিখিত নিয়োগ পত্রাংশ হইতে প্রমাণিত হয়। * * The Communication made by the Governor General to the king of Oude in Actober 1847 gave his Majesty to understand that if thecondition of the Government was not very materially amended before two years had expired the management for his behoof would be taken into the hands of the British government. *There seems little reason to expect or to hope that in October 1849 any amendment whatever will have been effected* * * I do myself therefore the honor of proposing to you to accept the office of Resident at Lucknow, *with especial reference to the great changes which in all probability will take place.* * * Letter dated Government House Calcutta Sept. 10th. 1848.

তাঁহাকে অকারণে রাজ্যচ্যুত করিবার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইয়া পার্লামেণ্টে যে আবেদন পত্র দাখিল করেন তাহা হইতে জানা যায় যে কর্ণেল সাহেব অযোধ্যায় গিয়াই যথেচ্ছাচার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। যে প্রকার কার্য্য করিলে নবাবের নিজের মনঃপীড়া জন্মে, তাঁহার রাজোচিত মর্য্যাদার লাঘব হয়, প্রজার নিকটে তিনি হেয় ও অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হন, ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাই প্রবল—নবাব তাঁহার হাতে ক্রীড়া-পুতলি ইহা যাহাতে চারিদিকে রাষ্ট্র হয়—এ প্রকার কার্য্যেই তিনি অধিক মনোযোগ দিলেন। সেগুলি কি আমরা একে একে সংক্ষেপে বুঝাইব।

সর্ব্বপ্রথমে শ্লিমান মন্ত্রী নিয়োগ কার্য্যে স্বাধীনতায় বাধা দিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করেন। পাঠককে একথাটি স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি—যে ১৮০১ সালের সন্ধিতে ওয়েলেস্‌লী সাহেব—রেসিডেণ্টকে নবাবের কোন প্রকার আভ্যন্তরিণ শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেন। সে সন্ধি এ সময়েও কার্য্যকরী ছিল—সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া শ্লিমান কোম্পানীর পক্ষে সন্ধিভঙ্গ দোষে দোষী হইয়াছেন।

ওয়াশী আলি খাঁ—নবাবের প্রধানমন্ত্রী আলিনাফ খাঁর সহকারী (under secretary) ছিলেন। তিনি বিশেষরূপ কার্য্যদক্ষ, পরিশ্রমী, ইংরাজের রীতি নীতি ও ব্যবহারাভিজ্ঞ ও তীক্ষ্নদর্শী রাজপুরুষ ছিলেন। প্রভুভক্তি তাঁহার জীবনের প্রধান গুণ। সাধ্যমতে প্রভুর দোষ ঢাকিয়া চলিতে, তাঁহার পদোচিত সম্ভ্রম অটুট রাখিতে, রাজ্যের সকল স্থানে, আবশ্যক মত নূতন সংস্করণে সুবন্দোবস্ত চালাইতে তিনি বড়ই কর্ম্মঠ ছিলেন। কর্ণেল শ্লিমান দেখিলেন এ লোকটা দরবারে ক্ষমতাপন্ন থাকিলে নবাবের বিরুদ্ধে মোকদ্দামা খাড়া করা বড় দুরূহ হইবে। ডালহৌসীর উপদেশ পালন অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সুতরাং ইহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য—তিনি নবাবকে লিখিলেন "কর্ণেল লো প্রভৃতি ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্টগণ ওয়াশী আলিকে লক্ষ্ণৌএ থাকিতে দেন নাই—আপনি সুতরাং ইহাকে পদচ্যুত করিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে ইহাকে নির্ব্বাসিত করুন।" (২ মার্চ্চ ১৮৫৯)।

নবাব উত্তর দিলেন "বিনা বিচারে ওয়াশী আলিকে নির্ব্বাসিত করিলে আমার রাজ্যে প্রজারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া গোলমাল উপস্থিত করিবে।" রেসিডেণ্ট সাহেব তখন বলিলেন—"এই পদবী ওয়াশী আলির জায়গীর বা পৈতৃক সম্পত্তি নহে—সুতরাং সে দোষ করিয়াছে কিনা তাহার বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই।" নবাব মনে মনে ওয়াশীকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানিতেন কিন্তু জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করা বিপদজনক জানিয়া অনিচ্ছায় রেসিডেণ্টের উত্তেজনায় ওয়াশী আলীকে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ওয়াশী আলিও প্রভুর আজ্ঞা বিনাওজরে শিরোধার্য্য করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। গঙ্গা বক্‌স নামক একজন অপরাধীকে

ধরিবার জন্য রেসিডেণ্ট সাহেব নবাবের পক্ষ হইতে কয়েক মাস পূর্ব্বে একখানি ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। অপরাধীকে ধরিতে পারিলে সরকার হইতে পুরস্কার দেওয়া হইবে একথা উক্ত ঘোষণা পত্রে উল্লিখিত ছিল। ওয়াশী আলি নির্ব্বাসিত হইয়াও ঘটনা বশে এই অপরাধীকে ধরাইয়া দিলেন। কর্ণেল শ্লিমান যখন শুনিলেন গঙ্গাবক্স ধৃত হইয়াছে তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন ওয়াশী আলির দ্বারায় এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে—তখন তিনি বড় সুখী হইলেন না। নবাব ওয়াশীকে নির্দ্ধারিত পুরস্কার দিতে চাহিলেন—রেসিডেণ্ট তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করিলেন, পুরস্কার দেওয়া দূরে থাক্ ওয়াশীকে পুনরায় লক্ষ্ণৌত্যাগ করাইবার জন্য জেদাজেদি আরম্ভ করিলেন। হতভাগ্য ওয়াশী পুনরায় লক্ষ্ণৌ হইতে নির্ব্বাসিত হইল।

এই পর্য্যন্ত ঘটাইয়াই যদি কর্ণেল সাহেব ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে কুণ্ঠিত হইতাম না—কিন্তু ইহার পর আর একটী ঘটনা ঘটিল যাহাতে কর্ণেল শ্লিমানকে অতিশয় যথেচ্ছাচারী, ধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য লোক বলিয়া বোধ হয়। ঘটনাটী এই—"এক দিন রাত্রে একজন সিপাহী রেসিডেন্সির বারান্দায় পাহারা দিতেছিল, এমন সময়ে সহসা বন্দুকের আওয়াজ হইল—আওয়াজ শুনিয়া পাঁচ ছয় জন চাপরাসী দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপারটা কি?" সিপাহী উত্তর করিল, "এইমাত্র দুইজন লোক আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কর্ণেল শ্লিমান কোথায়? আমি জানি না বলাতে তাহারা চলিয়া গেল—কিন্তু এতরাত্রে তাহাদের অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিতে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল—এবং সেই জন্য আমি তাহাদের লক্ষ্য করিয়া এই মাত্র বন্দুক ছুড়িয়াছি।

তখন আর এ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ হইল না—পরদিন কর্ণেল শ্লিমান নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"রেসিডেন্সির সিপাহীরা বড় বেহুঁসিয়ার। গত রাত্রের ঘটনার জন্য আমি কয়েকজন অতিরিক্ত সৈন্য রাখিতে চাই" নবাব বিনাবাক্য ব্যয়ে একথায় সম্মত হইলেন। বলা বাহুল্য খরচটা নবাবের ঘাড়ে পড়িল।

অপরাধী ধরিবার ঘোষণাপত্র প্রচার হইলেও সপ্তাহপরে আবার সেই প্রকার এক ঘটনা ঘটিল। সেই দিনও রাত্রে সেই প্রকার বন্দুকের আওয়াজ হইল—সেই প্রকার লোক ছুটিয়া আসিল,—সিপাহী বলেন—একজন হাতিয়ার ওয়ালা আদমী এই দিকে আসিতেছিল, আমি তাহাকে সৈনিক নিয়ম মতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—সে উত্তর না দেওয়াতে আমি আওয়াজ করিয়াছি। ইহাতে আমার হাতে চোট লাগিয়াছে।

বস্তুত তাহার হাতে গুলি প্রবেশ করিয়াছিল।

পরদিন প্রাতে দস্তুর মত তদারক আরম্ভ হইল। তদারকে দেখা গেল কড়িকাঠের গায়ে সেই সিপাহীর ঠিক মাথার উপরে একটি গুলি বিঁধিয়া রহিয়াছে। তাহার জামার হাতার ভিতর বারুদ প্রবেশ করিয়াছে ও তাহাতে সেইস্থান ঝলসাইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত

গুলি ও বারুদের পরীক্ষায় ইহাও প্রকাশ পাইল—উক্ত সিপাহী যে দরের গুলি বারুদ ব্যবহার করে ইহাও তাই। প্রকৃত রহস্য উক্ত তদারকে এই বাহির হইল—যে কর্ত্তব্য পরায়ণ ডালরুটীভোজী সিপাহী-সাহেব পাহারা দিতে দিতে ঢুলিতে ছিলেন—সহসা ঘুমের ঘোরে বন্দুকের ঘোঁড়ায় হাত পড়াতে আপনা আপনি আওয়াজ হইয়া গিয়াছে। গুলি কড়িকাঠে বিঁধিয়াছে ও তাহার মধ্য হইতে একটা ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া তাহার হাতে পড়িয়াছে।

তদারকে যে রহস্য বাহির হইল—কর্ণেল শ্লিমান তাহাতে বড় একটা মনোযোগ করিলেন না—তাঁহার মনে জাগিতেছিল ওয়াশী আলি,—তিনি ভাবিলেন সেই দুরাত্মারই এই সমস্ত কাজ—সেই তাঁহাকে খুন করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছে। সন্দেহের উপর তাহাকে অপরাধী স্থির করিয়া—তিনি নবাবকে ইহার সুবিচারের জন্য অনুরোধ করেন। অগত্যা ওয়াশীকে ১৮৫৩ সালের ২০ এ নবেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌএর প্রধান বিচারক—সুলতান উল্‌মা সৈয়দ মহম্মদের নিকট খাড়া করা হইল। কর্ণেল শ্লিমানকে এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা হইল—কিন্তু তিনি ইহাতে অস্বীকার করিলেন। সৈয়দ মহম্মদ ও অন্যান্য বিচারকের একমতে ওয়াশী ও অন্যান্য অপরাধীগণ নির্দ্দোষী বলিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। ওয়াশী আলির চরিত্র সম্বন্ধে মেজর জেনারেল জনষ্টন প্রভৃতি উচ্চদরের মত দিয়াছেন। কিন্তু শ্লিমানের ক্রমাগত তাড়নায় তিনি ভগ্নান্তঃকরণে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

ইহার পর আর একটী কার্য্যে তাঁহার আরও যথেচ্ছাচার প্রকাশ পায়। করম আহম্মদ নামক এক ব্যক্তি মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়াতে নবাব তাহাকে রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে বলেন। ইহা ছাড়া মুন্সী করমের আরও দোষ ছিল—তিনি নবাবের সভার সকল রকম কথাই রেসিডেণ্ট সাহেবকে শুনাইতেন—সত্যের ভাগ অপেক্ষা তাহাতে মিথ্যার ভাগই অধিক থাকিত। নবাব তাহাকে রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে বলিতেছেন দেখিয়া—রেসিডেণ্ট সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিয়া নবাবকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন "মুন্সী করম আহম্মদ আমার ও আমার সহকারীর কাছে সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করে বলিয়া আপনি তাহাকে বাসান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আপনি ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন করম আহাম্মদকে নির্ব্বাসিত করিলে আমি আপনার উকীল প্রভৃতি কোন কর্ম্মচারীকেই আমার কাছে আসিতে দিব না। আরও আমি গবর্ণর জেনারেলকে লিখিব—যে আপনি আপনার প্রজাগণকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করেন। এ প্রকার স্থলে রেসিডেন্সি উঠাইয়া ও সৈন্যদল সরাইয়া লওয়াই আরও ভাল"।

পাঠক! একবার ভয় দেখানর প্রথাটা দেখুন। বলা বাহুল্য যে করম খাঁ এ যাত্রা রেসিডেণ্টের হস্তক্ষেপে বাঁচিয়া গেলেন। *

* Spoliation of Oudh by the Honorable East India Company. 1858.

নবাব ওয়াজিদ আলিশা স্বীয় মোহরে “গাজি” এই শব্দটী ব্যবহার করিতেন। ইহা তাঁহার পৈতৃক উপাধি। এই শব্দটীর মধ্যে এমন কোন অর্থ নাই যাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন প্রকার মান হানি বা অনিষ্ট হইতে পারে। কর্ণেল শ্লিমান গায়েরজোরে নবাবকে তাঁহার শীল হইতে এই কথাটী কাটিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি কোম্পানীর প্রতিনিধি কাজেই নবাব ইহা কোম্পানীর নিজের অভিপ্রায় বুঝিয়া এই শব্দটী তাঁহার শীল হইতে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। নবাবকে এই কথাটী গোপনে লিখিয়া পাঠাইলেই কার্য্য সিদ্ধি হইত কিন্তু তাঁহাকে আরও অপমানিত ও সাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি officially অর্থাৎ সাধারণকে জানাইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিলেন। বৎসর বৎসর নবাব সাহেবেরা বন্ধুত্বের ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ অযোধ্যার রাজকীয় প্রথানুসারে রেসিডেণ্টকে ফল উপহার প্রদান করিতেন এ পর্য্যন্ত সকল রেসিডেণ্টই তাহা আপ্যায়িত ভাবে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু শ্লিমান তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া সকলকে জানাইলেন অযোধ্যার নবাবগণের সহিত তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্য লোপ পাইয়াছে।

১৮০১ সালের সুবিখ্যাত সন্ধির একটী ধারায় লিখিত ছিল—“ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যাকে আভ্যন্তরিণ শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন এবং পলায়িত অপরাধাদিগকে আশ্রয় না দিয়া অযোধ্যা গবর্ণমেণ্টের নিকট সমর্পণ করিলেন।” Oudh Blue book হইতে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়—শ্লিমান সাহেব স্বেচ্ছায় এই ধারা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। সেলন এলাকাভুক্ত, ব্যালাকঙ্করের রাজা হনুমন্ত সিংহের ঘটনাটী ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আগাগোড়া বলিতে গেলে স্থানে কুলাইবে না সুতরাং বিষয়টী সংক্ষেপে বুঝাইব। কর্ণেল শ্লিমানের ভাবভঙ্গী দেখিয়া রাজা হনুমন্তসিং বুঝিতে পারিলেন এ সময়ে তাঁহার কাণে যাহা কিছু তোলা যাইবে তাহাই কার্য্যকারক হইবে। মনে মনে এই কল্পনা করিয়া তিনি নবাবের আমিনকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিলেন এবং নবাবের কর্ম্মচারীরা পাছে তাঁহাকে ধরিয়া বিচারালয়ে সমর্পণ করে এই ভয়ে তিনি রেসিডেণ্ট সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন। রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহাকে যে কেবল অভয় দিলেন এমত নহে—তাঁহাকে লক্ষ্ণৌয়ে আনিয়া কাণ্টনমেণ্টের সীমা মধ্যে একটী বাঙ্গলা কিনিয়া তাহাতে বাস করিতে দিলেন। ছাউনীর সীমামধ্যে কোম্পানীর সৈনিক নিয়মানুসারে, সেনাসম্পর্কীয় লোক ছাড়া আর কেহই থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু শ্লিমান সাহেব ইহা জানিয়াও রাজা হনুমন্ত সিংহকে তথায় আশ্রয় দিলেন এমন কি উক্ত রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে ঘোড়সওয়ার হইয়া তাঁহার সহিত রাজপথে বাহির হইতেন। এই প্রশ্রয়ের এই ফল হইল, হনুমন্তসিংহ যেমন একদিকে সরকারের প্রকৃত প্রাপ্য বন্ধ করিলেন তেমনি অপর দিকে তাঁহার পুত্রেরা জবরদস্তিতে প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিতে লাগিলেন। নবাব এ সমস্ত অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার প্রতিবাদ

করা নিষ্ফল জানিয়া চুপ করিয়া রহিলেন এবং এইরূপে ১৮০১ সালের সন্ধি রেসিডেণ্ট নিজেই ভঙ্গ করিলেন।

অযোধ্যার বিচার-বিভাগে রেসিডেণ্ট সাহেব কি প্রকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; ছত্রসিংহ ও রামদত্তের ঘটনা হইতে তাহার প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। একদিন একজন লোক আসিয়া বলিল—"আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিলাম—যখন বিঘারি গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হইলাম তথাকার জমীদারের ভ্রাতা ছত্রসিংহ আসিয়া আমাদের সহসা আটক করিলেন ও তাঁহার বাটীতে ধরিয়া লইয়া গেলেন, আমরা তাঁহার হস্তে বন্দী হইলাম, ছত্রসিংহ জানি না কি কারণে আমার বন্ধুর শিরচ্ছেদ করিলেন, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমি এক দাসীকে ঘুস দিয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া আত্ম রক্ষা করিয়াছি।" শ্লিমান সাহেব এই ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং নবাবের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ না করিয়া তাঁহার বিনা-সম্মতিতে কোম্পানীর ১০ নং দেশী পদাতির কিয়দংশ সৈন্য ও দুইটী কামান দিয়া—হার্ডউইক সাহেবকে ছত্রসিংহের দমন জন্য পাঠাইলেন। হার্ডউইক আবার বন্নিতে গিয়া অযোধ্যার সীমান্ত পুলিসের কর্ত্তা ওয়েণ্টন সাহেবের অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া বিঘারি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রেসিডেণ্ট সাহেব কড়া হুকুম দিলেন ছত্রসিংহকে ধরিয়া একেবারে বন্দী-করিবে নচেৎ গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।" কোম্পানীর সৈন্য গিয়া বিঘারি পৌছিল কিন্তু কোথায় বিদ্রোহ বা আত্মরক্ষার চিহ্ন স্বরূপ কোন দুর্গাদি দেখিতে পাইল না। সৈন্যাধ্যক্ষেরা বুঝিলেন মশা মারিতে কামান পাতা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তাবেদার কাজেই ছত্রসিংহকে ডাকিয়া পাঠান হইল। ছত্রসিংহ নির্দ্দোষী—এই প্রকার আয়োজন দেখিয়া প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু পরে আসিয়া সেনাধ্যক্ষদের সহিত যেমন দেখা করিলেন অমনি তাঁহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। যে লোক ছত্রসিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছিল—সে সেখানে উপস্থিত ছিল, যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোথায় তাহার সঙ্গীর শিরচ্ছেদ করা হইয়াছে ও কোথায় তাহাকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল দেখাইয়া দেওয়া হউক তখন সে ব্যক্তি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল! মোট কথা এরূপ ঘটনা আদৌ ঘটে নাই। এই সময়ে বিঘারীর সহিত তাহার পার্শ্বস্থ গ্রামের সীমা লইয়া আদালতে বিবাদ চলিতেছিল কোন প্রকারে গোলযোগ করিয়া বিঘারির ধ্বংশ করিতে পারিলে এই সকল কথা একেবারে উড়িয়া যায় এবং এই উদ্দেশ্যেই এই প্রকার মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। আরও অভিযোগকারী একজন সামান্য সিপাহী—ইতিপূর্ব্বে চৌর্য্যাপরাধে তাহাকে সরকারী কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। এই ঘটনার পরিণাম হইল এই, প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল।

তালুকদার রামদত্তের ঘটনাটা মোটামুটি এই; মহম্মদ হোসেন নামক নবাবের একজন আমিন খাজনা আদায় করিবার জন্য বরৈছ ডিষ্ট্রীক্টে উপস্থিত হন। রামদত্ত এই

বিভাগের এক অংশের তালুকদার। সরকারের প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে আমিন সাহেবের তাঁবুতে ডাকিয়া পাঠান হয়। রামদত্ত আমিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে সমস্ত বাকী বকেয়া পরিশোধ করিয়া দিতে উপদেশ দেন। রামদত্ত এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আমিন হুকুম দিলেন—সমস্ত পরিশোধ না করিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিবেন না। আমিনের তাঁবুর সম্মুখে জনতা নিবারণ জন্য একটী কানাত করা হইয়াছিল। রামদত্তের সহিত তেরজন অস্ত্রধারী সেনা ছিল, তালুকদার এই কানাতের মধ্যে উপস্থিত হইল তাঁহাকে পুনরায় বলা হইল সমস্ত খাজনা না দিয়া তিনি কোন মতেই স্থানত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই ঘটনায় রামদত্ত উত্তেজিত হইয়া আমিনের কয়েকজন সিপাহীকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলেন। এই খানে একটী ক্ষুদ্রগোছের দাঙ্গা হইল—এবং রামদত্ত আমিন মহম্মদ হোসেনের সিপাহিগণের হস্তে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তালুকদারের কারপরদাজ—অযোধ্যা প্রসাদ ও সুধনলাল নামক দুইব্যক্তি এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট অভিযোগ করিলেন—যে আমিন তাঁহাদের প্রভুকে হত্যা করিয়াছেন। ইহার পর মহম্মদ হোসেন গোরক্ষপুর বিভাগে তহশীল করিতে গমন করিলেন। এইস্থানে রামদত্তের ভ্রাতা কৃষ্ণদত্ত, খাজনা দিতে অসমর্থ হইয়া আমিন মহম্মদ হোসেনের ক্ষমতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয় পক্ষে এই উপলক্ষে দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিতে লাগিল—কৃষ্ণ দত্ত পরিশেষে আঁটিতে না পারিয়া রাপ্তী নদীর পরপারে পলায়ন করিলেন। সেই সময়ে আমিনের সৈন্যেরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করিল—এইখানে দাঙ্গা হাঙ্গামায় মুখে আমিনের সৈন্যদল হইতে একটী গুলি ছুটিয়া গিয়া পরপারে এক ব্রাহ্মণের গায় লাগে। ব্রাহ্মণ বিশ্বাস মিত্র ইংরাজের প্রজা—সেই গুলির আঘাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হওয়াতে গোরক্ষপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট লক্ষ্ণৌএ রেসিডেণ্টের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। রেসিডেণ্ট শ্লিমান সাহেব এ সংবাদে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া আমিন মহম্মদ হোসেনকে পদচ্যুত করিবার জন্য নবাবকে লিখিলেন। নবাব ওয়াজিদ্ আলিশা রেসিডেণ্টের মনোরঞ্জনার্থে অগত্যা তাহাই করিলেন।

কিন্তু এই ব্যাপারে মহম্মদ হোসেন নিস্তার পাইলেন না। তাঁহার নামে দুইটী নরহত্যা অভিযোগ উপস্থিত করা হইল—প্রথম অভিযোগ রামদত্ত সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টী বিশ্বাস মিত্রকে লইয়া। বিশ্বাস মিত্রের বিচার করিতে নবাবের কোন হাত নাই কেননা সে ইংরাজের প্রজা, কিন্তু রাম দত্তের খুনের বিচারের জন্য—নবাব সাহেব অপরাধীকে "মুজ্জাহিদ্ উল উমরের" (প্রধান বিচারক) নিকট সমর্পণ করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া বিচারের পর প্রধান বিচারক, আমিল মহম্মদ হোসেনকে দুইটী কারণে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি দিলেন—প্রথম কারণ এই তিনি এই ঘটনাস্থলে অনু-

পস্থিত ছিলেন—দ্বিতীয় কারণ, গোলাগুলি চালাইয়া রাম দত্তকে নিহত করিবার জন্য তাঁহাকে কেহ হুকুম দিতে শোনে নাই। কর্ণেল শ্লিমান যে এ বিচারে সন্তুষ্ট হইলেন না তাহা বলা বাহুল্য। তিনি অপরাধীকে তাঁহার নিজের অথবা গোরক্ষপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীনে সমর্পন করিবার জন্য নবাবকে অনুরোধ করিলেন—কিন্তু এ প্রস্তাব ভীষণ অপমানকর ভাবিয়া নবাব তাহাকে অসম্মত হইলেন, পরিশেষে রেসিডেণ্ট সাহেব এই বিষয় ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টকে জানাইলে তাঁহারা লিখিয়া পাঠাইলেন "গোড়াগুড়ি হইতেই এই মোকদ্দমা রেসিডেণ্টের নিজে তদারক করা উচিত ছিল—কিন্তু তিনি নিজে যখন অপরাধীকে পূর্ব্বোক্ত বিচারালয়ে সমর্পণ করিয়াছেন তখন বিচারকদের আজ্ঞাই মানিয়া চলিতে হইবে।"

এই সকল উদ্ধৃত ঘটনাবলী হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন কর্ণেল শ্লিমান অযোধ্যার নবাবকে সাধারণের চক্ষে কতদূর হেয় ও অপদার্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং পদে পদে তাঁহাকে কতদূর অপমানিত করিয়াছিলেন।

১৮৫০ সালের শীতকালে শ্লিমান সাহেব অযোধ্যা ভ্রমণে বাহির হইলেন—ইহার লোক-দেখান উদ্দেশ্য দেশ দেখা ও প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণ করা, আসল উদ্দেশ্য—ডালহৌসীর উপদেশ প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। যেখান হইতে যে প্রকারে অযোধ্যার প্রজাগণের নিকট হইতে নবাবের ও তাঁহার রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়, কর্ণেল শ্লিমান তাহার কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি রাখেন নাই। প্রলোভন, ভয়প্রদর্শন, সহানুভূতি প্রকাশ, স্তোক বাক্য, প্রভৃতি নানা উপায়ে প্রজাদের নিকট হইতে দরখাস্ত সংগ্রহ হইতে লাগিল। নবাবের নিকট যখন তিনি এই ভ্রমণ প্রস্তাব করেন তখন নবাব সাহেব তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন এমন কি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু শ্লিমান কাহারই কথা শুনিলেন না। ভ্রমণের খরচটা (তিন লক্ষ টাকা!) অযোধ্যার রাজ ভাণ্ডার হইতেই শোষিত হইয়াছিল। শ্লিমান যাইবার সময় নবাবকে বলিলেন—"চিনটের বাহিরে যাইব না—সেইখান হইতেই ফিরিব।" কিন্তু কার্য্যত সমস্ত অযোধ্যাটা ঘুরিয়া আসিলেন। Hooker এক স্থলে বলিয়াছেন—"He who goeth about to persuade a multitude, that they are not so well governed as they ought to be,—shall never want attentive and favorable hearers." সুতরাং শ্লিমান সাহেব যে নবাবের বিরুদ্ধে সকল প্রকারের অভিযোগ সংগ্রহ করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি? ডালহৌসী তাঁহাকে যে গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্য লক্ষ্ণৌএ পাঠাইয়াছিলেন তিনি তাহা প্রকারান্তরে সুসিদ্ধ করিয়া,—১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া—কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।*

* নবাব তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে যে সমস্ত উত্তর দিয়াছিলেন

জেনারেল আউটরাম।

কর্ণেল শ্লিমান কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইলে জেনারেল আউটরাম (পরে স্যর জেমস আউটরাম) অযোধ্যার রেসিডেন্সিতে গিয়া বসিলেন। আসিবার সময় লর্ড ডালহৌসী তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—কর্ণেল শ্লিমান অযোধ্যা সম্বন্ধে যে প্রকার রিপোর্ট করিয়া গিয়াছেন অযোধ্যার অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত হইয়াছে কি না আপনি লিখিবেন। ৫ই ডিসেম্বর আউটরাম লক্ষ্ণৌএ উপস্থিত হন—এবং চারি মাসের মধ্যেই অযোধ্যা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রস্তুত করিয়া ১৫ই মার্চ্চের পর তিনি তাহা গবর্ণর জেনারেলের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই মন্তব্যে অযোধ্যার অদৃষ্টে শীলমোহর পড়িল—সাদত খাঁর বংশধরের সিংহাসন টলিল—অযোধ্যার মুসলমান-শাসনের ভিত্তি মূল কাঁপিল। ইংলণ্ডে একটা সামান্য প্রজাকে বাসচ্যুত করিতে পনরমিনিটের অধিক সময় আবশ্যক করে না—কিন্তু অযোধ্যার নবাব বংশের ক্ষমতা লোপ করিতে ইহা অপেক্ষাও কম সময় লাগিয়াছিল। বলা বাহুল্য—আউটরাম নিজে অযোধ্যা সম্বন্ধে কোন কিছু নূতন অনুসন্ধান করেন নাই—তাঁহার ন্যায় উন্নতচেতা লোকের হাতে এই কার্য্য পড়িলে বোধ হয় অযোধ্যা এ সময় ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইত না। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লিমান যাহা করিয়া গিয়াছিলেন—তিনি তাহাই ঝাড়িয়া পুঁছিয়া, সাজাইয়া, গুজাইয়া লর্ড ডালহৌসীর নিকট পাঠাইলেন। †

তাহা হইতে কর্ণেল শ্লিমানের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। একস্থলে আছে—"In his very first halt, on the occassion of his tour through Oudh he recieved petitions from my subjects * * * In consequence of the attention paid to them, and of their considering Col. Sleman's direction on their petitions to be as a sort of recommendation by him, the inhabitants began to send in a countless number of petitions—many cases which had been disposed of twenty or thirty years ago were instituted in a new form—while those whose cases were pending before the king presented petitions on the same matters before the Resident, and when the inhabitants found that their petitions were transferred by the resident to the king for adjudication they hoped * that all of them would by causing a hurried inquiry obtain for them their wishes. (Reply to the charges. by H. M. the king quoted in spoliation of Oudh.

† In the absence of any personal experience in this country I am of course entirely dependant for my information on what I find in the Residency Records and can ascertain through the channels which supplied my Predecessor." Preface to the charges against. H. M. the King.

আউটরাম তাঁহার মন্তব্যটীকে প্রধানতঃ সাত ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন—(১) নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণ (২) রাজস্ব বন্দোবস্ত (৩) পুলিশ ও বিচার বিভাগ (৪) সৈনিক বিভাগ (৫) পূর্ত্তবিভাগ (৬) ফৌজদারী বিভাগ ও অপরাধী সংখ্যা (৭) রাজ্যমধ্যে অত্যাচার ও অবিচার।

শ্লিমান লিখিয়া গিয়াছিলেন "বর্ত্তমান নবাব সর্ব্বদাই নৃত্য গীতাদিতে উন্মত্ত এবং নিম্ন শ্রেণীর লোক ও খোজাবৃন্দে পরিবেষ্টিত। শ্লিমান যাহা বলিয়া গিয়াছেন আউটরাম তাহার প্রতিধ্বনি করিলেন সেই প্রতিধ্বনি আবার ডালহৌসীর মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়া সত্যে পরিণত হইল। নবাব যে গীতবাদ্যাদিতে অনুরক্ত ছিলেন, এবং খোজাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন একথা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। মুসলমান রাজা বা বাদসাহদিগের অন্তঃপুর রক্ষার জন্য খোজাদিগের প্রয়োজন হইয়া থাকে, আকবর প্রভৃতি বাদসাহগণের যেরূপ অন্তঃপুর রক্ষার জন্য খোজা নিযুক্ত হইত—ওয়াজিদ আলির সম্বন্ধেও তদ্রুপ। এ দেশের বড় বড় রাজা রাজড়ার সভায় এ প্রকার দৃশ্য নিতান্ত অসাধারণ নহে। কিন্তু অন্তঃপুর রক্ষার জন্য আবশ্যকানুসারে বহুসংখ্যক খোজা রাজপ্রাসাদের আশাপাশে থাকিত বলিয়া যে নবাব অপরাধী হইলেন একথা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। 'রাজকার্য্য হইতে অবসর' গ্রহণান্তে নবাব অন্তঃপুরে বসিয়া কোথায় কি করিলেন পুংখানুপুংখরূপে ইহার অনুসন্ধান করা রেসিডেণ্টদিগের একটা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছিল সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহারা সামান্য ঘটনাটী পাইলেও লিপিবদ্ধ করিতেন। নবাবের প্রকাশ্য সভার দুই এক স্থলে সঙ্গীতালোচনা হইত বটে কিন্তু তাহা অন্য ধরণের। বাদশাহ ওয়াজিদআলি নিজে একজন সুশিক্ষিত ও উচ্চদরের কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক কাব্যগ্রন্থ ইউরোপের বড় বড় লাইব্রেরিতে আজও পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ ফরাশি গার্সিন ট্যাসে নবাবের এই সমস্ত কবিতার মনোহারিণী শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নবাবের অপরাধের মধ্যে এই, তিনি মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিয়া উপযুক্ত গায়কদিগের মুখে তাহার সুর তান লয় মান আবৃত্তি স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন। সময়ে সময়ে এই প্রকারে নিজের সুখ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া তিনি যে রাজ্য উচ্ছন্ন দিতে বসিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাস করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। সামান্য লোকে যে কার্য্যে স্বাধীনতা পাইবে সে কার্য্যে যে একজন রাজ্যেশ্বরের স্বাধীনতা থাকিবে না একথা নিতান্ত জবরদস্তির কথা।

রাজ্যশাসন কার্য্যে তিনি যদি একবারে উদাসীন হইয়া এই সকল ব্যসনে নিমগ্ন থাকিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ দোষী করিতাম। তিনি নিজের মুখে এ সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম হইতে আমরা বুঝাইব—যে ওয়াজিদ আলিকে যতদূর উদাসীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন শাসনকর্ত্তা বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে বস্তুতঃ তিনি তদ্রুপ নহেন। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন "আমার রাজ্যারোহণের পর

কয়েক মাস নিয়মিত দরবারাদি করিয়া আর আমি তদ্রূপ করি নাই কিন্তু ইহার বিশেষ কারণ আছে। প্রজা পালন করিতে হইলে তাহাদের সম্বন্ধে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রয়োজনীয়। এই অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া দরবারাদি করিলে—বৃথা সময়ের অপব্যয় ভিন্ন আর কোন ফলই হয় না। আমি এই সময় হইতে নিজে চেষ্টা করিয়া রাজ্য সম্বন্ধে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। রেসিডেণ্ট রাজ্য সম্বন্ধে যে কোন কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—আমি তাহার কোনটীরই উত্তর দিতে অপারক হই নাই। বিচার কার্য্যে যদি কোন গলদ্ থাকে তাহা জানিবার জন্য আমি প্রকাশ্য রাজপথে,প্রজাদের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে অভিযোগ ও প্রতিবাদাদি পাইবার জন্য বাক্স টাঙ্গাইয়া দিয়াছি। সৈন্য সংস্কারের চেষ্টা আমি পাইয়াছিলাম কিন্তু রেসিডেণ্ট "এরূপ করিলে কোম্পানী অসন্তুষ্ট হইবেন" এই কথা বলাতে আমি সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছি। এবং প্রজার সৌকয্যার্থে লর্ড হার্ডিঞ্জের পরামর্শ ক্রমে আমি রাজ্যমধ্যে ইজারা উঠাইয়া দিয়া আমনী প্রথার প্রচলন করিয়াছি" ইত্যাদি।

ওয়াজিদ আলিকে মিথ্যাবাদী ধরিলে এ সাফাই গ্রহণীয় নহে। কিন্তু এ বিবেচনার ভার পাঠকের উপরই রহিল। রাজ্য-সংস্কার কার্য্যে ওয়াজিদ আলি মনোযোগী হইয়াছিলেন কি না—তাহার প্রমাণ আমরা পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই যথেষ্ট দিয়াছি।

কর্ণেল লো সাহেব অনেক দিন ধরিয়া অযোধ্যার রেসিডেণ্ট ছিলেন - বিশেষতঃ "অযোধ্যা গ্রহণ" প্রস্তাবের সময় তিনি লাট্ কৌন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। নবাবের সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। §

লর্ড ডালহৌসী যে সকল ছিদ্র ধরিয়া অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন—তাহাদের মধ্যে "অরাজকতা"র কথাটাই বেশী আলোচনা করা হইয়াছে। "নবাবের রাজ্যে অসহনীয় অরাজকতা না হইলে তাহা কখনই ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করা হইত না—

§ * * The Kings of Oudh have been spoken of in English Society as merci-less tyrents over their own subjects. * * but that sort of language is positively untrue as regards every one of the last five kings * their general conduct towards us, both as public allies of our government, and as individual princes conducting business, in a regular attentive, courteous and friendly manner with our public functionaries, has been unusually meritorious and praise-worthy * However unfaithful they have been to the trust confided to them * they have ever been true and faithful in their adherence to the British power. They have all along acknowledged our power, have submitted without a murmur to our supremacy and have aided us in the hour of our utmost need: The Minute of Hon'ble J. Lowe, 1886.

একথাও একস্থলে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অরাজকতা তিনটি কারণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—(১)পুলিসের বেবন্দবস্ত, (২) বিচারালয়ের বিশৃঙ্খলতা (৩) রাজকার্য্যে নবাবের অনাসক্তি। রাজ্যের আভ্যন্তরিণ শাসন কার্য্যের সুশৃঙ্খলা পুলিশ ও বিচার বিভাগ হইতেই হয় একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতে পাঠক বেশ প্রমাণ পাইবেন ১৮৫৬ সালের বাঙ্গলার আভ্যন্তরিণ অবস্থা অযোধ্যার তুলনায় বড় বেশী সন্তোষকর নহে। ইংরাজের নিজের রাজ্যে যখন এত অরাজকতা তখন সেই সূত্রে পরের রাজ্য ধরিয়া টানা কতদূর অন্যায় ও রাজনীতি বিগর্হিত তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। * কিন্তু ডালহৌসী কোম্পানীর স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য

---

* অযোধ্যার আভ্যন্তরিণ অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসীর মত।

1. Gangs of free-booters infest the Districts * *

2. Law and Justices are unknown. * * * * *

3. Armed violence and bloodsheds are daily events. * *

4. Life and property are nowhere secure for an hour. *

—Vide East India Pamphlets—

বাঙ্গলার তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে মিসনরীগণের মত। (এই সময়ে বাঙ্গলার শোচনীয় অবস্থা পার্লমেণ্টে তুলিবার জন্য তৎকালীন প্রধান প্রধান মিশনরীরা অনুসন্ধান দ্বারা বাঙ্গলার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে এক মন্তব্য তৈয়ার করিয়াছিলেন।

1. The police force are powerless to resist the gangs of organised burglers and dacoits.

2. Throughout the length and bredth of the land the strong prey almost universally upon the weak and power is but too commonly valued only as it can be turned into money.

3. Gang robberies of the most daring character are perpetrated annually in great numbers with impunity. There are constant scenes of violence in contentions respecting disputed boundaries.

4. In many districts of Bengal neither life nor property is secure.

J. M. Ludlaw's (Bar-at-Law) papers on Oudh.

বাঙ্গলার পুলিশের ও বিচারালয়ের সম্বন্ধে আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর হ্যালিডে সাহেব কি বলিয়াছেন একবার দেখুন। ইহা হইতে বোধ হয় অযোধ্যার অবস্থা বাঙ্গলার অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ছিল না। হ্যালিডে সাহেব পুলিস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে মনস্থ করিলেন। যে রাক্ষসী ক্ষুধার উৎপীড়নে তিনি ভারতীয় সামন্ত রাজগণের সর্ব্বনাশ করিতেছিলেন—তাহারই উত্তেজনায় অযোধ্যা গ্রাসে মুখ ব্যাদান করিলেন।

মহাযজ্ঞের পূর্ব্ব সূচনা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিয়া ন্যায় কি অন্যায় করিয়াছেন তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রস্তাবের সময়-সাপেক্ষ নহে। অযোধ্যা গ্রহণরূপ যে মহা-যজ্ঞের কল্পনা করিয়া ডালহৌসী মনে মনে প্রভূত সন্তোষ লাভ করিতেছিলেন, যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল আশায় নিশ্চিত হইয়া তিনি শ্লিমান ও আউটরামকে হোতাস্বরূপ নিযুক্ত করিয়া কোম্পানীর নামে যজ্ঞ সংকল্প করিয়াছিলেন—তাহা কিরূপে সুসিদ্ধ হইল—এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

জেনেরেল আউটরাম ডালহৌসীর পরামর্শানুসারে অযোধ্যার অবস্থা সম্বন্ধে এক যথা-রীতি রিপোর্ট পাঠাইলেন। লাট সাহেব এ সময়ে কলিকাতায় ছিলেন না—উৎকামন্দের শীতল বায়ু সেবনে মস্তিষ্ক শীতল করিতেছিলেন,এমন সময়ে কলিকাতা হইতে (জেনারেল লো প্রেরিত) আউটরামের মন্তব্য তাঁহার নিকট পৌছিল। ডালহৌসী উৎকামন্দে বসিয়াই স্থির চিত্তে দৃঢ়বিশ্বাসে অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করণাভিপ্রায়ে এক সুবৃহৎ মন্তব্য লিখি-লেন। ইহার পর সুপ্রীম কৌন্সিলে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সেই সময়ে ডোরিন সাহেব, স্যর বার্ণস পীকক্, জেনারেল লো ও অনারেবল জে, পি গ্রাণ্ট কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন। সামান্য মতবিভিন্নতা-সত্বেও উঁহারা স্থির করিলেন যে অযোধ্যার শাসনভার ইংরাজের স্বায়ত্তাধীনে আসা নিতান্ত আবশ্যকীয়। এই সময়ে আবার ডাইরেকটারদের নিকট হইতে সম্মতি পত্র আসাতে ঘৃতে বহ্নি সংযুক্ত হইল, লর্ড ডালহৌসী কোমর বাঁধিয়া এই মহাযজ্ঞের শেষাহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং জেনারেল আউটরামকে সময়োচিত উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন।

লর্ড ডালহৌসী আউটরামকে গোপনে উপদেশ দিয়াছিলেন—"নবাবকে ত রাজ্যচ্যুত করিতেই হইবে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে সবদিকে আট ঘাট বাঁধিয়া কাজ করা প্রয়োজন। পাছে

"The village police are in a permanant state of starvation—they are all theives and robbers of necessity or leagued with theives and robbers, in so much that when any one is robbed in a village, it is most probable that the first one suspected is the village watctman." আর একস্থলে বিচারালয় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"Our creminal judicature does not command the confidence of the people, the administration of justice is considered a little better than a lottery. ইহার পর অযোধ্যা বেচারীর অপরাধ কি?

Vide E. I. Pamphlets M. Lewin's paper on Oudh.

নবাব কার্য্য কালে কোন প্রকার বিপক্ষতাচরণ করেন—বা তাঁহার সৈন্যেরা এই অসম্ভব পরিবর্ত্তনে রুষ্ট হইয়া কোন রূপ বিপ্লব উপস্থিত করে—তাহার নিবারণের বিশেষ কোন উপায় করা আবশ্যক। এই উদ্দেশে আউটরাম নানাস্থান হইতে সেনাদল সংগৃহীত করিয়া কানপুরে একত্রিত করিলেন।

১৮৫৫ সালের নবেম্বর মাসের শেষাশেষি নবাবের কর্ম্মচারীদের মনে এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। সন্দেহটী কিন্তু ধুয়াঁর মতন, ভিতরে যে কি আছে তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। চারিদিকে যেন অন্ধকারের একটা অদৃষ্ট ছায়া বেষ্টিত।

কলিকাতায় ইংরাজের দরবারে তাহাদের কোন উকীলাদি ছিল না যে তাহারা ইহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া পাঠাইবে। অযোধ্যার গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের প্রথমেই দেখিলেন—কানপুরে রাশিকৃত সেনা একত্রিত হইয়াছে। কিন্তু কেন এরূপ কাণ্ড হইতেছে তাহার উত্তর দিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করে এমন লোক কেহই নাই। নবাবের কর্ম্মচারীদের কৌতূহল এই সময়ে এতদূর বাড়িয়া উঠিল—যে তাঁহারা প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট হেইস্ সাহেবকে এই বিষয়ে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আউটরাম এই সময় কলিকাতা আসিয়াছিলেন—সুচতুর হেইস্ নবাবের কর্ম্মচারীদের মনে যাহাতে কোন প্রকার বিরুদ্ধ সন্দেহ উপস্থিত না হয় এই জন্য বলিলেন—নেপাল-রাজসৈন্যগণ ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে বাধা দিবার নিমিত্ত এই সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করা হইতেছে।" স্তোকবাক্যে এইরূপে তাঁহাদের বুঝান হইল বটে কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। হেইস্ আবার ইহার উপর আর একটু কারিকুরী করিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত নবাবের সখ্যতা যে এখনও অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে অবস্থিত ইহা জানাইবার জন্য তিনি "পশুপক্ষীয় লড়াই" দেখিবার জন্য নবাবের নিকট এক প্রস্তাব করিলেন। সরল বুদ্ধি নবাব এই সময়ে প্রকৃত কথা না বুঝিতে পারিয়া মহাসমারোহের সহিত এই প্রকার আমোদে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহার পরেই নবাবকে এই সমস্ত ক্রীড়া কৌতুকের জন্য বিলাসী ও কাণ্ডজ্ঞান বিহীন বলিয়া কোম্পানী বিশেষরূপ অনুযোগ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে আউটরাম আসিয়া অযোধ্যায় পৌঁছিলেন। প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া রাখা এখন অনাবশ্যক ভাবিয়া তিনি কঠোর ভবিষ্যতের যবনিকা উন্মোচন করিতে বাসনা করিলেন। রেসিডেন্সিতে বাদসাহ ওয়াজিদ্ আলীর প্রধান মন্ত্রী নবাব আলিনকী খাঁকে ডাকিয়া পাঠান হইল। নবাব আলিনকী আসিয়া রেসিডেণ্টের মুখে যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার মস্তক বজ্রাহত হইল। আউটরাম বলিলেন "বাদসাহের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সমস্ত পূর্ব্ব সন্ধি তাঁহার কার্য্য গুণে লোপ পাইয়াছে—সেই সমস্ত সন্ধির পরিবর্ত্তে একটী নূতন সন্ধি স্বাক্ষরিত করিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল আমার নিকট

পাঠাইয়াছেন। এই সন্ধির মর্ম্ম এই—"বাদসাহ রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিবেন। রাজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা কিছু বন্দোবস্ত আবশ্যক কোম্পানী কর্ম্মচারী নিয়োগে তাহা সম্পন্ন করিবেন এবং বাদসাহ কেবল তাঁহার রাজোপাধি ও বাৎসরিক ১৫ লক্ষ টাকা পেন্সনে অধিকারী থাকিবেন। লক্ষ্ণৌএর রাজপ্রাসাদের মধ্যে তাঁহার সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে।" আলিনকি এই কথা শুনিয়া বিশেষ মর্ম্মপীড়িত হইলেন—তিনি বিনয়বচনে আউটরামকে বুঝাইলেন—"দেখুন বর্ত্তমান বাদসাহ ইংরাজের কতদূর বাধ্য। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তিনি কখনও তাহাতে অমত করেন নাই। রাজ্যের অবস্থা উন্নত করিতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।" কিন্তু মন্ত্রীর এ সমস্ত যুক্তি রেসিডেণ্টের মনে স্থান পাইল না। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আপনার প্রভুকে গিয়া এই কথা বলিবেন। এবং সন্ধিপত্রের এই নকলখানি লইয়া যান। নিশ্চয় জানিবেন—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মত এ সম্বন্ধে অবিচলিত।"

হতভাগ্য বাদসাহ ওয়াজিদ আলির কর্ণে পরিশেষে এই কথা গেল। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—বাদসাহ বিনয় বচনে এক যুক্তিযুক্ত পত্র লিখিয়া রেসিডেণ্টকে বলিলেন, তাঁহাকে আর একবার শেষ সময় দেওয়া হউক। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করে কে? রেসিডেণ্ট বাদসাহকে তিন দিনের জন্য বিবেচনা করিবার সময় দিলেন।

হতভাগ্য ওয়াজিদ আলি অদৃষ্ট লিপি নিতান্ত অখণ্ডনীয় দেখিয়া—সকল বিষয়েই নিশ্চেষ্ট হইলেন। তিনি এই সময়ে তাঁহার নিজ অধীনস্থ ও তালুকদারদের সমগ্র সেনাদল লইয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই এবং না করিয়া বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ বরঞ্চ এই সময়ে সাহায্য করিবার জন্য যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়াছিল, তালুকদারেরাও তাঁহাদের সমস্ত সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে ইহাদের উত্তেজনার দ্বারা কেবল অনর্থক নরহত্যা হইয়া লক্ষ্ণৌ-বক্ষ নরশোণিতে প্লাবিত হয়, এই ভাবিয়া বাদসাহ ওয়াজিদ আলি তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে "অস্ত্রহীন" হইতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি মনে মনে বুঝিয়াছিলেন অযোধ্যা ইংরাজের গ্রাস হইতে মুক্ত করা নিতান্ত অসম্ভব। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও কোম্পানীর প্রতিকূলতাচরণ করা যে একই তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই এই পন্থা অবলম্বন করিলেন।

তিন দিন কাটিয়া গেল, চতুর্থ দিবসে জেনেরেল আউটরাম দৃঢ়তায় মন বাঁধিয়া তাঁহার সহকারী কাপ্তেন হেইস্ ও ওয়েষ্টনকে সঙ্গে লইয়া "জরদকুটী" রাজপ্রাসাদে অযোধ্যা সম্বন্ধে তাঁহার শেষ দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিতে গেলেন। রেসিডেণ্ট তোরণ দ্বারে প্রবৃষ্ট হইলেন—তাঁহার শরীর রক্ষার জন্য কয়েকজন সিপাহী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল। পূর্ব্বে এই স্থানে প্রবেশ করিলে পদাতিকেরা অস্ত্র তুলিয়া রেসিডেণ্টকে সম্মান করিত। আজ তাহারা প্রভুর আজ্ঞায় অস্ত্রহীন, সৈনিক নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য

কেবল মাত্র সামান্য যষ্টি সহায় করিয়াছে। প্রাসাদের চারিদিকে আগে জনকোলাহলের আনন্দোচ্ছাসে কর্ণপাত করা যাইত না। এখন তাহা গভীর অরণ্যাণীর ন্যায় শব্দ বিহীন হইয়াছে শ্মশানময়ী ভাব ধারণ করিয়াছে। গোলন্দাজ কামান ছাড়িয়া গিয়াছে—অশ্বারোহী হাতিয়ারও অশ্ব ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, যে সকল সৈন্য প্রাসাদের চারিদিকে পাহারা দিতেছে তাহারাও সম্পূর্ণ অস্ত্রহীন। এই সকল দেখিতে দেখিতে রেসিডেণ্ট প্রাসাদের মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

সেই অমরাবতী বিনিন্দিত প্রকাণ্ড প্রাসাদের একটী সুসজ্জিত নির্জ্জন কক্ষে বাদসাহ ওয়াজিদ আলি বসিয়া। নবাবের দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতা সেকন্দর হোসমত বাহাদুর; বামপার্শ্বে প্রধান সচিব আলিনকী, রাজস্ব সচিব রাজা বাল-কিষণ, রেসিডেন্সি উকীল মসীহুদ্দৌলা। বাদসাহ রেসিডেণ্টকে দেখিয়া মর্ম্ম যন্ত্রনায় প্রপীড়িত হইলেন—রেসিডেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি আপনাদের কি করিয়াছি যে এই প্রকার দণ্ড বিধান হইল।" আউটরাম উত্তর দিলেন না—ডালহৌসীর স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র বাদসাহকে পড়িতে দিলেন—বাদসাহ আদ্যোপান্ত পড়িয়া যে উত্তর দিলেন তাহা অতিশয় হৃদয়-বিদারক কথায় পরিপূর্ণ—তাহা অতিশয় নৈরাশ্য-পীড়িত ভগ্ন হৃদয়ের কথা।' তিনি বলিলেন—সাহেব! সন্ধি ত সমাবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের জন্য। আমি যাহা ছিলাম এক্ষণে আর তাহা নাই—আমার সহিত "সন্ধির" প্রস্তাব করা এক্ষণে আমাকে বিদ্রূপ করা বই আর কিছু নয়। আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা শতাধিক বৎসর এই অযোধ্যা শাসন করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজের সংশ্রব হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা বরাবরই তাঁহাদের সহিত প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন—আমিও জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ বা বন্ধুতার কোন স্বত্ব লঙ্ঘন করি নাই। তত্রাচ আমার উপর এ কঠিন দণ্ড বিধান কেন? কোম্পানী যখনই হউকনা কেন ইচ্ছা করিলেই ত অযোধ্যা দখল করিতে পারিতেন।"

ইহার পর ধীরে ধীরে স্বীয় রত্নময় উষ্ণীষ খুলিয়া রেসিডেণ্টের হাতে দিলেন। বলিলেন "জীবন থাকিতে আমি এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করিব না। অযোধ্যা ছাড়িয়া পথের ভিখারি হইতে হয় তাহাও ভাল কিন্তু এই প্রকার অসম্মানকর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। আমি মহারাণীর নিকট মহাসভা পার্লামেণ্টের নিকট আমার নিজের দুঃখ জানাইব"—বাদসাহ নীরব হইলেন, রেসিডেণ্ট সাহেব সদলে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। বকতিয়ার খিলিজি দ্বাদশজন সৈনিক সহায়ে বাঙ্গলা জয় করিয়াছিলেন—ইংরাজের অযোধ্যা গ্রহণ করিতে তাহাও আবশ্যক হইল না। ইহার পর আউটরাম ঘোষণা প্রচার করিলেন—অযোধ্যা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়াছে ইত্যাদি।" এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সাদত খাঁর বংশ অযোধ্যার সিংহাসনের সমস্ত স্বত্বই হারাইলেন এবং তথায় মুসলমান পতাকার পরিবর্ত্তে সিংহ চিহ্নিত ব্রিটিশ পতাকা তর তর ভাবে উড়িতে লাগিল।

মার্চমাসের মাঝামাঝি বাদসাহ ওয়াজিদআলি চিরজন্মের মত লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিলেন। যে দিন তিনি রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন—সে দিন লক্ষ্ণৌবাসীর পক্ষে মহা অশুভ চিরস্মরণীয় দিন। সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত একজন ইংরাজের লেখা হইতে আমরা সেই দিনের ঘটনা এস্থলে তুলিয়া দিলাম। "ইংলণ্ডে যাইবার জন্য গতকল্য বাদসাহ ওয়াজিদ আলি এখান হইতে কলিকাতায় রওয়ানা হইয়াছেন। যে সময়ে নবাব রাজ প্রাসাদের তোরণ দিয়া বহির্গত হন সেই সময়ে আমি যে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা জীবনেও ভুলিব না। বাদসাহ উত্তর-তোরণ দিয়া গোপনে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন—কিন্তু যখন শুনিলেন তাঁহার প্রজারা তাঁহার নিকট শেষ বিদায় লইবার জন্য পূর্ব্ব দ্বারে সমাগত হইয়াছে সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্ব দ্বারের অসীম জনতার কথা আর কি বলিব? বৃদ্ধ, যুবা, বধির, অন্ধ, রোগী, বালক যে যেখানে ছিল সকলেই যেন সেই দিন নবাবের নিকট চির বিদায় লইতে আসিয়াছে। বাদসাহ গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া যখন দ্বারের নিকটস্থ হইলেন তখন তাঁহার পট্টমহিষী, বৃদ্ধামাতা, ও একমাত্র পুত্রের আবৃত শকট সেই স্থানে দেখা দিল। সেই সময়ে ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ মহার্ণবের ন্যায় সেই জনস্রোত ভয়ানক চঞ্চল হইয়া উঠিল। চারিদিক হই-তেই "বাদসা সেলামত্" "বাদসহত্ফের্ বন্নে রহে" "লণ্ডনসে হুকুম আওয়ে" ইত্যাদি ধ্বনি দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তোরণ দ্বারের উপর যবনিকার অন্তরালে বাদসাহের পরিচারিণী ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকাবর্গ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল। জনস্রোতের মধ্যে কেহবা কাঁদিতেছিল কেহবা কোম্পানীকে অভিসম্পাত করিতেছিল কেহবা ফিরিঙ্গির শির লইবার প্রস্তাব করিতেছিল।"

অযোধ্যা ত্যাগ করিলে ওয়াজিদ্ আলির অদৃষ্টে কি ঘটিল তাহা না জানেন এরূপ লোক খুব অল্পই আছেন।

ওয়াজিদ আলিসার সম্বন্ধে আমাদের এখনও বলিবার কথা অনেক থাকিলেও নানা কারণে এই স্থানেই বক্তব্য শেষ করিলাম। অযোধ্যার ইতিহাস সমগ্র "ইংরেজাধিকার ইতিহাসের" একটী প্রধান পরিচ্ছেদ। যতদিন ভারতে ব্রিটিশ্ পতাকা সতেজে উড়িতে থাকিবে ততদিন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী অযোধ্যার উপর যে ভীষণ নীতি-বিগর্হিত অত্যাচার করিয়াছেন তাহা কেহই ভুলিতে পারিবে না। সুখের বিষয় এই মহা-রাণীর হাতে রাজত্ব আসিয়া অবধি অযোধ্যা প্রদেশবাসীগণ ক্রমশঃ নবাব বংশের শোক ভুলিতেছে। মহারাণীর রাজত্বে অযোধ্যার সকল স্থলেই সুখ, স্বচ্ছন্দ ও শান্তি বিরাজ মান। ইহা দেখিয়া বোধ হয়, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী অযোধ্যার উপর যে সমস্ত অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে।

সমাপ্ত। শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

রেলের গাড়ীর একটি ঘটনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আফিস হইতে আসিয়া খুড়া মহাশয়ের এক টেলিগ্রাম পাইলাম; "শীঘ্র এলাহাবাদ ছাড়িয়া জব্বলপুরে এস।"

টেলিগ্রাফ পড়িয়া মনটা বড়ই উদ্বিগ্ন হইল, তৎক্ষণাৎ দু একখানি কাপড় ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই একটি দ্রব্য ব্যাগে পুরিয়া ষ্টেসনে যাত্রা করিলাম।

ষ্টেসনে আসিয়া টিকিট কিনিতে না কিনিতে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা দিল। একে মেল; তাহাতে আবার ঘোরতর জনতা, ছুটাছুটীর হুড়াহুড়ির ধূম,—আমি টিকিট হস্তে ছুটিয়া সম্মুখে যে একটী কামরা দেখিলাম তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া তাহার ভিতরে যেমন উঠিয়া পড়িলাম অমনি শেষ ঘণ্টা পড়িল, কর্ণ বিদারক কু কু শব্দে কুকি দিয়া, দীর্ঘায়ত বিকট-দর্শন এঞ্জিন মহাশয় মেঘকৃষ্ণ ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে—ষ্টেসন ছাড়িয়া পবন গতিতে ছুটিলেন।

গাড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম সে কামরার মধ্যে আর কোন সহযাত্রী নাই—কিন্তু প্রবেশ করিয়াই সে ভ্রম দূর হইল। তাড়াতাড়ির চোটে একখানি "স্ত্রী-লোকের গাড়িতে" উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। কাজটা অবশ্য অন্যায় হইয়াছিল কিন্তু তখন ত্রুটি শোধরাইবারও আর কোন উপায় নাই—কারণ গাড়ি তখন দ্রুতবেগে হুস্ হুস্ শব্দে মাঠের মধ্য দিয়া ছুটিতেছে।

স্ত্রীলোকের গাড়ি বলিয়া ইহা এক প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পরেই ব্রেকভান। কামরার মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া একটী আলো জ্বলিতেছে সেই আলোকে দেখিতে পাইলাম আমার সহযাত্রী দুইটীই স্ত্রীলোক, একটী বৃদ্ধা, বেশ ভূষায় দাসী বলিয়াই বোধ হইল, অপরটী কিশোরী, তাহার আপাদমস্তক একখানি মোটা চাদরে আবৃত তাহার ভিতর অর্দ্ধোন্মোচিত অবগুণ্ঠন। বৃদ্ধা গাড়ির এক কোণে মাথা দিয়া ঘুমাইতে-ছিল। যুবতীটী পা গুটাইয়া সংকুচিত ভাবে তাহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের পার্শ্বে দুইটী হাত বাক্স ও একটী কাপড়ের পুটুলী ছিল।

তন্দ্রার প্রাখর্য্য কমিয়া আসাতেই হউক্ বা সঙ্গিনীর ভীষণ যন্ত্রণা প্রদ অস্তর টিপনি-তেই হউক—বৃদ্ধা সহসা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিল। আর একজন লোক—বিশেষতঃ অপরিচিত পুরুষ স্ত্রীলোকের গাড়ীর ভিতর—কাজেই বুড়ী কর্কশ স্বরে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল "কেগা তুমি?"

আমি বলিলাম "তাড়াতাড়িতে বাছা এই গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছি কিছু মনে করিও না, আমি পরের ষ্টেসনেই নামিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিব"।

বুড়ী আমার কথায় বোধ করি খানিকটা আশ্বস্ত হইল—কেননা তখন নরম স্বরে বলিল "তুমি কতদূর যাইবে ? আমি বলিলাম "জব্বলপুর পর্য্যন্ত।" সে বলিল "আমরাও সেখানে যাইতেছি" বলিয়া আবার শুইবার উদ্যোগ করিল। এইরূপ দুই একটা কথা কহিয়াই আমার সম্বন্ধে বোধ করি তাহার সমস্ত ভয় দূর হইল। আমার আর কোন-রূপ প্রশ্ন শোভা পায় না আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

চুপ করিয়া বসিয়া কি করি—সঙ্গে যে ক্ষুদ্র সতরঞ্চ ও বালিস ছিল তাহা লইয়া বিছানা করিলাম, তাহার পর ব্যাগ হইতে একখানি পরদিনের "প্রভাতী" পাইয়োনীয়া বাহির করিয়া একটী চুরাট ধরাইয়া টানিতে টানিতে বিছানায় শুইয়া কাগজখানি পড়িতে লাগিলাম। আগের দিনের পায়োনিয়ারে একটি খুনের বিবরণ ছিল—ব্যাপার খানা এই,

"বাদসাহী মণ্ডীর ছটুলাল আগরওয়ালা অতি নির্দ্দয়রূপে তীক্ষ্ণধার ভুজালি দ্বারা তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। ছটুলাল ভাঙ্গ খাইয়া গৃহে আসিয়া ছল ধরিয়া তাহার স্ত্রীর সহিত বিবাদ আরম্ভ করে, যথেচ্ছা অশ্রাব্য গালি দিতে থাকে। স্ত্রীলোকটী এই সমস্ত অকারণ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে উঠিয়া যাইতেছিল—এমন সময়ে ছটুলাল উন্মত্তের ন্যায় তাহার মস্তকের পশ্চাৎ ভাগে সেই তীক্ষ্ণধার ভুজালির দ্বারা আঘাত করে। সেই আঘাতেই উৎস ধারায় রক্ত স্রোত বহিতে লাগিল, ও স্ত্রীলোকটী ভূমে পড়িয়া যাতনায় ছট্‌পট করিতে লাগিল—নৃশংস স্ত্রীহত্যাকারী চুপে চুপে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়াতে ধৃত হইয়া পুলিসে প্রেরিত হইল। তাহার স্ত্রী সেই সাংঘাতিক আঘাতে আধঘণ্টা পরেই মরিয়া যায়। বিচারে ছটুলালের কি হইল—এই প্রভাতী পায়োনিয়ারে তাহা থাকিবার কথা, তাহা জানিতে কুতূহল হইয়া আমি কাগজ খুঁজিতে লাগিলাম। পাতা উল্টাইয়াই দেখিতে পাইলাম—লেখা আছে Worderful escape of the murderer.

সেই হত্যাকারী কি তবে পলাইয়াছে ? হাঁ তাইত বটে। "এক সাক্ষীর জোবানবন্দীর পর ছটুলালের বিচার বন্ধ হইয়াছিল মাজিষ্ট্রেট তাহাকে হাজতে লইয়া যাইতে হুকুম দিয়াছিলেন। জেলের গাড়িতে অপরাধিকে তুলিয়া দিবার জন্য ৪ জন কনষ্টেবল হাতকড়ি দিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতেছিল কিন্তু দুরাত্মা সহসা—বলপ্রয়োগে হস্তের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দুই জন কনষ্টেবলকে পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। দুই জন কনষ্টেবল ও অন্যেরা তাহার পিছু পিছু ছুটিল কিন্তু সেই নর-পিশাচ সহসা এক চোরা গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া এমন স্থলে লুকাইল—যে পুলিসে সেই গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়াও তাহার সন্ধান পায় নাই। এই অপরাধীকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সহস্র টাকা পারিতোষিক দিবেন ঘোষণা করিয়াছেন।"

ঘটনাটী পড়িয়া মনে বড় বিস্ময় জন্মিল। কি আশ্চর্য্য! চারিজন ডালরুটী ভোজী

ষণ্ডা পুলিশ কনষ্টেবল, সুদৃঢ় হাতকড়ি, অসংখ্য জন স্রোত, সকলকে ফাঁকি দিয়া দুরাত্মা পলায়ন করিল—ইংরাজের পুলিস এত হুঁসিয়ার এত সুদক্ষ তথাপি ইহাকে ধরিতে পারিল না! কেবল এই কথাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাবেশ হইল, কাগজখানি আপনাআপনি হস্তের শিথিলতা পাইয়া গাড়ির মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম—স্মরণ নাই—কিন্তু এই স্বল্পস্থায়ী তন্দ্রার মধ্যে এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। বোধ হইল—যেন সেই রক্তাক্ত শাণিত ভুজালি হস্তে, দুরাত্মা ছুটুলাল আসিয়া আমার শিয়রে দাঁড়াইয়াছে—তাহার কেশ অতিরুক্ষ, চক্ষুদ্বয় ঘোরতর রক্তবর্ণ—রক্ত যেন ফাটিয়া পড়িতেছে—মুখে ভয়ানক ভ্রুকুটী, জানি না কি কারণে সেই তীক্ষ্ণধার ভুজালি তুলিয়া সে আমার স্কন্ধে আঘাত করিল, তাহার সে আঘাত যেন ব্যর্থ হইল—ইহাতে যেন তাহার ক্রোধ আরও বাড়িল সে যেন সহসা হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিল "এইবার!"

তাহার সে ভীষণ চীৎকারে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল—আমি বিকলাঙ্গ হইয়া মূর্চ্ছিত হইবার মত হইলাম—কিন্তু তখনই যেন দেখিতে পাইলাম এক আলুথালুঁভাবগ্রস্তা রমণীমূর্ত্তি করুণা-উচ্ছসিত নয়নে দৌড়িয়া আসিয়া সেই নৃশংসের হাত ধরিয়া ফেলিল, তাহার স্পর্শে যেন দুরাত্মা নরহন্তা মৃতপ্রায় হইল। শুনিলাম সেই দেবী প্রতিমা যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "বড় বিপদ শীঘ্র পলাও এ যাত্রা বড় বাঁচিলে" সে মুখ যেন চেনা চেনা তথাপি যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না—এমন সময়ে সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল—বস্তুতই দেখিলাম—সেই স্বপ্ন দৃষ্টা রমণী আমার কাছে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে অঙ্গুলি বিস্তার করিলেন। তবে কি ইহা স্বপ্ন নয়—তবে সত্য সত্যই আমি দুরাত্মার কবলে পড়িয়াছিলাম! ভাল করিয়া চোক রগড়াইয়া সন্দেহ ঘুচাইলাম—না এ. স্বপ্ন নয় সত্য সত্যই এক রূপবতী কিশোরী আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আমি কথা কহিতে যাইতেছিলাম—সেই রমণী ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি টিপিয়া আমায় নিষেধ করিলেন। আমার দৃষ্টি সহসা তাঁহার মুখের উপর পড়িল সেই বিদ্যুল্লতা তুল্য প্রফুল্ল মূর্ত্তিতে ভয়-চকিত ভাব দেখিয়া মনে বড়ই বিস্ময় জন্মিল। তখনও আমার চোখ্ হইতে ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ যায় নাই—মন হইতে সেই ভয়ানক স্বপ্নস্মৃতি একবারে লোপ হয় নাই—আমি নিজে জাগ্রত কি নিদ্রিত ভাল করিয়া দেখিবার জন্য পুনরায় চোকদুটী খুব রগড়াইলাম। না এত স্বপ্ন নয়! ইনি আমার সেই সহযাত্রী কিশোরী?

আমি সাহস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনি কি চান" কথাটা অবশ্য যথাসম্ভব মৃদুস্বরে হইল—উৎকণ্ঠা, অকারণ সন্দেহ, অত্যধিক বিস্ময় নিবন্ধন আমার তখন ভালরূপ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে জড়িত হইয়া পড়িতেছিল।

সুন্দরী এই কথার উত্তর না দিয়া ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন—আমি তাহাতে বুঝিলাম, তিনি আরো আস্তে কথা কহিতে বলিতেছেন—তাইত ব্যাপারটা কি? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি হতভম্বা হইয়া গেলাম। কিশোরী আমার হাতে একখানি ক্ষুদ্র কাগজ দিলেন—সেই অস্ফূট আলোকে পড়িয়া দেখিলাম তাহাতে লেখা আছে "খুব সাবধানে খুব আস্তে কথা কহিবেন—আমার বেঞ্চের নীচে কোন দুষ্ট লোক লুকাইয়া রহিয়াছে, কি অভিপ্রায় তা জানিনা, আমি নীচে পা রাখিতে গিয়াছিলাম—দুইবার তাহার হাত মাড়াইয়া ধরিয়াছি।"

বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় হইল—উৎকণ্ঠার উপর আরও উৎকণ্ঠা বাড়িল। রেলের গাড়ীতে এ প্রকার গোপন ভাবে লুক্কায়িত কে? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? একি তবে চোর? না—আমরা জাগিয়া থাকিতে চুরী হওয়া অসম্ভব্ এবং চুরি করিয়া চোর পলাইবেই বা কোথা? তবে কি কোন দুষ্ট লোক এই অসহায়া রমণীর উপর অত্যাচার করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে এ প্রকার লুক্কায়িত ভাবে আছে? আবার ভাবিলাম—এ ব্যক্তি ত রাজদণ্ডে দণ্ডিত, কারাবাসী নয়? হয়ত তাহাই হইতে পারে—গোপনে গবর্ণমেণ্টের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করিতেছে। আমার মনে ছটুলালের পলায়নের কথা এই সময়ে সহসা উদিত হইল—ভাবিলাম, এত সেই স্ত্রীহত্যাকারী পলায়িত খুনী ছটুলাল নয়?

এই কথা মনে হইবা মাত্র আমি উঠিয়া তাড়াতাড়ি একটি দেশলাই জ্বালাইয়া বেঞ্চের নিম্নে ধরিলাম—যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, শরীর রোমাঞ্চ হইতে লাগিল—মুখ শুখাইয়া গেল, কি সর্ব্বনাশ! সেই অপ্রশস্ত স্থান অধিকার করিয়া গুড়ি মাড়িয়া একটী যম দূতাকৃতি লোক বসিয়া রহিয়াছে তাহার চক্ষু দিয়া যেন আগুন জ্বলিতেছে, সেই বিকৃত মুখমণ্ডলে ভ্রুকুটি নাচিতেছে—কপালের শিরা বাহির হইয়াছে—সমস্ত মুখের চারিদিক দিয়া স্বেদ-জল গড়াইতেছে! ওঃ এ ভয়ানক মূর্ত্তি কি মানুষের সম্ভবে! আমার মনে স্বপ্নের কথা—ছটুলাল আগরওয়ালার খুন ও পলায়নের কথা আদ্যোপান্ত ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ সহসা বলিয়া উঠিলাম "এ নিশ্চয়ই সেই পলাতক খুনী ছটুলাল!! কি সর্ব্বনাশ! যাহা ভাবিয়াছিলাম তাই! যেখানে ব্যাঘ্র ভয় সেইখানে সন্ধ্যা!! আমার মুখের কথা শেষ না হইতে হইতেই উন্মত্ত ব্যাঘ্রবৎ হুঙ্কার দিয়া ভীষণাকৃতি, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায় দীর্ঘকায়বিশিষ্ট সেই দুরাত্মা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। আমার সহযাত্রী রমণী

সেই ভীষণ হুঙ্কার শব্দ শুনিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন বৃদ্ধাও সেই শব্দে জাগিয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গিনীর পরিণাম প্রাপ্ত হইল। যুবতীর চেতনা সম্পাদন অপেক্ষা দুরাত্মাকে ধরাশায়ী করিয়া আত্মরক্ষার কথা আগে আমার মনে জাগিয়া উঠিল। আমি জগদীশ্বরের নামে শতগুণ বলসঞ্চয় করিয়া একবারে সেই দুরাত্মার উপর পড়িয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিলাম, ইহার পর কি হইল তাহা বলিতে পারি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চেতনা হইলে যখন ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলাম তখন দেখি এক সুপ্রশস্ত কক্ষ মধ্যে একটী সুসজ্জিত পালঙ্কে আমি শুইয়া রহিয়াছি, আমার পাশে বসিয়া একজন গম্ভীর মূর্ত্তি ইউরোপীয় রমণী, ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছেন। তাঁহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া সেই লজ্জাবনতমুখী আয়তলোচনা অতুলনীয় রূপ সম্পন্না আমার সেই সহযাত্রী রমণী। আমি জাগিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে এত বেদনা যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেও আমার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আমাকে জাগিতে দেখিয়া ইংরাজ রমণী ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় কেমন বোধ করিতেছেন।"

আমি উত্তর দিতে যাইতেছি—এমন সময় এক সৌম্যমূর্ত্তি ইংরাজ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সাহেব গৃহ প্রবেশ করিয়াই সেই প্রশ্ন করিলেন। জাগিয়াই আমার গাড়ীর ঘটনা মনে পড়িল। বুঝিলাম ইহাঁদের যত্নে এখানে আনীত হইয়া রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি তাঁহাদের এই সদাশয়তা ও করুণার জন্য অশ্রু পূর্ণ নয়নে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কি প্রকারে এখানে আসিলাম তাহা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি সে কথার কিছু উত্তর না দিয়া হাসিয়া পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে পড়িতে দিলেন। কাগজখানি পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলাম—বলিলাম "মহাশয় আমিত ইহার কিছু মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিতেছি না"।

তিনি বলিলেন "কেন বুঝিবার গোল কিসে"?

আমি। "আমি ঐ পুরস্কার পাইতে কি প্রকারে উপযুক্ত? আমি কি তাহাকে ধরিয়াছি?"

সা। "তুমি ধর নাই ত কে ধরিল? সরকারে রিপোর্ট গিয়াছে তোমা দ্বারা এই কাজ হইয়াছে, আর ঘটনাও ত তাই! আমি যে নিজে সাক্ষী?"

আ। "রিপোর্ট করাইল কে?"

সা। "আমি নিজে"

আ। "এ কার্য্যে যখন আপনার হাত আছে তখন আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। কিন্তু এ পুরস্কার আমায় দেওয়ানয় লাভ কি?"

সা। "লাভ সদ্গুণের ও কৃতকার্য্যতার পুরস্কার। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন রাজার

কর্ত্তব্য। এ কার্য্যে যে সহায়তা করে রাজা তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। অপরাধী হাত ছিনিয়া পালানয় পুলিসের বড়ই অপযশ হইয়াছে--কিন্তু তোমার দ্বারা তাহাদের মুখরক্ষা।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম—

সাহেব বলিলেন "চুপ করিলে যে" ?

আ। "ঘটনাটা বড় ভাল বুঝিতে পারিতেছি না—অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত খুলিয়া বলুন"

সা। গত পরশু তুমি যে কামরায় আসিতেছিলে—রেলগাড়ীর সেই কামরায় বেঞ্চের নীচে একজন খুনী এলাহাবাদ হইতে পলাইতেছিল জান ?

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ তাহাকে আমি ধরিয়াছিলাম, মনে আছে, কিন্তু তাহার. পর কি হইল জানি না।

সা। "তার পর কি ঘটিয়াছিল আমি বলিতেছি ? তোমার গাড়ীতে আর দুটি স্ত্রীলোক ছিল বোধ হয় মনে আছে ? তাঁদের মুখ থেকেই আমি পূর্ব্বের সমস্ত ঘটনা শুনেছি। ছটুলালের সহিত ভূপতিত হয়ে তোমারও সংজ্ঞা লোপ হয়েছিল—বোধ হয় এর ৪।৫ মিনিট পরে গাড়ী ষ্টেসনে লাগে। আমি তোমাদের পরের গাড়ীর শেষের কামরায় ছিলাম সহসা তোমাদের গাড়ীর ভিতর হইতে অব্যক্ত, কঠোর গোঁয়ানি শব্দ আমার কাণে যাওয়াতে কোন আরোহীর বিপদ উপস্থিত ভাবিয়া—আমি তাড়াতাড়ি তোমাদের কামরার দ্বার খুলিয়া ফেলিলাম। যাহা দেখিলাম সে দৃশ্য অতি ভয়ানক! দুইটী স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত,—তুমি সজোরে সেই দুর্ব্বৃত্তের গলা টিপিয়া ধরাতে বোধ হয় সে গোঁ গোঁ করিয়াছিল,—আমি পুলিশ পুলিশ বলিয়া ডাকিবা মাত্রই সসজ্জ পুলিশ সেই অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত দুরাত্মাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল। তার পর শুশ্রূষা দ্বারা স্ত্রীলোক দুটী ও তোমাকে ডুলী দ্বারা এই বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। যাহা হউক পরমেশ্বরের কৃপায় তুমি ত সুস্থ হইয়াছ—এখন এই কাগজখানিতে সহী করিয়া দাও—আমি আফিসে পাঠাইয়া দিই।"

আমি সাহেবকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার দয়ার জন্য শত শত ধন্যবাদ দিলাম। আমার সহীযুক্ত কাগজখানি লইয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন। যাবার সময় বলিয়া গেলেন "কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আবার সাক্ষাৎ করিব।"

সাহেব চলিয়া যাইবার প্রায় পনর মিনিট পরে একজন হিন্দুস্থানী যুবক ডাক্তার লইয়া আমার কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার নাম নারায়ণ। শুনিলাম এই বাড়ী তাঁহারই। তাঁহার কাছে সেই ইংরাজ ও ইংরাজ রমণীর পরিচয়ও অবগত হইলাম। ইংরাজটি ডিটেকটিভ বিভাগের বড় সাহেব রমণী তাহার ভগিনী।

আমি এই হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের অমায়িকতায় অতিশয় মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু আর একটী

বিষয় জানিতে আমার সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহল হইতেছিল সুতরাং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যে রমণী আমার সহিত এক গাড়িতে আসিয়াছিলেন তিনি এক্ষণে কোথায়? এখানে বলা আবশ্যক সাহেব আসিবার কিছু পরেই ইংরাজ রমণীর সঙ্গে তিনি আমার কক্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। একথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার যে কেন এত লজ্জা হইতেছিল তা বলিতে পারি না। নারায়ণজী বলিলেন—"তিনি ও তাঁহার দাসী উপর তালায় আমার পরিবারবর্গের নিকট আছেন।"

একথার পর নারায়ণজী শীতলপ্রসাদ আমার আহারের উদ্যোগ করিতে অন্তঃপুরে গেলেন। আমি তাঁহার ন্যায় মধুর প্রকৃতি উদার স্বভাব, হিন্দুস্থানী অতি অল্পই দেখিয়াছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

খুল্লতাত মহাশয়ের টেলিগ্রাফ পাইয়া যে আমি জব্বলপুরে যাইতেছিলাম ইহা বোধ হয় আপনাদের মনে আছে। পথিমধ্যে এই অসম্ভাবিত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া দুই দিন দেরী হইয়া গেল—এজন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলাম। অবশেষে আমাকে জব্বলপুর যাইতে একান্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সাহেব বলিলেন—"বাবু! এই দুইটী স্ত্রীলোকও (যাহারা আমার সহিত এলাহাবাদের ডাক গাড়ীতে আসিয়াছিলেন) জব্বলপুরে যাইবেন তুমি ইহাদের সঙ্গে লইয়া ঠিকানায় পৌছিয়া দিও।"

আমি সাহেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার ও নারায়ণ জীর নিকট বিদায় লইয়া জব্বলপুরে যাত্রা করিলাম এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

জব্বলপুরে পৌছিয়াই আমি আমার সহযাত্রী রমণীকে, তাঁহার বাটীতে পৌছিয়া দিলাম।

রাজলক্ষ্মীর পিতার পীড়া সাংঘাতিক কিন্তু এক্ষণে একটু ভাল আছেন (আমার সহযাত্রী কিশোরীর নাম রাজলক্ষ্মী) সুচিকিৎসার গুণে বিশেষত স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল হইয়াছেন। বৃদ্ধার মুখে আমার পরিচয় পাইয়া তিনি আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। রাজলক্ষ্মীর মাতা তাঁহার ভাইকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন আমাকে সেই দিন তাঁহাদের বাটীতে থাকিতে হইবে। আমি তাঁহার অনুগ্রহে, আত্মীয়তায় বড় আপ্যায়িত হইলাম—কিন্তু যে কার্য্যবশতঃ জব্বলপুরে আসা হইয়াছে তাহা কতদূর জরুরি খুলিয়া বলাতে তাঁহারা আমাকে পর দিন তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে প্রতিশ্রুত করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন।

আমি আসিয়া খুল্লতাত মহাশয়ের চরণ বন্দনা করিলাম। তাঁহাকে নীরোগ শরীর দেখিয়া আরও আহ্লাদিত হইলাম। পথিমধ্যে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাও খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে গোপনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া গুটি কতক কথা বলিলেন। কি

বলিলেন তাহা আর আপনাদের শুনিয়া কাজ নাই এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে জন্য তিনি পূর্ব্বোক্ত জরুরি টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন আমি নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হওয়াতেও তাহা সুশৃঙ্খলে সমাধা হইয়া গিয়াছে।

পর দিন বৈকালে আমি রাজলক্ষ্মীদের বাটীতে প্রতিজ্ঞা মত উপস্থিত হইলাম। অন্তঃপুরে সংবাদ পৌছিবামাত্রই গৃহিণী তাঁহার ভাইকে পাঠাইয়া আমায় উপরে লইয়া গেলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম রোগীর অবস্থা বড় ভাল নয়। রোগটা পাঁচ রকমের, তাহার যন্ত্রণা কিছু অধিক। গৃহিণী অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া পতির পদসেবা করিতেছেন—দাসী নিকটে বসিয়া ব্যজন করিতেছে, রাজলক্ষ্মীকে সে ঘরে দেখিতে পাইলাম না—বোধ হয় কার্য্যান্তরে ব্যস্ত আছে।

কর্ত্তা গৃহিণী আমাকে সস্নেহ সম্ভাষণে বলিলেন "এস বাবা এস"। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রুগ্নশয্যার এক পার্শ্বে বসিলাম।

কর্ত্তা গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমার রাজু কোথায়"

গৃহিণী ডাকিলেন—"রাজলক্ষ্মী একবার এদিকে আয় ত মা।"

রাজলক্ষ্মী গৃহে প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মী বস্তুতই লক্ষ্মী-প্রতিমা, রমণীরত্ন, অতুল সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার। গৃহ প্রবেশ করিয়াই আমাকে দেখিয়াই তিনি সংকুচিত ভাবে ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিলেন তাহার মুখমণ্ডল ঘোরতর লজ্জারক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।

রাজলক্ষ্মী ধীরে ধীরে পিতার শয্যা পার্শ্বে আসিয়া বসিলে—বৃদ্ধ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন—তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহিনী পতিকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া গৃহান্তরে গেলেন। বৃদ্ধ আমাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন "বাবা কাছে একটু সরিয়া বস গুটীকত কথা বলিব—"

আমি তাঁহার আরও নিকটস্থ হইলাম—বৃদ্ধ বলিলেন—রামমোহনের নিকট (তাঁহার শ্যালক) আমি তোমার সব পরিচয়ই পাইয়াছি—অতি মহৎ বংশে তোমার জন্ম, অতি মধুর তোমার প্রকৃতি, তোমার কাছে আমি নানা কারণে বড়ই কৃতজ্ঞ, এক্ষণে তুমিই এ বিদেশে আমার পরম বন্ধু, আমার এই শেষাবস্থা, এই ভয়ানক রোগের হাত থেকে যে অব্যাহতি পাই এরূপ আশা আমার নাই—মনের কথা তোমাকেই বলিব স্থির করিয়াছি"

আমি বলিলাম "স্বচ্ছন্দে বলুন, আমাকে পুত্রস্থানীয় ভাবিবেন, কোন বিষয়েই সঙ্কোচ করিবেন না—"

পিতা। "চিরজীবি হও বাবা! আহাঃ এমন সৎছেলে এ কলিতে আর হয় না—তোমার কাছে কিছুই গোপন করিব না—আমারত এই অবস্থা দেখিতেছ—ইহার উপর আবার কন্যাদায়! এতচেষ্টা করিয়াও রাজুর আমার উপযুক্ত পাত্র পাইলাম না!

আমি সোৎসুকে বলিলাম—রাজলক্ষ্মী কি তবে অবিবাহিতা? এত দিন বিবাহ না হইবার কারণ কি?

পি। কারণ কি? কারণ অনেক—প্রথমতঃ আমার এই প্রকার শারীরিক অবস্থা, দ্বিতীয়তঃ কুলীন কন্যা, তৃতীয়তঃ সুপাত্রের অভাব, চতুর্থতঃ বিদেশ বিভূঁই স্বদেশে গিয়া চেষ্টা না করিলে মনোনীত পাত্র পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু রাজলক্ষ্মী বয়স্থা হইয়া পড়িয়াছে আর বিবাহ না দিলেও চলে না"।

আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল আমি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন—"বিষয় বিভবাদি যাহা কিছু করিয়াছি রাজলক্ষ্মীই তার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, রাজলক্ষ্মীই আমার একমাত্র কন্যা। বৎস তুমি আমার পুত্র হও এই আমার ভিক্ষা।"

সে গৃহের মধ্যে যদি সহসা বজ্র পতন হইত তাহা হইলেও আমি অত চমকিত হইতাম না—যদি সেই মুহূর্ত্তে আমায় কেহ রাজ্যেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিত—তাহাতেও আমি অত আহ্লাদিত হইতাম না। যদি তারকা সহিত চন্দ্রমণ্ডলের সমস্ত স্নিগ্ধরশ্মি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিত তাহা হইলেও অন্ধকারময় হৃদয়ের অন্তস্থল অতদুর আলোকিত হইত না। আমি জানিতাম রত্ন অনুসন্ধানেই লোকে সাগরে জীবন বিসর্জ্জন করে—সাগর হইতে রত্ন উঠিয়া কখনও কাহারও কণ্ঠ লগ্ন হয় না।

বৃদ্ধ আমায় চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন "বাবা চুপ করিয়া রহিলে যে! আমার এই রুগ্ন শয্যা স্পর্শ করিয়া শপথকর আমার রাজলক্ষ্মীকে তুমি অঙ্কলক্ষ্মী করিবে"।

... ...

ইহার এক বৎসর পরে একদিন আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে—মনোহর শারদীয়া যামিনী স্নিগ্ধ রশ্মিময়—চন্দ্রমা নীরবে শ্বেতমেঘরাশি মধ্যে বিচরণ করিতেছে। শুভ্র মেঘগুলি সেই রজতমণ্ডিত কিরণে স্নাত ও পরিসিক্ত হইয়া আরও শুভ্রতর দেখাইতেছে, নিকটে যমুনা কল কল শব্দে প্রবাহিত হইয়া আপন মনে সঙ্গমাভিমুখে ছুটিয়াছে—সেই ঘন কৃষ্ণ উর্ম্মি সংক্ষুব্ধ যমুনা-বক্ষে আকাশের চাঁদের বড়ই মধুর, বড়ই চঞ্চল প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

এই অনন্ত প্রবাহময়ী যমুনাতীরে একখানি মনোহর দ্বিতল অট্টালিকার চারিদিকে মনোহর উদ্যান, সেই উদ্যান মধ্যে পালিত উদ্যানলতা মনোহর চন্দ্র করে বিশ্রাম করিতেছে—নীরবে বৃক্ষ পত্র সকল সে কিরণে প্রতিঘাত করিতেছে। লতা মধ্যে শ্বেত কুসুম দল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মনোহর সুগন্ধে চারিদিক পরিব্যাপ্ত আর ঐ সুধাধবল অট্টালিকার ছাদের উপর বসিয়া একটী অতুল শোভাময়ী রমণী

মূর্ত্তি—অবেণী সংবদ্ধ ভ্রমর কৃষ্ণ কেশরাশি আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে, বাতাস সেই অলকাগুলি লইয়া খেলা করিতেছে, চন্দ্র রশ্মি সেই ঘনকৃষ্ণ অলকার অন্ত-রালে লুকোচুরী খেলিয়া—সেই চাঁদমুখে আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ রমণী রত্ন কে? আজ্ আমার রাজলক্ষ্মী।

পরিবর্ত্তন-শীল তারকা*।

তারকাগণ ঔজ্জল্যে যে কেবল মাত্র শ্রেণীগত ভিন্ন—অর্থাৎ পরস্পরের সম্বন্ধে মাত্র বিসদৃশ—এমনই নহে, ইহা ছাড়া আবার কতকগুলি বিশেষ তারকার স্বকীয় জ্যোতিও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যে সকল তারকার জ্যোতি আস্তে আস্তে নিয়মিত ভাবে এবং একটি বিশেষ মাত্রার মধ্যে পরিবর্ত্তিত হয় তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন শীল তারকা কহে। সাধারণতঃ উল্লিখিত রূপেই তারাদিগের জ্যোতির পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু কোন কোন স্থলে জ্যোতির হ্রাস বৃদ্ধি নিতান্তই সহসা হয়—এবং কোন কোন স্থলে এই পরিবর্ত্তনের মাত্রাও অজ্ঞাত। সেই জন্যই আর কি মাঝে মাঝে নূতন নক্ষত্র, হারাণ নক্ষত্র, ক্ষণস্থায়ী নক্ষত্র প্রভৃতি হঠাৎ আবিভূত নক্ষত্রের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। জ্যোতির্ব্বিদদিগের মতে, নিয়মিত পরিবর্ত্তনশীল এবং উক্তরূপ সহসা পরিবর্ত্তনশাল নক্ষত্রদিগের জ্যোতি-পরিবর্ত্তন-ঘটনাগুলির রূপ একই, পার্থক্যের মধ্যে উভয় ঘটনার মধ্যে জ্যোতির মাত্রাগত পার্থক্য মাত্র বিদ্যমান।

তারকাগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উজ্জলতা প্রাপ্ত হয় কি না তাহা দেখিয়াই তাহাদের জ্যোতির পরিবর্ত্তন নির্ণীত হইয়া থাকে, আর এইরূপে যে শ্রেণীতে পৌছিলে তাহাদের পরিবর্ত্তন শেষ হয়—সেই চূড়ান্ত শ্রেণী ধরিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তনের মাত্রা স্থির করা হয়। একবার চূড়ান্ত উজ্জ্বল হইয়া আবার সেইরূপ চূড়ান্ত ঔজ্জল্য প্রাপ্ত হইতে যে তারকার যে সময় লাগে—সেই সময়ই তাহার পরিবর্ত্তনকাল বলিয়া কথিত।

* গত মাঘ মাসের ভারতীতে তারকা রাশি নামক প্রবন্ধে ৫৭৬ পৃষ্ঠায় দুইটি ভুল হইয়া গিয়াছে।

(১) Hydra নক্ষত্র-পুঞ্জের ঙ-নক্ষত্রটির নাম অশ্লেষা। পুনর্ব্বসু নক্ষত্র মিথুন রাশিতে, অতএব Hydra স্থলে পুনর্ব্বসু না হইয়া অশ্লেষা হইবে।

(২) কন্যা রাশির অন্তর্গত হস্ত-নক্ষত্র Corvus নামক নক্ষত্র রাশিতে বর্ত্তমান, কিন্তু ভুলক্রমে Centaurus রাশির মধ্যস্থিত বলিয়া ছাপা হইয়াছে।

যাহা বলা হইল তাহা সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইবার জন্য নিম্নে কয়েকটি পরিবর্ত্তনশীল তারকার পরিবর্ত্তন কালাদি সন্নিবিষ্ট হইল।

নিম্নলিখিত তারকার	ঔজ্জ্বল্য পরিবর্ত্তন		পরিবর্ত্তন সময়।
	এই শ্রেণী হইতে	এই শ্রেণীতে	
আরগো রশির-ঢ ...	১ ...	৪	৪৬ বৎসর।
সিফিউস-রাশির-দ ...	৫ ...	১১	৭৩ বৎসর।
ক্যাসিওপি রাশির-দ	৬ ...	১৪ শের ও কিছু নিম্নে	৪৩৫ দিন।
সিটাস্ রাশির-ণ ...	১ কিম্বা ২ ...	১২ শের ও কিছু নিম্নে	৩৩১ দিন।
কর্কট রাশির-ধ ..	৮ ...	১০½	১০ দিন।
পারসিউস রাশির-খ	২½ ...	৪	২⅚ দিন।

উল্লিখিত তালিকাস্থ চতুর্থ তারকাটির অর্থাৎ সিটাস রাশির ণ-নক্ষত্রটির আর একটি নাম Mira বা the Marvellous অর্থাৎ 'আশ্চর্য্য'। ইহার পরিবর্ত্তন বড় আশ্চর্য্য-জনক বলিয়া ইহা উক্ত নামে অভিহিত। এইটি চরম ঔজ্জ্বল্যে পৌছিলে কখনো প্রথম শ্রেণীর কখনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পারসিউস-রাশির খ-তারকাটির জ্যোতি আরো আশ্চর্য্য রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার পরিবর্ত্তন কাল এত অল্প অথচ 'আশ্চর্য্য' তারকাটি স্বাভাবিক চক্ষে যেমন অদৃশ্য হয় ইহা কখনো তাহা হয় না। এই তারাটি দুই দিন সাড়ে তিন ঘণ্টা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়া হঠাৎ তাহার পর হইতে ম্লান-প্রভ হইতে আরম্ভ করে, এবং সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর একটি তারকায় পরিণত হয়। আবার তাহার পর ইহা উজ্জ্বল হইতে আরম্ভ করিয়া সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে চূড়ান্ত ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়, এইরূপে এই সমস্ত পরিবর্ত্তন তিন দিনেরও কম সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

যতগুলি নূতন বা ক্ষণ স্থায়ী তারকা দেখা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে ১৫৭২ এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত তারকা দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্বশালী। প্রথমটি সহসা আকাশে উদিত হইয়া ১৭ মাস ধরিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার জ্যোতি প্রথম প্রথম বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতির ন্যায় অত্যুজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ করিতে লাগিল। এমন কি তারাটির অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা বশতঃ দুই প্রহরেও তাহাকে সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইত। এখন আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ৯৪৫ এবং ১২৬৪ খৃষ্টাব্দে আকাশের ঠিক ঐ একই ভাগে (ক্যাশিওপি রাশিতে) এইরূপ তারকার আবির্ভাব হয়। ইহা হইতে কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ অনুমান করিলেন, সম্ভবতঃ উক্ত রাশির একটি

পরিবর্ত্তন-শীল তারকাই এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখা দিতেছে। উহার পরিবর্ত্তন কাল এত দীর্ঘ কালব্যাপী, যে একবার চূড়ান্ত উজ্জ্বল হইয়া আবার সেই অবস্থায় আসিতে উহার প্রায় ৩০০ শত বৎসর লাগে, কাজেই অল্প দিন মাত্র উহাকে দেখা যায়।

এই অনুমানটি ঠিক হইলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আবার উক্ত নক্ষত্রটির উদয় হইবার কথা। কিন্তু আমরা যতদূর জানি ঐ খৃষ্টাব্দ হইতে এখন পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের তারকাটি করোণা-বরিয়ালিস রাশিতে উদয় হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহাকে নবম শ্রেণীর তারকারূপে তালিকা-বদ্ধ করা হইয়াছিল, হঠাৎ উক্ত বৎসরের মে মাসে ইহা জ্বলিয়া উঠিল—এবং ১২ই মে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিতে লাগিল। আবার ১৪ই তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়া গেল এবং কিছু দিন ধরিয়া প্রতিদিন অর্দ্ধ শ্রেণী করিয়া নামিতে নামিতে মে মাসের শেষাশেষি হইতে আবার ইহার এই পরিবর্ত্তন দ্রুততার কিছু লাঘব হইয়া আসিল। জ্যোতির্ব্বিদগণের অনুমানে, এই তারকাটির বায়বাবরণে হঠাৎ হাইড্রোজন গ্যাস জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

তারকাদিগের এই জ্যোতি পরিবর্ত্তন জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের একটি গূঢ় রহস্য। পূর্ব্বে ইহার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ অনুমান করা হইত যে, তারকাগণ মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করিতে করিতে তাহাদের দেহের উজ্জ্বল অংশ যখন আমাদের দিকে ফিরায় তখন আমরা তাহাদিগকে প্রজ্জ্বলন্ত দেখি। তারকাদিগের দেহ সর্ব্বাংশে যে সমান উজ্জ্বল নহে এই অনুমানের উপর উল্লিখিত অনুমানটি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে ব্যালফুর-ষ্টুয়ার্ট সূর্য্য সম্বন্ধে (সূর্য্যও অবশ্য একটি পরিবর্ত্তন শীল তারকা। সকল সময় সূর্য্যের উজ্জ্বলতা আমাদের নিকট কিছু একই নহে) নানা রূপ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ বলেন "আমাদের সৌরজগৎ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ বলিতে পারি, কোন গ্রহ সূর্য্যের কাছাকাছি আসিলে সূর্য্যের বিশেষতঃ তাহার যে অংশ গ্রহের পাশাপাশি থাকে সেই অংশের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়।" ইহা হইতে জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন—যদি মনে করা যায় কোন তারকার একটি বৃহৎ গ্রহ তাহার অল্প দূরে থাকিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে—তাহা হইলে ব্যালফুর ষ্টুয়ার্টের পরীক্ষা অনুসারে তারকাটির যে অংশ গ্রহের নিকটবর্ত্তী তাহা তাহার দূরবর্ত্তী অংশ অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল হইবে, এবং গ্রহটিও যেমন ঘুরিতে থাকিবে দূরের দর্শকদিগের চক্ষে পরিবর্ত্তন প্রকাশিত করিয়া এই অবস্থাটিও সেইরূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকিবে।

এখন যদি মনে করা যায় এই গ্রহের কক্ষ গোলাকৃতি না হইয়া সুদীর্ঘ-ডিম্বাকৃতি, তাহা হইলে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া গ্রহটি তারকার নিকটবর্ত্তী হইবে না, অতি অল্পকাল মাত্র তাহার নিকটে থাকিবে। এরূপ অবস্থায় দর্শকেরা অধিক সময় অন্ধকার এবং অল্পকাল প্রখর আলোক দেখিতে পাইবে। প্রকৃত পক্ষে ক্ষণস্থায়ী তারকা সম্বন্ধে এই রূপই ঘটে।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

নিকট সম্পর্কে বিবাহ।

নিকট সম্পর্কে বিবাহ যে দোষাবহ তাঁহা আমাদের নিকটে নূতন কথা নহে। আমাদের বিবাহ প্রথা ইহার বিশেষ বিরুদ্ধ; কিন্তু তথাপি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে আজকাল কি মতামত প্রকাশ করিতেছেন তাহা আমাদের জানিয়া থাকিতে ক্ষতি নাই। য়ুরোপে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে বলিয়াই তাঁহারা এ সম্বন্ধে এত অধিক আন্দোলন করিতেছেন। আমরা তাহার কিঞ্চিৎমাত্র ফল নিয়ে প্রকাশ করিতেছি।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে আয়রলণ্ডের অ্যাকাডমি অব মেডিসিনের কোন এক অধিবেশনে সভাপতি ডাক্তার সি, এ, কেমিরণ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সভ্য, অর্দ্ধসভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে এ সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার প্রথাদি আদিম কালে প্রচলিত ছিল এবং আধুনিক কালেই বা কিরূপ আছে তাহার বর্ণনা করিয়া পরে যাহারা খুল্লতাত জ্যেষ্ঠতাত বা মাতুল কন্যা বিবাহ করিয়াছেন তাহাদের জীবনী হইতে দেখাইলেন যে সে বিবাহে সন্তান সন্ততিদিগের উপর কি কুফল ফলিয়াছে।

কত সংখ্যক লোক এরূপ বিবাহ করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য বক্তা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৮০০০ হাজার লোকের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, শতকরা ০.৫৭ জন অর্থাৎ কিঞ্চিদূর্দ্ধ শতকরা অর্দ্ধ জন মাত্র এরূপ বিবাহ করে এবং তাঁহার বিশ্বাস যে সমস্ত আয়ারলণ্ড বাসীদিগের ২০০ শত জনের মধ্যে একজন মাত্র এইরূপ বিবাহের অর্থাৎ খুল্লতাত অথবা মাতুল কন্যার সহিত বিবাহের সন্তান। এই বিশ্বাসের কারণ তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করেন। প্রথমতঃ এইরূপ বিবাহ প্রটেষ্টাণ্ট দিগের মধ্যেই প্রচলিত, রোমান কাথলিকদিগের এরূপ বিবাহ প্রচলিত নাই, এবং কাথলিকগণ আয়ারলণ্ডের তিন চতুর্থাংশ প্রোটেষ্টাণ্টেরা সিকি অংশ মাত্র।

পুনশ্চ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের লোক সংখ্যা হইতে জানা যায় যে সমস্ত আয়ারলণ্ডের জন সংখ্যার মধ্যে ৫১৩৬ জন মূক ও বধীর, তন্মধ্যে ১৩৫ জন নিকট সম্পর্কীয় ভ্রাতা ভগিনীর (First cousins) বিবাহের সন্তান।

এখন আয়ারলণ্ডের সমগ্র মূক বধীরের সংখ্যা যদি ৫১৩৬ হয় তবে এই পরিমাণে সমগ্র জন সংখ্যার উক্ত সামান্য দুই শতাংশের একাংশ মধ্যে ১৫.৬৮ অর্থাৎ মোট প্রায় ১৬ জন মূক বধীর সন্তান হওয়া উচিত। তাহা না হইয়া যখন দেখা যাইতেছে যে নিকট সম্পর্কীয় ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহের সন্তানগণের মধ্যে ১৫৩ জন মূক বধীর তখন এরূপ বিবাহ মূক বধীর জন্মিবার একটি প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ডাক্তার কিল্প্যাটরিক্ উক্ত বক্তৃতা শ্রবণান্তে বলিলেন, ইহা হইতে বেশ সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এক অথবা দুই পুরুষ বিভিন্ন ভ্রাতা ভগিনীদিগের (First and Second cousins) মধ্যে বিবাহ মূক ও বধির সংখ্যা বৃদ্ধির একটি বিশেষ কারণ।

তাঁহার সাক্ষাৎ জানার মধ্যে যত বোবা ও কালা সন্তান জন্মে তাহা নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের ফল। তিনি একটি দৃষ্টান্ত জানেন যেখানে এইরূপ নিকট বিবাহে একটী পুত্র মূক ও বধীর, দ্বিতীয়টি উন্মাদ এবং অপরাপর সন্তানগুলি শারীরিক সামর্থ্য হীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

ডাক্তার উসটেস্ বলেন যে "মনুষ্যজাতি অপরাপর সকল প্রাণীর শীর্ষস্থানের অধিকারী। অতএব যে সকল জন্তুর অস্থি আকার ও গঠনের সহিত আমাদের নিকট সাদৃশ্য আছে তাহাদের ব্যবহারাদি দেখিয়া এ প্রশ্ন সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। যাহাদের পশু পক্ষী ইত্যাদির চাষ (breeding) সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন যে কোন বিশিষ্ট জাতীয় ঘোটক হস্তী প্রভৃতি এক রক্ত সঙ্গমে ক্রমশ হীন জাতীয় হইয়া পড়ে, এবং ইহাও দেখা যায় যে জন্তুদিগকে স্বাধীন নির্ব্বাচনের ভার দিলে তাহারা প্রায়ই নিকট সম্পর্কীয়দিগের সহিত মিলিত হয় না।

ডাক্তার ফক্স ও ডাক্তার উইলিস্ তাহাদের প্রত্যেকে দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ডাক্তার কাফিরপের পক্ষ সমর্থন করেন। অবশেষে ডাক্তার রাইট এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডারউইনের কপোত-পরীক্ষার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন, এবং বলেন যাঁহারা এবিষয়ে কিছু মনোযোগ দিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে হাঁস ভেড়া মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের জাতি বিশুদ্ধ রাখা কিরূপ কঠিন।† হয় তাহাদিগকে অপর কোন উচ্চ বা নিম্ন জাতীয় হাঁস ভেড়া মুরগী প্রভৃতি পশু দ্বারা মিলিত করিতে হয় অথবা সে বংশ ক্রমশ একেবারে লোপ পাইয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেকিন-রাজ প্রাসাদ হইতে আনীত শ্বেত চূড়াবিশিষ্ট পোলদেশীয় কুক্কুটের বংশ কিরূপে লোপ পাইয়া যায় তাহার বিবৃত করেন।

এইরূপে দেখা যায় আয়রলণ্ডের ডাক্তারগণের মধ্যে কাহারও এবিষয়ে বিভিন্নমত নাই।

হেঁয়ালি নাট্য।*

ব্যাঘ্র সভা।

হ্যাট কোটধারী ব্যাঘ্র মহোদয়গণ আসীন।

সভাপতি ব্যাঘ্র। সভ্যগণ, আমরা সুসভ্য ব্যাঘ্রজাতি, পশুদিগের মধ্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এই উন্নতির কারণ—

---

† একজন ভদ্রলোক (তিনি ডাক্তার নহেন) তাঁহার সাক্ষাৎ জ্ঞান-গোচর বিড়াল শিশু কতকগুলি এই কারণে কিরূপ বধীর হইয়া জন্মে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

* মাঘ মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "আদেশ।" শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

প্রথম সভ্য। "আমাদের খরধার দন্তনখ, আমাদের দাঁতের জোরের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য? দেশকে দেশ আমরা এই দাঁতে নখের প্রতাপে উচ্ছন্ন দিই।

সভাপতি। (জিভ কাটিয়া) উহুঁ অমন কথা বলিবেন না। মনের জোরই আমাদের প্রধান জোর। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাক্য, স্বাধীন বাণিজ্য ইহাই আমাদের উন্নতির কারণ। আমরা যেখানে যাই এই স্বাধীনতা বিস্তৃত করি, বিশ্বজনীন উন্নতির ভিত্তি প্রোথিত করি।

দ্বিতীয় সভ্য। উত্তম। উত্তম। আমরা উন্নত উদার ব্যাঘ্র জাতি। আমাদের যেরূপ সুবিধা সেইরূপ বাক্য সুতরাং আমাদের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাক্য—

তৃতীয়। স্বাধীন বাণিজ্য। গরু ছাগল আমাদিগকে অনবরত রক্ত যোগায় সে জন্য তাহাদিগকে আমাদের কিছুই দিতে হয় না।" (সহসা একজন শৃগাল সভ্যকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া) কি হে তুমি কি বলিতে চাও?

শৃগাল। আমি শুধু একটি স্বাধীন বাক্য বলিতে চাই—

দ্বি স। বেটা তুমি স্বাধীন বাক্য বলিবে—তোমাকে এই উন্নত ব্যাঘ্র জাতির সহিত একাসনে বসিতে দিয়াছি—ইহাই যথেষ্ট—আবার স্বাধীন বাক্য। ধর বেটাকে ?

সকলের আক্রমণ, শৃগালের পলায়ন।

ব্যাঘ্র দূতের প্রবেশ।

দূত। মশায়রা গো, মশায়রা গো, আর স্বাধীনতা না, এদিকে গোখানার বড় গরুটা যায়।"

সভাপতি। বড় গরুটা যায়! তার পা দুট যে খেয়ে রাখা গেছে, যাবে কি করে?

দূত। সে যাবে না মশায়, তাকে নিয়ে যাবে।

সভা। কে নেবে কে?

দূত। কে আবার? ভালুক ভায়া, তার ডাক এতক্ষণ আপনারা কেউ শোনেন নি?

সভা। ভালুক ভায়া! গোখানার নেকড়ে খানসামা কি করছে? ভালুকের কাণ পাকড়ে ধরুক না?

দূত। সেত মশায় পাকড়াতেই গেছে।

সভা। তবে খবর?

দূত। খবরেরই মশায় অভাব। নেকড়ের খবর ত এখনো পাওয়া যাচ্ছেনা।

প্র-স। সত্যি না কি?

সভা। তাইত, নেকড়ের চাকর—বিড়ালটা বল, কুকুরটা বল যখন তখন আমাদের যোগাচ্ছে তার দেখানেই?

দ্বি-স। তার জন্যই ত এমন পেট ফুলিয়ে বসে আছি? তার দেখা নেই?

তৃতীয়। গেল গেল সব গেল, গরু গেল, নেকড়ে গেল, হায় হায় সব গেল।

সকলের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।

সভাপতি। (ব্যগ্রভাবে) আর কেঁদ না—সভ্যগণ, আমি এখনি খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছি।

গোশালা।

একজন ব্যাঘ্রের প্রবেশ।

ব্যাঘ্র। বলি ও নেকড়ে—নেকড়ে ভায়া হেথায় আছহে? (নেকড়েকে দেখিয়া) এই যে নেকড়ে জি—খবরটা কি বল দেখি? পাকড়ালে?

নেকড়ে। প্রভু, এতক্ষণ তা কি বাকী থাকে, সে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

ব্যাঘ্র। (আহ্লাদে) বেশ হয়েছে—ভালুকভায়া—কেমন জব্দ! কিন্তু কোথায় রেখেছ বলদেখি?

নেকড়ে। ভালুক ভায়া! তাকে কেন পাকড়াব?

সিংহ। তবে কাকে?

নেকড়ে। যাকে পারব তাকে। ভালুক পাকড়ান কি সহজ নাকি? ভালুক ত ভালুক—মশায় কানুলি বেড়ালটাকে ধরতে গিয়ে দেখুন না গায়ে এখনো আঁচড়ানোর দাগ।

ব্যাঘ্র। তবে কাকে পাকড়ালে নেকড়ে সাহেব?

নেকড়ে। দুটা ফড়িং।

ব্যাঘ্র। ফড়িং! কই?

নেকড়ে। একটাকে ঐ বর্ম্মার কোনে মেরে রেখে এসেছি। আর একটাকে এই পাহাড়ে মারতে চলেছি।

ব্যাঘ্র তাহার বুদ্ধি বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া নতজানু হইয়া বলিলেন—

প্রভু হে কে তুমি? এত বুদ্ধি নেকড়ের হইবে না। শুনিয়াছি মনুষ্য রাজ্যে ব্রিটিস ব্যাঘ্র নামে এক উচ্চতর ব্যাঘ্র জাতি আছে—তুমি তাহারি দ্বিতীয়াবতার নেকড়ে রূপে জন্মিয়াছ। প্রভু তোমায় প্রণাম করি—তুমি আমার মস্তকে চরণ স্পর্শ কর।

বিরহ।

সান্ধ্য-নীরবতার ঘুমন্ত জ্যোৎস্নায় জগতের অজানা রহস্যের অস্ফুট ছায়া রাখিয়া পাপিয়া হৃদয়ের মধ্য হইতে গাহিল—'চোক গেল'। বিরহিনীর অজানা হৃদয়ে পাপিয়ার সেই বিরহ-আকুল কণ্ঠস্বর পুরাতন কালের হারান স্মৃতির মত ধীরে ধীরে আসিয়া মিলাইয়া গেল। সে শুভ্র কৌমুদী-স্নাত কণ্ঠস্বরে কবে কোন্ বিরহী আপনার হৃদয়ের জ্বালা প্রকাশ করিয়াছিল—বিরহ দীপ্ত অক্ষরে আপনাকে রচনা করিয়া পাপিয়ার পঞ্চম কণ্ঠে হারাইয়া গিয়াছে। সেই অবধি পাপিয়ার হৃদয়োচ্ছ্বাসে বিরহিনীর মরমের কথা লিখিত। পাপিয়া পঞ্চমে তান চড়াইয়া গায় 'চোক গেল'—বিরহিনীর আকুল নিশ্বাস নীরবে বলিয়া যায় 'হায়'। সেই অবধি বসন্তে বিরহিনীর মরমে মরমে পাপিয়া ডাকে—বসন্তের কুসুম সৌরভে, বসন্তের মলয় বাতাসে বিরহের উদাস ভাব বিকশিত হয়। পুরশ্রী কাজে

কোকিল চিৎকার করিয়া বলে, পাপিয়ার স্বর ‘কু—উঃ।’ কিন্তু বিরহিনীরা বলেন, কোকিলের স্বরই কু উ।

বর্ষাকালে ভেকেরা বিরহের গান গায়। ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, চারিদিকে বিষাদের ঘনান্ধকার ছাইয়া থাকে,—সে অন্ধকার দিনে ভেকের বিরহ সঙ্গীতই উপযুক্ত। ভেক কণ্ঠোচ্ছাসে একটা অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বিরহিনীর হৃদয়েও কি যেন একটা বিভীষিকা জাগিয়া থাকে। বসন্তের পাখী পাপিয়ার কণ্ঠস্বরে হৃদয়ে একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য ভাবের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু বিভীষিকা হইতে তাহা অনেক দূরে। স্তরে স্তরে স্তরে পাপিয়ার গান যেমন অসীম আকাশে বিস্তৃত হয়, বসন্তের বিরহও সেইরূপ জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে—কবিতায়, সঙ্গীতে, নির্ঝর-ঝর্ঝরে, নদীকল্লোলে, কুসুমবিকাশে ফুটিয়া উঠে। জগতের সহিত বিরহিনীর হৃদয়ের ভাবের আদান প্রদান চলে। জোৎস্নায়, মলয়ে সহস্র রহস্য বিকশিত হয়। সেই মহারহস্যে কোথা আমি! কোথা তুমি! কোথা কে!—সেখানে সকলই অনির্দ্দেশ্য।

বর্ষার বিরহ গুমরিয়া মরে। সে জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়, অমনি গম্ভীর মেঘগর্জ্জন তাহাকে থামাইয়া দেয়। বসন্তের বিরহের মত তাহার স্বাধীনতা নাই। বসন্তে একটা দূরব্যাপী আকুলি ব্যাকুলি উপলব্ধি করা যায়—সেই আকুলি ব্যাকুলি সুরে বসন্তের পাখী হৃদয় খুলিয়া গায় ‘চোক গেল’। বর্ষাকালে পাপিয়া ‘চোক গেল’ বলিবে কেন—বর্ষার বসন্তের মত উজ্জল লাবণ্য কোথায়? সে বিষাদময় অন্ধকারময় আকাশে স্বাধীন পাপিয়ার সুর ব্যক্ত হইবে কিরূপে? বর্ষার বিরহ শ্বাসহীন বসন্তের বিরহ নিশ্বাসময়। বর্ষা মেঘাচ্ছন্ন—বসন্ত মেঘমুক্ত, নির্ম্মল, চন্দ্র কিরণ খচিত।

এই লাবণ্যময়ী বসন্ত-সুন্দরীর মৃদু নিশ্বাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পাপিয়ার সুর যখন আকাশে ভাসিয়া যায়—শেষ সূর্য্য কিরণমুগ্ধ মেঘমালার স্তরবিন্যস্ত সৌন্দর্য্য লাবণ্য বিকাশিত করিয়া, দেবকন্যাগণের উদ্ঘাটিত হৃদয় স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে কোথায় মিলাইয়া যায়—তখন বিরহ কি আপনার সঙ্কীর্ণ কুটীরের মধ্যে আর থাকিতে পারে? তখন সে বাহির হইয়া পড়ে—প্রকৃতির সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইতে চায়। কবিরা হৃদয়ে বিরহিনীদের এই উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস অনুভব করেন—এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত অশ্রুমোচন করিতে থাকেন।

বর্ষার বিরহ নীরবে হৃদয় দহন করে—বসন্তের বিরহের মত তাহা সহজে ধরা দেয় না। এই জন্য সামান্য কবিরা বর্ষার বিরহ অনুভব করিতে পারেন না। বিরহিনীর হৃদয়ে না ডুবিলে তাহা অনুভব করা যায় না। বসন্তের বিরহ আপনি ধরা দেয়, সেই জন্য কোকিল, মলয়, জোৎস্না সকলেরই আয়ত্তাধীন। বর্ষার মেঘ, অন্ধকার, বিষাদ, প্রাণের কিছুভিন্ন অপরে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু বর্ষার মধ্যে যতখানি অভিশাপ লুকান থাকে বসন্তে তাহার কিছুই থাকে না। বসন্তে হৃদয় নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া পড়ে; বর্ষায় হৃদয় হৃদয়-রুদ্ধ হইয়া মরে—শ্বাস রোধ হইয়া আসে। তাহার কারণ বসন্তে বিরহ সুখান্বেষী—সুখের ভাগ খুঁজে; বর্ষার বিরহ দুঃখের সহভোগী চায়।

বসন্তের বিরহের মধ্যে পরশ্রী কাতরতা খানিকটা প্রকাশ পায়। শ্যামল পল্লব, মধুর মলয়, নবযৌবন ক্রীড়াময়ী,—চারিদিকেই আনন্দ। ইহার মধ্যে বিরহিনীর অসূয়া। বসন্তের কবি পাপিয়া বিরহিনীর হৃদয়ের মধ্য হইতে চারিদিকে চাহিয়া এই জন্যই

আক্ষেপ করে 'চোক গেল'। মিলন মনে মনে হাসিয়া বলে 'তোমার চোখ যাইলেই ভাল'।

কিন্তু পাপিয়া তাহা শুনিবে কেন? পাপিয়া আবার বলে 'চোক গেল'। এক্ষণে পাপিয়া আর থামে না—সুর হইতে রেখাব, রেখাব হইতে গান্ধার, গান্ধার হইতে মধ্যম, মধ্যম হইতে পঞ্চমে উঠিয়া পাপিয়া অনবরত বলে—'চোক গেল' 'চোক গেল' 'চোকগেল'। কোকিল পাপিয়ার হিংসা দেখাইয়া বলে 'কু' 'কু' 'কু'। ভাবোন্মত্ত পাপিয়া সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না—বিরহ কাতর কণ্ঠস্বরে বসন্তের অবিরল প্রবাহিত জ্যোৎস্নার মধ্য হইতে গাহিয়া উঠে 'উ-উ-উ চোক গেল'। বসন্তের শুভ্র জ্যোৎস্না আরও জ্যোৎস্নাময়ী হইয়া উঠে। বিরহিনীর হৃদয়ের আকুলতা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে।

এইরূপে অজানা নিশ্বাসের মত বসন্ত ধীরে ধীরে অবসিত হয়। তখন যদি বা পাপিয়া ডাকে তেমন মধুর লাগে না। তখন ফুল ফুটে, জ্যোৎস্না ফুটে—কিন্তু সে সহস্র স্মৃতি অগণ্য বিস্মৃতি-জড়িত জ্যোৎস্না আর ফুটে না। জীবনের উচ্ছ্বাস মরিয়া আসে। বিরহিণী চমকিয়া উঠেন—"কখন বসন্ত এল এবার হ'ল না গান।"

বসন্তে বিরহিনীর হৃদয়ের ভাবে কেমন শৃঙ্খলা আছে। বসন্তে ভাবের ক্রমবিকাশ উপলব্ধি করা যায়। বর্ষার প্রথম হইতেই যেন একটা ভাব ফুটিয়া থাকে। তাহাতে স্তর নাই, ক্রম বিকাশ নাই। বসন্তে ভাবের বড় বড় উপন্যাস রচিত হয—তাহাতে বাসুকীর মত সহস্র দীর্ঘনিশ্বাস ফণা তুলিয়া আছে, তাহাতে মান আছে, ভঞ্জন আছে, হাসি বাঁশি, নৈরাশ্য, মিলন, সকলই আছে; এবং এই সমস্তের মধ্যে একটি শোভন শৃঙ্খল আছে। বর্ষার 'সুও রাণী দুও রাণী'র মত ছোট ছোট গল্প রচিত হয়। বর্ষায় মান থাকিতে পারে, ভঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু তেমন ঘটা নাই; বর্ষার বাঁশী আছে, কিন্তু বসন্তের ভেসে মৃদু কম্পন নাই। বসন্তশেষে বিরহিনী চমকিয়া উঠেন—তাঁহার নিশ্বাস যেন থামিয়া আসে। বর্ষা শেষে হৃদয় হইতে একটি ম্লান দীর্ঘ নিশ্বাস উচ্ছসিয়া উঠে।

শ্রী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ষের বিদায় গান।

আয় প্রাণ আয়, বসন্ত সে যায়,
এই বেলা তার সাথে চলে আয়।

তরু দেহ হ'তে পাতা পড়ে ঝরে
সুকুমারী লতা ধীরে যায় মরে!
গোলাপের দল, ঝরে অবিরল
বেলার অধরে হাসি নাহি ভায়।
মলিন মালতী, যূথিকা শুকায়।
মানিনী করবী, টগর গরবী
বিরহের তাপে মাথাটি নোয়ায়।
এই বেলা প্রাণ আয় চলে আয়।

ফুল বাস মাখা মলয় সমীর,
ফুল দশা হেরি আকুল অধীর
উদাস পরাণে বন হতে ধায়,
দূর দুরান্তরে কে জানে কোথায়!
পাখীগুলি সব, হয়েছে নীরব,
মধুর সঙ্গীত আর নাহি গায়।

বসন্তের সাথে সবে চলে যায়।
এই বেলা প্রাণ তুই চলে আয়।

বরষা আঁধার আসিবে এখনি,
সাথে করে নিয়ে ঝটিকা অশনি।
এখনি ধরার ফুরাইবে সুখ;
অশ্রুতে মলিন হবে হাসি মুখ।
তার সাথে বল, তোর অশ্রুজল
মিশাইতে মন সাধ কিরে যায়?
এই বেলা প্রাণ আয় চলে আয়।

লয়ে যাবি সাথে যুথিকার হাস,
লয়ে যাবি সাথে মালতীর বাস,
গোলাপের প্রেম মলয় বাতাস,
কানন বালার অভিমান শ্বাস,
পল্লবের গান, পাখী কলতান
সাথে নিয়ে সব আয় চলে আয়।
ওই যে বসন্ত মাগিছে বিদায়।
এই বেলা প্রাণ আয় চলে আয়।

শ্রী হিরণ্ময়ী দেবী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আফগান বিবরণ। শ্রী কেশবচন্দ্র আচার্য্য প্রণীত। লেখক ভূমিকাতে যাহা বলিয়াছেন, আমরা এই পুস্তকের সমালোচনাতে প্রথমে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"আফগান বিবরণ আফগানিস্থানের সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে। যে প্রকারে সদোযায়ী রাজত্ব সংস্থাপিত হয়, এবং যে কারণে তাহার ধ্বংস হইয়া বরাকযায়ী রাজত্ব সংস্থাপিত হয় এবং যে কারণে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বারম্বার আফগানিস্থানে যাইতেছেন সেই সকল বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।"

কিন্তু পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা বাঙ্গলাতে আফগানের প্রথম ইতিহাস পুস্তক। অন্ততঃ বাঙ্গলায় আফগানের অন্য ইতিহাস পুস্তক আছে বলিয়া ত আমরা জানি না। সুতরাং লেখক এজন্য ধন্যবাদের পাত্র।

আফগানিস্থান সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কি ব্যবহার করা উচিত—এ সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন—আমাদের সর্ব্বতোভাবে ভাল লাগিল না। তিনি বলিতেছেন—"আফগান দেশ অধিকার করিতে পারিলে যে নিতান্ত মঙ্গলের বিষয় তাহার সন্দেহ নাই এবং ঐরূপ অধিকার স্পৃহাও নিতান্ত বাঞ্ছনীয়"। কিন্তু তবে কি না ঐ উদ্ধত জাতিকে পরাজিত করিয়া শাসনে রাখা নিতান্তই কষ্টকর—সে জন্যই মাত্র লেখকের মতে বৃটিসগভর্ণমেণ্টের উহা করা উচিত নয়।

আমরা বলি তাহাদের শাসনে রাখা সহজ হইলেও গভর্ণমেণ্টের তাহা করা উচিত নহে। তাহাতে স্বার্থ সিদ্ধি হইতে পারে কিন্তু তাহা নীতি বিগর্হিত।

লেখক বলিতেছেন—"আফগানকে দুর্ব্বল অবস্থায় রাখাই বৃটিস গভর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভারতবর্ষবাসী গণকে অস্ত্র শূন্য করিয়া আফগানগণকে অর্থ এবং অস্ত্র দ্বারা বলীয়ান করা যে কোন নীতিসঙ্গত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।"

ঠিক কথা, আত্ম রক্ষার জন্য আফগানকে যতটুক দমনে রাখা আবশ্যক তাহা ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য—সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতবাসীকে অস্ত্রশূন্য করা কোন নীতি সঙ্গত যেমন বুঝা যায় না, তেমনি স্বার্থের জন্য একটা সর্ব্বগ্রাসী তৃষ্ণার মাহাত্ম্যও আমরা বুঝিতে পারি না।